তারাশঙ্কর স্মৃতিকথা

প্রথম খণ্ড

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়



নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩,

প্রকাশক করেছেন—
শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস, (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম সংস্করণ
বৈশাখ ১৩৬৭

ছেপেছেন—
এস. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস, (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

তারাশঙ্কর স্মৃতিকথা

প্রথম খণ্ড

সূচীপত্র

ভূমিকা

বোধহয় ১৯৩০ সালের আগেকার কথা। কল্লোল দল ভাগ হয়ে গিয়েছে। কল্লোলের লেখকদের কেউ কেউ কালিকলম নামে আর একটি পত্রিকা প্রকাশ করছেন। কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের দোতলায় তার দপ্তর। সম্পাদকদের মধ্যে একজন ছিলেন মুরলীধর বসু। তিনি ভবানীপুরের মিত্র ইনস্টিটিউশন স্কুলের শিক্ষক। তাঁর নাম এখন আর বিশেষ কেউ জানে না। তিনি আমাকে বললেন, 'তুমি অমুখ তারিখে আপিসে এসো। তারাশঙ্কর বলে ছেলেটির সঙ্গে তোমাকে পরিচয় করিয়ে দেব।' সেই তারিখে কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের দোতলায় উঠলুম। কিন্তু তারাশঙ্কর সেদিন আসেন নি। পরে তাঁর সঙ্গে অনেকবার দেখা হয়েছে। প্রত্যেকবারই মুরলীধরবাবুর বর্ণনার কথা মনে হয়েছে। তারাশঙ্করবাবুকে বহুদিন পর্যন্ত, যা তাঁর বয়স তার চেয়ে অনেক কম মনে হ'ত। অনেকদিন পর্যন্ত প্রৌঢ় বয়স তাঁর চেহারায় কোনও ছাপ ফেলতে পারে নি। অনেক বয়স পর্যন্ত তাঁকে নবীন যুবক না হলেও যুবক বলে চালিয়ে দেওয়া যেত। তাঁর একাধিক আত্মজীবনীতে তারাশঙ্কর পরিণত বয়সের চেয়ে প্রথম বয়সের সাহিত্যজীবনের কথাই বেশি বলেছেন। বেশির ভাগ লেখকই এক অর্থে বয়সের হিসাবের বাইরে বলা যেতে পারে। পরিণত বয়সেও অনেকে তাঁরা নিজেদের শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের দিনগুলিকে আস্বাদন করতে পারেন। সেই স্বাদ তাঁদের রচনায়, কবিতায়, গল্পে ও উপন্যাসে ফিরে ফিরে আসে। যাঁরা স্মৃতিকথা লিখেছেন তাঁরা তো বটেই। যাঁরা লেখেন নি, তাঁদেরও চিঠিপত্রে তার বহু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের কথা ছেড়ে দিচ্ছি। তিনি স্পষ্ট করে সব সময় সব কথা বলেন নি। কবিদের স্বভাবই এই। আমরা কখনো কখনো সেই অস্পষ্ট রেখা পড়তে চেয়েছি। কখনো য :মনে করতে ভালবাসি সেই পছন্দসই চিন্তা কিংবা ভাললাগাকে তাঁর উপর আরোপ করেছি। পরবর্তীকালের লেখকদের মধ্যে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের আত্মজীবনীর কথা অনেকের মনে পড়বে। বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ও বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের জীবনীকথা কিছুদিন পূর্বে বেরিয়েছে। শিবরাম চক্রবর্তীর 'ঈশ্বর পৃথিবী ভালবাসা' লেখবার পর চার বছর হয়ে গিয়েছে। পড়বার সময় তাঁর লেখা একাধিক গল্প মনে পড়বে এবং 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' উপন্যাস। কিন্তু একে কি প্রচলিত প্রথার জীবনস্মৃতি বলব? হেমেন্দ্রকুমার রায় টুকরো টুকরো করে তাঁর সময়ের পরিচিত চরিত্রদের পরিষ্কার ছবি এঁকেছেন। সজনীকান্ত দাসও আত্মস্মৃতি লিখেছিলেন। তার স্বাদ আলাদা। মনীশ ঘটকও অল্প লিখে গিয়েছেন, কিন্তু সে লেখা একটু ছন্নছাড়া। প্রবোধকুমার সান্যালের 'বনস্পতির বৈঠক' একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বেরিয়ে যথেষ্ট সমালোচনার খোরাক জুগিয়েছিল। পরে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে পুস্তকাকারে বেরিয়েছে। প্রবোধকুমারের বই অবশ্যই তাঁর স্মৃতিকথা এবং প্রথম যখন প্রকাশিত হয়েছিল তখনই মনে হয়েছিল বেশিমাত্রায় স্মৃতিনির্ভর।

এটি অবশ্য শুধু তাঁর সাহিত্যজীবনের চিত্র নয়, সাহিত্য ছাড়াও সমসাময়িক কালকে ধরে রাখবার চেষ্টা। যাঁদের এক সময় অতি আধুনিক সাহিত্যিক বলা হত, তাঁদের মধ্যে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু ও অল্পদিন আগেকার লেখা বিষ্ণু দে ও সমর সেনের সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণের কথা পাঠকদের মনে পড়বে। সুধীন্দ্রনাথ দত্তও তাঁর সময়কার কথা লিখেছিলেন কিন্তু সে বিবরণ অসম্পূর্ণ, এবং বাংলাভাষায় লেখা নয়। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত যাকে তাঁদের যুগ অর্থাৎ কল্লোল যুগ বলেছেন তাকে স্পষ্ট করে দেখাতে চেয়েছিলেন। দীনেশরঞ্জন দাশ যিনি কল্লোলের সম্পাদনা করতেন, তাঁর কথা অনেকের মনে নেই। সম্পাদনার কাজ ছাড়াও তাঁর অন্য বহুবিধ গুণ ছিল। তার মধ্যে অভিনয় একটি। পরবর্তী জীবনে সিনেমার নেশা তাঁকে কল্লোল থেকে দূরে সরিয়ে এনেছিল। তাঁর সঙ্গে তারাশঙ্করের প্রথম সাক্ষাৎ খুব প্রীতিকর হয় নি। সম্ভবত দুজনই মানুষ চিনতে ভুল করেছিলেন। সেখানে আরও উপস্থিত ছিলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। সেদিন যে দৃশ্যের অবতারণা হল সেটা এমন কিছু বিচিত্র নয়। কিন্তু তারাশঙ্কর কল্লোল গোষ্ঠীর সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারলেন না। কেবল মুরলীধর বসুকে দেখে মনে হল 'কতকালের জানাশোনা'।

কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের দোতলায় প্রতি বৃহস্পতিবার বসত 'বারবেলার আসর'। এই আসরে পরিচয় হল সরোজকুমার রায়চৌধুরী, শশাঙ্ক চৌধুরী, কিরণকুমার রায় ও সুবোধ রায়ের সঙ্গে। এ আসরেও তারাশঙ্কর যা আশা করেছিলেন তা পেলেন না। তিনি মনে করেছিলেন এটি হবে সাহিত্যপাঠ ও সমালোচনার আসর, আবিষ্কার করে আশ্চর্য হলেন এ সাহিত্যিকদের গল্পগুজব করবার বৈঠক। এই আসরে গিয়ে প্রথম দিন এই জন্য তাঁর মন স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে নি। তাহলেও সাহিত্যের বাঁধা সড়কে এই তাঁর পদার্পণ। সাহিত্যলক্ষ্মী এই সময় থেকে তাঁর প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিপাত করেছিলেন। অল্পদিনের মধ্যে তিনি অনেকগুলি ভাল গল্প লিখেছিলেন-- যেমন জলসাঘর, মুটু মোক্তারের সওয়াল, নারী ও নাগিনী, মেলা যা তাঁর পাঠকরা মনে করে রেখেছেন। একটি বড় লাভ তাঁর শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয়।

তারাশঙ্কর তাঁর জীবনের প্রথম অধ্যায়কেই একটু বড় করে এঁকেছেন। তাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। যে-সব বইয়ের জন্য পরবর্তীকালে তিনি বিখ্যাত হয়েছেন, যেমন—চৈতালী ঘূর্ণী, কালিন্দী, কবি, গণদেবতা, নাগিনী কন্যার কাহিনী, আরোগ্য নিকেতন সেই সব গল্পের ছাঁচ কিংবা বিভিন্ন চরিত্রগুলির আদল তাঁর 'সাহিত্য-জীবনে' পাওয়া যাবে। উত্তরবাংলা, পূর্ববাংলার পদ্মার তীরের গ্রাম, যশোর ও খুলনা, হুগলী জেলা বর্ধমানের শহর ও গ্রাম এ সবের সঙ্গে বাঙালী পাঠকের আগে থেকে পরিচয় ছিল। কিন্তু বীরভূমের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে বিলম্বে, ১৯২৫-২৬-এর পর থেকে, এ কথা বললে বোধহয় ভুল হয় না।

তারাশঙ্কর লাভপুর গ্রামের কোনও কোনও বাড়ির জামাইদের কথা বলেছেন যাদের থিয়েটারের নেশা ছিল। সকাল বেলায় বাড়ি অর্থাৎ শ্বশুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোনও দোকান ঘরে বসে থিয়েটারের 'পার্ট' লিখতেন, এবং ভাবী অভি-

নেতাদের সন্ধানে থাকতেন। প্রায় প্রত্যেক শহরেই এই রকম থিয়েটার পাগল দেখা যেত। তারাশঙ্করের নিজের এ বিষয়ে উৎসাহের কথা তাঁর আত্মস্মৃতিতে আছে। লাভপুর নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মস্থান। তিনি তারাশঙ্করের আত্মীয়। একসময় তাঁর নাটক কলকাতার রঙ্গমঞ্চে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। তারাশঙ্করের ছোটগল্প নুটু মোক্তারের সওয়ালের পরিবর্তিত নাট্যরূপ 'দুইপুরুষ' বহুদিন ধরে মঞ্চে প্রশংসার সঙ্গে অভিনীত হয়েছে।

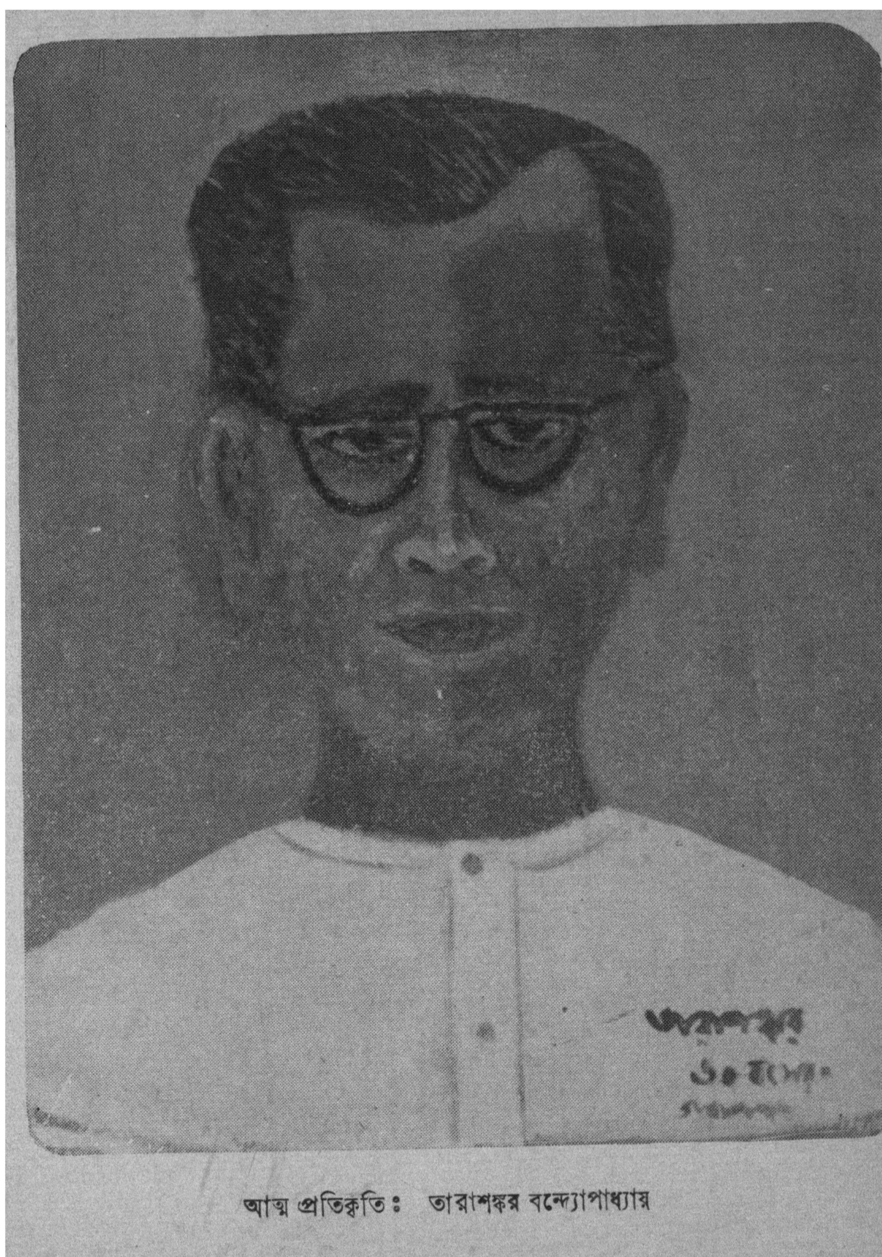
এই বহু প্রশংসিত নাটকটিকে রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের ব্যবস্থা করতে গিয়ে যে দুঃখ এবং অনাদর পেতে হয়েছে তারাশঙ্কর তার কথা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। যাকে 'কমার্শিয়াল থিয়েটার' বলা হয় তার গৌরব এখন আর আগেকার মতো নেই। কিন্তু নাটক নির্বাচনের রীতির যে পরিবর্তন হয়েছে তা মনে হয় না। তখন রীতি ছিল পরিচিত উপন্যাসগুলিকে নাট্যরূপ দিয়ে অভিনয় করা। এই প্রথায় অনেক সময় ব্যবসার দিক থেকে ফল ভাল ফলেছে।

অপেক্ষাকৃত অল্পসময়ে তারাশঙ্কর 'মারাঠা তর্পণ' বলে একটি নাটক লিখেছিলেন। নাম শুনলে মনে হয় তাতে 'sound and fury'র অংশ কিছু কম ছিল না। থিয়েটারের কর্তারা এটিকে মঞ্চস্থ করতে তখন উদ্গ্রীব ছিলেন না। পরিণত বয়সে তিনি সেই সময়ের ইতিহাস অর্থাৎ পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের ঘটনা নিয়ে একটি বড় নাটক লিখেছিলেন ইতিহাসের বড় পটভূমিতে। প্রধান চরিত্র দুটি আহমেদ শাহ্ আবদালী ও তৃতীয় পেশোয়া বালাজী বাজী রাও। দেশ পত্রিকায় বেরিয়েছিল কয়েক সপ্তাহ ধরে। কিছু দিন পরে স্টার থিয়েটারে অভিনীত হল, বালাজী রাও নামে। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র গুপ্ত ছাড়া তখন স্টার থিয়েটারে নামকরা অভিনেতা তেমন কেউ ছিলেন না। অভিনেত্রীও নন। তাহলেও জনসমাগম যথেষ্ট হয়েছিল। খবরের কাগজে বিরূপ সমালোচনাও হয় নি। খানিকটা রসিকতা করতে গিয়ে আমি এর মধ্যে জড়িয়ে পড়লাম। অনেকদিন ধরে সেই স্মৃতি আমাকে পীড়া দিয়েছে, কাজেই পরিষ্কার করে বলা দরকার। কয়েক সপ্তাহ অভিনয় হবার পর সংবাদপত্রে একজন সুপরিচিত সাংবাদিকের স্বাক্ষরে একটি চিঠি বের হল। তাতে অভিনয়ের প্রশংসার পরে এই ধরনের কথা ছিল এমন প্রকৃত ঐতিহাসিক নাটক আর কখনও লেখা হয় নি। নাটকে কোনও ঐতিহাসিক ত্রুটি খুঁজে পাওয়া যাবে না। সে পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগেকার কথা। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন প্রথম শৃঙ্গোদ্গমে কোনও কোনও প্রাণীর স্বভাব হয় যে সে সব জিনিসের সঙ্গে শৃঙ্গের শক্তি পরীক্ষা করে। আমার শৃঙ্গোদ্গম বহু পূর্বে হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু স্বভাব তখনও যায় নি। আমি খবরের কাগজে চিঠি লিখলাম নাটকটিকে আর যাই হোক ঐতিহাসিক ত্রুটি থেকে মুক্ত এ কথা বলা চলে না। বাংলা নাটক আমাদের ইতিহাসের প্রথম পাঠ শিখিয়েছে, ইতিহাসের ভুলও কিছু শিখিয়েছে। মুঘলযুগের একমাত্র বাংলা নাটক যা ইতিহাসের ভুল থেকে মুক্ত বলে মনে হয়, সে হচ্ছে তখ্ত-ই-তাউস, প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর লেখা; জাহান্দার শাহর স্বল্পস্থায়ী রাজত্বের কাহিনী নিয়ে। নাটকের প্রযোজনার ত্রুটি ছিল কিছু তার জন্য নাট্যকার দায়ী ছিলেন না।

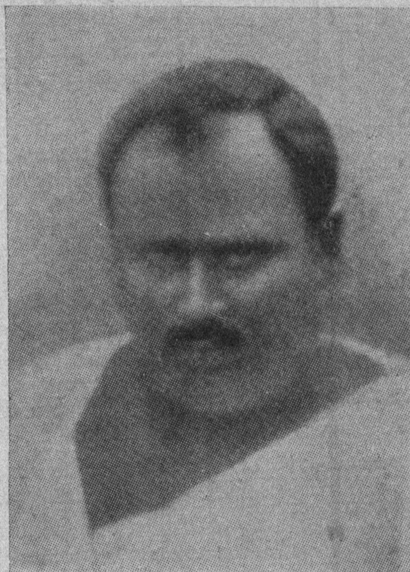
ত্রুটিহীনতার দাবী অবশ্য তারাশঙ্কর নিজে করেন নি। কিন্তু শুনেছি সমালোচনাটি পড়ে তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। কয়েক বছর পরে দিল্লী থেকে কলকাতার পথে একটি বড় স্টেশনে, বোধহয় কানপুরে, আমাদের দেখা হল। তিনি কখন ট্রেনে উঠেছিলেন জানি না। সস্নেহে তাঁর কামরায় আমাকে আমন্ত্রণ করে মিষ্টান্ন বিতরণ করলেন। মিষ্টান্ন আমার প্রিয় নয়, কিন্তু সেই সময় তাঁর দেওয়া উপহার প্রত্যাখ্যান করতে ইচ্ছা হল না। যদি বা কিছু অম্ল রস কোথাও সঞ্চিত হয়ে থাকে সেদিনের মিষ্টান্নের মাধুর্যে দূর হয়ে গিয়েছিল।

আরও অনেক বছর পরে বিশ্বভারতীর আমন্ত্রণে তারাশঙ্কর শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। এই তাঁর শেষ শান্তিনিকেতনে আসা। পূর্বে এসেছিলেন কবির আহ্বানে পঁয়ত্রিশ বছর আগে। কবি তাঁর 'রাইকমল' ও 'ছলনাময়ী' পড়ে বিশেষ পরিতৃপ্ত হয়ে পত্র লিখেছিলেন। তখনকার শান্তিনিকেতন যাত্রা এবং শেষবারের শান্তিনিকেতন আসার মধ্যে প্রভেদ ছিল। তারাশঙ্করের বক্তৃতার বিষয় ছিল রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার পল্লী। এই উপলক্ষে 'মহাকবিকে তাঁর সাধনপীঠে প্রণাম জানাবার আবেগটিও অনুপস্থিত ছিল না।' এর কিছু পূর্বে একবার শান্তিনিকেতনে এসে নানা কারণে সুস্থ বোধ করেন নি। তাঁর প্রাথমিক বক্তৃতায় সে কথা স্পষ্ট করে বলেছিলেন। বক্তৃতার পালা সাঙ্গ হবার পর তিনি কয়েকদিন থেকে গিয়েছিলেন; মনে হয় তাঁর শেষ শান্তিনিকেতন বাস অপ্রীতিকর হয় নি। এই বক্তৃতাগুলি যখন ছোট বই হয়ে প্রকাশিত হল তখন অবিমিশ্র বিস্ময়ে লক্ষ্য করলুম তিনি গ্রন্থটি "শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত অশেষ প্রীতিভাজনেষু"কে উৎসর্গ করেছেন। মনের মধ্যে একটি কাঁটার বিরোধ কোথাও ছিল, সেটি অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছে।

প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত



আত্ম প্রতিকৃতি : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়



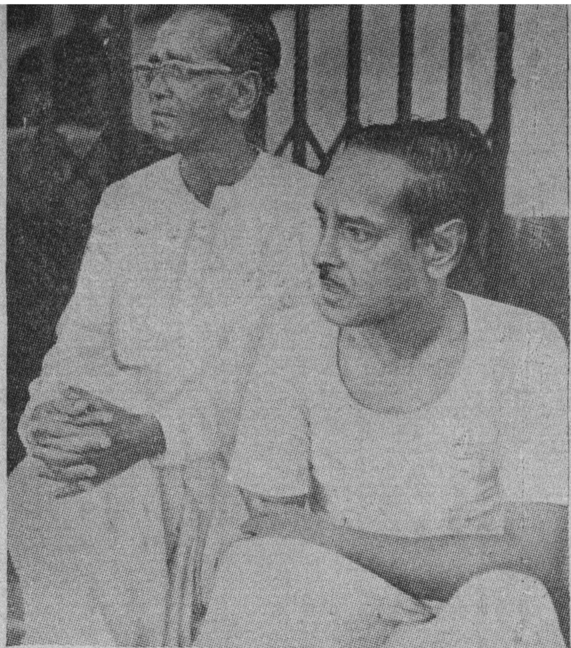
বাবা : হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়



পিসিমা ঃ শৈলজা দেবী



মা ঃ প্রভাবতী দেবী



জ্যেষ্ঠপুত্র
সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-এর
সঙ্গে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়



তারাশঙ্করের নিকটতম বন্ধু
সজনীকান্ত দাস



পত্নীঃ উমাশশী দেবী

আমার কালের কথা

এক

অসীম অনন্তকালের পথ অতিবাহন করে চলেছে মানুষের মিছিল। বছরের-পর-বছরের মাইল-পোস্ট পিছনে পড়ে থাকছে। বিরাম বিশ্রামহীন চলা। পঞ্চাশটা মাইল পিছনে ফেলে এসে বারেকের জন্য পিছনে চাইতে ইচ্ছা হল।

পাশে যারা সঙ্গী সাথী জুটেছে, যারা কেউ এসেছে—তিরিশ মাইল, কেউ বা বত্রিশ, কেউ বা পঁয়ত্রিশ—যারা ভালোবাসে—পথ চলায় যারা বহু সপ্তপদ একসঙ্গে ফেলে হয়ে উঠেছে অন্তরঙ্গ মিত্র, অনুজের সমান প্রিয়—তারা লক্ষ্য করলে পথ চলার মধ্যে আমার ভাবান্তর।

প্রশ্ন করলে—কি হল দাদা?

বললাম—কালের পঞ্চাশটা মাইল-পোস্ট ফেলে এলাম পিছনে; আজ মনে পড়ছে সেই কথা। আঁকাবাঁকা, চড়াই-উৎরাই, রুক্ষ প্রান্তর, ছায়াশীতল সমতল পার হয়ে চলেছে জীবনের রথ, আলোকে-অন্ধকারে, সুখে-দুঃখে বিচিত্র এর রূপ—সেই সব কথা মনে পড়ছে ভাই।

তারা বললে—বলুন সেই কথা। আপনার কথা।

—না। আমার কথা বলতে নেই ভাই।

—না। বলুন।

—না। আমার মা বলেছেন—নিজের পুণ্যের কথা বললে সে পুণ্য ক্ষয় হয়, কীর্তির কথা বললে সে কীর্তির বনিয়াদে ফাট ধরে; নিজের বেদনার কথা বললে নিজের অপমান করা হয়; নিজের সুখের কথা বললে অহঙ্কারের পাপ স্পর্শ করে। নিজের কথা বলা যায় শুধু একজনের কাছে।

তারা হয়তো হাসলে। হাসির কথাই যে। বিংশ-শতাব্দী বিজ্ঞানের যুগ। এই যুগে যে-একজনের কাছে নিজের কথা বলা যায় বলে অনুমান তারা করলে, তার অস্তিত্ব যে সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে।

—হাসিস নে ভাই। তার কথা আমি বলিনি। আমিও যে তোদের সঙ্গী, একসঙ্গে পথ চলেছি। তোদের সামনেও যে সন্ধিক্ষণ বা উদয়লগ্নের নব আভাস দেখা দিয়েছে, আমিও যে চোখের সামনে ঠিক তাই দেখছি। আমি বলছি যে-জনের কথা, সে হলাম আমি নিজে। নিজের কাছে ছাড়া নিজের সুখের কথা,

পুণ্যের কথা, কীর্তির কথা—এ সব কথা বলতে নেই। যাঁরা অনন্যসাধারণ তাঁরা পারেন বলতে। যেহেতু না, তাঁদের অনুসরণ করেই আমাদের চলা। তাঁরা ঋষি, আদিম কাল থেকে তাঁরা বলে আসছেন তাঁদের উপলব্ধির কথা, অভয়ের বাণী—শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ। আর বলে যারা একান্তই নগণ্য সাধারণ, তারা। কারণ তাদের স্পর্শবোধ আছে—অনুভবশক্তি নাই, বেদনায় চিৎকার করে কাঁদা, সুখে কলরব করে উল্লাস করা হল তাদের স্বভাবধর্ম। অনন্যসাধারণ আমি নই; অতি বিনয় করে নিজেকে নগণ্য সাধারণও মনে করি না। তাই চিৎকার করে কেঁদে, বা কলরব করে উল্লাস করে দুঃখ সুখের কথা বলতে পারব না। আমি সাধারণ মানুষ, আমার অধিকার সম্বন্ধে আমি সচেতন, আমার মর্যাদা সম্বন্ধে সজ্ঞান। তাই আমার নিজের কথা বলব শুধু নিজেকে, নিজেই দাঁড়াব নিজের কাছে বিচারপ্রার্থীর মতো এবং বিচারকের মতো, সান্ত্বনাপ্রার্থীর মতো—সান্ত্বনাদাতার মতো। তবে—

—তবে?

—তবে হ্যাঁ, বলতে পারি কিছু কথা। বলতে পারি পথের কথা অর্থাৎ কালের কথা। এই পঞ্চাশটা বছর—পঞ্চাশটা মাইল-পোস্টের কথা বলতে পারি।

—তাতেও কি আপনার কথা বলা হবে না?—হাসলে অনুজদের একজন।

—না।

—না?

—হ্যাঁ ভাই, না।

—কালের কথায় আপনি আসবেন না? আপনার কথা থাকবে না?

—আসব। থাকবে। তবু সে আমার আসা হবে না, আমার বলা কথা হবে না।

উটপাখিতে শুনেছি বালির মধ্যে মুখ গুঁজে ভাবে আমাকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না। কথাটা সেই রকম হল না দাদা?

—ভাই, ক্ষীর-সাগরের হংসের দল, উটপাখির এ দৃষ্টান্ত ঠিক খাটে না। বিচার করে ভেবে দেখ, ক্ষীর-সাগরের রসপরিপূর্ণতার হানি না ঘটিয়ে যেটুকু জল তার সঙ্গে থাকে, সেটুকু ন্যায্য অধিকারেই থাকে। জল বলে তাকে বাদ দিতে গেলে ক্ষীর-সাগর ক্ষোয়াক্ষীরের খটখটে চড়ায় পরিণত হবে ভাই। ঐতিহাসিক প্রত্নতাত্ত্বিকেরা তীক্ষ্ণতুণ্ডতে তাকে বিদীর্ণ করে মুক্তা-প্রবাল অনেক আবিষ্কার করবেন তার ভিতর থেকে, কিন্তু হংসের দলের—তোদের বিপদ হবে, সাঁতার দেওয়া চলবে না। ক্ষীরের মধ্যে যতটুকু অধিকার, সেই অধিকারটুকু জুড়ে থাকবে আমার কথা। তার বেশি নয়।

—বেশ, মেনে নিলাম। এখন আরম্ভ করুন আপনার কথা।

১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাস। ঠিক মাইলখানেক পিছনে—১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসের পোস্টের উপর তে-রঙ্গা ঝাণ্ডা উড়ছে। মাঝখানে তার অশোক-চক্র। ওই ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসেই আমি প্রবেশ করেছি পঞ্চাশের মাইলে। পিছনে ঊনপঞ্চাশটা মাইল-পোস্ট পার হয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীতে—১৮৯৮ সালের জুলাই মাসে—বাংলা ১৩০৫ সালের ৮ই শ্রাবণ সূর্যোদয়ের ঠিক পূর্বলগ্নে আমার জীবন-

যাত্রার শুরু।/ আমাদের অঞ্চলে বলে, ব্রাহ্মমুহূর্তে সূর্য উদিত হননি, তাঁর লাল আভা ফুটেছে পূর্বদিগন্তে, এমনি সময় আমার জন্ম বলে শাস্ত্রমতে আমার জন্মদিন ৭ই শ্রাবণ। অল্প কয়েক মুহূর্তের জন্য একদিন আয়ু আমার হয় বেড়ে বা কমে গেছে।

১৮৯৮ সাল। ভারতবর্ষের দিকে দিগন্তে উড়ত তখন ইউনিয়ন জ্যাক। ভারতেশ্বরী তখন মহারানী ভিক্টোরিয়া। লোকে বলত—মহারানীর রাজত্ব। বাংলাদেশ তখন জেলায়-মহকুমায়-থানায় ভাগ হয়েছে। শিকলে ছাঁদে ছাঁদে বাঁধা, এমন বাঁধন যে এক জায়গায় টান পড়লে শিকলের সবখানে সব কড়া ঠনঠন শব্দে বেজে ওঠে। প্রাচীন রাঢ় বারেন্দ্র প্রভৃতি বিভাগের নাম মানুষ ভুলে গিয়েছে। বিস্মৃতনামা প্রাচীন রাঢ়ের এক প্রান্তে বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রাম। আমার সূতিকাগৃহ আজও আছে। মাটির মেঝে, শক্ত পাথুরে রাঙা মাটির দেওয়াল দিয়ে গড়া উত্তরদুয়ারী কোঠাঘর আজও অটুট আছে। শুধু অটুট বললেই বোধ হয় সব বলা হয় না। ঘরখানির সামান্য পরিবর্তনের জন্য বছর কয়েক আগে খানিকটা দেওয়াল ভাঙার প্রয়োজন হয়েছিল, কোদাল টামনা শাবল হার মানলে, শেষে গাঁইতি আনা হল; দেওয়াল ভাঙল বটে, কিন্তু সেদিন যে আগুনের ফুলকি ছড়িয়েছিল গাঁইতির আঘাতে আঘাতে, তা আজও আমার চোখে ভাসছে। গাঁইতির একটা দিক ভোঁতা হয়েছিল, একটা দিক ভেঙেছিল। এরই নিচের তলা ধরে আমি প্রথম পৃথিবীর মৃত্তিকার আলিঙ্গন পেয়েছিলাম।

ভূমিষ্ঠ হবার সময় আমি নাকি খুব উচ্চ চিৎকারে কেঁদেছিলাম। আমার জীবনের কর্ম ও সাধন ফলের মধ্যে তার চিহ্ন আছে কি-না মাঝে মাঝে আজ ভেবে দেখি আমি। সে কথা থাক্। সেদিন যাঁরা সূতিকাগৃহের দুয়ারে উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা অপেক্ষাকৃত বিষণ্ণ হয়ে বলেছিলেন—যাঃ, মেয়ে হল! এত উঁচু গলা এ মেয়ের! আজও আমাদের দেশে বাড়ির গিন্নীরা বলেন—ছেলেরা ভূমিষ্ঠ হবার সময় কম কাঁদে। মেয়েরা আসে জীবনে যে কান্না তারা কাঁদবে তারই সুর ধরে! কাঁদতেই তাদের জন্ম!

লাভপুর গ্রামখানি অদ্ভুত গ্রাম। আমার জন্মস্থান—আমার মাতৃভূমি, আমার পিতৃপুরুষের লীলাভূমি বলে অতিরঞ্জন করছি না, সত্য কথা বলছি।) কালের লীলা, কালান্তরের রূপমহিমা এখানে এত সুস্পষ্ট যে বিস্ময় না-মেনে পারি না। এ গ্রামে জন্মেছি বলে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করি।

(১৮৯৮ সালে লাভপুরের সমাজে তখন দুই বিরোধী শক্তির দ্বন্দ্ব চলেছে। জমিদারপ্রধান গ্রাম। নবাবী আমল থেকে সরকার-বংশীয়েরা ছিলেন জমিদার। তাঁরা তখন বহুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন, তাঁদের ভাঙনের উপর আরও দুটি বংশ, ওই সরকারবাবুদেরই দৌহিত্র-বংশ। এদের এক বংশ হল আমার পিতৃবংশ, দ্বিতীয়টি অন্য এক বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ। প্রকৃতপক্ষে এই দ্বিতীয় বংশই তখন গ্রামের মধ্যে প্রধান। (ঠিক এই সময়ে—গ্রামের এক দরিদ্রসন্তান ঘর থেকে বেরিয়ে এক বিচিত্র সংঘটনের মধ্যে ইংরেজ কয়লা ব্যবসায়ীর কুঠীতে পাঁচ টাকা মাইনের

চাকরিতে ঢুকে শেষ পর্যন্ত কয়লার খনির মালিক হয়ে দেশে আবির্ভূত হলেন।) বীরভূমে জমিদারের একটা বৈশিষ্ট্য হল জমিদারীর আয়তন ও আয়ের ক্ষুদ্রতা এবং তাঁদের সংখ্যার বাহুল্য। দশ হাজার টাকা আয় যাঁদের, তাঁরা রাজাতুল্য ব্যক্তি। (আমাদের গ্রামের জমিদারের আয় পাঁচ থেকে সাত-আট হাজার। কিন্তু তাতেই তাঁদের প্রবল পরাক্রম। সমারোহ প্রচুর।) এ ছাড়া চাষের জমির সঙ্গে পঞ্চাশ থেকে পাঁচশো-হাজার-টাকা বাৎসরিক আয়ের জমিদার অনেক, হাতপায়ের আঙুলে গণা যায় না। তাঁদের পরাক্রম কম নয়। তাঁরা বলতেন—'মাটি বাপের নয়, দাপের; দাপ তো আয়ে নাই, দাপ আছে বুকে।' বুকে চাপড় মেরে তাঁরা বীর্যের দাবি ঘোষণা করে বলতেন—'আমি জমিদার।' (এঁদের সঙ্গে আরম্ভ হল লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক এই ভাগ্যবান ব্যবসায়ীর বিরোধ।) আশ্চর্য সাহস ছিল তাঁদের। সাহসের কথায় একটি দৃষ্টান্ত মনে পড়ে গেল। এমনি এক শ-চারেক টাকা আয়ের জমিদারের বিরোধ উপস্থিত হয়েছিল বর্ধমানের মহারাজার সঙ্গে। বৈষয়িক স্বত্ব নিয়ে ফৌজদারী, পরে দেওয়ানী মামলা চলল। মুন্সেফ-কোর্ট, জজ-কোর্ট, শেষে হাই-কোর্ট। একদা এক চাকুরে বন্ধু দেশে এসে সব বৃত্তান্ত শুনে তাঁকে তিরস্কার করে বললেন—তুই কার সঙ্গে মামলা করছিস?

—কেন? বর্ধমানের রাজার সঙ্গে।

—তাঁকে তুই চোখে দেখেছিস যে মামলা করছিস? তাঁর বাড়ি দেখেছিস?

মামলাকারী হা-হা করে হেসে বলেছিলেন—বাড়ি দেখেছি, তাঁকে দেখিনি।

—তবে?

—তবে আবার কি? বর্ধমানে মহারাজা তো বর্ধমানের মহারাজা রে, ভগবান যে ভগবান—সে অন্যায় দাবি করলে তাই মানি না। বিশ বছরের বেটা মরে গেল, পরমায়ু দেয়নি ভগবান, তাই তার চিকিৎসায় টাকার শ্রাদ্ধ করে লড়াই করেছি, রাত জেগেছি; যম একদিকে টেনেছে, আমি একদিকে টেনেছি। হেরেছি। তাতে কি। এক ফোঁটা চোখের জল ফেলিনি।

লাভপুর-সমাজের নেতৃত্বের আসন নিয়ে এই বিচিত্র বিরোধ সমাজ-জীবনের নানা স্তরে বিস্তৃত হয়েছে। কীর্তির প্রতিযোগিতা চলছে মহাসমারোহের প্রকাশের মধ্যে, দ্বন্দ্ব চলছে সৌজন্য প্রকাশ নিয়ে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে রাজভক্তি নিয়ে, প্রতিযোগিতা চলছে জ্ঞানমার্গের অধিকার নিয়ে, আবার পরস্পরের মধ্যে কলঙ্ককালি ছিটানো নিয়েও চলেছে জমিদার ও ব্যবসায়ীর মধ্যে বিচিত্র বিরোধ।

দুই

প্রধান জমিদার-বংশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মাইনর স্কুলের।

ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠা করলেন হাই ইংলিশ স্কুলের। মাইনর স্কুলটি উঠে গিল।

আমাদের গ্রামের গ্রামদেবতা ফুল্লরা দেবী। একান্ন মহাপীঠের অন্যতম মহাপীঠ। আসল নাম নাকি অট্টহাস। ব্যবসায়ী ধনী দেবীর প্রাচীন মন্দির

ভেঙে নূতন মন্দির করে দিলেন। জমিদার সঙ্গে সঙ্গে বাঁধিয়ে দিলেন দেবীর মন্দিরের সম্মুখে দীঘির উপর প্রশস্ত ঘাট। জমিদার-বাড়িতে জগদ্ধাত্রী-পূজার সমারোহ।

ব্যবসায়ী বাড়িতে রাধাগোবিন্দের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে রাসযাত্রায় সমারোহ করলেন।

জগদ্ধাত্রী-পূজায় পঞ্চগ্রামের ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য শূদ্র হরিজন ভোজন হত। মনে আছে, চারটে হিসেবে বড় বড় ছানাবড়া—আজকাল যার একটার দাম অন্তত আট আনা, প্রচুর মাছ, প্রচুর মাংস। খাইয়েদের ব্যবস্থা ধরাবাঁধা নয়, যে যত পারে. সে এক 'নাও নাও' এবং 'আর না, আর না' শব্দ। তারপর বিসর্জনের দিন বারুদের কারখানা, লাঠিয়ালদের লাঠিখেলা, প্রতিমা নিয়ে বিরাট শোভাযাত্রা; ছেলেবেলায় সে এক পরম কামনার দিন ছিল। 'দুই পুরুষ' নাটকের প্রথমেই কঙ্কনার বাবুদের বাড়িতে জগদ্ধাত্রী পূজার ধূমের কথাটা সেই স্মৃতি থেকেই এসেছে। কিন্তু কঙ্কনার বাবুদের সঙ্গে এই জমিদারবাবুদের কোনো সম্পর্ক নাই। সে কথা হোক্।

কার্তিকের শুক্লা-নবমীতে জগদ্ধাত্রী-পূজার কয়েক দিন পরেই রাস-পূর্ণিমা। ব্যবসায়ীর বাড়িতে পঞ্চগ্রাম সপ্তগ্রামের লোকদের নিমন্ত্রণ, ব্যঞ্জনের সংখ্যা এবং স্বাদুতা নিয়ে প্রতিযোগিতা। পাতায় কুলাত না, ব্যঞ্জনের তেলে নাটমন্দিরের বাঁধানো মেঝে পিচ্ছিল হয়ে যেত। সোডা ক্ষার দিয়ে মাজতে হত। মিষ্টান্নও এখানে বেশি এবং আকারেও বড় হত। তবু ব্যবসায়ী ভোজের ব্যবস্থায় এঁটে উঠতেন না। হার মানতে হত শাক্ত ব্যবস্থার কাছে বৈষ্ণব ব্যবস্থার আয়োজনকে। জগদ্ধাত্রী-পূজায় পাঁঠা বলি হত। বৎসর ধরে পোষা বড় বড় পাঁঠার মাংসের কালিয়ার ব্যবস্থায় জমিদার-বাড়ি টেক্কা মেরে থাকত। শুধু মাংসের ব্যবস্থাতেই নয়, আয়োজনের সঙ্গে রন্ধন-শিল্পের যে মুন্সিয়ানা এবং যত্নের পারিপাট্য থাকলে সামান্যকে অসামান্য করে তোলা যায়, তা যেমন জমিদার-বাড়িতে ছিল, ব্যবসায়ীর বাড়িতে তা তেমনটি ছিল না। জমিদার-কর্তা নিজে নুন মিষ্টির পরিমাণ দেখতেন, চেয়ার নিয়ে রন্ধনশালায় বসে পাচকের সঙ্গে সারারাত্রি জাগতেন, শেষ রাত্রে চাকর ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লে নিজেই তামাক সেজে খাওয়াতেন। উনানে কাঠ ঠেলতেন। সকালে মুখ ধুয়ে পূজারম্ভের পরেই বসতেন দই নিয়ে। দইকে তিনি 'আম-দইয়ে' পরিণত করতেন। আম আদা বেটে মিশিয়ে তাকে আম-সন্দেশের মতো এমন সুগন্ধযুক্ত সুস্বাদু বস্তুতে পরিণত করতে জানতেন যে লোকে ওই আম-দই খাবার জন্য উদগ্রীব হয়ে তার পালা গুনত ; কখন আসবে আম-দই? দীর্ঘদিনের রোগীও আসত, বলত, মুখটা একটু ছাড়িয়ে আসি। সে স্বাদ আজও মনে হলে আমার রসনাও সিক্ত হয়ে ওঠে।

রাধাগোবিন্দের ধাতু ও শিলাবিগ্রহ, তার বিসর্জন নাই। তাঁর ছিল রাস-পূর্ণিমার পরদিন বনভোজনের ব্যবস্থা। চতুর্দোলায় যেতেন যুগল বিগ্রহ, মশালে মশালে গ্রামের আকাশ রাঙা করে চলত মশালধারীরা, আসাসোঁটা নিয়ে চলত বরকন্দাজ, গ্রাম প্রদক্ষিণ করে গ্রামের বাইরে তাঁদের বিস্তীর্ণ বাগানে বিগ্রহ

নামাতেন। বাজি পুড়ত, লাঠিখেলা হত, সাঁওতালরা নাচত। দুই তরফের সমারোহেই দশ-বিশখানা গ্রামের লোক ভেঙে আসত। দশ-পনেরো হাজার লোক। আসলে এটা বিসর্জন উৎসবের প্রতিযোগী উৎসব বলতে ভুলেছি। জগদ্ধাত্রী-পুজোয় জমিদার-বাড়িতে দুদিন যাত্রা হত। এদিকে ব্যবসায়ীর বাড়িতে রাসে হত মাসখানেক ধরে ভাগবতের কথকতা ও যাত্রা। অনেক বার দুই বাড়িতেই হয়েছে খেমটা নাচ। না হলেই চলত না। পুজা-পার্বণে হত, অন্নপ্রাশন-উপনয়নে হত, এমন কি আমাদের গ্রামের হাইস্কুল প্রতিষ্ঠার সময় স্কুলের হলে কলকাতার মোটা দক্ষিণার খেমটা নাচ হয়েছিল।

এই ব্যবসায়ী ধনীর বাড়িতে আসত বড় বড় যাত্রার দল। সে কালের নীলকণ্ঠ শ্রীকণ্ঠ সিতিকণ্ঠ তিন ভাই আসতেন, মতি রায়ও আসতেন। অধিকাংশ সময় আসতেন আমাদের জেলার খ্যাতনামা কৃষ্ণযাত্রার অধিকারী যোগীন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর দল নিয়ে। আমাদের গ্রাম তখন জমজমাট গ্রাম। স্বচ্ছল গৃহস্থ বাড়ির যুবকের দল- তখন প্রকাণ্ড। ব্যবসায়ীটির কল্যাণে কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ। কলকাতার নবজীবনের সংস্কৃতির অমৃত কেউ ভৃঙ্গারে করে আনতে না পারলেও, ফ্যাশানের হুইস্কির বোতল কেস-বন্দী হয়ে গ্রামে অনায়াসে পৌঁচেছে। তারই ফলে একবার একটি ঘটনা ঘটেছিল। শ্রীকণ্ঠ ও সিতিকণ্ঠ এসেছেন রাসের বাড়িতে গাওনা করতে। লোকে লোকারণ্য, গান চলছে। কিন্তু গ্রামের কয়েকজন যুবকের গান মনঃপূত হয়নি। তাঁরা আগেই কৃষ্ণযাত্রায় অমত জানিয়েছিলেন। বল-হরি-হরিবোল অর্থাৎ যাত্রাকে গঙ্গাযাত্রা বলে ব্যঙ্গ করে আসর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এসেই তাঁরা অকস্মাৎ চিৎকার করে উঠলেন—আগুন! আগুন! আগুন!

মাটির ঘরের দেশ, ঘনসন্নিবদ্ধ খড়ের চাল। চিৎকার শুনে মুহূর্তের মধ্যে আসর গেল ভেঙে। আতঙ্কিত গ্রাম্য শ্রোতার দল ছুটল আপন আপন বাড়ির দিকে।

যুবকের দল আবার হরিবোল দিয়ে উঠল—বল-হরি-হরিবোল।

নীলকণ্ঠের সহোদর—শ্রীকণ্ঠ এবং সিতিকণ্ঠ উভয়েই ছিলেন মানী লোক। তাঁরা সমস্ত বুঝলেন। এবং মাথা নিচু করে আসর ভেঙে লাভপুর থেকে বিদায় নিলেন। পরবৎসর উপযাচক হয়ে নীলকণ্ঠ, লোকে বলত 'কণ্ঠ মহাশয়', এলেন তাঁর দল নিয়ে, সঙ্গে তাঁর দুই ভাই। সে-বার তিনি গান করলেন। সে কী গান। আর সে কী জনতা! সে কী স্তব্ধতা! মানুষ হাসল, বুক ভাসিয়ে কাঁদল। কিন্তু এত অসুবিধাতেও কেউ 'আঃ' শব্দ করলে না! লাভপুরের যুবকদের উচ্ছৃঙ্খলতাকে জয় করে নীলকণ্ঠ সে-বার ফিরে গেলেন।

এমনি দ্বন্দ্বের সমারোহে সমৃদ্ধ লাভপুরের মৃত্তিকায় আমি জন্মেছি। সামন্ত-তন্ত্র বা জমিদারতন্ত্রের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের দ্বন্দ্ব আমি দুচোখ ভরে দেখেছি। সে দ্বন্দ্বের ধাক্কা খেয়েছি। আমরাও ছিলাম ক্ষুদ্র জমিদার। সে দ্বন্দ্বে আমাদেরও অংশ ছিল।

তিন

আমাদের রাঢ় দেশে একটা প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে, লক্ষ্মী যখন ছেড়ে যান তার আগে তিনি গৃহস্থকে বলেন—'হয় চাল ছাড়, নয় আমাকে ছাড়।' গৃহস্থ চাল ছাড়তে পারে না। লক্ষ্মীই ছেড়ে যান। 'চাল' কথাটা শুনতে খারাপ, চাল কথাটার বাইরের অর্থ হয় তো বাইরের ভড়ং, কিন্তু গভীরভাবে ভেবে দেখলে জীবনের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে, জীবনের ভিত্তির সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠ যোগ আবিষ্কার করা যায়। তাই প্রতিষ্ঠা যে-কালে সমাজে সম্পদের উপর প্রতিষ্ঠিত, দেউলের মাথায় চূড়ার মতো সে-কালে সম্পদরূপী ভিত নড়লে চূড়া বা চাল আপনি খসে পড়ে প্রতিষ্ঠায়, আবার চূড়ার উচ্চতার প্রতিযোগিতায় চূড়া যখন বিন্ধ্যগিরির মতো বাড়তে থাকে তখন চূড়ার ভারে ভিতও আপনি বসে পড়ে। ইট-কাঠ-পাথরের মন্দির জড়বস্তু, কিন্তু মানুষের প্রতিষ্ঠার মন্দির সজীব, তাই কোনো নূতন প্রতিষ্ঠা-বান যখন অপর সকল প্রতিষ্ঠাবানের প্রতিষ্ঠার মন্দিরকে ছাড়িয়ে নিজের ইমারৎ গড়ে, তখন পুরানো প্রতিষ্ঠার মন্দিরগুলি স্বাভাবিকভাবে সজীব বিন্ধ্যগিরির মতো থাকে। (আমরাও ছিলাম স্বল্প আয়ের জমিদার) পাখি-পর্যায়ভুক্ত হবার যোগ্যতা না থাকলেও পাখা ছিল। সুতরাং আকাশের উঁচুতে ওঠার প্রতিযোগিতায় দুর্বল ডানায় ভর দিয়েও মেতে ওঠাই এক্ষেত্রে ছিল স্বাভাবিক জীবন-ধর্ম। এই স্বাভাবিক জীবন-ধর্ম বলেই এই দ্বন্দ্ব আমাদের সংসারকেও স্পর্শ করেছিল। এই ব্যবসায়ী বাল্যজীবনে ছিলেন দরিদ্রের সন্তান : তখন আমাদের বাড়ি থেকে তাঁদের বৃত্তি বরাদ্দ ছিল। পুজার সময় আমার পিতামহদের বিচিত্র গোপন দানের একটি বিচিত্র পদ্ধতি ছিল ; তাঁরা অপরিচিত মজুর শ্রেণীর লোকের মাথায় কাপড় মিষ্টান্ন প্রভৃতি সাজিয়ে অভাবী গৃহস্থদের বাড়ি পাঠাতেন। সঙ্গে থাকত জাল চিঠি—গৃহস্থদের দূর-আত্মীয়েরা যেন তত্ত্ব পাঠাচ্ছেন। এবং লিখছেন, 'কিছু তত্ত্ব পাঠাইলাম। তোমাদের সদা সর্বদা খোঁজ লইতে পারি না বলিয়া লজ্জা পাই। যাহা হউক যৎকিঞ্চিৎ গ্রহণ করিবা।' সেই তত্ত্ব এদের বাড়িও যেত। সুতরাং তাঁদের সঙ্গে প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতার দ্বন্দ্ব আমাদের সংসারকে টেনেছিল স্বাভাবিকভাবেই। আমার পিতামহ ছিলেন উকিল। সিউড়িতে ওকালতি করতেন। তাঁরা ছিলেন দূর-আত্মীয়েরা যেন তত্ত্ব পাঠাচ্ছেন। এবং লিখছেন, 'কিছু তত্ত্ব পাঠাইলাম। তোমাদের সদা সর্বদা খোঁজ লইতে পারি না বলিয়া লজ্জা পাই। যাহা হউক উকিল। মানুষও ছিলেন বিচিত্র। একবার এক স্বত্বের মামলায় তাঁর মক্কেলের হল পরাজয়। ইংরেজ জজ। জজ বলেছিলেন—ভুয়া মামলা তুমি মুখের জোরে জিতবে ব্যানার্জি? তা হয় না। তিনি অনেক বুঝিয়েছিলেন—সাহেব, এই পয়েণ্ট আপনি বুঝে দেখুন। সাহেব বুঝতে চাননি। অপমানজনক কথা বলেছিলেন।

তিনি অপমানিত হয়ে নিজে হাইকোর্টে আপীল করে সেই মামলা ডিগ্রি করেছিলেন। যেদিন খবর পেলেন, সেদিন তিনি ঢাকীকে পয়সা দিয়ে গোটা শহরে ঢাক পিটিয়ে খবরটা জানিয়েছিলেন। সেই জজ সাহেব তখন অন্য জেলায়। তাঁকেও চিঠি লিখে খবরটা জানিয়ে তবে শান্ত হয়েছিলেন।

আমার বাবা ছিলেন পিতার এক সন্তান এবং প্রৌঢ় বয়সের সন্তান। পিতামহ বিবাহ করেছিলেন তিনবার। আমার প্রথম পিতামহী ছিলেন বন্ধ্যা। গল্প শুনেছি, তিনি নাকি অপরূপ চরিত্রের মানুষ ছিলেন। জীবনে তাঁর কোনো মানুষের সঙ্গে কোনোদিন বিরোধ ঘটেনি। গড়গড়ায় তিনি নাকি তামাক খেতেন। সে গড়গড়াটি আজও আছে। আমার পিতামহ দ্বিতীয় বিবাহ করেন বাহান্ন-তিপান্ন বৎসর বয়সে। বিবাহ করবার সংকল্প প্রথম স্ত্রীর কাছে প্রকাশ করতে পারেননি। বিবাহের পর যখন বধূ নিয়ে এলেন, তাঁর প্রথমা স্ত্রীই হাসিমুখে বরণ করে ঘরে তুলে বলেছিলেন—আমায় আগে বললে যে বিয়েতে কত ধুমধাম করতাম বাবু! পিতামহ লজ্জিত হয়েছিলেন, কোনো কথা বলতে পারেননি। কয়েকদিন পর তিনি প্রথমা স্ত্রীকে ডেকে একটি টাকার থলি দিয়ে বলেছিলেন—এইটি তোমাকে দিলাম। এতে এক হাজার টাকা আছে।

তিনি বলেছিলেন—টাকা নিয়ে কি করব?

—যা খুশি তোমার। গয়না গড়িয়ো।

—গয়না তো আছে।

—আরও গড়িয়ো। কিংবা মেয়ে-মহলে মহাজনী করো। অর্থাৎ স্ত্রীলোক-মহলে টাকা ধার দিয়ো। ইচ্ছে হয় কাউকে দিয়ো। আমি দিচ্ছি 'না' বলতে নেই।

তিনি আর কোনো কথা না বলে টাকার থলিটি নিয়েছিলেন। এর দশ-এগারো মাসের মধ্যেই তিনি মারা যান। মারা যাবার পর তাঁর গয়নার বাক্স খুলে সোনা-রূপা ও নগদ সঞ্চয়ের হিসাব করতে গিয়ে সে থলিটিও পাওয়া যায়। পিতামহ থলিটি বেঁধে দিয়েছিলেন পাটের অর্থাৎ রেশমের গুচ্ছ দিয়ে। দেখা যায় সেই রেশমের গুচ্ছ, তাঁর বেঁধে দেওয়া বাঁধনটি ঠিক তেমনিই আছে। খুলে দেখা যায় এক হাজার টাকার একটি টাকা খরচ হয়নি। অথবা একটি টাকা তাতে যোগ হয়নি।

তাঁর মৃত্যুর বৎসর খানেক পরে আমার বাবার জন্ম। বেশি বয়সের একমাত্র সন্তানের প্রতি আমার পিতামহের স্নেহের দুর্বলতা ছিল অপরিসীম। দুর্বলতার আরও অবশ্য একটি কারণ ছিল। আমার পিতামহী অতি অল্পবয়সেই মারা যান। আমার বাবার বয়স তখন চার-পাঁচ। মাতৃহীন একমাত্র সন্তান অত্যন্ত আবদারে দুর্দান্ত হয়ে উঠেছিলেন। তার উপর আমার বাবার স্বাস্থ্য ছিল প্রচণ্ড সবল। সিউড়ীতে জেলা-স্কুল তখন স্থাপিত হয়েছে। সেই স্কুলের ছাত্র ছিলেন তিনি। পড়াশুনার বুদ্ধি ছিল অত্যন্ত প্রখর। তবুও তিনি অত্যন্ত অল্পবয়সে লেখাপড়া ছেড়ে দেন। এর জন্য তিনি পরে বহু অনুতাপ করেছেন। তিনি স্কুলে লেখা-পড়া অবশ্য করেননি, কিন্তু পরে ঘরে যথেষ্ট শাস্ত্র পাঠ করেছিলেন। নিজে তিনি

নিয়মিতভাবে সেকালে নিজের ডায়রি রেখে গেছেন। তাঁর ডায়রি থেকেই খানিকটা অংশ এখানে তুলে দিলাম, তা থেকেই তাঁর স্কুল ছাড়ার বিবরণ এবং পরবর্তী জীবনে প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্বে তাঁর মর্মপীড়ার আভাস পাওয়া যাবে। তা থেকেই পরিস্ফুট হবে সেকালের খানিকটা, যে-খানিকটার পটভূমিতে আমি বেড়ে উঠেছি—

'আমার বয়স পাঁচ বৎসর হইলে পিতা আমার হাতেখড়ি দিয়া বিদ্যাশিক্ষা দেওয়াইতে লাগিলেন। কিন্তু মাতৃহীন বালক এবং বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র সন্তান বলিয়া বিদ্যার জন্য বা কোনো বিষয়ের জন্য কখনও কোনো শাসন করিতেন না। আপন বক্ষে রাখিয়া পালন করিতেন। আমার সাত-আট বৎসর বয়সে প্রথম বাংলা স্কুলে আমাকে ভর্তি করিয়া দেন; একখানি ঠেলাগাড়ি করিয়া স্কুলে যাইতাম। ক্রমে বীরভূম গর্ভনমেণ্ট ইস্কুলে ভর্তি হইলাম। বাল্যকালে আমার বুদ্ধি এরূপ সুতীক্ষ্ণ ছিল যে একবার মাত্র পাঠ্যপুস্তক পাঠ করিলে তাহা অভ্যস্ত হইয়া যাইত। ক্লাসে প্রথম বা দ্বিতীয় স্থান আমার নির্দিষ্ট ছিল। পরে ষষ্ঠ শ্রেণী হইতে ডবল প্রমোশন পাইয়া চতুর্থ শ্রেণীতে উঠিলাম। এই সময় আমার বয়স ষোলো এবং এই বৎসরই—১২৮৬ সালে আমার প্রথম পরিণয় হয়।...

'ষষ্ঠ শ্রেণী হইতে, ডবল প্রমোশন লইয়া চতুর্থ শ্রেণীতে উঠিয়া আমার বিশেষ পড়ার আবশ্যক ছিল। কিন্তু প্রমোশনের ২।১ মাসের মধ্যেই আমার ইস্কুলে অনেক কামাই হয়, পড়াশুনাও করা হয় না। তাহাতে আমার ক্লাসের পড়া পড়িতে একটু কষ্ট হয়। তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি বলিয়া কোনোরূপে পড়া চালাইতেছিলাম, কিন্তু পূর্বের ন্যায় প্রথম বা দ্বিতীয় আসন রাখিতে পারিতেছিলাম না। ইহার জন্য মনে বড় কষ্ট ছিল। এই সময়ে আবার একটি কাণ্ড ঘটিল। সামার ভেকেশনে লাভপুর আসিলাম কিন্তু ইস্কুল খোলার সঙ্গে-সঙ্গে সিউড়ী যাওয়া হইল না। নবীন ভাইপোর বিবাহ মঙ্গলডিহি গ্রামে, ওই বিবাহের জন্য থাকিয়া গেলাম। ১০।১২ দিন কামাই হইয়া গেল। এই আমার জীবনের সুখ বা উন্নতির পথে কাঁটা পড়িল। এই দশ-বারো দিন কামাই আমার বিদ্যাশিক্ষার মূলে চির-কুঠারাঘাত করিল। কামাইয়ের পর ইস্কুলে গেলে গদাই গরাঞী নামে একজন মাস্টার আমার উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল। আমাকে নিত্যই তিন বার করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল—'বাবুর বেটা বাবু—তার ওপর কুলীন, ফাল্গুন মাসে একটা বিয়ে, জ্যৈষ্ঠ মাসে একটা বিয়ে, তোমার আর লেখাপড়ার প্রয়োজন কি? যাও, লেখাপড়া ছেড়ে আরও দশটা বিবাহ কর না কেন!' নবীনের বিবাহের কথাটা সে কোনোমতেই বিশ্বাস করিত না, তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল—জ্যৈষ্ঠ মাসে বিবাহ আমিই করিয়াছি। এই বিদ্রূপ ক্রমে আমার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। চোখ দিয়া জল পড়িত। অন্য ছেলেরা হাসিত। একদিন দুর্দান্ত ক্রোধ হইল, সে-দিন গদাই মাস্টার এই ঠাট্টাটি করিবামাত্র বই বগলে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম—"হ্যাঁ, বিবাহের ব্যবসা করাই আজ স্থির করিলাম, তোমার যদি কন্যা থাকে—তবে তাহাকেও বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছি।" এই বলিয়া এক দৌড় দিয়া ইস্কুল হইতে পলাইয়া আসিলাম। বাবাকে বলিলাম—"আমাকে অন্যত্র ইস্কুলে ভরতি করিয়া দিন।" বাবা একমাত্র সন্তানকে

বিদেশে পাঠাইতে রাজী হইলেন না। বলিলেন—"এখানে আমার নিকট থাকিয়া তোমার যখন লেখাপড়া হইল না, তখন বিদেশে পাঠাইয়া কি হইবে? বাহিরে পাঠাইয়া আমিও থাকিতে পারিব না, তুমিও নষ্ট হইবে। তুমি আমার নিকট থাক, নিজেকে সংশোধন কর।"

'বুদ্ধি অর্থ অনুরাগ সমস্ত থাকা সত্ত্বেও পূর্বজন্মের কর্মফল আমাকে কৌশলে বিদ্যালয় হইতে বিতাড়িত করিয়া আমার জীবনকে সুখশূন্য করিয়া দিল। হায়, বিদ্যাহীন-জীবনে ও পশু-জীবনে প্রভেদ কি? জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া জীব যদি স্বীয় বংশোচিত সম্মান প্রতিষ্ঠা রক্ষা করিতে না পারে তবে তাহার তুল্য দুঃখ কাহার? আমি সেই দুঃখ অহরহ ভোগ করিতেছি।...'

আমার বাবার ডায়রির আরও খানিকটা অংশ তুলে দিলেই আমার জীবনের পট-ভূমি পরিষ্কার হয়ে উঠবে। বাংলা ১৩১০ সালের মাঘ মাসে, ৮ই মাঘ ছিল সরস্বতী-পূজা। এ অংশটুকুও ওই দিনের, এবং অংশটুকু আমাকে নিয়েই। বাড়িতে সরস্বতী-পূজা আছে। সে-বার বারবেলার জন্য পূজা আরম্ভ হতে যথেষ্ট বিলম্ব ঘটেছিল। বাবা ডায়রিতে লিখেছেন—

'বারবেলার জন্য দুই প্রহরের পর ঘট আনাইয়া 'সরস্বতী মাতার অর্চনা আরম্ভ হইল। বেলা বেশি হওয়ার জন্য তারাশংকরকে বলিলাম—"বাবা জল খাও, জল খাইয়া অঞ্জলি দিলে দোষ হইবে না।" বালক বলিল—"কই, আমার তো পিপাসা পায় নাই।" বালকের দেবভক্তি—বিদ্যানুরাগ দেখিয়া মনে বড়ই আনন্দ হইল। পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার পর তারাশঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"বাবা, মাকে প্রণাম করিবার সময় কি বলিলে?" তাহাতে সে বলিল—"আমি বলিলাম—মা, আমাকে খুব বিদ্যা দাও, আমি ডাইনে বাঁয়ে ঢোল দিয়া পূজা দিব—বড় হইয়া পূজায় যাত্রা করাইব—ধুম করিব।" শুনিয়া পুলকিত হইলাম! দেখ বাবা তারাশঙ্কর—জীবনে এ কথা যেন কোনোদিন ভুলিয়ো না। অর্থের জন্য অনেক কষ্ট পাইতেছি। পৈতৃক সম্পত্তি সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠা সম্মান রক্ষা দায় হইয়া উঠিয়াছে। বিদ্যাশিক্ষা করিয়া পৈতৃক সম্মান বংশপ্রতিষ্ঠাকে তুমি ফিরাইয়া আনিবে। বহু কীর্তি করিবে। এবং সরস্বতী মায়ের কাছে যে সঙ্কল্প করিলে তাহা বজায় রাখিবে। ব্যবসা করিয়া অর্থ প্রচুর হয়, কিন্তু তাহার মূল্য তত নয়— যত মূল্য বিদ্যাবলে উপার্জন করা অর্থের। আমার বাবার পাট তোমাকে বজায় রাখিতে হইবে। তুমি উকিল হইবে। আমার বাবা শেষ জীবনে শখ করিয়া শালের সামলা কিনিয়াছিলেন। ঐ সামলা আমি সযত্নে তুলিয়া রাখিয়াছি—ওই সামলা তোমাকে পরিতে হইবে। এখানকার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইবে।'

আরও খানিকটা তুলে দেব, তা হলেই আমার জীবনের পটভূমির একাংশ স্পষ্ট হবে। ইংরেজ রাজত্বে যাঁরা ইংরেজি শিখেছিলেন, তাঁরা ইংরেজি-না-জানা লোককে মূর্খ ভাবতেন। ইংরেজি-না-জানা লোকরাও ভাবনা-অনুভূতি আচার-ব্যবহার, এমন কি ভারতীয় শাস্ত্র ও তত্ত্বে গভীর অধিকার সত্ত্বেও নিজেদের সম্পর্কে এই অপবাদ স্বীকার করে নিতেন। না হলে আমার বাবা ইস্কুল ছেড়ে ঘরে শাস্ত্রাদি

পাঠ করে সাংস্কৃতিক জীবনকে আয়ত্ত করেছিলেন, তাতে তাঁর বিদ্যার জন্য আক্ষেপ করার প্রয়োজন ছিল না। (তিনি নিয়মিত খবরের কাগজ পড়তেন। সেকালের সাপ্তাহিক কাগজ—'বঙ্গবাসী' 'হিতবাদী'র তখন প্রবল প্রসার।) প্রকাণ্ড সাইজের কাগজ, এক পৃষ্ঠায় শুয়ে অপর পৃষ্ঠা পড়া যেত! দুখানা কাগজই আসত আমাদের বাড়ি। (এছাড়া সে-আমলে তিনি একখানি মাসিক-পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন। পত্রিকাখানির নাম ছিল 'হিন্দু পত্রিকা'।) তাছাড়া তাঁর ছোটোখাটো একটি পুস্তক-সংগ্রহ ছিল। অধিকাংশই ধর্মগ্রন্থ। সংস্কৃত বাংলা দুই ভাষায় লিখিত শাস্ত্র তিনি পাঠ করতেন। (ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত ও নানা তন্ত্র তিনি কিনে সংগ্রহ করতেন এবং নিয়মিত পড়তেন। কাব্যে এবং উপন্যাসেও তাঁর অনুরাগ কম ছিল না।) তাঁর আমলের কালিদাসের গ্রন্থাবলী আমার কাছে আছে। তাঁর সংগ্রহ থেকেই আমি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের আস্বাদন পাই। তাঁর দিনলিপির মধ্যে প্রত্যহ দুই লাইন পুনরুক্ত হয়েছে। 'স্নানান্তে ঈশ্বরোপাসনা করিয়া আহার করিলাম—পরে বৈঠকখানায় খবরের কাগজ 'হিন্দু পত্রিকা'দি পাঠ করিলাম।' এর পরই কোনো দিন পাই—'মহানির্বাণতন্ত্র পাঠ করিলাম।' অথবা 'যোগাবশিষ্ঠ রামায়ণ পাঠ করিলাম' অথবা 'রানীভবানী নামক ঐতিহাসিক উপন্যাস পাঠ করিলাম' অথবা 'আজ কালিদাসের কাব্যরসাস্বাদন করিয়া ধন্য হইলাম।' জীবনে তাঁর একটি দার্শনিক দৃষ্টিও স্পষ্ট এবং পরিস্ফুট হয়েছিল। আমাদের গ্রামের নূতন ধনী ব্যবসায়ী একটি মজা দীঘি কাটাচ্ছিলেন, সেই দীঘিতে উঠল এক অক্ষত শিলা-মূর্তি। বাসুদেব দেবতা। এই উপলক্ষে সেদিন দশখানা গ্রামের লোক—কেউ বললে—'এই ঠাকুরই সর্বনাশ করবে, জল-শয়নে ছিলেন—মাছের লোভে ঘুম ভাঙালে, এইবার—' এই সুরের কথাই প্রবল হয়ে উঠেছিল। যারা অন্য সুরে কথা বলেছিল, তারা বলেছিল—সৌভাগ্য যোলো কলায় পূর্ণ হল। কিন্তু তার পরই মৃদুস্বরে বলেছিল—কলা পাকল।

আমার বাবার ডায়রিতে পাই—'শত শত বৎসর পূর্বে যে দেবতা সে-আমলের সেবক প্রতিষ্ঠাতার পরাজয়ের দুর্ভাগ্যের নিয়তিকে স্বীকার করিয়া নিজেও অপমানিত হইয়া পুষ্করিণীগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন—তিনি এতকাল পরে উঠিলেন। যখন উঠিলেন তখন নূতন লীলায় প্রকট হইবেন। শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-শোভিতহস্ত ত্রিলোকের পালক বিষ্ণু—বাবুর কীর্তির মধ্য দিয়া উদিত হইলেন। মনে হইতেছে এ গ্রামে ছোট-বড় লইয়া যে বিবাদ-কলহ চলিতেছে—তাহার চরম মীমাংসা হইয়া গেল। ত্রিলোকপালককে আশ্রয় করিয়া রায় দিয়া দিলেন যে তিনিই এখানকার লোকপালক হইবেন।'

আর এক স্থানে একদিন—নূতন ধনীর আলোকোজ্জ্বল এক সমারোহের আসর থেকে নিজের অন্ধকার-স্তব্ধ বাড়ির দিকে এসে তিনি রাত্রির অন্ধকারের গাঢ়তার দিকে চেয়ে যা ভেবেছিলেন তাই লিখেছেন—

'রাত্রির রূপ অন্ধকার, তাহার স্পর্শ শীতল, রাত্রির শেষ যামে তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠে। চণ্ডীর মধ্যে পাই—কালরাত্রিরূপা মহাশক্তি মহিষাসুরকে মৃত্যুর

অব্যবহিত পূর্বে দেখা দিয়েছিলেন। আজিকার অমাবস্যার অন্ধকার—আমাদের চারিদিকে যেন তেমনি রাত্রির ছায়া ফেলিয়াছে।'

মোট কথা—বাস্তব সংসারের যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি মর্মান্তিক পরাজয়ের ক্ষোভ বহনের দুঃখকে স্বীকার করেই জীবনতত্ত্বের রহস্য অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি এবং দৃষ্টি আয়ত্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি মারা যান অল্পবয়সে। আমার বয়স তখন আট বৎসর। কিন্তু তাঁর স্মৃতি আমার মনের উপর গভীর রেখাপাত করে গিয়েছে। তাঁর মূর্তি আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে। অত্যন্ত বলশালী দেহ ছিল তাঁর। ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ। স্পষ্টভাষী ছিলেন। আমার প্রতি স্নেহ ছিল মাত্রাতিরিক্ত, সর্বদা কাছে রেখে এই ধরনের কথা বলে যেতেন। অধিকাংশ বুঝতাম না, কিন্তু সে-কথা তিনি ভাবতেন না। তাঁর ডায়রিখানির প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠায় আমার নাম আছে। আমাকে সম্বোধন করে কিছু-না-কিছু লিখে গেছেন। চোদ্দো-পনেরো বৎসর বয়স থেকে ঐ ডায়রি আমি পড়ে আসছি। আজকের দৃষ্টি দিয়ে সে-কালকে বুঝবার পক্ষে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে আমার বাবার ঐ ডায়রি। এই ডায়রি আরও একটা পরিচয় বহন করে রয়েছে। সেটা হল সে-কালের ভারতবর্ষের মানুষের উপর ইয়োরোপের সভ্যতার প্রভাব পড়ার পরিচয়। ভারতবর্ষ বা বাংলাদেশের মানুষেরা জীবনের পরিচয় বহন করে আসছে স্মৃতিতে ও শ্রুতিতে। রাজসিক রুচিতে শিলালিপি তাম্রশাসন রেখে গেছেন রাজন্যবর্গ —গৃহচ্ছদে, মন্দিরে, পোড়ামাটির ফলকের লেখায় বা ঘরের কাঠের ষড়দলে সন তারিখ নাম আছে, তবু এ দেশে জীবনান্তে দেহকে ছাই করে সমস্ত কিছু মুছে দিয়ে যাওয়াই রীতি। কবিদের কাব্যে নিজের পরিচয় দেওয়া আছে, দীঘির নামেও কীর্তিমানেরা নাম জুড়ে রেখে গেছেন, কিন্তু আত্মজীবনের কথা লেখার রেওয়াজ ছিল না। ভালো-মন্দর বিচার করছি না। সত্য স্বভাবের কথা বলছি। ইংরিজি সভ্যতার প্রভাবেই ডায়রি লেখার রেওয়াজ এসেছিল। ইংরিজি শিক্ষায় পারদর্শিতা লাভ না করলেও আমার বাবার উপর তা পড়েছিল। আমাদের গ্রাম থেকে সাত মাইল দূরে কীর্ণাহার। সেখানকার জমিদার স্বর্গীয় শিবচন্দ্র সরকার মহাশয় ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বন্ধু, পুণ্যাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের বৈবাহিক। তিনি আমার পিতামহের বয়সী। তিনি ডায়রি রাখতেন। বোধহয় আমাদের অঞ্চলে ডায়রি-লেখক হিসাবে তিনিই প্রথম ব্যক্তি। শিবচন্দ্রবাবুই আমাদের অঞ্চলে প্রথম হাইস্কুল স্থাপন করেন—জেলার মধ্যে বোধহয় দ্বিতীয় হাইস্কুল। প্রথম হাইস্কুল সিউড়ী শহরের গবর্নমেণ্ট স্কুল।

বাবার ডায়রিতেও স্পষ্ট এবং সে-কালের শ্রুতি ও স্মৃতিতেও প্রমাণ রয়েছে যে, তখনকার কালের মানুষ ইংরাজের রাজত্বে ইংরিজি সভ্যতার ও শিক্ষার রাজকীয় সমাদরে গভীর বেদনার সঙ্গে ভালো-মন্দ যা কিছু অতীত কালের সম্বল ছিল সমস্ত কিছুকে পুরানো পুঁথির দপ্তরে বেঁধে ভাঙা পেঁটরায় পুরে নূতনকে গ্রহণ করবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল।

মন্দ ছিল প্রচুর।

বিশেষ করে মেয়েদের জীবনে। কৌলীন্যের দোর্দণ্ড প্রতাপে তখনও ঘরে ঘরে কন্যারা বিবাহের পরেও পিতৃগৃহে থাকেন। পিতৃগৃহে তাঁদের অবশ্য দোর্দণ্ড প্রতাপ। আমার 'দুই পুরুষে' নুটুর মুখে আছে, 'ব্রাহ্মণের ভগ্নী উপবীতের চেয়েও বড়, উপবীত থাকে গলায়, ভগ্নীর স্থান মাথায়।' এ সেই আমলের কথা। এক এক কুলীন তখনও চল্লিশ-পঞ্চাশ-ষাট বিবাহ করে থাকেন। আমাদের দেশে কুলীনদের মধ্যে এ রেওয়াজ তখন কমেছে। বিবাহ পেশা যাঁদের, তাঁদের অধিকাংশেরই বাস ছিল পূর্ববঙ্গে—যশোর, খুলনা, বিক্রমপুর। আমরাও কুলীন। কিন্তু এক স্ত্রী বর্তমানে বিবাহ তখন নিন্দনীয় হয়ে উঠেছে। সন্তান না হলে দু-তিন বিবাহরীতি অবশ্য তখনও বর্তমান। তখনকার দিনে সন্তানহীনা স্ত্রী বংশরক্ষার জন্য নিজে উদ্যোগী হয়ে স্বামীর বিবাহ দিতেন, তার পিছনে ছিল সমাজের উৎসাহ; এমন স্ত্রী সমাজে অজস্র প্রশংসায় ধন্য হতেন। এ-সব অবশ্য সম্পত্তিশালী লোকের ঘরেই ঘটত।

'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম'-প্রণেতা স্বর্গীয় চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় আমাদের গ্রামের কুটুম্ব ছিলেন। আমাদের গ্রামে মধ্যে মধ্যে যেতেনও। তিনি 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' লিখে যে প্রশংসা পেয়েছিলেন, আমাদের ওখানে সে প্রশংসা উপলব্ধি করার মতো লোক ছিল না এমন নয়, ছিল ; কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যুর পর আর বিবাহ করেননি বা এমন লোক কখনও আর বিবাহ করবেন না—এই উপলব্ধির প্রশংসটাই ছিল বড়। তাই তিনি যখন আবার বিবাহ করেন, তখন লোক তাঁকে আর সে প্রশংসা দিত না। তিনিও দ্বিতীয় বিবাহের পর আর বড় একটা সম্পর্ক রাখেননি লাভপুরের সঙ্গে।

এমনি যখন দেশের পটভূমি পরিবর্তনমুখী, তখন আমাদের ঘরের পটভূমিতে পরিবর্তন ঘটে গেল খানিকটা দ্রুততর গতিতে। আমাদের ঘরে এলেন আমার মা। তখন আমাদেব সংসারের উপর দিয়ে একটা বিপর্যয় চলে গেছে সদ্য-সদ্য। আমার পিসিমা ছিলেন পাঁচজন। তাঁদের তিনজন মারা গেছেন অল্প কিছু দিনের মধ্যেই। এক পিসিমা একই দিনে কলেরায় স্বামী-পুত্রকে হারিয়ে ঘরে এসেছেন। আমার বড় মা মারা গেলেন। তারপরই এলেন আমার মা। পাটনা শহরের প্রবাসী বাঙালী ঘরের মেয়ে, বাপ ইংরেজি-নবিস সরকারী চাকরে। শুধু এইটুকু বললেই বলা হল না। (তিনি অসাধারণ একটি মেয়ে। প্রতিভাময়ী। তিনি এসেই আমাদের সংসারকে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে গেলেন, তখনকার দিনে আমাদের গ্রামে প্রবহমান যে কাল তাকে পিছনে রেখে অনেক দূরে।) তখনও পিতার এক পুত্র আমার বাবা মদ্যপানে মাত্রা ছাড়ান, ক্রোধে আত্মহারা হন। আমার পিসিমা একদিনে স্বামীপুত্র হারানোর বেদনায় ক্ষোভে অধীর-চিত্ত, অসহিষ্ণু প্রকৃতি, অনির্বাণ চিতার মতো উত্তপ্ত। আমাদের সংসারে চারিদিকে বিশৃঙ্খলা। আছে সবই, কিন্তু শ্রী নাই, মাধুর্য নাই, এমন কি সেবাও নাই—কেউ অসুস্থ হলে সে একা বিছানায় রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করে, ঝি-চাকরে এক গ্লাস জল রেখে যায়, কবিরাজ-বাড়ি থেকে ওষুধ আসে কিন্তু অনুপানের অভাবে, ওষুধ মেড়ে তৈরি করার অভাবে নিয়মিত খাওয়া

হয় না। রোগীর যন্ত্রণা তার পীড়িত মনের ক্ষুব্ধ চিৎকারে গোটা বাড়িতেই নিজের রোগটা সংক্রামিত করে দেয়, এমনি অবস্থা।

(আমার মা এলেন আমাদের বাড়িতে। বয়স তখন পনরো। পনরো বছরের মেয়েটি বাড়িতে পা দেবা মাত্র গোটা বাড়িটার চেহারা ফিরে গেল। বাবার সমস্ত ঔদ্ধত্য মহিমময় গাম্ভীর্যে পরিণত হল) পরিমিত গণ্ডীর মধ্যে তিনি যেন শান্ত হয়ে সাধনা-মগ্না হলেন। কৌলিক এবং দেশের মাটির যে সাধনা ও ঐতিহ্য রক্তের মধ্যে মানুষ বহন করে, তাঁর মধ্যে তা আত্মপ্রকাশ করল; বর্ষার ভাঙনের খেলায় উন্মত্ত, ভাঙা মাটির রক্তের বন্যার উচ্ছ্বাসে ভরা ভৈরব নদ যেন শরৎকালের ব্রহ্মপুত্রে রূপান্তরিত হল। পিসিমা সেবায় স্নেহে ধীরে ধীরে প্রশান্ত হয়ে এলেন। বাড়ির শ্রী ফিরল। নিজের রুচিমতো তিনি ঘরগুলি সাজালেন।

বাড়িতে আমাদের কাঁঠালকাঠের আলমারি খাট চেয়ার টেবিলের রেওয়াজ ছিল। কিন্তু তাতে কোনো রঙ দেওয়া ছিল না। দেশে তখনও রঙের চলন হয়নি। বড় বড় দালান-বাড়ির দরজায় জানালায় আলকাতরা দেওয়া হত। ব্যবসায়ী ধনী স্বর্গীয় যাদবলালবাবুর বাড়ির দরজায় জানালায় সবুজ রঙ এসেছে এবং কলকাতার দোকানের বার্নিশ-করা ফার্নিচারও কিছু কিছু এসেছে। আমার মা এসে বাবাকে বললেন, এই খাট আলমারিগুলিতে বার্নিশ দিলে বড় ভালো হয়।

—বার্নিশ? সে দেবে কে?

—দেবে ছুতোর মিস্ত্রীতেই; তুমি কিছু শিরীষ কাগজ আর ফ্রেঞ্চ বার্নিশ সিউড়ী বা কলকাতা থেকে আনিয়ে দাও।

—আমাদের এখানকার মিস্ত্রীরা ও কাজ পারবে না।

—পারবে। আমাদের পাটনার বাড়িতে বার্নিশ করানো হয়। মিস্ত্রীদের বার্নিশ করা দেখেছি আমি। আমি বলে দেব। তোমাকে বলে দেব—তুমি মিস্ত্রীদের বুঝিয়ে দিয়ো।

তাই হল। সাজিমাটি দিয়ে আসবাবগুলি ধোবার সময় অনেকে বললে, গেল—কাঠগুলোর দফা গয়া হল।

কিন্তু বার্নিশ শেষ হলে তারা মুগ্ধ হয়ে গেল, বললে—কে বলবে সেই জিনিস? গয়ায় পিণ্ড পেয়ে প্রেতযোনি থেকে মুক্তি পেয়ে নবজন্ম নবকলেবর লাভ করলে জিনিসগুলি। তারপর ঘরে রঙ দেওয়ালেন। বাবার বইগুলিকে পাঠালেন সিউড়ীতে দপ্তরী-বাড়ি। বেঁধে এল সেগুলি। পুরানো ছবিগুলির সঙ্গে কিছু নতুন রবিবর্মার ছবি কিনে নতুন করে পেরেক পুঁতে টাঙালেন সেগুলি, ব্রাকেটগুলিও নতুন বন্দোবস্তে টাঙালেন। ঘরের দেওয়ালে আলমারির তাক ছিল—দরজা ছিল না। সে তৈরি করালেন, কাচ বসালেন। বালিশে ঝালর-দেওয়া ওয়াড় তৈরি করে পরালেন। বাক্সের ঘেরাটোপ হল। বাবার বাগানের শখ ছিল, ফুল হত প্রচুর। পুজোর জড় তোলা হত, এখন থেকে ফুলের মালা হতে শুরু হল, বিগ্রহের জড় আগে—তারপর মানুষের জড়। রুপার ডিসে লম্বা গেলাসে সাজানো হতে লাগল।

বাড়িখানিতে যেন তাঁর প্রতিবিম্ব ছড়িয়ে পড়ল। পাড়ায় খবর রটল। মেয়েরা

এসে দেখে গেলেন। এমন কি স্বর্গীয় যাদবলালবাবু একদা বাড়ির দরজায় এসে ডাকলেন—হরিমামা, আমি আপনার ঘর দেখতে এলাম। শুনলাম বাঁকীপুরের মামী নাকি চমৎকার ঘর সাজিয়েছেন। আমি দেখব।

তিনি দেখে গেলেন।

তাঁর বাড়িও নতুন ছাঁদে সাজল। অনেক উজ্জ্বলতর শ্রী এবং শোভা হল, অবশ্য আয়োজনের মহার্ঘতায়, ঝাড়-লণ্ঠনের শতেক বাতির আলো সেখানে জ্বলল। কিন্তু কেরোসিনের কালি-পড়া ডিবের বদলে ঘরে মোমবাতির আলোর প্রথা প্রবর্তন করেছিলেন আমার মা।

আমার মায়ের আগে আমাদের গ্রামে পদার্পণ করেছিলেন মায়েরই মামাতো দিদি। সারা শহরের বিখ্যাত উকিলের মেয়ে। তিনিই করতে পারতেন এ রেওয়াজের প্রবর্তন; তাঁরও ছিল অনেক গুণ। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে তাঁর গুণপনা কার্যকরী হয়নি। তাঁর বিবাহ হয়েছিল আমাদের গ্রামের এক অতি দরিদ্র-সন্তানের সঙ্গে। দরিদ্র-সন্তানটি নিজের শক্তিতে অধ্যবসায়ে এবং যাদবলালবাবুর আনুকূল্যে (যাদবলালবাবুর উপর নির্ভরশীল আত্মীয় ছিলেন) বিশ্ববিদ্যালয়ে বি. এ. পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করেছিলেন। আবার এই উকিলটি সন্ধান করে ছেলেটিকে বের করে তারই সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন। কিন্তু অকালে তিনি মারা গেলেন; শুনেছি মৃত্যুর দু-তিন দিন পরেই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে তাঁর নিয়োগপত্র এসেছিল অদৃষ্টের পরিহাসের মতো। তারই ফলে তিনি তাঁর গুণপনার প্রভাব ছড়াতে পারেননি; দারিদ্র্যদোষ গুণরাশিকে নাশ করে, এর চেয়ে সাধারণ সত্য আর নাই। শুধু তাই নয়, তিনি অকালবৈধব্যের বেদনায় বোধ করি তাঁর প্রভাব ছড়াতেও চাননি।

মোট কথা, কাল-পরিবর্তনের ক্ষণে আমার মা আমাদের বাড়িতে পদার্পণ করে প্রসন্না শক্তির মতো কাজ করেছেন। শুধু রুচির দিক থেকেই নয়, ভাবের দিক থেকেও তাঁর মধ্যে তিনি এনেছিলেন নূতন কালকে। আমার জীবনে মা-ই আমার সত্যসত্যই ধরিত্রী, তাঁর মনোভূমিতেই আমার জীবনের মূল নিহিত আছে, শুধু সেখান থেকে রসই গ্রহণ করেনি, তাঁকে আঁকড়েই দাঁড়িয়ে আছে। ওই ভূমিই আমাকে রস দিয়ে বাঁচিয়ে প্রেরণা দিয়ে বলেছে, 'আকাশলোকে বেড়ে চল, সূর্য-আরাধনায় যাত্রা কর। তুলে ধর তোমার জীবন-পুষ্প দিয়ে সূর্যার্ঘ্য।'

আমার মায়ের দেহবর্ণ ছিল উজ্জ্বল শুভ্র। আর তাতে ছিল একটি দীপ্তি। চোখ দুটি স্বচ্ছ, তারা দুটি নীলাভ। কথাবার্তা অত্যন্ত মিষ্ট, প্রকৃতি অনমনীয় দৃঢ়, অথচ শান্ত। আর আছে জীবন-জোড়া একটি প্রসন্ন বিষণ্ণতা। সেটা তাঁর অনাসক্ত প্রকৃতির বিচিত্র বহিঃপ্রকাশ। আমার মা যদি উপযুক্ত বেদীতে দাঁড়াবার সুযোগ পেতেন তবে তিনি দেশে বরণীয়াদের অন্যতমা হতেন—এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। পড়াশুনা তিনি যথেষ্ট করেছেন। পিত্রালয়ে পাটনার স্কুলে নিচের ক্লাসে—বোধ হয় আপার প্রাইমারি ক্লাসে পড়ার সময় বিবাহ হয়; পল্লীগ্রামে রক্ষণশীল পরিবারের বধূ হয়ে সংসারের শত সহস্র কর্মের মধ্যেও তিনি তাঁর পড়াশুনা করে গেছেন।

আমার বাবার বয়স তখন সাতাশ, মায়ের বয়স পনেরো, এই দিক দিয়ে অর্থাৎ সংস্কৃতির চর্চার মধ্য দিয়েই তাঁদের মানসিক মিলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হল। এই কারণেই আমার বাবার মতো প্রবল-ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষের উচ্ছৃঙ্খল জীবনকে শান্ত-সংযত বেগবান প্রবাহে পরিণতি তিনি দিতে পেরেছিলেন। তিনি শিষ্যার মতো স্বামীর কাছে ধর্মশাস্ত্র পড়েছিলেন। সেকালের উপন্যাসগুলি সবই পড়েছিলেন; পুরাণ রামায়ণ মহাভারত তাঁর কণ্ঠস্থ; কবিকঙ্কণ চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, মনসা-মঙ্গল পড়েছেন। হরিবংশ, ভাগবতের অনুবাদ, কালিকাপুরাণ, বৃহন্নারদীয়পুরাণ, কল্কিপুরাণ,—এ-সবও পড়েছেন। মেঘনাদবধ, ব্রজাঙ্গনা, তিলোত্তমাসম্ভব, পলাশীর যুদ্ধ, রৈবতক, বৃত্রসংহার—এগুলিও সে আমলে পড়েছেন তিনি। আজ তাঁর বয়স সত্তর। ছেলে সাহিত্যিক হওয়ায় এ আমলে কিছু রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, সরোজ রায়চৌধুরী এবং আমার লেখাও পড়েছেন। সেদিন নারায়ণ গাঙ্গুলীর বই পড়ছিলেন দেখেছি। আজও তাঁর পড়াশুনার অভ্যাস অটুট আছে। এবং সে অভ্যাস বিচিত্র। অম্বলের ব্যাধির জন্য আফিং খান! সন্ধ্যার সময় আফিঙের ঝোঁকে একবার শুয়ে পড়েন। ঘণ্টা দুয়েক পরে ওঠেন, সকলকে খাইয়ে দাইয়ে নিজে বসেন একটি হ্যারিকেন সামনে রেখে একখানি শাস্ত্রগ্রন্থ নিয়ে। রাত্রের এ পাঠই তাঁর সত্যকার পাঠ। এবং এ সময়ে রামকৃষ্ণকথামৃত বা অন্য কোনো শাস্ত্র ছাড়া আর কিছু পড়েন না। এমনও দেখেছি যে, রাত্রি দুটো, আলো জ্বলছে, মা পড়ছেন। কোনো কোনো দিন দেখেছি, সেই রাত্রে ভাঁড়ার ঘরে আলো জ্বলছে, মা ঘুরছেন ঘরের মধ্যে। জিজ্ঞাসা করে উত্তর পেয়েছি, 'বইখানা শেষ হল: শুলাম, ঘুম এল না, তাই কি করব? কাজ সেরে রাখছি।' কোনো দিন দেখেছি বই বন্ধ করে আকাশের দিকে চেয়ে বসে আছেন। বলছেন, 'বইখানা এই শেষ হল। ভাবছি।'

তাঁর হস্তাক্ষরও অতি সুন্দর। বানান নির্ভুল, ব্যাকরণেও ভুল করতেন না। আজকাল লেখার পাট প্রায় তুলে দিয়েছেন। আমার বাবার মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল প্রায় বারো-চোদ্দ বৎসর আমাদের বাড়ির খসড়া জমাখরচের খাতা তিনি নিজে হাতে লিখেছেন: সে খাতাগুলি আজও আছে। পৃষ্ঠাগুলি দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। কতবার মামলার দাখিল কাগজে তাঁর সই বা লেখা দেখে বিচারক সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, এ কোনো মেয়ের হাতে লেখা হতে পারে না। তেমনি তাঁর সাহস। অনুরূপ স্থৈর্য।

আমাদের বাড়ির পশ্চিম ভাগে আমাদের চণ্ডীমণ্ডপ। ছটি শিবালয়, নাটমন্দির, দুর্গামণ্ডপ, কালীমণ্ডপ, নারায়ণের মন্দির, তার মধ্যে অনেকটা খোলা জায়গা। শিবালয়গুলির কোণে একটি বুড়া কামিনীফুলের গাছ, গাছটিতে চড়ে আমরা ছেলে-বেলায় সমবেত জনতার মাথার উপর দিয়ে বলিদান দেখতাম। একদা রাত্রে আমার শোবার ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে দেখি—মা দাঁড়িয়ে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছেন চণ্ডী-মণ্ডপের দিকে। প্রশ্ন করতেই নীরবে দেখিয়ে দিলেন কামিনীগাছটাকে। জ্যোৎস্না-লোকিত রাত্রে দেখলাম—কামিনীগাছের গুঁড়িটির যেখান থেকে দুটি ডাল বেরিয়ে পৃথক হয়েছে, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে একটি শুভ্রবস্ত্রাবৃত মূর্তি। মধ্যে মধ্যে গাছের

ডাল দুটিকে নাড়া দিয়ে দোলাচ্ছে। শিউরে উঠলাম। তারপর তিনি নিচে নামলেন। প্রশ্ন করলাম—কোথায় যাবে? তিনি আঙুল বাড়িয়ে ওই ছায়ামূর্তি দেখিয়ে দিলেন।

—সে কি?

—দেখে আসি।

তিনি বাইরের দরজা খুলে তখন এগিয়েছেন। আমাকে অগত্যা অনুসরণ করতে হল। খানিকটা গিয়ে তিনি হেসে উঠলেন। বললেন—জ্যোৎস্না। কালো গাছের ফাঁকটায় জ্যোৎস্না পড়েছে।

সত্যিই তাই। কাছে গিয়ে দেখলাম, গাছের ফাঁকটি এই রাত্রে পল্লবের কালো রূপের মধ্যে জ্যোৎস্নার আলোয় ঠিক মানুষের আকার নিয়েছে।

একবার আমাদের খিড়কিতে একটি শেওড়াগাছের মধ্যে দুটো জ্বলন্ত চোখ দেখে এগিয়ে গেলেন তার তত্ত্ব নির্ধারণের জন্য।

সবচেয়ে তাঁর সাহস এবং স্থৈর্য দেখেছি সাক্ষাৎ কালস্বরূপ সাপের সম্মুখে। আমাদের বাড়িতে অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ পিতামহের বাড়িতে ও আমাদের বাড়িতে গোখুরো সাপের প্রাদুর্ভাব বেশি। আজ পঞ্চাশ বছর ধরেই দেখে আসছি। গ্রীষ্মকাল থেকে শীতের প্রারম্ভ পর্যন্ত অন্ততঃ চার-পাঁচটা বড় বড় গোখুরা মারা পড়েই প্রতি বার। এর সঙ্গে কয়েকটা চিতি, মধ্যে মধ্যে ভয়ংকর দু-একটা চন্দ্রবোড়া। এক এক বৎসর বাড়ির কাছেপিঠে বাচ্চা হলে বিশ-ত্রিশটা গোখুরার আধ হাত থেকে হাতখানেক লম্বা বাচ্চাও মারা পড়ে। একবার তিন-চার দিনে তেতাল্লিশটা বাচ্চা বেরিয়েছিল। সে-বার প্রথম বাচ্চাটা দেখা দিয়েছিল মায়ের পায়ের উপর। রোয়াকে উঠানে পা ঝুলিয়ে মা বসে আছেন, গরমের সময়, এখানে ওখানে বসে আছেন আরও সকলে। মা কথা বলতে বলতে স্থির হয়ে গেলেন। কথাও বলেন না, নড়েন না, মাটির মূর্তি যেন।

পিসিমা ডাকেন—বউ!

উত্তর নাই।

—মা!

উত্তর নাই।

কে যেন শঙ্কিত হয়ে তাঁর গায়ে হাত দিতে উদ্যত হতেই তিনি মৃদু কণ্ঠে বললেন—সাপ।

—কোথায়?

—আমার পায়ের উপর দিয়ে যাচ্ছে। চুপ কর।

কয়েক মুহূর্ত পরেই বলেন—আলো। পা তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। দ্রুতপদে একটা আলো নিয়ে ফিরে এসে দেখলেন, উঠান এবং রোয়াকের কোলের নালা বেয়ে চলেছে গোখুরা সাপের শিশু; আলো এবং মানুষের চাঞ্চল্যে তার মনোহর চক্র প্রসারিত করে মাথা তুলে দাঁড়াল। মা হাসলেন, কিছু বললেন না।

আশ্চর্য তাঁর এই সাপ সম্পর্কে সজাগবোধ। ঘরে সাপ বের হলে তিনি ঘরে ঢুকবা মাত্র বুঝতে পারেন। মাটির উপর সাপের বুকে হাঁটার একটা শব্দ আছে। সে শব্দ যত মৃদুই হোক, তাঁর কানে ধরা পড়তই। পড়ত এই কারণে বলছি যে,

আজকাল মায়ের কানের শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। তাতেও তিনি বুঝতে পারেন বিচিত্র পর্যবেক্ষণশক্তিতে। ভাঁড়ার ঘরেই সাপ বের হয় বেশি। সাপ ঘরে স্থির হয়ে থাকলেও তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। বলেন—আলোটা দেখি। ঘরে বোধ হয় সাপ রয়েছে।

আলো না নিয়ে ঘরে ঢোকাটাই তাঁর অভ্যাস। হাজার বলেও আলো নেওয়ার অভ্যাস তাঁর হয়নি। আলো নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে তিনি সাপের সন্ধান করেন। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বের করেন—ওই, ওই। কোনো ক্ষেত্রে চলে যায় সাপ আলোর ছটা পেয়ে, কোনো ক্ষেত্রে বেরিয়ে পড়ে, মা আলো সামনে রেখে গতিরোধ করে আমাদের বলেন—লাঠি আনো, মারো। ক্ষেত্রবিশেষে বেদে ডাকানো হয়। বেদে ধরে নিয়ে যায়।

যে সাপ স্থির হয়ে থেকে গর্জন না করে নিজের অস্তিত্ব গোপন রাখতে চায়, অন্ধকারেও তার অস্তিত্ব কেমন করে তিনি বুঝলেন, এ প্রশ্ন প্রথম জীবনে সবিস্ময়ে একদিন করেছিলাম—কি করে বুঝলে তুমি?

হেসে বলেছিলেন—ঘরে ঢুকেই দেখলাম সব স্থির। আরসুলারা উড়ছে না, ইঁদুর দলের নাচের আসর বসেনি; বুঝলাম, ঘরে নিশ্চয় এমন কেউ এসেছেন যাঁর সামনে এ-সব বেয়াদপি চলে না। ভীষণ শাসন তাঁর।

আরও তত্ত্ব আছে, সে তত্ত্বটি সকল সময় ধরা পড়ে না। সাপ ও সাপিনীর মিলনের সময় সাপিনীর গায়ে কাঁঠালীচাঁপার গন্ধের মতো গন্ধ বের হয়। এই গন্ধের তথ্যও তিনিই আমাকে বলেছিলেন। বেদেদের কাছে তথ্যের তত্ত্ব অবগত হয়েছিলাম পরে। এর সমর্থনও পেয়েছি সাপের সম্পর্কে যাঁরা বই লিখেছেন তাঁদের বইয়ে।

এই দিক দিয়ে তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং সাহসের আর দুটি কথা বলব। যদি নিজের মায়ের কথা কিছু বেশিই বলা হয়, তবু মার্জনা পাব ভরসা আছে।

আমার আট বছর বয়সের সময় আমার বাবা মারা যান। তারপর আমাদের বাড়ির অভিভাবক হয়ে আসেন আমার বাবার মাতুল। তাঁরও ত্রিসংসারে কেউ ছিল না—তাঁর ওই ভাগিনেয়টি ছাড়া। আমাদের ভাগ্য—বৎসর চারেক পরে তিনিও মারা গেলেন এবং আমরা সংসারে হলাম একান্তভাবে পুরুষ-অভিভাবকহীন। বাড়িতে নায়েব একজন এবং আমার ভাইদের পড়াবার জন্য একজন মাস্টার গৌর ঘোষ, তা ছাড়া চাকর ও চাপরাসী। এ ছাড়াও গরু-বাছুরদের পরিচর্যার জন্য দু-তিন জন বাউরী জাতীয় চাকর। বৈঠকখানার উঠানে ধানে বোঝাই মরাই তিন-চারটি। কয়েকদিন পরেই চাপরাসী, নায়েব, চাকর এবং গৌর ঘোষদের মুখপাত্র হিসাবে গৌর ঘোষ সবিনয়ে মাকে বললেন—মা, অপরাধ নেবেন না; একটি কথা বলব। পিসিমাকে বলতে সাহস হয় না, উনি রেগে উঠে হয়তো -

—কি বল?

—বৈঠকখানায় তো টেঁকা কঠিন হল মা।

—কেন? বলেই মা বললেন—ও! ভয় পাচ্ছ তোমরা?

—হ্যাঁ মা। কর্তা বোধ হয়—

অর্থাৎ প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়েছেন।

এতক্ষণে নায়েব বললেন—সমস্ত রাত্রি, যে ঘরে তিনি মারা গিয়েছেন, সেই ঘরে হট-হট শব্দ হয়, চেয়ারে খাটে যেন কেউ বসেন উঠেন। ভয়ে মা, শরীর হিম হয়ে যায়।

পিসিমা শুনেছিলেন কথাটা। তিনি প্রথমটা রাগই করলেন।

তাঁরা সভয়ে চলে গেলেন। আধ ঘণ্টা পরে ফিরে এসে চুপি চুপি ডাকলেন—মা! পিসিমা!

—কি?

—দয়া করে একবার আসুন, নিজের কানে শুনে যান।

মা উঠলেন, পিসিমাকেও উঠতে হল।

বৈঠকখানার বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। কান পেতে রইলেন।

হট্-হট্। খট্-খট্। তার পর দুম শব্দ উঠল।

যে ঘরে বাবার মাতুল মারা গিয়েছিলেন, সেই ঘরের মধ্যে। সকলে আঁতকে উঠলেন। মা কিন্তু এগিয়ে গিয়ে ঘরটার তালা খুললেন। আলো নিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকলেন। দেখলেন, সত্য সত্য চেয়ার টেবিল সরে নড়ে গিয়েছে। একটা চেয়ার উল্টে পড়ে আছে।

পিসিমা সকাতরে বললেন—বউ, কি হবে?

মা কোনও উত্তর দিলেন না। চারিদিক দেখলেন—তারপর আবিষ্কার করলেন একটি জানালা একটু খোলা রয়েছে। তিনি এগিয়ে গেলেন, জানালাটি বেশ করে বন্ধ করে খিল এঁটে দিয়ে বললেন, সমস্ত জানালার খিলে একটা করে পেরেক এঁটে দিন দেখি।

দেওয়া হল। তারপর বললেন—এইবার দেখুন।

দুদিন পর আবার তাঁরা বললেন—মা, ওই করে কি অশরীরীর উপদ্রব বন্ধ হয়?

—আবার হচ্ছে?

—ঘরে অবশ্য কিছু হচ্ছে না। সমস্ত রাত্রি চালের উপর চলে বেড়াচ্ছেন। মচ মচ শব্দ হচ্ছে। পরের দিন মা একটা পেয়ারা গাছ কাটিয়ে দিলেন। গাছটা ছিল বাড়ির বাইরে। কিন্তু ডাল এসে পড়েছিল চালের উপর।

এবার সবই বন্ধ হল। তাঁরা বললেন—বুঝতে পারিনি মা। ওই মরাইয়ের ধান নেবার উদ্যোগ পর্ব হচ্ছিল। যাতে ভয় পাই, শব্দ হলেও না উঠি।

কিন্তু সেই দিন রাত্রেই বাড়ি থেকে খেয়ে বৈঠকখানায় ফিরে তাঁরা সদলে চিৎকার করে উঠলেন। গৌর ঘোষ খুব উঁচু দরের ভূতের গল্প বলিয়ে ছিল—সে বাড়ির ভেতর পর্যন্ত ছুটে এসে পড়ে গেল।

—কি হল?

—প্রচণ্ড শব্দ করে গাছের উপর কর্তা 'ঝাঁপ' বলে লাফিয়ে পড়লেন।

—বল কি? মা বের হলেন।

—বউ, যেয়ো না। বউ! পিসিমা ডাকলেন।

বউ শুনলেন না। গিয়ে যে কাঁঠাল গাছটার উপর কর্তা লাফিয়ে পড়েছিলেন, মাথার উপর আলোটা তুলে সেই গাছটার উপর আলো ফেললেন।

'বাঁপ' শব্দ করে এবার লাফ দিয়ে মাটিতে পড়লেন তিনি। তিনি কর্তা নন। পাউষ বিড়াল একটা। এক ধরনের বন্য বিড়াল। অবিকল 'বাঁপ' বলে চিৎকার করে। সকলেই তখন বললে—বললাম গোর, ভালো করে দেখ। তা না, ছুটে চলে গেলে বাড়ি।

গোর বেচারা তখন একপাটি চটির অন্বেষণে ব্যস্ত থেকে লজ্জা থেকে অব্যাহতি পাবার চেষ্টা করছে—এক পাটি আবার কোথায় গেল? কি বিপদ।

বিপদই বটে। ছুটে পালাবার সময় ছটকে বেরিয়ে গিয়ে ঢুকেছে হাত দশেক দূরে মালতী লতার ঝোপের মধ্যে।

মায়ের এই সাহস আমার পক্ষে বিপদের হেতু হয়েছিল এক সময়। প্রথম সিগারেট খেতে শিখি তখন। রাত্রে বৈঠকখানায় অন্ধকারে আরাম করে সিগারেট খাচ্ছি। হঠাৎ হাত পড়ল পিঠে। ফিরে দেখি, মা দাঁড়িয়ে। কখন নিঃশব্দপদসঞ্চারে এসে দাঁড়িয়েছেন। চমকে উঠলাম। হাত থেকে সিগারেট পড়ে গেল। মা বললেন—ছি! তারপর চলে গেলেন।

এই সময়ে অর্থাৎ কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থলে তিনি যেন আগলে ফিরতেন আমাকে। সর্বাপেক্ষা রাগ হত এবং বিপদ হত আমার উপন্যাস পড়া নিয়ে। তখন যা পাই পড়ি। পড়ি না শুধু পাঠ্য-পুস্তক। কিন্তু প্রতি বই পড়তে গিয়েই ধরা পড়ি তাঁর কাছে। তাঁরও ক্লান্তি নেই, আমারও ক্লান্তি নেই। অথচ এই গল্পের প্রতি আমার অসাধারণ আসক্তির মূল তিনি। তিনি আমার গল্পের আসক্তি জন্মিয়েছেন। অসাধারণ তাঁর গল্প বলার শক্তি ছিল। আমি আমার জীবনে চারজন প্রথম শ্রেণীর গল্প-বলিয়ের সাক্ষাৎ পেয়েছি। প্রথম আমার মা। যেমন বলতে পারতেন গল্প, তেমনি অফুরন্ত ছিল তাঁর ভাণ্ডার। অনেক গল্প আজও মনে আছে। আজও কানে বাজছে—

"কোথা গো মা কাজলহারা
মুছাও আমার অশ্রুধারা
প্রাণে মারবে মুক্তাহারা
আসবে রাজা মিনকোহারা
পত্নীহারা কন্যাহারা—
চোখের জলে ভাসবে ধরা।"

"রাজা মিনকোহারা মস্ত রাজা। দুই রানী তাঁর, মুক্তাহারা আর কাজলহারা। মুক্তাহারা বন্ধ্যা, কাজলহারার একটি মাত্র কন্যা—ননীর পুতলী, যেমন লাবণ্য তেমনি রূপ। মিনকোহারা গেলেন দিগ্বিজয়ে। সুযোগ পেলেন মুক্তাহারা তাঁর সতীনের উপর হিংসা চরিতার্থ করবার। কাজলহারা কিন্তু অত্যন্ত সরলা। তিনি দিদি বলেন মুক্তাহারাকে। ভক্তি করেন, বিশ্বাস করেন। সুযোগ নিলেন মুক্তাহারা, মিষ্ট কথায়

কাজলহারাকে ডেকে বললেন—আয় কাজল, তোর চুল বেঁধে দি। কাজলহারা দিদির সমাদরে উৎফুল্ল হয়ে চুলের গুছি-দড়ি নিয়ে ছুটে এসে বসলেন ছোট আদুরে মেয়েটির মতো। মুক্তাহারা অবিকল সাপের মতো আকার দিয়ে বাঁধলেন বেণী, তারপর একটি মন্ত্রপূত শিকড় তাঁর খোঁপায় গুঁজে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কাজলহারা হয়ে গেলেন এক অজগর সাপ। হয়ে তিনি রাজপুরী থেকে বেরিয়ে নগরের প্রান্তে একটি গাছের কোটরে আশ্রয় নিলেন। পিছন পিছন তাঁর মেয়েটি এসে—সেই কোটরের ধারে বসে ঐ বলে কাঁদতে লাগল।" এই গল্প। কিন্তু ওই যে রাজকন্যার কান্না—সে-কান্নায় শ্রোতারা সকলেই দীর্ঘশ্বাস ফেলত, আমি কাঁদতাম। আজও আমার মনে আছে, তার সেই বিলাপের অবিকল শব্দবিন্যাস। গল্প শেষে মা হেসে আমার চোখ মুছিয়ে দিয়ে একটি হিন্দী প্রবাদ-বাক্য বলতেন—বলনেওয়ালা ঝুটা, শুননেওয়ালা সাচ্চা, অর্থাৎ গল্প যে বলে সে বলে মিথ্যে, কিন্তু যে শোনে সে শোনে সত্য।

আমার মায়ের মধ্যে ছিল গভীর স্বদেশানুরাগ। আমার বাবারও ছিল। রাখীবন্ধন অনুষ্ঠান যখন প্রথম অনুষ্ঠিত হয়, তখন তাঁর ডায়রিতে পাই—৩০শে আশ্বিনের ডায়রি—"বেঙ্গল পার্টিশন হইয়াছে, হিন্দু মুসলমান সকল জাতিই মনে মনে দুঃখ পাইয়াছে। বঙ্গদেশের এই দুঃখে বঙ্গবাসীগণ আজ নূতন করিয়া জাগ্রত হইতেছেন। পরাধীনতায় দুঃখ অনুভব করিতেছেন। এই উপলক্ষে কলিকাতার কবিবর রবীন্দ্র ঠাকুর এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিজ্ঞাপন দ্বারা বঙ্গবাসীকে পরস্পরের হস্তে হরিদ্রাবর্ণের রাখী বাঁধিতে বলিয়াছেন। সকল বঙ্গবাসীই তাহা পালন করিবে। ইহা দ্বারাই আমরা একতাসূত্রে আবদ্ধ হইব। হায়, আজ ৯৫০ বৎসর পরে ঈশ্বরের কি মহিমা যে ভারতের দরিদ্র সন্তানগণ একতাসূত্রে আবদ্ধ হইতে সংকল্প করিয়াছে? হে বিশ্বপিতা, বিশ্বপতি, জগদীশ্বর—হে জগজ্জননী, অসুরদর্পদলনী মা—একবার তোমাদের চির-আশ্রিত শরণাগত ভারতসন্তানগণকে—যাহাদের জন্য তোমরা যুগে যুগে এই ভারতভূমে অবতীর্ণ হইয়া পাপের নাশ করিয়াছ—পুণ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছ—অসুর প্রাদুর্ভাব দলন করিয়াছ—তাহাদের শক্তি দাও, তাহাদের হৃদয়ে পুণ্যের আলোক প্রজ্বলিত কর। সত্যধর্ম—হিন্দুধর্মকে গৌরবান্বিত কর। দীনবন্ধো, কৃপা কর—কৃপা কর—কৃপা কর।" অন্যত্র পাই তিনি দেশপ্রেমোদ্দীপক 'পদ' রচনা করেছেন।

আমার মায়ের দেশপ্রেম ছিল অবাস্তব। তিনি পাটনার মেয়ে। বাস্তব রাজনীতিবোধ তাঁর সুদ্ধমাত্র ধর্ম এবং অদৃষ্টের উপরে নির্ভরশীল ছিল না। আমার বড় মামার মধ্যে মানিকতলার দলের ঢেউ এসে লেগেছিল। পরবর্তীকালে আমার সেজ মামা—তিনি আমার থেকে চার পাঁচ বৎসরের বড় ছিলেন—তিনি উত্তর-ভারতের বিপ্লবীদলের দলভুক্ত হয়েছিলেন। অকালে বিশ-বাইশ বৎসর বয়সে তিনি প্লেগ রোগে মারা যান। পরে বেনারস কন্‌স্‌পিরেসি কেসে তাঁর নাম কয়েকবার উল্লিখিত হয়েছে—তাঁর পরবর্তী ছোট ভাইকে তাতে সাক্ষ্যও দিতে হয়েছে।

ঐ প্রথম রাখীবন্ধনের দিন আমার বড় মামা লাভপুরে ছিলেন। তিনি রাখী

এনে আমার মায়ের হাতে বেঁধে দিতেই মা তাঁর হাত থেকে একটি রাখী নিয়ে আমার হাতে বেঁধে দিয়ে মন্ত্র পড়েছিলেন—বাংলার মাটি—বাংলার জল—

এই ঘটনাটির উল্লেখ 'ধাত্রীদেবতা'য় আছে। 'ধাত্রীদেবতা'র মায়ের সঙ্গে আমার মায়ের খানিকটা সাদৃশ্য আছে। আমার আত্মীয়া একটি কলেজে-পড়া মেয়ে 'ধাত্রী-দেবতা' পড়ে বলেছিল—'আপনি নিজের মাকে একেবারে মহিমময়ী করে বই লিখেছেন।' আমার মা সত্যই মহিমময়ী।

আজ তিনি বৃদ্ধা, জীবনের দীপ্তি হ্রাস পেয়ে আসছে। সে আমলের সে দীপ্তিময়ীকে প্রথম দর্শনে চেনা যায় না, তার বদলে দেখা যায় এক অপরিসীম করুণা-ময়ী নারীকে, যাঁর বুকে আজ সকল আগুন জল হয়ে অক্ষয় সরোবরের সৃষ্টি করেছে। সামান্য জীবজন্তুর কষ্ট দেখা দূরের কথা—শুনলেও সে সরোবরে উচ্ছ্বাস উঠে। আছে শুধু আত্মার সেই আকুতি। সেই আকুতিতে তিনি প্রতীক্ষা করে আছেন মৃত্যু কবে আসবে সেই দিনের। এ প্রতীক্ষা জীবনের পরাজয়ের তিতিক্ষায় নয়, মৃত্যুর মধ্যে অমৃতময়ের সাক্ষাতের প্রত্যাশায়।

চার

মা আমার মহিমময়ী। কালের নূতন পদপাতে আলপনায় পদশোভা আঁকবার শক্তি এবং নৈপুণ্য নিয়ে জন্মেছিলেন বা অর্জন করেছিলেন বলেই তিনি শুধু মহিমময়ী নন। আরও কিছু আছে। সেটা হল—নূতন পদপাত করে কাল যে নব-যুগ-ভঙ্গিতে প্রকট হলেন, তাতেই তাঁর জীবনদর্শন বা ভাবনা গণ্ডীবদ্ধ নয়। যুগ-ভঙ্গিমায় প্রকট কালের মহাকালরূপ দর্শনের ব্যাকুলতা তাঁর অসীম। নূতনকে আসন ও অর্ঘ্য দিয়ে বরণ করেছেন : যুগধর্মকে যুগের প্রভাবকে সাগ্রহে গ্রহণ করেছেন; কিন্তু জীবন-ভাবনায় মানুষ যা চিরদিন ভেবে এসেছে, সে ভাবনা তাঁর গভীর ; সেই ভাবনাতেই আজ বৃদ্ধ বয়সে তিনি তন্ময়, তাই সমস্ত কিছুর মধ্যে মানব-জীবনের অমোঘ নীতিবোধটিই তাঁর শ্রেষ্ঠ জীবন-মন্ত্র ; এবং তাঁর আটষট্টি বৎসরের জীবন গঙ্গাধারার মতো পবিত্র নিরাসক্তির স্রোতোধারায় অহরহই যেন সদ্যস্নাত। পৃথিবীর সম্পদকে, সুখকে তিনি তুচ্ছ বলেন না, লক্ষ্মীকেই তিনি শক্তিরূপা বলে থাকেন, পূজাও দেন, প্রণামও করেন, কিন্তু তাঁর ইষ্টদেবতা হলেন বৈরাগ্যের দেবতা শিব।

মায়ের প্রসঙ্গে এই কথা বলছি যখন তখন এ-কথাটিও বলতে হবে সঙ্গে সঙ্গে যে, সে-কালে এই ভাবনাটি প্রায় প্রতিটি মানুষের মধ্যে ছিল। আমাদের দেশের সামাজিক ইতিহাস যাঁরা চর্চা করেছেন, তাঁরা বলেন—এই বোধ বা আধ্যাত্মিকতা মাত্রাতিরিক্ত রূপে এ দেশের মানুষের মনে এমন প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, ঐহিক

সমস্যার সমাধানে সমগ্র জাতিটাকেই ক্লীব করে তুলেছিল। ইতিহাসে তার নজীর আছে। হিন্দুর পরাজয়ের আর অবধি নাই, যে এসেছে—শক-হুন, চেঙ্গিজ খাঁ, তৈমুরলঙ্গ, পাঠান, মোগল, ইংরেজ—সবার কাছেই তাকে হারতে হয়েছে। শুধু কি মানুষেরই কাছে হেরেছে? সরীসৃপ, পশু—এর কাছেও হার মেনে এদের দেবতার আসনে বসিয়ে পূজা করেছে। মনসা পূজা, দক্ষিণরায় পূজা আজও একেবারে বিলুপ্ত হয়নি। সত্যসত্যই জীবনদর্শন তখন বিকৃত হয়ে উঠেছিল। আধ্যাত্মিকতা পরিণত হয়েছিল তেত্রিশ কোটী দেবতার পূজা-সমারোহে—কোটী কোটী অক্ষম মানুষের 'দেহি দেহি' প্রার্থনা-কোলাহলে; ভাবনাও মন থেকে নির্বাচিত হয়ে বাইরে এসে নিয়েছিল অর্থহীন আকার ও অন্ধ সংস্কারের চেহারা।

এ সব স্বীকার করেও কিন্তু আমার মন সে-কালকে কালাপাহাড়ের ভাঙা প্রস্তর বিগ্রহের মতো বিসর্জন দিতেও পারে না, শুধু পাথরের পুতুল বলে মিউজিয়ামের বস্তু বলেও ভাবতে পারে না। ওর মধ্যে কোথায় যেন কি আছে। বিচিত্র বিস্ময়কর কিছু। তেত্রিশ কোটী দেবপূজার শুকনো বা পচা ফুলের রাশির মধ্যে ওই বৈরাগ্যের দেবতা শিবের প্রসাদী নির্মাল্য, অম্লান বিল্বপত্রের মতো কিছু। আমার পূজা তাকে না দিয়ে পারি না।

একটু খুলেই বলতে হবে। সে-কালেও দেখেছি, আবার আজকের কালেও দেখছি। সে-কালের বিকৃতিকে স্বীকার আমি আগেই করেছি। আবারও করছি। বার বার স্বীকার করছি এবং যে আবর্জনার স্তূপ পচে উঠে ওই চির-অম্লান দুর্লভ বস্তুটিকে চেপে রেখেছিল তা স্মরণ করেও শিউরে উঠছি। মনে পড়ছে এই জঞ্জাল আমার মাথার চুলে বাসা গেড়েছিল ছেলেবেলায়। ছেলেবেলায় আমার মাথায় মেয়েদের মতো লম্বা চুল ছিল। অন্নপ্রাশনের সময় চূড়াকরণের জন্য কয়েকটি দাগ কেটে ক্ষুর বুলানোর পর পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত চুলে আর কাঁচি ঠেকেনি। লম্বা পিঠ পর্যন্ত চুল অনেকে শখ করে আজকাল রাখেন, শখের দায়ে অনেক কিছুই সহ্য হয়: কিন্তু আমার চুল শখের ছিল না। মাথার লম্বা চুলে আঠা বাঁধত, চুল শুকুতে হত, মধ্যে মধ্যে উকুন হত, সত্যসত্যই সে আমার মাথায় ছিল জঞ্জালের বোঝা। একদা চুলের এই জঞ্জাল-স্বরূপ এমন উৎকটভাবে আমার কাছে আত্মপ্রকাশ করলে যে, সে-কথা আর বলবার নয়। একদিন রাত্রে বিনুনি বাঁধা আমার মাথায় আমার তিন বছরের বোন বিষ্ঠা লেপন করে দিলে। গভীর রাত্রে সে এক প্রায়শ্চিত্ত। বিনুনির ছাঁদের ফাঁকে ফাঁকে ঢুকেছে ময়লা। সেই বিনুনি খুলে সেই রাত্রে স্নান করতে হল। সেই রাত্রে মনে হল আমার, কেন আমি চুল রাখব? কাটবই আমি চুল।

কিন্তু নিরুপায় অসহায় আমি। এ চুল দেবতার কাছে মানতের চুল। একা আমার নয়, অনেকের মাথায় মানতের চুল থাকত। কারও পাঁচ বৎসর, কারও দশ বৎসর, কারও উপনয়ন পর্যন্ত (ব্রাহ্মণদের) চুল বাড়ত, কারও কারও আবার চুলের সঙ্গে জটাও থাকত মানত্, জটা তৈরি হত সযত্ন পরিচর্যায়। ঠিক আমারই বয়সী আমার বাল্যসঙ্গী বদি বা বৈদ্যনাথের চুল এবং জটা ছিল তেরো বৎসর বয়স

পর্যন্ত। তার উপনয়ন পর্যন্ত মানত ছিল, উপনয়ন হয়েছিল তেরো বৎসর বয়সে। বেচারী মাথায় রীতিমতো খোঁপা বেঁধে ইস্কুলে যেত। ওই সময়ে শুনতাম—যখন সে ছোট ছিল, তখন বয়স্কেরা কৌতুক করে বলতেন—কই, তেঁতুল পড়া দেখাও তো! বলেই বলতেন—জট নড়ে, তেঁতুল পড়ে, জট নড়ে, তেঁতুল পড়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে বদির মাথা ঘন ঘন নড়তে শুরু করত, জটা দুটিও আন্দোলিত হত তেঁতুলের সোঁটার মতো। বড় হয়ে লজ্জা পেত বৈদ্যনাথ। হঠাৎ আমার সুযোগ এল এ-জঞ্জাল মুক্ত হবার। সে-দিন আনন্দের আমার সীমা ছিল না। ব্যক্তিগত জঞ্জাল-জ্বালার অসুখ-অসুবিধা ছাড়াও আরও অনেক কিছু ছিল চুলের বেদনা। এ বয়সের কথা যত কিছু মনে আছে তার মধ্যে চুলের জন্য লজ্জা পাওয়ার কথা মনে আছে। বাইরের লোকে আমাদের দেখে প্রথমেই খুকী বলে সম্বোধন করত। একদিনের কথা আজও মনে আছে আমার। তখন আমার বয়স তিন বছর। প্রথম মামার বাড়ি যাচ্ছি পাটনায়। ট্রেনে চড়েছি প্রথম। আদমপুর স্টেশনে যখন ট্রেনখানা এসে প্রথম ঢুকল—সে ছবি আমার মনে জ্বলজ্বল করছে একটা টকটকে লাল ছবির মতো। মনে পড়ছে ইঞ্জিনের মুখটায় টকটকে লাল রঙ দেওয়া ছিল আর ঝক্‌মকে সোনার মতো উজ্জ্বল পিতলের হরফে কিছু লেখা ছিল। সেই সঙ্গে মনে পড়ছে—কামরার ভিতর বাবা, মা, মায়ের কোলে কয়েক মাস বয়সের আমার বোন এবং আমি। আর মাথায় কালো টুপি-পরা এক ভদ্রলোক বসে আছে। রেলিং দেওয়া ঘেরা ছোট্ট খাঁচার মতো কামরা। ওই ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কি খোকী, মামা-বাড়ি যাচ্ছ? আমি যে কী লজ্জা পেয়েছিলাম—সে আর কী বলব। হাতে ধরে বিনুনি দুটোকে টানতে শুরু করেছিলাম।

গ্রামের অনেক প্রবীণ, যাঁরা নাকি সম্পর্কে ছিলেন ঠাকুরদাদা—তাঁরা রহস্য করে বলতেন তারাশঙ্করী। বাল্যবন্ধুরাও শুনে কথাটা শিখে নিয়েছিল।

তবুও কাটবার কোনো উপায় ছিল না।

মনে মনে দারুণ ভয় ছিল—বাবা বৈদ্যনাথের মানতের চুল। এর একগাছি চুল ছিঁড়ে গেলে দেবতা রাগ করবেন।

আজ ভাবি এই সব কথা। সে-সব জঞ্জাল আজ ধীরে ধীরে পরিষ্কৃত হতে শুরু হয়েছে ভেবে আশ্বাস পাই। আবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের আকুতিতে তাকে খুঁজে-পেতে দেখি। সে আমলকে চোখে দেখেছি—অন্তরে-অন্তরেও অনুভব করেছি বলেই স্পষ্ট বুঝতে পারি জীবনের হবিকে ভস্মে ঢালার মর্মকথা। আমাদের সমাজের যে সব মানুষের স্বল্প আয়, কিছু কৃষিক্ষেত্র নিয়ে স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা চালিয়ে আসছিলেন—তাঁরা অকস্মাৎ সম্মুখীন হলেন এক অভিনব সভ্যতায়, যার ফলে অবশ্যম্ভাবীরূপে আরম্ভ হয়ে গেল এক অর্থনৈতিক বিপ্লব। বিপ্লব উপস্থিত হলেই বিপর্যয়ের দুঃখ শুরু হয়। সেই দুঃখ থেকে পরিত্রাণের পথ ছিল বাইরের জগতে গিয়ে—যে জগৎ গ্রামের অর্থ টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, সেখান থেকে অর্থ উপার্জন করে আনা। কিন্তু সে শিক্ষা ছিল না, সাহসও ছিল না। সে আমলের সুখীর অন্যতম সংজ্ঞাই ছিল অপ্রবাসী। সেই কারণে প্রবাসবাস ছিল দুঃখদায়ক, এবং

সংসারে যা দুঃখদায়ক তাই ভীতির বস্তু। আর শুরু হয়েছিল শিক্ষা-বিপ্লব। যাঁরা ইংরেজি জানতেন না তাঁদের সম্মুখে বাইরের জগতের পথ ছিল রুদ্ধ ; অন্তত তাঁরা তাই মনে করতেন। অথচ ব্যক্তিত্বের যোগ্যতায় তাঁরা আজকের দিনের উচ্চ-পদস্থের চেয়ে হীন কি অক্ষম ছিলেন না। এ-কালের শিক্ষা তাঁদের ব্যক্তিত্ব ও যোগ্যতার সঙ্গে যুক্ত হলে সমান কৃতিত্বের পরিচয় তাঁরা দিতে পারতেন। এই অবস্থার মধ্যে পড়ে এই সব মানুষই অসহায় হয়ে একমাত্র দৈব বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে ছিল। বিশ্বাস ছিল না নিজের উপর, ভরসা ছিল না রাজশক্তির উপর, সুতরাং একটা ভরসাস্থল ছাড়া মানুষ বাঁচে কি করে? ধর্মের অবস্থা তখন বিকৃত। এই কালে ধর্মের বিকৃত অবস্থাটা ঐতিহাসিক সত্য। তাই অসহায় মানুষ ক্ষুদ্রতম দুঃখের জন্য দেবতাকে মানত করেছে। এবং মানত্ করেছে বা করতে চেয়েছে তার সব কিছু। নখ থেকে চুল থেকে প্রিয় আহার্য এবং আরও অনেক কিছু। আমি হাত মানত্ রাখতে দেখেছি। ডান হাত এক বৎসরের জন্য মানত্ রেখেছিলেন আমার পিসিমা। ডান হাতখানি দেবতাকে দিয়ে সংসারের সকল কর্ম বাঁ হাত দিয়ে করতেন; প্রচণ্ড গ্রীষ্মে ঘেমে সারা হচ্ছেন—বাঁ হাতে পাখা চালাচ্ছেন—বাঁ হাত ভেরে গিয়েছে, পাখা রেখে দিয়েছেন, তবু ডান হাতে পাখা স্পর্শ করেননি।

এক কালের নগর ভেঙে পড়ল জীর্ণ হয়ে, তার চারিপাশের উপবনগুলি সংস্কারাভাবে হয়ে উঠল অরণ্য, সেই অরণ্য শিকড় গজিয়ে ফাটিয়ে ফেললে নগরীর বসতি, দেওয়ালের সেই ফাটলে ফাটলে উড়ে এসে পড়ল গাছের বীজ, প্রাসাদের বসতির মাথায় মাথায় জন্মাল বনস্পতি—তারই মধ্যে যে মানুষের দল বাস করছিল, তাদের চোখে একদা প্রখরতম আলো ফেলে এগিয়ে এল যখন নূতন কাল তখন চোখ তাদের ধেঁধে গেল। উপায়ান্তরহীন হয়ে তারা পশ্চাদপসরণ করে লুকাতে চাইল ওই ভাঙা নগরীর গহনতম প্রদেশে। ওইখানেই তাদের বাঁচবার আশ্বাস।

অসহায় মানুষেরা মানত করেছে, পূজা করেছে, ভালো করেছে, মন্দ করেছে, যা কিছু করেছে দেবতার নাম নিয়ে। তান্ত্রিক মদ খেয়েছে কালীমার নাম করে, শৈব গাঁজা মদ সিদ্ধি খেয়েছে শিবের নাম করে, বৈষ্ণব গাঁজা খেয়েছে গোবিন্দের নাম করে। তাদের জন্য বেদনা অনুভব করি। ঘৃণা করতে পারি না। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি জিনিসের সন্ধান আমি পেয়েছি। ওই নির্মাল্যের সন্ধান। এই স্তূপীকৃত মিথ্যার মধ্যে সত্য কিছু দেখেছি আমি। হঠাৎ সে সত্য আত্মপ্রকাশ করত। এই যে দেবতার পূজা, বিকৃত ধর্মাচরণের অন্তরালে এত পার্থিব কামনা —এই কামনা অকস্মাৎ দেখা যেত শেষ হয়ে গিয়েছে। সে-কালের মানুষেরা যখন মৃত্যুর সম্মুখীন হতেন তখন এই সত্য আত্মপ্রকাশ করত। আজকের দিনে নিজেরাই প্রবীণ হয়ে এসেছি, এই বয়সে এ-কালের অনেক প্রবীণের অন্তিম শয্যার পাশেও উপস্থিত থেকেছি। কিন্তু সে-কালের মানুষদের মৃত্যুর সম্মুখীনতার সময়ের রূপ বিচিত্র এবং বিস্ময়কর। প্রবীণদের কথা বাদই দিচ্ছি; যাঁরা নাকি পঞ্চান্ন-ষাট বছর বয়সেও মহাপ্রয়াণ করেছেন, তাঁদেরও শতকরা আশিজনকে আশ্চর্য

প্রশান্ত স্থৈর্যের সঙ্গে মৃত্যুর সম্মুখীন হতে দেখেছি; যেটা নাকি এ-কালে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেল বললেও অত্যুক্তি হবে না। রোগে যাঁরা অজ্ঞান হয়ে যেতেন, জ্ঞানহীন অবস্থাতেই যাঁদের জীবনান্ত ঘটত, তাঁদের কথা বলছি না। সে-কালে পল্লীগ্রামে টাইফয়েড বা ম্যানেনজাইটিস, আকস্মিক হার্টফেলে মৃত্যু বা সন্ন্যাস রোগ বিরল ছিল। মানুষের স্বাস্থ্য ভালো ছিল, পরমায়ুও স্বভাবতই ছিল দীর্ঘ। সজ্ঞানে প্রবীণেরা মৃত্যুকালে প্রসন্ন প্রশান্ত মুখে বিদায়-সম্ভাষণ জানাতেন, পরমাত্মীয়দের নিজেই সান্ত্বনা দিয়ে যেতেন। একটি কথা সকলেই বলে যেতেন—'অধর্ম করো না সংসারে। দুঃখ কাউকে দিয়ো না।' আর বলতেন কে তাঁর কাছে কি পাবে। সে-পাওনা শুধু আর্থিক পাওনাই নয়—অন্যবিধ পাওনাও বটে। বলতেন—'অমুক আমার এই বিপদের সময় মহৎ উপকার করেছিল: আমি তার কিছুই করতে পারিনি, তুমি এই উপকারের ঋণ শোধ করো।' অনেকে আবার ছেলেদের দেনা-পাওনা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝিয়ে দিতেন সরকারী কর্মচারীদের চার্জ নেওয়ার মতো। তাঁর শ্রাদ্ধে কি খরচ করবে, সেও নির্দেশ দিয়ে যেতেন। তারপর হঠাৎ বলতেন—'আর না। দাও, আমার জপের মালা দাও।' কিংবা বলতেন—'শোনাও, এইবার নাম শোনাও।' অনেকে কাশীতে অথবা গঙ্গাতীরে দেহ-ত্যাগ করতে আয়োজন করে খোল করতাল বাজিয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ করে প্রতি দেবালয়ে প্রণাম করে চলে যেতেন—দৃষ্টি আবদ্ধ থাকত হয়তো আকাশের দিকে অথবা গ্রামের সর্বোচ্চ তরুশীর্ষে—কে জানে!

আজ পঞ্চাশোর্ধ্বে যখন দিন চলেছে, তখন এই যাওয়াকে আর তুচ্ছ করতে পারি নে কোনো মতেই। বসে বসে ভাবি আর অনুভব করি যেন তাদের এই মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার মধ্যে অন্তত কিছু পরিমাণও অমৃতের স্পর্শ আছে। সাধক রামকৃষ্ণের গান মনে পড়ে—

"আন রে ভোলা জপের মালা ভাসি গঙ্গাজলে।"

হয়তো সবটাই মানসিক বিকৃতি। এই বিকৃতি এতই প্রচণ্ড যে, পাগলের আনন্দে মৃত্যুকে বরণ করতেন তাঁরা—এ বললে তর্ক করব না। সবিনয়ে মাথা নত করে হার স্বীকার করেও বলব নূতন কালকে—নূতন কালের সত্যকে স্বীকার করে, মাথায় নিয়ে কামনা করি, মৃত্যুর সময় যেন এমনই পাগলের আনন্দেই মৃত্যুকে বরণ করতে পারি অর্থাৎ কল্পনায়ও অমৃতবিন্দুর আস্বাদ পাই।

পরবর্তী জীবনে তখন আমি প্রায় গ্রাম্য পরিব্রাজক, পিঠে বোঁচকা বেঁধে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াই। মেলা বেড়ানো একটা রোগ দাঁড়িয়েছিল। সেই সময় এক বৃদ্ধ বৈষ্ণবকে দেখেছিলাম। বয়স কত অনুমান করা কঠিন। কাটোয়ার পথে দেখা হয়েছিল। কাটোয়ার পাকা সড়কে হেঁটে চলেছিলাম; পাঁচুন্দির পর কাঁচা সড়ক, সড়কের দুই ধারে বনওয়ারীবাদের রাজাদের কল্পবৃন্দাবনের কীর্তির ধ্বংসাবশেষ। বড় বড় দীঘি, বাঁধানো ঘাট, পুরাকালের সুরম্য উপবনের ভগ্ন স্মৃতি, কয়েকটা বাঁধানো বেদী, কতকগুলি কেয়াগাছ, কয়েকটা চাঁপা করবীর গাছ, দু-একটি মাধবীলতা; তাল গাছের বেড়া, দু-একটা ভাঙা কুঞ্জে শুধু একটা কি

দুটো তমালের গাছ দাঁড়িয়ে আছে, আর আছে দু-একটা ছায়ানিবিড় সপ্তপর্ণী, যার চলতি নাম ছাতিমগাছ। এর কোনোটা তমালবন, কোনোটা কাম্যকবন, কোনোটা বা নিধুবন; অর্থাৎ বিস্তীর্ণ চার-পাঁচ ক্রোশ একটি অঞ্চল জুড়ে রাজারা বৃন্দাবনের দ্বাদশ-বন রচনা করেছিলেন: তার অবস্থিতি হল বনওয়ারীবাদ থেকে উদ্ধারণপুরের ঘাট পর্যন্ত রাস্তার দুই পাশে। এইখানে তাঁদের গৃহদেবতা বনওয়ারীজীর লীলা চলত। বনওয়ারীবাদের রাজার এখন ভগ্নাবস্থা। কীর্তিও ভাঙা-ভগ্ন হয়ে এসেছে। কিন্তু ওই ভগ্ন কীর্তিময় পরিপার্শ্ব পথিকের মনে আজও একটি অপরূপ স্বপ্ন রচনা করে। এই পথে যেতে একটি প্রাচীন ছাতিমগাছের তলে দেখলাম এক বৃদ্ধ বাউলকে। একা বসে আছে নিস্পন্দ মৃতের মতো। আমার সন্দেহ হয়েছিল প্রথমটায়। থমকে দাঁড়ালাম। কিছুক্ষণ লক্ষ্য করে বুঝলাম, মৃত নয়, জীবিত মানুষই বটে। এগিয়ে কাছে গেলাম, সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম, এই অবস্থায় তুমি এখানে এই গাছতলায় পড়ে কেন? কানে ভালো শুনতো পায় না লোকটি, এত জীর্ণ হয়েছে শরীর। ক্ষীণকণ্ঠেই প্রশ্ন করলে—কি বলছেন বাবা? কানে হাত দিয়ে হেসে বললে—শুনতে পাই না ভালো।

একটু জোরেই প্রশ্নটির পুনরুক্তি করলাম।—এই শরীর তোমার, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আবার হেসে সে বললে—সেই জন্যেই তো বাবা, যাব উদ্ধারণপুর, মা গঙ্গার তীরে। দেহ রাখতে যাচ্ছি বাবা। পরমপুরুষ ভাঙা আবাসে আর থাকবেন না।

কথায় কথায় সে বলেছিল অনেক কথা। যার সারমর্ম হল—বাবা, ওর মধ্যে কতদিন আত্মাপুরুষ বাস করলেন। দেহ তো নয় বাবা, দেহমন্দির। একদিন কত গরব করেছি, কত মেজেছি ঘষেছি, সাজিয়েছি: আজ উনি রব তুলে অহরহ বলছেন —পড়ম্-পড়ম্। তাই নিয়ে চলেছি—গঙ্গার কূলে, সাধক উদ্ধারণ দত্ত বাবার পাটে—গিয়ে বলব—নাও এইবার পড়: সামনে গঙ্গার শীতল জল, জলে প্রভুর পায়ের পরশ, মাটিতে সাধকের পদধূলি; তুমি এই পুণ্যের সঙ্গে মিশে যাও।

প্রশ্ন করেছিলাম—কিন্তু এই দেহ নিয়ে যাবে কি করে? আসছ কত দূর থেকে? এলে কেমন করে?

—চিন্তামণির দয়ায় বাবা। আসছি, তা ক্রোশ ছয় হবে। গোবিন্দ বলে বেরিয়ে পড়লাম ঝুলি কাঁধে নিয়ে, পথের ধারে এসে দাঁড়ালাম, গরুর গাড়িতে আসছি। গাড়োয়ানকে ডেকে বললাম—ধানের বস্তার ফাঁকে আমাকে একটু বসিয়ে নাও না বাবা, আমিও বস্তার সামিল। তারা তুলে নিলে। ছোট লাইনের ইস্টিশানে এসে রেলের বাবুদের বললাম—দাও না বাবা, মালগাড়িতে বোঝাই করে। বেশি ওজন হবে না। তোমাদের ইঞ্জিনে টানতে একটুও কষ্ট হবে না। তারা তুলে দিলে গাড়িতে। নামিয়ে দিলে পাঁচুন্দিতে। পাঁচুন্দি থেকে হেঁটে যাবারই বাসনা ছিল। তা উনি নারাজ। কেবল বলছেন, পড়ম্—পড়ম্—পড়ম্। পড়ব—পড়ব —পড়ব। গোটা এক দিন কোনো রকমে বুঝিয়ে-সুজিয়ে গড়াতে গড়াতে এসে এই গাছতলায় বসেছি। দেখি, গাড়ি পেলেই বলব—নে বাবা, ভাঙা মন্দিরকে বেঁধে-

ছেঁদে তুলে নে, উদ্ধারণপুরের পথে যতটা যাবি নিয়ে চল। যেখানে পথ ভাঙবি, সেইখানে দিস নামিয়ে। আবার বসে থাকব গাছতলায়—দেখব আবার গাড়ি।

অনেকক্ষণ তার কাছে বসেছিলাম। অনেক কথা বলেছিলাম। সে শুধু বলেছিল এই কথাই—জীর্ণ দেহমন্দিরখানিকে গঙ্গার পুণ্য-তীর্থময় ঘাটে বিসর্জন দিয়ে তার আত্মাপুরুষকে মুক্তি দেবে। কী আনন্দ যে তার সেই বহুরেখাঙ্কিত পাণ্ডুর মুখখানিতে দেখেছিলাম, সে ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না।

আমার পিতামহের জ্যেষ্ঠ যিনি ছিলেন, তাঁর আমলের শ্রেষ্ঠ কৃতী ব্যক্তি তিনি। তাঁর কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। তিনি ছিলেন দিলদরিয়া মেজাজের লোক। বড় উকিল ছিলেন, উপার্জন ছিল প্রচুর, ভোগীও ছিলেন তেমনি। বিবাহ করেছিলেন তিনবার। অবশ্য প্রত্যেক বারেই বিপত্নীক অবস্থাতে বিবাহ করেছিলেন। সন্তান ছিল, সে সত্ত্বেও শেষ বারে যখন বিবাহ করেন তখন তাঁর বয়স অনেক, ষাটের উপর তো বটেই, সত্তরের কাছে, হয়তো বা ঊনসত্তর। কর্তা থাকতেন সিউড়ীতে, ছেলে থাকতেন লাভপুরে—সম্পত্তি দেখতেন। তিনি বিবাহ করলেন, ভাইয়ের নিষেধ শুনলেন না, বন্ধুর নিষেধ না, কারুর না। তাঁর বিবাহের পর সিউড়ীর উকিলেরা শুনেছি ঢাক বাজিয়ে বর-কন্যাকে অভ্যর্থনা করেছিলেন। কিন্তু তাতে তিনি লজ্জিত হননি। বিচিত্র মানুষ বৃদ্ধবয়সে বিবাহ করলেন, কিন্তু পত্নীকে পাঠিয়ে দিলেন লাভপুরের সংসারে। নিজে সিউড়ীতে রইলেন প্রণয়িনীকে নিয়ে। এতে তাঁর কোনো সঙ্কোচ বা লজ্জা ছিল না। লাভপুরে আসতেন, প্রচুর মদ্যপান করে পূজাসমারোহে সত্যসত্যই নাচতেন। এক কথায়, দান করতেন টাকাপয়সা যা হাতে উঠত তাই। একবারও দেখতেন না কি দিচ্ছেন। মত্ত অবস্থায় আঙুল থেকে আংটি পড়ে গেছে, কেউ কুড়িয়ে পেয়েছে, ফেরত দিতে এসেছে, বলেছেন—উঁহু, ও আর আমার নয়, ও তোর। আমার ভাগ্য আমার আঙুল থেকে খসিয়ে নিয়ে তোর হাতে তুলে দিয়েছে। দেশের আইনে অবিশ্যি এটা আমারই, কিন্তু ভাগ্যের আইনে ওটা তোর।

বুঝতে না পারলে বলতেন, ওরে মূর্খ, ওটা তোর হল, নিয়ে যা। আমি বাবা ও-পারে গিয়েও ওকালতি করব—সেই আইনের ধারা। এ তুই বুঝবি না। তবে তুই যখন ফিরে দিতে এসেছিস তখন তার জন্যে তোর এ-পারের আইনে আরও কিছু পাওয়া হয়েছে। নে। বলে আধুলিটা বা টাকাটা তার হাতে দিয়েছেন।

আবার যে পেয়েছে কুড়িয়ে—সে-কালের সে মানুষ এমনি যে, সে ভেবে আকুল হয়েছে, হায় হায় হায়, সে এখন করবে কি? পরের সোনা কুড়িয়ে পাওয়া যে ভালো নয়! যে মালিক সে ফিরে নিলে ভাগ্য মন্দ বিধান থেকে নিষ্কৃতি পেত। মালিক নিলে না—সে এখন করে কি? যাক। এমনি মানুষ ছিলেন আমার পিতামহের জ্যেষ্ঠ। বাড়িতে শিবপ্রতিষ্ঠা করেছেন, দুর্গাপূজা এনেছেন, কালীপূজা সরস্বতীপূজা এনেছেন, নিত্য নারায়ণ সেবা প্রতিষ্ঠা করেছেন, অহঙ্কার করে বলেন, কাশী বৃন্দাবন প্রতিষ্ঠা করেছি আমি। মানুষটাকে বিচার করলে মনে হয়—প্রতিষ্ঠার আনন্দে বিভোর, তার দম্ভে দাম্ভিক।

তীর্থে যেতে বললে বলতেন—কোথায় যাব, কিসের জন্যে যাব? আমার বাড়ির দোরে সব দেবতাকে বসিয়ে রেখেছি! আমি যাব কোথায়? সত্যই দাম্ভিক লোক।

এই মানুষ জ্বরে পড়লেন। চেতনা হারালেন। কবিরাজ বললেন—এ জ্বর থেকে কর্তা উঠবেন না। যা ব্যবস্থা হয়, করুন।

গঙ্গাতীরে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হল। পাল্কি সাজল, গরুর গাড়ি সাজল। তাঁর সংজ্ঞাহীন দেহ পাল্কিতে তোলা হল। গ্রামের সকল দেবালয়ে পাল্কি নামিয়ে—সংজ্ঞাহীন মানুষটির ললাট রজবিভূষিত করা হল। পাল্কি গিয়ে থামল—আমাদের গ্রামপ্রান্তে মহাপীঠতীর্থ ফুল্লরাতলায়। এই স্থানটিই গ্রামের শেষ বিদায়স্থল। এর পর পাল্কি একেবারে গঙ্গাতীরে গিয়ে নামবে। ষোলোজন বেহারাই যথেষ্ট—কিন্তু বত্রিশজন বলশালী কাহারের ব্যবস্থা হয়েছে। ফুল্লরাদেবীর প্রাঙ্গণে পাল্কি নামল, পুরোহিত মাথায় আশীর্বাদী দিচ্ছেন—কর্তা চোখ মেললেন। চারিদিকে জনতা এবং দেবস্থলের ঘন জঙ্গল ও মন্দির প্রভৃতির দিকে তাকিয়ে নিজেকে পাল্কির মধ্যে দেখে প্রশ্ন করলেন—কোথায় এনেছে আমাকে?

ভাই এগিয়ে এলেন, বললেন—মহাদেবী ফুল্লরা মাতার স্থানে। আপনাকে জ্ঞান-গঙ্গা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

হাত বের করে ভাইয়ের মাথায় রেখে বললেন—আমি রামচন্দ্রের চেয়ে ভাগ্যবান। আমার লক্ষ্মণ আমার মহাপ্রস্থানের ব্যবস্থা করেছে, তাকে রেখে আমি আগে যাচ্ছি। আমার অন্তরের কামনা সে জানে যে। অচেতন হয়ে পড়েছিলাম—অন্তিম কামনা জানাতে পারিনি।

ভাই বললেন—পাল্কি তুলবে এইবার?

—না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। কর্ম বাকী আছে আমার।

—বলুন।

—আমাদের ঘরে ভাগ্নেরা আছেন। তাঁদের প্রাপ্য দিতে হবে। আমাদের সন্তানেরা কৃতী নয়, তারা অকৃতী কিন্তু ভোগী। তারা কখনও দেবে না।...এই সম্পত্তি তাদের দিলাম আমি।

আরও দুই-একটি ব্যবস্থার পর হেসে বললেন—বাস্।

ভাই জিজ্ঞাসা করলেন—আর কোনও আদেশ থাকে তো বলুন।

বললেন—এইবার আদেশ, পাল্কি তোল। কালী কালী বল সকলে। দু-কান ভরে শুনি। সময় বেশি আছে বলে মনে হচ্ছে না।

নিজে নাড়ী অনুভব করে বললেন—হয়তো শেষ রাত্রি পর্যন্ত।

—আপনার শ্রাদ্ধাদি সম্পর্কে—?

হাত নাড়লেন।—কোনো কামনা নেই আর, সুতরাং বক্তব্যও আর নেই আমার। এখন চল চল চল। আমার মালা দাও।

আমার পিতামহ কাশীতে গিয়ে দেহত্যাগ করেছিলেন। চুরাশি বৎসর বয়সে সপরিবারে তীর্থ-যাত্রা করলেন। চুরাশি বৎসর বয়সেও তিনি যথেষ্ট সক্ষম ছিলেন। এ-বয়সেও তাঁর চুল পাকেনি ; কালো ছিল চুল। দেহেও ছিলেন সমর্থ। যা শুনেছি,

তা বিস্ময়কর মনে হয় আজকের দিনে। পঁচাত্তর বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি সিউড়ী-তেই বাস করেছেন। শেষের চার-পাঁচ বৎসর ওকালতি করতেন না। তখন আদালতে ইংরেজির রেওয়াজ শুরু হয়েছে। ইংরেজি-জানা উকিলেরা এসে বসেছেন। বাংলা ও ফার্সীনবীসদের মানসম্মান চলে যাচ্ছে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। তিনি ওকালতি ছেড়ে ছিলেন। সে-কথা থাক। তাঁর সামর্থ্যের কথা বলি। দুর্গাপুজোয় তিনি নিজে পুজকের কর্ম করতেন। ষষ্ঠীর দিন তিনি সিউড়ী থেকে লাভপুর আসতেন। বিশ মাইল পথ, উপবাস করে তিনি পদব্রজে রওনা হতেন, সঙ্গে পাইক থাকত; এই পঁচাত্তর বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি উপবাসী থেকে পদব্রজে বিশ মাইল পথ হেঁটে লাভপুরে পৌঁছে পুনরায় স্নান করে সন্ধ্যার সময় নবপত্রিকা ও নবপল্লবের অধিবাস ও পুজাসংকল্পাদি সেরে তবে জল খেতেন। চুরাশি বৎসর বয়স পর্যন্ত দেহে রোগ বড় একটা কেউ দেখেনি। মধ্যে মধ্যে অমাবস্যা-পূর্ণিমায় বাতশিরার জ্বর হত। বাতশিরা এ-কালে বোধ হয় দুর্বোধ্য; ফাইলেরিয়ার জ্বরকে বাতশিরার জ্বর বলত। এই বয়সে তাঁর আহারও ছিল প্রচুর। দিনে খেতেন ভাতের সঙ্গে ঘি তরকারি মাছ এবং ঘরের দু-সের দুধ জ্বাল দিয়ে এক সেরে পরিণত করে চিঁড়া কলা ও চিনি দিয়ে মেখে তাই; এবং রাত্রে হালুয়া ও আধ সের ক্ষীরের মতো দুধ। এই মানুষ চুরাশি বৎসর বয়সে তীর্থভ্রমণে যাবার সময় গ্রামের প্রতি জনের কাছে বিদায় নিয়ে, তখন একজন তাঁর দিদি সম্পর্কীয়া জীবিতা ছিলেন—তাঁকে প্রণাম করে, গ্রামের প্রতি দেবালয়ে প্রণিপাত করে একটি প্রার্থনাই জানালেন যে, যে-কামনা নিয়ে তীর্থে চলেছি সে-কামনা যেন পূর্ণ হয় আমার। তীর্থস্থলে যেন আমার দেহান্ত ঘটে, আমি যেন মুক্তি পাই।

২২শে কার্তিক তিনি তীর্থযাত্রা করলেন। গয়াতীর্থ সেরে কাশীতে এসে পেঁৗছলেন—২৭শে কার্তিক। ৫ই অগ্রহায়ণ তাঁর জ্বর হল, ৬ই তারিখে সে-জ্বর ছেড়ে গেল—দেহের উত্তাপ সাড়ে ৯৫৷৷° ডিগ্রিতে নামল। ৭ই অগ্রহায়ণ তিনি দেহত্যাগ করলেন। সম্পূর্ণ সচেতন অবস্থায় দেহত্যাগ করলেন। বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা পর্যন্ত খর্ব হয়নি। তার প্রমাণ—তিনি লাভপুর থেকে রওনা হওয়ার পর তাঁর একমাত্র দৌহিত্র অকস্মাৎ মারা গেল লাভপুরে। সে সংবাদ লাভপুরের পত্রে গোপন রাখতে হয়েছিল। লেখেনইনি তাঁরা। ৬ই তারিখে এই পত্র কাশীতে এল। দীর্ঘ পত্র, নায়েব লিখেছেন, পুত্র পিতাকে সে-পত্র পড়ে শোনালেন। তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে সাড়ে ৯৫৷৷° ডিগ্রি দেহোত্তাপ নিয়ে বৃদ্ধ অর্ধশায়িত অবস্থায় পত্র শুনছিলেন, পত্র শেষ হতেই ঘাড় নেড়ে বললেন—পত্র তো ভালো বোধ হচ্ছে না বাবা।

পুত্র বললেন—কেন বাবা? সবই তো ভালো লিখেছেন নায়েব।

ক্রমশ-স্তিমিতদেহোত্তাপ বৃদ্ধ বললেন—দেখ বাবা হরিদাস, পত্রে গ্রামের লোকের সংবাদ আছে, এমন কি তোমার গরু-বাছুরের সংবাদ পর্যন্ত দিয়েছে, মামলা-মকদ্দমা বিষয়ের কথা আছে, কিন্তু হেমাঙ্গিনীর একমাত্র সন্তান ভোলার সংবাদ তো নেই!

আমার বাবা বললেন—তোমার ভাবনা একটু বেশি বাবা। ভোলার বাপের মায়ের

সংবাদ দিয়েছে, তাদের বাড়ির খবর দিয়েছে, তার কথা আর স্বতন্ত্র করে কি লিখবে?

ঘাড় নেড়ে বৃদ্ধ বললেন—সকলের সংবাদ পৃথকভাবে না লিখলে ভাবতাম না বাবা। বালক হলেও ভোলা তো বাড়ির গরু বাছুর থেকে ছোট নয়।

বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা তখনও এতখানি। পরদিন ৭ই তারিখ রাত্রি নয়টায় একবার প্রলাপ বকলেন বসে থাকতেই। প্রলাপই বলব। অন্য কথা বলছিলেন, তার মধ্যেই ডেকে উঠলেন লাভপুরের নায়েবকে।—কই হে ফুল্লরাবাবু, তুমি কেমন লোক হে? কই, আমার আহ্নিকের জায়গা কই করেছ?

ছেলে শঙ্কিত হয়ে গায়ে হাত দিয়ে বললেন—বাবা, কি বলছ? সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলেন। দেহের উত্তাপ আরও কমেছে।

বাপ আত্মস্থ হয়ে বললেন—কি বলছ?

—রাত্রিকালে আহ্নিকের জায়গা করতে বলছ কি?

—বলেছি? ও। একটু চোখ বন্ধ করে থেকে বললেন—জ্বর আসছে—শিবজ্বর।

জ্বর এল। নিজেই বললেন—আমাকে এবার তীরস্থ কর। আমার উপবীত আমার আঙুলে জড়িয়ে দাও।

কুলদাপ্রসাদবাবুও ছিলেন বিচিত্র মানুষ।

যেমন ভোগী তেমনি রসিক সুগায়ক, তেমনি সুপুরুষ ও সুন্দরভাষী। কুলদাবাবু ছিলেন বৈষ্ণবমন্ত্র উপাসক। লোকে তাঁকে ব্যঙ্গ করত। সাধারণভাবে তিনি গ্রামের লোকের প্রিয়পাত্র ছিলেন না; তাঁর সমস্ত গুণ প্রকাশের আতিশয্যে এবং বিষয়বোধের চারিত্রিক জটিলতার জন্য অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। কীর্তন শুনতে বসে তিনি কাঁদতেন; মধ্যে মধ্যে 'ওহো ওহো' বলে ভাবাতিশয্য প্রকাশ করতেন; বহু লোকের কাছে তা হাস্যকর মনে হত। এর মধ্যে আতিশয্য ছিল, কিন্তু কপটতা ছিল না। নিমন্ত্রণ-বাড়িতে যেতেন, সেখানে বলতেন—দেখ, দইয়ের মাথাটা আন দেখি। আর তেলুক দেখে মাছ। তাঁর ভোগবিলাসে কুণ্ঠা ছিল না। জীবনের শেষ কাল পর্যন্ত দেখেছি ভোগের প্রতি অনুরাগ। পরিপাটী কোঁচানো কাপড়, শক্তকফ শার্ট, চকচকে জুতো, ঝকঝকে মাজা একটি গাড়ু, তার উপর ভাঁজকরা পরিষ্কার গামছা, চকচকে গড়গড়া, চমৎকার সটকার নল, একখানি সুন্দর কম্বল, একটি ঝালর-দেওয়া পাখা। একটি বাক্স—এই আয়োজন থেকে কুলদাবাবুকে পৃথক করা যায় না। তাঁকে মনে পড়লেই এগুলি মনে পড়বে। লোকে অন্য অপবাদও দিত। তা হয়তো সত্যিই। কিন্তু সে-কালে এই দোষ থেকে মুক্ত মানুষের সংখ্যা খুব কম ছিল। আমার বাবার ডায়রিতে পাই, তিনি আক্ষেপ করে লিখেছেন—"লাভপুরে আসিয়া—লোকের সংসর্গে আসিয়া অল্পবয়সেই মদ্যপানে অভ্যস্ত হইলাম, বেশ্যাসক্তি জন্মিল।" আমার মায়ের পদার্পণের পর তিনি এ গ্লানি থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। মদ্যপান ছিল, কিন্তু সে ছিল তান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংযত পরমাণে পান। থাক।

কুলদাবাবুর বিষয়াসক্তিও ছিল প্রবল এবং জটিল। মামলা-মকদ্দমা অনেক

করেছেন, করতে বাধ্যও হয়েছেন। কিন্তু এই মানুষটির মধ্যে আমি এক চিরকালের সম্ভ্রমের মানুষকে দেখেছি। এমন মিষ্ট ভাষা আর এমন সহ্যগুণ সংসারে বিরল। একবারের ঘটনা চোখের উপর ভাসছে। বৃদ্ধ বসে আছেন দুর্গাপূজা-মণ্ডপে। কম্বল বাক্স গড়গড়া গামছা পাখা নিয়ে আসর জমিয়ে নবমী-পূজার ব্যবস্থা করছেন। বহু সরিকের পূজা, অনেক কালের পূজা ; সরকার-বাড়ির পূজায় দৌহিত্র উত্তরাধিকারী হিসাবে কয়েকজন বাঁড়ুজ্জে মুখুজ্জেও সরিক। নবমী-পূজার দিন সরকার-বাড়ির পূজাস্থানে বলি হয় অনেক, প্রায় ষাটটি। এই বলির পর্যায় বাঁধা আছে। এ পর্যায় বংশের সম্মান হিসাবেই নির্দিষ্ট। সে-বার এক প্রবীণ দৌহিত্র সরিকের তিরোধান হয়েছে। এই দৌহিত্রের বলি ছিল প্রথম বলি ; দৌহিত্র নিঃসন্তান, তাঁর উত্তরাধিকারী হয়েছেন তাঁর ভাগিনেয়। ভদ্রলোক শিক্ষিত, গ্রাজুয়েট, কৃতী ব্যবসায়ী, সংস্কৃতিবান, আধুনিক। কুলদাবাবু ব্যবস্থা করলেন—এবার প্রথম দেওয়া হবে প্রবীণতম সরিকের বলি। কথাটা গোপন ছিল না। প্রথমেই এ নিয়ে বাদানুবাদ করে মীমাংসায় উপনীত হলে ঘটনাটি ঘটতে পেত না। কিন্তু দৌহিত্রের উত্তরাধিকারী এ নিয়ে কোনো কথা বললেন না। তাঁর অজুহাত, তাঁকে তো জানানো হয়নি। তবে তিনি ব্যবস্থা সবই করলেন। ঠিক বলির সময় তাঁর ভাগিনেয় ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং প্রচণ্ড প্রতিবাদ তুললে। কুলদাবাবুর ব্যবস্থা নাকচ করে দিয়ে নিজেদের বলিই হাড়িকাঠে ফেললে। সেই বলিই প্রথম বলি হল। গণ্ডগোলটা বলির সময় স্থগিত থাকল চাপা আগুনের মতো। বলি শেষ হওয়ার পর জ্বলে উঠল।

দৌহিত্রের উত্তরাধিকারী আত্মস্থ ছিলেন না। ইচ্ছাপূর্বকই ছিলেন না। চক্ষু-লজ্জাকে অতিক্রম করার জন্যই ছিলেন না। তিনি এসে আক্রমণ করলেন বৃদ্ধকে, মৌখিক আক্রমণ। মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। তিনি তখন যেন উন্মত্ত। বাক্যপ্রয়োগে শীলতা তো অতিক্রম প্রথম থেকেই করেছিল, কয়েক ক্ষেত্রে শ্লীলতাও অতিক্রান্ত হল। জনতা থমথম করছে। স্তব্ধ। বৃদ্ধ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে নির্বাক হয়ে শুনে যাচ্ছেন আর তামাক টানছেন। তাঁর চারিপাশে তাঁর তিন পুত্র, চার ভ্রাতুষ্পুত্র—সাতজন। এদের মধ্যে বড় ছেলে কৃতী, কয়লাব্যবসায়ী, দেহেও শক্তিশালী। ভ্রাতুষ্পুত্রদের একজন বড় পুলিশ কর্মচারী, শুরবীর চেহারা। অন্য তিন ভ্রাতুষ্পুত্র শুধু শক্তিশালীই নয়, রোষ-বর্বরতার অখ্যাতিতে কুখ্যাত। আর প্রতিপক্ষেরা স্বজন-শক্তিতে মাত্র দুজন। হয়তো কুলদাবাবু বহু স্বজনের রোষভাজন ছিলেন, কিন্তু সে-দিন বিবাদ যা দাঁড়িয়েছিল তাতে সমগ্র সরকারবংশের এক হওয়ারই কথা। শুধু মাত্র কোনো এক-জনের প্রথম সক্রিয় প্রতিবাদ শুরুর অপেক্ষা। ওই মানুষটি মুখে প্রতিবাদ শুরু করলেই তা হবে। তাঁর মুখ খোলার অপেক্ষা। কিন্তু আশ্চর্য! দৌহিত্র-বংশের উত্তরাধিকারী প্রতিবাদ না পেয়ে অধিকতর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছেন, গালাগালি অভি-সম্পাত করেই চলেছেন, তবু এ মানুষটি নির্বাক, স্থিরদৃষ্টি, স্থির হয়ে বসে আছেন। শেষে তাঁর বড় ছেলের আর সহ্য হল না। তিনি বাপের পাশেই বসে ছিলেন, অধীর হয়ে বলে উঠলেন—মুখ সামলে কথা বলবে।

বারেকের জন্য বৃদ্ধ জ্বলে উঠলেন—আমি বলব—জ্যোতিষ্মানের মতো জ্বলে

উঠে তিনি যেন গৃহদাহী বহ্নিকে নির্বাপিত করে দিলেন। কমপক্ষে পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়স্ক পুত্রের মাথায় তিনি সর্বসমক্ষে চড় মেরে বসিয়ে দিয়ে হেঁকে উঠলেন —খবরদার! চারিদিকে আসন্ন বিস্ফোরণ মুহূর্তে স্তব্ধ ক্ষান্ত হয়ে গেল। এমন কি দৌহিত্রের উত্তরাধিকারীও স্তব্ধ হয়ে গেলেন। আজও আমার চোখের উপর ভাসছে, আমি দেখছি সেই মুহূর্তের ছবি, মানুষের মুখে-চোখে পশু তার হিংস্র রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে—সে হিংস্র চিৎকার করতে উদ্যত হয়ে বিমূঢ় হয়ে গেল। আমার মনে হল, একটা প্রহেলিকা খেলে যাচ্ছে। তার অর্থ কি উপলব্ধি করতে পারছি না। স্তব্ধ নাটমণ্ডপে তিনি বলে গেলেন তাঁর বাক্যগুলি, আমার মনের আকাশে বাতাসে এখনও প্রতিধ্বনিত হচ্ছে—সেই প্রতিধ্বনির ধ্বনিই আমি আজ লিখে চলেছি। তিনি বলে গেলেন—ওরে মূর্খ বর্বর, তুই কাকে কি বলছিস? কার উপর হাত তুলতে চলেছিস? জানিস ও কে?

অবাক্ হয়ে জনতা শুনে গেল।

—জানিস ও কে? ও হল—এর ভাগ্নে।—এর দৌহিত্র। (মায়ের নাম করে)—এর বেটা। ওরে মূর্খ, ও যখন শিশু ছিল তখন ওকে বুকে নিলে ও যদি আমার বুকে বিষ্ঠা ত্যাগ করে দিত, তবে কি আমি তাকে ফেলে দিতাম? ও আজ বড় হয়েছে দেখছিস কিন্তু আমি যে বুড়ো হয়েছি হতভাগা; তোদের চোখ নেই, তোরা অন্ধ। তাই তোরা দেখতে পাস না, ও আমার কাছে তাই আছে। বলুক, ওর যা খুশি ও বলুক। আমার ওপর রাগ করবে না তো করবে কার ওপর?

চারিদিকে দেখলাম মানুষের চেহারা পাল্টে গেছে, পশু কোথায় মিলিয়ে গেছে। মানুষের মুখে প্রসন্নতা, চোখে জল।

একবার নয়, বার বার দেখেছি এমন সহ্যগুণ।

এক ধনীর বাড়িতে মাতৃবিয়োগের পরই তিনি তত্ত্ব করতে এসেছেন। ধনী আধুনিক—বহুকীর্তিমানের উত্তরাধিকারী। আশ্চর্যের কথা, তবুও তিনি আত্মীয়তা-কামী এই বৃদ্ধ আগন্তুককে হেয় প্রতিপন্ন করবার জন্য আক্রমণ শুরু করলেন। নাতি-ঠাকুরদার সম্পর্কের সুযোগ নিয়ে রহস্যের মধ্য দিয়ে কুটিল আক্রমণ। চরিত্র, লোভ, হীনতা, দৈন্য ইত্যাদি নিয়ে আক্রমণ। বৃদ্ধ প্রসন্ন হাসি হাসতে শুরু করলেন। অমৃতং বালভাষিতং। সত্য বলতে, আমি মনে করি, বৃদ্ধের সে বোধ মিথ্যা বা কপট ছিল না।

তিনি গঙ্গাতীরে গিয়ে স্বজনপরিবৃত হয়ে দেহ রেখেছিলেন।

কুলদাবাবুর এক পূর্বপুরুষের কথা না বলে পারছি না।

তিনি গ্রামেরই কুটুম্বের কাছে ঋণ করেছিলেন। দলিল-দস্তাবেজ ছিল-কি-ছিল না, সে-কথা বাহুল্য। মৃত্যুকালে তিনি কুটুম্বকে ডেকে বললেন—ঋণদায় নিয়ে মরণে আমার তৃপ্তি হচ্ছে না, শান্তি পাচ্ছি না আমি। আমার নগদ টাকা এখন নাই। আপনি এই ভূমি-সম্পত্তি নিয়ে আমাকে নিষ্কৃতি দিন। আমি তৃপ্তি পাই, শান্তি পাই।

কুটুম্ব বললেন—তাই হল।

সানন্দে মৃত্যুপথযাত্রী বললেন—দলিল, একটা দলিল কর।

কুটুম্ব বললেন—গ্রহীতার নাম এই—। আমার নামের পরিবর্তে ওই নামে হবে। সে নাম কুটুম্বের ভাগিনেয় বা ভাগিনেয়-বধূর নাম। মৃত্যুপথযাত্রীর জামাতা অথবা কন্যা।

মৃত্যুপথযাত্রীর চোখ দিয়ে জল গড়াল। মুখে তিনি নামগান শুরু করলেন। মুছে ফেললেন সকল পার্থিব ভাবনা।

ছেলেবেলায়, তখন আমার বয়স সাত-আট বৎসর, সেই সময় প্রথম দেখেছিলাম—আমাদের গ্রামের বিষ্ণু মুখুজ্জে মহাশয়কে ঠিক এমনি কামনা নিয়ে কাশী যেতে। খোল করতাল বাজিয়ে গ্রামের— গ্রামের কেন—আশপাশের গ্রামের লোকদের প্রণাম নিয়ে, গ্রামের দেবতাদের প্রণাম করে—কাশী গিয়েছিলেন দেহত্যাগ করতে।

আমাদের গ্রামের হিরণ্যভূষণবাবুর মা গিয়েছিলেন গঙ্গাতীর।

আমাদের আশেপাশের গ্রামের অনেকে এমন যাওয়া গিয়েছেন শুনেছি।

এই সব কথা আজ যখন মনে ভাবি, তখন মনে হয়, সে-কালের সবই আবর্জনা ছিল না। আবর্জনা-স্তূপের মধ্যে খানিকটা কিছু ছিল।

আর-একটা জিনিস ছিল।

সে-কালের এই ধর্মাশ্রয়ী মানুষদের ভাষা ছিল বড় মধুর, বড় মিষ্ট। তেমনি ছিল ধৈর্য, সহনশীলতা। আজকের দিনের ভাষা সে-দিনের ভাষার তুলনায় অনেক উন্নত—দীপ্তিতে তীক্ষ্ণতায় ব্যঞ্জনা-মহিমায় প্রকাশ-শক্তিতে অপরূপ, মনের মধ্যে দাগ কেটে বসে যায়, ক্ষেত্রবিশেষে বীণার সপ্ততারে ঝঙ্কার তোলে ; কিন্তু মিষ্টতায় সে-দিনের ভাষা ছিল বড় মধুর।

এই দুটি বস্তু আজ মনে হয় আমরা হারিয়েছি। অন্যথায় সে-কালের অবস্থার ঐতিহাসিক দোহাই পেড়েও আর কোনো মানসিক অবস্থাতেই সমর্থন করতে পারি না। মিথ্যার জঞ্জাল সেদিন আমাদের সমস্ত জীবনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। এই জঞ্জাল অপসারণের ঢেউ তখন বাংলাদেশের প্রাণকেন্দ্র কলকাতায় উঠেছে, কিন্তু আমাদের গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছায়নি। বন্যার প্রথমেই যেমন ঢেউয়ের আগে ভেসে আসে রাশিকৃত ফেনা আর নদীর উৎসমূলের খড়-কুটা আবর্জনা, তেমনি নবজীবনের শক্তির সঞ্চারের আগে এসে লাগল ফ্যাশন। গোড়াতেই বলেছি, ভৃঙ্গারে ভরে মৃত-সঞ্জীবনী অমৃতধারা আসেনি, এসেছিল কেস-বন্দী স্কটল্যাণ্ডের তৈরি স্কচ হুইস্কি। সে-কালের হুইস্কির বোতল আমাদের বাড়িতেও আমি দেখেছি। আমার বাবা ছিলেন তন্ত্রোপাসক, বাড়িতে কালী ও তারা এই দুই মহাবিদ্যার পূজা ছিল। তারাপূজায় কারণের ঘট স্থাপন করতে হয়। কারণের ভোগ হয়। মা-তারাকে উপাদেয়তর দুর্লভ সামগ্রী হিসাবে স্কচ হুইস্কির ভোগও দেওয়া হয়েছিল বোধ হয়। বোতলের গায়ের নাম দেখেছি—H. M. S.; ওটাই নাকি চলতি বেশি ছিল

সেকালে। এ বিষয়ে আমার একটা কথা মনে হয়—হুইস্কির নামটা সার্থক ছিল। ইংলণ্ডের রাজার রাজকীয় কর্মসাধনের জন্যই ওটা ঢুকেছিল। শিক্ষার আগে এল ফ্যাশন। জুতোয় জামায়, ম্যান্‌চেস্টারের রেলি-ব্রাদার্সের ধুতিতে শাড়িতে, নূতন কালের চুল ছাঁটায়, কথায়-বার্তায় ঢঙে-ধারায়-ধরনে সে এক ফ্যান্সি ফেয়ার এসে বসে গেল দেশের মধ্যে।

পূর্বেই বলেছি, আমার চুল মানত্ ছিল বাবা বৈদ্যনাথের কাছে। সেই চুল মানত্ দিতে গেলাম আমি বিচিত্র পোশাকে, সার্জের সুট পরে মাথায় বেড়া বিনুনি বেঁধে, তার উপর একটা নাইট ক্যাপের মতো টুপি এঁটে। সেদিনের কথা আজ মনে পড়ছে। চুল বেঁধে সুট পরে টুপি মাথায় দিয়ে বেশ গৌরব অনুভব করেছিলাম ; একটি শিশুর আধুনিকত্বের গৌরবে যতখানি স্ফীত হওয়া সম্ভবপর তা সেদিন হয়েছিলাম আমি।

আমার চুল হয়তো আরও কিছুদিন থাকত। হয়তো বৈদ্যনাথের মতো পৈতের সময় পর্যন্ত চুল আমাকে বাঁধতে হত, কিন্তু পর পর মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেল। এই উত্থান-পতনের দ্বন্দ্বে বাবা আমার মুহ্যমান হয়ে পড়ে বৈদ্যনাথের কাছে মর্ম-বেদনা নিবেদন করতে ছুটে গেলেন।

একটা ঘটনা ঘটল, যা আজ বিচিত্র মনে হবে।

গ্রামের নব-অভ্যুদিত ধনী হাই ইংলিশ ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, ইস্কুলের সভাপতি ছিলেন জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট, ম্যানেজিং কমিটিতে গ্রামের প্রধানদের নেওয়া হয়েছিল। আমার বাবাও ছিলেন ম্যানেজিং কমিটির সভ্য। স্কুলের থার্ড মাস্টার ছিলেন স্পষ্টভাষী এবং একটু বিচিত্র ধরনের মানুষ। তাঁর ওই স্পষ্টভাষিতার অপ-রাধে একদা তিনি অকস্মাৎ অপসারিত হলেন। করলেন—হেডমাস্টার এবং সেক্রেটারি। ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদনসাপেক্ষও রাখলেন না ব্যাপারটা। এক কথায় বাড়ির মালিকের মতো জবাব দিয়ে দিলেন। সেক্রেটারি ছিলেন ইস্কুল-প্রতিষ্ঠাতা নিজে : ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদন সহজলভ্য ছিল। তাঁদের অনুগামী সভ্যের সংখ্যাই বেশি, তবুও অধীরতার তাড়নায় তাঁরা অপেক্ষা করলেন না। এরই প্রতিবাদে বাবা এবং আরও দুইজন কমিটিতে যাওয়া বন্ধ করলেন। হয়তো কেন নিশ্চয়ই এটা তাঁদের দিক থেকে প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্বের একটা রূপান্তরিত প্রকাশ। অন্য দিকে ইস্কুল প্রতিষ্ঠাতা তাঁর দিক থেকে বিচার করে অন্যায় দেখতেও পেলেন না, স্বীকারও করলেন না। এবং তিনি গ্রাহ্য করলেন না—এঁদের অসহযোগিতা। এর পর স্কুলে প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন উপলক্ষে এলেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব, তাঁর নাম ছিল—এস্. সি. মুখার্জী, আই. সি. এস্.। সে-সভাতেও এঁরা গেলেন না—প্রতিবাদ জানাবার জন্যই গেলেন না। অনুপস্থিতির অভিযোগ সাহেবের কানে উঠল। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ এক আত্মীয়, এবং তিনি সাহেবকে বুঝিয়ে দিলেন যে, গ্রামের এই তিন প্রধান—এই সভায় অনুপস্থিত হয়ে কেবলমাত্র ইস্কুল-প্রতিষ্ঠাতাকেই অপমানিত করেননি, রাজপ্রতিনিধিরও অসম্মান করেছেন। তখন ম্যাজিস্ট্রেট, এস্. ডি. ও., এস্. পি. এলে স্থানীয় জমিদারের ডাক-বাংলোয় সেলাম দিতে যেতে হত। সে-কালের

আই. সি. এস. ম্যাজিস্ট্রেটের কথাটা মনে নিলেন। তিনি সদরে ফিরে গিয়ে—দারোগা মারফৎ হুকুমনামা পাঠালেন। এই তিনজন জমিদারকে এই অপরাধের জন্য ইস্কুল-প্রতিষ্ঠাতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে স্থানীয় সেটেলমেণ্ট ডেপুটির সম্মুখে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক। 'দিল্লীশ্বরো-বা জগদীশ্বরো-বা' কথাটায় যদি কারও সন্দেহ ছিল মুসলমান আমলে, ইংরেজ আমলে 'ইংলণ্ডেশ্বরো-বা জগদীশ্বরো-বা' ঐ কথাটায় কারও তখন সন্দেহ ছিল না। বুয়োর যুদ্ধ এবং রুশ-জাপান যুদ্ধ তখন শেষ হয়েছে, এঁরা প্রত্যেকেই সাপ্তাহিক 'বঙ্গবাসী' 'হিতবাদী' মনোযোগ দিয়ে পড়েছেন, তৃপ্তি পেয়েছেন, তবুও ইংরাজের সম্পর্কে মনোভাব টলেনি। কাজেই দোর্দণ্ডপ্রতাপ ইংলণ্ডেশ্বরের প্রতিনিধির এ আদেশ অমান্য করতে তাঁদের সাহস হল না। তাঁরা প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইলেন। ক্ষমা চাইলেন, কিন্তু মনে হল এর চেয়ে মৃত্যুও ভালো ছিল।

সঙ্গে সঙ্গে ঘটল দ্বিতীয় ঘটনা। এই নব-অভ্যুদিত ধনী কিনলেন মুসলমান-নবাববংশীয় জমিদারের কাছে একটি জমিদারি। ব্যাপারটা একটু জটিল। সংক্ষেপে বলি। আমাদের গ্রামের জমিদারির অংশীদার সকলেই, কিন্তু দক্ষিণপাড়া—যে-পাড়ায় আমাদের বাস—সে-পাড়াটি ছিল মুরশিদাবাদের এক মুসলমান জমিদারের। উচ্চ মূল্য দিয়ে এই দক্ষিণপাড়ার জমিদারি কিনলেন। এবং নিজে অর্থ ব্যয় করে আনলেন গভর্নমেণ্ট সেটেলমেণ্ট। প্রমাণ করতে চাইলেন—গ্রামের প্রধানদের বাড়িগুলি, যা তাঁরা এতকাল মুসলমান জমিদারের আমলে ব্রহ্মত্র বা লাখরাজ হিসাবে ভোগ করে প্রজা হয়েও প্রজা-না-হওয়ার সুবিধা পেয়ে আসছেন—সে সুবিধা তাঁরা পেতে পারেন না, ব্রহ্মত্র-লাখরাজ মিথ্যা। তাঁর এই অনুমান পুরাপুরি সত্য না হলেও অনেকটাই সত্য ছিল। আমাদের দেশের সেটেলমেণ্টে এক রকম নূতন লাখরাজের সৃষ্টি হয়েছে, যার নাম—ভোগদখলসূত্রে নিষ্কর লাখরাজ। সূত্রটা যেখানে খাজনা না দিয়ে ভোগদখলের, সেখানে দখলটা জবরদখল। প্রাচীন মুসলমান জমিদার বর্ধিষ্ণু হিন্দুদের এই জবরদখল সহ্য করেছিলেন। এরা বর্ধিষ্ণু এবং ব্রাহ্মণ, এই ছিল সহনশীলতার কারণ। কিন্তু নূতন জমিদার সেটা সহ্য করতে চাইলেন না। লাখরাজ যেখানে সত্য নয়, সেখানে কর দিয়ে তাঁকে জমিদার স্বীকার করে তাঁদের প্রজা হতে হবে। যে সেটেলমেণ্ট ডেপুটির সামনে তাঁদের ক্ষমা চাইতে হয়েছিল, সেই সেটেলমেণ্ট ডেপুটি এই উপলক্ষেই তখন লাভপুরে ছিলেন। একদা দেখা গেল—সেটেলমেণ্টের চেন থাক্ নক্সার দাগে দাগে যেতে গিয়ে আমাদের কয়েক বাড়ির অন্দরে গিয়ে প্রবেশ করেছে। তার পিছনে পিছনে আমিন কানুনগো, সেটেলমেণ্টের টেবিল ঘাড়ে নিয়ে কুলি, থাক্-নক্শা বগলে জমিদারের কর্মচারী এবং আরও অনেকে। অন্দরের উঠান ছিল বাঁধানো, সেখানে পায়ের ছাপ বা জুতোর দাগ পড়ার কথা নয়, কিন্তু মালিকদের অন্তস্তল দলিত হয়ে গেল।

আরও একটি ঘটনা ঘটল। এর সঙ্গে গ্রামের কোনো লোকের সংস্রব ছিল না। আমাদের একটি বড় মামলায় পরাজয় হল। একটি ন্যায্য সম্পত্তির অধিকার থেকে আমরা বিচ্যুত হলাম।

এই তিনটি ঘটনার আঘাতে আমার বাবা মুহ্যমান হয়ে আশ্রয় সন্ধানে ছুটে গেলেন বৈদ্যনাথধামে। দেবতার পায়ে গড়িয়ে পড়বেন। বলবেন—তুমি তোমার শক্তি প্রয়োগে এর প্রতিকার কর। মানত্ করবেন। শুধু তাই নয়, আমার পিসিমা ধর্না দেবেন সেখানে। সপরিবারে বৈদ্যনাথ গেলাম। বৈদ্যনাথের মন্দিরপ্রাঙ্গণ, মন্দিরের ধ্বজা আজও আমার চোখের উপর ভাসছে। এর পর আরও কয়েকবার দেওঘর গিয়েছি, এই গতবার ১৩৫৫ সালেও গিয়েছি—কিন্তু সে ছবির সঙ্গে মেলে না। সে মন্দির এত উঁচু, এত শুভ্র যে, মনে হয় আকাশের গায়ে সাদা মেঘের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল।

আমার মাথার চুলের লজ্জা বৈদ্যনাথের পাথর-বাঁধানো অঙ্গনে উজাড় করে দিয়ে সেই দিন সেইখানে নিলাম হাতেখড়ি। মনে হচ্ছে বাংলা এবং দেবনাগরী দুই অক্ষরেই খড়ি বুলিয়েছিলাম। যে পাথরখানির উপর খড়ি বুলিয়েছিলাম, সেই পাথরখানিকে বের করবার জন্য (এবারে ১৩৫৫ সালে) কত যে মনে মনে সন্ধান করেছি! যে-দিন গিয়েছি মন্দিরে, সেই দিনই বৈদ্যনাথের পূর্ব দরজার সামনে দাঁড়িয়ে শুধু খুঁজেছি খুঁজেছি খুঁজেছি। স্ত্রী কন্যা পুত্র জিজ্ঞাসা করেছেন, কি? এমন করে কি দেখছেন?

উত্তর দিইনি। হেসেছি। সম্ভবত লজ্জা অনুভব করেছি।

সে-কথা থাক।

বাবা কেঁদেছিলেন দেওঘরে। স্পষ্ট মনে পড়ছে, রাত্রে শোবার সময় বিছানায় বসে বেশ স্ফুটকণ্ঠেই প্রার্থনা করেছিলেন মনে আছে—রাজার হুকুমে এই অপমান, এর প্রতিকার তুমি ভিন্ন আর কে করতে পারে? হে দেবাদিদেব! হে আশুতোষ!

আমার চোখেও জল এসেছিল। তারই প্রভাব আমার জীবনে কাজ করেছে। রাজার বিরুদ্ধে যে দেশব্যাপী বিদ্রোহী মনোভাব এইভাবে সৃষ্টি হল তার সঙ্গে অন্তরের যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই। প্রাণে প্রাণে অনুভব করেছি, এরই মধ্যে হবে আমার জীবনের সার্থকতম বিকাশ।

অপর প্রভাব এই দেবভক্তিই বলি, আধ্যাত্মিকতাই বলি, নীতিবাদই বলি তার প্রভাব। একটি গভীর অজ্ঞাত অনুশাসন আমি অনুভব করি; মানব-হৃদয়ের এই অনুশাসনের একটি বেদনাময় আকুতি আমার আছে। এ দুর্বলতা হলে আমি দুর্বল। পরাজয় হলে আমি পরাজিত।

সে-কালকে যতই চেষ্টা করছি প্রকাশ করতে, ততই যেন মনে হচ্ছে ঠিক প্রকাশ করা হল না। প্রথমেই বলেছি, ছোট ছোট জমিদারপ্রধান একটি অঞ্চল, সে অঞ্চলে অকস্মাৎ অভ্যুদয় হল এক লক্ষপতি ব্যবসায়ীর, তাঁর সঙ্গে প্রাধান্য নিয়ে সংঘর্ষ বাধল আমাদের অঞ্চলে। জমিদার-শ্রেণী যতই বিব্রত বিপন্ন হলেন, ততই তাঁরা ভগবানকে ডাকতে শুরু করলেন। ভগবানের তখন বহু মূর্তি। দেবতা তেত্রিশ কোটী, সুতরাং রূপ তাঁর তেত্রিশ কোটীই। ওর মধ্যে কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে দেখা যাবে—মূর্তি ছিল আসলে দুটি। শক্তিমূর্তি আর বিষ্ণুমূর্তি। মোটা-মুটিই ধরা যাক আর অতিসূক্ষ্মভাবেই বিচার করা যাক—ধর্মজীবনে ছিল দুটি

পথ বা মত—শাক্ত ও বৈষ্ণব। যুগল বিগ্রহ অর্থাৎ রাধাগোবিন্দ, বাসুদেব, গোপাল, নাড়ু-গোপাল, শালগ্রামশিলা, গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ—এই ছিলেন বৈষ্ণবদের দেবতা। তা ছাড়া দুর্গা থেকে শুরু করে মনসা ওলাইচণ্ডী পর্যন্ত সবাই ছিলেন শাক্ত-তনখাভোগী ; শিব ঠাকুর থেকে শুরু করে পুরুষ দেবতারাও ওই শাক্ত মতের পথের পাশে বাসা গেড়েছিলেন। গাজনে শিব ঠাকুর উঠতেন, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে ধর্মরাজ, ভাদ্রে ইন্দ্রদেবতা বিশ্বকর্মা—এঁদের সকলের পুজোতেই পাঁঠা-বলির ব্যবস্থা ছিল। ছিল কেন, আজও আছে। সুতরাং ওঁরা শাক্তের দলে। তবে মা লক্ষ্মী এবং মা সরস্বতী এঁরা দুজন সবারই পূজ্য এবং এঁরা বৈষ্ণবদের দলে, ওঁদের কথা উঠলেই আজও মনে হয়—নারায়ণ বসে আছেন মাঝখানে, দু-পাশে তাঁর দুই প্রিয়তমা—লক্ষ্মী আর সরস্বতী। অদৃষ্ট পরিবর্তনের কামনায় মানতের পরিমাণ বাড়তে শুরু করল এক দিকে, অন্য দিকে যাঁর অভ্যুত্থান হচ্ছে তিনি বাড়াতে লাগলেন সমারোহ।

দেশেও তখন প্রাচুর্য ছিল।

ক্ষেত্র ছিল উর্বর, বর্ষাও তখন এখন থেকে প্রবল ছিল, মাঠে পুকুরগুলিও তখন এখনকার মতো এমনভাবে মাঠের সমান হয়ে মজে যায়নি, ফসল যথেষ্ট হত। ধান কলাই গম আখ সরষে আলু—এ প্রায় প্রত্যেক সম্পন্ন গৃহস্থের ক্ষেতে জন্মাত। গোয়ালে ভালো ভালো গাই ছিল, দুধও হত প্রচুর, পুকুরে বড় বড় মাছ থাকত, অভাব দেশে ছিল না ; অল্প চার-পাঁচ হাজার টাকা আয়ে রাজার হালে চলে যেত। আমার নিজের যখন বারো-চোদ্দো বছর বয়স তখনকার হাট-খরচা আমার মনে আছে—সপ্তাহে দু'দিন হাটে তরকারির খরচা ছিল—ছ আনা হিসেবে বারো আনা। প্রথম মহাযুদ্ধের পর খরচাটা বাড়ল—বারো আনা থেকে আঠারো আনা পাঁচ সিকিতে পেঁছিল। আমাদের বাড়ির মুদীর দোকানের খরচ ছিল বছরে একশো টাকা। কোনো বছর দশ টাকা কম—কোনো বার পাঁচ টাকা। বছরে দু-বার কাপড় কেনার ব্যবস্থা ছিল—আশ্বিনের পুজোর সময় এবং বছরের শেষই বলুন আর পরের বছরের প্রারম্ভের আয়োজনেই বলুন, চৈত্র মাসে আর এক দফা কাপড় আসত। পুজোর সময়—শান্তিপুরে ফরাসডাঙার পোশাকী কাপড় থেকে শুরু করে, গুরু পুরোহিত পূজক দেবপূজার কাপড়, বাড়ির মুদী মোদক জেলে মুড়িভাজুনী মেথর চাকর-বাকর—এসব নিয়ে পাহাড়প্রমাণ কাপড় (তাই বলত লোকে) কেনা হত দোকান থেকে, ফর্দ আসত সত্তর পঁচাত্তর আশি। পাঁচশো টাকা ঋণ হলে গহস্থ ভাবত, ঋণে সে আকণ্ঠ ডুবে গেছে। চাকরের মাইনে ছিল দেড় টাকা, কাপড় কোঁচানো থেকে সকল রকম তরিবত জানা খানসামার মাইনে আড়াই টাকা, মেয়ে-রাঁধুনী থাকত দু-টাকা আড়াই টাকায়, পুরুষ-রাঁধুনীর বেতন সাড়ে-তিন টাকার বেশি ছিল না। পশ্চিমা দারোয়ানেরা শুখো সাত টাকা মাইনে পেলে বলত—দরকার হলে জান ডাল্ দেগা। বাউরী প্রভৃতি জাতীয় যারা গো-সেবা প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত থাকত, তাদের ছোটরা থাকত পেট-ভাতায়, আর বড়দের মাইনে ছিল বছরে ছ-টাকা থেকে নয় টাকা পর্যন্ত।

কাজেই সংসার চালিয়েও মানত্ দিতে খুব বেগ পেতে হত না। দোষ তাঁদের

নেই। আবহাওয়াই ছিল তখন এই। ভাগ্য আর অদৃষ্ট ছাড়া পথ ছিল না। দেবতারা ছিলেন ভাগ্যের কাণ্ডারী। সকাল থেকে বাউল বৈষ্ণব আসতেন ভিক্ষে করতে। খঞ্জনি একতারা বাজিয়ে গান গাইতেন। পদাবলীর গায়কও দু-চারজন ছিলেন। শাক্ত সন্ন্যাসীও আসতেন। প্রচণ্ড জোরে হাঁক মারতেন—চে—ৎ চণ্ডী! কালী কপালী নরমুণ্ডমালী, বন্ধন কাট মা, বন্ধন কাট। মুসলমান ফকির আসতেন, বয়েৎ আওড়াতেন, তাঁদের কারও কারও হাতে চামড়ার আবরণীর উপর শিক্রে পাখি (বাজ পাখিরই একটি ছোট জাত) থাকত, কেউ কেউ গান গাইতেন—দেশি হাতে তৈরি সারেঙ্গী জাতের যন্ত্র বাজিয়ে। প্রায় সব গানই ছিল গোপাল-হারা মা যশোদার বেদনার গান। কেউ কেউ দেহতত্ত্বের গান গাইতেন—

"এই দেহে কিবা ফল—পদ্মপত্রে জল—
এ দেহের মিছে গৌরব করিস মন!"

কেউ কেউ পীরমঙ্গল গাইতেন। অঞ্চলে যত পীর আছেন, হিন্দুর জাগ্রত দেবতা আছেন, সবাই ছিলেন পীর, সকলের মহিমাই কীর্তন করতেন তাঁরা। সে কি হিন্দুর দোরে, কি মুসলমানের দোরে, তাঁরা ওই গানই গেয়ে যেতেন—সকলেই ভক্তিপুলকিত চিত্তে শুনত।

"পীর বড় ধনী রে ভাই—ঠাকুর বড় ধনী—
পীর গাজী—মুশকিল আসান কর, পীর গাজী—!
তোমার গোপাল দুগ্ধ খাবেন জন্ম যাবে সুখে—
দুঃখ তোমার দূরে যাবে—অন্ন দিয়ো ভুখে।
পীরের ঘোড়া পীরের জোড়া পীরকে কর দান,
বাত ব্যাধি হইতে মাগো পাইবে পরিত্রাণ।"

মস্ত বড় গান। আজও মনে আছে আমার। আরও মধ্যে মধ্যে আসত 'গরুমারা'। অর্থাৎ গো-বধ করে প্রায়শ্চিত্তকারী ভিক্ষুক। আমার মনের মধ্যে আজও ছাপ কেটে রয়েছে প্রথম 'গরুমারা'র ছবি। গরমের সময় স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে আমাদের ভাঁড়ার-ঘরের দাওয়ার উপর তেঁতুল থেকে বীচি ছাড়িয়ে ফেলা হচ্ছে। মা পিসিমা ঝি রাঁধুনী এদের সঙ্গে আমিও বসে গেছি ; আমার সঙ্গে আছে আমার শৈশব-সঙ্গিনী চারু, ডাকনাম নেড়ী ; সকলেই এক-একটা পাথর দিয়ে ছেঁচে তেঁতুলবীচি বের করছি। হঠাৎ সদর-দোরে ডাক উঠল, হাম্-বা—অ্যা-ম-ব্যা—অ্যা-ম-ব্যা। সমস্ত শরীর কেমন যেন করে উঠল। দরজায় উঁকি মেরে দেখলাম, ধূলিধূসর কৌপীন পরনে একটি জোয়ান মানুষ হাতে একগাছা দড়ি নিয়ে এমনি চিৎকার করছে, অ্যা-ম-ব্যা! অকস্মাৎ মানুষের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেলে যে উদ্বেগ তার বুকখানাকে তোলপাড় করে তোলে—সেই অসহনীয় উদ্বেগ আমার শিশুচিত্তকে অধীর অস্থির করে তুলেছিল। আমি সমস্ত দিন কেঁদেছিলাম। মায়ের কাছে শুনেছিলাম এই-ভাবে বারো বৎসর তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

সপ্তাহে দু-তিন দিন আসত পটুয়ারা। দ্বিজপদ পটুয়াকে আজও মনে আছে।

সুন্দর চেহারা ছিল তার। তেমনি সে গান গাইত। লম্বা পট খুলে কৃষ্ণলীলা-রাসলীলা-গৌরাঙ্গলীলার পর পর সাজানো ছবি দেখিয়ে যেত আর গান গেয়ে যেত—

"আহা, কী মধুর লীলা রে!"

পটের শেষের দিকটায় থাকত ধর্মরাজ অর্থাৎ যমরাজার দরবার। বৈতরণী নদী পার হয়ে যেতে হয় দরবারে, যেতেই হবে, না গিয়ে পরিত্রাণ নাই। যমদূতে নিয়ে যাবে। পাপীর কাছে বৈতরণী টগবগ করে ফুটছে। তাকে ঐ নদীর ফুটন্ত জলে ভাসতে ভাসতে যেতে হবে। ওপারে দরবারে বসে আছেন ধর্মরাজ, চিত্রগুপ্ত বসে আছেন এই দেখুন হিসেবনিকেশের খাতা নিয়ে।

নীলবর্ণ যমরাজ। রাজবেশ। পালোয়ানের মতো গোঁফ, বড় বড় সাদা চোখ। চিত্রগুপ্তের কানে কলম, হাতে খাতা—খতিয়ানের লম্বা খেরুয়া-বাঁধানো খাতার মতো খাতা। তারপর বিভিন্ন পাপে বিভিন্ন নরকে ভূতের মতো চেহারা যমদূতের হাতে পাপীদের শাস্তির দৃশ্য—কোথাও অসংখ্য সাপ-বিছে-কাঁকড়াবিছে-পরিপূর্ণ নরকে পাপীকে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, কোথাও ফুটন্ত কড়াইয়ে তাদের ভাজা হচ্ছে, কোথাও ঢেঁকির তলায় ফেলে কোটা হচ্ছে, কোথাও আগুনে গলানো লোহার সাঁড়াশি দিয়ে জিভ ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে। খেজুরগাছে তুলে হাত-পা গাছের সঙ্গে বেঁধে টেনে নামানো হচ্ছে এমনও একটা ছবি ছিল।

সব শেষ ছবিটি ছিল নদীর ঘাটে শ্রীকৃষ্ণ কাণ্ডারী হয়ে বসে আছেন নৌকা নিয়ে। দ্বিজপদ গাইত—ও নামের তরী বাঁধা ঘাটে ডাকলে সে যে পার করে।

বেদিয়ারা আসত। দেশি বেদিয়া সাপুড়ে। এরা সাধারণত আসত বর্ষার সময়, মাঠে আল-কেউটে ধরত—গ্রামে সাপ দেখিয়ে গান গেয়ে ভিক্ষা করত, বাঁদর নাচাত, আর চলত। ওরা যেত—মেদিনীপুর পর্যন্ত। তাদের মুখেই শুনেছিলাম—মেদিনীপুর অঞ্চলে কবিরাজ ছিলেন অনেক, তাঁরা কালো কেউটের বিষ কিনতেন এবং তা দিয়ে ওষুধ তৈরি করতেন। কালো কষ্টিপাথরের মতো এদের গায়ের রঙ, তেমনি কি ছিল চুল—পুরুষদের দাড়ি-গোঁফের এমন প্রাচুর্য যে ভারতবর্ষের যে-কোনো শ্মশ্রুগুম্ফগরবীদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। মেয়েদের চুলও ছিল তেমনি—রুক্ষ কালো ঘন এক রাশ চুল, বৈশাখের হাওয়ায় ফুলতে থাকত দ্রুত ধাবমান কালো মেঘের মতো। তেমনি টিকলো নাক আর তীক্ষ্ণ চোখ।

ওদের গানের দু-একটা মনে আছে।

"ও কালীলাগ ডংসেছে লখাকে—বাসর ঘরেতে—
বেউলা কাঁদে পতির শোকে পড়ে ধুলাতে।
কালী—লা—গ।"

আর একটা গান—

"ও জানি না গো—ও গো—এ—মন হবে।
গোকুল ছাড়িছে কালা মথুরাতে যাবে।"

আর একটা গান—

"কালীদহের ও নাগিনী ফুঁসিস না—এমন করে ফুঁসিস না।
ও তারে—দেখলে লাজের মাথা খাবি, তাও কি মরণ বুঝিস না।
ও নাগিনী ফুঁসিস না।"

কালো কেউটে সাপ অত্যন্ত হিংস্র। মানুষকে এরা তাড়া করে কামড়ায়। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও যে নাই তা নয়। একটি কেউটে সাপের সঙ্গে আমার এক সময় নিত্য দেখা হত। কিন্তু সে কখনও মাথা তোলেনি। সাড়া পাওয়া মাত্র চলে যেত। তার কথা পরে বলব। কিন্তু সাধারণভাবে কেউটের স্বভাব হিংস্র এবং এরা তাড়া করে যায় মানুষকে। আমিও তাড়া খেয়েছি অন্য কেউটের দু-চারবার। এই বেদেরা আশ্চর্য। এরা তাড়া করে ধরে এই সব সাপ। দেখেছি, বেদের মেয়ে বর্ষার ধানভরা ক্ষেতের মধ্যে ছুটে চলেছে। আশ্চর্য হয়েছি—কি ব্যাপার! তারপরই দেখেছি প্রকাণ্ড একটা কেউটের মুখ মুঠিতে ধরে অন্য হাতে লেজটা টেনে ধরে আক্রোশভরে সাপটাকে বলছে—"আমার হাত থেকে, যমের হাত থেকে তু পালাবি?" মাত্র হাত দেড়েক লম্বা একটা পাচনি ছড়ি হাতে নিয়ে—সদ্য-ধরা সাপটাকে ছেড়ে দিয়ে হাঁটু দুলিয়ে নাচাতে দেখেছি, গাইতে শুনেছি—"ও নাগিনী ফুঁসিস না।"

পটুয়ারা এবং বেদিয়ারা ধর্মে মুসলমান! বহুকাল পর্যন্ত এ তথ্য জানতাম না। দ্বিজপদ পটুয়া, রাধিকা বেদেনীর সঙ্গে আমার হৃদ্য একটি সম্পর্ক জন্মেছিল। দ্বিজপদের সুন্দর চেহারা এবং রাধিকার একপিঠ ঘন কালো চুল আর তীক্ষ্ন চোখ যেন আকর্ষণ করত আমাকে। রাধিকা এক-একদিন বাঁদর নিয়ে নাচাতে আসত। গাইত—

"হীরেমন নাচ দেখি লো!
তেমনি তেমনি তেমনি করে, বাহার করে,
ও হীরেমন নাচ দেখি লো!
যেমন আমার খোকাবাবুর চাঁদমুখ
তেমনি বিদায় পাবি লো!"

আমার চিবুক স্পর্শ করে বলত—মায়ের কাছে একখানা শান্তিপুরে শাড়ি এনে দাও খোকাবাবু, হ্যাঁ।

তা আমি দিয়েছিলাম। মা একবার পুরানো একখানা শান্তিপুরে শাড়ি তাকে দিয়েছিলেন। সে কাপড়খানা আমাদের বাড়িতেই পরে হেলে-দুলে চলে গিয়েছিল। বুড়ী রাধিকা একদিন আমায় বললে—তখন আমি কংগ্রেসের কাজ করি—২৩।২৪ সালে বোধ হয়। বললে—হ্যাঁ, খোকাবাবু, দাড়কার অবনীশবাবু যে আমাদিগে হিঁদু হতে বলছে, কি করি বল তো?

দ্বিজপদও বলেছিল। কয়েকদিন পর সেও এসেছিল, সেও বললে। তখন জানলাম ওরা ধর্মে ইসলাম ধর্মাবলম্বী।

আর এক দল দেশি যাযাবর আমাদের দেশে আছে। আমাদের অঞ্চলে বাজীকর বলে। এরা ম্যাজিক দেখায়। মেয়েরা নাচে, গান গায়। পুরুষেরাও ঢোলক বাজিয়ে

গান গায়। সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে এরা গান বাঁধে। মনে আছে, ছেলেবেলায় শুনেছি—

"ও—মহারানীর মিত্যু হ-ই-ল।
ও—বড়লাট ছোটলাট কাঁদিতে বসিল।"

এদের কাছেই ক্ষুদিরামের ফাঁসির গান শুনেছিলাম। ওরা বলেছিল—আমাদের বাঁধা গান।

"ও—বিদায় দে মা—ফিরে আসি।"

এদের মেয়েরা কিন্তু অদ্ভুত। বেশভূষায় এমন বিলাসিনী যে, দেখবামাত্র মনে হয় ওরা নৃত্য-ব্যবসায়িনী নটী। গায়ে গিল্টির গয়না, পাছাপাড় শৌখিন শাড়ি —দেহের ভাঁজে ভাঁজে জড়িয়ে পরে, নাকের নথ দুলিয়ে ভুরু টেনে, হেলে দুলে, সুর করে কথা বলে গৃহস্থের দোরে এসে দাঁড়ায়—ভিক্ষে পাই মা, সোনাকপালী, স্বামীসোহাগী, চাঁদবদনী, রাজার রানী! কোমরে হাতের কনুই দিয়ে ধরে রাখে একটা ঝুড়ি। ঝুড়িটা রেখেই বলে—নাচন দেখাই মা, দেখ। বলেই আরম্ভ করে দেয়, দুই হাতে তুড়ি মেরে, দেহখানি নৃত্যদোলায় দুলিয়ে গান ধরে—

"উর্‌র্‌র্—জাগ—জাগ—জাগিন ঘিনা—জার ঘিনি না—
উরুর-র—"

অদ্ভুত মিষ্ট ভাষা এদের। তেমনি কী নাছোড়বান্দা। হাঁক দিয়ে দাঁড়ালে যদি গৃহস্থ বলে—ভিক্ষে দিতে নেই, বাড়িতে অসুখ।

অমনি সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্বরে দরদ মাখিয়ে সুরেলা উচ্চারণে বলে উঠল—বালাই ষাট, ও-কথা বলতে নাই মা—শত্রুর অসুখ হোক। হাত জোড়া আছে বললে, বলে —হাতের কঙ্কণ নাড়া দিয়ে জোড়া হাত খুলে ফেল রাজার মা, বাবু-সোহাগী! এদের বাজী অর্থাৎ যাদুবিদ্যার পারদর্শিতা অদ্ভুত। এরা বলে অনেক কথা—টাকু মোড়ল বলে কে এক ওস্তাদ ছিল ; তার দোহাই দিয়ে বাজী দেখাত।

আবও আসত সত্যকারের বেদের দল।

তাঁবু, গরুর গাড়ি, গরু, মোষ, ঘোড়া, কুকুর নিয়ে আসত এক-একটা দল ; দলে পুরুষে নারীতে পঞ্চাশ ষাট থেকে চার পাঁচশো পর্যন্ত লোক থাকত। নানা ধরনের বেদে দেখেছি। সে-কালে বছরে তিনটে চারটে দল আসতই। একেবারে বর্বর এক ফালি নেংটি পরা, কালো কষ্টিপাথরের মতো দেহ, তারা আসত—পায়ে হেঁটে আসত, সঙ্গে থাকত কিছু গরু মহিষ আর এক পাল দারুণ হিংস্রদর্শন কুকুর ; এসে গ্রামপ্রান্তে গাছতলায় বাসা গাড়ত, প্রান্তরে প্রান্তরে শিকার করে আনত খরগোস, সজারু, ইঁদুর, গোসাপ, শেয়াল, বড় বড় ধামিন সাপ। সন্ধ্যার অন্ধকার হয়-হয়, তখন তারা শিকার করে ফিরত, অস্পষ্ট আলোয় ছায়ামূর্তির মতো দেখাত, কাঁধে বাঁকে ঝুলত রাশীকৃত মৃত জন্তু, সরীসৃপ। এদের মেয়েরা গ্রামে দুপুরে ভিক্ষা করত। মাটির ঝুমঝুমি, খেজুরপাতায় বোনা থলে বিক্রি করত। দুপুরে স্তব্ধ গৃহদ্বারে হাঁক উঠত—এ খোকার মা, ঝুমুঝুমি লিবি? কিনলেও বিপদ, না-কিনলেও বিপদ, ঝগড়া কোনোক্রমে বাধিয়ে কিছু-না-কিছু কেড়ে নিয়ে পালাত।

অপেক্ষাকৃত সভ্য বেদের দল আসত।

ইরানীরা আসত। এদের অস্তিত্ব শহরের লোকের কাছে সুপরিচিত। ছুরি কাঁচি বিক্রি করে। মাথায় ডবল বেণীর উপর রুমাল বাঁধে, ঘাঘরা পাঞ্জাবি পরে মেয়েরা। মাথায় পাগড়ি বা মেমটুপি, পাজামা পাঞ্জাবি পরে পুরুষরা দল বেঁধে গ্রামে ঢুকত। দর করলে নিতেই হত জিনিস। এবং যে দাম বলত—সেই দামই আদায় করত। আমাদের বাড়িতে যোগেশদাদা নায়েব ছিলেন। ভারি ভালো মানুষ, সুপুরুষ, গৌরবর্ণ মানুষ, মাথায় লম্বা চুল, গোঁফ-দাড়িতে মানুষটিকে মানিয়েছিল চমৎকার। সাধু ভাষায় কথা বলতেন। তিনি একবার একটি ইরানী মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলেন—কি হ্যায়?

বেণী দুলিয়ে উদ্ধত যাযাবরী ছুটে সিঁড়ি বেয়ে এসে সেলাম করে বললে—ছুরি আসে, কাঁইচি আসে, ক্ষুর আসে—দেকো-দেকো-দেকো। সঙ্গে সঙ্গে কাঁধের চামড়ার ব্যাগ নামিয়ে পসরা খুলে বসে গেল ইরানী মেয়ে। টক্‌টকে রঙ, মাথায় লাল রুমাল, গায়ে গাঢ় নীল সবুজ পাঞ্জাবি, কালো দুটো বেণী, খাটো কিন্তু মোটা। যোগেশদাদা একখানা ক্ষুর নিয়ে দেখে বলেছিলেন—আচ্ছা নেহি।

—আচ্ছা নেহি? ইরানী মেয়ে ফোঁস করে উঠল—আচ্ছা নেহি? বলে এক হাতে যোগেশদাদার হাত চেপে ধরে অন্য হাতে ক্ষুরখানা ধরে বললে—বলো, কাটেগা?

—আরে, কাটেগা কি? না—না—

খিলখিল করে হেসে মেয়েটা যোগেশদাদার হাত ছেড়ে দিয়ে বললে—তবে দেকো। বলেই ক্ষুরটা বসিয়ে দিলে নিজের হাতে। অল্পই বসালে অবশ্য। সঙ্গে সঙ্গে রক্ত বেরিয়ে এল। হেসে রক্ত দেখিয়ে বললে—দেকো। ক্যায়সা দার হ্যায় দেকো। আব লেও।

যোগেশদাদা বললে—না। নেব না। তুই ভয়ানক—

ভয়ানকই বটে, ইরানী মেয়েটা খপ করে যোগেশদাদার দাড়ি চেপে ধরে বললে—তব তুমার দাড়ি লে লেগা! হামারা ক্ষুর দেখানেকা দাম।

আর আসত সভ্য বেদে। আজকাল অনেকেই এদের জানেন না। মস্ত দল, ঘোড়া গরু মহিষ তাঁবু কুকুর—সরঞ্জাম অনেক। এরা সব কেউ সাজত সন্ন্যাসী, কেউ সাজত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কপালে তিলক, গলায় তুলসী বা রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে কমণ্ডলু, বেশ সংস্কৃত শ্লোক আউড়ে এসে দোরে দাঁড়াত। এদের একটা ভিক্ষের বুলি আমার আজও মনে আছে—সীত্যারাম—সীত্যারাম। বাড়ির মঙ্গল হোবে রাম। সাধু বিদায় করো রাম। বলেই যেত, বলেই যেত—রাজ্য পাবে, পুত্র পাবে, মনের মতো পত্নী পাবে। তেমন ভক্তিমান দেখলে সঙ্গে সঙ্গে ঝুলির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে মুষ্টিবদ্ধ হাত বাড়িয়ে বলত—ধরো, ধরো। রামজী স্বপ্ন দিয়া তুমকো দেনেকো লিয়ে, ধরো। গৃহস্থ শঙ্কিত হয়ে হাত বাড়াত। পেত একটা তামার মাদুলী। সঙ্গে সঙ্গে সাধু বলত—দে দক্ষিণা। একশো—পঞ্চাশ—পঁচিশ—পাঁচ। শেষে এক টাকায় এসে চোখ রাঙা করে বলত—ভস্ম করে দেব। শাপ দেব।

শুধু কি এরাই সে-কালের সব? আরও ছিল। বলতে গিয়ে কথা ফুরোয় না। ডাইনী ছিল—স্বর্ণ ডাইনীকে মনে পড়ছে। শুকনো কাঠির মতো চেহারা, একটু কুঁজো, মাথায় কাঁচাপাকা চুল, হাটে তরিতরকারি কিনে গ্রামে-ঘরে বেচে বেড়াত। চোখ দুটো ছিল নরুনে-চেরা চোখের মতো ছোট। দৃষ্টি তীক্ষ্ণই ছিল, কিন্তু ডাইনী শুনে মনে হত সে চোখ যেন আমার বুকের ভেতরটা ভেদ করে ঢুকে আমার হৃদ্‌পিণ্ডটা খুঁজে খুঁজে ফিরছে। স্বর্ণ গ্রামে বড় কারও ঘরে ঢুকত না। আমার অনেক বয়স পর্যন্ত স্বর্ণ বেঁচে ছিল। আমরা স্বর্ণপিসি বলতাম। বেচারী গ্রামের ভদ্রপল্লী থেকে দূরে—জেলেপাড়ার মোড়ে একখানি ঘর বেঁধে বাস করত। সে-পথে যেতে-আসতে দেখেছি, বুড়ী ঘরের মধ্যে আধো-অন্ধকার আধো-আলোর মধ্যে বসে আছে। চুপ করে বসে আছে। কথা বড় কারও সঙ্গে বলত না। কেউ বললেও তাড়াতাড়ি দু-একটা জবাব দিয়ে ঘরে ঢুকে যেত। তার শেষ-কালটায় আমি বুঝেছিলাম তার বেদনা। মর্মান্তিক বেদনা ছিল তার। নিজেরও তার বিশ্বাস ছিল, সে ডাইনী। কাউকে স্নেহ করে সে মনে মনে শিউরে উঠত; কাউকে দেখে চোখে ভালো লাগলে সে সভয়ে চোখ বন্ধ করত; চোখে ভালো-লাগার অবাধ্যতাকে তিরস্কার করত। দুই ক্ষেত্রেই তার শঙ্কা হত, সে বুঝি তাকে খেয়ে ফেলবে, হয়তো বা ফেলেছে, বিষাক্ত তীরের মতো তার লোভ গিয়ে ওদের দেহের মধ্যে বিঁধে গিয়েছে' সমগ্র পৃথিবীতে তার আত্মীয় ছিল না, স্বজন ছিল না। রোগের যন্ত্রণায় দুঃখে সমগ্র জীবনটাই সে একা কাটিয়ে গেছে।

ডাইনী স্বর্ণ একাই ছিল না, আরও ছিল। কিন্তু স্বর্ণের মতো অপবাদ কারুর ছিল না। সে এক বিস্ময়কর ঘটনা। আমার চোখের উপর ভাসছে। জীবনে ভুলতে পারব না শৈশবের দেখা সে ছবি। বলব ঘটনাটি। আমাদের বাড়িতে ছিলেন আমাদেরই গ্রামের এক ব্রাহ্মণ-কন্যা। রান্নার কাজ করতেন। আমি তাঁকে বলতাম 'দাদার মা'। তাঁর ছোট ছেলেটিও তাঁর সঙ্গে থাকতেন আমাদেরই বাড়িতে। অবিনাশদাদার উপর ছেলেবেলায় আমার গভীর আসক্তি ছিল। তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে আঁকড়ে থাকতাম, স্কুল যাবার সময় তিনি বিপন্ন হতেন। তিনিও আমাকে গভীর স্নেহ করতেন। নইলে ছোট একটি ছেলেকে ভুলিয়ে রাখার মতো সম্পদ তাঁর কিছু ছিল না। অবিনাশ-দাদার গল্প-ভাণ্ডারে একটি মাত্র গল্প ছিল,—'ব্যাজারে ব্রাহ্মণের গল্প'।—এক ব্রাহ্মণ মাঠে গিয়েছেন। এক জায়গায় কুলকাঁটা ছড়ানো ছিল, ভুল করে তারই উপর গিয়ে পড়েছেন আর পায়ে কাঁটা ফুটেছে। সে-কাঁটা বের করতে গেলেন, এদিকে অন্য পাটি টলে পড়ল কাঁটার উপর, তাতে ফুটল কাঁটা। এ-পা মুক্ত করে নামিয়ে সে-পায়ের কাঁটা তুলতে তুলতে টলল এ-পা। ফুটল কাঁটা। মোট কথা, কাঁটা আর ছাড়ে না। ব্রাহ্মণের একেই ব্যাজার স্বভাব, তার উপর এই ব্যাপার। ক্ষেপে গেলেন ব্রাহ্মণ এবং দুই পায়ে সেই কাঁটা ছড়ানো ঠাঁইটুকুর উপর ভ্যাঁক ভ্যাঁক করে লাথি মেরে নাচতে লাগলেন আর চ্যাঁচাতে লাগলেন—ভোঁক—ভোঁক

—ভোঁক—ভোঁক। আমাদের দেশে 'কাঁটা-ফোটা' বলে না; বলে—কাঁটা ভোঁকা, কাঁটা ভুঁকেছে। এইটুকু গল্প। কিন্তু সে থাক। গল্প একটিই হোক আর যত তুচ্ছ সামান্যই হোক, অবিনাশদাদার মূল্য আমার কাছে অসামান্য ছিল। একদা খবর পেলাম অবিনাশদাদাকে স্বর্ণ ডাইনী খেয়েছে। ডাইনে নজর দেওয়াকে আমরা বলি—ডাইনে খাওয়া। প্রবল জ্বরে অবিনাশদাদা অচেতন। দাদার মা তখন তাঁর নিজের বাড়িতে থাকেন, আমাদের বাড়িতে কাজ করেন না, কাজ করেন তাঁর বড় মেয়ে সাতনদিদি। সাতনদিদিই সকালে কাঁদতে কাঁদতে এলেন। খবর পাঠানো হল গোঁসাই-বাবার কাছে। 'ধাত্রীদেবতা'র রামজী সাধু। তখন তিনি আমাদেরই বাগানে তারা-মায়ের আশ্রমে থাকেন। প্রায় আমাদের সংসারেরই একজন। আমারই মায়ার ডোরে সন্ন্যাসী আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়েছেন। গোঁসাই-বাবা ডাইনের ওঝা ছিলেন। মন্ত্র জানতেন। তাঁরই সঙ্গে, বোধ হয় তাঁরই কোলে চেপে, গেলাম দাদার মায়ের বাড়ি। উঠান তখন লোকে লোকারণ্য। সনা ডাইনে খেয়েছে অবিনাশকে, রামজী সাধু ঝাড়বেন।

মেটে কোঠায় অর্থাৎ মাটির দোতলায় অবিনাশ-দাদা শুয়ে আছেন, চোখ বন্ধ। ডাকলে সাড়া নাই। প্রবল জ্বর। মাথার শিয়রে দাদার মা বসে। ও-পাশে বসে অবিনাশদাদার দুই বোন। গোঁসাই-বাবা ডাকলেন—মামা! গোঁসাই-বাবাকে দাদার মা 'গোঁসাই-দাদা' বলতেন, সেই হেতু অবিনাশ-দাদা তাঁকে বলতেন, রামজী মামা। সাধু অবিনাশদাদাকে বলতেন ভাগ্না, কখনও মামা।

কোনো উত্তর দিতেন না অবিনাশ-দাদা।

—অবিনাশ!

অবিনাশ এবার ঘুরে শুল।—মর্, হাঘরে গোঁসাই। আমি মেয়েছেলে, আমাকে কি বলিস তুই?

—তু কৌন্ রে?

চুপ করে রইল অবিনাশ।

—কৌন্ তু?

—বলব না।

—বলবি না?

—না।

মন্ত্র পড়া শুরু হল। বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়েন রামজী সাধু আর মধ্যে মধ্যে ফুঁ দেন—ছুঁ—ছুঁ—ছুঁ।

অবিনাশ চিৎকার করে উঠল, পরিত্রাহি চিৎকার। বলছি—বলছি—বলছি।

তবু মন্ত্র পড়া চলল।—ছুঁ—ছুঁ—ছুঁ।

—বাপ রে, মা রে! ও গোঁসাই, আর মেরো না। বলছি, আমি বলছি।

—বোল, তু কৌন্?

—আমি স্বর্ণ। স্বর্ণ ডাইনী।

—তু কাহে এখানে? আঁ?

—আমি একে খেয়েছি যে।

—খেলি? কাহে—কাহে খেলি?

—কি করব? আমার ঘরের ছামনে দিয়ে এই বড় বড় আম হাতে নিয়ে যাচ্ছিল, আমি থাকতে পারলাম না, আমি আম না পেয়ে ওকেই খেলাম।

—কাহে, তু মাঙলি না কাহে? কাহে বলালি না—হামাকে দাও?

—কি করে বলব? একে লোভের কথা, তার উপরে মেয়েলোক, আমি লজ্জায় বলতে পারলাম না।

—হাঁ! তব ইবার তু যা। ভাগ্।

—না। তোমার পায়ে পড়ি, যেতে আমাকে বলো না।

আদেশের সুরে গোঁসাই বললেন—যা তু। হামি বলছে।

—না। বিদ্রোহ ঘোষণা করলে অবিনাশ-দাদার মুখ দিয়ে স্বর্ণ ডাইনী।

—না? আচ্ছা। এ দিদি, আন্ সরষা।

সরষে এল। হাতের মুঠোয় সরষে নিয়ে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ে—ছুঁ শব্দে ফুঁ দিয়ে ছিটিয়ে মারলেন অবিনাশ-দাদার গায়ে।

চিৎকার করে কেঁদে উঠল অবিনাশদাদা—বাবা রে, মা রে, ওরে, মেরে ফেললে রে! ওরে বাবা রে!

আবার মারলেন সরষের ছিটে।

—যাচ্ছি, যাচ্ছি, যাচ্ছি, আমি যাচ্ছি, আর মেরো না। আমি যাচ্ছি।

—যাবি?

—হ্যাঁ যাব।

সংগে সংগেই অবিনাশ কেঁদে উঠল—ওগো, যেতে যে পারছি না গো।

—পারছিস না? চালাকি লাগাইয়েছিস, আঁ? হাত তুললেন রামজী সাধু, মারবেন ছিটে। অবিনাশ চিৎকার করলে আবার—না না! যাব, যাচ্ছি।

—যাবি?

—হ্যাঁ, যাবো।

—তব এক কাম কর্। ঘরের বাহারে একঠো কলসীমে জল আছে। দাঁতে উঠাকে লে যা। নেহি তো—

—তাই, তাই যাচ্ছি।

জ্বরে অচেতন অবিনাশ উঠে দাঁড়াল। দাদার মা ধরতে গেলেন। রামজী বাবা বললেন—না। ঘর থেকে অবিনাশ বের হল। চোখে বিহ্বল দৃষ্টি তার। ঘরের বাইরে দোতলার বারান্দায় জলপূর্ণ কলসী আগে থেকেই রাখা ছিল, সেটার কানা দাঁতে কামড়ে তুলে নিলে। দাঁতে ধরেই নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে, উঠানে নামল, বাইরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল, দাঁত থেকে কলসীটা খসে পড়ে গেল, সে নিজেও পড়ে গেল মাটির উপর—ধরলেন গোঁসাই-বাবা। এবার বিপুল বলশালী পশ্চিম-দেশীয় সন্ন্যাসী কিশোর বা সদ্যযুবা অবিনাশকে ছোট ছেলেটির মতো পাঁজাকোলা করে তুলে উপরে এনে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। গোঁসাই-বাবার পাশে পাশেই রয়েছি আমি। এবার গোঁসাই-বাবা ডাকলেন—অবিনাশ! মামা!

—অ্যাঁ?

—কেমন আছ?

—ভালো আছি।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অবিনাশ-দাদার জ্বর ছেড়ে গেল। আমার শিশুচিত্তে ডাইনী-আতঙ্ক দৃঢ়বদ্ধ হয়ে গেল। স্বর্ণ সে-দফা মার খেয়েছিল, এ-কথা বলাই বাহুল্য।

অনেকদিন পর, তখন আমার বয়স তেরো-চোদ্দ বৎসর। স্বর্ণ হঠাৎ আমাদের বাড়ি যাওয়া-আসা শুরু করলে। পান তরকারি নিয়ে আসত। শুনলাম, ফুল্লরা-তলায় যাওয়া-আসার পথে মায়ের সঙ্গে স্বর্ণের কথাবার্তা হয়েছে। মা তাকে বলতেন, ঠাকুরঝি। ওইটুকুতেই সে কৃতার্থ।

স্বর্ণ আসত এর পর আমাদের বাড়ি। আমার ভয় চলে গেল। স্বর্ণকে বুঝতে লাগলাম। পথে যেতাম, দেখতাম, স্বর্ণ নিজের দাওয়ায় বসে আছে আকাশের দিকে চেয়ে, অথবা আধো-অন্ধকার ঘরের দুয়ারটিতে ঠেস দিয়ে বসে আছে। নিঃসঙ্গ, পৃথিবীপরিত্যক্ত স্বর্ণ। কখনও কথা বলতে সাহস হত না। কি জানি, স্বর্ণ যদি সেই ডাইনীমন্ত্র স্পষ্টাক্ষরে উচ্চারণ করে আমাকে শুনিয়ে দিয়ে বলে, তোকে দিলাম। তবে আমিও যে ডাইনী হয়ে যাব। স্বর্ণ পাবে জীবন থেকে মুক্তি।

কথাটা আমাকে বলেছিলেন আমার পিসিমা। আতঙ্কে এক রাত্রি ঘুম হয়নি। মাকে বলতে তিনি হেসে বললেন—জানি নে বাবা, সত্যি মিথ্যে কি। সত্যি বলে আমার মনে হয় না। তবে ও তোমার এমন অনিষ্ট করবে কেন? স্বর্ণ আমাকে ভালোবাসে। তোমাদেরও ভালোবাসে। তা ছাড়া, কই, অবিনাশের ওই ঘটনার পর আর তো স্বর্ণকে দিয়ে কারুর অনিষ্ট হয়নি?

স্বর্ণ ছাড়া আরও অনেক ডাইনী ছিল। তার চেয়ে গল্প ছিল অনেক বেশি। প্রকাণ্ড মাঠে একটা অশত্থগাছ ছিল। মাঠটার চারিদিকে আর যে-গাছগুলি ছিল সেগুলি সবই বট, মাঝখানে ওই অশত্থগাছটি খানিকটা হেলে দাঁড়িয়ে ছিল। এক দিকের শিকড় উঠে বেরিয়ে পড়েছিল, মনে হত গাছটার আধখানা আছে আধখানা নাই। শুনতাম, ওটা ডাকিনীর গাছ। দেশে নাকি ছিল ভারী এক গুণীন। কাঁউরের অর্থাৎ কামরূপের বিদ্যাও তার জানা ছিল। একদিন গরমকালের রাত্রে গ্রামের প্রান্তে বসে কয়েকজন বন্ধুবান্ধব মিলে আমোদ-আহ্লাদ করছে, এমন সময় আকাশ-পথে একটা শব্দ শোনা গেল। প্রচণ্ড বেগে যেন একখানা মেঘ উড়ে চলেছে। সকলে বিস্মিত হল—একি!

গুণীন হেসে বললে—গাছ উড়ে চলেছে।

—গাছ? গাছ উড়ে চলে? কি বলছ?

—চলে। কামরূপের ডাকিনীবিদ্যা যারা জানে, তারা গাছে বসে বিদ্যার প্রভাবে গাছকে উড়িয়ে নিয়ে চলে—দেশ থেকে দেশান্তরে। ডাকিনী চলেছে আকাশ-পথে।

বিশ্বাস করলে না কেউ। বললে—তুমি ধোঁকা দিচ্ছ।

—দেখবে?

—দেখাও।

গুণীন হাঁকতে লাগল মন্ত্র। আকাশে একটা চিৎকার উঠল, চিলের মতো চিৎকার, একসঙ্গে যেন বিশ-পঁচিশটা চিল ক্রোধে চিৎকার করে উঠল, ঈ—

সকলে ভয়ে কেঁপে উঠল। কিন্তু গুণীন আপন মনে মন্ত্র উচ্চারণ করেই চলল। মেঘের মতো জিনিসটির গতি থামল না, কিন্তু সামনে সে আর ছুটল না। পাক খেয়ে ঘুরতে লাগল। ঘুরতে ঘুরতে নামল এক অশত্থগাছ। গুণীনের মন্ত্র তখনও থামেনি। মাটি ফাটল, শিকড় সেই ফাটলে ঢুকল, গাছটি এইখানে জন্মানো গাছের মতো সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারও চেয়ে বিস্ময়ের কথা—গাছের মাথায় অপরূপ সুন্দরী এক মেয়ে, একপিঠ এলোচুল, সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা।

লোকে মাথা হেঁট করলে।

ডাকিনী বললে—আমাকে নামালে তুমি গুণীন, দশের সামনে এই অবস্থায়! আমাকে লজ্জা দিলে! আমি ডাকিনী হলেও মেয়ে। আমার লজ্জা রক্ষা কর, আমাকে কাপড় দাও।

গুণীন হাসল।

ডাকিনী তখন নেমে হাত বাড়িয়ে বললে—দাও, কাপড় দাও।

গুণীন হেসে ঘাড় নাড়লে—সবুর কর। সবুর কর।

কিন্তু যারা গুণীনের সঙ্গী—তাদের সবুর সইল না; একজন বললে—ছি ভাই!

গুণীন তাকে ধমক দিলে—না।

ততক্ষণে আর-একজন অতর্কিতে গুণীনের কাঁধের গামছাখানাই টেনে মেয়েটিকে ছুঁড়ে দিলে, গুণীন আঁতকে উঠল—করলি কি? করলি কি?

ডাকিনী খিল-খিল করে হেসে উঠল। গামছাখানায় মাথা থেকে পা পর্যন্ত সামনের দিক ঢেকে, হেঁট হয়ে, পায়ের দিকের গামছার প্রান্তটা ধরে উপর দিকে নিয়ে পিছনের দিকে মাথা পার করে ফেলে দিলে। গুণীন মর্মান্তিক চিৎকার করে উঠল—সকলে সভয়ে দেখলে, গুণীনের দেহের চামড়া পায়ের দিক হতে ছিঁড়ে ক্রমশ মাথার দিকে গুটিয়ে পিছনের দিকে উল্টে গেল। চামড়া-ছাড়ানো মানুষটা পশুর মতো আর্তনাদ করে উঠল। ডাকিনীর খিল-খিল হাসি উচ্চ থেকে উচ্চতর হয়ে উঠল। সে গিয়ে আবার চাপল সেই গাছে। গুণীন সেই অবস্থাতেই তখনও মন্ত্র পড়ছিল; মন্ত্র আধখানার বেশি পড়তে পারলে না সে। গাছটার আধখানা উঠল না, আধখানা ছিঁড়ে আবার উঠল আকাশে। আবার আকাশে শব্দ হতে লাগল। উড়ন্ত মেঘের মতো চলে গেল—কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে।

এর উপর ছিল ভূত।

আমাদের বাড়ির গলিতে—বাড়ি থেকে বৈঠকখানা ও সদর রাস্তায় যাবার পথে জ্যাঠামশায়দের ডুমুরগাছে ভূত ছিল। শিউলিগাছে ব্রাহ্মণ-প্রেত ছিল। এই গলিপথ নিচের দিকে ছিল সর্পসঙ্কুল—অন্য দিকে মাথার উপরটা ভূত-অধ্যুষিত। সে কী বিপদ শিশুর পক্ষে! বারো-চোদ্দ বৎসর বয়স পর্যন্ত গলির মুখে এসেই ঢুকতাম

আমাদেরই বাড়ির দৌহিত্র-বংশের এক বাড়িতে। সকাতরে বলতাম—ওগো, আমাকে একটু দাঁড়িয়ে দাও।

সাপের ভয় আমার ছিল না কোনো কালে। আজ পর্যন্ত, আমি একলা যখন যাওয়া-আসা করেছি, কখনও আলো হাতে যাবার প্রয়োজন অনুভব করিনি। মোটা-মুটি ওদের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। ওদের চলাফেরা বুঝতে পারি। গ্রামের মধ্যে যে সব সাপ বাস করে, তারা মানুষের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে বাস করে—এটা আমি দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বলছি। বিপদ মাঠের সাপের কাছে। তারা মাঠে থাকে, মানুষকে তারা মোটেই বরদাস্ত করতে পারে না। তাও, উত্তরকালে, আমি যখন কৃষিকর্মে আত্মনিয়োগ করেছিলাম আবাদ করে সোনা ফলাবার জন্য—তখন এক কালো কেউটের সঙ্গে আমার বেশ পরিচয় হয়েছিল। প্রায় নিত্যই আমার সঙ্গে দেখা হত তার। পরে তার বাসাও আবিষ্কার করেছিলাম। একবার প্রবল বৃষ্টিতে দেখেছিলাম, তার বাসাটার উপরে মাটি খুলে একরাশি ডিম জলের স্রোতে ভেসে গেল। তখন জানলাম, সাপটি নারী জাতীয়া—নাম দিয়েছিলাম তার কালকূটী।

ভূত থেকে সাপের কথায় এসে পড়েছি। সাপের কথা থাক।

আমাদের গলিতে ডুমুরগাছের ভূত আমাকে উত্যক্ত করেছে।

শিউলিতলার ব্রাহ্মণের বিবরণ বিচিত্র। ইনি ক্বচিৎ কদাচিৎ দেখা দেন। দেখা দেন কালপুরুষের মতো। তিনি দেখা দিলেই বুঝতে হবে, আমাদের কয়েক বাড়ির মধ্যে কারুর ডাক পড়েছে।

আমাদের বাড়ির গলির ওপাশে ছিল ভট্‌চাজদের বাড়ি। গল্প শুনতাম এই বাড়ির রামাই ভূতের। রামাই বাড়ির চালের সাঙায় পা ঝুলিয়ে বসে থাকত। তার শিশু ভাইপো বিছানায় কাঁদলে তাকে বিছানা-সুদ্ধ তুলে সাঙায় নিয়ে দোল দিত। আরও অদ্ভুত কাণ্ড রামাই ভূতের। শুনেছি, নাকি কাঁদীর রাজবাড়িতে রাস-উৎসবের খুব সমারোহ হয়। খাওয়া-দাওয়া দু-তিনটে জেলার মধ্যে বিখ্যাত।

একবার বাড়ির মেয়েরা রাস-পূর্ণিমার দিন ওই রাজবাড়ির খাওয়া-দাওয়ার গল্প করছিলেন। একজন বলেছিলেন—মিছে গল্প করে কি হবে? খাওয়াচ্ছে কে? পর-মুহূর্তেই রামাইয়ের কথা মনে করে বলেছিলেন—রামাই যদি দয়া করে তবে নিশ্চয় সাধ মেটে, খেতে পাই!

বাস্‌; ঘণ্টা খানেক যেতে-না-যেতেই শূন্যলোক থেকে নেমে এল দুই চ্যাঙারি। লুচি, মালপো, মিষ্টিতে বোঝাই।

এর পর আর ভূত বিশ্বাস না-করে উপায় আছে?

ভূতের গল্প মাও বলতেন, কিন্তু ভূতকে ভয় ছিল না তাঁর। সে-কথা আগে বলেছি। ডুমুরগাছের ভূতের ভয় আশ্চর্যভাবে আমার কেটেছিল। সে-কথা এখানে নয়, পরে বলব।

ডাইন ডাকিনী ভূত প্রেত-সমাকুল আমার সে-কাল। বেদে সাপুড়ে পটুয়া দরবেশ তখন দেশে প্রচুর। প্রতি দিনই এদের কারুর-না-কারুর বা কোনো-দলের-না কোনো-দলের সঙ্গে দেখা হতই। আমার সাহিত্যিক জীবনে এরা দল বেঁধে ভিড়

করে এসেছে ঠিক এই কারণেই। কলকাতায় ম্যাজিকওয়ালারা বা বাজীকরেরা যারা তাঁবু খাটিয়ে বাজনা বাজিয়ে ভিতরে কাচের জারের মধ্যে আরকে ডুবানো মরা ছ'টা পা দুটো মুণ্ডুওয়ালা ছাগলের বাচ্চা দেখায়, তাদের মতো বিষয়বৈচিত্র্যের জন্য আমি এদের খুঁজেপেতে আনিনি। এই প্রসঙ্গে একটি ছোট কাহিনী বলব আমার সাহিত্যিক জীবনের।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাতের সময়ের কথা। আমার 'ছলনাময়ী' গল্পের বইয়ে "ডাইনীর বাঁশী" গল্পটি আছে। স্বর্ণ ডাইনীর গল্প। রবীন্দ্রনাথ নানা কথার মধ্যে হঠাৎ বললেন—ডাইনীর গল্পটি ভালো হয়েছে। খুব ভালো লেগেছে আমার। আমি কলকাতায় কয়েকজনের কাছে বললাম। একজন বললেন—আমাদের দেশে উইচ নিয়ে গল্প? গল্পটি নিশ্চয় বিদেশী গল্প থেকে নিয়েছে।

আমি তাঁর কথার মধ্যেই বলে উঠলাম—না। ও আমার দেখা। আর আমি তো ইংরেজি ভালো জানি না, আমার গ্রামে ইংরেজি বই পড়ারও সুযোগ নেই। স্বর্ণ ডাইনী আমাদের বাইরের বাড়ির পুকুরের ওপারে থাকত। তাকে আমি দেখেছি। আমি—

হেসে তিনি বললেন—আমিও তাঁদের তাই বলেছি। এ তারাশঙ্করের দেখা ডাইনী, সে তাকে দেখেছে। পড়তে পড়তে আমি যে চোখে দেখতে পাচ্ছি, স্বর্ণ দুপুরবেলা বসে আছে আর সামনের তালগাছটার মাথায় চিলটা ডাকছে। আমাদের দেশের এঁরা ইউরোপের উইক্রাফ্‌টের কথা অনেক পড়েছেন। শহরে থাকেন, গ্রামের ডাইনী দেখেননি। তাই উইচ নিয়ে গল্প হলেই মনে করেন, বিদেশ থেকে না বলে ধার করেছে।

এরই মধ্য থেকেই, মায়ের শিক্ষা এবং বাবার গম্ভীর ও গভীর তত্ত্বসন্ধানের আকুতি থেকে আমি পেয়েছিলাম আমার পথ।

আমার মায়ের মধ্যে ব্যবহারিক শিক্ষা ছাড়াও আর এক উপাদেয় ধারায় পেয়েছিলাম এই শিক্ষা—মায়ের গল্প বলার কথা আগে বলেছি। নিত্য সন্ধ্যায় শুনতাম গল্প। যে-দিন চুল বাঁধতে বসতে হত, সে-দিন চুল বাঁধার সময় গল্প বলতেন।

"এক ছিল রাজা।
রাজার দুই মেয়ে।"

বলতেন সত্যপ্রিয়ের কাহিনী। আমার 'শ্রীপঞ্চমী নামে ছেলেদের গল্পের বইয়ের প্রথম গল্প। সত্যই একমাত্র প্রেয় ছিল কুমারটির, শ্রেয়ই হয়েছিল তার প্রেয়। তারই কাহিনী থেকে পেতাম পথের নিশানা। সত্যই একমাত্র পথ।

গল্পের শেষে মা বলতেন—

"কহনী হ্যায় সাচ্চা,
বলনেবালা ঝুটা,
শুননেবালা সাচ্চা।"

বলতেন—আমি বললাম বানিয়ে। কিন্তু তুমি সত্যি, আর গল্প সত্যি। গল্প তুমি কোনোদিন ভুলবে না।

সাত

ছেলেবেলায় আমি যত গল্প শুনেছি, এত গল্প বোধ হয় খুব কম ছেলেই শুনতে পায়। আজ মনে পড়ছে, সে-কালের গল্পগুলির মধ্যে, অন্তত আমি যাঁদের কাছে গল্প শুনেছি তাঁদের গল্পের মধ্যে, আশ্চর্যভাবে প্রাণপুরুষের সন্ধান ছিল।

এ-কালে অনেক পুরাকালের গল্প-সংগ্রহ বেরিয়েছে : 'ঠাকুরদার ঝুলি', 'ঠাকুর-মায়ের ঝুলি', আরও অনেক। এগুলির মধ্যে আমার শোনা গল্পগুলি পাইনি। এর কারণ বোধ হয় আমার শোনা গল্পগুলির উৎপত্তিস্থান বাংলা দেশ নয়। আমার প্রথম গল্পকথক আমার মা। তাঁর জন্ম পাটনা শহরে, মানুষও হয়েছিলেন তিনি পাটনায়। তিনি বলতেন যে-সব গল্প, তার অধিকাংশই তিনি শুনেছিলেন তাঁর মায়ের ঝিয়ের কাছে। বলতেন—বুড়ী দাই। বুড়ী দাইকে তাঁর কী শ্রদ্ধা আর মমতা ছিল। ওই সত্যপ্রিয়ের কাহিনীর কথা এর আগে উল্লেখ করেছি ; কাজলহারার কথা বলেছি; আর একটা গল্প তাঁর 'ঘাসেড়ানন্দনের গল্প'। ঘাসেড়ানন্দন শব্দটাতেই হিন্দী ভাষার গন্ধ আছে। তবে আমার মা তাকে আশ্চর্যভাবে আত্মসাৎ করে একে-বারে বাঙালীর গল্প করে তুলেছিলেন। এই সেদিনও, বোধ হয় মাস তিনেক আগে (১৩৫৭ সালের ভাদ্র মাসে), সেই গল্প তিনি আমার পৌত্রকে শোনাচ্ছিলেন। আমিও বসলাম পাশে। মা হাসলেন। আমার পিঠে হাত দিয়ে যেন আমাকেই বলতে লাগলেন। এক জায়গায় নানা খাবারের কথা আছে। তিনি বলে গেলেন—মল্লিকা ফুলের মতো সাদা সুগন্ধ অন্ন, কাঁচা সোনার মতো রঙের সোনামুগের দাল, শাক শুক্তো দালনা, নানা রকমের ভাজা-ঝোল-ঝাল-অম্বল-চাটনি-দই-পায়স-ক্ষীর-পিঠা, নানাবিধ মিষ্টান্ন রসগোল্লা-পান্তুয়া-সন্দেশ-চমচম-বরফি—অনেক নাম করে গেলেন। কিন্তু কোনোটি বিহারের বিশেষ খাদ্য নয়। এই গল্পটির মধ্যে বড় হল বন্ধুপ্রীতি, সত্য-প্রীতি এবং বীর্যবানের বীর্য। রাজকন্যাও আছে, মায়াবিনী ডাকিনীও আছে, কিন্তু সে-সব কিছুই মনে থাকে না। মনে থাকে, বন্ধুর কাছে সত্য গোপন করেছিলেন বলে মহাবীর ঘাসেড়ানন্দন তাঁদের বললেন—ভাই, তোমরা বন্ধু, তোমাদের ভোলা অসম্ভব, ভুলতে কখনই পারব না জীবনে। তবে ভাই, সত্য হল তার চেয়েও বড়। সেই সত্যকে আমার কাছে গোপন করেছ তোমরা ; সুতরাং আজ থেকে বুকের বন্ধুত্ব বুকে রেখে আমরা পৃথক হলাম। যখন আহার করব, তখন চারজনের আয়োজন করব, চার পাতে সাজাব, আগে তোমাদের তিনজনকে নিবেদন করে তবে নিজে খাব। চারজনের মতো আয়োজন যদি না জোটে, তবে যা জুটবে তাই চার ভাগ করে তিন ভাগ তোমাদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করে আমি এক ভাগ খাব। তিন ভাগ বিতরণ করে দেব দীনদুঃখীকে।

তিন বন্ধু চলে গেলেন একদিনে। তাঁরাও তাই স্বীকার করলেন। দোষ মেনে নিলেন। বললেন—এই মিথ্যা বলার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে যদি পারি তো আবার দেখা হবে।

দেখা অবশ্যই হয়েছিল। এবং গল্প শোনার পরমানন্দের মধ্যে ওই কথা কয়টিই কানে বাজত। ওই তো সেই প্রাণপুরুষের সন্ধানের রহস্যমন্ত্র।

গল্প শোনার পর্বকে বলতে পারি—আমার হাতেখড়ির আগে মুখে মুখে জীবনের বর্ণপরিচয়ের চেষ্টার প্রথম পর্ব। এই পর্বের মধ্যে মায়ের পরই হলেন আমার গোঁসাই-বাবা রামজী-সাধু। তিনি আমাদের গ্রামের ফুল্লরা মহাপীঠে তীর্থ-ভ্রমণে এসে আমার বাবার আধ্যাত্মিক চর্চার পরিচয়ে আকৃষ্ট হয়ে বাবার পরম বন্ধুত্বে পরিণত হন। গ্রামপ্রান্তের একটি প্রান্তরে বাবা তখন একটি বাগান তৈরি করা-চ্ছিলেন। সেই বাগানটির মধ্যে সন্ন্যাসী বন্ধুর জন্য একটি আশ্রম তৈরি করে দেন এবং সন্ন্যাসীর অভিপ্রায় অনুযায়ী একটি মন্দির তৈরি করে সেখানে শারদ শুক্লা-চতুর্দশীতে তারা-পুজার প্রতিষ্ঠা করেন। যে বৎসর তারা-পুজার প্রবর্তন হয় সেই বৎসরেই ঠিক দশম মাসে আমার জন্ম হয়, সেই কারণেই এই সন্ন্যাসীটি আমার মমতায় এমনই আচ্ছন্ন হন যে, সমস্ত জীবনে তিনি আর লাভপুর ত্যাগ করতে পারেননি। তাঁর পার্থিব দেহের সমাধি আমি নিজে হাতে রচনা করেছি। সন্ন্যাসী প্রথম জীবনে পল্টনে চাকরি করতেন, তখন তাঁর নাম ছিল বলভদ্র পাণ্ডে। সন্ন্যাসী-জীবনে তাঁর নাম হয়েছিল রামজী-সাধু। আমার ভাগ্যক্রমে রামজী-বাবা—আমার গোঁসাই-বাবাও —ছিলেন অদ্ভুত দক্ষ কথক। আমার জীবনে চারজন প্রথম শ্রেণীর গল্প-কথকের সাক্ষাৎ পেয়েছি। আমার মা, আমার গোঁসাই-বাবা, আর দুজনের সাক্ষাৎ পেয়েছি পরিণত বয়সে—একজন প্রায় আমার সমবয়সী, তিন-চার বৎসরের বড়—তাঁর নাম গৌর ঘোষ। অপরজন ত্রিকাল ভট্টাচার্য—অকস্মাৎ অপরিচিত মানুষটি এসে আমার বাড়িতে অতিথি হয়েছিলেন। ত্রিকাল ভট্টাচার্য এক কালে ছিলেন পেশাদার গল্প-বলিয়ে, তাঁর মতো গল্প-কথক বাংলাদেশে আর কেউ আছেন বলে কল্পনা করতে পারি না। গৌর ঘোষ আশ্চর্য রকম ভালো ভূতের গল্প জানে এবং বলতে পারে। গৌর ভূতের ভয়ে চটি ফেলে ছুটে পালাত, কিন্তু সে যখন ভূতের গল্প বলত তখন ভূত যেন মজলিসের আশেপাশে ঘুরে বেড়াত। বলত—হঠাৎ উ-স শব্দ হল, ছাদ ফুঁড়ে সড়-সড় সড়-সড় করে নেমে এল একটা সদ্যজাত ছেলে, ছেলেটা ওঁয়া-ওঁয়া করে কাঁদছে। গৌর নিজেই ওঁয়া-ওঁয়া শব্দে কঁকিয়ে উঠত, আর মজলিসসুদ্ধ লোক আঁ শব্দ করে আঁতকে উঠত। রামজী-বাবা ভাঙা বাংলায় হিন্দুস্থানী রূপকথা বলতেন। "সহবত অসর, না—তরুম্ তাসীর? জন্মগুণেই বড়, না, শিক্ষা-সহবতের গুণ বড়?" তাঁর গল্পের বড় হত শিক্ষার গুণ, জন্মের গুণকে খাটো করে বলতেন—বাবা সহবৎ—সহবৎই হল সবচেয়ে বড় কথা। রাজার ছেলে মুরুখ হলে সে ভূত, সে জানোয়ার। সন্ধ্যায় আসতেন—আমি পড়া সেরে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করতাম, রাস্তার দিকে কান পেতে থাকতাম, রাস্তার উপর কখন সবল পদধ্বনি বেজে উঠবে, তার সঙ্গে ঝনাৎ করে বাজবে তাঁর চিমটার কড়ার শব্দ। তিনি বৈঠকখানার ফটকে ঢুকেই হেঁকে উঠতেন, "নমো নারায়ণায়।" আমার বাবার বৈঠকখানার মজলিস ছিল বিখ্যাত মজলিস। গ্রামের সকল বিশিষ্ট লোকেরাই এখানে আসতেন, বসতেন। চায়ের ব্যবস্থা ছিল—সমারোহের ব্যবস্থা। এক-একবারে

বিশ থেকে ত্রিশ কাপ চা তৈরি হত। চায়ের জন্য স্বতন্ত্র ঘর ছিল, সে ঘরে উনান নিবত না। কল্কের-পর-কল্কেতে তামাক সাজা থাকত। আমার অনন্ত দাদা বাবার খাস খানসামা, সে চিমটে ধরে তাতে আগুন চড়াত। মজলিসে গ্রামের সামাজিক, বৈষয়িক আলোচনা চলত কিছুক্ষণ, তারপর ধর্মশাস্ত্র আলোচনা হত। গোঁসাই-বাবা এলেই সকলে উঠে দাঁড়াতেন। গোঁসাই বাবার কিন্তু সে ঘরে ঢোকবার উপায় ছিল না। তিনি এসে ঢুকতেন আমার পড়ার ঘরে।

বাবা হামার—বাবা হামার—বাবা হামার রে!

আমি লাফ দিয়ে উঠে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে ঝুলে পড়তাম, তিনি বুকে তুলে নিয়ে বলতেন—আজ তো বাবা, লড়াইকে গল্প বলবে। মণিপুরকে গল্প।

মণিপুরের টিকেন্দ্রজিত মহাবীর, মহাভারতের পাণ্ডব-বংশধর। মণিপুর-রাজ-কন্যা চিত্রাঙ্গদার গর্ভজাত মহাবীর বভ্রুবাহন তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের পুত্র। শুধু তাই নয়, পাণ্ডবের অশ্বমেধযজ্ঞের ঘোড়া নিয়ে বভ্রুবাহন ও অর্জুনে—পিতাপুত্রে মহাযুদ্ধ হয়েছিল। সে যুদ্ধে অর্জুনকে পরাজিত করেছিলেন বভ্রুবাহন। সেই বংশের সন্তান টিকেন্দ্রজিত। তাঁরই গল্প।—টিকেন্দ্রজিত বীর হইলে কি হোবে বাবা, আংরেজকে কামান—আরে বাপ রে বাপ—সে ছুটল—দনা-নৃ-নৃ-নৃ। দনা-নৃ-নৃ-নৃ! আমার চোখের সামনে ভেঙে ভেঙে পড়ত দুর্গপ্রাকার। চোখে আসত জল।

মধ্য পথে অনন্ত দাদা অথবা ভীমসিং চাপরাশী আসত বাড়ির ভিতর থেকে, আমার পিসিমায়ের তাগিদ নিয়ে। তিনি আমার জন্য বসে আছেন। খাইয়ে-দাইয়ে আমাকে নিয়ে শোবেন গিয়ে। আমার পিসিমা শৈলজা দেবী আগুনের মতো উত্তপ্ত। আমিই ছিলাম সে উত্তাপে জল। প্রথম জীবনে বাইশ-তেইশ বৎসর বয়সে একই দিনে কলেরায় স্বামী-পুত্র হারিয়ে পিত্রালয়ে এসেছিলেন ; বুকে নিয়ে এসেছিলেন জ্বলন্ত চিতাবহ্নি। সে বহ্নিতে কারও নিস্তার ছিল না। আমি যখন জন্মালাম, তখন তিনি মায়ের কোল থেকে আমাকে নিয়ে পালন করতে আরম্ভ করলেন এবং জীবনের উত্তাপও কমে আসতে আরম্ভ হল। আমারও পিসিমার কোলের কাছটি ছাড়া ঘুম আসত না। কিন্তু তিনি মাত্র একটি গল্প জানতেন। কাজেই আমার গল্প না-শোনা-পর্যন্ত তাঁকে বসে ঢুলতে হত। ঢুলতেন আর গোঁসাই-বাবাকে তিরস্কার করতেন।

গোঁসাই-বাবার এ সব তিরস্কার কানে ঢুকত না। তিনি গল্প বলতেন, দনা-নৃ-নৃ-নৃন দনা-নৃ-নৃ-নৃন।

আট

গল্প শুধু আমিই শুনতাম না, ছেলেরাই শুনত না, সেকালে বড়দের আসরেও গল্প হত। বাবার বৈঠকখানাই ছিল গ্রামের মধ্যে সব চেয়ে জমজমাট আসর। সকাল থেকে গ্রামের ভদ্রজনদের আসা শুরু হত। সকালবেলা আটটা নাগাদ চায়ের আসর

জমে উঠত ; তিরিশ থেকে চল্লিশ জন ভদ্রলোক এসে বসে যেতেন। বাবার খাস খানসামা ছিল আমার অনন্তদা। গ্রামেরই বৈষ্ণব-ঘরের ছেলে। ছেলে বয়স থেকে আছে, বাবা নিজে কাজ শিখিয়েছিলেন। কাপড় কোঁচানো, চা তৈরি, গা-হাত টেপা ইত্যাদি তরিতের কাজে অনন্ত দাদার মতো নিপুণ শিল্পী সচরাচর দেখা যায় না। অনন্তদা ভোরবেলা উঠে চায়ের সরঞ্জাম, তামাকের সরঞ্জাম তৈরি করে অপেক্ষা করত। একটা স্বতন্ত্র ঘরই ছিল চা এবং তামাকের। বেলা একটা পর্যন্ত চলত মজলিস, তারপর আবার মজলিস বসত সন্ধ্যা আটটা থেকে : রাত্রি বারোটা বাজতই, কোনো কোনো দিন রাত্রি দেড়টা দুটোও বাজত। সেদিন খাওয়া-দাওয়ার আসরও বসে যেত। গ্রামে জামাই বেয়াই কুটুম্ব যার বাড়িতেই যিনি আসতেন তিনিই আসতেন এই মজলিসে। কয়েকজন—সাত-আটজন ছিলেন আসরের প্রায় চব্বিশ ঘণ্টার মানুষ। এঁদের মধ্যে গ্রামের ঘরজামাই দু-তিনজন। বাকি গ্রামের ভদ্রজন। তুমুল উত্তেজিত আলোচনা চলত। বৈষয়িক তর্ক, সামাজিক বিচারের তর্ক। আবার উঠত হাস্য-পরিহাসে হাস্যরোল। সে কী হাসি! রাত্রির অন্ধকার শিউরে উঠত। একালে সেকালের মানুষের সে-স্বাস্থ্যও নাই, সে-কণ্ঠস্বরও নাই, তেমন করে প্রাণ খুলে হাসবার প্রবৃত্তিও নাই ; একালে সে-হাসি আর নাই। এক সময় মনে হত হয়তো-বা সভ্যতাই সে-হাসির উৎসমুখে অনুশাসনের পাথর চাপা দিয়েছে ; উচ্ছ্বাস আর সেই স্বচ্ছন্দ বেগবতী ধারায় নির্গমন-পথ পায় না। কিন্তু একদিন বোধ করি ১৯২২।২৩ সালে সে-ভ্রম আমার গিয়েছিল। তখন আমি কলকাতায় ভবানীপুর বেলতলা রোডে স্বর্গীয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের বাড়ির ঠিক পিছনের দিকের বাড়িতে থাকি। আমি যে ঘরটিতে থাকতাম, সে-ঘরের পশ্চিম দিকের জানালা থেকে দাশ মহাশয়ের বাড়ির দোতলার ঘরের কিছুটা দেখা যায়। বাড়ির বিস্তীর্ণ হাতার সবটা তো দেখা যেতই। তখন প্রথম বাসায় এসেছি। সেই বাড়ির নিচের তলায় সন্ধ্যাবেলা বসবার ঘরে বসে আছি, হঠাৎ একটা কোলাহল উঠল। সে কী কোলাহল, কোথায় যেন অকস্মাৎ অভাবনীয় কিছু ঘটে গেল! তখন ভবানীপুর এ-ভবানীপুর ছিল না, দেশবন্ধুর বাড়ির সামনে রসা রোডের পশ্চিম দিকে প্রকাণ্ড মাঠ পড়ে ছিল ; পূর্ণ থিয়েটারও তখন হয়নি। ওদিকটা সবই তখন হয় মাঠ, নয় বস্তি। কোলাহল শুনে প্রায় সবাই ছুটে বেরিয়ে গেল। রাস্তায় যখন বেরুলাম তখন আর কোলাহল নাই। কি হল? দুর্ঘটনার কোলাহল কি এইভাবে মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে যায়? দেশবন্ধুর বাড়ির পূর্ব দিকের ছোট ফটকে বসে ছিল একজন দ্বারপাল : সে বুঝতে পেরেছিল আমাদের মনের জিজ্ঞাসা। সে হেসে বলেছিল, যা ভেবেছেন বাবু, তা নয়, হয়নি কিছু, সাহেবরা হাসছেন। হাঁ, হাসি বটে! সেদিনও মনে পড়েছিল বাবার মজলিসের হাসি। একালের দোষ নাই, পরিপূর্ণ প্রাণশক্তি স্বাস্থ্য-স্বাচ্ছন্দ্যের উপর নির্ভর করে। আজ স্বাচ্ছন্দ্য নাই, স্বাস্থ্য নাই, কাজেই প্রাণশক্তি অপূর্ণাঙ্গ শিশুর মতো দুর্বল রুগ্‌ণ ; সে-হাসি হাসবে কি করে মানুষ!

বাবার মজলিসে গল্প হত।

গল্প বেশির ভাগ বলতেন গোঁসাই-বাবা।

বাবাও বলতেন। তিনি কথাবার্তা খুব ভালো বলতেন। বক্তা ছিলেন ভালো, কথায় জোর ছিল, কিন্তু গল্প-কথক ভালো ছিলেন না। তিনি বেশির ভাগ গল্প বলতেন বেতাল পঞ্চবিংশতির গল্প বা ওই ধরনের গল্প। গল্পের শেষে প্রশ্ন থাকত। প্রশ্নটি উত্থাপন করে বলতেন, বল, কার কি উত্তর। সব শেষে তিনি বলতেন গল্পের উত্তর।

একটা গল্প—চার বন্ধু—একজন কাষ্ঠশিল্পী, একজন চিত্রশিল্পী, একজন বস্ত্র ও ভূষণশিল্পী, একজন মন্ত্রসিদ্ধ তাপসপুত্র—একদিন বনের মধ্যে রাত্রে একটা গাছ-তলায় আশ্রয় নিলেন। কথা হল, গভীর বন—এই বনে এক-একজন এক-এক প্রহর জেগে পাহারা দেবেন। প্রথম প্রহরে প্রহরার ভার পড়ল কাষ্ঠশিল্পীর উপর। বন্ধুরা ঘুমুচ্ছে, তিনি একা বসে আছেন, সামনে জ্বলছে এক অগ্নিকুণ্ড, পাশে কিছু শুকনা কাঠ। একা, নিতান্ত খেয়ালবশেই তিনি নিজের যন্ত্র বের করে কাঠ থেকে গড়লেন এক অপূর্ব নারীমূর্তি। মূর্তিটিও শেষ হল, প্রথম প্রহরশেষের ঘোষণাও বেজে উঠল, কাষ্ঠশিল্পী ডেকে দিলেন চিত্রশিল্পীকে। নিজে শুয়ে পড়লেন। চিত্র-শিল্পীর চোখে পড়ল সেই কাঠের নারীমূর্তি। বুঝলেন, বন্ধুর কাজ এটি। তিনি এবার নিজের সরঞ্জাম বের করে তাতে রঙ দিলেন। গোলাপ ফুলের মতো দেহবর্ণে উজ্জ্বল করে দিলেন, চোখ আঁকলেন, ভুরু আঁকলেন। গাছের বাকল থেকে আঁশ বের করে এক রাশি কালো রঙ দিয়ে চুল করে দিলেন, নখ আঁকলেন, গালে একটি ছোট তিল—তাও দিতে ভুললেন না। শেষ করলেন, বার বার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলেন, মনোমতো হলে তুলি রেখে বসলেন। এমন সময় দ্বিতীয় প্রহর ঘোষণা করে যামঘোষকেরা কোলাহল করে। চিত্রশিল্পী মূর্তিটিকে একটি গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে সরঞ্জাম গুটিয়ে শুয়ে পড়লেন, ডেকে দিলেন বস্ত্র ও ভূষণ-শিল্পীকে। তিনি উঠে আগুনটাকে জোর করে দিয়ে বসলেন, মূর্তিটিকে দেখে চমকে উঠলেন, এই নগ্না সুন্দরী নারী—এ কে? কোনো বনদেবী? না, দেবী এমন লজ্জাহীনা নগ্না হবে কেন? তবে কি মায়াবিনী? না, তাও তো নয়। মায়াবিনী এমন নিস্পন্দ স্থির কেন, তার হাবভাব ছলাকলা কই? ভালো করে চোখ রগড়ালেন : এবার বুঝলেন, দুই বন্ধুর কীর্তি এটি। হাসলেন, এবং পরক্ষণেই নিজের ব্যবসায়ের কাপড় এবং আভরণের বোঁচকা পেটিকা খুলে বসলেন। বেছে মানানসই রঙের পট্টবস্ত্র বের করলেন, আভরণ বের করলেন, পুতুলটিকে মনের মতো করে সাজালেন। তারপর তৃতীয় প্রহর শেষ হতেই মন্ত্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণপুত্রকে জাগিয়ে নিজে শুলেন। ব্রাহ্মণপুত্র কিন্তু প্রতারিত হলেন না, তিনি এই অনুপম রূপলাবণ্যময়ী পুতুলটিকে দেখবামাত্র বুঝলেন যে, এটি প্রাণহীন পুত্তলিকা মাত্র এবং তিন বন্ধুর তিন প্রহরের আপন-আপন গুণপনার ফল এই মূর্তিটিকে দেখে খুব খুশি হলেন। সঙ্গে সঙ্গে স্থির করলেন যে, তাঁর গুণপরিচয় এর সঙ্গে যোগ করে দেওয়াই তাঁর কর্তব্য। তা হলেই চার বন্ধুর এই রাত্রিযাপনটি পরম সার্থক হয়ে উঠবে। তখন মন্ত্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণপুত্র পুতুলটিকে অগ্নিকুণ্ডের সামনে এনে রাখলেন, কুণ্ডের

অগ্নিকে মন্ত্র দ্বারা সঞ্জীবনী অগ্নিতে পরিণত করলেন, তারপর মন্ত্রজপে বসলেন। মন্ত্রজপ শেষ করে অগ্নিতে আহুতি দিয়ে তারই তিলক এবং উত্তাপে অভিষেক করতেই পুত্তলিকা জীবন লাভ করে চঞ্চল বিস্ময়ে চারিদিকে তাকিয়ে বললে—তুমি কে? আমিই বা কে?

এমন সময় ভোর হল। পাখিরা ডেকে উঠল। ঘুমন্ত তিন বন্ধু জেগে উঠে বসলেন, এবং এই অপূর্ব নারীকে দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন। বিস্ময় কাটতেই কিন্তু সূত্রপাত হল কলহের। চারজনেই বললেন, এ আমার সৃষ্টি—এ হবে আমার পত্নী।

এখন কে বিচার করবে—এ নারী কার প্রাপ্য?

প্রশ্ন হত—বল, তোমরা বল। কে পাবে এই নারীকে?

গল্প থেকে বিতর্ক উপস্থিত হত। যুক্তির উপর ভিত্তি করে বিতর্ক এবং শাস্ত্রীয় যুক্তি। সকলের শেষে বাবা বলতেন গল্পের মীমাংসা। এ গল্পের মীমাংসা, ওই নারীকে পত্নীরূপে পাবেন ওই বস্ত্র এবং আভরণশিল্পী। প্রাণদাতা ব্রাহ্মণপুত্র পিতার কাজ করেছেন—তিনি দিয়েছেন প্রাণশক্তি; চিত্রশিল্পী ও কাষ্ঠশিল্পী তাঁরা মায়ের কাজ করেছেন, দিয়েছেন অস্থি মেদ মজ্জা মাংস রক্ত অবয়ব। ওই বস্ত্র এবং আভরণশিল্পী সদাগরপুত্র বস্ত্র এবং আভরণ দিয়ে ভর্তার কাজ করেছেন। তিনিই তার ভর্তা অর্থাৎ স্বামী।

কখনও কখনও পুরাণের গল্প হত। তা থেকে চলে যেতেন শাস্ত্র আলোচনায়। কখনও কখনও হত দেশ-বিদেশের গল্প, কেউ আগন্তুক অথবা বিদেশবাসী গ্রামে ফিরলে সে গল্প হত।—সে তোমাদের কত বলব বাপু! সে-দেশ আচ্ছা দেশ! আচ্ছা দেশ! যত মাছ—তত দুধ, সে-দুধে ঘি কত হে! হাতে লাগলে ছাড়তে চায় না। পদ্মার ধার—বুয়েচ না—এই পদ্মা—একূল-ওকূল নজর চলে না—বর্ষার সময় সাক্ষাৎ ভৈরবী—সে বাবু দেখেই আমার হৃৎকম্প! কালী কালী বল মন, রাত্রে শুয়ে ঘুম হত না। ভাবতাম ঘুমবো, কখন ধ্বস ছাড়বে—অকূলে ভাসব! আঃ, হায়-হায়-হায়, জপের মালাটা নিতে সময় পাব না রে বাবা! ভুক করে ডুবব, আর উঠব না। একেবারে সাগরসঙ্গমের তলদেশে মাটিচাপা...নয়তো হাঙ্গর-কুম্ভীরের গর্ভে। বর্ষা পার হলেই বাস্। রাজশাহী তো রাজসাহী রে বাবা!

এর পর চুপি চুপি বলতেন—গাঁজার এক-একটা জটা কী! এ-ই এতখানি লম্বা আর ইয়া পুরু। বুয়েচ না ভাই, রসও কী তেমনি! দু-টিপ দিয়েছ তো আঠা একেবারে চট চট করে উঠল। তেজও কী তেমনি রে বাবা! বুয়েচ হরাই ভাই, প্রথম গিয়েছি—এত তো জানি না—মেরেছি জোরে টান। বাস্, গল-গল করে সেই যে ধোঁয়া বেরিয়ে চোখের সামনেটা ঝাপসা করে দিল—তিন দিন সে-ঝাপসা কাটে না চোখের। পোস্টাপিসের কাজ, চোখে ঝাপসা দেখি, মাথা ভোঁ-ভোঁ করে—তিন আর চারে সাত লিখতে গিয়ে ভাবি, ঠিক হল তো, তিন আর চারে পাঁচ নয় তো? সে এক বিপদ! কালী কালী বল—তারা তারা বল—শিব শিব বল। হরি বোল—হরি বোল।

ইনি ছিলেন আমার ব্রজজ্যাঠা। এমন সদানন্দময় পুরুষ পৃথিবীতে বিরল। সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন. পোস্টাপিসে কাজ করতেন, সরকার-বংশের সন্তান, লাভপুরে এ'দের বাড়িরই দৌহিত্র আমরা। অপরূপ মানুষ ছিলেন ব্রজজ্যাঠা।

ব্রজজ্যাঠার কথা মনে পড়লে—কত বিচিত্র কাহিনী যে মনে পড়ে! ব্রজজ্যাঠা সেকালে ফ্রেঞ্চ-ছাট দাড়ি-গোঁফ রাখতেন, দেখতে ছিলেন সুশ্রী মানুষ, কণ্ঠস্বর ছিল সুমিষ্ট। গান গাইতে পারতেন। ছুটিছাটায় বাড়ি এসে গ্রামের পথে বেরিয়েই গান ধরতেন—"আজ তোমারে দেখতে এলেম অনেক দিনের পরে।" গান শেষ করতেন আমাদের বৈঠকখানার দরজায়। ঘরে ঢুকেই ডাকতেন—ভাই কানাই! ভাই হরাই! আমার বাবার নাম ছিল—হরিদাস, তাঁকে আদর করে ডাকতেন—হরাই।

বিচিত্র মানুষ। পেন্সন নেবার পর একবার বর্ধমান গিয়েছিলেন বর্ধমানে মেডিকেল স্কুলে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য। পেন্সন বিক্রির অভিপ্রায় ছিল। গিয়ে উঠেছিলেন আমাদের গ্রামের শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়ের বাসায়। তিনি ছিলেন তখন বর্ধমানের পুলিশ কর্মচারী। নিত্যগোপালবাবুর কথা পরে বলব। এখানে শুধু এইটুকু বলব যে, এই মানুষটি ছিলেন যেমন রূপবান, তেমনই সুকণ্ঠ গায়ক ; যেমন উঁচু মেজাজের লোক, তেমনই ছিলেন জনপ্রিয়। ব্রজবাবুকে পেয়ে নিত্যগোপালবাবু কৃতার্থ হয়ে দু-একদিনের বেশি রাখতে চেয়েছিলেন। ব্রজজ্যাঠা কিন্তু কিছুতেই থাকবেন না। রসিক মানুষ, শেষ পর্যন্ত বললেন—গোপাল, আমি তা হলে ক্ষেপে যাব। বাড়িতে বুড়ী আছে, তার জন্য আমার মন কেমন করছে। আমি কি আর থাকতে পারি? ধরে রাখলে গোবধ ব্রহ্মবধ হবে রে ছোঁড়া! তার পাপ তোকে অর্সাবে।

অবশেষে নিত্যগোপালবাবু কৌশল অবলম্বন করলেন। ব্রজজ্যাঠার জুতো-জোড়াটি সরিয়ে রাখলেন। ব্রজজ্যাঠা জুতো না পেয়ে শেষে ধপাস করে বসে পড়ে মাথায় হাত দিয়ে বললেন—আমার সর্বনাশ হল রে গোপাল, আমার সর্বনাশ হল।

নিত্যগোপালবাবু বললেন, এক জোড়া জুতোতে আপনার সর্বনাশ হল?

—ওরে ভাই, তুই জানিস না। জুতো-জোড়া আমার নয়—শম্ভুর জুতো আমি চেয়ে নিয়ে এসেছি ভাই। আঃ, শেষ পর্যন্ত ললাটে কি আছে তা বুঝতে পারছি না আমি। হায়-হায়-হায়! আমি এখন করব কি!

—কি করবেন? আমার বাড়ি থেকে জুতো গিয়েছে—আমি কিনে দেব।

—ওরে, শম্ভুকে জানিস না রে, শম্ভুকে জানিস না তুই।

শম্ভু সরকার দুর্দান্ত ক্রোধী লোক, নিত্যগোপালবাবুরই বয়সী, অন্তরঙ্গ বন্ধু। লেখাপড়া বিশেষ করেন নাই—প্রচণ্ড শক্তিশালী মানুষ, তার উপর দুর্দান্ত ক্রোধী—নিত্যগোপালবাবুর বয়সী এবং বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও প্রাচীনকালের তন্ত্রমন্ত্রের অন্ধ ভক্ত; গ্রামের লোকে তাঁর ভয়ে ত্রস্ত। গোপালবাবু হেসে বললেন—আমি সে-জোড়ার চেয়ে দামী ভালো জুতো কিনে দেব দাদা।

এবার ব্রজজ্যাঠা কেঁদে ফেলে বললেন, ওরে, শম্ভুকে তুই জানিস না গোপাল,

সে যদি বলে—আমার সেই জোড়াটির চেয়ে ভালো জুতো আর হয় না, আমার সেই জোড়াটিই চাই?

তৎক্ষণাৎ নিত্যগোপালবাবুকে জুতো বের করে দিতে হল।

এর অনেক দিন পরে—আর একটি ঘটনা বলি। ব্রজজ্যাঠার তখন শরীর ভেঙেছে, আমার বাবার অনেক দিন আগেই মৃত্যু হয়েছে। আড্ডা নাই। ব্রজজ্যাঠা তাঁর পাড়ার কাছাকাছি এক ভদ্রলোকের বৈঠকখানায় বসেন। লোকজন থাকলেও বসেন, কেউ না-থাকলেও এসে বারান্দায় বেঞ্চে বসে থাকেন। যাঁর বৈঠকখানা তিনি জীবনে কৃতী ব্যক্তি, ধনী মানুষ। কিন্তু আকস্মিক পত্নী-বিয়োগে অহরহ মদ্যপান করে—হয় পড়ে থাকেন, নয় প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রের সঙ্গে বৈষয়িক কর্তৃত্ব নিয়ে প্রচণ্ড কলহ করেন। ছেলে কলেজে তখন বি. এ. পড়ে। ঘটনার দিন সকালবেলা থেকেই পিতাপুত্রে বাদানুবাদ চলছিল। সকালে পিতা অনেকখানি প্রকৃতিস্থ ছিলেন, ছেলের প্রতিবাদের উত্তরে যুক্তিপূর্ণ কিছু বলতে না পেরে ক্রুদ্ধ হয়ে বেরিয়ে চলে গেলেন। ছেলে বেঞ্চে বসেই রইল। তারপর সেও উঠে গেল। কিছুক্ষণ পর প্রচুর পরিমাণে মদ্যপান করে বাপ ফিরে এলেন। দেখলেন, বেঞ্চে ছেলে বসে রয়েছেন। তিনি কিন্তু ছেলে নন, তিনি আমার ব্রজজ্যাঠা। ভদ্রলোকের ছেলে উঠে যাবার পর তিনি এসে চুপ করে একলাটিই বসে আছেন। ক্রোধে মদ্যপানে আত্মহারা ভদ্রলোক একেবারে জুতো খুলেই ছেলে ভ্রমে ব্রজজ্যাঠাকেই প্রহার করতে শুরু করলেন, তবে রে ব্যাটা হারাম-জাদা, তবে রে নচ্ছার—ব্রজজ্যাঠা কয়েক মুহূর্ত হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন, তারপর হাত তুলে নিজের দাড়ি দেখিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, ও অমুক, আমি—ওরে, আমার পাকাদাড়ি! ওরে, তোর অপরাধ হবে!

ভদ্রলোক দাড়ি দেখেই থেমেছিলেন। তার পরই তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়লেন। ব্রজজ্যাঠা তাঁকে বুকে তুলে নিয়ে কাঁদতে লাগলেন ভদ্রলোকের মৃতা পত্নীর নাম ধরে—আঃ, তুই এ কী করে গেলি মা! হায়-হায়-হায়! সোনার মানুষ, এ কী হয়ে গেল তোর বিহনে!

ব্রজজ্যাঠা বাংলা দেশের পোস্টাপিসের কাজে যেখানে গিয়েছিলেন সেখানকার খাওয়া-দাওয়া স্বাচ্ছন্দ্যের গল্প বলতেন। মানকরের কদমা, দুবরাজপুরের বাতাসা, সিউড়ির মোরব্বা, কাঁদির মনোহরা, জয়নগরের মোয়া, গুপ্তিপাড়ার মণ্ডার গল্প ছেলেবেলায় ব্রজজ্যাঠার মুখেই শুনেছিলাম। দুই-দই-ঘি-মাছ-মাংস ইত্যাদির দর পর্যন্ত মুখস্থ ছিল তাঁর। শুধু তাই নয়, কোথায় কোন্ সাধুর কত বড় জটা দেখেছেন, কোন্ মিঞা সাহেবের কত লম্বা দাড়ি দেখেছেন, কোন্ জমিদারের বাড়িতে কত বড় ও কত ভয়ালদর্শন কুকুর দেখেছেন, সেগুলি নিখুঁতভাবে বর্ণনা করতেন।

কেদার চাটুজ্জে গল্প বলতেন। ইনি ছিলেন আমাদের গ্রামের জামাই। ঘর-জামাই ছিলেন না, তবে তাঁর নিজের পৈত্রিক ভিটা গুপ্তিপাড়ার সঙ্গেও সম্ভবত বিশেষ সংশ্রব ছিল না। ইংরেজি-জানা মানুষ, সরকারী আবগারী বিভাগের সাব-ইনস্পেক্টর ছিলেন এবং নিজেও ছিলেন আবগারী বিভাগের একজন সত্যকার

পৃষ্ঠপোষক। অতিরিক্ত মদ্যপান করে কর্তব্যকর্মে অবহেলার জন্যই মধ্যে মধ্যে সস্‌পেণ্ড হতেন। সস্‌পেণ্ড হলেই লাভপুরে এসে উঠতেন। শ্বশুরও ছিলেন সেকালের তান্ত্রিক। ঝাঁকড়া চুল, ঝাঁকড়া দাড়ি-গোঁফ; মুখে বিচিত্র শব্দ করতে পারতেন—বাঁশীর শব্দ, জন্তু-জানোয়ারের শব্দ ; মন্ত্রতন্ত্র জানতেন, কুকুর কামড়ালে বিষ ঝাড়তেন, সাপের বিষের মন্ত্র জানতেন, চব্বিশ ঘণ্টাই নাকের একটা রন্ধ্রে একটা পাথর রেখে এক রন্ধ্রেই নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালাতেন। সমস্ত দিনই প্রায় একটা গাইয়ের দড়ি ধরে তাকে চরিয়ে নিয়ে বেড়াতেন। জামাইয়ের সঙ্গে খুব বনাবনতি হত না শ্বশুরের। উভয়ে প্রায় সমবয়সীই ছিলেন। জামাই এসে শ্বশুর-বাড়িতে উঠলেও খাওয়ার সময় এবং শোবার সময়টুকু বাদ দিয়ে বাকি সময়টা থাকতেন আমার বাবার আড্ডায়। তাঁর ছিল বড় বড় গল্প। রাজা-উজীর আমীর-ওমরার কথা। লোকে বিরক্ত হলেও কিছু বলত না। অমুক দাদা কি অমুক কাকার জামাই, তাকে কি কখনও কিছু বলা যায়! সেকালের সমাজের এই ছিল প্রথা। জামাই, বিশেষ করে কুলীন-ঘরের জামাই, তার সব দোষ শত ঔদ্ধত্যও ছিল মার্জনীয়।

আর প্রায়ই আসতেন সাধু সন্ন্যাসীর দল। গ্রামে আমাদের একান্ন মহাপীঠের অন্যতম মহাপীঠ বলে খ্যাত ফুল্লরা দেবীর স্থান পবিত্র তীর্থ, শাক্ত সাধু-সন্ন্যাসী প্রতিদিনই দু-চারজন আসতেন যেতেন।

দু-একজন কিছু দিন ধরেই থাকতেন। কেউ সাধনা করতেন, কেউ দিন গুজরান করতেন দেবস্থলের প্রসাদান্নে। এঁদের মধ্যে আসতেন পর্যটক সাধুর দল। ফুল্লরা মহাপীঠে তাঁরা এলে আমাদের তারা-মায়ের আশ্রমে রামজী-বাবার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হত। বাবারও খ্যাতি ছিল সাধুপ্রীতির এবং শাস্ত্র-আলোচনার, সেই হেতু তাঁরা আসতেন আমাদের বৈঠকখানায়। বাবা সাধু-ভোজন করাতেন। পশ্চিম-দেশীয় সাধুরা আমাদের বাড়ির আতিথ্যে সত্য-সত্যই পরম পরিতৃপ্ত হতেন। তার কারণ পশ্চিম-প্রবাসী বাড়ির কন্যা আমার মা তাঁদের ছাতুভরা রুটি তৈরি করে অতিথি-সৎকার করতেন। পরম উপাদেয় খাদ্য ; ছাতুখোর বলে যাঁরা পশ্চিম-দেশীয়দের ব্যঙ্গ করতেন সেকালে তাঁরাও এই ছাতুভরা রুটি খেয়ে বলতেন—ভাই হরিবাবু, আর একদিন ছাতুভরা রুটি খাওয়াতে হবে।

এই সাধুরা করতেন দুর্গম তীর্থস্থলের গল্প।

তাঁদের মুখেই ছেলেবেলায় শুনেছিলাম, লছমনঝোলার দড়ির সাঁকোর কথা। মনে আছে, শিশু-কল্পনাতেই দেখেছিলাম দু-দিকে খাড়া পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে গাছপালা, দুই খাড়া পাহাড়ের মধ্যে অনেক নিচে গঙ্গা বয়ে চলেছে প্রচণ্ড বেগে, সেই প্রচণ্ড বেগে—যে বেগে ইন্দ্রের ঐরাবত গিয়েছিল ভেসে। আর তার উপরে দড়ির পুল, দুখানা পাশাপাশি দড়িতে কাঠের টুকরো লাগানো, মাথার উপরে আরো দুটো দড়ি, দড়ি ধরে দড়িতে বাঁধা কাঠে পা দিয়ে চলতে গেলে দোলে, মানুষের মাথা ঘোরে। হাতের মুঠি খুলে গেলে পা ফসকে গেল ; মানুষ পড়ছে মাথা নিচু করে নিচে, নিচে—আরও নিচে, তারপর আর দেখা গেল না। শরীর

শিউরে উঠল। বলতেন, বদরী-নারায়ণের কথা, কেদারমঠের ও যোশীমঠের কথা, মানস-সরোবরের কথা, জ্বালামুখী কামাখ্যা-তীর্থের কথা।

পুজোর পর মাস-দ মধ্যে আসতেন অনেক গায়ক। কাপড়ের খোলে সযত্নে ঢাকা তানপুরা বগলে নিয়ে এসে উঠতেন। তাঁদের কারুর কাছে শুনেছিলাম তানসেনের গল্প। শুনেছিলাম, আকবরশাহ একদা তানসেনের প্রতিপক্ষের মুখে দীপকরাগ শুনে চমৎকৃত হলেন—গানের মহিমায় শামাদান-ঝাড়ে বাতি জ্বলে উঠল। প্রতিপক্ষ সুযোগ পেয়ে বললেন—তানসেন যদি দীপক গায়, তবে আগুন জ্বলে উঠবে দাউ দাউ করে। বাদশা ধরলেন তানসেনকে। তানসেন প্রথমে রাজী হননি, অবশেষে বাধ্য হয়ে রাজী হলেন। গাইলেন দীপক এবং আগুন জ্বলল, তাতেই তিনি পুড়ে গেলেন। যাঁদের মল্লার গেয়ে মেঘ এনে বর্ষণ করাবার কথা ছিল, তাঁরা তো তানসেনের মতো সংগীতসিদ্ধ ছিলেন না—কাজেই তাঁরা পারলেন না মেঘ এনে তাকে গলিয়ে বর্ষণ নামাতে। যে গায়কেরা আসতেন, গ্রামের প্রতিষ্ঠাবানদের বাড়িতে তাঁদের বাৎসরিক বৃত্তি ছিল। কোথাও এক টাকা, কোথাও দু-টাকা, কোথাও বা চার টাকা। অনেক বিভক্ত প্রতিষ্ঠাবান বংশের ঘরে—চার আনা আট আনা হিসাবে বৃত্তি পেতেন। গান শোনাতেন, গল্প শোনাতেন। পুরানো কালের গায়কদের গল্প, নূতন কালের গায়কদের গল্প। সেতারী আসতেন। মধ্যে মধ্যে জ্যোতিষী আসতেন। দেশের জ্যোতিষী, বিদেশের অপরিচিত জ্যোতিষী। এঁদের কাছেও গল্প শুনেছি। দুটো একটা গল্প মনে রয়েছে।

এক ছিলেন অভ্রান্ত জ্যোতিষী। তাঁর যেমন সূক্ষ্ম গণনা, তেমনই ছিল নির্ভুল বিচার। তাঁর এক কন্যা হল পরমাসুন্দরী। কন্যার অদৃষ্ট গণনা করে দেখলেন—অদৃষ্টে রয়েছে বাসর-বৈধব্যের যোগ।

মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। অনেক ভেবে কঠিন সংকল্প নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। একটি যুগের ক্ষণ-লগ্ন গণনা করে এমনই একটি দিন ও লগ্ন আবিষ্কার করলেন, যে লগ্নের এক অতি দুর্লভ গ্রহ-সমাবেশের ফলে এক অমৃতময় বিবাহযোগের সৃষ্টি হয়েছে। এমন পুণ্য লগ্ন বহু বর্ষ পরে আসে। যুগে একবার আসে। এ লগ্নে কন্যার বিবাহ হলে বৈধব্য হতে পারে না। তিনি সেই লগ্নে কন্যার বিবাহ দিয়ে বিধিলিপি খণ্ডন করবেন স্থির করলেন। নিজে বালিঘড়ি ধরে লগ্ননির্ণয়ের জন্য বসলেন। ক্ষণ গণনা করে চলেছেন, পাশে দাঁড়িয়ে দেখছেন বিবাহসজ্জায় সজ্জিত কন্যা; মধ্যে মধ্যে নূতন আভরণগুলি নাড়ছেন। বিখ্যাত জ্যোতিষী, তাঁর কন্যার বিবাহ; কত রাজা কত ধনী কত মহাজন আভরণ যৌতুক দিয়েছেন, মণি-মুক্তার আভরণ, তাতে বিভূষিতা হয়ে মেয়েটির আনন্দ হয়েছে প্রচুর, সেকথা বলাই বাহুল্য। হঠাৎ মেয়েটি চকিত হয়ে বলে উঠল—যাঃ! তার গলার একটি মালা ছিঁড়ে গেছে! ঝরঝর করে খসে পড়ে গেল মুক্তাগুলি। জ্যোতিষী চকিতের জন্য দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখে আবার নিজের কাজে মন দিলেন। বালির পাত্রের দিকে চেয়ে রইলেন। ঝুরঝুর করে বালি ঝরে পড়ছে। তিনি বললেন, যাক। যেতে দাও। লগ্ন এল, বিবাহ আরম্ভ হল।

জ্যোতিষী কঠিন হেসে আকাশের দিকে তাকিয়ে বিধাতাকে বলতে চাইলেন, তোমার বিধান লঙ্ঘিত হবে, এর জন্য অপরাধী আমাকে করো না। অপরাধ আমার নয়। যে বিদ্যা তোমার মানস-কন্যা, অপরাধ যদি হয়—অপরাধ তার। এ তারই প্রসাদ।

কিন্তু ওকথা বলা শেষ হয় না তাঁর। আকাশের দিকে তাকিয়েই তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। একি! আকাশে কোটী কোটী নক্ষত্র ঝলমল করছে, তারই মধ্যে তাঁর দৃষ্টি দেখতে পাচ্ছে গ্রহ নক্ষত্র সংস্থানের অবস্থা ; যেমন নাকি সমুদ্রতটের অসংখ্য শুক্তির মধ্যে মণিকার চিনতে পারে কোন্‌টি কোন্‌টি মুক্তাগর্ভ শুক্তি। এই বৃষ, ওই মিথুন। কিন্তু যে-লগ্ন তিনি গণনা করেছেন তাতে চন্দ্রের তো এই রাশিতে অবস্থানের কথা নয়। এ সংস্থান তো সে-লগ্নের পরবর্তী কালের অবস্থান! পাগলের মতো তিনি ছুটে গেলেন বালিঘড়ির কাছে। কি হল! দেখলেন, বালু-নির্গমনের নালিকার মধ্যে আশ্চর্যভাবে তখনও একটি মুক্তার অর্ধাংশ আটকে রয়েছে। বুঝলেন, তিনি যে মুহূর্তে চকিতের জন্য ফিরে তাকিয়েছিলেন—সেই মুহূর্তে একটি মুক্তা ভেঙে তারই আধখানা লাফিয়ে গিয়ে পড়েছে ওই নালিকার মধ্যে এবং আংশিকভাবে পথ রুদ্ধ করে আটকে রয়েছে। তারই ফলে নির্দিষ্ট সময়ের পরিমিত বালুটুকু শেষ হতে অনেক বেশি সময় লেগেছে। লগ্ন সেই অবসরে অতিক্রান্ত হয়ে গেছে তাঁকে উপহাস করে।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পণ্ডিত প্রণাম করলেন নিয়তিকে। মনে মনে বললেন--আমার দম্ভকে ক্ষমা করো। তুমি মহাশক্তি, তোমার অভিপ্রায় পূর্ণ করবার জন্য তুমি দশমহাবিদ্যার রূপ ধরে দেবাদিদেব মহাদেব মহাকালকে পরাভূত করে আপনার পথে চলে যাও। মনে ছিল না আমার। ক্ষমা করো আমাকে।

আর একটা গল্প—

এমনই আর এক জ্যোতিষী ছিলেন।

একদা তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হলেন এক কৃষ্ণবর্ণ শীর্ণকায় ব্রাহ্মণ। বললেন—শুনেছি নাকি তোমার গণনা অভ্রান্ত। তোমার দৃষ্টির সম্মুখে অহরহ নাকি গ্রহসংস্থান দৃশ্যমান রয়েছে। কোনো গ্রহেরই নাকি সাধ্য নাই তোমার দৃষ্টির বাইরে যেতে।

জ্যোতিষী হাসলেন—বললেন—গুরুর প্রসাদ এবং দেবী সরস্বতীর বর। কৃতিত্ব আমার নয়।

—ভালো। আমিও সামান্য চর্চা করি এই বিদ্যার। কিন্তু আমি কোনোমতেই আজ চায়াগর্ভসম্ভূত সূর্যতনয় মহাগ্রহের অবস্থান নির্ণয় করতে পারছি না। বল তো পণ্ডিত, শনিগ্রহের অবস্থিতি এখন কোথায়?

পণ্ডিত খড়ি তুলে নিয়ে ছক এঁকে, সামান্য গণনা করেই পিছন ফিরে আগন্তুকের দিকে তর্জনী নির্দেশ করে বললেন—এইখানে তাঁর অবস্থিতি।

মুহূর্তে তাঁর তর্জনীটি জ্বলে উঠে ভস্ম হয়ে পড়ে গিল। অট্টহাস্যে সাধুবাদ

উঠল, সাধু—সাধু—সাধু! আগন্তুক কৃষ্ণ বিদ্যুতের মতো দীপ্তিতে চারিদিক উদ্ভাসিত করে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

আর একবার এক জ্যোতিষী এসেছিলেন। বিদেশী অজ্ঞাতকুলশীল জ্যোতিষী। এসেই গ্রাম তোলপাড় করে দিলেন। যিনি এলেন তাঁকেই তাঁর নাম ধরে ডাকলেন, এস অমুকবাবু, কি অমুকচন্দ্র এস বাবা। তারপর বলতে লাগলেন তাঁর জীবন-কথা। যেন গড় গড় করে পড়ে যাচ্ছেন তার জীবনের খাতা। তিনি প্রথমে এসে উঠেছিলেন যাদবলালবাবুর ঠাকুরবাড়িতে। এক বেলার পর আমার বাবার সঙ্গে আলাপ হতেই এসে উঠলেন আমাদের বাড়ি। আমার বাবাকে বললেন—তুমি আমার পূর্বজন্মের পিতা। তারপর আমাদের বৈঠকখানা একেবারে জনসমাগমে ভরে গেল। অদ্ভুত জ্যোতিষী। যে-কোনো আগন্তুক এলেন—তাঁর অভ্রান্ত পরিচয় এবং জীবন-কথা বলে গেলেন। তারপর ভবিষ্যদ্বাণী। কারও অম্লশূলের ব্যাধি, তাকে বললেন—তোমার পেটে তিনটি বিচিত্র অন্ন আছে—একটির বর্ণ লাল, একটির নীল, অপরটির কালো। মাদুলি দিলেন। সবশেষে যাদবলালবাবুর বড় দৌহিত্র সম্পর্কে বললেন—সামনে কঠিন ফাঁড়া, মৃত্যুযোগ। শান্তির ব্যবস্থা হল। তন্ত্রমতে কালী-পূজা করে শনিগ্রহের শান্তি। কৃষ্ণবর্ণ ছাগ, কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র, কৃষ্ণবর্ণ গাইয়ের দুধের ঘি, এ ছাড়া নীলা স্বর্ণ রৌপ্য ইত্যাদি অনেক আয়োজন। গভীর রাত্রে পূজার ব্যবস্থা গ্রামপ্রান্তে নির্জনে। পূজা আরম্ভ হল। শুধু দেবী এবং সাধক ছাড়া কেউ রইল না। রাত্রির শেষ প্রহরে দেখা গেল মাটির দেবতা দাঁড়িয়ে আছেন, আয়োজনসহ সাধক অন্তর্হিত। এ সত্ত্বেও সেকালের অনেকে বলেছিল—পূজা শেষ করে সাধক স্বস্থানে চলে গেছেন। কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ ছাগটা চিৎকার করে বললে—উঁ-হু উঁ-হুঁ।

আরও আসত লাঠিয়াল। প্রকাশ্য পেশায় লাঠিয়াল। গোপন পেশায় ডাকাত। এরাও বৃত্তি পেত। বৃত্তি ছাড়াও মধ্যে মধ্যে আসত, অভাব-অভিযোগ থাকলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আসত পুলিশের হাত থেকে বাঁচবার জন্য। কিন্তু একটা বিশেষত্ব ছিল। পুলিসের অভিযোগ সত্য হলে সে-ক্ষেত্রে তারা আসত না। যে-ক্ষেত্রে অভিযোগ মিথ্যা, সে-ক্ষেত্রেই তারা আসত। বলত---মিছে লাঞ্ছনা হবে হুজুর!

আবার নিজেদের দাঙ্গা-হাঙ্গামা থাকলে এদের ডাকা হত। এরা আসত কাপড় গামছা লাঠি নিয়ে। কাজ করে বকশিশ নিয়ে চলে যেত।

এরই মধ্যে গল্প করত। ডাকাতির গল্প। দাঙ্গার গল্প। শিউরে উঠত মানুষ সে-সব গল্প শুনে। আমার রাত্রে ঘুম হত না আতঙ্কে, তবু শুনতাম সেই সব গল্প। মনে আছে পোড়া শেখের ডাকাতির সব গল্প। পোড়া শেখ ছিল দুর্ধর্ষ লাঠিয়াল, তেমনি প্রকৃতিতেও ছিল নিষ্ঠুর। ও-অঞ্চলে তার জুড়ি ছিল না। ময়ূরাক্ষীর ওপারে অবশ্য ভল্লারা ছিল। তারা আজও আছে। এই অর্ধাহার-অনাহারের দিনেও তাদের মধ্যে বীর্যবান আছে। জাতিতে অবশ্য ভল্লা নয়—তারাচরণ হাড়ি আজও আছে, ওই ওদেরই অঞ্চলের ওদেরই শিক্ষায় সে গড়ে উঠেছে ; তারাচরণ—বীর তারাচরণ। অল্পদিন আগেই ১৯৫০ সালেই আমাদের ও-অঞ্চলে একটা

হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হয়ে গেছে। দোষ কার—সে সঠিক জানি না, তবে অতর্কিতে আক্রমণ করেছিল দলবদ্ধ হয়ে মুসলমানেরাই। অঞ্চলও মুসলমান প্রধান। বীরভূম-মুরশিদাবাদের ওই সীমান্তটিতে মুসলমান প্রায় শতকরা সত্তরের বেশিই হবে—কম হবে না। হিন্দুদের গ্রামে তখন খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে। আক্রমণ সেই অবস্থায়। তারাচরণ ছিল সে-দিন সে-গ্রামে। একা তারাচরণই দাঁড়িয়েছিল লাঠি হাতে। ক্রমে পাশে অবশ্য লোক জমল কিছু। কিন্তু সে প্রতিপক্ষের তুলনায় অনেক কম। তবুও তারাচরণ তাদের গ্রামে প্রবেশ করতে দেয়নি। তারাচরণের কথা থাক। পোড়া শেখের কথা বলি। পোড়া শেখ দেশ ছেড়ে ফেরার হয়েছিল। গিয়ে পড়েছিল এমন অঞ্চলে, যে-অঞ্চলে, পঞ্জাবী ডাকাতের প্রাদুর্ভাব এবং সাহেব সুবার কুঠি ছিল। আজ মনে হয় রানীগঞ্জের কলিয়ারী অঞ্চল হবে। পোড়া শেখ নাকি (পোড়াকে আমি দেখিনি) সেই পঞ্জাবীদের দলে মিশে সাহেবদের কুঠি লুঠতে গিয়েছিল। সে বলত—হ্যাঁ, মরদ বটে! সাহস বটে পঞ্জাবীদের! আমি তাদের ফুঁয়ে উড়ে যাবার যুগ্যি। তবু আমার খেলা দেখে তারা সঙ্গে নয়েছিল। বলত—অন্ধকার রাত্রি, দু-পহর পার হয়েছে—আকাশে মেঘ। আ—আ—আ শব্দ করে গিয়ে লাফিয়ে পড়ল সব—বাঘের মতো। ওদিকে কুঠির বারান্দা থেকে ছুটতে লাগল গুলি। হামাগুড়ি দিয়ে চলল। চারিদিকের দরজায় কুড়ুলের ঘা পড়তে লাগল। ভাঙল দরজা। সাহেবের বন্দুক চলছে, মেম গুলি ভরছে। কিন্তু চারপাশের দরজা ভাঙলে সে কি করবে? সাহেবকে কেটেছিল তারা। পোড়া বলত—আমি ছিলাম বাইরে, ফাঁক পেয়ে গেলাম ভেতরে ছুটে। এক জায়গায় দেখলাম, ছোট একটা সাহেবের মেয়ে, কানে মাকড়ি, পড়ে আছে ভয়ে বেহুঁশ হয়ে। খুলে নিতে সময় লাগবে, নিলাম পট্ পট্ করে ছিঁড়ে।

অসংখ্য ডাকাতির গল্প।

মানুষকে খুঁটিতে বেঁধে উনান জ্বেলে কড়া চড়িয়ে তেল গরম করে সেই তেল গায়ে ঢেলে দিত। কত সময় মানুষকে বেঁধে সেই তপ্ত কড়ায় বসিয়ে দিত। জ্বলন্ত মশাল দিয়ে পিটত। মানুষের গলা আধখানা বা দু-ফাঁক করে দিয়ে যেত। শড়কিতে গেঁথে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দিত।

কত রাত্রি বাল্যকালে আতঙ্কে বিনিদ্র কাটিয়েছি—তার হিসাব নাই। মধ্যে মধ্যে এক-একটা সময় আসত, যখন দু-তিন মাসের মধ্যে তিন-চার ক্রোশের ভিতর চার-পাঁচটা ডাকাতি হয়ে যেত। শৈশবের একটা স্মৃতি মধ্যে মধ্যে আজও মনে পড়ে। অন্ধকার রাত্রি, কাঁচা ধানভরা মাঠ, আর সেই মাঠের মধ্যে সঞ্চরমান কয়েকটা আলো দেখলেই মনে পড়ে যায় সে স্মৃতি।

সম্ভবত আশ্বিন মাস। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, পিসিমা উঠে বসেছেন, জানালা খুলেছেন, সভয়ে ডাকছেন—বউ—বউ—বউ!

মায়ের কণ্ঠস্বর ভেসে এল—ছাদে যাচ্ছি আমি।

আমি তখনও কিছু বুঝিনি। এই মুহূর্তে একটা তীব্র আর্তকণ্ঠের চিৎকার

কানে এসে ঢুকল। উঃ, সে কী চিৎকার! বজ্রপাতের চিৎকারে স্তম্ভিত অভিভূত হয়ে যায় মানুষ, মরবার হলে মরে যায় এক মুহূর্তে; কিন্তু এ চিৎকার যেন মানুষের শ্বাস রোধ করে দেয় নিদারুণ আতঙ্কে। আকাশ চিরে গেল, বাতাসের পাথারে মাথা কুটে আছড়ে পড়ল সে চিৎকার। ঘুমন্ত মানুষের ঘুম ভেঙে গেল। সে চিৎকারে ভয়ে কেঁদে উঠেছিলাম আমি। আমাদের বাড়ির জানালা দিয়ে তাল-গাছের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায়, গ্রামের দক্ষিণ মাঠ নিমচের জেল। সেই জোলের উপরে জমাট অন্ধকার থর থর করে কাঁপছে। আলো—অনেক আলোয় ভরে যাচ্ছে-বিচ্ছিন্ন আলো সব ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে। আবার কিছুক্ষণ পর উঠল চিৎকার। মানুষের এমন প্রাণ-ফাটানো আর্তস্বর আর শুনি নাই। পরে শুনেছি সে চিৎকারে ভাষা ছিল—জান বাঁচাও! জান বাঁ-চা-ও!

আমাদের গ্রামের সিকি মাইল দক্ষিণে সিউড়ি থেকে কাটোয়া যাবার পাকা সড়ক চলে গেছে, সেই সড়ক দিয়ে—ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলে গেল সেই আর্তনাদ। জান বাঁ-চা-ও! বিপন্ন প্রাণের সেই ভয়—সেই আকুতি এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে যে, ঘরে ঘরে মানুষ থর থর করে কাঁপল। বুকের ভিতরটা চড় চড় করে উঠল, গলা শুকিয়ে গেল। আবার তার জান বাঁচাবার জন্য মানুষ দলে দলে আলো হাতে ছুটে বেরিয়ে গেল।

রাত্রি তখন গ্রামের পক্ষে বেশি হলেও আমাদের গ্রামের পক্ষে, বিশেষ করে আমাদের বাড়ির পক্ষে, বেশি নয়। রাত্রি এগারোটা সবে বেজেছে। বাবার মজলিস পুরোদমে চলেছে। মা তখনও জেগে।

ছুটল মানুষ। কিন্তু দিগ্বিদিকহীন ভয়ার্ত হতভাগ্য সামনের পাকা রাস্তা ধরেই ছুটে চলেছে—ছুটেই চলেছে। নিতান্ত হতভাগা, গ্রাম ঠাওর করতে পারেনি; পাশের দু-চারটে ঘন জঙ্গল গেছে, আশ্রয় নিতে সাহস করেনি। সামনেই ছুটে চলেছে। পিছনে তার ছুটে আসছে মৃত্যুদূতের মতো পরস্বাপহারী ঠ্যাঙাড়ে, আমরা বলি 'মান্ষুড়ে'। আজ মনে হয়, মানুষ বাঘের মুখে সাপের মুখে তত ভয় পায় না, যত ভয় পায় হত্যাভিপ্রায়ে হিংস্র মানুষকে দেখে। তারই মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে বোধ হয় মৃত্যুর ভয়ালতম রূপ। আক্রান্ত মানুষটির পিছনে ছিল ওই ভয়ালতম রূপ; তাই উন্মাদের মতোই সে সামনে ছুটে চলেছিল। হতভাগ্য ভাবতে পারেনি, নিয়তি নদীর রূপ নিয়ে পথ রোধ করে দাঁড়াবে। সামনে ছিল নদী। আমাদের গ্রামের দেড় মাইল দূরে কুয়ে নদীর ঘাট—সেই ঘাটে সড়কে ছেদ পড়েছে। দিনে খেয়া চলে, রাত্রে জনহীন ঘাট। সেই ঘাটের উপরে উঠল আর-একটা মর্মান্তিক চিৎকার। তারপর সব স্তব্ধ। সকলে ছুটে গেল।—ভয় নাই—ভয় নাই! গিয়ে দেখলে, জনহীন ঘাট, ঘাটের উপরে খানিকটা রক্তচিহ্ন। আর কিছু নাই। অনেক খুঁজেও কিছু পাওয়া গেল না। শুধু দূরে ধানভরা বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে সঞ্চরমান ছায়ামূর্তির মতো কয়েকটি কিছু যেন কেউ কেউ দেখেছিল। কিন্তু তারা ভয়ার্ত নয়, আলোর আশ্বাস তারা চায় না, অন্ধকারে মিলিয়ে গেল কোথায় সেই বিস্তীর্ণ ধান্যক্ষেত্রে, খুঁজে পাওয়া গেল না। পরের দিন পাওয়া গেল—নদীর ঘাটের খানিকটা

পাশে—দহের বুকে ঝুঁকে-পড়া একটা শ্যাওড়া গাছের মধ্যে একটি বিদেশী মুসলমানের মৃতদেহ।

পরে প্রকাশ পেল ঘটনাটি।

'বাম্‌নিগ্রাম' বহুকাল থেকে একদল 'মান্‌ষুড়ে' মুসলমানদের জন্য কুখ্যাত। এ কান্ড তাদেরই। বিদেশী মুসলমানটি গরু বা মহিষ কিনতে এসেছিল পাঁচুন্দির হাটে। কাটোয়ার কাছে পাঁচুন্দি, কিন্তু তখন ব্যান্ডেল-কাটোয়া-বারহারোয়া লাইন হয়নি। পাঁচুন্দি যাবার রাস্তা ছিল—লুপলাইনের আমেদপুর স্টেশনে নেমে ওই পাকা সড়ক। এই পাকা সড়কে আমেদপুর ও লাভপুরের মধ্যে এই বাম্‌নিগ্রাম। আমেদপুর হয়ে আগয়া নদীর ব্রীজ থেকে প্রায় তিন মাইল ব্যাপী প্রান্তর। মধ্যস্থলে সুঁদীপুরের বটতলা, ঝুরি-নামা শিকড়ে বিশ-পঁচিশটা কান্ড সৃষ্টি হয়েছে, সে এক ঘন জঙ্গলে ঘেরা ঠাঁই। দিনে সূর্যের আলো পড়ত না। সুঁদীপুরের বটতলার উল্লেখ আমার রচনায় আছে. 'ডাকহরকরা' গল্পে "হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায়" 'তামস তপস্যায়' আছে মনে পড়ছে। এই বটতলায় তারা রাত্রে পথিকের প্রতীক্ষা করত। বাঁশের খাটো লাঠি- মাটি ঘেঁষে সুকৌশল নিক্ষেপে প্রচন্ড বেগে ছুটে পথিকের পায়ে আঘাত করত, পথিক পড়ে যেত। এরা ছুটে এসেই একটা লাঠি তার গলায় বা ঘাড়ে দিয়ে দুই প্রান্তে পা দিয়ে চেপে ধরত, অন্য একজন দুজন পায়ে ধরে মানুষটাকে উল্টে দিত, মট্ শব্দ করে ভেঙে যেত ঘাড়ের মেরুদন্ডটা। তারপর অনুসন্ধান করত, তার কাছে কি আছে। এমনও শোনা গেছে যে, একজন মানুষকে হত্যা করে পেয়েছে হয়তো চারটে পয়সা, আর তার পরনের জীর্ণ কাপড়খানা।

এই বিদেশী মুসলমানটিকে আমেদপুর থেকে—এই দলের একজন অপরাহ্নে ভুলিয়ে তার গাড়িতে নিজের বাড়ি এনে তুলেছিল। স্বজাতি হিসাবে বিশ্বাস করেছিল সে। কিন্তু সন্ধ্যার পর লোকটি বুঝতে পেরেছিল এদের অভিপ্রায়। তাই এক সময়ে তাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পথে পথে প্রাণভয়ে ছুটেছিল। কিছুক্ষণ পর ষড়যন্ত্রীরা পালানোর কথা জানতে পেরে মুখের শিকার ফসকানো হিংস্র পশুর মতো ছুটেছিল তার পিছনে পিছনে। দুরন্ত মৃত্যুভয়ে হতভাগ্য সামনে দুখানা গ্রাম পেয়েও তাতে ঢোকেনি। হয়তো গ্রাম বলে বুঝতে পারেনি। অথবা মানুষকেই আর বিশ্বাস করেনি। সে-দিন সে-মুহূর্তে কার উদ্দেশ্যে সে এমন করে জান বাঁচানোর আকুল প্রার্থনা জানিয়েছিল—সে-ই জানে।

মান্‌ষুড়ে মুসলমান দলটি আজ আর নাই। তাদের বংশই শেষ হয়ে গেছে। শুধু বাম্‌নিগ্রামেরই নয়, আরও কয়েকখানা গ্রামের এই অপবাদ ছিল। আমাদের গ্রামের উত্তর-পূর্বে মাইল চারেক দূরে ধনডাঙার হিন্দুদের এ অপবাদ ছিল। মাইল আষ্টেক দূরে দাশকল গ্রামে হিন্দুদের এ দুর্নাম ছিল। শোনা যায়, এইখানে যে ছিল এই হত্যাকান্ডের নায়ক, সে একদিন রাত্রে পথিকভ্রমে হত্যা করেছিল নিজের একমাত্র পুত্রকে। ছেলে চিৎকার করে বলেছিল—বাবা আমি, বাবা। তার দেহখানা ঘুরিয়ে দিতে দিতে বাপ বলেছিল—এ সময়ে সবাই বাবা বলে। আমার 'আখড়াইয়ের দীঘি' গল্প এবং 'দ্বীপান্তর' নাটকের উদ্ভব এখান থেকেই। ক্রোশ-

অন্তর দীঘি আর ডাক-অন্তর মসজিদওয়ালা বাদশাহী সড়ক এখানেই; সেই সড়কের উপরে গাছতলায় বসে এক বৃদ্ধ বীরবংশীর মুখে এই পুত্রহত্যার কাহিনী শুনেছিলাম।

বজরহাট বলে একখানি গ্রাম আছে—মুসলমানের গ্রাম। ময়ূরাক্ষীর ওপারে। সেখানেও এই ব্যবসা ছিল। আমি নিজে একবার এই বজরহাট হয়ে যাচ্ছিলাম সাঁইথিয়া। সন্ধ্যার পর। পড়েছিলাম এদের হাতে। আমি ছিলাম বাইসিক্লের আরোহী, আর নিতান্তই ছিল পরমায়ু (এ ছাড়া অন্য কোনো ব্যাখ্যায় প্রকাশ করা যায় না সে-দিনের সে বিচিত্র পরিত্রাণকে), তাই বেঁচেছিলাম। সে-কথা এখানে নয়।

লাঠিয়াল ডাকাত যারা, তারা ঠিক এদের মতো ছিল না। খুন তারা সহজে করত না। তারা এই মানুষ-মারাদের ঘৃণা করত। লাঠিয়ালের প্রকৃতি এবং মানুষুড়ের প্রকৃতিতেও প্রভেদ দেখেছি। লাঠিয়ালরা—ডাকাতরা অনেক ভালো। এদের কাছে গল্প শুনতাম। এমনি এদের কথা ভারি মিষ্টি। বলত—বুঝলেন বাবু, মদ খেয়েছি গাঁয়ে মজলিস করে; একজনা লোক, মাথায় গামছার পাগড়ি, হাতে জালানকাঠি, জাল বুনতে বুনতে এসে বসল। বললে—মদ দেবা খানিক? আমি ধীবর, যাব কুটুমবাড়ি, তা ভাই, মদ দেখে ভারি লোভ লেগেছে। তা বললাম—বস, খা। খেলে, আলাপ করলে, চলে গেল। দুদিন পর এল পিঠে গামছায় বাঁধা পাঁচটা পাকী মদের বোতল আর এক বড় রুইমাছ নিয়ে। বললে—সেদিন তোমরা খাইয়েছ, আজ আমি খাওয়াই। বুয়েচেন না, ভারি খুশি হলাম। একদিন খেয়ে গিয়ে যেচে খাওয়াতে এসেছে লোকটা, খুশি হবারই কথা। তা আবার পাকী মদ। বুঝলাম, ধীবর মশায়ের পয়সা আছে। রাত-বিরেতে জাল ফেলে পরের পুকুরে রুই কাতলা ধরেন, পয়সার আর অভাব কি? বসে গেলাম খেতে। মাছ ভেজে বেশ আসর করে বসলাম, সেও বসল। বসল, কিন্তু নিজের কাজ ভুললে না। খেলে আর জাল বুনলে। গল্প করলে। আবার দিন-সাতেক পর এল। তারপরে বলে—সোনা থাকে তো দাও, কিনব। মানে ডাকাতির মাল। আরও দুদিন এল। মদ মাংস, গান খুব জমে গেল। তা'পরেতে কথাবার্তা। সোনা দোবা ঠিক হল। দিনও ঠিক হল। ঠিক দিনে বুয়েচেন কিনা 'ক্যার্-ক্যার্' করে গোটা গাঁ ঘেরাও। চারিদিকে লালপাগড়ি। আর সেই ধীবর মশায় ভোল পাল্টে গোয়েন্দা দারোগা! ও বাবা! এমন ধীবরের মতো জাল বোনা, এমন ঢক ঢক করে পচুই খাওয়া—এ দেখে কি করে বুঝব বলুন যে, এ ধীবর নয়? তা আমরাও ঠকেছিলাম। তিনিও ঠকলেন। মাল কোথা পাবে—ঘরে কি থাকে? মাল পোঁতা আমাদের ময়ূরাক্ষীর ধারে, গাছের তলায়। তবু ছাড়ে না। নিয়ে গেল ধরে। মারপিঠ, নখে ছুঁচ ফুটানো, অনেক হল। শেষে লোভ। অনেক ভাবলাম, তারপরে বললাম—চল দেব দেখিয়ে। কিন্তু একা আমার সঙ্গে যেতে হবে। তাই রাজী। পিস্তল ঝুলিয়ে চলল। ময়ূরাক্ষীর বালিতে এনে এক জায়গা বেশ করে খুঁড়লাম। বললাম—এইখানেই তো ছিল। কই? তা—। যা আঁচ করেছিলাম, ঠিক তাই হল। দারোগা মনের আকুলিতে হেঁট হল—"ছিল তো যাবে কোথায়?" ওই যেমন হেঁট হওয়া

আর এক ঠেলা পেছন থেকে; মুখ থুবড়ে পড়ল সেই গর্তে। অমনি চাবুলে বয়ে দিলাম বালি চাপিয়ে। পা দুটো থাকল বেরিয়ে। আমি টেনে দৌড়। তা বেটার ভাগ্যি, পরমায়ু আছে—একটা মেয়েছেলে দেখেছিল, নদীর ধারে ঘাস কাটছিল, সে ছুটে এসে বালি সরিয়ে ঠ্যাঙে ধরে টেনে বেটাকে বার করলে।

—তারপর?

—তারপর আর কি? তারপরে বছরখানেক পরে ধরা পড়লাম। ঠেলে দিলে চার বছর।

হা-হা-করে হাসত।

এই আমার কালের প্রথম জীবনের সেকাল। সেকালের—সেকালের এই রূপ। দেশে নূতন কাল তখন এসেছে, এসেছে কলকাতায়, এসেছে তার আশেপাশের জেলায়, আমাদের জেলায় বোলপুরের প্রান্তে ভুবনডাঙায় শান্তিনিকেতন আশ্রম স্থাপিত হয়েছে, সেখানে এসেছে, বোলপুরের পাশে বিখ্যাত লর্ড সিংহের রায়পুর, সেখানে এসেছে; কিন্তু সিংহবাড়ির নূতন কালের মানুষেরা এ দেশ ছেড়ে কলকাতায় গেছেন। শান্তিনিকেতনের চারিপাশে তখন গণ্ডী টানা। ব্রাহ্মধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের বিরোধের গণ্ডী টেনে এ দেশের লোক শান্তিনিকেতনকে পতিত করে রেখেছে।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে রবীন্দ্রনাথের কথা। প্রথম যেদিন সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়, যেদিন তিনি স্বর্ণ ডাইনির গল্প নিয়ে কথা বলেছিলেন সেই দিনেরই কথা।

ওই স্বর্ণের প্রসঙ্গেই বলেছিলেন, আমাদের দেশে কত বিচিত্র ধারা, কত বিচিত্র রীতিনীতি, কত বিচিত্র মানুষ, এঁরা তা দেখেননি, দেখা দূরের কথা, কল্পনাও করতে পারেন না। তুমি এদের দেখেছ। আমি কল্পনা করতে পারি, কিন্তু দেখিনি। দেখবার সুযোগ পাইনি, দেখতে দাওনি তোমরা, আমাদের তোমরা পতিত করে রেখেছিলে। পতিত শব্দটি তিনিও ব্যবহার করেছিলেন।

আবার এর একটি বিপরীত দিকও আছে। নূতন কালের মানুষেরা পুরানো কালের মানুষদের অবজ্ঞায় দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন।

এক দিকে ছিল ক্ষোভ থেকে উদ্ভূত উপেক্ষা।

অন্য দিকে ছিল পীড়িতচক্ষু মানুষের আলোক-ভীতির মতো বেদনাদায়ক বর্জনপ্রবৃত্তি।

একটা নদীরই মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড চড়া, চড়ার দুধারে বয়ে যাচ্ছে দুটি স্রোত। একটির সম্মুখে পথের সন্ধান নাই, অপরের সম্মুখে পথের সন্ধান এবং জীবনের গতি। কিন্তু দুটি একত্রিত না হলে জলস্রোতে সে-বেগ সঞ্চারিত হবে না, যে-বেগে সম্মুখের যে-ভূমিতলে পথের দিশা আছে, সে ভূমিতলকে কেটে আপন গর্ভপথে পরিণত করে তারই বুক বেয়ে ধেয়ে যেতে পারবে জীবনস্রোত সাগরাভিমুখে।

না। সেকালের সেকালে আরও আছে। আছে অবশ্য অনেক, কিন্তু যেটুকুর কথা মনে পড়ে গেল, সেটুকু না বললে সেকালের অনেকটাই অপ্রকাশ থেকে যাবে।

আগে কিছুটা বলেছি। বলেছি, বাখারে গোলায় ধান ছিল, গোয়ালে বড় বড় বলদ ছিল, দুধালো গাই ছিল, গ্রামে বড় বড় পুকুর ছিল—পুকুরে গভীরতা ছিল, জল ছিল অথৈ, সে অথৈ জলে পুকুরভরা মাছ ছিল, বাড়ির ক্ষেতের-খামারে শাক ছিল, সবজি ছিল, ঘরে কাঁসা-পিতলের বাসন ছিল, রুপার বাসনও ছিল দু-দশ জনের ঘরে। আরও ছিল -আকাশে মেঘ ছিল, সে-মেঘে জল ছিল। অনাবৃষ্টি তখন কম হত। তখন বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল ৫০ থেকে ৬০ ইঞ্চি পর্যন্ত। আমার মনে আছে, ১৩১৩ সালে আমাদের অঞ্চলে 'আকাড়া' অর্থাৎ অনটন হয়েছিল। টাকায় তেরো সের চাল হয়েছিল; কাঁচি ৬০-এর ওজনের তেরো সের আজকের ৮০-র ওজনের দশ সের তিন পোয়া। আজকের ওজনের এক সের চালের দাম হয়েছিল ছ পয়সা। পরবর্তীকালে জেলার বৃষ্টিপাতের খতিয়ান দেখেছিলাম, তাতে দেখেছি সে-বার বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল ৪০ ইঞ্চির কিছু বেশি। আজ সেই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হয়েছে ৩০ ইঞ্চি থেকে ৪০ ইঞ্চি পর্যন্ত, যে বৎসর খুব বেশি বর্ষা হয়, সে-বার হয়তো ৪৫ ইঞ্চিতে পৌঁছোয়। তাই বলছি, আকাশে মেঘ ছিল, মেঘে জল ছিল। আমার 'গণদেবতা' বইয়ে আমি লিখেছি, গ্রাম্য বৃদ্ধ দ্বারিকা চৌধুরী গ্রামে আটকবন্দী যতীনের সঙ্গে আলাপ করতে এলে যতীন তাকে বলেছিল "সেকালের গল্প বলুন আপনাদের।"

—গল্প? হ্যাঁ, সেকালের কথা একালের গল্প বইকি। আবার ওপারে গিয়ে যখন কর্তাদের সঙ্গে দেখা হবে তখন একালে যা দেখে যাচ্ছি তাই বলব, সেও তাঁদের কাছে হবে গল্প। সেকালে গাই বিয়োলে দুধ বিলোতাম, ক্রিয়াকর্মে বাসন বিলোতাম, পথের ধারে আম-কাঁঠালের বাগান করতাম, পথের ধারে মাঠের মধ্যে পথিকের ছায়ার জন্যে, চাষীর ছায়ার জন্যে গাছ প্রতিষ্ঠে করতাম ; মানুষে, জীবে-জন্তুতে জল খাবে বলে পুকুর প্রতিষ্ঠে করতাম, সরোবর দীঘি কাটাতাম, দেবতা প্রতিষ্ঠে করতাম, তাঁর প্রসাদে ঘরে নিত্য অতিথি সৎকার হত। মহাপুরুষদের ঈশ্বরদর্শন হত। তাঁদের আশীর্বাদ পেতাম। এই আমাদের সেকাল।

সে তো আজ আপনাদের কাছে গল্প মনে হবে গো!

—আপনি দীঘি কাটিয়েছেন চৌধুরী মশায়?

—আমার ভাগ্য ভাঙা ভাগ্য বাবা। ভাঙা ভাগ্যের ঝুড়ি ভাঙা, কোদাল ভাঙা, মাটি কাটা যায় না, কোনো মতে খুঁড়লেও ভাঙা ঝুড়িতে তুলে ফেলা যায় না। তবে আমার বাবা দীঘি কাটিয়েছিলেন ; তখন আমি ছোট, আমার মনে আছে। এক ঝুড়ি মাটি কাটত একজন, বইত একজন। দশ কড়া কড়ি ছিল দাম। মানে আধ পয়সা।

একজন লোক বসে বসে ঝুড়ি গুণত, কড়ি দিত। বিকেলে কড়ি দিয়ে পয়সা নিয়ে যেত।

—আধ পয়সা ঝুড়ি?

এ আমি কল্পনা ক'রে লিখিনি। এই সেকালের কথা। আধ পয়সা ঝুড়ি মজুরি, ওদিকে দু'টাকা মণ চাল। টাকায় চব্বিশ সেরও দেখেছি আমি। দুধের সের ছিল দু-পয়সা। হিসেব ছিল "পাই" অর্থাৎ আধ সেরের—এক পয়সায় এক পাই দুধ মিলত।

মায়েরা ছেলেদের চাঁদ ধরে দেবার জন্যে চাঁদকে লোভ দেখিয়ে ডাকতেন—

"আয় চাঁদ আয় আয়
বাটি ভরে দুধ দোব
রুপোর থালায় ভাত দোব
রুই মাছের মুড়ো দোব
সুখশয্যে পেতে দোব
চাঁদ তুই সুখে নিদ্রা যাবি
আম-কাঁঠালের বাগান দিয়ে
ছায়ায় ছায়ায় যাবি।"

ঘুমপাড়ানী মাসি-পিসিকে ডেকে বলতেন—

"ঘুমপাড়ানী মাসি-পিসি ঘুম দিয়ে যাও।
বাটা ভরে পান দেব গাল পুরে খাও॥"

আবার ছেলে ভুলাবার, ছেলে ঘুম পাড়াবার অন্য ছড়াও আছে, যে-ছড়া সম্ভবত সেকালের হরিজন সম্প্রদায়ের মায়ের রচিত—

"আয় রে ঘুম যায় রে ঘুম বাউরীপাড়া দিয়ে
বাউরীদের ছেলে ঘুমালো কাঁথা মুড়ি দিয়ে!"

ঘুম যদি জেলেপাড়া দিয়ে যেত, তবে ছেলে জাল মুড়ি দিয়ে ঘুমাত। যদি যেত ডোমপাড়া দিয়ে তবে ঘুমাত টোকা বা ঝুড়ি মুড়ি দিয়ে। দারিদ্র্য ছিল। এখনকার তুলনায় ঘর-দুয়ারের অবস্থায়, পরিচ্ছদের ব্যবস্থায়, আভরণের ব্যাপারে সেকালের দারিদ্র্যকে অতি নিষ্ঠুর মনে হবে। আজ আমাদের হরিজনদের ঘর-দুয়ার অনেক ভালো, দরজা-জানালা আছে, অনেকে মাটির কোঠা অর্থাৎ দোতলা করেছে, বাইরে বারান্দায় কলি ফেরানো অর্থাৎ চুন দেওয়া হয়েছে, দরজায় আলকাতরা মাখানো হয়েছে। সেকালে ঘর ছিল ঘুপচি : হয়তো চার কোণে মাথায় মাথায় চাল ঠেকত ; জানালা দূরে থাক, দরজাও সর্বক্ষেত্রে থাকত না, থাকত আগড়। একখানিই ঘর, তার এক দিকে হেঁসেল, এক দিকে হাঁস মুরগী, মাঝখানে শুত মানুষ। আজ মুরগী হাঁস আলাদা থাকে, রান্না রাখবার জায়গা আলাদা, মানুষেরা শোয় অনেক ক্ষেত্রে খাটিয়ায় তক্তপোশে, বিছানাও তাদের ভালো। সেকালে দরিদ্র পুরুষেরা সাত হাত কাপড় পরে নগ্নপ্রায় হয়ে বেড়াত, মেয়েরাও পরত তাঁতের খাটো সাড়ে-আট

হাত শাড়ি। আজ দশ হাত শাড়ি জামা সেমিজ পরে। যুদ্ধের পরে হাফপ্যান্ট যথেষ্ট আমদানি হয়েছে। সেকালে মেয়েদের আভরণ ছিল রূপাদস্তার বালাকাটা বলে একটা গয়না। কারুর গলায় পিতলের 'মুড়কিমালা'—মোটা কস্তায় মাদুলি গেঁথে তারই মালা ; আর কারও কারও থাকত সরষের মতো গোল একদানা সোনার নাক-ছবি। আজ মেয়েরা রূপোর গয়না তো পরেই, অধিকাংশেরই হাতে তামার উপর সোনার পাত মোড়া শাঁখাবাঁধা আছে। সোনার বেশ মানানসই নাকছবি সকলের নাকেই আছে—কারও নাকে হরতন, কারুর চিঁড়িতন, কারও একটা ইংরেজি অক্ষর, কারুর কারুর সোনার নাকছবিতে ওপেল পাথর কি ছোট রুবির টুকরো দেখতে পাওয়া যায়। তা ছাড়া মাথায় রূপোর কাঁটা, কানে সোনার টাপ প্রায় প্রত্যেকেরই আছে। সেকালে রাত্রে অধিকাংশ ঘরেই আলো জ্বলত না। কেরাচিনি (কেরোসিন) তেলের একটি ডিবে আর একটি 'খরবাক্‌সো' বা 'জেশলাই' অর্থাৎ ফায়ারবক্‌স বা দেশলাই থাকত বিপদ-আপদের জন্য, তাতে অন্তত একটা মাস চলে যেত। তাদের কেউ কেউ নিমের ফল কুড়িয়ে জড়ো করত। জেলেদের পাড়ায় এটি ছিল প্রত্যেক গৃহস্থের অবশ্যকর্তব্য। নিমের ফল কুড়িতে ঘানিতে পিষিয়ে তেল তৈরি করে সেই তেলে প্রদীপ জ্বালানো হত। আজ প্রত্যেক ঘরেই হ্যারিকেন হয়েছে, ডিবেও আছে, আলো নিয়তই জ্বলে। নিমফল অবশ্য ছেলেরা এখনও কুড়িয়ে তেল পিষিয়ে নেয়। সমস্ত দিন জলে কাজ করে এসে এই নিমতেল তারা গায়ে মাখে চর্মরোগ নিবারণের জন্য। তুলনায় সেকালের দারিদ্র্য শোচনীয় ছিল মানুষের কিন্তু তবুও সেকালে অনাহার, অর্ধাহার ছিল না, একালে অবস্থার এই উন্নতি সত্ত্বেও মধ্যে মধ্যে তাদের অনাহার ঘটে। সেকালের ব্যবস্থায় এদের সঙ্গে মধ্যবিত্তদের একটি ঘনিষ্ঠ যোগ এবং অন্তরঙ্গতা ছিল। বিচিত্র এবং মধুর সে-যোগ ও অন্তরঙ্গতা। এক-একটি বর্ধিষ্ণু পরিবারের সঙ্গে কয়েকটি করে দরিদ্র পরিবারের এই সম্পর্ক ছিল। প্রায় পুরুষানুক্রমিক যোগ।

আমাদের বাড়ির সঙ্গে এমনি যোগ ছিল গুটি কয়েক পরিবারের। তাদের মধ্যে 'ধাত্রী দেবতা'র শিবুর অনুচর শম্ভু বাউরীদের বাড়িই প্রধান। শম্ভুর পিতামহ থেকে তারা আমাদের বাড়িতেই কাজকর্ম করে। শম্ভুর পিতামহকে আমি দেখিনি। তার পিতামহী মোনা—নাম ছিল মনোমোহিনী—তাকে আমি দেখেছি। ভোর-না-হতেই মোনা এসে হাজির হত। এসেই ঘর-দুয়ার উঠান থেকে চারিপাশ সাফ করত, জল দিয়ে ধুয়ে দিত। কালো পোকা-খেগো চেহারার মতো বুড়ী মোনা এসেই প্রথম বকত বাড়ির ঝিকে। তারপর চাকরকে, তারপর রাঁধুনীকে, তারপর কখনও কখনও আমার মাকে। শুধু বকতে সাহস করত না আমার পিসিকে। বকত বাড়ির বিশৃঙ্খলার জন্য, অব্যবস্থার জন্য।

বলত—হা টে, (অর্থাৎ হ্যাঁ লা) টুকুচি শাসন করতে লারিস (পারিস না) ওই ঝিচাকরগুলানকে? অমুনি অব্যবস্থা! দেখ্ দেখ্, তোর কটা কটা চোখ দুটো তো খুব ঝকমকে, বলি আপচোটা (অপচয়) একবার দেখ্। জিনিস ফেলেছে দেখ্।

মা হাসতেন। মোনা বা তার সম্প্রদায়ের সকলেই 'আপনি' বলে কথা বলতে

জানে না, এ কথা নয়। বাবা যদি ডাকতেন, মোনা! তৎক্ষণাৎ মোনা হাত জোড় ক'রে উত্তর দিত—আজ্ঞে বাবা, আজ্ঞা করুন।

মোনা আমাদের শাসন করত। আমাকে কম। কিন্তু আমার মেজ ভাই আমার বোনকে শাসন তো করতই, প্রহারও করত।

ছেলেবেলায় চার-পাঁচ বছর পর্যন্ত আমাদের এদের বাড়িতেই কাটত। এরাই মানুষ করত। সকালবেলায় নিয়ে যেত, এগারোটা নাগাদ ফিরিয়ে আনত, তারপর নিয়ে যেত আবার বেলা তিনটেতে। সন্ধ্যে হ'লে বাড়ি দিয়ে যেত। ওদের অন্ন ব্যঞ্জন অনেক পেটে আছে আমাদের।

মোনার একটা কথা ভারি কৌতুককর। সে ব্যাঙকে ভয় করত যমের মতো। তার ধারণা ছিল ব্যাঙের বিষেই সে মরবে। ব্যাঙ দেখলে মোনা ভয়ে আতঙ্কে বু-বু, তি-তি শব্দ করে লাফাতে আরম্ভ করত। অকস্মাৎ বড় ব্যাঙের সামনে পড়লে তার চোখের দিকে চেয়ে যেন আতঙ্কে জমে পাথর হয়ে যেত।

মোনার ছেলে গোষ্ঠ আমাদের বাড়িতেই গরুর পরিচর্যা করত। সে মারা গেলে তার তিন ছেলে সতীশ, মতিলাল, শম্ভু—সকলেই প্রথমে রাখাল, তারপর মাহিন্দার, কৃষাণ ও ভাগ জোতদারের কাজ করেছে। সতীশের পুত্র 'লেড়ো', সেও কাজ করেছে।

মোনা মারা গেল। তারপর মোনার পুত্রবধূ তার কাজ করতে লাগল। সতীশের মাকে আমরা 'সতের মা' বলতাম। সতের মা সে-দিন পর্যন্ত জীবিত ছিল। শেষ বয়সে কাজ করতে পারত না, তার পুত্রবধূ 'সতের বউ' তখন কাজ করত।

সতীশের মায়ের কি অধিকার আমাদের উপর, তার সে-অধিকার অনস্বীকার্য। অকপটে বলছি, সে-অধিকার স্বীকার করতে কোনোদিন একবিন্দু গ্লানি অনুভব করিনি। এসে দাঁড়াত সতের মা, বলত—বলি হাঁগো, তুই ইসব কি করছিস? লোকে বলছে—তোকে ধরে নিয়ে যাবে? সাহেবদের সংগে ল্যাই (কলহ) করছিস! একজনা বললে—জ্যালে ভরে তো দেবেই, গুলি করে না দেয় তো ভালো।

ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলেছিল সতের মা।

ইদানীং যখনই কলকাতা থেকে বাড়ি যেতাম তখনই স্টেশন থেকে আমাদের বাড়ি যাওয়ার পথে দাঁড়িয়ে থাকত সতের মা, বলত, বাবা এলি? অঃ, আচ্ছা পাষাণ বটিস বাবা। আঃ, মুখ মনে পড়ে না রে! দাঁড়া খানিক দেখি।

আমি জেলে থাকতে শম্ভু মধ্যে মধ্যে রওনা হত সিউড়ি, বড়বাবুর সংগে দেখা সে করবেই। কিন্তু খানিকটা পথ যেতে যেতে তার সাহস চলে যেত, পুলিস এবং সাহেবদের ভয়টা উঠত বড় হয়ে, ভগ্নমনে বাড়ি ফিরে কাঁদতে বসত।

অন্য দিক দিয়ে আমাদের বাড়িতে তাদের অখণ্ড অধিকার ছিল, অংশীদার বললেও অত্যুক্তি হয় না। বিপদে, রোগে, দুর্ভিক্ষে, শ্মশানে পর্যন্ত পরস্পরের সহযোগিতা ও আত্মীয়তা ছিল প্রসারিত। আমাদের খড় তাদের ঘর ছাওয়াতে দিতে হত, তাদের জ্বালানি—সেও আমাদের বাড়ি থেকে যেত; আমাদের পুকুরের মাছ তারা

নিত্য ধরত, আমাদের ডাক্তার তাদের দেখত। বাড়িতে মাছ এলে তাদের ধরে যেত। আমাদের পুরানো জামা-কাপড় পছন্দ করে নিয়ে যেত।

শুধু সংযুক্ত হরিজন পরিবারটিই নয়—গোটা পল্লীর ভারই সমগ্রভাবে মধ্যবিত্তদের উপর ন্যস্ত ছিল, অবশ্য-কর্তব্যরূপে সে-ভার তাঁরা বহন করতেন।

কোনো হরিজন পরিবার অনশনে থাকত না। সেকালের গৃহিণীরা বেলা তিনটে নাগাদ বের হতেন এই পল্লী-ভ্রমণে। দেখতেন সকলের চালের দিকে চেয়ে, কার চালের উপর দিয়ে ধোঁয়া উঠছে, কার চালের উপর ধোঁয়া নাই। ঘরের ভিতর উনোন জ্বললে, চালের খড়ের উপর দিয়ে ধোঁয়া বের হয়। যার ঘরের চালের উপর ধোঁয়া উঠছে না, তার উঠানে গিয়ে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করতেন--কি, তোর আজ আখা (উনান) জ্বলে না কেন রে?

সঙ্গে সঙ্গেই কারণের প্রতিবিধান হত। পুরুষ অসুখে পড়েছে, ঘরে চাল নাই—ওষুধের ব্যবস্থা হয়েছে, চাল দেওয়া হয়েছে। মেয়ের অসুখ হয়েছে, রাঁধবার লোক নাই, ঘরে পুরুষ নাই, ছেলেরা ছোট—সে ক্ষেত্রে ছোট ছেলেদের ডেকে ভাত দেওয়া হয়েছে। দুধ গিয়েছে, তৈরি সাগু গিয়েছে।

বেলা দুটোর পরই ওদের মেয়েরা নেমে যেত পুকুরে, মাছ ধরত--শোল মাছ, ন্যাটা মাছ। বিনা মাছে তারা ভাত খেত না। মধ্যবিত্তের বাগানে শুকনো কাঠ আহরণ করতে বের হত প্রত্যহ সকালে। কাঠ ভেঙে আনত প্রচুর পরিমাণে; এ সব ছিল তাদের জীবনের অধিকারভুক্ত।

তাল গাছের পাতা এবং ফল--এতে ছিল ওদের অধিকার। গ্রামের ভিতরের গাছের তাল কেটে খাওয়া সকলের পক্ষেই নিষিদ্ধ ছিল। এই তাল পাকলে ওরা কুড়িয়ে খেত, পেড়ে খেত।

ওরা অস্পৃশ্য ছিল, তবু মানুষের হৃদয়ে ওদের প্রবেশাধিকার ছিল অবাধ। আমার মেয়ে বুলু যে দিন মারা যায়, সে দিন সতীশের মা আমার স্ত্রীকে আমাকে যে অসঙ্কোচ অধিকারে স্পর্শ করেছে সেকথা স্মরণ করে এ-কথা লিখতে আমার দ্বিধা হচ্ছে না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ছে এদের দৃষ্টিতেই সে দিন দেবতার ভোগ নষ্ট হত, এদের সঙ্গে একটা লম্বা খড় কি দড়ির সংস্পর্শে স্পর্শদোষ হলে প্রাপ্তবয়স্কেরা স্নান করেছেন। এদের বাস্তুতে এরা শুধু বাস করবারই অধিকারী ছিল, ভূমিতে কোনো অধিকারই ছিল না। এরা সে বাস্তুর উঠানে গাছ লাগাত, বাড়ির পিছনে বাঁশ লাগাত, সে গাছ, সে বাঁশঝাড় আমার হয়েছে। একটি ডাল কি একটি বাঁশের প্রয়োজনে আমার কাছে এসে হাত জোড় করে দাঁড়াত। ওরা আন্তরিক-ভাবে বিশ্বাস করেছে হীনকুলে জন্মাপরাধে ওরা সত্যই অস্পৃশ্য। পরবর্তী কালে যখন সমাজসেবার ব্রত নিয়ে ওদের বুঝাতে চেয়েছি যে, অস্পৃশ্যতা মানুষের সৃষ্টি, বিধাতার নয়—তখন ওরা শিউরে উঠেছে, আমাকে সন্দেহের চক্ষে দেখেছে। উপরের কথাগুলির সঙ্গে মনে পড়ছে—সেকালের মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্তের উচ্ছৃঙ্খল জীবনের যত পঙ্ক যত ক্লেদ সমস্ত নিক্ষেপ করেছে তারা ওদেরই জীবন-পাত্রে, সে জীবন-পাত্র বিষাক্ত করে দিয়েছে। ওদের যুবতী বধূ-কন্যাদের প্রলুব্ধ করে যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চন-

মূল্যে—চার আনা আট আনার বিনিময়ে ভ্রষ্ট করেছে—ভোগ করেছে। এমনও হয়েছে যে, গভীর রাত্রে নেশার তাড়নায় কামোন্মত্ত হয়ে নির্লজ্জ হল্লা করে ওদের পল্লীতে প্রবেশ করেছে, লাথি মেরে ঘরের আগড় বা দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকেছে, ভীত স্বামী বা পিতা ঘর থেকে বেরিয়ে গেছেন, বাড়ির গৃহিণী কর্তার পৌরুষের লজ্জাকে ঢেকে নিজের নারীজনোচিত লজ্জার মাথা খেয়ে সামান্য দক্ষিণা গ্রহণ করে বা বিনা দক্ষিণাতেই বধূ বা কন্যাকে সমর্পণ করেছে ভদ্রজনের হাতে। কেউ যদি অভিভাবকদের কাছে অভিযোগ করেছে, তবে শতকরা নিরানব্বুই ক্ষেত্রে অভিভাবক অভিযোগকারীকেই ঘৃণাভরে কঠিন শাসন করে উত্তর করেছেন—নিজের ঘর শাসন কর হারামজাদা। আর কারও ঘরে না গিয়ে তোর ঘরেই গেল কেন? আমরাই এদের সমগ্র নারীসমাজকে এমন করে তুলেছি যে, এরা ক্রমে হয়ে উঠেছে জন্মগত স্বৈরিণী। চারিদিকের সমাজের সকল লম্পটের দেহজ বিষ এদের দেহে সঞ্চারিত হয়েছে, গোটা সম্প্রদায়কে বিষাক্ত ব্যাধিগ্রস্ত করে তুলেছে। বছর কয়েক আগে আমি হিসাব করে দেখেছি, এদের শতকরা ষাটটি বাড়ি আজ সন্তানহীন। আলো বেশি কি অন্ধকার বেশি বিচার করতে চাচ্ছি না। শুধু স্মরণই করছি সেকালকে।

এদের বিপদে সেকালে সাহায্য করেছি, রোগে ডাক্তার দেখিয়েছি, অভাবে দান করেছি, ওরাও নিয়েছে—এ কথা বলবার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ছে, স্বল্প অপরাধ ওদের ক্ষমা করলেও কি কঠিন শাসনই না সেকালে করেছি আমরা! সে শাসন নয়, নির্যাতন।

প্রথমেই আমার বাবার কথাই বলি। পিতামহের শ্রাদ্ধে মাছ ধরানো হল আমাদের পুকুরে। এক-একটি মাছ পনেরো সের থেকে বিশ সের চব্বিশ সের। জেলেরা টানা জালে মাছ ধরলে। মাছ তুললে কিন্তু একখানা মাছসুদ্ধ জাল জলে ফেলে রেখে এল সকলের অজ্ঞাতসারে। তার মধ্যে রইল একটা আঠারো সের মাছ। বাকি মাছ বাড়ি এল, জেলেরা সকলেই বাড়ি চলে গেল। বাড়িতে ক্রিয়ার আয়োজন চলেছে, এমন সময় একজন চুপিচুপি খবর দিয়ে গেল, জেলেরা মাছ চুরি করেছে এবং সেই মাছ এনে কাটাকুটির আয়োজন করছে। হাটকুড়া জেলে এর পাণ্ডা, কীর্তি তারই। বাবা অগ্নিমূর্তি হয়ে বেত হাতে বেরিয়ে গেলেন একটা জনবিরল পথ ধরে, তার খানিকটা অতিক্রম করলেন একটা পুকুরের জলহীন অংশ ধরে। অকস্মাৎ গিয়ে উঠলেন হাটকুড়ার উঠানে। জেলেরা ভয়ে পাথর হয়ে গেল। বাবা হাটকুড়াকে বেতের আঘাতে জর্জরিত করে দিলেন। মাছ উঠিয়ে আনা হল। বাবার শেষে খানিকটা অনুতাপ হল, তিনি হাটকুড়াকে ডেকে এক টাকা বকশিশ দিলেন। এ আমার শোনা গল্প। আমার জীবনে আমি বাবাকে প্রহার করতে দেখিনি। তখন তাঁর ঘোর পরিবর্তন হয়েছে।

চোখে দেখেছি কত শাসন, আমাদের বাড়িতে না হলেও আশেপাশে মাসে দুটো একটা এ শাসন চলত। একবার দেখেছিলাম এক শাসন। স্মরণ করেও শিউরে উঠি আজ।

হঠাৎ চামড়ার দর চড়ে গেল। সক্রিয় এবং সচেষ্ট হয়ে উঠল চামড়ার ব্যবসাদারেরা। এরা সকলেই মুসলমান। চামড়া সংগ্রহ করে বেড়ায়, গ্রামে গ্রামে হিন্দু

সমাজের চর্মকারেরা বিক্রি করে। এরা চামড়া ছাড়িয়ে আনে ভাগাড়ে-ফেলে-দেওয়া মৃত জন্তুর দেহ থেকে। গৃহপালিত জন্তুর মধ্যে আমাদের দেশে গরুই প্রধান।

হঠাৎ গরু মরতে শুরু হল। গরুর পাল চারণভূমে যায়, ফিরে আসে—হঠাৎ অবস্থা দাঁড়ায় কলেরা-রোগাক্রান্ত মানুষের মতো, ওষুধ খাটে না, ভালো চিকিৎসকও নাই—মরে যায়। বৈদ্যরা বললেন, বিষকাঁড় করেছে মশায়। অর্থাৎ বিষপ্রয়োগ করেছে, ঘাসের পাতায় বিষ মিশিয়ে দিয়েছে।

গরুর চারণভূমে যাওয়া বন্ধ হল, কিন্তু তবু গো-হত্যা বন্ধ হল না। চামড়ার ব্যবসায়ীদের দ্বারা প্রলুব্ধ দরিদ্র চর্মকারেরা তখন টাকার নেশায় পড়েছে। আবার ভয়েও বটে—ব্যবসায়ীরা ভয়ও দেখিয়েছে—এখন নিরস্ত হলে তারাই প্রকাশ করে দেবে এ অপকর্মের কথা। তারা গ্রামের মানুষ, পথ দিয়ে যায় আসে : শাক তুলতে, কাঠ ভাঙতে কি কোনো অজুহাতে গ্রামের লোকের বাড়িতেও ঢোকে : সুযোগ বুঝে গরুর খাবার জাবের মধ্যে বিষ মাখানো পাতা রেখে যায়, গরু খায়, মরে। আমাদের কয়েকটা গাই মরে গেল। সব চেয়ে ক্ষতি হল আর একজন জমিদারের। তিনি তখনও প্রবল প্রতাপশালী জমিদারদের মধ্যে। দুর্দান্ত লোক। তাঁর বড় বড় হেলে বলদ মরে গেল, কয়েকটা গাইও গেল। বলদগুলি ছিল তাঁর শখের জিনিস। তিনি প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। ধরে আনলেন চর্মকারদের। আমরা শুনলাম, তাদের শাসন করা হচ্ছে। দেখতে গেলাম লুকিয়ে। সে দৃশ্য ভুলব না। কয়েকজন বাঁধা রয়েছে গাছে। দু-জনকে হাতে বেঁধে গাছের ডালে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। নিজে তিনি দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হনহন ক'রে এসে ঢুকলেন বৈঠকখানায়, আবার বেরিয়ে গেলেন, সঙ্গীদের কেউ বললে—মদ খেয়ে তেজী করে নিলে মন! দেখলাম তিনি গেলেন, বেত হাতে নিলেন, প্রহার শুরু করলেন। আমি ছুটে পালিয়ে এলাম।

অথচ এই জমিদারটির মতো এই সম্প্রদায়ের হিতৈষী রক্ষাকর্তা আর কেউ ছিল না। গ্রামে প্রবল মহামারী চলেছে, ভদ্রজনেরা সকলে গ্রামান্তরে স্থানান্তরে গেলেন। ইনি যাননি, এই হরিজনপল্লীতে কলেরা চলেছে—তাদের জন্যই যাননি। ওদের দেখবে কে? কলেরার চিকিৎসা সেকালে ছিল না, ডাক্তারেরাও যেত না, তবু ওদের চাল দিতে হবে, অন্ন চাই ; সব চেয়ে বড় কথা—সাহস দিতে হবে, তার লোক চাই। তিনি থাকতেন। একবার এমনি মহামারীতে তাঁর স্ত্রী মারা গেলেন ; তিনি বললেন—কি করব? ওদের ছেড়ে যাব কি করে? তা কি হয়! শুধু ওই হরিজন সম্প্রদায়ই নয়—এ শাসন বিস্তৃত ছিল সমস্ত মজুরশ্রেণীর উপর, সমস্ত কৃষকশ্রেণীর উপর। আমাদের ওই অঞ্চলে মুসলমানেরা আর্থিক অবস্থায় পেশায় কৃষকশ্রেণীভুক্ত। তাদের উপর ঠিক এতখানি না চললেও কিছুটা চলত। আমাদের গ্রামের পাশে ঠাকুরপাড়া। তারপর পশ্চিমপাড়া। তার ওদিকে ব্যাপারীপাড়া। ব্যাপারীপাড়ার পাশে ছোট গোগা, শেখপাড়া, একখানা গ্রাম পার হয়ে পুরানো মহগ্রাম, কামারমাঠ, ফলগ্রাম। এগুলি সব মুসলমানের বসতি। এক কালে ঠাকুরপাড়ার ঠাকুরেরা ছিলেন এ অঞ্চলের অধিপতি। ঠাকুরেরা মুসলমান। এঁরা ছিলেন নাকি যোগী বংশের সন্তান, তাই লোকে বলত—ঠাকুর। শুধু এ অঞ্চলে ভূমির অধিপতিই ছিলেন না,

মুসলমানদের ধর্মগুরুও ছিলেন। সম্রাট আলমগীরের তামার ছাড়পত্র আজও এঁদের বাড়িতে আছে। নানকার নিষ্কর জমির ছাড়পত্র। মূল বংশের আর কেউ আজ নাই। আমার বাল্যকালেও কয়েকজনকে দেখেছি। মাথায় সাদা টুপি, সৌম্যদর্শন মুসলমান। কী মধুর ব্যবহার, কী মিষ্ট কথা! নিজেদের দলিজায় তক্তাপোশের উপর বসে থাকতেন, এক প্রসন্ন উদাসদৃষ্টিতে পথের দিকে চেয়ে থাকতেন। কোথাও যেতেন না।

অনেক সন্ধান করেছি, সন্ধান করে আমার মনে হয়েছে, কোন্‌কালে এঁরা ছিলেন হিন্দু এবং ধর্মগুরু ব্রাহ্মণই ছিলেন। কোনোমতে স্বধর্মচ্যুত হয়েছিলেন এবং হয়েছিলেন তাঁর স্বজাতীয় অপর কোনো ব্রাহ্মণ প্রতিপক্ষেরই চক্রান্তে। তার ফলে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শিষ্য যজমান ভক্ত সকলেই ইসলাম অবলম্বন করেছিল।

থাক সে-কথা।

মুসলমানেরা কিন্তু হরিজন কৃষক-মজুরদের মতো এত নত ছিল না। থাকবার কথাও নয়। ইসলামের ওই গুণটি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। চোখে দেখেছি যে, হরিজন কোনো কারণে ইসলাম অবলম্বন করলে কিছুদিনের মধ্যেই তার পরিবর্তন ঘটে, সে মাথা উঁচু করে চলতে শেখে।

মুসলমানদের মধ্যে প্রথম আধিপত্য ছিল জমিদার হিরণ্যভূষণবাবুর। তারপর সে-আধিপত্য আয়ত্ত করলেন নবোদিত ধনী যাদবলালবাবু। এই আয়ত্তে আনার উদ্যোগপর্বে ওই সব গ্রামের জমিদারির অংশ কিনলেন তিনি। তাদের প্রচুর কাজ দিলেন। বড় বড় ইমারত তৈরির কাজে, দীঘি কাটার, জমি তৈরির কাজে তাদেরই তিনি ডাক দিলেন। তারা এল এগিয়ে। তবুও তারা হিরণ্যবাবুকে ত্যাগ করলে না। তখন যাদবলালবাবুর বড় ছেলে এদের শাসন করবার জন্য উদ্যত হলেন। বেত হাতে নিলেন। ফলে একদা গুজব রটল, মুসলমানেরা এক হয়ে এর প্রতিবাদে বদ্ধপরিকর হয়েছে। তারা স্থির করেছে, অত্যাচারীকে হত্যা করে ফেলবে। স্বর্গীয় যাদবলালবাবু উপেক্ষা করলেন না গুজব, তিনি পুত্রকে সংযত করলেন, মুসলমানদের ডেকে সান্ত্বনাবাক্য বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন, এ অত্যাচার তিনি কোনো মতেই হতে দেবেন না।

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে স্পৃশ্যতা-অস্পৃশ্যতা নিয়েও কোনো বিরোধ সেদিন অনুভব করিনি। শুদ্ধাচারী হিন্দু মুসলমানকে স্পর্শ করে কাপড় ছাড়তেন। এ মুসলমানেরা জানতেন। তাঁরাও কোনোদিন হিন্দুর বাড়িতে অন্নজাতীয় আহার্য গ্রহণ করতেন না। মধ্যে মধ্যে সামাজিক নিমন্ত্রণে সিধা এবং ফল-মিষ্টান্নের আদান-প্রদান চলত।

তবু এ কথা বলব যে, বাহ্যিক প্রশান্ত প্রসন্ন এই সম্পর্কের মধ্যে কোথায় যেন ছিল একটি ভেদ এবং বিরোধের সুর।

মনে পড়ছে এবারত হাজী এবং আব্বাস হাজীকে।

এবারত হাজী ভীমের মতো বিশালকায় মানুষ। দুই ভাই প্রথম জীবনে মাটি কাটার কাজ করতেন। শুধু দেহের শক্তিবলেই বিস্তীর্ণ ভূমিলক্ষ্মীর অধিকারী

হয়েছিলেন। শুনেছি, দুই ভাই পতিত জমি বন্দোবস্ত নিয়ে নিজেরা কোদালে কেটে মরা পুকুরের পাঁক বয়ে তাতে দিয়ে উর্বর কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করেছিলেন। দুনিয়া সুদ্ধ লোকের চাচা ছিলেন। হজ করে এসেছিলেন। মাথায় টুপি পরে লুঙির মতো কাপড় পরে, গায়ে চাদর দিয়ে আসতেন, আম বাড়িতে আসতেন, বাড়ির ভিতর আসতেন—কই, পিসিমা কই?

আমরা ডাকতাম—চাচা।

উত্তর দিতেন—বাপ। ঘুরে তাকিয়ে বলতেন, আরে বাপ রে, বাপজান! ছোট হুজুর!

বলতাম, চাচা, সেইটি বল।

হা-হা করে হেসে চারদিক চঞ্চল করে তুলে বলতেন--খুব উঁচু গলায় লম্বা উচ্চারণে বলতেন, আমরা মু-স-ল-মা-ন, আমরা এ-তো ব-ড়ো—। নিজের হাতটা যতখানি ওঠে তুলে এবং নিজে খুঁড়িয়ে উঠে আরও খানিকটা উঁচু করে দেখাতেন কত বড়। তারপর মিহিগলায় হাতের দুটি আঙুল জুড়ে একটি মটর বা সরষের আকার দেখিয়ে বলতেন—তোমরা হিন্দু এতটুকু। কথাগুলি দ্রুত উচ্চারণে বলে যেতেন।

এটুকু অবচেতন বিরোধের প্রকাশ। সমাজগতভাবে বিরোধ উপস্থিত হলে এর প্রকাশ্য প্রকাশ হত। সেকালে কদাচিৎ হত। তবু ছিল। এই আমার সেকালের সেকাল।

আমার কালের সেকালের আর একটি স্মৃতি আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। এর আগে তার দোষ বলেছি, গুণ বলেছি, যেমন চিনেছি তেমন বলেছি। এবার যেটি বলব সেটি সুন্দরের স্মৃতির শোভা। সেকালের ঘর-দুয়ারের ছিল পরিচ্ছন্ন শ্রী। অপরূপ শ্রী ছিল। স্বাচ্ছল্য সেকালে ছিল। কিন্তু একালে স্বাচ্ছল্য অনেক স্থলে অনেক বেশিই আছে, সমারোহ একালে সর্বত্রই বেশি। কিন্তু স্বল্প আয়োজনে যে পরিচ্ছন্ন শ্রী সেকালে দেখেছি সে একালে নাই। নিকানো মাটির মেঝে—খড়ি রঙের আলপনা, নিকানো উঠান, নিকানো খামার, সবুজ সবজিক্ষেত, ঘরের এক পাশে কিছু ফুলের গাছ—এই আয়োজনের সে শ্রী অপরূপ। আজ দালান হয়েছে, পাকা মেঝে হয়েছে, চেয়ার-টেবিল আসবাব হয়েছে ফোটোগ্রাফে-ছবিতে দেওয়াল সাজানো হয়েছে; কিন্তু সে পরিচ্ছন্নতা নাই—সে নয়নমনোরম শ্রী নাই।

ফুলের বাগান—অন্ততপক্ষে কয়েকটি ফুলের গাছ সব বাড়িতেই ছিল। রুচিবানদের বাড়িতে বাগান ছিল। আমার বাবার বাগান ছিল বিখ্যাত। সকালবেলাতেই দেবস্থলের পূজারীতে, ইষ্টভক্ত প্রবীণ-প্রবীণা পূজার্থীতে, ব্রতপরায়ণা কুমারীর দলে ভরে যেত। সে বাগানের চিহ্ন আজও আছে দু-একটি পুরানো গাছের আর ইটের কেয়ারীতে। মাঝখানে ছিল একটি বাঁধানো বেদী। সেটিও আছে। বেদীর কোল ঘেঁষে সোজা একটি রাস্তা—তার দুধারে বাগান। বাগানের পশ্চিমদিকে গ্রামের রাস্তা, বাগানের দুই প্রান্তে বাড়ি ঢুকবার দুটি দুয়ার—এক দুয়ারের মাথায়

মাধবীলতা, অন্যটির মাথায় ছিল মালতীলতা। বর্ষার শেষে শরতের প্রারম্ভে সাদা ফুলের অজস্রসম্ভারভরা। মালতীলতাটি আর নীল আকাশে টুকরা টুকরা সাদা মেঘ—মনকে অপরূপ প্রসন্ন মাধুর্যে ভরে দিত। আর তেমনি উঠত নাতিমদির মৃদু মধুর গন্ধ। মালতীর মালা গেঁথে—কোনোদিন আমার গলায় পরার অথবা প্রিয়ার কবরী ভূষিত করার আকাঙ্ক্ষা জাগেনি। ফুল তুলে দেবস্থলে পাঠিয়েছি। বসন্তে ফুটত মাধবী, অপরূপ কারু তার গঠনে--মর্মস্থলে বাসন্তী রঙের ছোপ. থোকা থোকা ফুটে থাকত হরিদ্রাভ-মর্ম রত্নগুচ্ছের মতো। যেমনি মধুর গন্ধ। এ ফুলে মালা গাঁথা যায় না, আমি গাঁথতে পারিনি, গুচ্ছ গুচ্ছ তুলে দেবপূজায় পাঠিয়েছি. বিছানায় ছড়িয়েছি। বসন্তে আরও ফুটত বেল ফুল, রজনীগন্ধা। বেল ফুল ফুটত প্রত্যহ এক ঝুড়ি। বসন্তে শুরু হত—চলত বর্ষার শেষ পর্যন্ত। বর্ষায় আরও ফুটত জুঁই। লতানে জুঁই নয়, ঝাড় জুঁই, এ ঝাড় দুটির গোড়া খড়ের দড়িতে বেঁধে বাবা তাকে এক বড় তোড়ার মতো আকার দিয়েছিলেন। রাশি রাশি জুঁই ফুটত। মালা গাঁথা হত, দেবতা পরতেন--মানুষ পরত। আর ছিল কাহিনী। করবী টগর জবা, এরা ছিল—বারো মাস ফুল দিত, কামিনী দিত কিছুদিন পরে পরে—ঝাঁকে ঝাঁকে ফুল; সমস্ত রাত্রিটা মদির করে রাখত বায়ু-পরিমণ্ডলকে। সকাল থেকে তার ঝরা শুরু হত। শরতে শিউলি ফুটত, মেয়েরা ফুল কুড়িয়ে বোঁটা ছাড়িয়ে শুকিয়ে কাপড় রাঙাত। আমরা কাগজে দেওয়ালে কাঁচা বোঁটা ঘষে হলুদ রঙের দাগ টানতাম। ম্যাপে দিয়েছি শিউলি-বোঁটার হলুদ রঙ। ধারে ধারে ছিল ফলের গাছ, নারকেল গাছ ছিল, কাঁঠাল গাছ ছিল, লেবু ছিল; সুপারি ছিল, আর ছিল আমাদের শিশুজিহ্বা-মনোহর পেয়ারা গাছ। একটু দূরে ছিল একটি আম গাছ, আমার শৈশবের কত দ্বিপ্রহর সেই গাছে কেটেছে; পেয়ারা গাছে আমার কত কাপড় ছিঁড়েছে তার হিসেব নাই, কিন্তু মনে আছে। এই সব ফুলের শোভার মধ্যে আমাদের বাড়িতে মধ্যমণির মতো ছিল একটি গোলাপ গাছ। ব্ল্যাকপ্রিন্স গোলাপের গাছ। গাঢ় কালচে লাল, ভেলভেটের মতো একটি কোমল লাবণ্যভরা সে ফুল—আজও আমার মনের মাঝখানে যেন ফুটে রয়েছে। ঘন সবুজ ডাঁটার সর্বাঙ্গে কাঁটা—অগ্রভাগ ঈষৎ রক্তাভ, তারই প্রান্তে বড় আকারের ফুলটি বাতাসে দুলত;—লাল মানিকের মতো ফুটে থাকত। একটি ফুলই মনে পড়ে। কবে যে ফুটে আমার মনোহরণ করেছিল, সে দিন ক্ষণ মনে নাই, ফুলটি অক্ষয় আছে মনে- কোনো দিন ঝরল না, শুকাল না।

ফুল জীবনে অনেক দেখলাম. অনেক দেখব, কিন্তু আজ বার বার মনে হয়—তেমন গোলাপ আর কোথাও ফুটবে না; তেমন ব্ল্যাকপ্রিন্স আর দেখব না। সেই বোধ হয় প্রকৃতির রূপের সঙ্গে আমার শিশুচিত্তের প্রথম প্রেম—শুভদৃষ্টি।

নীল আকাশের তলে বৈঠকখানার সাদা দেওয়ালের পটভূমিকে পিছনে রেখে গাঢ় কালচে লাল ব্ল্যাকপ্রিন্স দুলত। লম্বা সবুজ ডাঁটিটি পর্যন্ত মনে রয়েছে। ছোট আমি—আমার চেয়ে খানিকটা বড়ই ছিল স্মৃতির সেই ডালটি, তারই মাথায় সেই গাঢ় লাল কোমল ফুলটি;—তুলতে বারণ ছিল, কিন্তু লোভ ছিল, নুইয়ে

শুকতে চেষ্টা করেছি, স্পর্শ করতে চেয়েছি, পারিনি, কাঁটা ফুটেছে হাতে, লাল ফোঁটা ফোঁটা রক্ত বেরিয়েছে। রক্তের ফোঁটায় ব্ল্যাকপ্রিন্স ফুটত।

সে গাঢ় কালচে লাল মস্ত বড় গোলাপ ফুল—একালে আর কোথাও ফুটল না। তাই বলছিলাম—আমার সেকালের পুষ্পশোভা আর এই লাল গোলাপ ফুল, একালের সকল দীপ্তির মধ্যেও অম্লানদীপ্তিতে ফুটে আছে। ঘন লাল কালচে লাল ব্ল্যাকপ্রিন্স গোলাপ সে বোধ হয় আমার কাছে ছিল ব্ল্যাকপ্রিন্সেস।

মধ্যে মধ্যে মনে হয়—জীবন ও স্মৃতি যদি এমন জীর্ণই হয়ে আসে যে, সকল কিছু সুন্দরের মুখ কুহেলিকায় ঢেকে আচ্ছন্ন হয়ে আসবে, তবে শেষ ঢাকা পড়বে ওই লাল ফুলটি। ওই যেন আমার সকল সুন্দরের কেন্দ্রে বিরাজিত রয়েছে। মৃত্যুকে বলি—মৃত্যু, তুমি, যদি সুন্দর হও, তবে তোমায় নিশ্চয় দেখব ওই স্মৃতির গাঢ় লাল গোলাপের ছবিতে, জীবনের দৃষ্টিগণ্ডী ক্রমসংকুচিত বলয়রেখার মতো ছোট থেকে আরও ছোট হয়ে আসবে, আকাশ পৃথিবীর মানুষ সবই বলয়গণ্ডীর বাইরে পড়ে যাবে, শেষ থাকবে ওই ফুলটি। ফুলটি যখন থাকবে না, তখন চোখের দৃষ্টি মুছে যাবে। আমার ব্ল্যাকপ্রিন্সেস। গাঢ় কালচে লাল—ভেলভেটের মতো গোলাপ ফুল আমার কালের সেকালের এবং সকল কালের মনোহারিণী।

দোষে গুণে সেকাল এক জীর্ণমূল বনস্পতির মতো। বিস্তীর্ণ শাখায় শাখায় ঘন পত্রপল্লবে পল্লবে ছায়া বিস্তার করে বিরাজিত ছিল। তার সর্ব অঙ্গে জীর্ণতা—বহু বজ্রপাতে বহু কোটরের সৃষ্টি হয়েছে, বহু শাখা ভেঙে গেছে, ভগ্ন শাখার চিহ্নগুলি মহাযোদ্ধার অঙ্গের ক্ষতচিহ্নের মতো সম্ভ্রম জাগাত। তার তলায় চলেছে সাধুর সাধনা, পথিক পেয়েছে বিশ্রাম, রাখাল গিয়েছে নিদ্রা, সরীসৃপ তার কোটরে গর্জন করেছে, মাথায় শকুন বসেছে, ডালে শুক বাসা বেঁধেছে, রাত্রের অন্ধকারে ব্যভিচার চলেছে। তার তলায় ডাকাতেরা, চোরেরা, ঠ্যাঙাড়েরা এসে মজলিস করেছে, মন্ত্রণা করেছে, লুঠের মাল ভাগ করেছে। তার ডালে দড়ি বেঁধে গলায় জড়িয়ে কেউ আত্মহত্যা করেছে। কোনো অমাবস্যার রাত্রে তারই তলে শবাসনে বসে তান্ত্রিক তপস্যা করেছেন। আর জীর্ণমূলে বনস্পতি ঝড়ের অপেক্ষা করেছে আকাশের দিগন্তের দিকে চেয়ে। কখন আসবে ঝড়? ভেঙে পড়বে সে, তার আত্মা সেই ঝড়ে উড়ে মহাকালের মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে। মাটির তলায় নূতন কালের বীজ তখন ফেটেছে, অঙ্কুর উঠছে। ওই বনস্পতিরই ঝরেপড়া বীজের অঙ্কুর, তারই গোড়ায় সে জন্মাচ্ছে। ঝড়ে চারিদিক বিপর্যস্ত হবে, বর্ষণে মাটি নরম হবে, অতীত কালের বনস্পতি ধরাশায়ী হয়ে আকাশপথ করবে উন্মুক্ত, সেই পথে নূতন কালের অঙ্কুরের আলোক-সাধনা হবে শুরু।

কখন আসবে ঝড়?

মানুষও তখন বলতে শুরু করেছে—এর শেষ কর! আর সয় না। কবে আসবে নূতন দিন?

দশ

'এল ঝড়। এল নূতন কাল। এল আমার কালের নূতন কাল।

১৯০৫ সালের ৩০শে আশ্বিন।

বাঙালীর জীবনে—ভারতবর্ষের জীবনে সে একটি মহামহিমময় দিন। এমন দিন জাতির জীবনে, দেশের ইতিহাসে বহু শত বৎসরে একবার আসে।)

সূর্যোদয় হয় নিত্য; পাখিরা কলরব করে, ফুল ফোটে, কীট-পতঙ্গেরা পাখা মেলে ভেসে পড়ে; গুঞ্জনধ্বনি তোলে, মানুষ জেগে ওঠে—তাদের বাঁধাধরা কাজ-কর্মের বোঝা কাঁধে নিয়ে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানকে বহন করে নিয়ে চলে প্রত্যাশাপূর্ণ ভবিষ্যতের দিকে; কালকে নিয়ে চলে কালান্তরের সন্ধিক্ষণের পানে। চলে—চলে—চলে। দিনের-পর-দিন চলে যায়, এক পুরুষের বোঝা অপর পুরুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তারা অন্তিম নিশ্বাসের সঙ্গে বেদনার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে যায় এই বলে যে, 'পুরুষান্তর হল, তবু সেই সন্ধিক্ষণ এল না; বহুকামনার কালান্তর হল না।।' কামনা করে যায়, 'যেন তার পরবর্তী পুরুষের জীবনে সেই সন্ধিক্ষণ আসে।'

১৯০৫ সালের ৩০শে আশ্বিন সেই সন্ধিক্ষণ এল, ঘোষণা করে বললে—আমি এলাম।

সেই তিরিশে আশ্বিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সে দিন দেশ যে জেগে উঠল—সে জেগে ওঠার তুলনা নাই। সেদিন পাখিরা যেন কলরব করে গেয়ে উঠল।

"ভেঙেছে দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময়
তোমারি হউক জয়।"

ফুলেরা ফুটল, তাদের বর্ণে গন্ধে বাণী ফুটে উঠল—

"তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়
তোমারি হউক জয়।"

কীট-পতঙ্গের পক্ষগুঞ্জনে উঠল তারই প্রতিধ্বনি। মানুষেরা জেগে উঠল, সূর্যপ্রণাম করে বললে—

"হে বিজয়ী বীর, নবজীবনের প্রাতে
নবীন আশার খড়্গ তোমার হাতে,
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে
বন্ধন হোক ক্ষয়।
তোমারি হউক জয়।

এসো দুঃসহ, এসো এসো নির্দয়
তোমারি হউক জয়।...
অরুণ-বহ্নি জ্বালাও চিত্ত-মাঝে—
মৃত্যুর হোক লয়।
তোমারি হউক জয়।”

মহাকবির কাব্যকে আশ্রয় না-করে তার মহিমা প্রকাশ করা যায় না।

আমার জন্ম ১৮৯৮ সালের আগস্ট মাসে। ১৯০৯ সালের অক্টোবরে আমার বয়স সাত বছর দু-মাস। আমার চোখে সে-দিনের সে-জাগরণের স্মৃতি জ্বলজ্বল করছে। মনে পড়ছে ভোর হতে-না-হতে গ্রামের তরুণ দলের সাড়া জেগে উঠল। এ ওকে ডাকছে, ও তাকে ডাকছে—

—নির্মল!

—কে? গোপাল?

—হ্যাঁ। উঠে আয়।

—আসছি।

—আয়। আমরা আর সবকে ডাকতে যাচ্ছি।

—ষষ্ঠী! ষষ্ঠী!

—ষষ্ঠী তো বেরিয়ে গেছে বাবা। সে ফোড়নকে ডাকতে গিয়েছে।

—গাবু! গাবু!

—যাচ্ছি।

—ধীরেন উঠেছে?

—উঠেছি। আমি ছোটকাকা একসঙ্গে যাচ্ছি।

—সুধীর! সুধীর!

—সে কালীকিংকরের বাড়িতে।

—রজনী! রজনী!

—সে কালীকিঙ্করের বাড়ি গেল সুধীরের সঙ্গে।

—কালীকিঙ্কর!

—যাচ্ছি আমরা।

ডাক চলেছে এপাড়া থেকে ওপাড়া। সেখান থেকে বাজারপাড়া। ওদিকে ইস্কুল-বোর্ডিং থেকে সমবেত কণ্ঠের ধ্বনি ভেসে আসছে—বন্দেমাতরম্! বন্দে-মাতরম্! বন্দেমাতরম্!

আমার বাবা উঠতেন একটু দেরিতে। আগেই বলেছি তাঁর বৈঠকখানায় একটা বড় মজলিস বসত। সেখানে প্রতি সন্ধ্যায় গ্রামের অন্তত অর্ধেক প্রধানেরা এসে সমবেত হতেন। সে মজলিস চলত রাত্রি বারোটা পর্যন্ত। তারপর বাড়ি এসে মুখ হাত ধুয়ে খাওয়াদাওয়া সেরে ইষ্টস্মরণ সেরে শুতে প্রায় একটা বাজত। কোনো কোনোদিন মজলিস ভাঙতে আরও দেরি হত। কাজেই ভোরে তিনি উঠতে পারতেন না। সেদিন কিন্তু ভোরবেলা উঠেছিলেন তিনি। তাঁর ডায়রিতে সে

কথার উল্লেখ রয়েছে। আমার মনে আছে—তিনি আমাকে একটি গল্প বলেছিলেন। তিনি গল্প বড় একটা বলতেন না। সেদিন বলেছিলেন। বলেছিলেন সুলতান মামুদের সোমনাথ-মন্দির ধ্বংসের গল্প। একটা কথা তার মধ্যে আজও মনের মধ্যে জ্বলজ্বল করছে। বলেছিলেন—"সোমনাথ শিবলিঙ্গকে উপড়ে নিয়ে গেল সুলতান মামুদ। সোমনাথ আপত্তি করলেন না, রুদ্রমূর্তিতে জেগে উঠলেন না, তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন হিন্দুর অধঃপতন দেখে। দেবতা প্রসন্ন থাকেন, সাহায্য করেন, পরিত্রাণ করেন সাধুকে। সাধু কে? না, যিনি সৎ, যিনি পবিত্রাত্মা, তিনি। হিন্দু জাতি তখন অধঃপতিত, তাদের সততা নাই, অন্তরের পবিত্রতা নাই, তাই দেবতা তখন তার প্রতি বিমুখ। দেবাদিদেব বহ [illegible] পাথরের গড়া লিংগ-মূর্তির ভিতর থেকে চলে গিয়েছেন স্বস্থানে [illegible]র পাণ্ডারা, পূজকেরা ওই লিংগমূর্তির নিচে একটা গহ্বর তৈরি করে [illegible] রাখত ধন-সম্পদ—কোটী কোটী টাকা মূল্যের সোনা-মণি-মাণিক্য। [illegible] শিব পরম বৈরাগী, শ্মশানের ছাই তাঁর অংগভূষণ, মড়ার হাড় তাঁর আভরণ, পশুচর্ম তাঁর বসন। সম্পদ সোনা-রূপা-হীরা-মণি-মাণিক্যের স্পর্শে তাঁর শরীরে যন্ত্রণা হয়। ঘর দোর তিনি তৈরি করেন না, তিনি ঘুরে বেড়ান শ্মশানে, বাস করেন হিমালয়শিখরে কৈলাসে। তিনি লোভী পূজক আর অধঃপতিত, অপবিত্র-আত্মা, মানুষের পূজা নেবেন কি করে? তাই চলে গিয়েছিলেন। সেই কারণেই দেবতা-পরিত্যক্ত পুণ্যহীন উচ্ছৃংখল হিন্দুরা হল পরাজিত। অনায়াসে সুলতান মামুদ জয় করলেন সোমনাথের মন্দির, ভেঙে ফেললেন পাথরের শিবমূর্তি। পেলেন রাশি রাশি ধন। সেই ধনসম্পদের সংগে নিয়ে গেলেন শিবমূর্তি। হাহাকার উঠল দেশে—সমস্ত ভারতবর্ষে। অরক্ষিত হল ভারতবর্ষ। তখন স্বপ্নাদেশ দিলেন পরমেশ্বর। স্বপ্নে বললেন—অধঃপতনের এ হল প্রায়শ্চিত্ত। এ প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হবে, যে দিন সমস্ত জাতি অনুতপ্ত হয়ে আবার পুণ্যের সাধনায় আত্মনিয়োগ করবে, পুণ্য যেদিন সঞ্চিত হবে সেই দিন। এমনি পুণ্যবান যদি কেউ আমার বেদীতে বা ওই বিদেশে গিয়ে আমার ভগ্নমূর্তির উপর এক গণ্ডুষ গঙ্গাজল আর একটি মাত্র বিল্বপত্র নিয়ে 'নমঃ শিবায়' বলে দিতে পারে—তবে সেই মুহূর্তে আমি আবার আবির্ভূত হব।" গল্পটি শেষ করে বলেছিলেন, "জান বাবা, আজ যে এই দিন - এ বোধ হয় সেই দিন। আজ বোধ হয়, আমাদের চৈতন্যোদয় হল। আজ বোধ হয় শুরু হল পুণ্য সাধনার।" চোখ তাঁর ছলছল করে উঠেছিল।

পুণ্য সাধনার যে সূত্রপাত হল, এ যেন সেদিন চোখে দেখা গিয়েছিল। বেলা দশটা নাগাদ গ্রামের রাস্তায় বের হল প্রকাণ্ড মিছিল। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, গন্ধবণিক ঘরের অল্পবয়সী ছেলেরা, বোর্ডিঙের ছেলেরা খোল করতাল বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। দলের পুরোভাগে ছিলেন কে কে—সকলকে স্মরণ করতে পারি না। তবে তিনজনকে মনে আছে। আমাদের গ্রামের শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়—গৌরবর্ণ দীর্ঘাকৃতি সুগঠিতদেহ গোপালবাবু আমার চোখে সেদিনের লাভপুরের নব অভ্যুদয়ের অগ্রদূত। সৃষ্টিকর্তা দুর্লভ মূলধন দিয়ে তাঁকে যেন

পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। প্রদীপ্ত বহ্নিশিখার মতো রূপ, দুর্লভ সুকণ্ঠ, জন্মগত সঙ্গীতপ্রতিভা, তেমনি প্রতিভা ছিল সাহিত্যে; বুদ্ধি ছিল শাণিত তীক্ষ্ণ, সাহস ছিল অপার। তিনিই ছিলেন সেদিন গানের দলের অগ্রগায়ক অধিনায়ক। তাঁর পাশে আরও দু-জন ছিলেন—একজন স্বর্গত নির্মলশিববাবু, অপরজন স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। স্বর্গগত নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে অল্পবিস্তর পরিচিত। বিশেষ করে তাঁর 'রাতকানা' প্রহসনটি বাংলার নাট্য-সাহিত্যের প্রহসন বিভাগে স্থায়ী আসন পেয়েছে। তিনি আমাদের গ্রামের আকাশের নবোদিত ভাস্করতুল্য—নবীন ধনী স্বর্গীয় যাদবলালবাবুর ছোট ছেলে। ইতিমধ্যেই ইংরেজ সরকারের প্রতিনিধিরা যাদবলালবাবুকে করস্পর্শ দিয়ে সম্মানিত করেছে, নিজের সামনে চেয়ার দিয়ে বসবার অধিকার দিয়েছে, কানে কানে ভাবীকালে খেতাবের কথাও বলেছে। বলেছে, তোমরাই হলে আইন ও ন্যায়াধিকারে প্রতিষ্ঠিত এই বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ। তুমি দেখবে যাদবলালবাবু, এখানে যেন ওই সব বাজে হুজুগ—

"That Suren Banerjee's wretched Bandemataram movement", কাপড় পোড়ানো, এ সব না হয়। কিন্তু নির্মলশিববাবু সে দিন ছিলেন তরুণ। সে দিন তিনিও সাড়া না-দিয়ে পারেননি। তিনি ছিলেন পুরোভাগে, তিনি ছিলেন অন্যতম উদ্যোক্তা। আর স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন—আমাদের নূতন হাই ইস্কুলের থার্ড মাস্টার। তেজস্বী দীপ্তিমান মানুষ। খড়্গের মতো নাক, চোখ দুটি ছিল অদ্ভুত ছোট, কিন্তু তাতে ছিল অন্তর্ভেদী দৃষ্টি এবং সে দৃষ্টির মধ্যে ছিল অকুতোভয়তা। আর ছিলেন তিনি সুবক্তা, সুবক্তা বললেও ঠিক বলা হল না—তাঁর মধ্যে বাগ্মিতার বীজ ছিল।

আজ এই তিনজন সম্পর্কে বলতে গিয়ে একটা কথাই তিনজন সম্পর্কে মনে হচ্ছে। তিনজনেই জীবনে সার্থক হতে পারেননি। গভীর বেদনা অনুভব করি তিনজন সম্পর্কে। মধ্যে মধ্যে ভাবি কেন পারলেন না? অথচ উপাদান ছিল প্রচুর।

স্বর্গীয় নির্মলশিববাবুর কারণ জানি। ধনসম্পদ এবং ইংরেজ সরকারের রাজপুরুষদের মোহে পড়ে তিনি তাঁর সাধনমার্গ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছিলেন। সুখ তাঁকে নষ্ট করেছিল। তিনি যদি রায়বাহাদুর উপাধি না পেতেন, তবে শেষ জীবন এমন সকরুণভাবে নিষ্ফল ব্যর্থ হত না। তাঁর জীবনে ছিল সুদুর্লভ একটি গুণ, বহু তপস্যা না করে এ গুণ আয়ত্ত করা যায় না। মানুষ মনুষ্যত্ব নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না, সে জন্মায় জীবরূপ নিয়ে, তার স্বাভাবিক ধর্ম হল ক্রোধ হিংসা লোভ। নির্মলশিববাবু জন্মেছিলেন যেন অক্রোধ নিয়ে। ওটি যেন ছিল তাঁর জন্মগত গুণ-সম্পদ। শেষ-বয়সে উপাধি এবং সম্পদ তাঁর দেবদুর্লভ গুণকেও বহুলাংশে নষ্ট করেছিল। বাইরের যাঁরা, তাঁরা হয়তো এর আঁচ পাননি। আর যারা লাভ-পুরের নিকটের মানুষ তারা এ আঁচ পেয়েছিল। আর ছিল প্রগাঢ় সাহিত্যানুরাগ, অভিনয়-প্রীতি ও প্রতিভা। এমন অভিনয়-প্রতিভা ও প্রীতি দুর্লভ। জীবনের

প্রথমাংশে এসব ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সত্যকারের সাধক। তাঁর সাধনার ফল গোটা গ্রামকে ধন্য ও সমৃদ্ধ করেছিল। কিন্তু সে-সাধনাতেও তাঁর ছেদ টেনে দিলে ইংরেজ রাজসরকারের তুচ্ছ প্রসাদ প্রলোভন।

নিত্যগোপালবাবুকে নষ্ট করেছে, তাঁর জীবনকে ব্যর্থ করেছে, ঠিক তার উলটো দিকের আঘাত। মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান; বাড়িতে শাসন ছিল অতিমাত্রায় কঠোর, আঠারো-উনিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত তাঁর কাকার হাতের বেত্রাঘাত তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। তবু হার মানেননি। হার মানতে হল নিষ্ঠুর অভাবের মধ্যে পড়ে। আদর্শানুরাগী তরুণ, কন্যাদায়গ্রস্ত শিক্ষককে তাঁর অন্তিমশয্যায় প্রতিশ্রুতি দিলেন, কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করবেন। শিক্ষক তাঁকে আশীর্বাদ করে নিশ্চিন্ত হয়ে শেষ-নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। গোপালবাবু গোপনে শিক্ষক-কন্যাকে বিবাহ করে প্রতিশ্রুতি রাখলেন। কিন্তু বিবাহের সন্ধ্যাতেই কথাটা প্রকাশ পেয়ে গেল। বেত্রপাণি খুল্লতাত লোক নিয়ে ছুটে গেলেন, বিবাহ বন্ধ করবেন। কিন্তু তখন বিবাহ হয়ে গেছে। বর্জিত হলেন সংসার থেকে গোপালবাবু। বয়স তখন ১৯।২০, আরম্ভ হল দুঃখের পরীক্ষা। উত্তীর্ণ হতে পারলেন না। আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন। আশ্রয় নাই, অন্নসংগ্রহের সাধ্য নাই; কি করবেন? ওই অবস্থাতেই অগ্রসর হতে না-পেরে তাঁকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে হল, তারও বেশি—নিতে হল তাঁকে পুলিশের চাকরি। জীবনাদর্শের সব শেষ হয়ে গেল। নইলে তিনিই নিয়ে এসেছিলেন আমাদের গ্রামে বিবেকানন্দের ভাবধারাকে বহন করে। সাহিত্য-সাধনার একটি ধারাকে শঙ্খ বাজিয়ে নিয়ে এসেছিলেন তিনি এবং নির্মল-শিববাবু, তাঁরাই এ ক্ষেত্রে ছিলেন যুগ্ম ভগীরথ। সব চেয়ে বড় ছিল তাঁর সংগীতপ্রতিভা। এমন সতেজ এবং সুডৌল মধুক্ষরা কণ্ঠস্বর বোধ হয় আমার জীবনে আমি শুনিনি। সে সুরমাধুর্য আজও কানে লেগে রয়েছে। শংকরাচার্যের শিবাষ্টকং, রবীন্দ্রনাথের 'কে হে মম মন্দিরে' এ গান দুখানি ছেলেবেলায় শুনেছি, অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।

থাক সে-সব কথা।

মিছিলের কথা বলি।

সেদিন মিছিল চলল করতাল বাজিয়ে, দেশের বন্দনা গান গেয়ে। বন্দেমাতরম্ ধ্বনি তুলে গ্রাম প্রদক্ষিণ করে এসে উপনীত হল আমাদের গ্রামের মহাপীঠে। সেখানে স্নান করলেন সকলে।

'ভাই-ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই' বলে পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন। 'বাংলার মাটি বাংলার জল' মন্ত্রোচ্চারণ করে হলুদ রঙের রাখী বাঁধলেন পরস্পরের হাতে। শপথ নিলেন—এ শপথ সকলে নিলেন নিজের কাছে নিজে। শপথ নিলেন 'সকল দুর্বলতাকে করব পরিহার, আত্মনিয়োগ করব পুণ্যের তপস্যায়। সকল কালিমাকে করব মার্জনা, করব ধৌত, করব মুক্ত। অন্তরকে করব শুভ্র, করব নির্মল সুপরিচ্ছন্ন সুপবিত্র।'

আশ্চর্যের কথা, তরুণেরা যারা ইতিমধ্যেই জমিদার ও তান্ত্রিক-প্রধান গ্রাম্য-

সমাজের প্রভাবে মদ্যপান শুরু করেছিল, কলকাতা-ফেরত যারা কলকাতার ফ্যাশন ও বিলাসলালসায় মদ্যপান শুরু করেছিল—দুই দলই শপথ করলে ছাড়ব।

এরা বললে—মদ খাব না।

ওরা বললে—Drink করব না।

এরা খেত—দেশি মদ।

ওরা খেত হুইস্কী।

সত্যিই সেদিন এল নবযুগ। নূতন সূর্যোদয়। জ্যোতির্ময়ের আবির্ভাব যেন প্রত্যক্ষ দেখেছিলাম।

আমার হাতে রাখী বেঁধে দিয়েছিলেন আমার মা।

আমার বড় মামা তখন লাভপুরে ছিলেন। তাঁরও থাকা উচিত ছিল মিছিলের পুরোভাগে। কিন্তু তিনি তা থাকেননি। ছিলেন পিছনে। তাঁর সঙ্গে তখন বিপ্লবী দলের ক্ষীণ সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। মুরারীপুকুর বাগানের বোমারু দলের সঙ্গে পাটনার কিছু লোক সংস্রবে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে তিনিও ছিলেন একজন। তিনি মিছিল থেকে ফিরে মায়ের হাতে রাখী বাঁধলেন। মা একটি রাখী নিয়ে আমার হাতে বেঁধে দিলেন।

মনে আছে আমার। স্পষ্ট মনে পড়ছে।

মনে পড়ছে—গোপালবাবু কবিতা রচনা করে হাতে লিখে নাটমন্দিরের দেওয়ালে সেঁটে দিয়েছেন। শুনলাম ওটা নাকি রাজদ্রোহমূলক কবিতা। বয়স তখন আমার সাত পূর্ণ হয়েছে। রাজদ্রোহ কাকে বলে ঠিক বুঝি না। তবে কবিতাটিতে যে একটি ঝাঁজ ছিল, সে অনুভব করবার মতো আমার মনের স্পর্শশক্তি তখন হয়েছে। সে কবিতাটির একটা লাইন আজও মনে আছে। ভাবটা গোটাই মনে রয়েছে। কবি বলছেন মহাশক্তিকে—মা, তুমি জাগো...মা, তুমি জাগো। যে লাইনটি মনে আছে, সেটি হচ্ছে এই—

"দেবাসুর-সংগ্রামের এই তো সময়!"

মনে হয়েছিল...অসুর ওই ইংরাজেরা। স্পষ্ট মনে আছে।

এগারো

কয়েক বৎসর আগে হ'লে ও-লাইনের অর্থ হত অন্যরূপ। বুঝতাম, অসুর মানে তারাই যারা সোমনাথ ভেঙেছে, বেণীমাধবের ধ্বজা ভেঙে মসজিদ তুলেছে, যারা বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর মন্দিরের চূড়া ভেঙেছে; কিন্তু উনিশশো পাঁচ সাল নূতন কাল নিয়ে এল, সঙ্গে সঙ্গে আনলে নূতন ব্যাখ্যা নূতন ব্যঞ্জনা। এ ছাড়াও অনেক কিছু নিয়ে এল।

বিচিত্র আবির্ভাব! কেমনভাবে সে যে এল তা বলেও যেন তৃপ্তি হচ্ছে না। গাজনে মহাকালের পূজা হয়, ধ্বজাপতাকা উড়িয়ে ভক্তবৃন্দ উচ্চকণ্ঠে কালাধিপতি

মহাকালের নাম ঘোষণা করে বলে, বলো—শিবো কালরুদ্র। নূতন বৎসর আসে, সে নিয়ে আসে নূতন জীবন। এও ঠিক তেমনি। বন্দেমাতরম্!

উনিশশো পাঁচ সালের পর নূতন জীবন আত্মপ্রকাশ করল।

আগে বলেছি, এর পূর্ব পর্যন্ত আমাদের গ্রামে ছিল পুরানো কালের মানুষদের অসহায় মনের ধর্মবিশ্বাস—অন্ধ ধর্মবিশ্বাস। আর একদিকে ছিল নূতন কালের ইংরেজি সভ্যতার ফেনা অর্থাৎ ফ্যাশন। নিছক ফ্যাশন। যাকে আমি তুলনা করি সে-কালের প্রচলিত—O. H. M. S. Whisky-র সঙ্গে। ইংরেজ জাতির অধিপতির প্রতি আনুগত্য সঞ্চার করা এই ফ্যাশনের একটি স্বভাবধর্ম ছিল। সেই হিসাবে O. H. M. S. নামটি সার্থক।

হঠাৎ Whisky পরিণত হ'ল সঞ্জীবনী রসে।

নেশার উত্তেজনায় কৃত্রিম জীবনোচ্ছ্বাস নয়, এ যেন স্বতোৎসারিত ভোগবতী ধারার আত্মপ্রকাশ। চোখের সামনে সে দেখা দিল আমাদের বীরভূমের বৈশাখের তৃণহীন গৈরিক প্রান্তরের বুকে—নববর্ষণে শ্যামলাভায় জেগে-ওঠা তৃণাঙ্কুর প্রকাশের মতো। বিস্ময় লাগে। প্রশ্ন জাগে, লালমাটির রুক্ষ রসহীন বুকের মধ্যে এই পৃথিবী-দগ্ধ-করা রৌদ্র সহ্য করে এই তৃণবীজগুলি বেঁচে ছিল কেমন করে? মনে মনে যেন অনুভব করতে পারি—জীবন অবিনশ্বর। সেদিনও মনে হয়েছিল জীবনমহিমা—মানবসাধনা অবিনশ্বর।

শুধু তৃণাঙ্কুরই জাগল না, কিছুদিনের মধ্যেই ফুল ধরল ঘাসগুলির ডগায়। উনিশশো পাঁচ সালেই 'বন্দেমাতরম্' নাম ললাটে ধারণ ক'রে জেগে উঠল দুটি প্রতিষ্ঠান। আরও একটি প্রতিষ্ঠান জাগল, যার নামে বন্দেমাতরম্ না থাকলেও বন্দেমাতরমের প্রত্যক্ষ প্রাণধর্ম ছিল সেই প্রতিষ্ঠানটিতেই।

'বন্দেমাতরম্ থিয়েটার'। থিয়েটার শব্দটিকে বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত করবার মতো মনোভাব তখনও হয়নি। আর হল 'বন্দেমাতরম্' লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা।

আর প্রতিষ্ঠিত হল 'দরিদ্র সেবা ভাণ্ডার'। এর প্রতিষ্ঠাতা নিত্যগোপালবাবু, তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্বর্গীয় শৈবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। যাদবলালবাবুদের প্রতিষ্ঠায় প্রতিদ্বন্দ্বী জমিদারবংশের সন্তান।

বন্দেমাতরম্ থিয়েটার, বন্দেমাতরম্ লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠাতাদের অগ্রণী ছিলেন স্বর্গীয় নির্মলশিববাবু। তাঁর সঙ্গে ছিলেন নিত্যগোপালবাবু, নিবেদনবাবু। থিয়েটারের মধ্যে ছিলেন আর-একজন। তিনি ছিলেন আমাদের গ্রামের জামাতা, গৃহ-জামাতা—স্বর্গীয় শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। শশাঙ্কবাবুর প্রাণ ছিল এই থিয়েটার। আরও একজন ছিলেন প্রথম দিকে, তাঁর নাম ছিল রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনিও ছিলেন গৃহজামাতা। শশাঙ্কবাবুর কথা একটি গল্পে আমি বলেছি, 'চন্দ্র জামাইয়ের জীবন-কথায়'। শেষের দিকটা কল্পনা। অবশ্য পুরো কল্পনা নয়, দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনে তাঁর আকর্ষণ তখন জেগেছিল। আমাকে গোপনে বলেছিলেন—আর বয়স নাই তারাশঙ্কর! সাহস পাই না। ভরসা হয় না।

থাক সে-সব কথা। থিয়েটারের কথা বলি। থিয়েটার আমাদের গ্রাম্য সমাজে

অনেক রস পরিবেশন করেছে। ভালোয়-মন্দতে অনেক দিয়েছে। নূতন যুগের ভাবধারার সঙ্গে পরিচয় আমাদের এই নাট্য-আন্দোলন যতখানি করিয়ে দিয়েছে, ততখানি আর কিছুতে হয়নি। নির্মলশিববাবু, নিত্যগোপালবাবু আগেই সাহিত্যের অমৃতরসের সন্ধান পেয়েছেন। সাহিত্যরস-পিপাসার সঙ্গে এই নাট্য-আন্দোলনের সমন্বয় ঘটল। তাঁরা নাটক লিখেছেন— অভিনয় হয়েছে। হয়তো নাট্য সম্প্রদায়ের সৃষ্টি না-হলেও তাঁরা সাহিত্য-চর্চা করতেন। কিন্তু তাঁরা ছাড়া গ্রামে যুবক সম্প্রদায় ছিল, তারাই অনেকখানি রক্ষা পেল নাট্য-আন্দোলনের প্রভাবে। কয়েক জনের কথা বলি। নির্মলশিববাবুদের সমবয়সী বন্ধু ছিলেন দুজন—একজন ষষ্ঠী, অপরজন সীতাংশু, ডাকনাম ফোড়ন। ষষ্ঠী ফোড়ন তখনও পড়ে। পড়ে নামমাত্র। অধঃপতনের সকল আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ। ষষ্ঠী টেরি কাটে—ডাইনে-বাঁয়ে দুদিকে সামনের চুল কপালের উপর গুটিয়ে গোল হয়ে উঠে থাকে, লম্বা ফুলে-ফেঁপে থাকে, ষষ্ঠী তারই মধ্যে গুঁজে রাখে আস্ত তিনটি-চারটি সিগারেট। এবং সেই নিয়েই ইস্কুলে যায়। বাড়ি ফেরে। বাড়িতে গ্রাজুয়েট প্রাইভেট মাস্টার রেখেছিলেন বাপ। মাস্টার বই খুলে বসে থাকেন, ষষ্ঠী বাঁয়া তবলা নিয়ে সঙ্গীতচর্চা করে। ফোড়ন সঙ্গে থাকে। এমনি ফোড়ন এবং ষষ্ঠী অনেক তখন। এরা স্বাভাবিকভাবে পরিণত হত ঊনবিংশ শতাব্দীর বিকৃত তান্ত্রিক কি শৈব কি বৈষ্ণবে। কিন্তু এই নাট্য-আন্দোলন এদের নূতন কালের ভাবের সঙ্গে পরিচিত করে দিলে। এই প্রসঙ্গে আর-একজনের কথা মনে পড়ছে। তার নাম ছিল দুকড়ি চক্রবর্তী। বর্ণ-ব্রাহ্মণের ছেলে, সামান্য লেখাপড়া শিখেছে, তার উপর গিয়েছে দৃষ্টিশক্তি, প্রায় অন্ধ বললেই হয়। দিনের আলোয় মানুষকে দেখে সে আবছা আবছা। রাস্তার ধারে বাড়ি—দাওয়ার উপরটিতে বসে থাকে রাস্তার দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে। মানুষ যায় আসে— সে দেখে কিছু যেন নড়ছে, কিছু যেন চলছে। হঠাৎ কোনো পরিচিত ব্যক্তির কণ্ঠস্বর কানে এলে মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, সে ডাকে—কে, মরিরাম? শোন—শোন।

মরিরামের দৃষ্টি আছে, কাজ আছে, সে চলে যায়—দুকড়ির মুখের আলো নিভে যায়।

দুকড়ি বাঁচল থিয়েটারে যোগ দিয়ে। সুন্দর চেহারা ছিল, অভিনয় করবার শক্তিও ছিল। আর একটা শক্তি ছিল, দৃষ্টিশক্তি ছিল না কিন্তু কানে শুনে সে পার্ট মুখস্থ করে ফেলত অল্প সময়ের মধ্যে।

শশাঙ্কবাবু এসে ডাকতেন—দোকন?

—জামাইবাবু!

—এস।

শশাঙ্কবাবু হাত ধরে তাকে নিয়ে যেতেন, দোকন যেত—মহলার মজলিসে বসত। রাত্রে শশাঙ্কবাবুই তাকে পেঁছে দিতেন। দোকন সকাল থেকে দাওয়ায় বসে পার্ট আওড়াত আপন মনেই। ক্রমে সে পেলে অভিনয়ে প্রতিষ্ঠা। তখন তার সঙ্গীর অভাব হত না। বেকার যুবকেরা তার কাছে বসে আড্ডা জমাত। তার সুপারিশ নিয়ে

তারাও ঢুকবে থিয়েটারে। তা ছাড়া লাইব্রেরি থেকে দোকন নাটক আনত। ওরাই তাকে পড়ে শোনাত। দোকন সুর করে বক্তৃতা করে যেত—

"উত্তাল তরঙ্গময়ী ফেনিল নর্মদা
ভীষণা রাক্ষসী-মুখে তুলিয়া হুঙ্কার—
কার লোভে ছুটিয়াছ পুনঃ উন্মাদিনী!"

অদ্ভুত ছিল তার স্মৃতিশক্তি। যে-ভূমিকায় সে একবার অভিনয় করেছে সে-ভূমিকার অংশ কোনোদিন ভোলেনি। উলুপী নাটকে সে গঙ্গার ভূমিকায় অভিনয় করেছিল. সে ছবি আমার আজও স্পষ্ট মনে পড়ছে।

নাট্য-আন্দোলন আর একটি সুমহৎ কাজ করেছিল। গ্রামের সকল স্তরের যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি অতি মধুর প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। সে-কালের গ্রাম্য সমাজ, গ্রামটি জমিদার-প্রধান, জমিদারেরা সকলেই ব্রাহ্মণ, দীর্ঘকাল ধরে ব্রাহ্মণ সমাজের যুবকেরা অপর সকল স্তরের যুবকদের থেকে স্বতন্ত্র থাকতেন। চলার-ফেরায় ওঠায়-বসায় অহেতুক অশোভন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলতেন। এক দাওয়ায় এক বিছানায় বসতেন না, এমন কি কোনো সাধারণ কর্মে গ্রামের তরফ থেকে সম্প্রদায়নির্বিশেষে কোথাও যেতে হলে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে পথ চলতেন। মেলায় যাত্রা-কীর্তনের আসরে বাবুদের ছেলেরা বসত যেখানে, সেখান থেকে খানিকটা সরে বসতেন অন্য সম্প্রদায়ের যুবকেরা। নাট্য-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার ফলে—সেই বিসদৃশ স্বাতন্ত্র্য অনেক পরিমাণে বিলুপ্ত হয়ে গেল। নাট্যসম্প্রদায়ের মহলার আসরে সকলেই বসতেন এক ঘরে এক বিছানায়, সরস হাস্যপরিহাসে সকলেই যোগ দিতেন, সকলেই হাসতেন সমান প্রাণ খুলে, সমান উচ্চ-কণ্ঠে। শুধু তাই নয়—এই সর্বস্তরের যুবকদের এমনি অন্তরঙ্গ মেলামেশার ফলে—জীবনে, আচার-আচরণে ও ব্যবহারের মধ্যে দেখা দিল উদ্ধত আভিজাত্যের পরিবর্তে উদার মাধুর্য, সস্নেহ আত্মীয়তা ; অন্য দিকে সভয় সঙ্কোচ এবং গোপন হিংসার পরিবর্তে অসঙ্কোচ প্রসন্নতা, শ্রদ্ধান্বিত গুণমুগ্ধতা।

এর জন্য সমস্ত শ্রদ্ধা, সমস্ত প্রশংসা প্রাপ্য দুটি লোকের। প্রথম, এ যজ্ঞের যাঁকে যজ্ঞেশ্বর বলা যায়—তিনি, স্বর্গীয় নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর প্রকৃতির মধ্যে—তাঁর ধাতুর মধ্যে ছিল অপরূপ মাধুর্য। প্রথম যৌবনে মানুষকে কাছে টানবার, মানুষকে স্বীকার করবার, মানুষকে মানুষ বলে বুকে গ্রহণ করবার এই সহজাত মাধুর্য এবং ঔদার্যের তুলনা সংসারে বিরল—অতি বিরল। দ্বিতীয় জন—ওই শশাঙ্কবাবু, হাত ধরে এদের নিয়ে আসতেন, নির্মলশিববাবু পরমস্নেহে গ্রহণ করতেন সকলকে। শশাঙ্কবাবু ছিলেন ঘরজামাই। আমাদের ঊনবিংশ শতাব্দীর খাঁটি ঘরজামাই। যাঁরা চিরকাল বসবাসের সংসারেও জামাই সেজে থাকতেন, এক মুহূর্ত ভুলতেন না জামাইয়ের মর্যাদা -তিনি তাঁদের একজন। আমাদের গ্রামে তিনিই বোধ হয় শেষ খাঁটি ঘরজামাই। ভোরবেলা উঠতেন, প্রাতঃকৃত্য শেষ করে দস্তুরমতো বেশভূষা করে নিচে নামতেন, সামান্য জলযোগ করে ছাড়ি, থিয়েটারের বই এবং পার্ট লেখার কাগজপত্র বগলে নিয়ে বের হতেন। এসে বসতেন—দোকানের

দাওয়ায় অথবা গোপাল স্বর্ণকারের দাওয়ায়। তারা সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করে মোড়া বা চৌকি পেতে দিত। তামাক সেজে হুঁকাটি হাতে দিত। তিনি তামাক খেতেন, পার্ট লিখতেন, আর খোঁজ নিতেন—পাড়ার কোন্ কোন্ তরুণের থিয়েটারে যোগ দেবার অভিপ্রায় আছে, যোগ্যতা আছে। তাদের ডাকতেন, তাদের সঙ্গে কথা বলতেন, নিমন্ত্রণ করতেন মহলার আসরে যাবার জন্য। সন্ধ্যার ঠিক আগে এসে তার দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকতেন, এস, আমার সঙ্গে এস। তিনি জানতেন যে, সঙ্গে না-নিয়ে গেলে ইচ্ছা সত্ত্বেও ওরা যেতে পারবে না। গিয়েও হয়তো দরজার মুখ থেকে ফিরে আসবে। সঙ্গে নিয়ে হাসিমুখে শশাঙ্কবাবু আসরে ঢুকে বলতেন, একে নিয়ে এলাম। বেশ ছেলে—ভালো ছেলে।

নির্মলবাবু সহজাত মিষ্ট হাসি হেসে বলতেন, বস বস। তুমি তো—এর ছেলে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—এত দূরে—এমনভাবে এক পাশে সরে বসলে কেন? ভালো করে উঠে বস। গান গাইতে জান?

—আজ্ঞে না।

—বাজাতে?

এবার চুপ করে থাকত সে।

—বাজাতে পার তা হলে। কই, তবলাটা বাঁধ দেখি!

এগিয়ে দিতেন তবলাটা।

মজলিস চলত। গানে বাজনায়, সরস সর্বজনীনতার মহিমায়, উদার রসিকতায়, প্রসন্ন হাস্যের মধ্যে কেমনভাবে যে সে একদিনেই অন্তরঙ্গ হয়ে উঠত, সে-কথা কেউই বুঝতে পারত না।

মজলিস শেষে শশাঙ্কবাবু জ্বালতেন তাঁর হ্যারিকেন লণ্ঠনটি। একেবারে আসল ডিট্‌জ লণ্ঠন। তেমনি ঝকঝকে, ঠিক যেন নতুনটি। কাচটি তেমনি পরিষ্কার। সপ্তাহে কাচটি একদিন করে চুন মাখিয়ে সাফ করতেন। তেমনি আধখানা চাঁদের মতো করে কাটা পলতেটি। আলোটি জেলে বলতেন, এস।

ডাকতেন তিনি—দোকনকে, হরি স্বর্ণকারকে, পঞ্চানন সাহাকে, ক্ষুদিরাম সাহাকে। প্রত্যেককে পেঁাছে দিয়ে তিনি বাড়ি ফিরতেন। এর মধ্যেও কিন্তু শশাঙ্কবাবু ছিলেন—বিশ্বামিত্র। দুরন্ত ছিল তাঁর ক্রোধ। সে ক্রোধ হত তাঁর অভিনয়ের সময়ে বা অভিনয়ের পথে ত্রুটিতে কি বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি হলে। সুরেন গড়্‌ঞীকে দেওয়া হয়েছিল একটি পরিচারকের ভূমিকা। রাজবাড়ির পরিচারক। রাজবাড়ি আক্রান্ত হয়েছে, নিরুপায় অসহায় বৃদ্ধ রাজার পরিত্রাণের কোনো পথ নেই। রাজা ডাকছেন—ওরে, কে আছিস—আমার জপের মালা। ওরে—মালা আন, আমার জপের মালা। ওরে, কে আছিস—

শশাঙ্কবাবু তিন মাস প্রত্যহ সুরেনকে তালিম দিয়েছেন—মালাগাছি হাতে নিয়ে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে—রাজাকে প্রথম প্রণাম করবে, তারপর মালাগাছি রাজার হাতে দেবে, তারপর আবার একটি প্রণাম করে চলে আসবে। সুরেন প্রতিদিন

মহলার সময় ঠিক ঠিক নির্দেশ পালন করে এসেছে। অভিনয়ের দিন রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করবে সুরেন, শশাঙ্কবাবু মালা হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। রাজা ডাকছেন। ঠিক সময়টিতে মালা সুরেনের হাতে দিয়ে—রেসের ঘোড়াকে জকির ইঙ্গিতের মতো ইঙ্গিত দিলেন তিনি। সুরেন প্রবেশ করলে রঙ্গমঞ্চে। রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে দর্শকভরা আসরের দিকে তাকিয়ে তার কেমন গোলমাল হয়ে গেল। সে প্রণাম করলে, তারপর মালাখানি রাজার হাতে না দিয়ে নিজের গলায় পরলে, তারপর আবার প্রণামটি করে ফিরে এল। এক-গা ঘেমে সে তখন যেন নেয়ে উঠেছে। ওদিকে দর্শকের আসরে হাসির অট্টরোল উঠেছে তখন। শশাঙ্কবাবুর মনে হচ্ছে, সমস্ত অভিনয়ের উপর বজ্রাঘাত হয়ে গেল। মাথায় তাঁর আগুন জ্বলে গেল। সুরেন উইংসের ফাঁক থেকে পা বের করবামাত্র তার গালে তিনি বসিয়ে দিলেন প্রচণ্ড চপেটাঘাত।

সুরেন জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল সেইখানে।

শশাঙ্কবাবুর দৃক্‌পাত নেই, তিনি তার গলা থেকে মালাখানি খুলে নিয়ে নিজেই গিয়ে দিয়ে এলেন রাজার হাতে।

দোকনদের দল বলত, বাপরে—জামাইবাবু সাক্ষাৎ বাঘ!

আবার বলত, এমন মানুষ আর হয় না।

সুরেনও বলত।

পরের দিনই শশাঙ্কবাবু নিজে গিয়েছিলেন সুরেনের বাড়ি।

—সুরেন! সুরেন!

—কে?

—আমি হে। শশাঙ্কবাবু। জামাইবাবু। শোন। বাইরে এস।

—আজ্ঞে জামাইবাবু!

—কাল মেরেছি। বড় লেগেছিল তোমার। তোমার—

'তোমার কাছে মাফ চাইতে এসেছি' বলতে পারেন না। মুখে বাধে। কিন্তু সুরেন বুঝে নেয়। সে পায়ের ধুলো নিয়ে বলে—আজ্ঞে না। লাগে নাই বেশি।

—আজ যেন ঠিক সময়ে যেয়ো। ঠিক আটটায় প্লে আরম্ভ হবে।

—যাব আজ্ঞে।

অভিনয়ের ত্রুটির জন্য শুধু যে সুরেন গড়াএঔীরাই মার খেয়েছে শশাঙ্কবাবুর হাতে তা নয়। রথী-মহারথীরাও মার খেয়েছে, তিরস্কৃত হয়েছে। স্বয়ং নির্মলশিব-বাবুও একবার চড় খেয়েছিলেন। নির্মলশিব ছিলেন অক্রোধ। চড় খেয়ে হেসে বলেছিলেন, বড় জোর হয়ে গেছে হে শশাঙ্ক।

নির্মলশিববাবু পার্ট মুখস্থ করেননি। নিজে ছিলেন নাট্যকার, পার্ট আটকায়নি, তিনি নিজেই গড়ে বলে চালিয়ে এসেছিলেন।

আর একবার নির্মলশিববাবু রঙ্গমঞ্চে হেসে ফেলেছিলেন। তার জন্যও শাস্তি দিয়েছিলেন শশাঙ্কবাবু। পরবর্তী অভিনয়ে তাঁকে সামান্য দূতের ভূমিকা গ্রহণ করতে

আর একবার, ইন্দুবাবু নামে একজন বিদেশী ভদ্রলোক অভিনয় করবেন। অভিনয়ও হচ্ছে বিদেশে। লাভপুর থেকে ত্রিশ মাইল দূরে—সুপ্রাচীন জমিদার-প্রধান গ্রাম এড়োয়ালীতে। কাঁদীর কাছাকাছি। রেল-স্টেশন থেকে পনেরো মাইল পথ। গরুর গাড়ি ছাড়া যান নাই। অভিনয়ের দিন সকালবেলা ইন্দুবাবুর আসার কথা। কিন্তু গাড়ি ফিরে এল, ইন্দুবাবু এলেন না। সমস্ত দিন শশাঙ্কবাবু গ্রামের বাইরে পথের ধারে একটা গাছতলায় বসে রইলেন। সন্ধ্যা হয়ে গেল, ইন্দুবাবু এলেন না। ওদিকে ডুপ্লিকেটের ব্যবস্থা হচ্ছে। অভিনয় শুরু হবে। হঠাৎ ইন্দুবাবু এসে হাজির হলেন অশ্বপৃষ্ঠে। মুখে রঙ, হাতে একগাছা বালা। ভদ্রলোক ধানবাদের ওদিকে কোথায় অভিনয় করছিলেন গত রাত্রে। অভিনয় শেষ হতে বিলম্ব হওয়ায় যে ট্রেন ধরবার, সে ট্রেন ফেল করেছিলেন; পরের ট্রেনে এসে অপরাহ্নে নেমেছেন। গরুর গাড়িতে মাইল পাঁচেক এসে এক মিঞাসাহেবের কাছে অনেক কাকুতি করে ভাড়া দিয়ে অশ্বটি সংগ্রহ করে এসে পৌঁচেছেন। শশাঙ্কবাবু চপেটাঘাতের জন্য উদ্যত হয়েছিলেন, কিন্তু বিবরণ শুনে ক্ষান্ত হন।

ইন্দুবাবুর কথায় নাট্য-আন্দোলনের আর একটি বৃহৎ কল্যাণের কথা মনে পড়ছে। সেটি হল আমাদের যুবক সম্প্রদায়ের সঙ্গে দেশ-দেশান্তরের যুবক সম্প্রদায়ের যোগাযোগ। এত বিদেশী ব্যক্তি, গণ্যমান্য রসিক জনের সঙ্গে আমাদের গ্রামের যোগাযোগ হয়েছিল যে, সে-কথা স্মরণ করে আজও বিস্মিত হই।

কামদাবাবু, ইন্দুবাবু, ললিতবাবু, প্রফুল্লবাবু, হরিশবাবু, সোমনাথবাবু, ফণিবাবু, আরও কত জন—তুলসীবাবু, প্রমথ, বলাই।

পেশাদার রঙ্গমঞ্চের রাধাচরণ ভট্টাচার্য দীর্ঘদিন লাভপুরে ছিলেন। তখন তাঁর বয়স অল্প, স্ত্রীভূমিকায় অভিনয় করতেন, মেয়েদেরও এত ভালো মানাত না নারী-ভূমিকায়। তেমনি ছিল সুকণ্ঠ।

ক্ষুদিরাম মালাকার। সে বোধ হয় পঁচিশ বৎসর অভিনয় করেছে লাভপুরে। আর্ট থিয়েটারের আমলে—তিনকড়ি চক্রবর্তী, নরেশ মিত্র এঁরাও একবার লাভপুরে গিয়ে 'কর্ণার্জুন' নাটকে পরশুরাম ও ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণের ভূমিকায় স্বেচ্ছায় অভিনয় করে এসেছেন।

আর যেতেন স্বর্গীয় নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। ওখানে থাকতেন। নাটক লিখতেন। যেতেন স্বর্গীয় নাট্যকার ও অভিনেতা অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। মন্মথমোহন বসু মহাশয় গিয়েছেন। রসরাজ স্বর্গীয় অমৃতলাল বসু গিয়েছেন। তিনিই আমাদের নবপর্যায় নাট্যমঞ্চের যবনিকা উত্তোলন করেছিলেন।

আমি বাল্যকালে এঁদের দূরে থেকে দেখতাম।

প্রথম যৌবনে ধন্য হয়েছি এঁদের কাছে এসে।

মনের আবেগে কালের গণ্ডী ছাড়িয়ে—একসঙ্গে অনেক কালের কথা বলে ফেলেছি। উনিশশো পাঁচ সালে—আমাদের প্রথম রঙ্গমঞ্চের উদ্বোধন হল। আজও মনে পড়ছে। কী অপরূপ মায়ারাজ্যের দ্বারোদ্ঘাটন হল সেদিন! দৃশ্যপট—উজ্জ্বল

আলো! অভিনয়ে নূতন সুর—নূতন ছন্দ! আমার শিশু-নয়নের নিদ্রা কোথায় গেল কে জানে, আমি বিনিদ্র হয়ে বসে অভিনয় দেখলাম। হরিশ্চন্দ্র আর বিল্বমঙ্গল অভিনয় হল প্রথম।

হরিশ্চন্দ্র ও বিল্বমঙ্গলবেশী নির্মলশিববাবুকে মনে পড়ছে। পাগলিনীবেশী নিত্যগোপালবাবুকে মনে পড়ছে। বিশ্বামিত্রবেশী শশাঙ্কবাবুকে মনে পড়ছে। চণ্ডালবেশী আমার মামাকে মনে পড়ছে। আর মনে পড়ছে—চিন্তামণি ও শৈব্যাবেশী এক কলকাতার কিশোরকে। তার নাম ছিল শিবচন্দ্র। আরও একজন এসেছিল, তার নাম জ্যোতির্ময়। সেও এসেছিল কলকাতা থেকে।

এর পরই হ'ল পাকা স্টেজ। নূতন ড্রপসিন আঁকানো হল। মধ্যস্থলে ভারত-মাতা, দুই পাশে—একদিকে হিন্দু, অপরদিকে মুসলমান ; ভারতমাতা দুজনের হাত ধরে মিলিয়ে দিচ্ছেন। উপরে লাল অক্ষরে লেখা বন্দেমাতরম্ থিয়েটার। ছবির নিচে লেখা—'হিন্দু মুসলমান একই মায়ের দুই সন্তান'।

এসব নিয়ে এল ওই নূতন কাল।

এই যে এল নূতন কাল, সে অবশ্য এল আপন বেগে ; কালবৈশাখী ঝড়ের মতো এল। যা কিছু আবর্জনা, যা কিছু জীর্ণ, যা কিছু পথে দিলে বাধা, তাদের উড়িয়ে ভেঙে ফেলে ঢেলে দিলে বর্ষণ ; আবর্জনার পুঞ্জ মাটির সঙ্গে মিশে পচল, উর্বর করে তুলল দেশকে, নূতন সৃষ্টিসমারোহে চঞ্চল হয়ে উঠল চারিদিক। ঋতুর পর অন্য ঋতুর মতো কাল হতে কালান্তর আপনিই আসে। কিন্তু বসন্তশেষে গ্রীষ্মাবি-র্ভাবের মধ্যে চৈত্র সংক্রান্তিতে আমরা করি গাজন। বৈশাখে বিষ্ণুদেবতার চন্দনযাত্রার অনুষ্ঠান করে সচেতনভাবে কাল-হতে-কালান্তরে মহাকালের পদচিহ্ন আলপনা এঁকে আমরা করি তার অর্চনা। অনেক সময় ঋতু অথবা কাল পরিবর্তনের জন্য সাধকেরা সাধনা করে থাকেন। ভারতবর্ষেও তাই হয়েছিল। সে মহাযজ্ঞের প্রথম সমিধসংগ্রহ এবং অগ্নিপ্রজ্বলন হয়েছিল বাংলা দেশেই। ইতিহাসে সে-কথা লেখা হবে।

আমাদের গ্রামে সে যজ্ঞাগ্নির আলোর আভাস এল, তার উত্তাপও আমরা অনুভব করলাম। উচ্চারিত মন্ত্রসঙ্গীতের ঝঙ্কার মনের তানে কম্পন তুললে।

এর জন্যও আয়োজনের প্রয়োজন হয়, সাধনার প্রয়োজন হয়। সে সাধনা আমাদের গ্রামে যাঁরা করেছিলেন তাঁদের মনে পড়ছে।

স্বর্গীয় যাদবলালবাবুর কথা আগেই বলেছি। তিনিই গ্রামে হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, দাতব্য চিকিৎসালয় এবং বালিকা বিদ্যালয়ও তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন। তখন তাঁকে কীর্তির নেশায় পেয়ে বসেছে। শ্মশানভূমির প্রান্তর তাঁর কীর্তিমালায় হেসে উঠেছে। তিনিই আমাদের গ্রামের সেই সাধক। মানুষও অকৃতজ্ঞ নয়, আজও লাভপুর বলতে আমরা যাদববাবুর লাভপুরকেই বুঝি। তাঁর উত্তরাধিকারীদের সঙ্গে পরবর্তীকালে গ্রামের সমস্ত লোকের বিরোধ বেধেছে। আসল বিরোধ সেই প্রতিষ্ঠার বিরোধ, সে বিরোধ জীবনের সর্বক্ষেত্রে

প্রসারিত হয়েছে, কিন্তু তবুও কেউ স্বর্গীয় যাদবলালবাবুকে ভুলে যায়নি, তাঁর স্মৃতির প্রতি বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেনি। যাদবলালবাবুর কীর্তি লাভপুরে অবিস্মরণীয়, তিনিই লাভপুরে নবযুগ-যজ্ঞ-প্রজ্বলনের সমিধ সংগ্রহ করেছিলেন, বেদী রচনা করেছিলেন, নৈবেদ্য সাজিয়েছিলেন। দীর্ঘাকৃতি, গৌরবর্ণ, নীলচক্ষু, হাস্যপ্রসন্ন মুখ, মিষ্ট কথা ; এ মানুষকে লক্ষের মধ্যে চেনা যায়। আমরা ছেলেবেলায় আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে খেলা করতাম, তিনি তাঁর ভিতরবাড়ি থেকে তাঁর ঠাকুরবাড়ি, কাছারিবাড়িতে যেতেন ওই চণ্ডীমণ্ডপ হয়ে; প্রতিটি ছেলের সঙ্গে কথা বলে যেতেন। তিনি আমার কাছে অবিস্মরণীয়। তিনি লাভপুরে আবির্ভূত না হলে, এই বর্তমান রচনা কোনোদিনই রচিত হত না। আমি লিখতেই হয়তো শিখতাম না। লাভপুর অন্তত বিশ-ত্রিশ বৎসর পিছিয়ে থাকত।

তাঁর সঙ্গে আর একজন এসেছিলেন লাভপুরের সৌভাগ্যক্রমে। তিনি স্বর্গীয় রায় বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। যাদবলালবাবু তাঁর মেসোমশায় হতেন। দরিদ্রের সন্তান, অসাধারণ বুদ্ধি ও প্রতিভা দেখে যাদবলালবাবুই তাঁকে পড়তে সাহায্য করেছিলেন ; এম. এ. পাস করে আগ্রা কলেজে অধ্যাপনা করতেন ; যাদবলাল-বাবুর কীর্তি স্থাপনের প্রারম্ভেই তিনি লাভপুরে এলেন। নূতন কালের শিক্ষায় প্রদীপ্তদৃষ্টি শক্তিশালী মানুষ, নিষ্ঠাবান সাধক, জীবনে বিপুল আশা ও উৎসাহ। তিনি প্রাণপাত পরিশ্রমে যাদবলালবাবুর সকল কীর্তিকে সার্থক ও পূর্ণ করে তুললেন। পরবর্তীকালে সমগ্র বীরভূম তাঁর কর্মে কল্যাণ পেয়েছে। তাঁর সে কর্মের সূত্রপাত লাভপুরে। তিনি বিবাহও করেছিলেন লাভপুরে।

আজও স্মরণ করতে পারি, তাঁর গম্ভীর কণ্ঠস্বরে আমার বুকের ভিতরটা যেন গুরু গুরু শব্দে ধ্বনি তুলত। যখনই কালপরিবর্তনের কথা স্মরণ করি, তখনই আমার কল্পনানেত্রে আমি দেখতে পাই, লাভপুরের পশ্চিমদিকে গেরুয়া রঙের প্রান্তরে বেদী বাঁধা হয়েছে, সমিধ সংগৃহীত হয়েছে, নৈবেদ্য সাজানো রয়েছে। স্বর্গীয় যাদবলালবাবু স্নান করে পট্টবস্ত্র পরে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছেন, তিনিই যজমান ; যজ্ঞস্থলে বেদীর উপর উত্তরসাধকের বেশে স্থান গ্রহণ করেছেন অবিনাশবাবু। অদূরে দাঁড়িয়ে আছেন স্বর্গীয় অতুলশিববাবু, স্বর্গীয় নির্মলশিব-বাবু, শ্রীযুক্ত নিত্যগোপালবাবু, শ্রীযুক্ত কালীকিংকরবাবুরা দল বেঁধে ; ওঁদের পিছনে আমিও দাঁড়িয়ে আছি। স্বয়ং কাল-পুরোহিত।

যজ্ঞ প্রজ্বলিত হল। ঘৃতগন্ধে আকাশ-বাতাস ভরে উঠল। মন্ত্র উচ্চারিত হতে লাগল। সব পাল্টে যেতে শুরু হল। দ্রুত পাল্টে যেতে শুরু হল সব।

বারো

আমার শৈশবকালের পটভূমিতে দেশের দ্রুত পরিবর্তন, সমাজের পটভূমিতে গ্রামের দ্রুত পরিবর্তনের উপরেও আমাদের পারিবারিক জীবনে এল মর্মান্তিক পরিবর্তন। আমার বয়স তখন আট বছর।) সে-কথা বলবার গ আমার ছেলেবেলার নিজের কথা কিছু বলে নেব। আমার মনে যে ঘটনাগুলি হয়ে রয়েছে সেইগুলির কথা। যে যে শৈশব-সাথীদের চোখ বুজলে আজও দেখতে পাই ত কথা। আগে বলব ঘটনার কথা।

আমার জীবনে প্রথমে সঙ্গী আসেনি, বন্ধু আসেনি, এসেছিল সঙ্গিনী, বান্ধবী। তার কথা আগে বলেছি। চারু আমার সম্পর্কে ভাইঝি, আমার থেকে বছর দেড়েক বড়। আমাদের বাড়িতে কোনো শিশু ছিল না, আমাদের সঙ্গে এক দেওয়ালে বাড়ি আমার জ্যাঠামশায়ের বাড়িতেও কোনো শিশু ছিল না। আমাদের বাড়ির দৌহিত্র-বংশের কন্যা চারুই ছিল আমাদের নিকটতম বাড়িতে আমার একমাত্র সমবয়সী। তার মা—আমার বউদিদি আমার মার চেয়ে বয়সে ছিলেন অনেক বড়। তবুও সে-কালের প্রথা অনুযায়ী—বয়সে ছোট শাশুড়ীকে প্রণাম করতেন, ভক্তি করতেন। সে ভক্তি ছিল স্বতস্ফূর্ত। তার কারণ অবশ্য আমার মায়ের ব্যক্তিত্ব এবং শক্তি। তাঁর কাছে আপনি মাথা নুয়ে পড়ত। তাঁরা সবাই ছিলেন আমার মায়ের গল্পের আসরের শ্রোতা।

চারু আমাকে পৃথিবীর অনেক কিছু চিনিয়েছে। বাড়ির আশপাশ থেকে গাছ তুলে এনে সিমেন্ট-বাঁধানো উঠানে বাগান করতাম, চারু আমায় গাছের নাম বলত। আমের আঁটি থেকে ভেঁপু তৈরি হয়, এ-কথা সে-ই আমাকে বলেছিল। কাগজের নৌকা করতে সে-ই আমাকে শিখিয়েছিল। পুতুল খেলতে শিখিয়েছিল।

চারু আমার অত্যাচার সহ্য করেছে অনেক। মেয়ে বলেই বোধ হয় বয়সে বড় এবং দৈহিক শক্তি বেশি থাকা সত্ত্বেও সে আমার প্রহার সহ্যই করত, কখনও আমার গায়ে হাত তোলেনি। একবার তার উপর চরম অত্যাচার করেছিলাম। এর আগে দেওঘর যাওয়ার কথা বলেছি। চারুর মাও পুত্রসন্তান কামনায় আমাদের সঙ্গে দেওঘর গিয়েছিলেন, সঙ্গে চারুও গিয়েছিল। চারুর কাকা—আমার আশুদাদা—তিনি সঙ্গে গিয়েছিলেন—তাঁর ছিল অম্লশূলের ব্যাধি। আশুদাদার স্ত্রী তাঁর জন্য ধর্না দিয়েছিলেন। আশুদাদা আমার প্রথম শিক্ষক। দেওঘরে হল হাতেখড়ি; সেই-খানেই তিনি শুরু করলেন আমাকে পড়ানো। আশুদাদা ছিলেন ছোটখাটো মানুষটি, মুখে ছিল ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। সাধারণ লোকের কাছে তিনি কেমন দেখতে ছিলেন জানি না, কিন্তু আমার স্মৃতিতে তিনি বড় সুন্দর মানুষ। ছোটখাটো মানুষ আশুদাদার ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ। আমার বাবা আমাদের অঞ্চলে ব্যক্তিত্বের জন্য, গম্ভীর প্রকৃতির জন্য খ্যাতনামা ছিলেন। আজও তাঁর নাম আমাদের গ্রামের আজকালকার

প্রবীণেরা করে থাকেন। আমার বাবার চেয়ে আশুদাদা বয়সে বড় থাকলেও সম্পর্কে ছিলেন ভাইপো, প্রতিষ্ঠায় ছিলেন অনেক ছোট। কিন্তু আশুদাদা বাবাকে অনেক সময় তিরস্কার করতেন। বিশেষ করে, জমিদার বংশের মর্যাদা রাখতে গিয়ে মামলা-মকদ্দমা করার ক্ষেত্রে বলতেন—কেন? মামলা কেন? যদি আপসে কথা বললে মিটে যায়, তবে মামলা কেন? আরও তিরস্কার করতেন যখন মধ্যে মধ্যে বাড়িতে তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর দল এসে অতিথি হত। বাবা হাসিমুখে সহ্য করতেন আমার যত ভালোবাসা ছিল এই মানুষটির উপর, তত ভয় ছিল। এই আশুদাদাও গিয়েছিলেন দেওঘরে। পাণ্ডাদের মহল্লায় বেশ একটা বড় বাড়িতে বাসা হয়েছিল। কয়েকখানা ঘর পড়ে ছিল —তার মধ্যে একটাতে ছিল বোলতার চাক। একটা দ্বিপ্রহরে চারুর সঙ্গে সেই ঘরে প্রবেশ করে দুজনে বোলতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দিলাম। ছোট ছোট ঢেলা সংগ্রহ করে এনেছিলাম পূর্ব থেকেই। ঢেলা ছুঁড়তে শুরু করলাম। ঢেলা লাগে না। তখন চারুই বললে—একটা লম্বা কিছু নিয়ে খোঁচা দিলে কি হয়?

কি যে হয় তা চারু কয়েক মিনিটের মধ্যেই উপলব্ধি করলে। লম্বা একটা কিছু —বোধ হয় ঘর ঝাড়বার জন্য একটা বাখারি-জাতীয় কিছু—বাড়িওয়ালারা বাড়িতেই রাখত—সেটা দিয়ে খুঁচিয়ে দিলাম। বোলতারা ভোঁ-ভোঁ ক'রে উড়ল—উড়ে তেড়ে এল। আমি বুঝে নিলাম কি হবে। সঙ্গে সঙ্গে ভোঁ-দৌড়—পিছনে অনুসরণ করছে বোলতা। আমি ঘর থেকে বেরিয়েই দরজাটা দিলাম টেনে। চারু চীৎকার করতে লাগল ঘরের মধ্যে। মর্মান্তিক আর্তনাদ। আর্তনাদ শুনে ওদিক থেকে আশুদাদা চীৎকার করে শাসন করলেন চারুকে, আমি আর দরজা খুলতে সময় পেলাম না, পালিয়ে এসে ঢুকলাম বাবার বিছানায়। চারু বোলতার কামড়ে ফুলে ঢোল হয়ে উঠেছিল। তবু সে আমার উপর রাগ করেনি। তবে চারুটা ছিল বুদ্ধিহীন, আশু-দাদা বলতেন—মাথামোটা। দুর্ভাগিনী চারু আজও বেঁচে আছে। ভাইদের সংসারে নিঃসন্তান চারু, জীবনের ভার বহন করে চলেছে। দুর্দান্ত মুখরা মেয়ে। আমি যখন দেশে যাই, তখন সর্বাগ্রে দেখা হয় চারুর সঙ্গে। চারুর ভাইয়েরা গ্রামের ভিতর থেকে সরে এসে স্টেশনের ধারে বাড়ি করেছে। আগে থেকে খবর জানা থাকলে চারু পথের উপরেই দাঁড়িয়ে থাকে নইলে আমার সাড়ায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে ছানি-পড়া চোখের মোটা কাচের চশমা আমার মুখের উপর তুলে আমায় দেখে বলে, এলেন? ওরে বাপ রে, বাপ রে, বাপ রে! এক যুগ পরে? বলে সেই পথের উপরেই ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে।

আমি বলি—ভালো আছিস তুই?

—ভালো? ভালো কি করে থাকব, বেঁচে রয়েছি যে! চারু হাসে। চারুর পরে এল বন্ধুরা। প্রথম বন্ধু কে তা ঠিক স্মরণ হচ্ছে না, দুজন প্রায় এক সঙ্গেই এসেছিল। একজন লক্ষ্মীনারায়ণ—অন্যজন প্রতুলকৃষ্ণ। ডাকনাম—নারাণ আর খোকা। শান্তশীল আর অশান্তশীল। একজন যত শান্ত, যত মধুর প্রকৃতি, অপরজন তত অশান্ত তত বিচিত্র দুষ্টবুদ্ধি। নারায়ণ স্বর্গীয় নির্মলশিববাবুর মেজ বোনের ছেলে, যাদবলালবাবুর দৌহিত্র, তার মা গ্রামের মেয়ে, আমার মায়ের

সমবয়সী, কিছু ছোট, সখী। তিনি ছেলেকে কোলে নিয়ে এলেন। নারাণের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়ে গেল এক মুহূর্তে। আমার ছিল বিখ্যাত কার্তিক-গড়িয়ে মতি-লাল মিস্ত্রীর হাতের তৈরি দুটি কার্তিক ঠাকুর। একই হাতের তৈরি, কিন্তু একটি ছিল খারাপ। খুব তাড়াতাড়ি গড়া বলেই এমন হয়েছিল। মতি বোধ হয় বিরক্ত হয়ে গড়েছিল। আমিই দুটির নামকরণ করেছিলাম—বাবু-কার্তিক, আর পেয়াদা-কার্তিক। আমি ছিলাম দুই কার্তিকেরই মালিক, সুতরাং আমি অনুগ্রহ করে নিত্যই নারাণকে দিতাম পেয়াদা-কার্তিক। কোনো-কোনোদিন জেদ ধরত, আজ বাবু-কার্তিক নেবেই সে। আমি তখন বলতাম—তবে আমি খেলবই না। তারপর জানালার গরাদ ধরে জানালায় উঠে দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে হাত পুরে বাইরে আনতাম আর আকাশে উড়িয়ে দিতাম কাল্পনিক পায়রা।

—এই—গিরে মদা—হুস—ধা!

গিরে মদা, অর্থাৎ গিরি নামক কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে কেনা মদ্দাটা।

—এই—তিলে মাদী—হুস—ধা!

অর্থাৎ তিলের মতো অজস্র কালো বিন্দু আছে গায়ে যে মাদী পায়রাটার—সেইটা।

এ-সব নাম এবং এই পায়রা ওড়ানোর ভঙ্গি শিখেছিলাম আশুদাদার ভাইপো ষষ্ঠীর কাছে। যে ষষ্ঠী নির্মলশিববাবুর সমবয়সী, থিয়েটারপ্রসঙ্গে যার নাম এর

নারাণ অবশেষে পেয়াদা-কার্তিক নিয়েই খেলতে রাজী হত। এর পরে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খেলার ধারা পাল্টাল। নারাণের সঙ্গে বন্ধুত্ব ক্ষীণ হল না। বোধ হয় তখন আট-দশ বছর বয়স, তখন থেকে একটা নূতন খেলা খেলতে শুরু করেছিলাম আমরা দুজনে। রামায়ণ খেলা। খেলাটা আমার আবিষ্কার। তখন রামায়ণ পড়েছি, তিন-চারবার তো নিশ্চয়। রামায়ণের কাহিনী কণ্ঠস্থ। এমন কি, বানর সেনাপতিদের সুগ্রীব-অঙ্গদ-নল-নীল-গয়-গবাক্ষ করে সমস্ত নাম—মহাবীর হনুমান তো বটেই, ওদিকে রাক্ষস সেনাপতি খর, দূষণ, ভস্মলোচন, অতিকায়, তরণীসেন—সব নাম মুখস্থ। আমাদের দেশে গেরুয়া রঙের খোয়াইয়ের মধ্যে অজস্র বিচিত্র আকারের বিচিত্র বর্ণের—লাল নীল সবুজ নুড়ি ছড়ানো। সেই নুড়ি কুড়িয়ে আনতাম পকেট এবং আঁচল ভর্তি করে। তার থেকে রঙ এবং আকার মিলিয়ে কোনোটিকে করতাম রাম, কোনোটিকে লক্ষ্মণ, কোনোটি হনুমান, কোনোটি রাবণ, কোনোটি কুম্ভকর্ণ, কোনোটি অতিকায়, কোনোটি মেঘনাদ। বারান্দায় খড়ি দিয়ে সেতুবন্ধ থেকে স্বর্ণলঙ্কা এঁকে দুইদিকে প্রস্তর বাহিনী সাজিয়ে রামলীলা হত। তালশিরের কাঠিতে সুতো বেঁধে হত ধনুক এবং কুঁচিকাটি ভেঙে করতাম তীর। সীতাহরণ থেকে সীতা-উদ্ধার পর্যন্ত এই খেলা চলত। বলা বাহুল্য, আমিই বেশির ভাগ নিতাম রামপক্ষ, নারাণকে নিতে হত রাবণপক্ষ। তাই নিত নারাণ। নারাণের চরিত্রের মধ্যে ছিল নির্মলশিববাবুর ওই মহৎ গুণের প্রতিফলন—অক্রোধ-গুণ। আরও গুণ তার ছিল—সে ছিল সত্যকারের সমাজ-কর্মী। প্রথম যৌবনে—

চরকা খদ্দর নিয়ে সংগঠনে সত্যকারের শক্তির পরিচয় দিয়েছিল। কিন্তু ওই এক পথে, যে পথে নির্মলশিববাবু হয়েছেন সাধন-ভ্রষ্ট, সেই পথে নারাণও হল সাধন-ভ্রষ্ট। সে-কথা থাক। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চোদ্দ-পনরো বছর বয়সে—আবার খেললাম নূতন খেলা। তখন আমরা দুই দলের দুই নেতা। আমরা যুদ্ধ করলাম। ওই যুদ্ধের খানিকটা ছাপ আছে 'ধাত্রী দেবতার' প্রথমে।

তারপর বয়স বাড়ল। বন্ধুত্ব বিচিত্রভাবে পরিণত হল সম্পর্কে। সে হল আমার ভগ্নিপতি—আমি হলাম তার ভগ্নীপতি। কিন্তু দুজনের জীবনপথ ধীরে ধীরে সরতে শুরু করছে তখন। বলতে ভুলেছি সাহিত্যচর্চা, তাও শুরু করেছিলাম দুজনে একসঙ্গে। নিত্যগোপালবাবুর কবিতা লেখা দেখে আমরাও কবিতা রচনা করলাম—

"শারদীয়া পূজা যত নিকট আইল
তত সব লোকদের আনন্দ বাড়িল।"

আর এরই মধ্যে এল প্রতুলকৃষ্ণ—খোকা।

চারুর জ্ঞাতি-ভাই খোকা। নিত্যগোপালবাবুর আপন খুড়তুত ভাই। আমরা ইস্কুলে এক ক্লাসে ভর্তি হলাম। খোকা, আমি আর শিবকৃষ্ণ—তিনজন ছাত্র ক্লাসে। খোকা প্রথমবার হল ফার্স্ট, হয়ে ডবল প্রমোশন নিলে। আমি সেকেণ্ড, ক্লাস প্রমোশন পেলাম। শিবকৃষ্ণ থার্ড, ফেল হল। কিছুদিন পর খোকাকে একদা দেখলাম, গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে আমাদের ঠাকুরবাড়িতে ঘুরছে। আমাকে ডাকলে। আমি গেলাম। অনেক কথা হল। সে সমস্তই হল কেমন করে নির্মলশিববাবু-নিত্যগোপালবাবুর মতো ফ্যাশনেব্‌ল্ হওয়া যায়। খোকা বললে—ওরা দাড়ি কামায়। ওরা ছ-আনা দশ আনা চুল কাটে। তাই এমন সুন্দর দেখায়। সে বের করলে একটা কাঁচি, এবং প্রস্তাব করলে সে আমার চুল কাটবে—আমায় কামিয়ে দেবে, আমি করব তার ক্ষৌরকর্ম। সে প্রথমেই আমার মাথার পিছনে চালালে কাঁচি। তারপর বললে, ঠিক হয়েছে। এইবার দাড়ি। কিন্তু দাড়ি তো নেই, কি কামাবে? অথচ না কামালে চলবে না। অতএব ভুরুর উপর চালালে কাঁচি। তারপর আমি ধরলাম কাঁচি। কয়েক মুহূর্ত পরে যথাসাধ্য সুন্দর করে তাকে ছেড়ে দিলাম।

মা পিসিমা মুখ দেখে অবাকবিস্ময়ে চেয়ে ছিলেন।

খোকার কথা অনেক।

তেরো

খোকার কথা অনেক।

আমার চেয়ে দেড় বছরের বড়; হিলহিলে লম্বা। কথায় কথায় ফিক্-ফিক্ করে হাসত। দারুণ দুঃখেও তার সে হাসি বন্ধ হত না। মায়ের একমাত্র সন্তান। প্রকাণ্ড একটি পরিবারের মধ্যে বড় হয়ে উঠেছে। খোকার বাপ-খুড়োরা ছয় ভাই। সে-আমলের নিয়ম অনুযায়ী খোকার মা-খুড়ি-জেঠীদের আসল নাম কেউ জানে না।

বউরা বাড়িতে পদার্পণ করবামাত্র নামকরণ হত—মতি-বউ, যুঁই-বউ, বেলি-বউ, শরৎ-বউ, মানিক-বউ, রানী-বউ, সৌরভ-বউ ইত্যাদি। বউদের নামের মধ্যে মূল্য এবং সৌন্দর্য দুই বোধেরই পরিচয় চোখে পড়বে। সমাদর যেখানে বেশি সেখানে মানিক-বউ নাম পেতেন বউ-মানিক, রানী-বউ হতেন বউ-রানী। খোকার মায়ের নাম ছিল—যুঁই-বউ, লোকে ডাকত যুহি-বউ বলে। অতি শান্ত সরল মিষ্ট প্রকৃতির ছোটখাটো মানুষ ছিলেন, গায়ের রঙ ছিল কাঁচা সোনার মতো। অল্পবয়সে বিধবা হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, সে বৈধব্যের আঘাত যেমন আকস্মিক তেমনি প্রচণ্ড ; ছোট দেওরের বিবাহে গেল তাঁর বড় ছেলে, খোকার দাদা অতুল, আর ফিরল না, কলেরায় মারা গেল। সেখান থেকে ফিরেই তিন দিন কি চার দিনের দিন মারা গেলেন স্বামী। কয়েকটা দিনের মধ্যে বাড়ির আনন্দ-আয়োজনের আসরে যুহি-বউদি একসঙ্গে হারালেন স্বামী পুত্র। যুহি-বউদি মারা গেছেন গত বৎসর ১৩৫৬ সালে। খোকার উপর তাঁর প্রত্যাশা কতখানি ছিল তা বুঝতে পারিনি, কখনও কোনো উৎকণ্ঠা প্রকাশ করতে দেখিনি। খোকা কলকাতাতেই থাকে। আমি কলকাতা থেকে গেলে বউদির সঙ্গে দেখা হত ; কিন্তু কখনও প্রশ্ন করেননি—খোকার সঙ্গে দেখা-টেখা হয়নি ভাই? এর একটা কারণ আমার মনে হয়, এই সংসারটির সে-আমলের অস্বাভাবিক অতি কঠোর ব্যবস্থার ফল। এরই জন্যে খোকা জীবনে হয়েছে অকৃতকার্য—ব্যর্থ। নিত্যগোপালবাবুর নাম পূর্বে করেছি—তিনি এই বাড়ির জ্যেষ্ঠ সন্তান, ভগবানের অজস্র প্রসাদ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, দুর্লভ রূপ, দুর্লভ মধুর কণ্ঠস্বর, তেমনি ক্ষুরধার বুদ্ধি, স্মৃতিশক্তি ; বলেছি তো অজস্র প্রসাদ। সংসারের এই কঠোর ব্যবস্থার ফল তাঁর জীবনের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। অন্তঃপুরে খোকার কুণ্ডলিনী পিসিমা ছিলেন সর্বময়ী কর্ত্রী, বাইরে কর্তা ছিলেন ওঁদের সেজকাকা। একজন জ্বলন্ত চুল্লী, অপরজন উত্তপ্ত কটাহ। ষোলো-সতেরো বয়স যখন নিত্যগোপালবাবুর—যখন তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেবেন তখনও বেত্রাঘাতে তাঁর পিঠ জর্জরিত করে দিয়েছেন সেজকাকা। তাঁর প্রচণ্ড শাসনের অন্তরালে ছিল এমন উচ্চাশা, যা মানুষকে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। সম্ভবত, সম্ভবত কেন—নিশ্চয়ই, তার উগ্র উচ্চাশা ছিল এই যে, তাঁদের বাড়ির ছেলেরা প্রত্যেকেই হবে স্কুলের পরীক্ষায় প্রথম, মাইনরের পর থেকে এন্ট্রান্স, এফ. এ., বি· এ·, এম· এ-তে বৃত্তি পাবে, প্রথম হবে, পরিশেষে হবে ম্যাজিস্ট্রেট অথবা জজ। এই গ্রামের অপর যে সকল পরিবারের মাথা তাঁদের পরিবারের মাথা থেকে উঁচু হয়ে আছে, সেগুলিকে অবনত করে দেবে। তাঁর সকল শাসন ছিল—গ্রাম্য ঈর্ষ্যা-বিদ্বেষের উত্তাপে উত্তপ্ত। সে-আমল; দৃষ্টি একমাত্র আবদ্ধ ছিল সরকারী চাকরির প্রতি। নইলে নিত্যগোপালবাবুর প্রতিভার বিকাশে তাঁর সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হতে পারত। থাক। খোকার কথা বলি। খোকারও ছিল মিষ্ট কণ্ঠস্বর এবং তার বুদ্ধিও ছিল তীক্ষ্ন; সে আর কিছু পারুক-না-পারুক, পরীক্ষা পাস করে বি. এ. ডিগ্রি নিয়ে কোনো বড় অপিসের হেডক্লার্কও হতে পারত। কিন্তু সেজ-কাকার শুভ কামনার উগ্রতা সে সহ্য করতে পারলে না। ক্লাসে সে ফার্স্ট হতেই সেজকাকা হেড মাস্টারকে ধরে তাকে ডবল প্রমোশন দেওয়ালেন। খোকা পড়ত

আমার সঙ্গে, আমাকে পিছনে ফেলে উপর চলে গেল—সেজকাকার উগ্র উচ্চাশা সেদিন পরিতৃপ্ত হয়েছিল সাময়িকভাবে। তারপর অন্তরালে যা ঘটে গেল—সে দেখবার দৃষ্টিও তাঁর ছিল না, অবকাশও ছিল না। বেচারা শিশু হাঁটুজলে সাঁতারে পারঙ্গমতা দেখিয়েছে বলে তাকে অগাধ জলে ঠেলে দিয়ে পাড়ের উপর দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করে রইলেন—মধ্যসমুদ্র থেকে তুলে আনুক সহস্রদল পদ্মটি, যার মধ্যে ঘুমিয়ে আছেন কমলালয়া লক্ষ্মী। প্রথম ভাগ পড়ে (সত্যসত্যই প্রথম ভাগ, পাঠ্য-বইয়ের নাম ছিল শিশুপাঠ—প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ সংক্ষিপ্ত করে সে এক বিচিত্র বই) ফার্স্ট হয়েছে বলে খোকাকে ঠেলে উঁচুতে তুলে দ্বিতীয় ভাগ বাদ দিয়ে—তার সামনে প্রায় ধরে দেওয়া হল চারুপাঠ। খোকা বেচারা—চারুপাঠে ভীমভীষণ ঝঞ্চাতাড়িত 'উত্তাল তরঙ্গমালা বিক্ষুব্ধ অর্ণববক্ষে' পড়ে গিয়ে ডুবে গেল অর্ণবজলে, অথবা উত্তাল তরঙ্গমালায় তাড়িত হয়ে ঊষর বালুবেলায় নিক্ষিপ্ত হল যে বেলাভূমে—মুক্তা তো দূরের কথা, ঝিনুক শামুকের একটা কুচি পর্যন্তও নাই। পালাতে লাগল খোকা। বাড়িতে পড়তে বসে পালাতে লাগল, স্কুলে ক্লাশ থেকে পালাতে লাগল, মিথ্যা কথা বলতে শিখল বাধ্য হয়ে, ছেলেমানুষ অপটুভাবে মিথ্যে বলত। প্রথম প্রথম পালাবার স্থান আবিষ্কার করলে—'পেমনো' নামক এক গন্ধবণিকনন্দন বন্ধুর বাড়িতে। বসে থাকত, তামাক খেত। ক্রমে সে-স্থানের সন্ধান জানাজানি হতেই যত্র-তত্র ধাবমান হল।

অনেক দিন পরের একটা ঘটনার কথা বলছি। তখন আমার ফার্স্ট ক্লাস। খোকা তখনও ফোর্থ ক্লাসে। সেই বোধ হয় স্কুলে শেষ বৎসর খোকার। আমার ক্লাস থেকে বেরিয়ে আমি লাইব্রেরির দিকে যাচ্ছি : বড় হলের মধ্য দিয়ে পথ : হলে দুটো ক্লাস বসে পাশাপাশি—ফোর্থ ক্লাস আর থার্ড ক্লাস। ফোর্থ ক্লাসে পড়াচ্ছিলেন আমাদের সেকেণ্ড মাস্টারমশাই ননীবাবু, তিনি আমায় দেখেই হঠাৎ বললেন—এই হয়েছে। শোন তো তারাশঙ্কর।

দেখলাম, খোকা দাঁড়িয়ে মুচকি মুচকি হাসছে। বইয়ের আড়াল দিয়ে অবশ্য। সেকেণ্ড মাস্টার বললেন, শ্রীমান প্রতুলকৃষ্ণের বাড়ি তো তোমাদের পাশেই। এক খিড়কির ঘাটেই তো আচরণ তোমাদের। বলতে পার—শ্রীমান প্রতুলের মা নাকি কাল খিড়কির ঘাটে পা পিছলে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন?

কি বলব ভেবে পেলাম না। এমন কোনো সংবাদও শুনিনি, তার উপর আজই তাঁকে বকতে শুনেছি। খোকাকেই বকছিলেন।

আমি বিব্রত হলাম, কিন্তু খোকা হেসেই চলল সমানে।

মাস্টার মশাই বললেন, অতঃপর আজ তোমাদের বাউরীপাড়ায় একটা নাকি দাঙ্গা হয়ে গেছে?

দাঙ্গা হয়েছে কি না জানি না, তবে বাউরীপাড়ায় ঝগড়া তো লেগেই থাকে, আজ সকালেও গোলমাল একটা শুনেছি। হঠাৎ প্রতুল বলে উঠল, এই ডাক্তারবাবুকে শুধান না স্যার। বাঁকা বাউরী আর নন্দ বাউরীর শালার মধ্যে ঝগড়ায় লাঠালাঠিতে নন্দর মাথাটা দু-ফাঁক হয়ে গিয়েছে কি না? বলুন না ডাক্তারবাবু?

ডাক্তারবাবু স্কুলে কোনো প্রয়োজনে এসে হলে মাত্র প্রবেশ করেছেন। হেসে

ডাক্তারবাবু বললেন, দু-ফাঁক ঠিক নয়, তবে কেটে খানিকটা গিয়েছে। খোকাই নিয়ে এসেছিল তাকে ডাক্তারখানায়। কিন্তু সে-কথা এখানে কেন? কি ব্যাপার?

মাস্টার বললেন, আমি পরশু শ্রীমান প্রতুলকে আলটিমেটাম দিয়েছি যে, বেতন নিয়মিত দিলেই যে তুমি এই ক্লাসের বেঞ্চিতে বসতে পাবে, তা পাবে না। হয় পড়া-শুনা কর, নয় স্কুল ছাড়। পাক্কা উচ্ছেদের নোটিশ। কি প্রতুল, বল, কথা ঠিক কি না?

খোকার নাকের নিচের অংশটা খোলা বইটায় ঢাকা, উপরের অংশটা দেখা যাচ্ছিল, সে ঘাড় নেড়ে জানালে—হ্যাঁ, কথা ঠিক।

খোলা বইয়ের আড়ালের অন্ধকারে ঠোঁটের উপর মুচকি হাসি ঘন ঘন খেলে যাচ্ছিল, সে সত্য অন্ধকার ঘরে শব্দ তুলে ছোট্ট ইঁদুরের ছুটে বেড়ানোর মতো শব্দের ইঙ্গিতেই আত্মপ্রকাশ করছিল। খোকার মুখের আড়াল দেওয়া বইয়ের ভিতর থেকে শব্দ উঠছিল খুক্-খুক্-খুক্। মাস্টার মশায় বললেন, কিন্তু কাল পড়া জিজ্ঞাসা করতেই, ঠিক এমনিভাবে বইয়ে মুখ ঢেকে দাঁড়াল এবং কড়িকাঠের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অবশেষে বললে- কাল খিড়কির ঘাটে পড়ে গিয়ে ওর মা সাংঘাতিক আঘাত পেয়েছেন—শয্যাশায়ী হয়ে রয়েছেন, তাঁর সেবা করতে গিয়ে পড়া করবার অবকাশ পায়নি। মাতৃভক্তি, মাতৃসেবার পুরস্কার দিতে না পারি, তিরস্কার কি করে করি? কাল সন্তুষ্ট মনে মার্জনাই করেছিলাম। আজ জিজ্ঞাসা করলাম পড়া, আজও ঠিক কালকের অবস্থা—দেখুন না, বইয়ে মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আজ বলছে-- বাউরীপাড়ায় ভীষণ দাঙ্গা বেধেছিল কোনো এক বাউরী-বধূকে নিয়ে : দুই বীর-পুঙ্গবে দ্বন্দ্বযুদ্ধ, সে যুদ্ধ থেকে কেউ তাদের নিবৃত্ত করতে পারেনি—অগত্যা ওকেই যেতে হয়েছিল রণাঙ্গনে। যুধ্যমান দুই বীরের উদ্যত মহাস্ত্রের মধ্যস্থলে উপবীতধারী দেবতার মতো দাঁড়িয়ে ওকে বলতে হয়েছে—ক্ষান্ত হও। নতুবা ভস্ম করে দেব। তবে তারা ক্ষান্ত হয়েছে। কিন্তু ওখানেই শেষ নয়, বিচার করতে হয়েছে – এই কন্যাটি কার প্রাপ্য—

খোকা বললে, তারপর নন্দার শালার মাথা ফেটেছিল, তাকে–

ডাক্তার বললে, হ্যাঁ, তাকে আমার কাছে এনেছিল। একটু টিংচার আইডিন দিয়ে বেঁধে দিলাম।

মাস্টার মশায় বললেন, তবে আজও তোমার মার্জনা। জনসেবার পুরস্কার দিতে না পারি, তিরস্কার করব কি করে? বস প্রতুলচন্দ্র। যাক, আগে তার গোড়ার কথা বলি।

প্রতুল ডবল প্রমোশন নিয়ে পরের বারে ফেল হল পরীক্ষায়। প্রতুলের সেজ-কাকা যত চটলেন প্রতুলের উপর, তত চটলেন পরীক্ষকদের উপর। তিনি রেগে ইস্কুলে গেলেন এবং রাগারাগি করে প্রতুলকে প্রমোশন দেওয়ালেন, এবং আমাদের বাড়িতে আমার গৃহশিক্ষকের কাছে পড়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। কিন্তু তখন তার শিশুমন অরণ্যবহ্নির উত্তাপে আতঙ্কিত কুরঙ্গশিশুর মতো পলায়নপর। জীবনে সে আতঙ্ক ব্যাধির মতো পেয়ে বসেছে। সে একমাত্র পথ আবিষ্কার করেছে—পলায়ন।

সে পালাতে চায়, ছুটে পালায়, জ্ঞানরাজ্য সমাদর করে ডাকলেও সে কর্ণপাত করে না। নিত্য সন্ধ্যায় সে পড়তে আসত। আমার গৃহশিক্ষক ব্রজেন্দ্র মণ্ডল মহাশয় দুর্বলদেহ মানুষ ছিলেন। তার উপর ছিল তাঁর নিতান্ত অল্পবয়স। অতি সৎপ্রকৃতির আন্তরিকতাপূর্ণ মানুষ ছিলেন, স্কুলে পড়াতেন কঠিন পরিশ্রম করে। পড়ানোর সূচীর মধ্যে তাঁর কাজ ছিল—ড্রিল শেখানো। প্রায় দু-ঘণ্টা—দুটো থেকে চারটে—নিজে ড্রিল করে দেখিয়ে ড্রিল শেখাতেন। স্কুল থেকে ফিরতেন একেবারে ক্লান্ত হয়ে। সন্ধ্যায় পড়াতে বসে পড়াগুলি দেখিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে তিনি প্রায়ই ঘুমিয়ে পড়তেন। যেমন তাঁর নাক ডাকা শুরু হত, অমনি খোকা পড়া বন্ধ করত। দু-মিনিট—তিন মিনিট—পাঁচ মিনিট অন্তর পড়া বন্ধ করত, এক মিনিট দু-মিনিট তিন মিনিট নীরব থাকত আবার শুরু করত—মনোহর ইক্ষুদণ্ড, মনোহর ইক্ষুদণ্ড, মনোহর ইক্ষুদণ্ড। তারপর হঠাৎ আমার হাতখানা চেপে ধরত ; আমি মুখ তুলে চাইলেই ফিক্ করে হেসে ফিসফিস করে বলত—আমি চললাম। ভ্রূ কুঞ্চিত করে মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে প্রশ্ন করতাম আমি—কোথায়? বা কেন?

সে বলত, বাড়ি।

আমি পড়তে পড়তেই আঙুল দেখিয়ে দিতাম মাস্টারের দিকে।

সে বলত, বলো তার মা ডাকছিল।

খোকাদের বাড়ি এবং আমাদের বৈঠকখানাবাড়ি সামনাসামনি, মাঝখানে হয়তো দশ ফুট চওড়া একটা গ্রাম্য রাস্তা। ওদের বাড়ির কথাবার্তা আমাদের এখান থেকে স্পষ্ট শোনা যেত। ওই কথা বলেই খোকা বই বগলে নিয়ে অন্ধকার রাস্তায় আমাদের বৈঠকখানার উঁচু দাওয়া থেকে ঝপ করে লাফিয়ে পড়ত। সিঁড়ি বেয়ে নামবার বিলম্ব তার সইত না। মিনিট দুয়েক পরেই শোনা যেত খোকার পিসিমার উচ্চ কণ্ঠের কথা—এরই মধ্যে তোর পড়া হয়ে গেল খোকা?

এর উত্তরে খোকা কি বলত শোনা যেত না। কিন্তু ওর পিসিমার কথা শোনা যেত—ভাত খেতে চলে গেল? এই তো সন্ধ্যে। এরই মধ্যে ভাত খেতে গেল?

এবার খোকার কথা শোনা যেত। সে এবার উচ্চকণ্ঠেই জবাব দিত, না? গেল না? মাস্টার সন্ধ্যে বেলাতেই খেয়ে নেয়। ভূতের ভয় মাস্টারের। ওর নাম বু-বু মাস্টার, তা জান না—না কি? আমি হঠাৎ চমকে উঠতাম মাস্টার মশায়ের ডাকে—পড়্। তুই নিজে পড়্।

মাস্টার জেগে উঠেছেন ইতিমধ্যে। সম্ভবত খোকার পিসিমা'র উচ্চ কণ্ঠস্বরেই জেগে উঠতেন, এবং নিজের 'বু-বু মাস্টার' নাম শুনে লজ্জা পেতেন। তার প্রতিক্রিয়ায় ক্রুদ্ধ হতেন।

খোকার পিসিমা বলতেন, এই খানিকক্ষণ পড়ানোর জন্যে মাসে দু-দুটো টাকা? বলছি আমি সাতনকে। এ যে গালে চড় মেরে টাকা নেওয়া!

তিনি বকেই যেতেন।

এদিকে ক্রোধ মাস্টারের মনে খোঁচা-খাওয়া সাপের গর্তে ঘুরপাক খাওয়ার মতো ঘুরপাক খেত।

এ লজ্জা তিনি রাখবেন কোথায়! ছাত্রকে না পড়িয়ে তিনি ফাঁকি দিয়ে টাকা নিয়ে থাকেন! বু-বু মাস্টার নামের লজ্জাও লঘু হয়ে যেত।

অথচ এ নামটায় তাঁর ছিল অপরিসীম লজ্জা। আমাদের বাড়ির ঠাকুর তরুণ ক্ষুদিরাম নিষ্ঠুর কৌতুক করে মাস্টারকে ভয় দেখিয়েছিল। ঠাকুর ক্ষুদিরাম মাস্টার মশায়ের চেয়েও অল্পবয়সী ছিল। মাস্টারের বয়স ছিল কুড়ি-বাইশ, ক্ষুদিরামের ছিল সতেরো-আঠারো। আমাদের বৈঠকখানা থেকে ভিতর-বাড়ি যেতে একটি দীর্ঘ গলিপথ অতিক্রম করতে হয়। দু-পাশেই আমাদের নিজেদের লোকের বাড়ি-ঘর। আমার জ্যেঠামশায় পেয়েছিলেন আমাদের পুরানো বাড়ি, সে-বাড়ির অনেক অপবাদ। একটা পুরানো ডুমুর গাছ গলির মাথায় ছত্রছায়া মেলে থাকত। সেখানে নাকি কেউ থাকতেন, মধ্যে মধ্যে দুটো পা ঝুলতে দেখা যেত—চকিতের মতো ; এই বাড়িতেই ছিল একটা শিউলীগাছ, সেখানেও কেউ থাকতেন নাকি—তাঁর মাথা ন্যাড়া, পায়ে খড়ম। তিনিও মধ্যে মধ্যে দেখা দিতেন, এবং তিনি দেখা দিলেই নাকি আমাদের পরিবারের মধ্যে কাউকে যেতে হত। এই ভৌতিক গৌরব বা অপবাদগ্রস্ত গলি নিয়েই হোক বা অন্য কোনো হেতু হতেই হোক, মাস্টার মশায় ক্ষুদিরামের ভূত সম্পর্কীয় কুসংস্কার দূর করতে চেয়েছিলেন। অনেক নজীর দেখিয়েছিলেন, বিজ্ঞান-বাদ বুঝাতে চেয়েছিলেন, সায়েবদের দোহাই পেড়েছিলেন এবং ক্ষুদিরামকে নির্বাক করে দিয়েছিলেন। ক্ষুদিরাম তখন নির্বাক হয়ে সেই রাত্রে মাস্টার মশায় যখন খাওয়া-দাওয়া সেরে আমাদের বাড়ির ভিতর থেকে একাকী বৈঠকখানায় আসছেন, (সুকৌশলে ক্ষুদিরাম সেদিন মাস্টারকে একাই ফেলেছিল) তখন হঠাৎ ওই গলির মধ্যে এক স্থানে ঝরঝর শব্দ তুলে এক রাশি কিছু বর্ষণ হয়ে গেল। সম্মুখেই ডুমুরতলা, তার ওদিকে শিউলীবৃক্ষ। মাস্টার মশায়ের রামকবচ—অভয়মন্ত্র বইয়ের মধ্যে আছে, বই তখন সঙ্গে নেই। কাজেই তিনি বু-বু-বু-বু শব্দ করে আমাদের বাড়ির মধ্যেই ফের দৌড়ে গিয়ে পড়ে গেলেন। শব্দটা তিনি প্রাণ খুলেই করেছিলেন, পাড়ার লোকে শুনেছিল ; কাজেই ও-নামটা সেই দিন সেই ক্ষণেই করণ করে দিলে লোকে। মর্মান্তিক লজ্জা সেই জন্যে। এ লজ্জাও তাঁর কাছে লঘু হয়ে যেত। টাকা নিয়ে ছাত্রকে পড়াতে তিনি ফাঁকি দেন! চোখ ফেটে তাঁর জল আসত। হতভাগ্য শিশুর মনের দুঃখ বুঝে ওঠা সহজ নয়, সে-আমলে এ দিকটায় বুঝবার মতো আলোকপাতও হয়নি ; কিন্তু শিশুর প্রতি করুণা-মমতা মানুষের অন্তরের সহজাত বৃত্তি, জৈব প্রবৃত্তির মতো। অনেক ক্ষেত্রে শিশুকে হরণ করে পশু তাকে হত্যার পরিবর্তে পালন করেছে। মাস্টার মশায় হৃদয়বান মানুষ ছিলেন, তবুও পরদিন সন্ধ্যায় পড়তে এলেই তাকে ধরতেন চুলের মুঠোয় চেপে। তারপর নির্মম প্রহার। কী কান্নাই কাঁদত প্রতুল! কিন্তু মাস্টার তাকে ছেড়ে দেবার কিছুক্ষণ পরেই সে চোখ মুছতে মুছতে আমার দিকে তাকিয়ে ফিক্ করে হেসে ফেলত। আমি তাকে বলতাম, আমি বলিনি রে। মাস্টার মশাই নিজেই শুনেছে।

সে ঘাড় নাড়ত—ঠিক, ঠিক। তুমি বল নাই সে আমি জানি।

দু-চার দিন আমিও বলে দিয়েছি। যে-দিন ছুটি নেওয়ার ইচ্ছা হত, অথচ

খোকার পিসিমা ওদিকে কোনো গোল তুলতেন না সেই দিন সে-দিন আমাকেই তুলতে হত সাড়া। ডাকতাম—মাশ-শাই —অর্থাৎ মাস্টার মশাই! স্যার! এদিকে টেনে নিতাম অঙ্কের খাতা।

—হুঁ!

—এটা হল কি না দেখুন।

—কি, পড়।

—অঙ্ক স্যার।

—এখন অঙ্ক নিয়ে বসলি কেন? উঠে বসতেন মাশ-শাই। নর্মাল ত্রৈবার্ষিক পাস ব্রজেন্দ্র পণ্ডিত অঙ্কশাস্ত্রে সত্যকার পণ্ডিত ছিলেন। কলেজ-ক্লাসের গণিতশাস্ত্র নিয়ে আপন মনেই কষে যেতেন। সে যে তাঁর কী আনন্দ, আমি তা ভুলব না। আবার কবিতাও লিখতেন, মস্ত খাতায় কবিতার পর কবিতা লিখে যেতেন। তিনি আজ নেই, কিন্তু কবিতার খাতার স্তূপ আছে। নাটকও লিখেছিলেন তিনি। সে-কথা থাক। খোকার কথাই বলি। জেগে উঠে বসে অঙ্ক দেখে বলতেন, কুড়কুড়ির ছা, ভুরভুরির মা, কষেছ তো ঠিক। বাঃ বাঃ! ওই বিচিত্র শব্দ দুটি তাঁর আবিষ্কার, ওর অর্থ তিনিই জানতেন। আমি যেটুকু বুঝতাম, সেটুকু মাস্টার মশায়ের স্নেহের সমাদর। মাস্টার এর পর লক্ষ্য করতেন খোকা নেই।

—খোকা? পালিয়েছে?

—হ্যাঁ স্যার। বললে, জিজ্ঞাসা করলে বলিস, মা ডাকছিল।

—হুঁ।

এর পরই বলতাম—আমিও যাই স্যার।

—ওই ছোঁড়াই তোর লেখাপড়া হতে দেবে না। চল্।

তার পরদিন আবার খোকাকে সৎপথে পরিচালনা করবার চেষ্টা করতেন। এ দিনের প্রহার তত নির্মম হত না। খোকা কাঁদত। আমার সঙ্গে কথা বলত না। কাঁদতে কাঁদতেই পড়ত। আমি মধ্যে মধ্যে তীর্যক দৃষ্টিতে তাকাতাম, সেও তাকাত। একবার—দুবার—তিনবারের বার খোকা ফিক্ করে হেসে ফেলত।

এই সময়টুকুর বাইরে খোকার সঙ্গে আমার কোনও সঙ্গ ছিল না। তার জীবন যেখানে মুক্তির অবকাশ পেয়েছে, সেইখানেই সে গিয়েছে। বাড়ি ঘর সমাজ থেকে ছুটে পালিয়ে গিয়েছে, নিচের স্তর থেকে আরও নিচের স্তরে গিয়েছে। সে যেন খুঁজত অন্ধকার। যে অন্ধকারে মানুষ শৃঙ্খলা-শাসন-লজ্জা—সমস্ত কিছু থেকে মুক্ত। সেখানে সে ছুটত বুনো কালো ঘোড়ার মতো। গ্রীষ্মের ছুটিতে খোকা গামছা কাঁধে বের হল স্নান করতে। গিয়ে উঠল আমবাগানে। কাঁচা আম খেয়ে কামড়ে ছড়িয়ে দাঁত টকে গেলে উঠত তালগাছে। তাল কেটে খেয়ে জলে নেমে—পুকুরের পাঁক ঘুলিয়ে বাড়ি ফিরত প্রায় তৃতীয় প্রহরে। তখন ভাত খেলেও চলে, না-খেলেও চলে! সেজকাকা তখন ঘুমিয়েছেন। বাড়ির সবাই তখন ঘুমিয়েছেন। জেগে আছেন শুধু তার মা। এর পর হঠাৎ খোকা পেটের যন্ত্রণায় অধীর হয়ে চিৎকার করত। তারপর ভেদবমি। এই ভেদবমি তিনবার কলেরার পর্যায়ে উঠেছে।

আম জাম তাল এ-সবের সময় পার হয়ে গেলে খোকা ছুটত বিচিত্র আঁকাবাঁকা পথে। সমস্ত কথা ভুলে গিয়েছি। দু-বারের কথা বলছি। একবার হঠাৎ দেখি, খোকা থিয়েটারের স্টেজের ভিতর থেকে উঁকি মারছে। তখন পাকা স্টেজ হয়েছে। সামনেটা চট দিয়ে ঢাকা থাকে। সেই চটের একটা বড় ছিদ্র দিয়ে খোকার মুণ্ডটা বেরিয়েছে। সে মুণ্ডটা দুলিয়ে ডাকলে। লোভ সামলাতে পারলাম না। সে বললে, পিছনের জানালা দিয়ে এস। পিছন দিকে গিয়ে দেখলাম, জানালার একটা শিক নেই। শিকটা খোকা ছাড়িয়েছিল কি না খোকাই জানে। অন্যে ছাড়িয়ে থাকলে সেটা খোকার চোখ এড়ায়নি। জীবনের যে-দিকটা পিছনের দিক, যে-দিকটায় জমে থাকে আবর্জনা, ভাঙা খোলা—সে-দিকটার খবর ছিল খোকার নখদর্পণে। ওর চোখে পড়তই। আমি যখন ওদিক দিয়ে ঘুরে গিয়ে ভিতরে ঢুকলাম, তখন সে এরই মধ্যেই সেজেগুজে বসে আছে। মাথায় সখীর পরচুলো—একটা বেণীওয়ালা চুল পরে দেওয়ালে ঝুলানো একখানা আয়নায় মুখ দেখছে আর ফিক্ ফিক্ করে হাসছে, বললে, কেমন লাগছে বল তো?

আমারও সে-দিন ভালো লেগেছিল। আমিও পরলাম একটা পরচুল। আয়নায় মুখ দেখলাম। খোকা বললে, বিল্বমঙ্গলে আমি সাজব পাগলিনী, তুমি সাজবে চিন্তামণি। হোক?

আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিলাম, মুখে বললাম, হ্যাঁ।

—দস্তখচংবাবুর চেয়ে আমি ভালো পার্ট করব। দেখো তুমি। বলেই সে গানও এক কলি গাইলে—কেমন মা তা কে জানে?

দস্তখচংবাবু হল নিত্যগোপালবাবুর সে-আমলের একটা চটানে নাম। আমাদের গ্রামে ফুল্লরা দেবীর স্থানে মেলা হয়। সে মেলায় সে-কালে বড় বড় যাত্রার দল আসত। একবার কলকাতার থিয়েটার পার্টিও গিয়েছিল। সে-বার এসেছিল ফকির অধিকারী মশাইয়ের নামজাদা দল। মেলায় যাত্রা হল। দশখানা গ্রামের লোক দেখলে। দেখতে পেলে না কেবল আমাদের গ্রামের ভদ্রঘরের মেয়েরা। মেলায় মেয়েদের জন্যে আসরও করা হয়েছিল, কিন্তু তবু সেখানে যাওয়া চলত না সে-আমলে। হোক না কেন ফকির অধিকারীর দলের যাত্রাগান। এই কারণেই গ্রামের মেয়েরা পরামর্শ করে ঠিক করলেন—নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে একদিন যাত্রাগান করাতে হবে। —গ্রামের ভিতরে তাঁরা চাঁদা তুলতে শুরু করলেন। কিন্তু দলের সঙ্গে কথাবার্তা বলবে কে? কর্তা, যাঁরা যাঁরা গ্রামের প্রধান তাঁদের কাছে এ-কথা বলতে সাহস হল না। তাঁরা এসব কাজ কখনও করেন না। মেয়েরা ধরলেন নিত্যগোপালবাবুকে। নিত্যগোপাল নিজে সুকণ্ঠ গায়ক—গান-বাজনায় গভীর আসক্তি। তার উপর অফুরন্ত প্রাণশক্তি, পনেরো-ষোলো বছরের উৎসাহী ছেলে—সঙ্গে সঙ্গেই ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে ঘাড় পেতে তুলে নিলেন দায়। দলের ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলে এলেন। দলের ম্যানেজারের কাছে এ ধরনের বায়না নূতন নয়। তখন বাংলা দেশের কোনো বর্ধিষ্ণু গ্রামে যাত্রার দল তিন দিনের বায়নায় গেলে অন্তত ছ-দিন গান গেয়ে তবে বের হত গ্রাম থেকে। এ-পাড়ার মেয়েরা ও-পাড়ায় যায় না, এ-বাবুর বাড়ি ও-বাবু

যায় না, বাবুদের পাড়ায় দোকানী-পাড়ার লোকেরা বসতে পায় না ; সুতরাং তিন দিন মূল বায়নার পর তিন দিন বাড়তি গাওনা গেয়ে তবে তারা ফিরত। এ-সব ক্ষেত্রে দক্ষিণাও কম নিত। খাওয়া-দাওয়া এবং শীতান্তে শীতবস্ত্রের 'সেল প্রাইসে'র মতো 'কম-সম' দক্ষিণা নিয়েই গান গাইত। আর মেয়েদের উদ্যোগের প্রতিভূ হয়ে এই রকম কিশোর ছাওয়ালরাই আসে বরাবর। দিনে চাল ডাল মাছ এবং রাত্রে ঘি ময়দা, আসরে পান তামাক আর টাকা পঞ্চাশেক দক্ষিণায় বায়না হল। দশ টাকা বায়নাও দেওয়া হল। ম্যানেজার পাকা লোক, বললেন, শর্তগুলো কাগজে লিখে কিন্তু একটা সই করে দিন।

নিত্যগোপালবাবু বললেন, বেশ তো। বলেই কাগজ কলম নিয়ে খস-খস করে লিখে দিলেন।

ম্যানেজার বললেন, সইটা—? সইটা কি—

—আমিই করব। বলেই সই করে দিলেন—এন. জি. মুখার্জি।

সন্ধ্যায় যাত্রার দলের সাজ-পোশাক নিয়ে গরুর গাড়ি এল। সাজঘরে আলো জ্বলছে, আসরও পড়েছে; কিন্তু নিত্যগোপালবাবু তখন লুকিয়ে পড়েছেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত যে টাকা উঠেছে তার পরিমাণ দেখে তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছেন। চাল-ডাল ঘি-ময়দা মাছ-তরকারি উঠেছে; কিন্তু টাকা উঠেছে তিরিশটি, আরও পাঁচ টাকার প্রতিশ্রুতি আছে। কিন্তু সে বাকি টাকা কোথায়? কি করবেন নিত্যগোপাল-বাবু? এ-দিকে যাত্রার দলের ম্যানেজার বসে রয়েছেন টাকার জন্য। টাকা না-নিয়ে গান শুরু করবেন না। এ বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা অনেক। শ্রোতারা এসেছে, তাদের মধ্যে থেকে জনকয়েক গিয়ে বললেন, কই মশায়, কখন আরম্ভ করবেন? বাবুরা যে সব এসে গেছেন। কর্তারা তখন সত্যিই এসেছেন, তাঁরা সেদিন নিমন্ত্রিত অতিথি। ম্যানেজার বললে, আমরাও তো তৈরি। দেখুন না—সকলেই তৈরি। কিন্তু আমাদের টাকা কই? বাকি চল্লিশ টাকা দক্ষিণা—পান-তামাকের দু-টাকা ; টাকাটা পেলেই শুরু করব। তিনি কই?

—কে?

—কে আবার? একটা তীক্ষ্নকণ্ঠ ব্যঙ্গভরে ধ্বনিত হয়ে উঠল—সারা আসরটা ছড়িয়ে পড়ল। শনির ভূমিকার অভিনেতা শনি সেজেই তার স্বভাবগত তীক্ষ্নকণ্ঠে ব্যঙ্গ করে বলে উঠল, কে আবার? সেই দস্তখচংবাবু মশায়। বায়না করতে গিয়ে কাগজ টেনে নিয়ে খসখস করে লিখে—টানা ইংরেজিতে সায়েবি ঢঙে দস্তখচং সেরে দিলেন। সেই ছোকরা—দস্তখচংবাবু?

কথাটা ছড়িয়ে দিলে শনি। বাবুদের কানে গেল। ব্যবস্থাও হল সঙ্গে সঙ্গে। তবু যাত্রা শুরু হয় না। কেন?—আরে মশায়, সে দস্তখচংবাবুকে আনুন, তিনি সামনে বসুন, তবে তো গাইব আমরা।

গান হয়ে গেল। দল চলে গেল। লোকে গানের কথাও ক্রমে ভুলে গেল, কিন্তু নিত্যগোপালবাবুর 'দস্তখচংবাবু' নামটা লোকে সহজে ভুললে না।

খোকার জ্যাঠতুত দাদা নিত্যগোপালবাবু, খোকা আড়ালে তাকে বলে দস্তখচং-

বাবু। শুধু নিত্যগোপালবাবুকেই নয়, অন্তরালে নিজের বাড়ির সকলকেই ডাকে এমনি ধরনের এক-একটা নাম ধরে।

দ্বিপ্রহরের অবসরে এমনিভাবে সে ঘুরে বেড়াত। আপনার মনে যা খুশি তাই করত এবং আমাদের সঙ্গে দেখা হলেই এই অবসরের কীর্তি-কলাপের কথা এমন রঙ দিয়ে বড় করে বলত যে, অবাক্ হয়ে যেতাম আমরা। ছোট একটা সাপ দেখে থাকলে বলত—সাড়ে-তিন হাত লম্বা একটা মিস্ কালো আলান (কেউটে) সাপ, বুঝলে কিনা, বুঝলে কিনা—এই তার ফণা। কুলোর মতোন—কুলোর মতোন ; চক্র কি? এই চক্র। আমাকে তাড়া করলে।

—তারপর?

—আমাকে তাড়া করলে। সোঁ-সোঁ করে তাড়া করলে।

—হ্যাঁ। তারপর? তুই কি করলি?

—ছুটলাম। হ্যাঁ, ছুটলাম। আমিও ছুটলাম। বোঁ-বোঁ করে ছুটলাম।

—সাপের দৌড়ের সঙ্গে মানুষ পারে?

—তা—পারে নাকি? কিন্তু—আমি—আমি—। আমি মন্তর জানি কিনা। সেই সীভারাম বাবা সন্ন্যেসীর কাছে শিখেছিলাম। সেই মন্তর বলে বললাম—যা, ফিরে যা। সে তখন সুড়-সুড় করে ফিরে গেল।

এমনি ধারায় থেমে থেমে নিজে মিথ্যে কথা ভেবে নিয়ে শ্রোতার চক্ষে প্রকট করে ধরেই সে মিথ্যে বলতে শিখেছিল। সে-অভ্যাস তার জীবনে আজও যায়নি। মিথ্যে যখনই বলে, এবং বলে সে প্রায়ই—অকারণেই বলে, নিঃস্বার্থভাবেই বলে—অপরের ঈর্ষ্যা না করেই বলে,—বলে এমনি থেমে থেমে। আমাদের গ্রামের লোক বা তার পরিচিত লোক সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধমক দিয়ে বলে—থাম খোকা।

খোকা দুঃখিত হয় না, লজ্জিত হয় না, ফিক্ করে হাসে।

চোদ্দ

যখন ভাবি, এত অবহেলা অবজ্ঞার মধ্যে, অত্যন্ত পীড়াদায়ক অপ্রতিষ্ঠা ও গৌরবহীনতার মধ্যেও খোকা ওই হাসিটুকু বাঁচিয়ে রাখল কি করে, তখন আশ্চর্য না হয়ে পারি না।

জীবনের অনুভূতি মরে গেছে? মনের ক্ষেত্র, সারা জীবন প্রশংসা প্রেরণা সস্নেহ উৎসাহের বর্ষণ না পেয়ে, শাসনের উত্তাপে, অবহেলা ও অপ্রতিষ্ঠার বালু-ঝড়ে একেবারে অনুর্বর হয়ে বন্ধ্যা হয়ে গেছে?

হয়তো হবে। কোনো ফুলই ফোটাতে পারলে না সে তার জীবনে। শুধু প্রখর কিছু তার উপর উত্তাপ বিকিরণ করলেই তার জীবন-বিস্তৃত বালুকণা চিক্‌মিক্ করে ওঠে,—তার না আছে কোনো মূল্য না আছে কোনো অর্থ। মূল্য নাই, অর্থ

নাই বলে লোকে হাসি দেখলেও চটে ওঠে। সকল লোকই চটে ওঠে—স্ত্রী পুত্র পর্যন্ত।

আমার অনুমান, ওর স্ত্রীও ওর গল্পে বাধা দিয়ে বলে, থাম বাপু, আর বকো না।

—কেন?

—কেন? যত সব মিছে কথা—

—কক্‌খনও না।

—নিশ্চয় মিছে কথা। যা বলছ, তাই হয় কখনও?

—হয় না? তুমি সব জান!

—সব না জানি ; এটুকু জানি যে, তোমার সব কথা মিছে।

—মিছে?

—নিশ্চয় মিছে।

—নিশ্চয় মিছে?

—নিশ্চয়—নিশ্চয় মিছে!

—এই দেখ—

এবার মুখের কাছে মুখ নেড়ে বউ বলে, নিশ্চয় মিছে—নিশ্চয় মিছে—নিশ্চয় মিছে, একশো বার মিছে। হাজার বার, লক্ষ বার মিছে। ঢের ঢের মিথ্যাবাদী দেখেছি—তোমার মতো দেখিনি।

এবার খোকা ফিক্ করে হেসে ফেলে। ওঃ, বউ কথাটা জোর বলেছে—হাজার বার, লক্ষ বার মিছে! এঃ, ধরে ফেলেছে!

ছেলেরা বড় হয়েছে, তারা বাড়িতে-ঘরে পাড়ায়-গ্রামে দেশে-দেশান্তরে যত পরিচিত স্থান আছে, সর্বত্রই তাদের বাপের অখ্যাতি অপবাদের কথা শুনে আসছে, চোখেও দেখেছে, বাপের প্রতিষ্ঠাহীনতার দৈন্য তাদের পীড়া দেয়—তারাও অনেক সময় গল্পমুখর খোকাকে বলে, তুমি বাপু, বড় বাজে বকো।

—বাজে বকি? জানিস তুই? শুয়ার কোথাকার!

—না! বকো না!

—অ্যাই—

—চুপ কর, চুপ কর—লোক আসছে, থাম। না যদি থাম তবে আমিই উঠে যাচ্ছি—যত খুশি পেট ভরে তুমি বাজে বকো—মিছে কথা বল। 'পেট ভরে' কথাটা বিচিত্র উচ্চারণে বলে 'পে-ট ভ-রে'! ছেলে উঠেই চলে যায়।

অল্প দুটি একটি মুহূর্তের জন্য খোকা স্তব্ধ হয়ে থাকে, তারপর আপন মনেই ফিক্ করে হেসে ফেলে। ধরে ফেলেছে ছেলেটা।

অর্থহীন মূল্যহীন হাসি, বালুকণার ঝিকিমিকি। নীরস-নিষ্ফল জীবনের প্রতিফলন ওষ্ঠপ্রান্তে ফুটে ওঠে। কেন মিথ্যে বলে—সে খোকা জানে না। হয়তো ওর আত্মা ব্যঙ্গ-ভরে বলে—সব ঝুট হ্যায়। তাই হয়তো মিথ্যে বলতে গ্লানির পরিবর্তে আনন্দ অনু করে থাকে খোকা।

ভগবানকে ধন্যবাদ যে, খোকা হাসে, কাঁদে না। কাঁদলে সে কোনোদিন মরে যেত।

খোকার অনেক কীর্তি, কিন্তু কথা এইটুকুই—এর বেশি নয়। এক-একটা কীর্তি অপরটারই পুনরাবৃত্তি। থাক খোকার কথা এইখানে। খোকার পর আরও বন্ধুরা এল, পাড়ারই ছেলে সব।

দ্বিজপদ, বৈদ্যনাথ, বড় পাঁচু, ছোট পাঁচু।

ক্রমে ও-পাড়া থেকে এল বংশী। তার পরের পাড়া থেকে বীরেশ্বর।

বীরেশ্বর বয়সে আমার চেয়ে বড়। তারই মাধ্যমে আলাপ হল আমাদেরই পাড়ার বীরেশ্বর বয়সী করালীর সঙ্গে।

দ্বিজপদ আমার জীবনের অনেকটা জুড়ে আছে।

আমার 'কবি' উপন্যাসের বিপ্রপদ—দ্বিজপদেরই অক্ষম রুগ্ণ অবস্থার চিত্র। বাল্যকালে দ্বিজপদ ছিল দুর্দান্ত দুরন্ত ক্রোধী, প্রচণ্ড রূঢ়ভাষী; কিন্তু আমার কাছে এবং আরও কয়েকজনের কাছে সে ছিল প্রীতি-মধুর, মিষ্টভাষী, অপরূপ মানুষ। আমার সঙ্গ সে খুব পেত না। তবে পেলে কৃতার্থ হত। সম্পর্কে (দূরসম্পর্ক নয়) আমি হতাম তার দাদামশায়, তার মায়ের কাকা। সে, তার দাদা, তার বোনেরা আমাকে 'দাদামশায়' বলত। দ্বিজপদ ছাড়া সবাই ছিল বয়সে বড়। এদের সকলের চরিত্রেই ছিল দ্বিজপদের মতো দুটি বিপরীতধর্মী মানুষ—একজন যত ক্রোধী, অপরজন তত মিষ্টভাষী। এর কারণ একেবারে রক্তগত বৈচিত্র্য, বংশানুক্রমের অতি সুস্পষ্ট প্রকাশ। দ্বিজপদের মা, আমার ভাইঝি ত্রিগুণাসুন্দরী —'তিগুণী'র বংশের ভাষা—তার নিজের ভাষা ছিল অতি মিষ্ট; দ্বিজপদের বাপের দিকের চরিত্রে ছিল অপরিমেয় রূঢ়তা, প্রচণ্ড ক্রোধ, কর্কশ উচ্চ কণ্ঠ; আর ছিল জৈব আবেগের উন্মত্ততা, সে প্রায় অন্ধ উন্মত্ত ঘোড়ার মতো ছুটিয়ে নিয়ে চলত জীবনকে। প্রয়াগে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে সাদা কালো দুটি স্রোতধারা যেমন পাশাপাশি চলে, তেমনি ছিল দ্বিজপদের জীবন। আমার ভাগ্যে আমি যতবার ওদের জীবনধারায় অবগাহন করেছি, ততবারই স্নাত হয়েছি স্নিগ্ধ শান্ত কালিন্দীর কালো জলের ধারায়।

দ্বিজপদ আমার চেয়ে বয়সে ছিল এক বৎসরের ছোট। পড়ত কিন্তু ক্লাস তিনেক নিচে, ক্রমে সে ব্যবধান—পাঁচ-ছয় ক্লাসের ব্যবধানে পরিণত হয়েছিল। দ্বিজপদের কণ্ঠ ছিল উচ্চ, উল্লাস ছিল উগ্র, তেমনি প্রবল ছিল জৈব প্রবৃত্তির পথে ছুটবার আবেগ। দ্বিজপদের বাবা ছিলেন আমার বাবার বাল্যবন্ধু, সম্পর্কে হতেন নাতজামাই, প্রতিবেশীও ছিলেন অতি-নিকট। দ্বিজপদের বাবা নিত্য আসতেন আমার বাবার ওখানে। চা খেতেন, গল্পগুজব করতেন। রামজী গোঁসাই-বাবা তাঁকে ডাকতেন 'রাজা' বলে। তার কারণ যৌবনে দ্বিজপদের বাবা গ্রামের যাত্রার দলে রাজা দুর্যোধন সাজতেন। রাজার মতো চেহারাও ছিল। তাঁর কথা থাক। দ্বিজপদের কথা বলি। আমার জীবনে দ্বিজপদ এবং বড় পাঁচু হঠাৎ একদা এক অভিনব অধ্যায়ের সূচনা করে দিলে, সে সূচনা সূত্ররেখার মতো সূক্ষ্ম সূত্রপাত থেকে

ভবিতব্যের রেখায় মিলে প্রশস্ত হয়ে হল পায়ে-চলা পথ; তারপর পরিণত হল রাজপথে;—অথবা তারা সেইদিন বল্মীক-স্তূপে আরোহণের আস্বাদন দিয়ে আমাকে ভাবীকালে দুরূহ পর্বতাভিযানে রত করে দিয়ে—নিজেরা নেমে গেল অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথে। অন্ধকারে কোন্ মনোরমের হাতছানি তাদের মুগ্ধ করেছিল, সেই কথাই আজ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ভাবি।

স্পষ্ট মনে রয়েছে সেদিনের কথা।

বড় পাঁচু, দ্বিজপদ আমার সঙ্গে খেলা করছিল আমাদের বাড়িতে। কয়েকদিন আগে নারাণের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। বড় পাঁচু এবং দ্বিজপদকে নিয়ে রামায়ণ-খেলা খেলছি। পাঁচু হি-হি করে হাসছে; ওটা ছিল পাঁচুর স্বভাব। কথার একটু জড়তা ছিল। অল্প বয়সেই—বোধ হয় এগারো-বারো বছর বয়সেই মারা গিয়েছিল পাঁচু, তবু যতটুকু মনে পড়ে, তার স্বভাবের মধ্যে একটি ভীরু চতুরপ্রকৃতির জীব উঁকি মারত। ঠাকুরবাড়িতে পূজক ছিলেন বুড়ো ভট্টাচার্য, আগুনের মতো কোপন-স্বভাব, কণ্ঠস্বর একটু খনা ছিল বলে ছেলেবয়সে নাম হয়েছিল—খনা, ক্রমে সেই নাম কোপন-স্বভাব হেতু—'খুনে'তে পরিণত হয়েছিল। চতুর ভীরু পাঁচু তাঁর কাছেও হি-হি করে হাসত। ভটচাজ পূজা করতেন, পাঁচু দোরের পাশে দাঁড়িয়ে উঁকি মারত আর হাসত—হি-হি! হি-হি! হি-হি! আশ্চর্য চতুর পাঁচু অনুভবে বুঝত যে, খুনে এতেই খুশি হবে।

সত্যই ভটচাজ রাগ করতেও পারতেন না। তিনিও হেসে ফেলতেন এবং পূজার মধ্যে অবকাশ হলেই প্রশ্ন করতেন—কি?

—পেছাদ।

প্রসাদ দিতেন ভটচাজ। একটু চিনি, একখানা বাতাসা। এর বেশি শিবঠাকুর আর কি পান?

পাশাপাশি পাঁচটি শিবমন্দির। ভটচাজ এক মন্দিরে পূজা সেরে দ্বিতীয় মন্দিরে ঢুকতেন। পাঁচু আবার এসে দাঁড়াত।

—হি-হি! হি-হি! হি-হি!

—আরে আবার কি?

—ভশচাজ!

—কি? আবার কি?

—পেছাদ।

—আরে! আবার প্রসাদ? এই যে দিলাম!

—তু আমাকে বায়ে বায়ে দে—আমি বায়ে বায়ে খাই ভশচাজ।

এবার ভটচাজই হেসে ফেলতেন হা-হা-করে।

সেদিন খেলতে এসেও অকারণে হাসছিল পাঁচু।

হঠাৎ নারাণ এসে নিমন্ত্রণ জানালে। ভাগবত খেলছে তারা।

ভাগবত! অবাক্ হয়ে গেলাম।

ভাগবতের কথকতা তো তখন শুনেছি। সংস্কৃত শ্লোক—তার ব্যাখ্যাগান, বিচিত্র রসরসিকতা—সেই সব ওরা করবে? কে করবে? তুই? নারাণ?

—না, আমি না। নিশাপতি করবে। মঙ্গলডিহি থেকে নিশাপতি এসেছে।

নিশাপতি মঙ্গলডিহির ছেলে হলেও লাভপুরের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে বেশি। নারাণের জীবনে সে-ই হয়েছে—নব নায়ক। সে-ই করবে ভাগবতের কথকতা।

গেলাম। সঙ্গে দ্বিজপদ পাঁচু এরাও গেল। সত্যিই অবাক্ হয়ে গেলাম। নিখুঁত পরিপাটি আয়োজন। একখানি আসন, সামনে একটি ছোট জলচৌকি, তার উপর একখানি কার্পেটের ঢাকনি, তার উপরে ফুল ও একখানি বই। পুষ্পমাল্যশোভিত কণ্ঠে তিলকশোভিত নিশাপতি বসেছে আসনের উপর। সে বললে, অহো ভাগ্য! আসুন—আসুন। নমস্কার—

নমস্কার।—বললাম আমরা।

নিশাপতি গম্ভীরভাবে বললে, দেবর্ষি নারদকে দেখে রাজা বললেন—অহো ভাগ্য! আসুন—আসুন—আসুন, দেবর্ষি, নমস্কার।

নিশাপতি তখন ভাগবত কথকতার এ স্টাণ্টটুকু আয়ত্ত করেছে। সে-কালে ভাগবতের আসরে এইভাবে অনেকজন আগন্তুক কথকের সাদর সম্বর্ধনায় আপ্যায়িত হয়ে বিনয় প্রকাশ করে অপ্রস্তুত হতেন। আমি অপ্রস্তুতই হলাম। কিন্তু পাঁচু বা দ্বিজপদ হল না। তারা এমন হি-হি করে হাসতে শুরু করে দিলে যে, নিশাপতিই অপ্রস্তুত হয়ে গেল। এর পর সে সংস্কৃত শ্লোক আউড়ে গেল।

মুখস্থ চাণক্য শ্লোক আউড়ে তার ব্যাখ্যা করে নিশাপতি ভাগবত পাঠের খেলা খেলছিল। চাণক্য শ্লোক তখন বাল্য বয়সেই শেখানো হত। আমি চাণক্য শ্লোক মুখস্থ করি নাই ; তবে কেউ বললে চাণক্য শ্লোক বলে চিনতে পারতাম। আমার মুখস্থ ছিল রঘুবংশের প্রথম শ্লোক—বাবা শিখিয়েছিলেন,

"বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থ প্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দেঃ পার্বতী-পরমেশ্বরৌ॥"

আমার সে শ্লোক আওড়াবার অবকাশ ছিল না। আমি চুপ করেই রইলাম। নিশাপতি শ্লোকের ব্যাখ্যা শুরু করলে। বিষ্ঠার মধ্যেও স্বর্ণখণ্ড থাকলে, তা সযত্নে সংগ্রহ করবে। বাস্, আর যায় কোথায়! হি—হি—হি! হি—হি—হি!—বিষ্ঠা! ভাগবতের মধ্যে বিষ্ঠা! পাঁচু এবং দ্বিজপদ হেসে আসর পণ্ড করে দিয়ে উঠে পড়ল, এবং হঠাৎ পাঁচু মুখে মুখে কবিতা রচনা করে ফেললে—

নিশাপতি—খিশাপতি—ছিশাপতি রে—

ভাগবতে হ্যাক-থু—হ্যাক থু-থু। হি-হি-হি! হি-হি-হি! হি-হি-হি! সে আর থামে না। নিশাপতি প্রায় ক্ষেপে গিয়ে ভ্রষ্টযোগীর মতো আসন ত্যাগ করে উঠে মারপিট শুরু করে দিলে। ওরা দলে ছিল ভারী। এলাকাটা ছিল ওদের। তবুও আমরা শুধু মার খেয়েই এলাম না, নাকের বদলে নরুনের মতো দু-এক ঘা দিয়েও এলাম। এলাম আমাদের বৈঠকখানায়। এসে শোধ নেওয়ার পরামর্শ চলতে লাগল। হঠাৎ বাগানের একটা গাছ থেকে পড়ল একটি পাখির বাচ্চা। ছোট্ট পাখির বাচ্চা,

বাসা থেকে পড়ে গেল কি করে? খেলার মোড় গেল ঘুরে। শোধ নেওয়ার পরামর্শ স্থগিত থাকল। পাখিটাকে কুড়িয়ে নিয়ে তাকে বাঁচাবার জন্য পরিচর্যা শুরু করে দিলাম। জল দিলাম, গাড়ুর নলের মুখে জল। খামার থেকে ধান এনে দিলাম তার মুখে—খা খা। পরিচর্যায় হাঁপিয়ে উঠে ছোট পাখির ছোট প্রাণটুকু বেরিয়ে গেল। ঘাড়টি লট্‌কে পড়ল। অত্যন্ত দুঃখ হল। আহা-হা, ছোট পাখিটি! বাঁচলে—কেমন পুষতাম!

অতঃপর পাখিটিকে সমাধি দেবার কল্পনা হল। মাটি খুঁড়তে আরম্ভ করলাম। পাখির ছানাটি পড়ে রইল বাগানের বাঁধানো বেদীর উপর।

হঠাৎ পাঁচু ডাকলে—দেখ।

দেখি, পাখির মা ডাল থেকে নেমে এসে ছানাকে ডাকছে। তার চারিপাশে ঘুরছে, সস্নেহে ঠোকরাচ্ছে।

আমি অবাক্ হয়ে দেখছিলাম।

পাঁচু ইতিমধ্যে মুখে মুখে কবিতা রচনা করে ফেললে—

"তারা দাদার পাখির ছানা মরিয়াছে আজি
তার মা এসে কাঁদিতেছে কেউঁ-কেঁউ করি।"

আমাদের বৈঠকখানার দরজায় লাইন দুটো খড়ি দিয়ে লিখে ফেললে সে। আমি বিস্মিত হয়ে পাঁচুর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। কবির সম্মান, কবির মূল্য তখন বুঝিনি, কিন্তু পাঁচু যা করেছে সে যে একটা মহাগৌরবের—তার মূল্য যে পরম মূল্য—তা যেন সেই মুহূর্তেই উপলব্ধি করলাম। উপলব্ধি করলাম নিজের বিস্ময়ের পরিণাম থেকে, গভীরতা থেকে। মা-পাখিটা ইতিমধ্যে ডালে গিয়ে বসলে, আবার এল, আবার গেল, কয়েকবারের পর ডালেই বসে রইল। তখন খড়ি নিয়ে আমি পাঁচুর লাইন দুটির নিচে লিখলাম—

"পাখির ছানা—মরে গিয়াছে—
মা ডেকে ফিরে গিয়াছে—
মাটির তলায় দিলাম সমাধি—
আমরাও সবাই মিলিয়া কাঁদি।"

লাইন ক'টি অন্তত কুড়ি বৎসরের উপর লাল রঙ করা দরজার খড়খড়ির গায়ে লেখা ছিল। বোধহয় কুড়ি বৎসরেরও বেশি। আমার আমলেই আমি নিজে হাতে সাদা রঙ দিয়েছিলাম দরজায়, তাতেই সে ঢাকা পড়ে গেছে। আমার সাহিত্য-সাধনা শুরু হয়ে গেল সেই দিন।

পাঁচু লিখেছিল প্রথম দুটি চরণ। আমি করেছিলাম পাদপূরণ। দিন তারিখ মনে নেই। তবে বয়স মনে আছে। আমার বয়স তখন আট বছরের কম। আট বছরেই আমার বাবা মারা গেলেন। তখন বাবা আমার বেঁচে ছিলেন। সেই বারেই পুজোর সময় কবিতা রচনা করলাম—

"শারদীয়া পূজা যত নিকট আইল
তত সব লোকের আনন্দ বাড়িল।"

আর মনে নেই, আরও অন্তত বারো-চোদ্দ লাইন ছিল। বাবা সে-কবিতা দেখে-ছিলেন। কবির সম্মান, কবির মূল্যে আমাকে বুঝিয়েছিল পাঁচু। জিহ্বায় জড়তা, সবতাতেই হাসি, বিচিত্র পাঁচু হঠাৎ সেদিন কি করে এবং কেন কবিতা রচনা করেছিল —তা ভাবি আর বিস্মিত হই। কবিতা রচনা করা তার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু তার আকস্মিক উচ্ছ্বাস মুহূর্তে আমাকে দিয়ে গেল জীবনের দীক্ষা।

পনেরো

"শারদীয়া পূজা যত নিকট আইল
তত সব লোকের আনন্দ বাড়িল।"

কবিতাটি রচনা করেছিলাম যখন, তখন অলক্ষ্যে কাল নিশ্চয়ই হেসেছিলেন। আজ সেই বহুকালের পুরানো কথা স্মরণ করতে গিয়ে—যখন পুরানো ছবিগুলি ঝাড়ামোছার পর স্পষ্ট হয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠছে তখন মনে হচ্ছে—সেদিন ছবিগুলি আঁকা হওয়ার সময় অনেক কিছু চোখে পড়েনি—পড়লেও সেদিন তার অর্থ উপলব্ধি হয়নি। কাল হেসেছিলেন এবং সে-হাসি ঠিকই চোখে পড়েছিল, কিন্তু তাকে কালের হাসি বলে চিনতে পারিনি। এতকাল পর্যন্ত, এই মুহূর্তে সেই কাহিনী লিখবার আগের মুহূর্ত পর্যন্তও না। আজ মনে পড়ছে সেই কালের হাসির খানিকটা ফুটেছিল বাবার মুখে—খানিকটা ফুটেছিল লোকের মুখে। বাবা হেসে-ছিলেন, রোগশয্যায় শুয়ে ছোট্ট কাগজে ছাপানো কবিতাটি পড়ে তাঁর মুখে হাসি ফুটেছিল। প্রসন্ন, কিন্তু রোগের ক্লান্তি ও ক্লিষ্টতার জন্য বিষণ্ণ ও ব্যথিত। আমায় ডেকে সমাদর করে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কতটা লিখেছো, নারাণই বা কতটা লিখেছে?

কবিতাটির নিচে রচয়িতা হিসাবে আমার এবং নারাণের নাম ছিল। ছাপা হয়েছিল কলকাতার তখনকার দিনের এক বিখ্যাত প্রেসে—ক্যালিডোনিয়ান প্রেসে। নারাণের ঠাকুরদা ছিলেন ক্যালিডোনিয়ান প্রেসের বড়বাবু। তিনি ছিলেন বিখ্যাত কুলীন। ষেঠেরা তারাচরণের বংশধর, আমাদের গ্রামের জামাই। বছরে বার দুয়েক শ্বশুরবাড়ি আসতেন। পুজোর সময় একবার এবং আর-একবার যখন হোক। তিনিই এনেছিলেন ছাপিয়ে। নারাণের সঙ্গে তখন বিরোধ মিটে গেছে; নারাণের পাশ থেকে নিশাপতির দলও অন্তর্হিত হয়েছে, আমার আশপাশ থেকে দ্বিজপদ পাঁচু এরাও সরেছে। পৃথিবীকে যারা ভালো-মন্দবোধের বিচার দিয়ে বেছে-বুছে ভোগ করে—তাদের সঙ্গে, যারা দুহাতে ভোগ করে যায় কোনো বিচার না করেই তাদের সঙ্গে ঠিক বনে না। ওদের সঙ্গে তাই ঠিক বনত না আমার। পাঁচু অল্পবয়সে গেছে, দ্বিজপদ অনেক দিন দুনিয়াকে দুর্দান্তভাবে ভোগ করে—শেষ-জীবনে যেন কার প্রচণ্ড গদাঘাতে ভগ্ন-ঊরু দুর্যোধনের মতো শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। সুস্থ জীবনে যার প্রচণ্ড চিৎকার করে পৃথিবীতে কোলাহল সৃষ্টি করে চলা অভ্যাস ছিল, হঠাৎ সে একেবারে রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল; কঠিন যৌন-ব্যাধি থেকে বাত। রোগের সামান্য উপশম হলেই দ্বিজপদ লাঠিতে ভর দিয়ে বেরিয়ে গ্রাম্য

রাস্তা উচ্চ হাস্যে রসিকতায় মুখর করে তুলত। থাক সে-কথা। দ্বিজপদরা বার বার এসেছে আমার কাছে। কিন্তু কিছুতেই বনেনি, কয়েক দিন পরেই আমার সঙ্গ ছেড়ে যেন পালিয়ে গেছে। সে-দিনও নারাণ এলে ওরা চলে গিয়েছিল। বড় পাঁচুর দেওয়া প্রেরণা তখন আমার মনের প্রদীপে আলো জ্বালিয়েছে। একটা ছোট কথা মনে পড়ে গেল। এ ঘটনার অনেক পরে—সম্ভবত বছর পঁচিশেক আগে—কালী-পুজোর রাত্রে আমাদের গ্রাম থেকে মাইল পাঁচেক দূরে এক জায়গায় পুজো। দেখতে চলেছিলাম ; হঠাৎ পথের ধারে গাছতলায় সিগারেট খেতে বসে দেশলাইয়ের কাঠির আলোয় চোখে পড়ল কিছু খড় পড়ে আছে, বোধ হয় কোনো রাহী ফেলে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল হল খড়গুলিতে আগুন ধরিয়ে বহ্ন্যুৎসব করবার। ধরিয়ে দিলাম আগুন, খড় পুড়ে ছাই হতে লাগল। হঠাৎ বেশ একটু দ্রুতগতিতে এল দুটি লোক, বললে—'বাঁচলাম বাবু, দাও তো একটু আগুন, লণ্ঠনটা ধরিয়ে নিই। আলো ধরিয়ে নিতে আগুন পাই নাই সারাটা পথ। সাথে দিয়েশলাই নাই।' আলোর শিখা জ্বেলে নিয়ে তারা চলে গেল মাঠের পথে। আমার সামনে খড় জ্বলে নিভে গেল ; অন্ধকার গাঢ় হয়ে উঠল। কেউ খড় পুড়িয়ে হাসে, কেউ পথের আলো জ্বালিয়ে নেয় তা থেকে।

বাল্যকালে একদিন আমার আলোয় নারায়ণকেও বললাম, তুই ভাই ধরিয়ে নে তোর মনের পিদীম এই শিখাতে। তা হলে ভালো হবে—একসঙ্গে চলব দুজনে।

নারাণ প্রথমটা উৎসাহিত হয়েছিল। এ উৎসাহ তার অনেকদিন ছিল। ওই কবিতা রচনায় সেদিন সেও যোগ দিয়েছিল। কতটা সে, কতটা আমি রচনা করে-ছিলাম—সে হিসাব আজ মনে নেই, করবও না।

বাবার প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলাম, আমি অর্ধেক, নারাণ অর্ধেক।

—তুমি সবটা লিখলে না কেন?

আমি চুপ করে ছিলাম। তারপর বলেছিলাম, ওর ঠাকুরদাদাই যে ছাপিয়ে দিলেন।

এবার বাবা চুপ করেছিলেন।

সেদিন ষষ্ঠী। সপ্তমীর দিন সকালে ছাপা কবিতার তাড়া নিয়ে ঢাক ঢোল শানাই কাঁসি কাঁসর ঘণ্টা মুখর শোভাযাত্রার মধ্যে—দুটি শিশু কবি—সর্বসমক্ষে সলজ্জ বিনয়ের অন্তরালে সগৌরবে আত্মঘোষণা করলে—'আমাদের পদ্য, পড়ে দেখুন।' আমার এই আত্মঘোষণার সময় কাল হেসেছিলেন বিচিত্র হাসি।

ক্ষুদ্র একটি বাংলার পল্লীতে সে-কালের গ্রাম্য বাঙালীর সমাজে এ আত্মঘোষণা খুব কঠিন ছিল না। কিন্তু আমাদের গ্রাম ক্ষুদ্র ছিল না—আকারেও না, প্রকৃতিতেও না, প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্বে অহরহ উত্তপ্ত গ্রামখানিতে দ্বন্দ্বী রথীর সংখ্যা ছিল অনেক। আভিজাত্য কৌলিন্য-গৌরব, বংশগৌরবের এবং সম্পদগৌরবের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সমাজক্ষেত্রটি প্রায় কুরুক্ষেত্র তখন। অল্পস্বল্প ভূসম্পত্তি, গোয়ালে গাই, পুকুরে মাছ—এমন ধরনের ব্যক্তিরা সে কুরুক্ষেত্রে অর্ধরথীর সামিল। কিন্তু তা হলেও অস্ত্রে ধার তাঁদের কম ছিল না। কুরুক্ষেত্রের সমরে সেনাপতি শল্যের মতো বিক্রমে তাঁরা ভীষ্ম দ্রোণের অভাবে সৈনাপত্য গ্রহণের শক্তি ধরতেন। বড় রথী ছিলেন তাঁরাই,

যাঁরা শুধু গ্রামেই প্রতিষ্ঠাবান নন—গ্রামের বাইরেও যাঁরা গণ্যমান্য। এমন গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে আবার আমাদের গ্রামে এমন সব মানুষ ছিলেন, যাঁরা সংস্কৃতির কেন্দ্র কলকাতায় থাকতেন, প্রচুর অর্থ উপার্জন করতেন। রূপে, সজ্জায়, অস্ত্রে, ধ্বজায়, শঙ্খনাদে তাঁরা এমনই দীপ্যমান ছিলেন যে তাঁদের চিনিয়ে দিতে হত না—দেখবামাত্র চেনা যেত। এই রথীদের সামনে প্রতিষ্ঠাকামী বালকের আত্মঘোষণা সহজ ছিল না। সেদিন রথীরা সবাই সমবেত। সমস্ত বৎসরের মধ্যে দুটি দিন তাঁরা সকলে একত্রিত হতেন, মহাসপ্তমীর প্রভাতে ঘট পূর্ণ করবার ঘাটে এবং বিজয়া-দশমীর দিন ওই ঘাটেই—ঘট বিসর্জনের অপরাহ্ণে। আজ স্মৃতি স্মরণ করতে বসে সেদিনের আমার গ্রামের সেই দীপ্তমুখ প্রসন্নস্বাস্থ্য উজ্জ্বলশ্রী প্রাণবন্ত মানুষের সমারোহ মনে করে চোখে জল আসছে। চারিদিকে দীপ্তি—চারিদিকে সবল দ্বন্দ্বে যুধ্যমান মানুষ, সে কত কোলাহল—কত বাজনা—কত উল্লাস—সে কী উচ্চ হাসি, সে কী প্রাণখোলা আলাপ! আবার তেমনি কঠিন উচ্চ ছিল বাদানুবাদ, ক্ষেত্রবিশেষে দৈহিক আক্রমণও হয়ে যেত। আর বক্র তীক্ষ্ণ হাস্যের গুণ আরোপ করে মর্মান্তিক শরক্ষেপ—সে যেন অগ্নিবাণ ব্যর্থ হচ্ছে বরুণাস্ত্রে, বরুণাস্ত্র ছিন্নবিচ্ছিন্ন হচ্ছে বায়বাস্ত্রে, বায়ুবাণ স্তিমিত স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে শৈবাস্ত্রে : সে যুদ্ধ বিচিত্র! তার মধ্যে ছাপা পদ্য হাতে নিয়ে যখন প্রবেশ করলাম, তখনকার অবস্থা আজ কল্পনা করতে গিয়ে মনে হচ্ছে—অভিমন্যুর মতোই দুঃসাহস হয়েছিল আমার সেদিন। কাগজ বিলি করতেই এই রথীদের অধর-ধনুতে বক্র হাস্যের জ্যা যোজিত হয়েছিল—পদ্য! কবিতা! কে লিখে দিলে? কি থেকে টুকলে? এরই মধ্যে ডিম ফুটে কালিদাস-হংস বেরুল নাকি? কেউ কেউ হয়তো মহাকবির "মন্দঃ কবিযশপ্রার্থী" শ্লোকটির প্রথম চরণও আউড়েছিলেন। সংস্কৃত-জানা কালিদাস-পড়া লোকও না-থাকা ছিল না আমাদের গ্রামে আমার কালে। আমার বাবার কালিদাস গ্রন্থাবলী আজিও রয়েছে। অর্ধপ্রসন্ন অর্ধবক্র কালের হাসির প্রসন্ন ভাগটা ফুটেছিল শয্যাশায়ী আমার বাবার মুখে—বক্রকুটিল দিকটা ফুটল সেদিনের সমবেত জনতার মুখে। কয়েকজনের মুখে প্রসন্ন প্রশংসার হাসিও ফুটেছিল। তাঁদের আজও ভুলিনি। এঁদের ভোলা যায় না।

স্বর্গীয় নির্মলশিববাবু, তাঁর মেজদাদা স্বর্গীয় অতুলশিববাবু, শ্রীযুক্ত নিত্যগোপালবাবু, এঁদের সেদিনের প্রশংসা-প্রসন্ন হাসি আমার চোখের উপর ভাসছে।

দ্বিজপদ সেদিন হঠাৎ আমায় সম্বোধন করলে 'কপিবর' বলে। সঙ্গে সঙ্গে কোন পুজোবাড়ি থেকে সংগ্রহ করে আনা একটা কপিপাতা নিজে কচকচ করে চিবিয়ে খেয়ে বললে, কপি খেয়ে ফেললাম। ওর আচরণটুকু আমাকে ওর বাক্যের আঘাত থেকে বাঁচিয়ে দিলে। বুঝলাম, কেউ ওকে শিখিয়ে দিয়েছে কপিবর কথাটা। কিন্তু কপির অর্থ বেচারা জানে না। আমি কপিপাতা চিবিয়ে খাওয়া দেখে হেসে উঠেছিলাম। পরবর্তীকালে দ্বিজপদকে আমিই ডাকতাম 'কপিবর' বলে। সে প্রাণ খুলে হাসত। মধ্যে মধ্যে বলত, একদিন কিন্তু 'উঁ-প' শব্দ করে ঘাড়ে চড়ে বসব।

আমি হাসতাম, বলতাম, ঘাড়ে না, তুই নাতি, তুই বন্ধু—পড়িস তো বুকে লাফিয়ে পড়িস।

কখনও কখনও বলতাম, দোহাই, যেন ঘাড়ে বসে কান ধরে টেনে ছিঁড়িস না।

সে জিভ কেটে পায়ের ধুলো নিয়ে বলত, দাদু, ছি-ছি দাদু! ছি-ছি! গাল পেতে বলত, মার মার, তিন চপেটাঘাত—থ্রি শ্ল্যাপস। সটাসট—সটাসট!

সেদিনের কথাই বলি। কপিবর বলে কপির পাতা চিবিয়েই দ্বিজপদ ক্ষান্ত হল না, সপ্তমীর দিন সন্ধ্যায় দ্বিজপদ ও-পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ঝগড়া করে এল—ওই ছাপানো 'পদ্য' নিয়ে।

—কে লিখতে পারে? কার ক্ষমতা আছে বল না শুনি? আমাদের পাড়ায় চারজনা পদ্য লিখেছে। গোপালবাবু লিখেছে, নির্মলবাবু লিখেছে, তারাশঙ্কর লিখেছে, নারাণ লিখেছে। কে লিখেছে তোদের পাড়ায়?

—লেখে নাই, লিখতে পারে আমাদের কালীকিঙ্করবাবু।

—কালীকিংকরবাবু! কালীকিঙ্করবাবু তোদের পাড়ার? একা তোদের পাড়ার? কালীকিংকরবাবু দু-পাড়ার।

শেষ পর্যন্ত মারপিট করে ফিরল দ্বিজপদ।

আমাকে এসেই ডাকলে।—লাগাও যুদ্ধ ওদের সঙ্গে, ও-পাড়ার সঙ্গে।

আমাদের বাড়িতে তখন সমস্ত কিছু যেন থমথম করছে। বাবার অসুখ দেখে ক্রমশই অধীর হয়ে উঠছেন পিসিমা। বাবা পুজোর বাজার করতে গিয়েছিলেন কলকাতা; সেখান থেকে এসে জ্বরে পড়েছেন। একজ্বরী জ্বর। প্রথমে ছিল অল্প জ্বর। ধীরে ধীরে জ্বর বেশি হয়ে চলেছে। আজ চারদিন তিনি বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেননি। আমাদের গ্রামের ডাক্তার গিরিশবাবু ভয় পেয়েছেন আজ। আমার আশুদাদাও চিন্তিত হয়েছেন। তখন আমাদের জেলায় সিউড়িতে ছিলেন লালা গোলোক বলে একজন বিচক্ষণ ডাক্তার। কিন্তু তাঁর চেয়েও খ্যাতি বেশি ছিল রামপুর-হাটের হরিতারণ ডাক্তারের। ডাক্তার আনাবার জন্য লোকও অপরাহ্ণে রওনা হয়েছিল, কিন্তু অন্য কয়েকজন প্রবীণে সে-লোককে ফিরিয়ে এনেছেন।

সে-কালে এটি ছিল একটি গ্রাম্য সমাজের বৈশিষ্ট্য।

শুধু ক্রিয়াকলাপেই নয়, অসুখে-বিসুখেও প্রতিটি প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি এসে একান্ত আপন জনের মতো বসতেন। কতটা তার আন্তরিক কতটা তার শুদ্ধ কর্তব্য পালনের তাগিদ—সে-কথা বলতে পারব না, তবে এটা ছিল। সে অসুস্থ ব্যক্তি, যেমন প্রতিষ্ঠার মানুষ হোক না কেন, তার চারিপাশে মানুষের অভাব হত না।

রোগের গুরুত্ব তাঁরা ঠিক বুঝতে পারেননি। তাঁরা নিজেরা প্রত্যেকেই নাড়ী দেখতে জানতেন। ওটা ছিল সে-কালের অপরিহার্য একটা শিক্ষা। অনেকের এই নাড়ীজ্ঞান ছিল যেমন সূক্ষ্ম, তেমনি বিচক্ষণ।

ব্যাঙের মতো লাফ দিয়ে নাড়ী চলছে, পায়রার মতো থমকে-থমকে চলছে, পিঁপড়ের পায়ের মতো চলছে—এ-সব কথা এখনও আমার মনে আছে। তাঁরাই নিজেরা নাড়ী বিচার করে লোক ফিরিয়ে আনলেন।

বাবার হয়েছিল টাইফয়েড। কলকাতা থেকে বীজাণু সংক্রামিত হয়েছিল। নাড়ী দেখে তাঁরা সে আভাস সকলেই পেয়েছিলেন, কিন্তু রোগ কতটা কঠিন হয়েছে বা

হতে পারে তাই নিয়ে মতভেদ হয়েছিল। আমার বাবার স্বাস্থ্য ছিল অপরূপ। এই রোগে—শেষ তিন-চারদিন বিছানায় থাকলেও—বসেই আছেন; সকলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে যাচ্ছেন। তিনি নিজেও বললেন, কেন এত ব্যস্ত হচ্ছ শৈলজা? তুমি ব্যস্ত হলেও তো রোগ ব্যস্ত হয়ে চলে যাবে না। ওর ভোগ ও পূর্ণ ভোগ করে তবে যাবে।

সপ্তমীর দিনই সকালবেলা আমায় পুজোর পোশাক বের করে দিয়েছেন। আমরা তখন ভাই বোন তিনজন—আমি বড়, আমার ছোট বোন, তারপর আমার মেজভাই; আমার কনিষ্ঠ সহোদর পাঁচ মাস মাতৃগর্ভে। আমাদের সকলকে পোশাক পরিয়ে ভালো করে দেখেছেন কাকে কেমন মানিয়েছে। রসিকতা করেছেন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ রাম চাকরের কোলে আমার ছোট ভাইকে দেখে। মাকে আদেশ করেছেন পোশাকী কাপড় পরতে। পরদিন মহাষ্টমীতে আমাদের বাড়িতে গ্রামের লোকের নিমন্ত্রণ, তার খোঁজ-খবর নিয়েছেন। আমাদের বাড়ির সম্মুখেই চণ্ডীমণ্ডপ—জানালা খুললে খাটে বসেই সব দেখা যায়। তিনি খাট থেকে নেমে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে পূর্ণঘট চণ্ডীমণ্ডপে প্রবেশমাত্র প্রণাম করেছেন:—নবপল্লবকে মণ্ডপে স্থাপন করে সপ্ত তীর্থের জলে স্নান করানো দেখেছেন—হুলুধ্বনি দিয়ে পান সুপারি ছিটিয়ে বরণ করে নবপল্লব পূজাবেদীতে স্থাপনার পর তবে আবার বিছানায় শুয়েছেন। সুতরাং তাঁকে খুব বেশি অসুস্থ না ভাববার মতো কারণ অনেক ছিল। বুঝতে কয়েকজন পেরেছিলেন। মা-পিসিমা মনের একটা আকুলতা থেকে বুঝেছিলেন। রাম চাকরও যেন বুঝেছিল। আর বুঝেছিলেন যোগেশদাদা। যোগেশ মজুমদার ছিলেন আমার জ্যাঠামশায়ের নায়েব। তাঁর কথা আগে বলেছি। তাঁর মতো নাড়ীজ্ঞান ক্বচিৎ দেখা যায়। নাড়ী দেখে তিনি বলে দিতেন—এ জ্বরের ভোগ হবে কত দিন। বলতে পারতেন জ্বরের পরিণতি কি হবে। খুব বেশি দিনের কথা নয়, বোধ হয় বৎসর পঁচিশেক আগে, আমাদের ওখানে স্বনামধন্য কয়লা-ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের একটি ছেলের টাইফয়েড হল। বারো দিনের দিন যোগেশদাদা নাড়ী দেখে এসে বললেন, কলকাতা থেকে ডাক্তার আনবার জন্য লোক গেল। আমি প্রশ্ন করেছিলাম, তুমি কেমন দেখলে যোগেশদা?

—আমি? দাড়িতে হাত বুলিয়ে যোগেশদা ম্লান হাসি হাসলেন।

—কঠিন কিছু?

একটু চুপ করে থেকে বললেন, ভাই, নাড়ীর গতি আমি যতটুকু বুঝি তাতে আমার মনে হল, রোগটি ব্রহ্মা-বিষ্ণুর আয়ত্তের বাইরে। তবে শিব সব পারেন। মৃত্যু একমাত্র তাঁর আয়ত্তাধীন।

তারপর বলে দিলেন—আঠারো দিন কি বাইশ দিন। তার পূর্বে বোধ হয় একটি অঙ্গ পঙ্গু হয়ে যাবে।

সে অসুখে চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলেন কলকাতার বর্তমান চিকিৎসা-জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক। পাঁচ-ছ দিন তিনি ছিলেন, প্রাণপণে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের দিক থেকে যা করবার করেছিলেন। অবশ্য তিনিও আশা প্রকাশ করেননি। কিন্তু

তাঁর কর্তব্য তিনি করেছিলেন। প্রায় অক্ষরে অক্ষরে যোগেশদাদার নাড়ী-পরীক্ষার ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে পরিণত হয়েছিল। চিকিৎসা তিনি করতেন না, শুধু ওই নাড়ীজ্ঞান আয়ত্ত করেছিলেন আশ্চর্য সাধনায়। আজ পেনিসিলিন-স্টেপটোমাইসিনের যুগে যোগেশদাদার নাড়ীজ্ঞান অনেকটা বিভ্রান্ত হত এ-কথা ঠিক, কিন্তু তাঁর একটা কথা লেখবার সময়েও আমার কানের কাছে যেন বাজছে। ঐ সময়েই তিনি বলেছিলেন, ভাই, সাধারণ-রোগের নাড়ী আর আর মৃত্যু-রোগের নাড়ীতে পার্থক্য আছে। বুঝা কঠিন, সব সময়ে বুঝতে পারাও যায় না। তবে গভীর মন দিয়ে নাড়ী পরীক্ষা করলে আভাস পাওয়া যায়, বুঝা যায়। সাধারণ-রোগে নাড়ী দেখে এও বলা যায়—ঠিক ঠিক ঔষধ পড়লে এই এই দিনে এই এই উপসর্গের হ্রাস হবে, এই-ভাবে জ্বরত্যাগ হবে। সে বলা কঠিন নয়। রোগের প্রকোপের মাত্রা, ঔষধের শক্তির মাত্রা, এ দুইয়ে যোগ-বিয়োগ করে বেশ বলা যায়। কিন্তু মৃত্যু-ব্যাধিতে ঔষধ কার্যকরী হয় না।

এই যোগেশদাদা বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু তিনিও এ-কথা বলতে পারেননি। কি করে বলবেন—এই ভেবে তিনি কূলকিনারা পাননি। রাম চাকর সকলকে বলেছিল—আমার কি রকম লাগছে গো। উঁহু, ই ভাল নয়। উঁহু! উঁহু!

সে এক বিচিত্র পরিবেশ! আজও মনে পড়ছে–আমার শিশুচিত্তের সে কী দ্বন্দ্ব! বাইরে দুয়ারের ওপারে আনন্দ-কলরোলের প্রবাহ বয়ে চলেছে, শঙ্খে-ঘণ্টায়-হুলুধ্বনিতে-ঢাকে-ঢোলে-কাঁসিতে-সানাইয়ের সুরে ঘোষণা করে আনন্দ-কলরোল প্রহরে প্রহরে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে পরিচ্ছদের বর্ণচ্ছটায়, শরৎ-রৌদ্রের ঝলমলানিতে দেবীমূর্তির সৌন্দর্যে-গাম্ভীর্যে রূপের জোয়ার বয়ে যাচ্ছে। রূপের সঙ্গে গন্ধ মিশেছে—গঙ্গা-যমুনার ধারার মতো। দেবমন্দিরে উঠছে ধূপগন্ধ, ঘৃতদীপের গন্ধ, পরাতের উপরে রাশিকৃত গন্ধপুষ্প—পদ্মফুল এসেছে ডালা ডালা, গন্ধরাজ টগর মালতীর রাশি সাজানো রয়েছে, ওদিকে ঘষা হচ্ছে অগুরু চন্দন। বধূ-কন্যাদের পরিচ্ছদে উঠছে পুষ্পসারের গন্ধ।

সেই চণ্ডীমণ্ডপের গায়েই আমাদের বাড়িটা সেদিন যেন ধনীর দুয়ারে কাঙালিনী মেয়ের মতোই দাঁড়িয়ে ছিল। বাড়ির ভিতরে পূজার আয়োজন চলছে, তবু যেন সেখানকার আকাশ মেঘমলিন, সব যেন স্তব্ধ হতশ্রী, বায়ুরও যেন অভাব ঘটেছিল। বাড়িতে থাকতে আমার শিশুচিত্তের যেন শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছিল। তবু সেখান থেকে বেরুতে পারছিলাম না। কেউ জোর করে চণ্ডীমণ্ডপে পাঠিয়ে দিলে—সেখানেও থাকতে পারছিলাম না, কঠিন আকর্ষণে বাড়িতে এসে ঢুকেছিলাম।

আমাদের সে-কালের লাভপুর ব্যক্তিত্বে আভিজাত্যে এবং যোগ্যতায় রুচিতে এবং মহার্ঘ্যতায় বাংলাদেশের মহানগরীর রুচিসমৃদ্ধ পল্লীর সঙ্গে তুলনীয় ছিল ; পূজার সময় সেই শোভা ষোলো-কলায় পরিপূর্ণ হত। বিদেশে যাঁরা থাকতেন, তাঁরা প্রতিটি জন ফিরতেন গ্রামে। ষষ্ঠীর দিন রাত্রি পর্যন্ত প্রত্যেকে যেন ফিরতে বাধ্য ছিলেন। না-আসাটা মহা-অপরাধ বলে গণ্য হত। সমাজের কাছে, গ্রামের কাছে, এই শর্তে

যেন দলিল লেখা ছিল। জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত মানুষ যাঁদের বলি, সেদিনের লাভপুরের জীবন-দ্বন্দ্বের মহারথী ও রথী—তেমন মানুষের সংখ্যাই ছিল ষাট-সত্তর জন, এঁদের সঙ্গে আসত পরিজনেরা। একটি পল্লীগ্রামে এমন দেড়শত মানুষের আগমন কম কথা নয়। তাঁরা এসে পুজা-সমারোহের মধ্যে যে উল্লাসের সৃষ্টি করতেন তাতে গ্রামের সকল বিষণ্ণতা সকল মলিনতা নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে যেত। তাঁরাও যেন দমিত-উল্লাস হয়ে গেলেন। আমার বাবার প্রতিষ্ঠা এবং ব্যক্তিত্বের কথা আগেই বলেছি। এই পুজা-সমারোহের মধ্যে তিনি থাকতেন পুরো-ভাগে। তাঁর কণ্ঠস্বরের উল্লাসকে যেন একটি মহিমা দিত। এবং তাঁর অসুস্থতা ছিল যেন কল্পনার বাইরের ব্যাপার। তিনি যে-অসুখে উঠতে পারেননি, সে-অসুখ তো কম নয়—এই কথাটাই সকলকে উল্লাসের মধ্যেও সচকিত করে দিয়েছিল। একে একে দল বেঁধে তাঁরা আসতে শুরু করলেন দেখতে।

এর মধ্যে বিশেষ করে মনে পড়ছে কয়েক জনকে। ইন্দ্রবাবু উকিল, যোগীবাবু উকিল আর ব্রজ জ্যেঠা-মহাশয়কে। বাবার সমবয়সী—অন্তরঙ্গ বন্ধু তিনজনেই। ইন্দ্রবাবু শুধু লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিলই ছিলেন না—তিনি সে-আমলের সত্যকারের সংস্কৃতিবান মানুষ ছিলেন, পাণ্ডিত্যে-ব্যক্তিত্বে আচারে-ব্যবহারে তিনি ছিলেন বিদ্যাসাগর-ভূদেব-বঙ্কিম-ইন্দ্রনাথের (পঞ্চানন্দ) অনুগামী। সম্ভবত সে-কালে কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। সপ্তমীর সন্ধ্যায় বাবার রোগশয্যার চারিপাশে মজলিস বসে গেল। আমি উঁকি মারছিলাম। যেতে পারছিলাম না। মনে আছে—ইন্দ্রবাবু আমার গায়ে বীরভূমের বসোয়া বিষ্ণুপুরের সিল্কের পাঞ্জাবি দেখে বলেছিলেন, হরিবাবু, এই জন্য আপনাকে এত ভালোবাসি। এখানে এসে দেখলাম ছোট ছেলেদের গায়ে আগাগোড়াই বিলিতি জামা পোশাক। আপনার ছেলের পরনে দেখছি ফরাসডাঙা ধুতি—দেশি সিল্কের পাঞ্জাবি। ছেলে কাঁদেনি—জরিদার ভেলভেটের পোশাকের জন্যে?

বাবা মৃদু হেসেছিলেন।

এইটুকুই মনে আছে। তারপর আলোচনা চলেছিল অনেকক্ষণ। যোগীবাবু ছিলেন অন্য ধরনের মানুষ। সৎ মানুষ, খাঁটি উকিল। বাবার সুখ-দুঃখের বন্ধু ছিলেন—আমাদের উকিলও ছিলেন। তিনি বসেই ছিলেন চুপ করে।

ব্রজ-জ্যেঠার আসার কথা মনে আছে। আত্মভোলা সরল রসিক মানুষ। গান গাইতে পারতেন। তিনি গান গেয়ে ঘরে ঢুকেছিলেন। শুনেছি, তিনি সিঁড়ি থেকেই গান ধরেছিলেন—

"ও ভাই কানাই, তু ভাই বিনে রাখাল-খেলা হয় না খেলা—
তু ভাই শুয়ে থাকলি ঘরে, চলে যে যায় গোঠের বেলা।"

ঘরে ঢুকে বলেছিলেন, এ কি কাণ্ড ভাই হরাই! মনে মনে কত আঁচ করে গাঁয়ে এলাম—মহামায়ার পুজা, তুমি ভাই অসুখ করে ঘরে পড়ে। শিবরাম! শিবরাম! তারা কালী—কালী তারা! কপালে হাত দিয়েই চমকে উঠে বলেছিলেন, হরি—হরি—হরি! এ যে অনেকটা জ্বর ভাই হরাই!

ব্রজ-জ্যেঠা আমার পিঠে হাত দিয়ে বলেছিলেন, জ্যেঠা, তুমি নাকি পদ্য লিখেছ? আমাদের পাড়ার সদরে দেখি—ছেলের দল দেওয়াল থেকে কাগজ ছিঁড়ছে। আর ঐ পাড়ার শশনের ব্যাটা—কি নাম—আচ্ছা বাহাদুর লেড়কা—এই যে কি-পদ—তার কান ছিঁড়ছে। আমি ছাড়িয়ে দিয়ে বললাম, কান ছিঁড়িস না বাবা, তার আগে বল হল কি? বলে—হরিবাবুর ছেলে তারাশঙ্কর আর চারুবাবুর ছেলে নারাণ পদ্য লিখেছে—তাই ওই কি-পদ—ও এসে টিটকিরি দিয়েছে আমাদের পাড়ার ছেলেদের। তাই ছেলেরা—পদ্য ছিঁড়েই ক্ষ্যান্ত হয়নি, ছোকরার কানও ছিঁড়ে দেবে। আমি বলি—বাবারা, তাতে রাগ কেন? সরকারপাড়ার আমরা সাতপুরুষ জমিদার—কাগজং-কলমং-লিখনং-পঠনং—ও আমাদের বারণং; হায়—হায়—হায়, নইলে পোস্টাপিসে চাকরি পেয়েছি সেই কবে, আজও প্রমোশন হল না রে বাবা! যতবার দরখাস্ত করি, ততবার ওপর থেকে লেখে—'না'। কেন 'নো'? না—দরখাস্তেই এত ভুল যে ওতে প্রমোশন হয় না। আমি বলি, দিস না ব্যাটারা। জমিদারকে প্রমোশন দিতে হলে রাজা করতে হয়, সে তোমাদের হাতে নেই। কই জ্যেঠা, তোমার পদ্য দেখি। ছেঁড়া কাগজটা তো পড়া হয়নি।

হঠাৎ ঘরে ঢুকলেন ডাক্তার এবং আশুদাদা। তাঁদের পিছনে পিসিমা।

ওষুধ খাবার সময় হয়েছে। ডাক্তার দেখবেন। পিসিমা বললেন, সকলেই বলছেন ভালো আছেন দাদা। কিন্তু আমার যে ভালো ঠেকছে না ডাক্তার। তুমি দেখ। ভালো করে দেখ। মুহূর্তে অন্ধকার এল ঘনিয়ে। ইন্দ্রবাবু আমার পিঠে হাত দিয়ে বললেন, ক্ষিদে পায়নি? যাও, মায়ের কাছে যাও।

অকস্মাৎ কাল এসে দাঁড়াল।

তাকে যেন স্বচক্ষে দেখেছিলাম। অষ্টমীর দিনও কেটে গিয়েছিল এমনিভাবেই। মহানবমীর দিন অকস্মাৎ অতর্কিতে সে এসে দাঁড়াল। মনে হচ্ছে তার ঠোঁটের এক কোণে বাবার ঠোঁটের ম্লান হাসি, অন্য কোণে ফুটেছিল বক্র তীক্ষ্ণ হাসি।

মহানবমীর দিন বেলা একটার সময় বাবা মারা গেলেন।

স্পষ্ট মনে পড়ছে, বাবা দশটার সময়ে বললেন—এ ঘর তিনি বদল করবেন। মহানবমীর দিন আমাদের ও-অঞ্চলে পুজো-সমারোহের সর্বোচ্চ লগ্ন। বলি হয় অনেক—ছাগ-মেষ-মহিষ, এবং বলির নিয়ম এক স্থানের পর অন্য স্থানে পর্যায়ক্রমে। গ্রামে সকল পুজো-বাড়ির ঢাক-ঢোল একত্রিত হয়ে বাজতে থাকে, গোটা গ্রামের লোক এক স্থানের পর অন্য স্থানে চলে শোভাযাত্রার মতো।

এই কারণেই বাবা বললেন, এ ঘরে বাজনার শব্দ হবে প্রচণ্ড। একটু দূরের ঘরে যাবেন। ডাক্তার নিষেধ করলেন। কিন্তু তিনি শুনলেন না। দুজনের কাঁধে ভর দিয়ে তিনি হেঁটেই ঘর-বদল করলেন।

বেলা এগারোটা নাগাদ দেখা দিল বিকার। ভুল বকতে আরম্ভ করলেন। তাঁর সে চোখের দৃষ্টি আমার চোখের উপর ভাসছে, রক্তাভ চোখের অস্থির চঞ্চল

অর্থহীন দৃষ্টি ; সে দৃষ্টি কি যেন খুঁজছিল। মনে আছে, ইন্দ্রবাবু উকিল মুখের কাছে বসে প্রশ্ন করলেন, হরিবাবু!

—আঃ! কি?

—কে আমি বল তো? চিনতে পারছ আমাকে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। তুমি ইন্দ্র।

—কিন্তু এমন কেন করছ?

—সর ইন্দ্র, সর। সরে বস। দেখছ না, বসতে পাচ্ছেন না। দাঁড়িয়ে আছেন।

—কে? কি বলছ?

—ঠিক বলছি। বাবা। আমার বাবা এসেছেন, দাঁড়িয়ে আছেন। আঃ, ইন্দ্র, গুরুজনের সম্মান রাখ। সরে বস, জায়গা দাও। বাবা—আমার বাবা। সরে যাও, সব সরে যাও। শৈল, আসন দে। আসন দে।

কপালের উপর জলপটি, লাল চোখ, অস্থির দৃষ্টি—বাবার চোখ আমার দিকে পড়ল, কিন্তু আমি তাঁর চোখে পড়লাম না।

কে যেন আমায় কোলে তুলে নিয়ে গেল।

তারপর মনে পড়ছে, বাবার শেষনিঃশ্বাস ত্যাগের ছবি। সেই সময় ছুটে এসে পড়েছিলাম।

বিহ্বল হয়ে দেখলাম।

চারদিকের কলরব কান্না—কিছুই আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে পারেনি। আমি দেখলাম, সে বিকারের প্রচণ্ডতা—সে অস্থিরতা।

আবার আমাকে কে নিয়ে গেল।

বাবার দৃষ্টি তখন স্থির হয়ে গেছে।

আবার ফিরে এলাম।

জনতা তখন স্তব্ধ। মৌন মূক সব। মা উপুড় হয়ে পড়ে আছেন আপাদমস্তক আবৃত করে ঘরের এক পাশে। বোধ হয় চেতনা ছিল না তখন। পিসিমা পড়ে আছেন। একে একে লোক আসছে, দাঁড়াচ্ছে, আবার চলে যাচ্ছে। শুধু উঠছে পদধ্বনি।

বাবা শুয়ে আছেন। চোখ দুটির পাতা তখন নামিয়ে দিয়েছে কেউ। আমি নেড়েছিলাম বাবার দেহ। ঠাণ্ডা হিম—কঠিন। মুহূর্তে মনে হল, আর ডাকলে সাড়া দেবেন না। ঠাণ্ডা হিম কঠিন হয়ে গেছেন বাবা। স্বচক্ষে মৃত্যু দেখলাম প্রথম। আমিও যেন কেমন হয়ে গেলাম। আতঙ্কিত অভিভূত আমি থরথর করে কাঁপতে লাগলাম।

ষোলো

আমার কাল সে-কাল আর এ-কালের সন্ধিক্ষণের কাল।

আমার কালের কথা স্মরণ করতে গেলেই মনে পড়ে আমার কালের সে-কালকে। ধরাশায়ী বিশালকায় ঘনপল্লব বনস্পতি। মনে ভেসে ওঠে আমার পিতার শবদেহের

কথা। শালপ্রাংশু মহাভুজ, লোহকপাটের মতো বুক, প্রশস্ত ললাট, ললাটে সারি সারি চিন্তাকুল বলীরেখা। গভীরদৃষ্টি মানুষটির জীবন্ত প্রতিচ্ছবি মনে পড়ে না। মনে পড়ে কঠিন হিমশীতল দেহ, অর্ধনিমীলিত স্থির শূন্যদৃষ্টি চোখ, নিথর হয়ে পড়ে আছেন, ধ্যানস্থ হয়ে গেছেন যেন অনন্তের ধ্যানে। এই আমার সে-কালের ছবি। তাই সে-কালকে শ্রদ্ধা করি, প্রণাম করি, তার মহিমার কাছে আমি নতমস্তক। তার ত্রুটি-বিচ্যুতি অপরাধ, তার স্খলন আমি সবই জানি আমার পৈতৃক চরিত্রের ত্রুটির মতো। আমার বাবা তাঁর দিনপঞ্জীতে তাঁর চরিত্রের কোনো দিক অনুদ্ঘাটিত রাখেননি, এবং সে-দিনলিপি আমাকেই উদ্দেশ করে লিখে গেছেন, সব জানিয়ে গেছেন ; বার বার বলে গেছেন অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে, বংশগত ঐতিহ্য-মহিমাকে অক্ষুণ্ণ অটুট রাখতে, অপূর্ণ কামনাকে পরিপূর্ণ করতে। সে ঐতিহ্য, সে মহিমা ব্রাহ্মণের। ধনীর নয়, দরিদ্রের নয়, জমিদারের নয়, প্রজার নয়, মহিমময় মানুষের। যে ত্রুটি জীবনে ছিল, তার প্রায়শ্চিত্ত করতে আদেশ দিয়ে গেছেন। তাই তো শ্রদ্ধা ছাড়া অবজ্ঞা বা ঘৃণা করতে পারি না সে-কালকে। তাই তো বলতে পারি না, সে-কাল ছিল ভ্রান্ত। কোনো ভ্রান্ত জন কি বলে?—অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করো। আমি পারিনি ; হে আমার উত্তরপুরুষ, তুমি করো।

কোনো ঘৃণ্য জন কি বলে?—জীবনে যেটুকু সত্য তাকে জীবন বিনিময়ে রক্ষা করো। হে আমার উত্তরপুরুষ, তোমার উত্তরপুরুষের জন্য এটুকু গচ্ছিত দিয়ে গেলাম তোমার কাছে।

কোনো অতৃপ্ত আত্মকেন্দ্রিক অসুস্থ মানুষ কি বলে?—আমার জীবনে যা পরিপূর্ণ হল না, হে আমার উত্তরপুরুষ, তা যেন তোমার জীবনে পূর্ণ হয়!

আমার কালের অপরার্ধ নূতন-কাল যেন আমার মা।

জ্যোতির্ময়ী—প্রসন্ন।

তিনি বলেন, আঘাতে বিচলিত হয়ো না, ক্লান্ত হয়ো না, পথ চল।

শুচিশুভ্রবস্ত্রাবৃতা মায়ের একটি কথা বলেই শেষ করব।

বাবার মৃত্যুর পরই অকস্মাৎ একদিন অনুভব করলাম—আমি নিঃসহায়, আমি সমগ্র গ্রামে উপেক্ষার পাত্র, করুণার পাত্র। আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

শারদীয়া নবমীর দিন আমার বাবা মারা গেলেন। পরদিন বিজয়া-দশমী। তারপর দিন একাদশী। একাদশীর দিন সকালে আমাদের হিন্দুসংসারে একটি অনুষ্ঠান আছে। আজও আছে। বলে 'যাত্রার সাইত'।

সম্ভবত, রামচন্দ্র বিজয়া-দশমীর দিনে রাবণ বধ করে বিজয়যাত্রা শেষ করে পরদিন প্রাতে সভানুষ্ঠান করেছিলেন। পুরস্কৃত করেছিলেন বানর-সৈন্যদের, রাক্ষসদের মার্জনা করেছিলেন, প্রসাদ বিতরণ করেছিলেন। মহাযজ্ঞ শেষে আরম্ভ হয়েছিল নবজীবন। সেই অনুকরণেই বোধ হয় এই প্রথার সৃষ্টি।

সেদিন সকালে শুভসময়ে চণ্ডীমণ্ডপে গৃহস্থকর্তা তাঁর সম্বল নিয়ে বসতেন, আজও নামমাত্র বসেন। সামনে থাকত বাক্স। বাক্সের মধ্যে আধুলি সিকি দুয়ানি

ডবলপয়সা। তখন আনি মুদ্রার সৃষ্টি হয়নি। ডবলপয়সা ছিল তামার এবং আকারে ছিল টাকার মতো বড়। প্রথমেই আমাদের গ্রাম-দেবতা ফুল্লরা দেবীর পুজক পুরোহিত ও গদিয়ান এসে প্রসাদী বিল্বপত্রের মালা গলায় দিয়ে আশীর্বাদ করে দাঁড়াতেন। কর্তা টাকা বা আধুলি বা সিকি দিয়ে প্রণাম করতেন। তারপর দুর্গা-পুজোর পুজক, পুরোহিত, পরিচারক, পাচক, ছেত্তাদার, প্রতিমাগঠনের কারিগর, ডাকসাজের মালাকার, নাপিত, বাদ্যকর, প্রতিমাবিসর্জনের বাহকদল, প্রতিমার চুল যারা তৈরি করে তারা, প্রতিমার নাকের নথ দেয় যারা তারা, আসন-অঙ্গুরী-সরবরাহকারী, ফুলবিল্বপত্র-সরবরাহকারী—সে অনেক-অনেকজন এসে তাদের প্রাপ্য নিয়ে যায়। গ্রামান্তর থেকে লাঠিয়াল আসত, তারা বিসর্জনের মিছিলে রক্ষক হিসেবে থাকত, তারা নিয়ে যেত প্রাপ্য। এর পর আসতেন চিকিৎসক, বৈদ্য, বিষবৈদ্য —অর্থাৎ সাপুড়ে, গো-বৈদ্য, চৌকিদার, দফাদার, কনস্টেবল, পোস্টাপিসের পিওন। মোদক আসত মিষ্টান্ন নিয়ে, মুদী আসত মসলা নিয়ে। জেলে আসত মাছ নিয়ে। তারা কাপড় পেত, টাকা—একটা টাকাও নিয়ে যেত, হিসেবে জমা করত। গ্রামের দাই আসত, রজক আসত, কর্মকার আসত। দু-আনা চার আনা বৃত্তি নিয়ে যেত। বাউল আসত, দরবেশ আসত, ভিক্ষুক আসত, সন্ন্যাসী আসত। সাঁওতালেরা আসত দল বেঁধে, তারা নাচত; বাঁশী মাদল বাজাত, দু-পয়সা চার পয়সা বিদায় পেত আর পেত অন্দরের দুয়ারে আঁচল ভরে মুড়ি খই মুড়কি। এ-সব এই মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত পেত। এই আসরে এসে বসত গ্রামের শিশু বালক-বালিকার দল। প্রতি আসরে একটি করে পয়সা পেত। এ হল শিশুদের বৃত্তি, এ আজও আছে। এই দিনটিতে ছেলেদের হাত পাততে কোনো বাধা নাই। লক্ষপতির সন্তানেরও নাই। আমি আমার বাবার কাছে প্রতি বার পেতাম একটি করে টাকা। তা ছাড়া সকল আসর ঘুরে পাঁচ ছ-আনা হত। সে-বার যাত্রার সাইতের আসরে আমাকেই বসিয়ে দিলে আমার বাবার শূন্য আসনে। ঠিক বুঝতে পারলাম না ব্যাপারটা। কিছুক্ষণ পরেই হল আমার ছুটি। উঠবার সময় কিন্তু আমার বৃত্তি একটি টাকা নিতে ভুললাম না। আমাকে তখন পাশের আসর থেকে ডাকলেন জ্যাঠামশাই। একটি সিকি বা কিছু যেন দিলেন। ও-পাশ থেকে ডাকলেন হিরণ্যভূষণবাবু। তিনি বোধ হয় আধুলি দিলেন। আমি কিছু বুঝতে পারলাম না এমন অভাবিত সৌভাগ্যের হেতু। একটু উৎসাহিত হয়েই অন্যান্য কর্তাদের আসরে গেলাম স্বাভাবিকভাবেই।

এক স্থানে অভাবিতভাবে সমাদৃত হলাম।

আমাকে একটা টাকা দিলেন। আমি অবাক্ হয়ে গেলাম।

আমার সঙ্গেই ছিল আমার বন্ধু ওই কর্তার ভাগিনেয়। তার হাতে দিলেন তিনি একটি সিকি। কর্তার ভাগিনেয় স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুণ্ণ হল। বললে, ওকে টাকা দিলে, আমি সিকি নেব কেন?

কর্তা কঠিন দৃষ্টিতে চেয়ে তাকে বললেন, যাও—যাও, যাও বলছি।

আমি পালিয়ে এলাম। হয়তো ভয়েই এসেছিলাম। মনে হয়তো হয়েছিল যে, আমার টাকাটাও হয়তো ফিরে দিয়ে সিকি নিতে হবে। বাইরে এসে দাঁড়িয়ে রইলাম

বন্ধুর অপেক্ষায়। সে কি পায় দেখব। যাত্রার সাইতে কে কত পায় এ নিয়ে প্রতিযোগিতা হত আমাদের মধ্যে। যে বেশি পেত, সে-ই আপন সৌভাগ্যে স্ফীত হয়ে উঠত।

হঠাৎ কানে এল ভিতর থেকে বন্ধুর কান্নার শব্দ। বন্ধু কাঁদছে। সঙ্গে সঙ্গে কানে এল, কর্তার বাড়ির কোনো কর্মচারী বন্ধুকে বলছে, ছি, কাঁদতে নাই। ছেলেমানুষ, টাকা নিয়ে কি করবে? ওর বাবা মরেছে কিনা—তাই ওকে একটা টাকা দিয়েছেন তোমার মামা। ওর হিংসে করতে নাই, ও নেহাত হতভাগা ছেলে।

সে-দিনের সে-মুহূর্তটি আমার মনের মধ্যে অক্ষয় হয়ে রয়েছে। সে যে কী হয়েছিল—তা বর্ণনা করা আজ সম্ভবপর নয়। শুধু ওই একটা কথা যেন লক্ষ কোটী হয়ে আমার পৃথিবীর আকাশ বাতাস পরিব্যাপ্ত হয়ে বেজে উঠেছিল।

হতভাগা ছেলে! হতভাগা ছেলে! হতভাগা ছেলে!

ছুটতে ছুটতে বাড়ি ফিরে এসেছিলাম।

মা আমার তখনও মাটির প্রতিমার মতো আপাদমস্তক থান কাপড়ে আবৃত করে পড়ে ছিলেন। এসে মায়ের কাছেই শুয়ে পড়েছিলাম। হাতে আর তখন টাকা-পয়সাগুলি সব ছিল না। পড়ে গেছে রাস্তায়।

মা মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, তুমি মস্ত লোক হবে। কেন হবে হতভাগা? দুঃখ করো না। ও তোমাকে তাঁরা ভালোবেসে বলেছেন।

টাকাটি ছিল না, পড়েই গিয়েছিল। বাকি সিকি দুয়ানি আধুলিগুলি মা ভিক্ষার্থীদের দিয়ে দিয়েছিলেন।

এই কারণেই এ-কালে অবজ্ঞা অবহেলা জীবনে যা এসেছে, তাই আমি পথে ফেলে দিয়ে এগিয়ে চলতেই চেষ্টা করেছি আজীবন। আমার কালের যে অংশ আমার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে, পালন করেছে আমাকে মায়ের মতো—এ হল তারই শিক্ষা। দীক্ষা আমার কালের সে-কালের কাছে।

অনন্তের ধ্যানে সমাধিস্থ, অর্ধনিমিলিত চক্ষু, হিমশীতল দেহ আমার বাবা আমার কালের অর্ধাঙ্গ—আমার জ্যোতির্ময়ী প্রদীপ্ত-দৃষ্টি শুভ্রবাসপরিহিতা তেজস্বিনী মা আমার কালের অপর অর্ধাঙ্গ; আমার জীবনে আমার কাল সাক্ষাৎ অর্ধনারীশ্বর মূর্তিতে প্রকটিত। তাই আমার সে-কাল আর এ-কালের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নাই। চির-কল্যাণের একটি ধারা তার মধ্যে আমি দেখতে পাই। কোনোকালে ওপারে ফুটেছে ফুল—কোনোকালে এ-পারে ফুটেছে ফুল। আমি সকল কালের সকল ফুলের মালা গেঁথেই পরাতে চাই মহাকালের গলায়। ওই অর্ধনারীশ্বর মূর্তি আমার কালের রূপ ভেদ করেই একদা আমাকে দেখা দেবেন। সে-দিন আমার মাল্য-রচনা সমাপ্ত হবে। বলব, নাও আমার মালা। শেষ করে দিলাম মালা-গাঁথার পালা। আমি হারিয়ে যাই তোমার মধ্যে। তোমার জয় হোক—জয় হোক—জয় হোক!

———

কৈশোর-স্মৃতি

এক

আমার স্বগ্রামবাসী এক প্রৌঢ়ের কৈশোর-স্মৃতি লিখে পাঠিয়েছেন।

শাস্ত্রমতে এগার থেকে পনের বছর পর্যন্ত পাঁচ বছর হল কৈশোর। ষোল বছর বয়স হলেই শাস্ত্রমতে সে যুবক হয়ে যায়। অর্থাৎ বাল্য এবং যৌবনের মধ্যবর্তী কাল হল কৈশোর। ঠিক যেন ভোরবেলার তন্দ্রাচ্ছন্ন কালের মতো কাল। বাইরের পাখির ডাক, ফুলের গন্ধ, বাতাসের স্পর্শ, আলোর আভাস, প্রতিটি ইন্দ্রিয়ে সাড়া তুলে তাকে জাগিয়ে তোলে ধীরে ধীরে। বলে- ওঠ, জাগ, দেখ বাইরের পৃথিবী কত সুন্দর, কত কর্মমুখর, ঘরের কোণ ছেড়ে বাইরে এস। জেগে উঠে বাইরে এসে পথে নামা আর কৈশোর শেষ হয়ে যৌবনের জাগরণ হওয়াও ঠিক এক রকম।

আমাদের স্কুলে সংস্কৃত পড়াতেন হেডপণ্ডিত মশায়। তিনি বলতেন—'বাবা, কৈশোর কাকে বলে জানিস? গরুর বাছুরের শিং ওঠা দেখেছিস? শিং দুটো দেখা দেয় অথচ মাথা ছাড়িয়ে ওঠে না, গুঁতোবার ঠিক শক্তি জন্মায় না অথচ অনবরত সে গুঁতোতে চায়। কৈশোর হল ঠিক তাই।' রসিক লোক ছিলেন তিনি। কিন্তু কথাটা ঠিক বলেছিলেন। ফুল ধরাবার আগে চারাগাছ সতেজ হয়ে বাড়তে শুরু করে। আলোর দিকে মাথা তুলে দাঁড়ায়। গাছের কৈশোর ওই সময়টুকু।

সে হিসাবে আমাদের দেশে কৈশোর আসে শাস্ত্র-নির্দিষ্ট সময়ের পরেও কিছু পরে। অন্ততঃ আমাদের কালে আসত। কালটা ছিল এখন হতে চল্লিশ বছর আগে। দেশে এখন পরাধীনতার শীত ঋতু বর্তমান। রাত্রি ছিল বড়, দিন ছিল ছোট, সূর্যোদয় হত বিলম্বে। চোদ্দ-পনের বছরের আগে তখন নবীনদের মনে ভবিষ্যতের আহ্বান আসত না। তখন ইংরেজি ১৯১১-১২ সাল ; একদিন সে দিনের কথা আমার মনে অনির্বাণ প্রদীপের শিখার মতো অক্ষয় হয়ে আছে, যখন তখন সে স্মৃতি আমার মনে জেগে ওঠে। সেদিন রাত্রি তখন প্রায় বারোটা, হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল বহু মানুষের চীৎকারে। আগুন—আগুন—আগুন!

আমার দেশ বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রামে। আমাদের ও অঞ্চলে মাটির দেওয়াল, খড়ের চাল। মাটির দেওয়ালের ঘর পাকাবাড়ির মতো পোক্ত, এক একখানা ঘর একশো-দেড়শো বছর কাটিয়ে দেয়। চাল দেড়ফুট দু' ফুট পুরু করে খড় দিয়ে ছাওয়ানো। চাল কাটামোতে পাকা তালের কড়ি-বর্গা, চাল-কাঠ, তার সঙ্গে দেশী জাম অর্জুন কাঠের কত সযত্ন কারুকার্য করা কাঠ লাগানো থাকে। আগুন লাগলে আগুনের অগ্নিমাদ্য সেরে যায়। খাদ্য শুধু সুস্বাদুই নয়, পরিমাণেও সে পায়

ভূরিভোজন। আমাদের দেশের বসতি অত্যন্ত ঘন, চালে চালে প্রায় ঠেকে থাকে, কলকাতার বাড়ির ছাদের মতো এ-চাল থেকে ও-চাল করে যাওয়া চলে! হনুমানের দল মাঠ থেকে গ্রামের একপ্রান্তে একটা চালে উঠে এ প্রান্তে এসে মাটিতে নেমে গ্রামান্তরে চলে যায়। কাজেই 'আগুন' শব্দ শুনলে গোটা গ্রাম চকিত হয়ে উঠে। আমাদের গ্রামে সমাজ-সেবক-সমিতি নামে একটি সমিতি ছিল, নানা কাজের মধ্যে নেভানোর কাজ ছিল সবচেয়ে বড় কাজগুলির একটি; বালতি ছিল পঁচিশটা। 'আগুন' শব্দ শুনলেই ছেলের দল ছুটে গিয়ে সমিতির বাড়ির দরজায় জমত। সেখান থেকে ছুটত বালতি নিয়ে। নিয়ম ছিল ছেলেরা জল তুলবে, তার চেয়ে বড় যারা তারা সেই জল তুলে ধরবে, আর আগুন-ধরা চালের উপর উঠে সেই জল নিয়ে আগুনের সঙ্গে লড়াই করবে অগ্রবর্তীরা প্রধানেরা। আরও নিয়ম ছিল, ছোটরা গ্রামান্তরে যাবে না। তাদের কাজ গ্রামের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। সেদিন রাতে ঘুম ভেঙে উঠে বাড়ির ছাদে উঠে দেখলাম, আকাশ লাল হয়ে উঠেছে উত্তর দিকে। গ্রাম তখন জেগেছে, পাকা বাড়িগুলিব ছাদে ছাদে কথা চলছে। কোথায় আগুন? বুঝতে পারছি না, বোধহয় মহুগ্রামে! ওঃ, উকো উড়ছে দেখ! দেখেছ! চৈত্রমাস। চাল একেবারে শুকনো হয়ে আছে! ওদিকে আকাশে জ্বলন্ত খড়ের কুটি আগুনের শিখার বেগে হাউইয়ের মতো ছটকে উড়ে আকাশময় ছড়িয়ে জ্বলতে জ্বলতে ভেসে চলেছে। কিছুদূর গিয়ে ঝড়ে পড়েছে। অধিকাংশই আকাশে নিভে যাচ্ছে অবশ্য। কিন্তু জ্বলন্ত অবস্থায় নেমেও আসছে অনেক স্ফুলিঙ্গ। দূর থেকে ভেসে আসছে বিপন্ন মানুষের আর্ত চিৎকার। মহুগ্রাম আমাদের গ্রামের উত্তরে। তখন আমি দিনের বেলা গ্রামান্তরে যেতে পাই, রাত্রে যাবার হুকুম পাইনি। রাত্রে যেতে সাহসও ছিল না তখন। অন্ততঃ এই দিন। এই ক্ষণটির আগে সাহস ছিল না। রাত্রে ওই আকাশের লাল ছটার মুক্তপথ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল যেন। সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আর্তকলরব আমার মনে যেন একটা অলঙ্ঘনীয় আহ্বান এনে দিল। ডাক সেদিন আমি যেন স্পষ্ট শুনেছিলাম। হঠাৎ বেরিয়ে পড়লাম। ছুটে নীচে নেমে এলাম। পিছনে মা-পিসিমা বিস্মিত শঙ্কিত হয়ে আমায় ডাকলেন, ওরে—ওরে! আমি শুনতে পেয়েছিলাম কিনা মনে নাই, কিন্তু বারেকের জন্য ক্ষণেকের জন্যও দাঁড়াইনি। ছুটেছিলাম ছুটেছিলাম। সমিতির বাড়ির দোরে কখন পেঁচৈছিলাম ঠিক স্মরণ করতে পারি না, তবে গিয়েছিলাম। কারণ মনে পড়েছে গ্রামান্তরে জ্বলন্ত ঘরের সামনে যখন দাঁড়িয়েছিলাম, তখন আমার হাতে বালতি ছিল। তিন-চারখানা ঘরে তখন আগুন লেগেছে। চাষীর গ্রাম। চাষীদের মেয়েরা মাটির হাঁড়ি ভরে জল তুলে আনছে। একটি মেয়ের কাঁধ থেকে একটা জলসুদ্ধ কলসী ফেঁসে পড়ে গেল। আমি তারই হাতে দিলাম বালতিটা। এইটে—এইটেতে আন জল।

খালি হাতে আমি চাইলাম জ্বলন্ত চালের দিকে; চৈত্র মাসের শুকনো খড় জ্বলছে—হাওয়ায় মধ্যে মধ্যে আগুনের শিখা লম্বা হয়ে যেন শুয়ে পড়ছে, মুহূর্তে সামনের খানিকটা খড় জ্বলে উঠছে। আগুন যেন লাল ছুটন্ত ঘোড়ার মতো ছুটে এগিয়ে আসছে। কি যে হল আমার, আমি উঠে পড়লাম মই বেয়ে চালের উপর।

আমার কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করছিল, গরম হয়ে উঠছিল, এই ছুটন্ত জ্বলন্ত লাল ঘোড়াটার মুখের সামনে দাঁড়িয়ে ওকে আঘাত করব, রুখব জলের ধারা ঢেলে। আর টেনে খসিয়ে নেব ওর ছুটন্ত ক্ষুরের সম্মুখের সুগম পথকে, অর্থাৎ ছাড়িয়ে দেব খড় বাঁখারি বাঁশ। ওকে থমকে দাঁড়াতে হবে। কতটা আমি পেরেছিলাম জানি না, তবে সমবেত চেষ্টায় আগুনকে দাঁড়াতে হল থমকে, তারপর নিভল। নিভল যখন, তখন রাত্রি তিনটে। আমার গায়ে অনেক জায়গায় আগুনের আঁচে ফোস্কা পড়েছিল। কেটেও গিয়েছিল কয়েকটা জায়গায়। বাঁশ ছাড়াতে খড় টানতে দড়ি ছিঁড়তে হাত আর পায়ে বেশ আঘাত পেয়েছিলাম। সেই আমার কৈশোর জাগরণ, সেদিন বুঝতে পারিনি—আজ পারি। তবে পরের দিন থেকে আমি যে পাল্টে গিয়েছিলাম এটা অনুভব করতে পারতাম। মনে হত বড় হয়েছি আমি। সত্যই বড় হয়েছি। পদক্ষেপে সেই মনের কথাটুকু যেন ঘোষণা করে চলতাম। আশেপাশের লোকের মৃদু কথাও শুনতে পেতাম—ছেলেটা ডাঁটো হয়ে উঠল দেখতে দেখতে।

তখন পৃথিবী এল তার আহ্বান নিয়ে।

১৯১১-১২ সাল।

তখন বাংলাদেশে ছেলেদের কৈশোরের কল্পনায় সার্থক জীবন ভাবতে গেলেই তিনটি স্বর্ণসিংহাসন ভেসে উঠত। একটিতে আঙুল দেখিয়ে দাঁড়াতেন তেজোদৃপ্ত এক সন্ন্যাসী মাথায় গৈরিক পাগড়ি, গায়ে গেরুয়া আলখাল্লা, আয়ত অদ্ভুত দুটি চোখ। বলতেন—জানিও, জন্ম হইতেই তুমি মহামায়ার উদ্দেশে বলি প্রদত্ত। আত্ম-বলি দিয়া এই সিংহাসনের অধিকারী হও। সে সন্ন্যাসী—বিবেকানন্দ।

আর একটি সিংহাসনের পাশে দাঁড়াতেন, আর এক তেজোদৃপ্ত পুরুষ? মাথায় পাগড়ি, গায়ে চাপকান, দৃঢ়বদ্ধ অদ্ভুত দুটি ঠোঁট, তেমনি ললাট, তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। তাঁর হাতে লেখনী, কুক্ষিতলে বই। নাম পড়া যেত বইগুলির। কপালকুণ্ডলা, দুর্গেশনন্দিনী, আনন্দমঠ, রাজসিংহ, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, কমলাকান্তের দপ্তর, আরও অনেক—অনেক। এই বইগুলি আমাদের বাড়িতে ছিল, আমি পড়েছিলাম। বাকি বইগুলি তখনও পড়িনি। তিনি বলতেন, আমার পিছনে এস। গান গেয়ে এস পৃথিবীর দেশে দেশে বাংলাদেশের বেদনার গান। বলি ও-সুখের কথায় বাঙালীর অধিকার নাই। কিন্তু দুঃখের কথায় আছে। বঙ্কিমচন্দ্র বলতেন, সার্থক হলে এ সিংহাসনে তুমি বসতে পাবে।

আর একটি সিংহাসনের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতেন একটি পনের-ষোল বছরের কিশোর। দেবদূতের মতো কল্পনার জন সে। তার ছবি কখনও দেখিনি, তবে বাউলদের মুখে তার গান শুনেছি।

"বিদায় দে মা ফিরে আসি
হাসি হাসি পরব ফাঁসী দেখবে ভারতবাসী।"

ক্ষুদিরাম আঙুল দেখিয়ে বলতেন, এ সিংহাসনের মূল্য গলায় ফাঁসী পরে দিতে হবে। বন্দেমাতরম্।

এই তখনকার দিন।

হয় বিবেকানন্দের মতো দিগ্বিজয়ী সন্ন্যাসী, নয় বঙ্কিমের আদর্শে সাহিত্যিক, নয় ক্ষুদিরামের আদর্শে শহীদ হওয়াই বাঙালীর ছেলের কৈশোরের স্বপ্ন। আরও ছিল বই কি।

ছিল মর্তের কুশন-আঁটা রুপোর চেয়ার।

মোহনবাগান ছিল। মোহনবাগান সেবার আই. এফ. এ. শীল্ড পেয়েছে। মনে আছে, এগারোজন খেলোয়াড়ের শীল্ড-বল নিয়ে গ্রুপ-ফটোর ব্লক ছাপিয়ে বাংলাদেশের ক্লাবে ক্লাবে পাঠানো হয়েছিল। আমাদের হাফ-ইয়ারলি একজামিন হচ্ছে; পরীক্ষা দিচ্ছি, আমাদের হেডমাস্টার মশাই হঠাৎ এসে সেই ছবিটা আমাকে দেখিয়ে বললেন, দেখ, এরা গোরাদের খেলায় হারিয়ে শীল্ড নিয়েছে। পারবি এমনি খেলতে?

খেলাতেও আমার ঝোঁক ছিল। কি শীত কি গ্রীষ্ম, ছুটির পর বীরভূমের অবাধ প্রান্তরে, খেলার মাঠে বল নিয়ে ছুটতাম, বল যতক্ষণ দেখা যেত ততক্ষণ খেলা চলত। মাত্র দুজন খেলোয়াড়, আমি আর একজন। তাও চলেছে খেলা—ধাঁই—ধাঁই, আমি এদিকে, বীরেশ্বর বলে একটি ছেলে সে ওদিকে। বীরেশ্বর আজও খেলতে পারে বোধ হয়। কালো কষ্টি পাথরের মতো শক্ত শরীর তার। খেলাতেও তেমনি পারদর্শিতা ছিল। সুযোগ পেলে সে বাংলাদেশের একজন খ্যাতনামা খেলোয়াড় হতে পারত। ফুটবল সিজনে নিত্য তার ছবি উঠত কাগজে। আমার সাধ ছিল, আমি হব শিব ভাদুড়ীর মত লেফট আউট।

আরও একটা ছিল গদি-আঁটা চেয়ার। সে ছিল অভিনেতার আসন। শখের থিয়েটারের মারফতে ওই আসনটাকে তুলে ধরা হয়েছিল, নইলে পেশাদারী থিয়েটারে যাবার কথা মনে থাকলেও কেউ উচ্চারণ করতে পারত না। তবে শখের থিয়েটারে নাম কেনার আকাঙ্ক্ষা কিশোর মনের কোণে দাঁড়িয়ে হাতছানি দিত। আমাদের লাভ-পুরের শখের থিয়েটার সত্য সত্যই ভালো থিয়েটার ছিল। পাকা স্টেজ, প্রচুর সাজ-সরঞ্জাম, সত্যকারের অভিনয় প্রতিভা—সবই ছিল। স্বর্গীয় নাট্যকার নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন এই আয়োজনের পুরোধা। তিনি প্রতিভাশালী অভিনেতা ছিলেন। নাটক লিখে, অভিনয় করে, সাহিত্য ও নাট্য চর্চার একটি অপরূপ পাদ-পীঠে পরিণত করেছিলেন আমাদের গ্রামকে। এই প্রসঙ্গে ছোট একটি গল্প বলি। কলকাতা থেকে খাস কলকাত্তাই একদল বরযাত্রী গিয়েছিলেন আমাদের গ্রামে। মেয়ে আমাদের গ্রামের। ধনীর কন্যা এবং সাধের কন্যা। তাই আমাদের শখের রঙ্গমঞ্চ অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। বরযাত্রীরা হেসে বললেন—রাত্রি জেগে অভিনয় দেখার দায় থেকে অব্যাহতি দিতে হবে। অনেক বিনয়ের পর স্থির হল, এক অঙ্ক দেখবেন। বিবাহ শেষ রাত্রে। বিবাহের পরদিন অভিনয়। সেজন্য থাকতে হল তাঁদের। বিবাহের দিন তাঁরা খেয়েদেয়ে শুয়েছেন, আমি গিয়েছি পান নিয়ে। ঘরে ঢুকতেই শুনলাম, একজন বলছেন—আজ যে যে গোলমাল করে ঘুমোতে দেবে না, কাল তাকে

সমস্ত রাত্রি থিয়েটার দেখার সাজা নিতে হবে। অর্থাৎ ওখানে থিয়েটার দেখা, আর কুইনিন মিক্সচার একটু একটু করে খাওয়া একই রকম ব্যাপার। আমি যত পেলাম লজ্জা তত হল দুঃখ। পরের দিন তাঁরা থিয়েটার দেখতে বসলেন।—গোড়া থেকেই গোল কর না গোল কর না করে গোলমাল শুরু করলেন। অভিনয় আরম্ভ হল। নির্মলশিববাবুর বীররাজা নাটক। সেখানি তখনও পাণ্ডুলিপি, কলকাতার রঙ্গমঞ্চে তখনও অভিনয় হয়নি, ছাপাও হয়নি। প্রথম দৃশ্য অভিনীত হতে হতে কলকাতার বাবুরা ভ্রূ কুঞ্চিত করে চুপ করলেন। নিজেদের মধ্যে গা টেপাটিপি শুরু করলেন। যার অর্থ হল, এ-কি হে! এরকম তো কথা ছিল না। এ যে ধুকড়ির মধ্যে খাসা চাল। একেবারে দাদখানি।

আমাদের গ্রামের একজন রসিক বসে কথাটা শুনেছিলেন। তিনি প্রথম দৃশ্য শেষ হতেই চেঁচিয়ে উঠলেন—গোবিন্দ ভোগ! গোবিন্দ ভোগ! অর্থাৎ দাদখানি চালটা কলকাতার; এখানকার ভালো চাল আমাদের গোবিন্দ ভোগ। কলকাতার বাবুরা রাত্রি তিনটা পর্যন্ত অভিনয় শেষ দেখে তবে উঠেছিলেন।

আমার কৈশোরে এই পাঁচখানি আসনের হাতছানিই আমাকে উতলা করেছিল। দু-এক বছর যেতেই সেবা সমিতির সম্পাদক হলাম। আজও সে স্মৃতি মনে জাগলে ক্ষণিকের জন্যও উদাস হয়ে পড়ে আমার সমস্ত সত্তা। মনে পড়ে সেই সেই পুণ্য সাধনার স্বাদ। মনে পড়ে, যে পীড়িতের, যে আর্তের সেবা করতাম,—তার চোখের সে দৃষ্টি, যে দৃষ্টিতে থাকত বিধাতার সস্নেহ আশীর্বাদ। একবার কলেরা মহামারীর আকারে আমাদের অঞ্চলে দেখা দিয়েছিল। কলকাতা থেকে স্বাস্থ্য বিভাগের বড় কর্তা বেণ্টলি সাহেব গিয়েছিলেন একদল ভলোণ্টিয়ার নিয়ে। তখন আমি ছেলেদের নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি। বেণ্টলি সাহেব আমাকে তাঁর নিজের ওয়াটার প্রুফটি উপহার দিয়েছিলেন। আমার উপন্যাস ধাত্রীদেবতার মধ্যে এই মহামারীর এবং আমার সে-সময়ের ভাব ফুটে উঠেছে।

সঙ্গে সঙ্গে চলত সাহিত্য সাধনা। লিখতাম কবিতাই বেশী। নাটকও লিখতাম। এবং ছাদের উপর সিন হিসেবে নানা রঙের গায়ের র‍্যাপার টাঙিয়ে অভিনয় করতাম। পরবর্তী জীবনে অভিনয় করেছি। অভিনয়ের জন্য সুখ্যাতি পেয়েছি। নিজের রোগা চেহারার জন্য রঙ্গমঞ্চে নামতে আজ লজ্জা পাই, নইলে হয় তো রঙ্গ-মঞ্চে অন্ততঃ এখানকার শখের অভিনয়ে অভিনয় করতাম। কিছুদিন আগে সাহিত্যিকেরা রবীন্দ্রস্মৃতি সমিতির তরফ থেকে অভিনয় করেছিলেন। তাঁদের জেদে শেষ পর্যন্ত একটি চাকরের ভূমিকা বেছে নিয়েছিলাম। অভিনয় দেখে তারিফ করে আমাদের এক সাহিত্যিক দাদা প্রেক্ষা-গৃহ থেকে হেঁকে বলেছিলেন—কি হলে এমন চাকরটি পাওয়া যায়? বলি ওহে, মাইনে নেবে কত?

তারপর শুরু করেছিলাম গল্প লেখা, উপন্যাস লেখা। তখন আমার বয়স মধ্যযৌবনে। বত্রিশ বছর পার হয়ে গেছে। মধ্যে সাহিত্য-সাধনার একটা দীর্ঘ ছেদের পর।

এই দীর্ঘ ছেদটা শহীদ হবার তপস্যায় কেটেছিল আমার। এ তপস্যা শুরু

হয়েছিল কৈশোরেই। পনের-ষোল বছর বয়সে এসে পড়েছিলাম বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে। পুরো বিপ্লবী হইনি তবে তাঁদের জানার সৌভাগ্য হয়েছিল। ম্যাট্রিক পাস করেছিলাম ষোল বছর বয়সে। কলকাতায় সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হলাম। কিছুদিন যেতে-না-যেতে দলের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত হয়ে গেল। তখন প্রথম মহাযুদ্ধ চলেছে। ওদিকে রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটি ছিল আমার পরম প্রিয়। আমার আত্মার বাণী। কবিতা লিখতাম। বিপ্লবের পথে অগ্রসর হতে মনে মনে বলতাম, "ওরে তুই ওঠ্ আজি, আগুন লেগেছে কোথা?" গান গাইতে পারি না, তবুও তখন গাইতাম—"একলা চল রে।"

এর মধ্যেও কিন্তু মোহনবাগানের খেলা দেখেছি। অনেক কষ্টে অনেক সাহস সঞ্চয় করে ভাদুড়ী ভাই দুজনের—সেকালে বলত ভাদুড়ী ব্রাদার্স; তাদের কাছে দাঁড়িয়ে দেখেছি। মনে আছে, শিব ভাদুড়ীর জামাখানি সন্তর্পণে স্পর্শ করে মনে মনে গভীর আনন্দ পেয়েছিলাম।

এ গল্প আমার ফুটবল খেলার সঙ্গী বীরেশ্বরের কাছে করেছিলাম, অনেক বাড়িয়েও বলেছিলাম। সেদিন আমরা ছিলাম তিনজন, বীরেশ্বর ছাড়া আর একজন, তার নাম কালিদাস দত্ত। শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তের নৌবিহারের মতো আমরা লুকিয়ে নদীর ঘাটে পারাপারের নৌকা খুলে নিয়ে ভেসে চলেছিলাম। কালিদাস হাল ধরেছিল, মধ্যে মধ্যে বুকনি কাটছিল গুরুগম্ভীর ভাষায়, ওটা তার বিলাস ছিল। আজও মনে আছে সে কথাগুলি: হঠাৎ বলে উঠল—সাবধান, দোদুল্যমান। অর্থাৎ নৌকা দুলছে। আমি ভাদুড়ী ভাইদের কথায় বলেছিলাম—এই লম্বা, কালিদাস বলেছিল—লম্বমান! মান দিয়ে কথা বলে বাক্যকে গম্ভীর করত সে। দোদুল্যমান, ঝোঝুল্যমান, রোরুদ্যমান, প্রকম্পমান, শেষ পর্যন্ত বোধুর্ক্যমান ছোছুট্যমান পর্যন্ত।

তখন পুজোর ছুটি। বাড়ি এসে দেখলাম একজন লোক বসে আছে। লোকটি ছিল সাধারণ ভদ্র আগন্তুকের বেশে পুলিসের লোক। আমাকে অনুসরণ করেই সেখানে গিয়েছিল। বিদেশী বিপন্ন পরিচয়ে আমাদের বাড়িতেই রইল সেদিন। কৈশোরের স্বপ্নভরা মন—তাকে আশ্রয় দিয়ে কত কথা বলেছিলাম মনের আবেগে! তাকে আমার কবিতা শুনিয়েছিলাম। সেবারকার দুর্গাপুজা সম্বন্ধে কবিতা। একটা লাইন আজও মনে আছে—

"মাটির হাতে আর খেলার প্রহরণ
জননী মিছে তুমি ধরো না ধরো না।"

তারিফ তিনি খুব করেছিলেন। কিন্তু কলকাতায় ফিরবামাত্রই আমায় পুলিসে ধরলে, সঙ্গে তিনিই ছিলেন। পূর্ণ লাহিড়ীমশাই ছিলেন, আমার পিতৃবন্ধু, তিনি আমাকে বুঝিয়ে ব্যবস্থা করলেন—বাড়িতে বন্দীত্বের (Home internment)।

শৃঙ্খলিত হল আমার কৈশোর আমার সঙ্গে। তবু সে সেই শিকল টেনে নির্ভয়ে এগিয়ে চলল—এগিয়ে চলল যৌবনের দিকে। ১৯২১-এর দিকে। ১৯২৮-এর দিকে।

১৯২১-এ অসহযোগ আন্দোলন। ১৯২৮ সালে সাহিত্যসাধনাকে আমার জীবন হিসাবে গ্রহণের সূত্রপাত।

কৈশোরের সোনার আসনের স্বপ্ন আজও শেষ হয়নি। কারুরই হয় না। ওই স্বপ্নই চলে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত চলে। স্বপ্ন চলে, সঙ্গে সঙ্গে আমি চলি, চলি আর নিজেকেই বলি—

"ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর
এমনি অন্ধ বন্ধ করো না পাখা।"

দুই

ইংরিজি ১৯১১-১২ সাল। আমার বয়স তখন চোদ্দ-পনেরো। ইংরেজি ১৮৯৮ সালে আমার জন্ম।

ওই আগুন লাগা রাত্রে আমার কৈশোর জাগল। বাড়ি ফিরে এলাম পোড়া খড় এবং কাঠের কালি মেখে; গায়ে ফোস্কা পড়েছে, কয়েক জায়গা কেটে গিয়েছে; শেষ রাত্রে তখনও মা-পিসিমা জেগে বসে রয়েছেন আমার জন্যে; আমি এসে তাঁদের সামনে দাঁড়ালাম। আজও স্পষ্ট মনে পড়ছে, চোখের সামনে ভাসছে যেন তাঁদের চোখের বিস্ময় জ্বলজ্বল দৃষ্টি! যেন চারটি উজ্জ্বল দীপশিখা। আমার মনে আত্মপ্রত্যয়, তাঁদের চোখে বিস্ময়। কাপড়ে কালি—সর্বাঙ্গে কালি—দেহের ক্ষত থেকে রক্ত তখনও গড়াচ্ছে; পোড়া জায়গাগুলি কালো হয়ে উঠেছে, তবু তাঁরা আহা-উহু বলে সমবেদনা প্রকাশ করবার মতো ভাষা খুঁজে পেলেন না। চিহ্ন থেকে আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ার দুঃসাহসিকতার পরিচয় পেয়েও, শঙ্কা প্রকাশ করে তিরস্কার করতে পারলেন না। আমারও মনে এল না কোন প্রকার অপরাধ-বোধের একবিন্দু সংকোচ। জীবনে নিরপরাধ বা অপরাধের সঙ্গে সংস্রবহীন অসম-সাহসিকতার মধ্যে অন্যায়বোধ নেই কিন্তু অনুশোচনাবোধ আছে। সে বোধ অপরাধবোধের চেয়ে কম পীড়া দেয় না। সে বোধ কোন পীড়া বা লজ্জা দেয়নি সেদিন। বিজয়ী বীরের মতো দাঁড়িয়েছিলাম তাঁদের সম্মুখে। সে রাত্রে স্নান করিনি, সেই কালি মেখেই বাকী রাত্রিটা শুয়েছিলাম।

যে রকম ঘরের ছেলে আমি, এবং তখনও আমাদের দেশে যে ধারা-ধরন প্রচলিত, তাতে এই ভাবে আমার কৈশোরের জাগরণ একটু বিচিত্র। তখনও আমাদের দেশের প্রচলিত ধারায় আমাদের মতো ছেলেরা যাঁরা যুবক তাঁরা নিজের ঘরে আগুন লাগলেও পরিচ্ছন্ন ঢিলেঢালা পোশাক একটু-আধটু এঁটেসেঁটে নিয়ে নিচে দাঁড়িয়ে সাধারণ জনগণকে আগুন নেভাতে হুকুম দেন। যাঁরা নেভাবার কাজে ইতিমধ্যেই রত হয়েছে তাদের নির্দেশ দেন—এই কর, ওই কর! ওইখানে জল দে! জল আন! এই, দাঁড়িয়ে করছিস কি! জল আন! রাখ, গায়ের কাপড় রাখ!

অর্থাৎ জন্মগত অধিকারে অশ্বারোহী বা রথী সেনাপতি তাঁরা, দৈবক্রমে পায়ের

নিচের ঘোড়া মরে গেলে বা রথখানি চূর্ণ-বিচূর্ণ হলে মাটিতে দাঁড়িয়ে তলোয়ার ধরেন না, সেটা মর্যাদায় বাধে। এইটাই হল তখনকার প্রাচীন ধারা-ধরনের ধারাবাহিকতার স্বরূপ এবং সে ধারাবাহিকতা তখনও ক্ষুণ্ণ হয়নি। উনিশশো পাঁচ সাল-এর ছ' সাত বৎসর পূর্বে নূতন এক যুগের সূচনা করেছে। আমরা সেই কালের বালক বলেই বোধ হয় এমনটা সম্ভবপর হল। আরও বোধ হয় একটা কারণ ছিল। বাল্যেই পিতৃহীন হয়েছিলাম, উনিশশো ছ সালে আট বছর বয়সে আমার মাথার উপরের বাবার স্নেহচ্ছায়া তাঁর দেহপাতের সঙ্গেই বিলুপ্ত হয়েছিল। তার ফলে আমাদের লাভপুরের প্রতিষ্ঠাদ্বন্দ্ব-জর্জর সমাজের অনেক জর্জরতা আমাকে আক্রমণ করেছিল। আমাকেও করেছিল, আমাদের বংশের এই আভিজাত্যের ধারাকেও আক্রমণ করেছিল। তখন সামান্য বালকসুলভ চাপল্য অথবা ত্রুটির জন্য আমার উপর বাক্যবাণ বর্ষিত হতে শুরু হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে অকারণেও বাক্যবাণ বর্ষিত হত। এর কতকগুলি আদিম মানুষের রচিত গুহাচিত্রের মতো আমার মনে অক্ষয় হয়ে আছে।

তখন বোধ করি আমার বয়স এগারো কি বারো। ইস্কুলে প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন হবে, প্রাইজ পাব ক্লাশে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছি বলে। প্রাইজ উপলক্ষে আবৃত্তি করবার জন্যে আমাকে ও লক্ষ্মীনারায়ণকে দেওয়া হয়েছে স্বর্গীয়া কামিনী রায়ের একলব্য নাটকের খানিকটা অংশ। আমি একলব্য, লক্ষ্মীনারায়ণ দ্রোণ। লক্ষ্মীনারায়ণ বাল্যজীবন-ভাগ্যে আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবান। স্বর্গীয় যাদবলালবাবুর দৌহিত্র, তার মামারাই তখন গ্রামের প্রধান। তার মেজমামা স্বর্গীয় অতুলশিববাবুই তখন ইস্কুলের সেক্রেটারী তাঁর বাপ শ্বশুরকুলের সহায়তায় নিজের উদ্যমকে কল্পনাতীত সার্থকতায় সফল করে তুলেছেন, সে সফলতা তখনও গতিশীল। সফলতা সফলতার দিকে এগিয়ে চলেছে, তার উপর নারায়ণ লেখাপড়াতেও ভালো ছেলে। আমার চেয়ে এক ক্লাশ নিচে পড়ে, ক্লাশের প্রথম ছেলে সে। সমাদরের অজস্রতায় তার জীবন তখন নির্মেঘ শরতাকাশে পূর্ণিমা রাত্রির সূর্যপ্রসাদ-ধন্য পূর্ণচন্দ্রের মতো। স্বভাবেও সে ওই চাঁদের মতো মধুর এবং স্নিগ্ধ। পরিণত বয়সে হিসেব করে দেখেছি, সে হিসেবে মনে হয়েছে যে, বাল্যের ওই সমাদরের অজস্রতাই তার চরিত্রে এ প্রসন্ন মাধুর্য দিয়ে গেছে। থাক সে কথা, যে কথা বলছিলাম তাই বলি। নারাণ ছিল আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু; যত প্রীতি তত ঈর্ষ্যা—জীবনের যত মধু তত বিষ তার সবচেয়ে বেশী অংশটা নেয় সে। তার ও দুটোর বেশি অংশ নিই আমি। বিষ পান করেও মোহ ঘোচে না, বাড়ে; আমরা দুজনে ইস্কুলে, ইস্কুলের বাইরে ঘরে বা মাঠে গিয়ে এই আবৃত্তি অভ্যাস করতে শুরু করলাম। এর আগে পর্যন্ত বরাবরই আমরা দুজনে একসঙ্গে আবৃত্তি করেছি। প্রথম বৎসর আমরা দুজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সুরে সুর মিলিয়ে হাত জোড় করে একসঙ্গে আবৃত্তি করেছি—

"সকলে দাঁড়াই এস সারি সারি হয়ে,
ম্যাজিস্ট্রেট এসেছেন অদ্য বিদ্যালয়ে।"

তারপর প্রতি বৎসরেই আমরা একসঙ্গে সুরে সুর মিলিয়ে কবিতা আবৃত্তি করেছি এবং সবচেয়ে বেশি প্রশংসা পেয়েছি। এবার প্রথম আমরা নাটকের অংশ আবৃত্তি করব। আমাদের গ্রামে তখন শখের অভিনয়ের খুব সমারোহ। অভিনয় দেখে আমরা আবৃত্তির সূত্র পেয়েছি। আমাদের উৎসাহ স্বাভাবিক ভাবেই প্রবল। দুজনে পরামর্শ করে নিজেদের পোশাক ঠিক করে নিলাম। আমি একলব্য, ব্যাধের ছেলে, তপস্বী। সুতরাং আমি পরব মোটা কাপড় ও গায়ে নেব একখানি চাদর: নারাণ পরবে থান এবং সাদা জামা। এর পর ঠিক হল নারাণ নাট্যসম্প্রদায়ের সাজ-ঘর থেকে দুটি ধনুর্বাণ ও তূণীর নিয়ে আসবে। একথা অবশ্য শিক্ষকদের জানানো হল না। কারণ সে আমল ছিল এমন যে ইস্কুলের ছেলের হাতে খেলার অস্ত্র দেখলেও রাজপুরুষেরা এবং শিক্ষক মহাশয়রা চমকে উঠতেন। এ ক্ষেত্রে রাজপুরুষেরা ছিলেন সূর্য এবং শিক্ষক মহাশয়েরা ছিলেন বালির স্তূপ। স্থির হল, একেবারে আবৃত্তির সময়টিতে আমরা বেঞ্চের তলায় লুকানো যাত্রার দলের ধনুর্বাণ নিয়ে বের হব। তাই-ই হলাম। শুধু মিলল না এক জায়গায়, দেখলাম নারাণ কোট-প্যাণ্ট এবং পাগড়ি পরে এসেছে। নারাণ ক্ষুণ্ণ মনেই বললে—মামারা বললেন, এই পরে যাও। যাই হোক—প্রথমেই আমি একলব্য হিসেবে চাদর গায়ে তীর-ধনুক হাতে সভামণ্ডপের ছোট আঙিনার মতো স্থানটুকুতে এসে হাঁটুগেড়ে বসলাম। তারপর নারাণ এল; তারও পিঠে ধনুর্বাণ। আরম্ভ হল আবৃত্তি। নিস্তব্ধ সভামণ্ডপ। এগারো-বারো বছরের দুটি ছেলের পক্ষে এমন প্রাণবন্ত আবৃত্তি সত্যই বিস্ময়ের কথা। আবৃত্তি শেষ হল। সভামণ্ডপ হাততালিতে এবং প্রশংসাগুঞ্জনে ভরে গেল। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন একজন প্রবীণ বাঙালী। আমি তখন ক্লাশে দ্বিতীয় হওয়ার গৌরবে পুরস্কার নেবার জন্য গিয়ে নমস্কার করে দাঁড়ালাম। তখন তিনি স্মিতমুখে বললেন—তুমি তো একলব্য। প্রাণটা ভরে উঠল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই এমন নিষ্ঠুর আঘাত পেলাম এই কৃতিত্বের অপরাধে যে, সে কথা মনে হলেই সমস্ত শরীরটা আমার আজও কুঁকড়ে ওঠে। অনুষ্ঠান শেষ হতেই সভামণ্ডপ থেকে বেরিয়ে আরও বহুজনের সপ্রশংস অভিনন্দনে অভিনন্দিত হব—এই প্রত্যাশায় ইস্কুলের বারান্দায় ইচ্ছে করেই দাঁড়িয়েছিলাম। আমাদের গ্রামের থিয়েটারের অভিনেতা যুবক-বৃন্দের দু-তিন জন এসে আমাকে বললেন—বলিহারি, বলিহারি, একেবারে জাত-ময়নার মতো বুলি বললে হে!

একজন বললেন—বাস-বাস। এইবার ইস্তফা দাও ইস্কুলে। ঢুকে পড় থিয়েটারে। আমরা আর ছেলে খুঁজে ফিরতে পারছি না!

একজন বললেন—এই জায়গাটা যদি আরও একটু ফিলিং দিয়ে বলতে পারতে! যিনি থিয়েটারে ঢুকতে বলেছিলেন তিনি বললেন—'ও সব ঠিক হয়ে যাবে। ফিলিংসের ওষুধ খাইয়ে দোব।' দেখিয়েছিলেন ওষুধ খাওয়াটা ভঙ্গি করে। ওটা মদ!

আমার চোখে জল এল, মনে হল ধরিত্রী দ্বিধা হলে তার মধ্যে লাফ দিয়ে পড়ি। এখানে শেষ নয়। প্রাইজের ছুটির পর ইস্কুল খুলতেই প্রথম ঘণ্টাতেই

কেষ্ট চাকর এসে ডেকে নিয়ে গেল লাইব্রেরিতে। সেখানে হেডমাস্টার মশায় মুখ লাল করে বসে আছেন। নারাণও এল। কঠোর কণ্ঠে প্রশ্ন এল—ধনুর্বাণ নিয়ে গিয়েছিলে কেন?

You? Why?

চুপ করে রইলাম।

আবার প্রশ্ন হল—কেন? কেন? কেন? You?

এবার বললাম—একলব্য ধনুর্বিদ্যাই শিখছিল—

What? What? আমাকে শিক্ষা দিবি? You ইঁচড়পাকা! এ তোর বুদ্ধি! তোর! আমি আন্দাজ করেছিলাম। Yes! লাভপুরের ছেলে যে লেখাপড়া ছাড়বি, থিয়েটার করবি, উচ্ছন্নে যাবি, তোর তো পথ সাফা, বাবা মরে গেছে, সিধে রাস্তায় ঘোড়া হাঁকিয়ে চলে যাবি অধঃপাতে।

এইখানে নারাণ খালাস পেয়ে গেল। সবটা ঘাড়ে পড়ল আমার। অপরাধটা শুধু থিয়েটারের অনুকরণ করার জন্য নয়—অপরাধটা গুরুতর হয়ে উঠেছে অন্যখানে, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে এই খেলার তীর-ধনুক নিয়ে বেরিয়ে Arms Act-এ অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছি। কালটা তখন ১৯১৯-২০ সাল। আলিপুর বোমার মামলার পরও কয়েকটা মামলা হয়েছে। ১৯০৫ সালের ৩০শে আশ্বিন যে নবজীবনের জোয়ার এসেছিল—সে তার প্রথম আঘাতে যতটুকু ভাঙাচোরা করবার ভেঙেচুরে যতটুকু সঞ্জীবনী ঢেলে দেবার ঢেলে দিয়ে আবার একবার সরে গেছে। ভাঁটা পড়েছে। রাজশক্তি দুর্যোগের মেঘমুক্ত হয়ে তীব্র কিরণসম্পাতে মাটির শুষে নেওয়া সঞ্জীবন রস টেনে নিচ্ছেন। লাভপুরে ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। এবং শুরু হয়েছে বেশ প্রবলভাবেই। এর জন্য স্থানীয় প্রধান স্বর্গীয় যাদবলাল-বাবুর উত্তরাধিকারীরা সহযোগিতা করছেন। যাদবলালবাবুর মেজ ছেলে—স্বর্গীয় অতুলশিববাবু তখন প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েত এবং অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট; ভবিষ্যতে আরও অনেক রাজসম্মানের প্রত্যাশী! তাঁরা অহরহই শঙ্কিত থাকেন লাভপুরে কোথায় কখন একটি রাজদ্রোহসূচক বাক্য উচ্চারিত হয় এবং তার ধ্বনি গিয়ে পৌঁছয় শিউড়ি সদর শহরে। কেউ যদি 'বন্দনা' শব্দটি উচ্চারণ করতে যায়—তবে 'বন্দ' পর্যন্ত বলতে-না-বলতে হাঁ-হাঁ করে ওঠেন—পাছে ওটা 'বন্দে মাতরমে' গিয়ে দাঁড়ায়। ভয় তাঁদের অপরিমিত। অন্যথায় তাঁরা আন্তরিকভাবে বিরোধী নিশ্চয় ছিলেন না। কারণ স্বদেশী কাপড়ের দোকান তাঁরাই করেছিলেন এখানে, যাতে করে এ অঞ্চলের লোকে স্বদেশী কাপড় পরতে পারে। অতুলশিববাবু হেডমাস্টার মশায়ের অন্তরঙ্গ ছিলেন। দুজনের ধারণা ছিল ইংরেজ অজেয়। এই কারণেই তাঁদের ভয় ছিল মাত্রাতিরিক্ত। ইংরাজের গুণের প্রতি শ্রদ্ধার চেয়ে ইংরাজের পুলিশী-শাসনের ভয়ঙ্করত্বই ছিল তাঁদের কাছে বড় কথা। আমাদের গ্রামে যে শখের নাট্যসম্প্রদায় স্থাপিত হয়েছিল ১৯০৫ সালে তার নাম দেওয়া হয়েছিল—বন্দে-মাতরম্ থিয়েটার। যে গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছিল—তারও নাম হয়েছিল—বন্দে-মাতরম্ লাইব্রেরি। প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হতেই ড্রপসিনে লেখা বন্দেমাতরম্ শব্দটি

জল-সাবান দিয়ে মুছে তখন সেখানে লেখা হয়েছে 'অন্নপূর্ণা'। লাইব্রেরির রবার স্ট্যাম্প মারা বইগুলিতে সযত্নে কালি দিয়ে বন্দেমাতরম্ শব্দটি কাটা হয়েছে। ছেলেদের একটি লাঠিখেলার আখড়া হয়েছিল—একবার পুলিস তদন্ত হতেই আখড়াটি উঠে গেছে। সুতরাং ভীতু স্বভাবের হেডমাস্টার মশায়ের আমাকে Arms Act-এ ফেলা হয় তো স্বাভাবিকই ছিল। কিন্তু আমার সে বুঝবার বয়স হয়নি এবং 'বাবা মরে গেছে, ঘোড়া হাঁকিয়ে অধঃপাতে যাবি' কথাটির মধ্যে মর্মান্তিক বেদনাদায়ক শ্লেষ ছিল, তাই সেদিন আমাকে জ্বালায় অস্থির করে তুলেছিল। এর পূর্বে গ্রামের অগ্রজ স্থানীয় যুবকেরা যে শ্লেষ করেছিলেন, তার সঙ্গে এর যোগ ছিল বলেই বোধ করি এতখানি অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। সেদিন হেডমাস্টার মশায় অবশ্য মুখে শাসন করেই ছেড়ে দিয়েছিলেন।

আর একটি দৃষ্টান্ত দিই। এই বয়সেই বোধ হয় এই ঘটনার বৎসরখানেক আগে বা পরে পূজার তিন চার দিন পূর্বের ঘটনা। ইস্কুল বন্ধ হয়েছে। চারিদিকে পূজা যেন ফুলের মতো ফুটতে শুরু করেছে, সকালবেলা সেদিন আমরা তিনজনে বেরিয়ে পড়েছি। আমি, দ্বিজপদ আর ষড়ানন। দ্বিজপদর কথা 'আমার কালের কথা'য় বলেছি। দ্বিজপদ জীবনে অন্ধকারের মুখে ধাবমান একটি প্রচণ্ড গতিশীল উল্কা। মধ্যে মধ্যে আমার শক্তির আকর্ষণে এসে কয়েক ঘণ্টা বা কয়েক দিনের জন্য আমাকে প্রদক্ষিণ করে ঘুরত। তারপর আবার চলে যেত। ষড়ানন আমাদের গ্রামের ছেলে নয়, তার বাড়ি সিউড়ির উত্তরে। তার মা এসেছিলেন আমাদের বাড়িতে পাচিকার কর্ম নিয়ে। বিধবার একটি সন্তান। লেখাপড়া শেখেনি, শিখেছে মাছ ধরতে। শিখেছে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতে। আমাদের বাড়িতে আসার পর তাকে ইস্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু ইস্কুল বা ষড়ানন পরস্পরে কেউ কাউকে সহ্য করতে পারেনি। ইস্কুলের ছুটি, বাড়ির প্রাইভেট মাস্টারমশাইও দেশে গিয়েছেন, আমরা তিনজনে শরৎ প্রভাতে প্রসন্ন আলোর মধ্যে সেদিন কেমন করে মিলিত হয়েছিলাম মনে নেই, তবে হয়েছিলাম, এবং ছুটির আনন্দে ছুটে বেরিয়ে গেলাম গ্রাম থেকে। আমার মনে একটি অজ্ঞাত আকর্ষণ ছিল পশ্চিম দিকে। গ্রাম থেকে পশ্চিম মুখে বেরিয়ে গিয়েছে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা, লুপলাইনের আমদপুর স্টেশন। সেবার আমার মেজমামা পূজায় আমাদের বাড়ি আসবেন। তিনি তখন কলকাতায় পড়েন। কলেজ বন্ধ হলেই আসবেন কথা ছিল। তিনিই নিয়ে আসবেন আমার পূজার নূতন গরদের জামা, নূতন জুতো, সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল একখানি বাঁধানো একসারসাইজ বুক। তখন আমার গোপন সাহিত্যচর্চা শুরু হয়েছে। বাড়িতেই একজন সঙ্গী পেয়েছি। নারাণও একজন সঙ্গী, সে ছাড়াও ইনি আর একজন, এসেছেন অত্যন্ত আকস্মিকভাবে। আমাদের বাড়িতে নায়েব হয়ে এলেন কালীশরণ চক্রবর্তী। পাশের গ্রাম দোনাইপুরে বাড়ি ; বয়স বোধহয় পঁয়ত্রিশ, লম্বা মানুষ : অম্বলের রোগী, দাড়িগোঁফওয়ালা লোকটির সঙ্গে ভারি মিল হয়ে গেল আমার। আমার কবিতা লেখা দেখে তিনিও আমার সাথীর মতো, সমবয়সীর মতো বললেন—আমিও পারি লিখতে!

—সত্যি?

—হ্যাঁ। আপনার ছন্দে কিছু কিছু ভুল আছে। বলেন তো ঠিক করে দি।

আমি তখন পুজোর পদ্য অর্থাৎ আগমনী কবিতা লিখছি। এবং তখন আমার মধ্যে চিন্ময়ী ও মৃন্ময়ী দেবতা এক হয়ে গিয়েছেন, 'বন্দেমাতরম' মন্ত্র শিশুমনেও ক্রিয়া করেছে; কবিতায় আমি দশভুজাকে আক্ষেপ করে বলছি—মা, তোর পুজা করতে এত সাধক বীর দিলেন হৃদয়শোণিত ঢেলে। শুরু করেছিলাম বোধ হয় পুরু রাজা থেকে; পৃথ্বীরাজ পার হয়ে চিতোরে লক্ষ্মণ সিংহের কথা লিখছি। লিখছি—তুই মা ক্ষুধার্ত হয়ে এলি। বললি, "ম'য় ভুখা হু", চাইলি রাজার দ্বাদশ পুত্র বলি। রাণা এগারোটি ছেলেকে যখন যুদ্ধে পাঠালেন তোকে উৎসর্গ করে, তারপর বংশের জন্য একটিকে রেখে দ্বাদশের স্থান পূরণ করলেন নিজে; তবু তুই মা জাগলি না! আমাদের গ্রামের কবি শ্রীযুক্ত নিত্যগোপালবাবুর "দেবাসুর সংগ্রামের এই তো সময়" কবিতার সুর আমার মনে সুর বেঁধেছে। থাক সে কথা। আমি কালীশরণবাবুকে বললাম, কই, এই জায়গাটি ঠিক করে দিন দেখি! তিনি আমার কাছে জেনে নিলেন ইতিহাসের গল্পটুকু এবং আমার বলবার কথাটুকু: তারপর কিছুক্ষণ চোখ বুজে বসে থেকে আমার লাইনগুলি কেটে চমৎকার করে লিখে দিলেন দুটি স্তবক। এঁর সঙ্গে মিলে সাহিত্যচর্চা স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে গেছে। একসারসাইজ বুকের আকর্ষণ সেইজন্যই সবচেয়ে বেশী। আদি কবি বাল্মীকি স্নানের পথে ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে শরাহত হতে দেখে যে দিন প্রথম কবিতা রচনা করেছিলেন সে দিন আগে ভুর্জপত্র বা তালপত্র সংগ্রহ করে তবে নদীর জলে নেমেছিলেন, একথা তিনি লিখে স্বীকার করে না গেলেও অভ্রান্ত সত্য।

সেই একসারসাইজ বুকের আকর্ষণে নানা গল্পের মধ্যে প্রায় মাইল তিনেক হেঁটে গিয়ে গাছতলায় বসলাম। তারপর স্পষ্টভাষায় সঙ্গীদের কাছে প্রস্তাব করলাম, চল, আমদপুর যাই। আমার মামা আসবেন। খাতা আনবেন—জামা আনবেন—জুতো আনবেন।

দ্বিজপদ চিরকাল আমার কবিতার ভক্ত। কবিতা সে কোন দিনই বোঝেনি জীবনে, কিন্তু কবিকে সে ভালোবাসত। আমার জন্য সে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ঝগড়া করেছে; মার খেয়েছে; মেরেছে। সে সোৎসাহে বললে—চল। ষড়াননও রাজী—চল। আমদপুর আরও চার মাইল। সাত মাইল হেঁটে স্টেশনে এলাম। কলকাতার ট্রেন চলে গেল; মামা এলেন না। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আবার ফিরলাম। এবার পা-দুটি ক্লান্ত, সম্মুখে একসারসাইজ বুকের হাতছানি নাই; শরতের প্রভাত প্রসন্ন হলেও মধ্যাহ্ন প্রখর, তখন সেই মধ্যাহ্নকাল, পথে বীরভূমের রাঙা মাটির লাল ধুলা। বেলা একটা নাগাদ প্রখরতায় ক্লিষ্ট হয়ে সর্বাঙ্গে লাল ধুলায় আচ্ছন্ন হয়ে বাড়ি এসে পৌঁছুলাম। তখন বাড়িতে কলরব কোলাহল পড়ে গেছে। সকালবেলা বেরিয়ে বেলা একটা পর্যন্ত আমার অনুপস্থিতি একটা অতি অস্বাভাবিক ব্যাপার। এগারোটা থেকে খোঁজ হয়েছে। বারোটা নাগাদ প্রকাশ পেয়েছে যে, আমাদের দেখা গেছে সুঁদিপুরের বটতলার কাছে, আমদপুরের পথে। আমাদের গ্রামেরই

একজন মুসলমান গাড়োয়ান আমদপুর থেকে ফেরার পথে দেখেছিল, সেই সংবাদ দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে কলরব শুরু করেছেন আমার পিসিমা। এই রৌদ্র—এই এতটা পথ—এই আশ্বিন মাস—মাত্র এগারো-বারো বছরের ছেলে, ফিরবে কি করে?

তিনি ছুটে গেলেন নারাণদের বাড়ি। নারাণদের তখন লাভপুরে ঘোড়ার গাড়ির ব্যবসা ছিল। লাভপুর থেকে আমদপুর যাত্রীদের ট্রেন ধরিয়ে দিত, আমদপুর থেকে যাত্রী নিয়ে আসত লাভপুর। সেই গাড়ির জন্য গেলেন। গাড়িখানি চাই. যা ভাড়া লাগে দেবেন। কিন্তু গাড়িখানি তখন মাত্র ঘণ্টাখানেক আগেই আমদপুর থেকে এসেছে। ঘোড়া দুটি ক্লান্ত। কাজেই তাঁরা ইতস্ততঃ করলেন। অবশেষে রাজী হলেন। এই কথাবার্তার অবসরে বাড়ির ভিতরের কয়েকটি কথা আমার পিসিমার কানে পেঁছিুল। নারাণের মা নারাণকে বলছেন—আর খেলা খেলবি তারা-শঙ্করের সঙ্গে? যাবি? মিশবি? ভালো ছেলে—ভালো ছেলে। হল তো ভালো ছেলে? খবরদার যাবি নে আর। আজ আমদপুর পালিয়েছে, কাল দিল্লী লাহোর পালাবে ও ছেলে।

কথাটা তাঁর কথা নয়, তিনি আমাকে খুবই ভালোবাসতেন। নারাণের মতোই ভালোবাসতেন; কিন্তু কথাটা ইতিমধ্যেই গ্রামে এমন রটে গিয়েছে যে, তিনি তার প্রভাব এড়াতে পারেননি। লোকে এইটুকু সময়ের মধ্যেই বলতে শুরু করেছে—"বাপ মরে গেছে, মাথার উপর মুরুব্বি নেই, ও ছেলে ক'দিন ভালো থাকবে, বখে গিয়েছে। আজ আমদপুর গিয়েছে, কাল দিল্লী-লাহোর।"

গ্রামের লোকেরও বোধ হয় দোষ ছিল না; কারণ তখন আমাদের গ্রামের সদ্য যুবকদের মধ্যে বাপ-মার বাক্স ভেঙে টাকা সংগ্রহ করে কলকাতা পালানো একটা নিয়মিত ঘটনায় দাঁড়িয়েছিল। আমাদের বাড়ির উত্তর-পূর্ব দিকের বাড়ি, আমাদেরই দৌহিত্র বংশের একটি শাখার বাড়ি এবং দক্ষিণ-পূর্ব দিকে আর এক দৌহিত্র বংশের বাড়ি। এক বাড়ির ছেলে নিত্যগোপালবাবু, খোকা, অন্য বাড়ির ছেলে ষষ্ঠী। 'আমার কালের কথা'র মধ্যে এদের পরিচয় দিয়েছি। নিত্যগোপালবাবুর আর এক খুড়তুত ভাই ছিল। রামগোপাল। বসিষষ্ঠীর সহোদর ছিল রাধাশ্যাম। রামগোপাল এবং খোকা—এদের দুজনকে কলকাতায় পড়তে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের অভিভাবকেরা। তারা দুজনেই বাসা থেকে ইস্কুল বেরিয়ে নিখোঁজ হতে শুরু করেছে তখন। খোঁজ পেতে অবশ্য বেগ পেতে হত না, দেশেই তারা পালিয়ে আসত। ওদিকে রাধাশ্যাম, আমি বলতাম রাধাদাদা, তখন বাক্স খোলা পেলেই টাকা সংগ্রহ করে দেশ থেকে কলকাতা ছুটতে শুরু করেছে। শুধু ওই দুই বাড়িতেই নয়, আরও কয়েকজন তখন এমনই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তারা সেই অনুযায়ী বিচার করে স্থির করেছে আমি বয়ে গিয়েছি। একটি বালক-চিত্তের বিচিত্র অভিলাষ পূর্ণ করবার আকুলতার মূলে যে কি অভিলাষ ছিল তা তাঁরা জানতেনও না। জানবার চেষ্টা করবার প্রয়োজনই বা কি তাঁদের! দেশ কালের ধারা ও পরিণতি অনুযায়ী ওই মন্তব্যেই গ্রামখানাকে ভরে দিলেন।

যাই হোক, গাড়িতে ঘোড়া জোতা হচ্ছে, এমন সময় আমরা আবির্ভূত হলাম

তিনজনে। সঙ্গে সঙ্গে ওই বাক্যবাণহত পিসিমা আহতা ব্যাঘ্রীর মতো আমাকে আক্রমণ করলেন। যত প্রহার করলেন, তার চেয়ে বেশী কাঁদলেন। আর বারবার বললেন, শুনে আয় গ্রামের এ-মুড়ো (অর্থাৎ মাথা) থেকে ও-মুড়ো পর্যন্ত লোকে কি বলছে, শুনে আয়! সকলে একবাক্যে বলছে, উচ্ছন্ন গিয়েছে, বয়ে গিয়েছে। কথাটা তীরের মতই বিঁধেছিল।

আরও কিছুদিন পর, সেও এক প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন অনুষ্ঠানের দিনের ঘটনা। তখন জেলাশাসক অর্থাৎ ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট স্বগীর্য় অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় রায় বাহাদুর। তখনকার দিনে নামকরা জেলাশাসক। ইংরেজি ফ্যাশনে ঘাড় চেঁচে যে-সব ছেলে চুল কাটে তাদের ডেকে বিদ্যাবত্তার তথ্য জেনে নেন, যার সে গৌরব নাই তাদের চুল কেটে ফেলতে বলেন। যাদের আছে, তাদের তারিফ করেন। সাধারণ পোশাকে জনসাধারণের সঙ্গে মিশে গিয়ে কনস্টেবলদের ঘুষ নেওয়া ধরেন। স্টেশনে থার্ডক্লাশ বুকিং-এর জানালায় যাত্রীদের সঙ্গে টিকিট মাস্টারের ব্যবহার লক্ষ্য করেন। কোথায় গ্রামে অস্বাস্থ্যকর ডোবা, সারডোবা আছে খুঁজে বেড়ান, সেগুলিকে বন্ধ করতে বাধ্য করেন। ইংরেজের ছকা শাসন-পদ্ধতির মধ্যেও শাসন-কর্ম ছাড়া সংস্কার কর্মে তাঁর স্পৃহা ছিল। ইস্কুলের অনুষ্ঠানের পর তিনি আমাদের পাড়ায় এলেন। আমাদের পাড়ার মূল রাস্তাটি অতি সঙ্কীর্ণ ছিল, আজও আছে, তিনি সেই রাস্তাটিকে কিছুটা প্রশস্ত করবার অভিপ্রায়ে এসেছিলেন। রাস্তার দু-পাশে বসতবাড়ি। বাড়ি-ঘরের ক্ষতি না করে ভিত, দাওয়া সিঁড়ি কেটে রাস্তাটিকে প্রশস্ত করবেন এই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। প্রত্যেক গৃহস্বামীকে ডেকে তিনি খানিকটা এমনই সীমানা চেয়ে নিচ্ছিলেন। আমাদের বৈঠকখানা বা কাছারীবাড়ি রাস্তার ধারে। প্রথমেই মাঝখানে সিঁড়ির দু-পাশে দুটি দুটি আট-দশ ফুট চওড়া দাওয়া, তারপর বারান্ডা। বাড়ির সম্মুখে প্রায় দু বিঘে জায়গায় বাগান ও খামার বাড়ি। তার একপাশের পাঁচিল চলে গিয়েছে রাস্তার পাশে পাশে। পাঁচিলের পাশে ভিতে প্রায় পাঁচ-ছ ফুট জায়গা পড়ে আছে। অমৃতবাবু আমাদের বৈঠকখানার সামনে এসে প্রশ্ন করলেন—এ বাড়ি কার?

পরিচয় দিলেন নির্মলশিববাবু, তখন তাঁর মেজদাদা গত হয়েছেন, তিনিই তাঁর স্থান দখল করেছেন। তিনিই তখন প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েত, অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট, জেলার সাহেব-সুবাদের প্রিয়পাত্র। তিনি বললেন—নাবালকের বাড়ি ইত্যাদি ইত্যাদি। ইতিমধ্যে আমি বেরিয়ে এলাম বাড়ির ভেতর থেকে। নির্মলশিববাবু বললেন—এই যে!

অমৃতলালবাবু আমাকে দেখেই বললেন—ও! এই যে দেখছি King!

প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন উপলক্ষে ঘণ্টা দুয়েক আগেই আমি এবং নারাণ আবৃত্তি করেছি একসঙ্গে। সেবার আবৃত্তির বিষয় ছিল King and the Miller. সেবারও আমাদের আবৃত্তিই সবচেয়ে ভালো হয়েছিল এবং আমিই শ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হয়েছিলাম।

আমি নমস্কার করে দাঁড়ালাম। তিনি আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন—

King, খানিকটা জায়গা দিতে হবে। তোমার দাওয়াটার অর্ধেকটা আর পাঁচিলের বাইরের জায়গাটা রাস্তার জন্যে দিতে হবে।

আমি বললাম, নিন।

তিনি বোধ হয় এক কথায় এমন উত্তর প্রত্যাশা করেননি। সম্ভবতঃ অন্য স্থানগুলির অভিজ্ঞতা থেকে প্রত্যাশা করেননি। সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন—এক কথায় দিয়ে দিলে?

আমি এ কথার জবাব দিতে পারিনি, খুঁজে পাইনি, শুধু প্রসন্নমুখেই তাঁর দিকে চেয়েছিলাম। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন—নিই তা হলে? এর পর মনে মনে বলবে তো লোকটা কি দুষ্টু?

—না। তা বলব না।

এর পর তিনি আমার কাঁধে হাত রেখে পাশে নিয়েই এগিয়ে চললেন। চলতে চলতে কি তাঁর মনে হল, তিনি বললেন—না। তোমার জায়গা আমি নেব না। তুমি বড় হয়ে নিজে দিও।

সে দেওয়ার ভাগ্য আজও আমার হয়নি, কারণ নেবার মানুষ কেউ নাই। দাবী কেউ জানায়নি। গ্রহীতা নাই।

এ ব্যাপারেও কিন্তু রটল, আমি ইঁচড়ে পেকেছি। এই কিশোর বয়সেই বংশগত আভিজাত্যের চলচলে জুতো এবং জামা পরে নিতান্ত অশোভনভাবেই গ্রামের বয়স্কদের হটিয়ে সাহেবের পাশে পাশে চলার স্পর্ধা প্রকাশ করেছি। আর আমার ভবিষ্যতের কোনো প্রত্যাশা নাই। পড়াশুনা ছেড়ে জমিদারি সেরেস্তার মধ্যে তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসলেই হয়।

এমনি করেই একটি ধারাবাহিক অধঃপতনে যাচ্ছি বা গিয়েছি বা যাব এই দুর্নাম রটনাই আমাকে বোধ হয় সুনামের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। যত অপবাদ রটেছে ততই আমি চেষ্টা করেছি সুবাদ সুখ্যাতি অর্জন করতে।

এর প্রতিক্রিয়ায় বিপরীত পথে যাবারও সুযোগ ছিল যথেষ্ট এবং সে পথও তখন পর্যন্ত সুগম ও প্রশস্তই ছিল। আমার শৈশবের কথায় সেকালের কথার মধ্যে পরিচয় দিয়েছি। কিন্তু আমার মা ছিলেন আমার প্রেরণাদায়িণী। আর আমার বাবার আধ্যাত্মিক ভাবগম্ভীরতার প্রভাবও আমার উপর পড়েছিল। তাই সুগম ও প্রশস্ত পথে না ছুটে দুর্গম পথেই আমার জীবন মোড় নিয়েছিল।

আর সবচেয়ে বড় কারণ ছিল নবযুগের ধর্ম।

মহাকাল নূতন যুগে বেশ পরিবর্তন করলেন, রূপান্তর গ্রহণ করলেন। ১৯০৫ সাল নিয়ে এল নূতন দৃষ্টি। নূতন উপলব্ধি। নূতন ভাবধারা।)

জাহ্নবী যেন মাঝখানে ভগীরথের শঙ্খধ্বনি শুনতে না পেয়ে পথভ্রান্তের শঙ্খধ্বনির পিছনে পিছনে ছুটেছিলেন। ভগীরথ আবার ফেরালেন তার মোড়;

কীর্তিনাশিনী পদ্মাবতীর জলধারার প্রবাহ থামল না, কিন্তু নূতন ভাগীরথী আপন পথে প্রবাহিত হলেন।

আমাদের গ্রামে ১৯০৫ সালের প্রতিক্রিয়া প্রবল হয়েছিল। থিয়েটারের ড্রপসিন থেকে, গ্রন্থাগারের রবার স্ট্যাম্প থেকে বন্দেমাতরম শব্দ মুছে দেওয়া হয়েছিল, কেটে দেওয়া হয়েছিল। নির্মলশিববাবুরা জেলাশাসকদের সহযোগিতা করে রাজভক্ত বলে পরিচিত হয়েছিলেন।

নিত্যগোপালবাবুকে পুলিস বিভাগে চাকরি নিতে হয়েছিল। তিনি দেশ-প্রেমমূলক কবিতা লেখাও বন্ধ করেছিলেন কিন্তু মহাকালের নব আবির্ভাবের প্রভাব রুদ্ধ হয়নি?

সে কি হয়?

নিত্যগোপালবাবুই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দরিদ্রভাণ্ডার। ওই দরিদ্রভাণ্ডারের মধ্যে আগুননেভানোর ব্যবস্থা হয়েছিল পরবর্তীকালে। এই ব্যবস্থার সূত্র ধরে সেদিন অন্ধকার রাত্রে একলা বেরিয়ে গিয়েছিলাম ছুটে।

আমাদের বাড়ির গলিপথে জ্যেঠামশায়দের বাড়ির ডুমুরগাছে ভূতের প্রবাদ ছিল, শিউলিগাছে 'কালপুরুষে'র আসন ছিল, গলির দু-পাশে রাত্রে সন-সন শব্দ তুলে গোখুরা বিচরণ করত। সন্ধ্যা হলে ওই গলিপথ আমার কাছে ছিল ভয়ঙ্করের লীলাপথ। আমি গলির মুখে ষষ্ঠীদের বাড়িতে ঢুকে বলতাম—আমায় একটু দাঁড়িয়ে দাও গো!

সেদিনও সন্ধ্যাবেলা সে-বাড়ির একজন আলো হাতে আমায় বাড়ি পোঁছে দিয়ে গিয়েছে। সেদিন গভীর রাত্রে কার আহ্বানে সেই পথে একা ছুটে বেরিয়ে গেলাম, আগুন নিভিয়ে ফিরলাম। ফিরবার সময় একবার থমকে দাঁড়িয়েছিলাম। তারপর সাপের জন্য হাতে তালি দিতে দিতে একাই বাড়ি ফিরলাম। নির্ভয়ে।

কৈশোর জাগল। মহাকাল যে নবযুগ এনেছিলেন, প্রতিক্রিয়ায় সে যুগের ধর্ম, মহাকালের প্রসাদ—অন্যে গ্রহণ করতে ভয় করেছিল, কিন্তু আমি দু'হাত পেতে গ্রহণ করেছি।

তিন

আমার কৈশোরের কাল-ধর্মের কথা বলেছি। এবার বলব পটভূমির কথা। (আমার কৈশোরের পটভূমি আমাদের গ্রামের স্কুল। প্রাচীন গ্রাম। প্রাচীনকালে আমাদের ও অঞ্চলে সমগ্র রাঢ়ভূমিতেই পাকাবাড়ি এক রকম ছিলই না।) মাটিকে পুড়িয়ে ইঁট করার কল্পনায় তাঁরা শিউরে উঠতেন। বলতেন, মা বসুমতীকে পোড়ানো? সে সহ্য হবে না বলেই অনেকের বিশ্বাস ছিল। ইঁট পুড়িয়ে একমাত্র দেবমন্দির তৈরি করতে বাধত না। গোটা রাঢ়ভূমিতেই প্রাচীনকালের বসবাসের পুরানো ইমারত প্রায় দেখা যায় না। মুসলমান আমলের নবাবদের ইমারত আছে। রাজারাজড়াদের যে ইমারতগুলি আছে তার কিছু পুরাতন, অধিকাংশ আধুনিক

কালের। সে কালও গণনায় কতকাল পিছনে যাবে অর্থাৎ পলাশীর ওপারে যাবে কিনা বলতে পারি না। মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের ছিল না বলেই মনে হয়। ইংরেজ রাজত্ব কায়েম হওয়ার পরই পাকাবাড়ির রেওয়াজ গ্রামাঞ্চলে দেখা গিয়েছে। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ যাঁরা জমিদার হয়েছেন ইংরেজ আমলে, লর্ড কর্নওয়ালিস সাহেবের চির-স্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়ার পর। এক সময় যখন আমাদের অঞ্চলে পদব্রজে ঘুরেছি তখন বিস্মিত হয়েছি কোথাও পুরানো কালের ভাঙা ইমারতের সন্ধান না পেয়ে। পরে স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকারের রচনায় একদিন পেলাম ঠিক এই কথা। সেকালে বসবাসের জন্য পাকাবাড়ির রেওয়াজ ছিল না। এক দেবগৃহ ছাড়া পাকাবাড়ির নির্মাণের পথে সংস্কারের বাধা ছিল।

আমাদের দেশে বলে 'ডাক পুরুষের কথা'—অর্থাৎ প্রবচন, সেই প্রবচনে আছে 'যেমন তেমন ঘর, খান পাঁচ-ছয় কর।' একখানা বড় ঘর। দশ-বারো কুঠুরিওয়ালা ঘর করো না, তিন-চারখানা কুঠুরিওয়ালা ঘর করবে। বড় ঘরের বিপদ হল ঘরটা যদি ফাটে তবে গোটাটাই গেল, তার চেয়ে বড় কথা ছেলেদের মধ্যে ভাগ হবে। বড় ঘরের মধ্যে কুঠুরি ভাগ করে নিয়ে বসবাসে ঠিক স্বাতন্ত্র্য আসবে না, শান্তিও না। তার চেয়ে বড় কথা লক্ষ্মী চঞ্চলা। আজ এসেছেন বলে চিরদিন থাকবেন না। কাল যদি তিনি চলেই যান তবে ওই বড় বাড়ি তোমার ঘাড়ে চাপবে ঘটোৎকচের মতো। (কর্নওয়ালিস সাহেব চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করে এতে কিছু ব্যতি-ক্রম ঘটালেন। বড় বড় জমিদারি ভেঙে ছোট ছোট লাট তৌজি বিলি হল, তার ওপর পত্তনী, দর-পত্তনী, সে-পত্তনী প্রভৃতি স্বত্ব সৃষ্টির ফলে জমিদারের অধীনে উপ-জমিদার, উপ-উপ-জমিদার আবির্ভূত হলেন সমাজে। ওদিকে চিরস্থায়ী বন্দো-বস্তের কল্যাণে চঞ্চলা লক্ষ্মীর পাদুটিও ভারী হয়ে উঠল; চিরস্থায়ী বন্দো-বস্তের ওজনে ভারী পিতলের নূপুর পরে মা-লক্ষ্মী একদিকে তার ঝমর ঝমর শব্দের গরবে গরবিনী হয়ে উঠলেন, অন্যদিকে ওইভাবে চলাফেরা কম করতে বাধ্য হলেন।) বিখ্যাত যাত্রাওয়ালা সাধক কবি কণ্ঠমশায় অর্থাৎ নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় মশায় গান বাঁধলেন—'আগে করবে জমিদারি তবে করবে পাকাবাড়ি।' প্রবচনটা গানের কলিতে সংশোধিত হল।

তা হলেও দেশে তখনও পর্যন্ত আগেকার রেওয়াজই চলে আসছিল। পাকা-বাড়ির সংখ্যা কমই ছিল আমাদের গ্রামে। খুব দরকারও ছিল না আমাদের দেশে পাকাবাড়ির। আমাদের দেশে মাটির কোঠাবাড়ি পাকাবাড়ির চেয়েও আরামপ্রদ এবং মজবুতও কম নয়। রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশের মাটির বাড়ির স্থায়িত্ব এবং আরাম দেখে ওই বাড়ি তৈয়ারির ধরন উন্নত করতেই 'শ্যামলী' তৈরি করার কল্পনা করেছিলেন। যাক, আমাদের মাটির দেওয়াল খড়ের চাল বসতির দেশে ইস্কুল, বোর্ডিং, ডিসপেন্সারীর পাকাবাড়িগুলি একটি মনোহর নবরাজ্যের সৃষ্টি করলে।

গ্রামের পশ্চিমপ্রান্তে পড়ে ছিল একটা ধু-ধু করা প্রান্তর, সেইখানে পাকা ইমারতের যে শোভা গড়ে উঠল তাকে আমাদের ওখানে লোকে বলত ইন্দ্রভুবন। সত্যসত্যই থাম ও রেলিং-ঘেরা, বারান্দাওয়ালা ডিসপেন্সারী-বাড়ি, লম্বা একটানা

বোর্ডিং-বাড়ি, তার ওপাশে রানীগঞ্জ টালিতে ছাওয়া চতুষ্পাঠী, চারিপাশে আম-বাগান, পুকুরের এমনই একটা মনোহর শোভা ছিল যাতে আমাদের কিশোর-চিত্ত ভরে উঠত।

তখন আমাদের নিকটতম রেল স্টেশন ছিল আমাদের গ্রামের পশ্চিম দিকে সাত মাইল দূরে লুপলাইনে আমদপুর। সিউড়ি আমাদের সদর শহর, সেও পশ্চিম দিকে। যত লোকজন আমাদের গ্রামে আসতেন তাঁদের একশো জনের মধ্যে আশি জন আসতেন পশ্চিম দিক থেকে। প্রথমেই তাঁদের চোখে পড়ত ইস্কুল, ডিস-পেন্সারী বোর্ডিং-এর শোভা। সকলে মুগ্ধ হয়ে যেতেন, মনে হত তাঁদের যে—কোন শহরে এসেছেন।

বোর্ডিং-এ ফটকের মুখেই চেয়ার-বেঞ্চ পেতে আসর জমিয়ে বসে থাকতেন হেডমাস্টার শশীভূষণ নিয়োগী। লম্বা মানুষ, শীর্ণ শরীর, প্রথম জীবনে দাড়ি-গোঁফ ছিল। বসে হুঁকোয় তামাক খেতেন। তামাকে তাঁর বিলাস ছিল। ভুর-ভুর করে এমন মিষ্টি গন্ধ উঠত যে ছেলেরাও বুকভরে নিঃশ্বাস নিয়ে ঘ্রাণে অর্ধ-ভোজন করে নিত। তামাক শেষ হলেই হেডমাস্টার মশাই ডাকতেন—কেষ্ট, কেষ্ট! তামাক! কেষ্ট ছিল ইস্কুল ও বোর্ডিং-এর চাকর। ছেলেদের সে খুব ভালোবাসত। হেডমাস্টার মশায় ছড়ি হাতে বা গাড়ু হাতে বের হয়ে গেলেই ছুটে আসত ছেলেরা। বড় বড় ছেলেরা! কেষ্ট তামাক, খানিক তামাক! দরজা খোলা পেলে চুরির বদলে ডাকাতি শুরু করে দিত। কেষ্ট সভয়ে বলত—ওগো, আর না, আর না। এই দেখ আর না।

তখনকার দিনে তামাক খাওয়াটা হাতখড়ির সংগে না হোক পাঠশালাতেই শুরু হত। শরৎচন্দ্রের দেবদাসে পাঠশালার চিত্রটুকু নিখুঁত। জীবনে পার্বতী কদাচিৎ সত্য কিন্তু হুঁকো-কল্কে প্রায় সর্বজনীন সত্য। আমাদের বয়সীদের সংখ্যা গ্রামে ছিল জন তিরিশেক তো বটেই। তিরিশ জনের মধ্যে সাতাশ জন পাঠশালাতেই তামাক খাওয়া শুরু করেছিল। বাদ ছিল তিনজন। আমি, নারাণ আর ছকু বা গৌরীবিলাস। আমি এবং নারাণ দুজনে পাঠশালায় যাইনি। একেবারেই ইস্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম। গৌরীবিলাস 'নন্দমশায়ে'র পাঠশালায় ফিরে এসেছিল। আমাদের মধ্যে নারাণ ইস্কুল জীবনে বোধ হয় ফোর্থ ক্লাশ বা ক্লাশ সেভেন থেকেই ধরেছিল তামাক সিগারেট। আমাদের পূর্ববর্তী যারা তাদের তো কথাই নেই। তাদের কথাই বলছি। তারাই হেডমাস্টার মশায়ের তামাক ডাকাতি করত।

হেডমাস্টার মশায়ও মধ্যে মধ্যে জেলখানা তল্লাশীর মতো বোর্ডিং খানাতল্লাশ করতেন; বেআইনি মাল ছিল হুঁকো-কল্কে, তামাক-টিকে, নভেল-নাটক। একেবারে বিশ-পঁচিশটা হুঁকো, সের তিন-চার তামাক, গাদাখানেক নভেল-নাটক কেষ্ট ঘাড়ে করে এনে তুলত মাস্টারমশায়ের ঘরে। বোর্ডিং-এ ছাত্রসংখ্যা ছিল জন পঞ্চাশেক, কুড়িটা হুঁকোই তাদের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। এক হুঁকোতেই প্রায় সকলেই তামাক খেত। বোধ করি জাতিভেদের ভিত্তিটা প্রথম নড়েছে হুঁকোর ধোঁয়ায়। মাস্টার-মশায় বিজয়দর্পে ফিরে আসতেন আর চিৎকার করতেন সরু গলায়, তাঁর গলার

আওয়াজ ভরাট ছিল না, চিৎকার করতেন—নিকাল যাও, আভি নিকাল যাও হামারা হিঁয়াসে। নেহি মাংতা হ্যায়। দুষ্টু গরু থেকে শূন্য গোয়াল ভালো। চাই না তাঁর এইসব তামাক-খাওয়া ছাত্র। চলে যাক সব, তিনি চেয়ার-বেঞ্চ দেওয়ালকে পড়াবেন। তারপর বের হত ফাইনের লিস্ট।

একজন ছাত্র ছিল নলিন মুখুজ্জে। সকলে তাকে বলত 'নলে ক্ষ্যাপা'। নলিন ক্ষ্যাপা ছিল না, পরবর্তীকালে তার মতো বিচক্ষণ সুদখোর মহাজন এবং কুটিল বিষয়ী দেখা যায়নি। সে ক্ষ্যাপামির অভিনয় করত এবং সার্থক অভিনয়। সে ছিল একজন বড়দরের তামাকখোর। ফোর্থ ক্লাশে ভর্তি হয়েছে, বয়স বোধ হয় বিশ, আঠারোর নিচে তো নয়ই; খানাতল্লাশীর আগে কেষ্ট খবর দিয়ে যেত। সেদিন কেষ্টকে খবর না দিয়ে হেডমাস্টার এসেছিলেন। কাজেই গোটা বোর্ডিং-এর সমস্ত বামাল ধরা পড়েছে। এবং হুঁকোগুলো মাস্টারমশায় নিয়ে আসেন—আর কেষ্ট চুপিসাড়ে আবার যথাস্থানে পৌঁছে দেয়—এই জন্য মাস্টারমশায় সেদিন ঘরে তালা এঁটে চাবি নিজের কাছে রেখেছেন। ভয়ানক কড়া ব্যবস্থা সেদিন। মাস্টারমশায় কঠিন হয়ে বসে আছেন। ঘণ্টা কয়েক কাটল। রাত্রে খাওয়ার সময় মাস্টারমশায় তামাক খাওয়ার কুফল সম্বন্ধে একটি বক্তৃতাও দিলেন; এবং আশা করলেন সকলেই আজ থেকে তামাক খাওয়া ছেড়ে দিলে। ছেলেরা চুপ করেই রইল। মৌনতা সম্মতিসূচক ধরে নিয়ে হৃষ্ট হলেন তিনি। নিজের ঘরে ফিরে তিনি তামাক খেতে বসলেন। হঠাৎ ক্রন্দনধ্বনিতে বোর্ডিংটা কেঁপে উঠল। প্রবল যন্ত্রণায় কেউ চিৎকার করে কাঁদছে। কার কি হল?

ছুটে গেলেন মাস্টারমশায়।

নলিন ছট্‌ফট্ করছে এবং চিৎকার করে কাঁদছে, মরে গেলাম, ওরে বাবারে! ওঃ! ওঃ! মরে যাব আমি! আ—।

—কি হল? এই নলিন? কি হয়েছে?

পেটে হাত দিল নলিন।

—পেট কামড়াচ্ছে? মাস্টারমশাই প্রশ্ন করলেন।

সবেগে ঘাড় আন্দোলিত করে নলিন জানাল—না।

—তবে?

—ফেঁপে উঠেছে। ফুলে উঠেছে।

—ফেঁপে উঠেছে? ফুলে উঠেছে?

—দম বন্ধ হয়ে যাবে। ও মাগো।

—কেন হল এমন? কি খেয়েছিস?

—কিছু না।

—তবে?

—তামাক! একটান তামাক! ভাত খেয়ে তামাক না খেয়ে পেট ফেঁপে উঠেছে। ওরে না রে। ছট্‌ফট্ করে নলিন ঘরের এদিক থেকে ওদিকে গড়িয়ে চলে গেল।

মাস্টারমশায় পালিয়ে এলেন। ডাকলেন—কেষ্ট। কেষ্ট!

—আজ্ঞে।

—রাস্কেলটার হুঁকো-কল্কে দিয়ে এস! জলদি! জলদি!

চাবি ফেলে দিলেন। তারপর আবার বললেন—দাঁড়াও।

—সব হুঁকোগুলো দিয়ে এস। তামাক-টিকে-কল্কে সব।

তাঁর ভয় হল। নলিন থামবে কিন্তু বাকী ঊনপঞ্চাশটা ছেলে ঊনপঞ্চাশ পবনের মতো ফাঁপা পেটের বায়ু উদ্গীরণ করে একটা প্রলয় ঝড় বইয়ে দেবে।

এমনি ধরনের অনেক ব্যাপারই ছিল সে সময়। এ-কালের কল্পনায় সেকালের ছেলেদের অদ্ভুত মনে হবে। একটি ছাত্র ছিল রাধারমণ শর। হেডমাস্টার মশায়ের অত্যন্ত স্নেহের পাত্র ছিল সে। অবাধ কর্তৃত্ব করত হেডমাস্টারমশায়ের ঘরে। রাধারমণের মস্তিষ্কে খানিকটা বিকৃতি ছিল। দু-তিনবার সে সত্যসত্যই পাগল হয়ে গিয়েছিল। রাধারমণ আমার থেকে বয়সে অনেক বড়, বোধ হয় ছ-সাত বছরের বড়। ছেলেবেলায় এই ছ-সাত বছরটা অনেক দীর্ঘকাল; আমার তখন সবে কৈশোর শুরু হয়েছে, রাধারমণ তখন যৌবনে প্রবেশ করছে। ছাত্রজীবনে সে সঠিক কেমন ছিল জানি না, তবে উত্তরকালে তার সঙ্গে একত্রে কাটিয়েছি, তখন দেখেছি অপরূপ মানুষ রাধারমণ। এমন সৎ সেবাপরায়ণ স্পষ্টভাষী মানুষ কমই দেখা যায় সংসারে। বোধ হয় সেই কারণেই সে হেডমাস্টারমশায়ের প্রিয়পাত্র ছিল।

আমাদের ইস্কুলে নতুন থার্ড-মাস্টার এলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। আগুনের শিখার মতো দীপ্ত একটি যুবা। নূতন কালের ভাবধারা জীবনের কানায় কানায় ভরে নিয়ে এসেছেন। দ্বিজেনবাবু ইস্কুলে এলেন কোট-প্যাণ্ট পরে। সারা ইস্কুলটায় যেন মাছি ভনভন করে উঠল। চাল! নতুন চাল মারতে এসেছে রে!

রাধারমণ সেকেণ্ড ক্লাশে পড়ে। সে হঠাৎ ক্লাশ থেকে উঠে চলে গেল হেড-মাস্টারের কাছে। একবার ঘরের চাবিটা চাই।

বিনা প্রশ্নে মাস্টারমশাই চাবি দিলেন। রাধারমণ চাবি নিয়ে হেডমাস্টার-মশায়ের ঘরে গিয়ে তাঁর পুরনো চাপকান এবং প্যাণ্ট পরে ক্লাশে এসে গম্ভীর মুখে বসল। বিপদে অবশ্য পড়ল, দমল না। পরের ঘণ্টায় দ্বিজেনবাবু ক্লাশে এসে চাপকানধারী ছাত্রটিকে একটি বিশিষ্ট ছাত্র ধরে নিয়ে বহু প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করলেন। রাধারমণ নিরুত্তর হয়ে বসে রইল।

আমাদের ক্লাশের কথা বলি।

(আমার ইস্কুল জীবন যখন শুরু হয় তখন ক্লাশে আমরা তিনজন ছাত্র।) আমি, প্রতুল এবং শিবকৃষ্ণ। আমরা বলতাম শিবকেষ্ট।

প্রতুল ডবল প্রমোশন নিলে। তার পরবারই ফেল হল, সেবার তবুও তাকে প্রমোশন দেওয়া হল, তারপর আবার ফেল হল, আবার হল, আবার হল, আমার থেকে ক্লাশ দুই পিছিয়ে গেল।

শিবকেষ্ট প্রথম বছরেই ফেল হল, তবুও সেবার প্রমোশন পেলে। আমাদের উপরের ক্লাশের দুজন ফেল হয়ে সঙ্গী হল, ক্ষুদিরাম সাহা, পঞ্চানন সাহা। আমার চেয়ে বয়সে বড়, দুজনেই আমাদের গ্রামের সাহা বংশের ছেলে। ক্লাশটা ছিল বোধ হয় ক্লাশ থ্রি। তখন বলা হত এইটথ্ ক্লাশ বি। লোয়ার প্রাইমারী শেষ করে এল আরও দুজন নতুন ছেলে, ঠাকুরদাস পাল, শ্রীকৃষ্ণ পাল। পাশের গ্রামের দুটি ছেলে খুড়ো আর ভাইপো। ঠাকুরদাস প্রিয়দর্শন বুদ্ধিমান। শ্রীকৃষ্ণের মোটাসোটা গড়ন, বলিষ্ঠ দেহ। সে যেন মূর্তিমান স্থূলতা।

ক্ষুদিরাম ও পঞ্চানন—এই দুজনেই ছিল মারাত্মক রকমের স্থূলবুদ্ধি। শিবকৃষ্ণেরও ঠিক তাই। অথচ এই চারজনই সংসার জীবনে সাফল্য লাভ করে গেছে। ক্ষুদিরাম ও পঞ্চানন সাহা জাতিতে শৌণ্ডিক, পচুই মদের ব্যবসায় করত। সে ব্যবসা তারা তীক্ষ্ণবু মতো পরিচালনা করেছে। কিন্তু কি কারণে জানি না, লেখাপড়ার সঙ্গে একটা বিরোধ তাদের জন্মেছিল। ঠাকুরদাস বুদ্ধিমান ছেলে ছিল। কিছুদূর উপরে উঠে ইংরেজিতে তার কিছু অসুবিধা ঘটেছিল, অন্য বিষয়ে সে ভালোই ছিল। কিন্তু বোধ হয় তার সাংসারিক অসুবিধায় পড়া ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল। যাক পরের কথা পরে। নতুন ক্লাশ-মাস্টার এলেন। তিনজনকে মনে পড়ছে। কান্তি মাস্টার অঙ্ক কষাতেন। পঞ্চানন পণ্ডিত বাংলা পড়াতেন। রজনী মাস্টার পড়াতেন ইংরেজি আর ইতিহাস। কান্তি মাস্টার ছিলেন সাক্ষাৎ কৃতান্ত। আমাদের ইস্কুল থেকে এণ্ট্রান্স পাস করে তিনি শিক্ষকতা গ্রহণ করেছিলেন। এমন নিষ্ঠুরভাবে যে কেউ ছোট ছেলেদের মারতে পারে, এ আমি কল্পনাও করতে পারিনি। কালো রঙ, বড় বড় উগ্রদৃষ্টি চোখ, পেশী সবল পরিপুষ্ট দেহ কান্তি মাস্টারের প্রকৃতিতেই উগ্রতা ছিল এবং উগ্রতা তার চেহারাতেই ফুটে বেরিয়েছিল। নানা কৌশলে নিষ্ঠুর নির্যাতন করতেন। আমি ঠাকুরদাস দুজন অংক ভালোই পারতাম, ঠাকুরদাস আমার থেকেও তখন অঙ্কে ভালো ছিল, তবু আমাদের নিষ্কৃতি ছিল না।

এটা? এটা কি হয়েছে! অ্যাঁ? শুনু—শুনু—শুনু। আরে—

খামচে চুল ধরেই আনতেন কাছে, তারপর টেনে মাথাটা নামিয়ে টেবিলের তলায় আটকে দিয়ে বিরাশি শিক্কা ওজনের কিল বলে যে বিখ্যাত কিলের কথা শোনা যায় তেমনি কিল বসিয়ে দিতেন। দম আটকে আসত। অ্যাঁ—! অ্যাঁ— শব্দ করে সামলাতাম। তিনি তাকিয়ে দেখতেন। তারপর আবার ধরতেন। এবার আঙুলের মাথায়। নখের মাথা কচলাতে কচলাতে টেনে টেবিলের উপর রেখে শ্লেটের কাঠ দিয়ে নখ থেকে প্রতিটি গাঁটের উপর আঘাত করতেন। হাত ঝাঁকি দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে সামলাতে হত। তারপর অন্য হাত। এবার দুই আঙুলের ফাঁকে পেন্সিল পুরে দিয়ে চাপ দিতেন। তারপর পেটের মাংস ধরে কচলাতেন।

বেচারী শিবকেষ্ট, খুদিরাম, পঞ্চানন আর শ্রীকৃষ্ণ। এরা অধীর অস্থির হয়ে উঠল। বউয়েরা অনেকে শ্বশুরবাড়ির নির্যাতনে আত্মহত্যা করেন। কান্তি মাস্টার যদি এক ঘণ্টার বদলে আরও ঘণ্টা দুয়েক পড়াতো, তবে বোধ হয় ওই বয়সে

শিবকেষ্টরাও আত্মহত্যা করত। প্রায় তাই করেও ছিল। এবং তার ভাগ আমাদেরও নিতে হয়েছিল। প্রহারের ঠেলায় আমরা সকলে ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ হয়ে পরিত্রাণের পথ খুঁজতে লাগলাম। অবশেষে স্থির হল—কান্তি মাস্টারের ঘণ্টায় পালা করে পালিয়ে পরিত্রাণ পেতে হবে। দৈনিক দুজন করে। ছজন ছেলে, সপ্তাহে ছ'দিন ইস্কুল। তাহলে দুজন করে পালিয়ে প্রত্যেকে সপ্তাহে দুদিন কান্তির কৃতান্ত হস্ত থেকে বাঁচতে পারা যাবে। ঠিক পূর্বের ঘণ্টায়, ঘণ্টা শেষের তিন-চার মিনিট আগে, সেই ঘণ্টার শিক্ষকের কাছে বাইরে যাওয়ার অনুমতি নিয়ে দুজনে বেরিয়ে পড়তাম ইস্কুল থেকে—এবং অল্প খানিকটা দূরে একটা নুড়ি পাথর সমাকুল ঢিবির আড়ালে বসে গল্প করতাম। পরের ঘণ্টাটি ঢং করে পড়ত, আমরা উঠতাম। ফিরে এসে ক্লাশে বসতাম।

কিছুদিন পরে, বোধ হয় মাস ছয়েক পরে একদিন এর প্রতিকার হল। আমার পেটের মাংস কচলেছিলেন কান্তিবাবু। তার ফলে পড়েছিল কালশিটে। সেই দাগ থেকে প্রকাশ হয়ে পড়ল কান্তিবাবুর নিষ্ঠুর প্রহার-পদ্ধতির কথা। আমার অভিভাবক জানালেন ইস্কুলে, হেডমাস্টারমশায়কে। ইস্কুলে বসে আছি, কেষ্ট এসে ডাকলে, হেডমাস্টার ডাকছেন।

ভয়ে শুকিয়ে গেলাম, লাইব্রেরিতে গেলাম। হেডমাস্টার পেটের দাগটা দেখলেন। হাফ-ইয়ারলি পরীক্ষার খাতা খুলে অঙ্কের নম্বর দেখলেন। তারপর বললেন—যা।

তারপর কি হল জানি না। কিন্তু কান্তি মাস্টার সেদিন ক্লাশে এসে বসলেন হাঁকডাক করে নয়, চুপচাপ। পড়ালেন না। ঘণ্টা শেষে উঠে চলে গেলেন। সেই-দিন থেকে মার বন্ধ হল। কিন্তু তার সঙ্গে আরও কিছু যেন গেল। কান্তিবাবুর যে প্রাণের যোগ ছিল, পড়ানোর মধ্যে যে আগ্রহ ছিল তাও চলে গেল। আরও ছ'-মাস পরে কান্তিবাবু মোক্তারী পাস করে এখান থেকে চলে গেলেন। পরে অনেক কাল পরে হঠাৎ শুনলাম কান্তিবাবুর সংবাদ। কান্তিবাবু তখন লালবাগ কোর্টে খ্যাতনামা মোক্তার, উপার্জন করেন প্রচুর। তাঁর এক সহপাঠী আমাদের ইস্কুলের একজন প্রাক্তন ছাত্রের কন্যার বিবাহে হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। বিচিত্র নাটকীয় ঘটনা। কন্যার পিতা দরিদ্র শিক্ষক, কন্যার বিবাহের সংবাদ বন্ধুকে জানিয়েছিলেন, এবং প্রসঙ্গক্রমে জানিয়েছিলেন, কেমন করে বিবাহ দেব জানি না। আজও অর্থ সংগ্রহ করে উঠতে পারিনি। কান্তিবাবু হঠাৎ এলেন এবং বললেন—আমার একটি মেয়ে ছিল, মারা গেছে। তার বিবাহের জন্য আমি অর্থসংগ্রহ করতাম, সেই অর্থ নিয়ে এসেছি, আমি খরচ করব।

আমি কল্পনায় দেখছি—কান্তিবাবুর বড় বড় উগ্রদৃষ্টি চোখ দুটি থেকে জল পড়ছে, এবং চোখের দৃষ্টির উগ্রতা গলে গলে ধুয়ে যাচ্ছে, সেখানে ফুটে উঠছে অপরূপ কোমল দৃষ্টি।

মনে হয়, ঐ দিনের পর তাঁর চোখের দৃষ্টিতে পুরানো উগ্রতা আর কোনোদিনই ফেরেনি। হয় তো তা সত্যি নয়। তবু এটুকু ভাবতে ভালো লাগে। আরও একটা কথা এখানে বলব। লিখতে লিখতে অনুভব করছি—মনের সেই অনুভূতির কথা-

টুকু না লিখলে অপরাধ হবে আমার। মনে হচ্ছে এই প্রহার করাটাই তাঁর সব নয়, আরও ছিল। ওই নিষ্ঠুর প্রহার করেও তিনি ভালোবাসতেন। সে ভালোবাসার আস্বাদ এতকাল পরেও মনে রয়েছে। তিনি হয়তো ওই চাকরিটাই পছন্দ করতেন না বা কোন রকম অসন্তোষ ছিল। কিংবা বাল্যজীবনে তিনি শিক্ষকের কাছে নিজে প্রচণ্ড প্রহার খেয়েছিলেন। এমনি একটা কিছু হবে। নইলে কান্তিবাবু ভালোবাসতেন, আমি আজও সে ভালবাসার আস্বাদ স্মরণ করতে পারছি; তাঁর হাসিও মনে পড়ছে।

আজ কান্তিবাবুর কথা লিখতে গিয়ে মনের একটি উপলব্ধির কথা প্রকাশ না করে পারছি না। জীবনে যত মানুষ দেখলাম—মানুষই দেখেছি আমি, মানুষ খুঁজে বেড়িয়েছি। দেখলাম, প্রতিটি মানুষের কখনও-না-কখনও এমনি এক-একটি বা এমনি কয়েকটি বিচিত্র বিকাশ হয় যা মনে করিয়ে দেয়, বুঝিয়ে দেয় তারও মধ্যে আছে সুন্দর বা মধুরের একটি প্রবাহ : সে শুধুই বালুচর নয়। হঠাৎ একদিন বালুচর ভেদ করে উৎসারিত হয় মধুরের একটি নির্ঝর। প্রতিটি—প্রতিটি মানুষের মধ্যেই হয়।

অরণ্যের বসন্ত-শোভা দেখে, তার স্নিগ্ধতার মধ্যে আমরা আত্মহারা হই, কিন্তু যারা নাকি অরণ্যের অধিবাসী, যারা বৃক্ষলতার প্রতিবেশী, তারা দেখে তার সদা-সর্বদার রূপ। সে রূপ মানুষের স্বার্থপরতার মতো, কুটিলতার মতো, হিংসার মতো রূঢ় ভয়ংকর। যে পুষ্পিত তরুটির রূপটির মধ্যে পেলাম আমি অপরূপের সন্ধান তাকে স্পর্শ করামাত্র বুঝতে পারি তার কাণ্ডের কঠোর রূঢ় প্রকৃতির পরিচয়। যে লতাটির নবপল্লব শোভায় আপনাকে হারালে মানুষ, ছুটে গেল লতার কাছে—সে তার নমনীয় দেহ বেষ্টনীর জটিল পাকে তার পাদুটিকে এমন করে জড়ালো যে তাতেই হয়তো হল তার জীবনান্ত। হরিণ আবদ্ধ হয় এই লতার জালে—বাঘ এসে তাকে সংহার করে।

আসল কথাটা যেন এই—এই বহু বিচিত্র রূপেভরা সৃষ্টির মধ্যে সকল রূপই অপরূপ হয়ে আপনাকে প্রকাশ করবার সাধনায় মগ্ন। তপস্বীকেও দেখেছি, তপস্যায় বিঘ্ন হলে রোষ-বহ্নিতে জ্বলে উঠেছেন। অভিশাপ দিয়েছেন। মানুষের সঙ্গে মানুষ আমরা নিবিড় সান্নিধ্যে বাস করি—অহরহ পরস্পরের এই তপস্যায় আঘাত করি। তারই ফলে পাই রূঢ়তার পরিচয়। সরে যাই তিক্ত চিত্তে। আর ফিরে তাকাই না তার দিকে। তাই চোখে পড়ে না তার অন্তরের রূপ কখন অপরূপ হয়ে বিকশিত হয়ে উঠল, একাত্মতা অনুভব করলে—রূপ এবং অপরূপেরও পরে আছে যে অরূপ রহস্য—তার সঙ্গে। সকল মানুষের জীবনেই এমনিভাবে অকস্মাৎ একটা বসন্ত শোভা দেখা দেয়। কারও দেখা দেয় বারবার। কারও দেয় বহু—বহুবার। যখনই তার জীবনরূপে এমনি অপরূপের আবির্ভাব হয়, তখনই সৃষ্টিতে আসে একটি কল্যাণ। সচেতন বুদ্ধিতে, যশের আশায়, পুণ্যের কামনায় মানুষ যখন এ ফুল ফোটাতে যায়—যখন এ ফুল ফোটে না, ফোটে তখনই যখন

আপনার বুদ্ধি বিবেচনাকে পিছনে ফেলে—বসন্তের এক আকস্মিক ক্ষণের বৃক্ষের রস সঞ্চারের মতো—মানুষের জীবনাবেগের উষ্ণতা তার দেহকোষে কোষে ছড়িয়ে পড়ে তাকে আত্মহারা করে দেয়—যখন সে নিজেও বুঝতে পারে না কি করছে তখনই ;—তখনই রিক্ত শুষ্ক কঠিন জীবন-পাদপের শাখার প্রান্তে প্রান্তে ফুটে ওঠে ফুল ; জীবনের রূপ অপরূপ হয়ে বিকশিত হয়ে ওঠে। এইখানেই তো জীবন নাটক। এমনই একটি ছেদে শেষ হয় এক একটি অঙ্গ।

চার

আমার শিক্ষক ছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ মণ্ডল। ইস্কুলে তিনি ছিলেন ড্রিল মাস্টার। তাঁর কথা 'আমার কালের কথা'য় বলেছি। কিন্তু ইস্কুলের প্রথম শিক্ষকের কথা বলা হয়নি।

আমাদের সাতন পণ্ডিত ; ঐ নামেই আজীবন পরিচিত থেকে গেলেন। আমাদের গ্রামের লোকই ছিলেন তিনি। আমাদের গ্রামের পাশেই, রশি দুই-তিন দূরে খান-কয়েক ধানক্ষেতের পরেই মহুগ্রাম। সেই গ্রামে তাঁর বাড়ি ছিল। ভাল নাম সতীশ-চন্দ্র মিশ্র। ভারি ভালো মানুষ ছিলেন। তেমনি রসিক ছিলেন পণ্ডিত মশায়। ক্লাসে যে ভালো ছেলে হত বিপদ হত তার সবচেয়ে বেশি। তাকেই তিনি তাঁর ঠিক ডান দিকে বেঞ্চের প্রথম স্থানে বসাতেন, আর আনন্দের আতিশয্য হলেই তার মাথায় তবলা বাজিয়ে দিতেন। এখানেই শেষ নয়, আমাদের শিবকেষ্টকে আদর করে পঞ্চাননদেব বলতেন. পড়ার সময় কিন্তু বলতেন শিবে!

—শিবে!

—আজ্ঞে!

—দাঁড়া, পড়া বল। পড় রিডিং।

শিবকেষ্ট প্রথম শব্দেই আটকে যায়। গয়ে র-ফলা দীর্ঘ-ই মূর্ধণ্য ষ-য়ে ম-য়ে কি হয় শিবকেষ্ট উচ্চারণ করতে পারে না। মনে মনে বানান করে, আর আওড়ায়. কি হবে বুঝতে পারে না।

—পড় পড়, বানান করে পড়।

শিবকেষ্ট সশব্দে বানান করে—গয়ে র-ফলা দীর্ঘ—ঈ—

—কি হয়?

শিবকেষ্ট কি বলত ঠিক মনে নেই। তবে—গরীষ বা গিরিষ জাতীয় একটা কিছু বলত।

—পচা।

পচার কণ্ঠস্বর আবার অনুনাসিক ছিল। তা ছাড়া বেচারার জিভের মাপটা একটু বেখাপ্পা ছিল, হয় ছোট নয় বড় কিছু একটা ছিল, যার জন্য তার জিভে

উচ্চারিত শব্দগুলি যেন গড়িয়ে বেরিয়ে আসত। র-কার তার ড়-কার হতই এবং অত্যন্ত স্পষ্ট ও উচ্চভাবেই হত। সে—একবার সি-ডি উচ্চারণ করেই থেমে চুপ করে থাকত।

এবার দাঁতে-দাঁতে কষকষ করতেন সাতন পণ্ডিত। —তোর মাথা আমি চিবিয়ে খাব শিবে।

ঠিক এই সময়েই ক্ষুদিরাম ক্লাসে ঢুকত কচি নিমপাতা সমেত একটা ডাল নিয়ে। পণ্ডিতের হাতে দিত। পণ্ডিত নিমপাতাগুলি একটানে ছিঁড়ে বের করে নিয়ে মুখে পুরে কচ কচ করে চিবিয়ে খেতেন। ডালটা ফেলে দিতেন ছুঁড়ে। এবং ধাঁ করে মারতেন ডান পাশের ভালো ছেলেটির মাথায়, না হয় কান ধরে টানতেন।

—মাশ্‌শায়!

—শিবে, পচার পড়া হয়নি কেন?

—আজ্ঞে স্যার। আমি তার কি করব স্যার?

—দেখবে! তুমি দেখবে।

এর পর শিবে এবং পচার দণ্ডবিধান হত। কান দুটো লাল করে দিয়ে, চুল টেনে ছিঁড়ে, গালে চড় মেরে, পিঠে কিল মেরে—শেষে—স্ট্যাণ্ড আপ্‌। কিংবা স্ট্যাণ্ড আপ অন দি বেঞ্চ। কোনো দিন—নিল ডাউন। কোনো কোনো দিন বাইরের কাঁকর পাথর কুড়িয়ে এনে তাই বিছিয়ে তারই উপর নিল ডাউন। নাকখত্তরও প্রচলন ছিল সে কালে। নাকের ডগায় ছাল-চামড়া উঠে লাল হয়ে যেত। চরম শাস্তি দিতেন নিমপাতার মুঠো মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে।

—চিবো চিবো। গেল। কোঁৎ করে গেল। হুঁ।

তারপর গালাগাল দিতেন—কুকুর-দেঁতো, পোঁটা-নেকো, কটা চোখো, মাথা-মোটা! চোখ দুটো ছিল তাঁর রক্তাভ এবং দৃষ্টিতে ছিল একটা চিন্তামগ্নতার আভাস। তিনি যেন অহরহই চিন্তামগ্ন থাকতেন। সমস্ত জীবন এই চিন্তামগ্নতার আভাস তাঁর চোখে দেখেছি। কি ভাবতেন কে জানে। তিনি ছিলেন গ্রামের লোক। তাই ইস্কুলের বাইরেও তাঁর সঙ্গে দেখা হত। পণ্ডিত মশায় সকালবেলায় গ্রাম্য শিব এবং কালী মায়ের আটনে পূজা করতেন। কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, হাতে ফুলের পাত্র। নমঃ নমঃ করে আতপ চাল আর ফুল বেলপাতা ছিটিয়ে দিয়ে জমিদারি সেরেস্তার দপ্তর নিয়ে বের হতেন। তখন তিনি ছিলেন জমিদারের আদায়কারী গোমস্তা। সমস্ত জীবন এই করে গিয়েছেন। আমাদের ওখানকার আমার বয়সী থেকে আমার ছেলেদের বয়সীরা পর্যন্ত সবাই বোধ হয় তাঁর ছাত্র। বহু কৃতীজন তাঁর ছাত্র। তিনি যখন তাঁদের সঙ্গে সম্ভ্রম করে কথা বলতেন—আমি লজ্জা পেতাম। এই মানুষটির শেষ বয়সটা বড় সকরুণ। কল্পনাতীতভাবে সকরুণ। অন্নবস্ত্রের কষ্টে সকরুণ নয়। সেদিক দিয়ে তাঁর বিশেষ কষ্ট ছিল না। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ—জমি ছিল, পুকুর ছিল, বাগান ছিল। কিন্তু বিচিত্র বিস্ময়কর পথে এল তাঁর জীবনে বিয়োগান্ত পরিণতি। তাঁর দুটি ছেলে—শ্রীধর আর সুদাই অর্থাৎ সুদর্শন।

শ্রীধরকে ম্যাট্রিক পাস করালেন। সুদাইও পড়ছিল। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল দুটো ছেলেই নেশাখোর হয়ে উঠেছে। শেষে পথে ঘাটে সমাজে তারা নেশায় প্রমত্ত হয়ে বেড়াতে লাগল। গাঁজা খেয়ে শ্রীধরের মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে গেল। আমাদের গ্রামের মহাপীঠ ফুল্লরাতলায় গাঁজাখোরদের আসরের সভ্য হল। সে আসরে মহাপীঠের মহন্ত গদীয়ান থেকে শ্রীধর পর্যন্ত দশ বারোজন সভ্য। সকলেই অর্ধোন্মাদ। ষাট বছর থেকে তেইশ চব্বিশ বছর বয়সের শ্রীধর নিয়ে অদ্ভুত উদার সভা। এই সভার আসরে পারা ঘৃতকুমারীর শাঁস এবং আরও কিছু মিশিয়ে তামাকে সোনায় পরিণত করবার বিচিত্র পরীক্ষা চলত। এই নিয়েই তর্কবিতর্ক করতে করতে শ্রীধর একখানা চেলাকাঠ আর একজন গঞ্জিকাসেবীর মাথায় দিলে বসিয়ে; ফলে তার মাথাটা চুর হয়ে গেল। আদালতে শ্রীধর সবিস্ময়ে বললে--এত নরম ওর মাথা। সে আমি জানতাম না।

দায়রা আদালতে বিচার হল—সেখানেও শ্রীধর ওই কথাই বললে, আর ফিকফিক করে হাসলে। শ্রীধরের সে পাগলের হাসি অকৃত্রিম। শ্রীধর বেকসুর খালাস পেলে।

ওদিকে সুদাই তখন দুর্দান্ত হয়ে উঠেছে। বাপকে বাড়িতে পীড়ন করে —পয়সা দে, গাঁজা খাব। বয়স তার তখন তের কি চৌদ্দ। বোধ হয় ক্লাস সেভেনে পড়ে।

প্রহার করে বাপকে। গ্রামের পথে পথে বাপের অযোগ্যতা ঘোষণা করে বেড়ায়। —যে বাপ গাঁজা খাবার পয়সা দিতে পারে না ছেলেকে—সে কেমন বাপ? কিসের বাপ?

বাড়িতে পণ্ডিতমশায় মাথা হেঁট করে মৃত্যু কামনা করেন। মাথা হেঁট করে পথ চলেন।

হঠাৎ যেন সুদিন এল।

উনিশশো তিরিশ সাল। মহুগ্রামে মিটিংয়ে সুদাই এগিয়ে এল। বললে— আজ থেকে আমি নেশা ছাড়লাম।

সত্যিই নেশা ছাড়লে সুদাই। পিকেটিং করতে লাগল গাঁজা মদের দোকানে। মিটিংয়ে বক্তৃতা দিতে লাগল। সে বক্তৃতায় বলত নিজের কথা। বলত—দেখ ভাই, আমি রোজ চার পাঁচ আনার গাঁজা খেতাম। মদও খেতাম। গাঁজা না খেলে ভাত খেতে পারতাম না। পেট ফুলত। কিন্তু দেখ ভাই, আর আমি গাঁজা খাই না। বড় খারাপ জিনিস। তোমরা কেউ গাঁজা মদ খেও না। গাঁজার পয়সা না থাকলে —আমি ঘটিবাটি বিক্রি করতাম। বাবাকে মাকে মারতাম। আমি আর গাঁজা খাই না। আমার জ্ঞান হয়েছে।

শুধু এইখানেই শেষ নয়। সুদাই, আর দুটি সমবয়সীর সঙ্গে, উনিশশো তিরিশ সালের আন্দোলনে আমাদের ওখান থেকে প্রথম গ্রেপ্তার হল। স্টেশনে সেদিন সে কি জনতা। সুদাইদের সে কি অভিনন্দন জানালে। ফুলের মালা গলায় নিয়ে, ললাটে চন্দন-তিলক নিয়ে তারা চলে গেল। সেদিন বৃদ্ধ পণ্ডিতের

চোখে দেখেছিলাম জল, মুখে সে কি হাসি। ঠোঁট দুটি হাসিকান্নায় থরথর করে কাঁপছিল। সে দৃশ্য আজও আমার চোখের সামনে ভাসছে।

সুদাইরা তিন মাসের কারাদণ্ড ভোগ করতে গেল—আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে। সেখানে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস ছিলেন তখন। তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হল ছোট তিনটি ছেলের উপর। তাদের কাছে ডেকে নিয়েছিলেন। যত্ন করেছিলেন। স্নেহ দিয়েছিলেন।

সুদাইরা ফিরল সগৌরবে। তখন আমি জেলে। আমি যখন জেল থেকে ফিরলাম তখন আন্দোলন স্তিমিত হয়ে এসেছে। পুলিসের নিষ্ঠুর নির্যাতনে দেশটা ভয়ে মূক হয়ে গেছে। বন্দেমাতরম্ উচ্চারণ করতেও কেউ সাহসী হয় না। এই অবস্থায় একদিন পণ্ডিতের সঙ্গে দেখা হল। পণ্ডিত কাঁদলেন। ঝরঝর করে কেঁদে বললেন—আমার অদৃষ্ট দেখ বাবা। আমার অদৃষ্ট! সুদাইটা আবার নেশা ধরেছে। আগের থেকে অনেক বেশি নেশা করছে। আমাকে ধরে মারছে। আমার অদৃষ্টেই বোধ হয় এত বড় আন্দোলন সব মিছে হয়ে গেল। ব্যর্থ হয়ে গেল।

এর পর খুব কমই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে। (উনিশশো বত্রিশ-তেত্রিশ সাল থেকেই আমি সাহিত্য সাধনার পথে কলকাতায় বেশি থাকতে শুরু করলাম। বিষয়-কর্মের সংশ্রব পরিত্যাগ করলাম,) নইলে হয় তো গোমস্তারূপী পণ্ডিতমশায়ের সঙ্গে দু-চারবার দেখা হত। তখনও তিনি সংসারের জন্য গোমস্তাগিরি ছাড়েননি। হঠাৎই একদিন শুনলাম পণ্ডিত মুক্তি পেয়েছেন। মারা গেছেন।

উনিশশো তেতাল্লিশ সালের মহামারীতে পণ্ডিতের সংসার সব শেষ হয়ে গেল একরকম। শ্রীধর গেল। সুদাই গেল। পণ্ডিতের স্ত্রী গেলেন। বোধ হয় এক বিধবা কন্যা, সেও গেল। রইল শুধু শ্রীধরের বিধবা স্ত্রী—তার একটি পুত্র। আর একটি কন্যা—তার বিবাহ হয়েছে আমারই এক বাল্যবন্ধুর সঙ্গে, তারা এবং তাদের পুত্রকন্যারা আছে। আমার বন্ধুটি কৃতী, শিক্ষিত, রসিকজন, শিক্ষাব্রতী। তার বংশের জলগণ্ডূষেই বোধ হয়, শিক্ষাব্রতী পণ্ডিতের জীবনতৃষ্ণা মিটবে।

সাতন পণ্ডিত মশায়কে দেশে অধিকাংশ মানুষই ভুলে গেছে। যারা মনে করে রেখেছে তারা কি ভাবে তা জানি না। আমি প্রায়ই তাঁর কথা মনে করি। কখনও কখনও এই সকরুণ জীবনকাহিনী নিয়ে উপন্যাস লেখার কথা ভাবি। কিন্তু বুঝতে পারি না, তাঁর এই দুর্ভাগ্যকে কোন্ ব্যাখ্যানে ব্যাখ্যা করব? জন্মান্তরের কর্মফল? অদৃষ্টের পরিহাস? সে আমি পারি না। তাঁর জীবনের ইতিহাসের অন্ধকারে ডুবে—তাঁর চরিত্রের যে ছিদ্র-পথে এ-পাপ ঢুকে তাঁর জীবনটাকে এমন ছিন্নভিন্ন করে দিলে তাকে আবিষ্কার করতে সাহস পাই না আমি।

তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি—ভালোবাসি, তাই তাঁর জীবনকাহিনী নিয়ে উপন্যাস রচনার অভিপ্রায় মন থেকে মুছে ফেলেছি।

সাতন পণ্ডিত আমার ইস্কুল জীবনের প্রথম শিক্ষক। তাঁর অনুকরণে আমার ছোট নাতি দুষ্টুমি করলে বড় নাতির মাথায় চড় বসিয়ে দি।

সে বলে—ওই। আমি কি করলাম?

আমি বলি—তুমি দেখবে। তুমি দেখবে।

সাতন পণ্ডিতের পরই মনে পড়ছে ফিফ্থ মাস্টার রজনী সিংহকে। আর একজনকে মনে পড়ছে। তিনিই আগে ছিলেন ফিফ্থ মাস্টার। হরিচরণ রায় নাম ছিল বোধ হয়। তাঁর কাছে পড়িনি—তবে তাঁকে দেখতাম প্রায়ই। আমার জ্যেঠামশায়ের বাড়িতে থাকতেন। সে আমলের এফ. এ. ফেল ছিলেন। খুব ভালো ইংরেজি জানতেন নাকি। আমার জ্যেঠামশায়ের টাকা অনেক। কৃপণ লোক। একটি সন্তান; তাই সেই সন্তানটিকে ইংরেজি শেখাবার জন্য হরিচরণ রায়কে বাড়িতে রেখেছিলেন। আমার জ্যাঠতুত ভাইয়ের তখন বয়স তেইশ-চব্বিশ তো বটেই। অহরহ মদ্যপান করেন; হরিচরণ রায় তাঁকে স্নেহ করতেন—তাই ওই অবস্থাতেও তাঁকে ইংরেজি খবরের কাগজ পড়ে শুনিয়ে ইংরেজি শেখাবার চেষ্টা করেন। হরিচরণ রায়ের আরও একটা স্নেহ এবং আকর্ষণ ছিল ছাত্রের পিতার উপর। আমার জ্যেঠামহাশয় ইস্কুল কলেজে পড়েননি। কিন্তু এমন ভালো ইংরেজি বলতেন যে যারা ইংরেজি রসিক তারা মুগ্ধ বিস্ময়ে তাঁর ইংরেজি বলা শুনত। অনেকে শখ করে শুনতে আসত, ইংরেজিতে কথা বলতে আসত। এমনটা সম্ভবপর হয়েছিল জ্যেঠামশায়ের পিতৃসৌভাগ্যে। বাপ ছিলেন বড় উকিল (সে আমলের বাংলানবিশ উকিল)। থাকতেন সিউড়িতে। সেই সময় এক ইংরেজ জজ আসেন, তাঁর ছোট ছেলেটির সঙ্গে উকিলবাবুর ফুটফুটে ছেলেটির হয় অকৃত্রিম অন্তরঙ্গতা। শুনেছি —মেমসাহেবও তাঁকে ছেলের মতো ভালোবাসতেন। সেই আকর্ষণে মাতৃহারা শিশুটি দিনের অধিকাংশ সময়ই থাকতেন তাঁদের কুঠিতে। মুখে মুখে শিখলেন ইংরেজি এবং সে বলার ভঙ্গি পর্যন্ত তাঁদের মতো খাঁটি সাহেবী। জ্যেঠামশায় যেদিন কারণ করতেন—সেদিন রক্ষা থাকত না। হরদম ইংরেজি বলতেন। হরিচরণবাবু তাঁর সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলে যে আনন্দ পেতেন সেই আনন্দের আকর্ষণটাই ছিল সবচেয়ে বড়। সে কাল ছিল আলাদা। তিনি মাস্টারকে বলতেন—মাস্টার, এই কথাটা শুধু তোমার ছাত্রকে বুঝিয়ে দাও। একটা কথা। মদ খাক—মদ খারাপ জিনিস নয়। কিন্তু এই কথাটি মনে রাখতে হবে, ফার্স্ট গ্লাস ফর থার্স্ট, সেকেন্ড গ্লাস ফর হেলথ্। বাস্ আর না। তারপর ফর ম্যাডনেস।

মাস্টার আরম্ভ করতেন—দ্যাটস্ রাইট স্যার, বাট।

বাস্—ওই শুরু হল। এবং চলতে লাগল।

হরি পণ্ডিত—তাঁকে সকলে হরি পণ্ডিতই বলত—বিচিত্র মানুষ ছিলেন। লোকে অনেকে তাঁকে বলত—কেন আর আপনি ও বাড়িতে আছেন পণ্ডিত? লোকে নিন্দে করে।

—করুক। ওটা মানুষের স্বভাব। আমার নিন্দে না পেলে আপনার নিন্দে করবে।

—কিন্তু আপনার আর ওই বাড়ির ভাত রোচে? হজম হয়?

—রোচে কি, হজম হয় না। আমার অম্লশূলের ব্যাধি অনেক দিনের। আর কিছু কেউ বলতে গেলে বলেন—প্লিজ—প্লিজ। আঙুল দেখিয়ে পথনির্দেশ করে বলতেন—নিজের কাজে যান।

হরি পণ্ডিতের ইচ্ছা ছিল—আমাকে পড়ান। সে অভিপ্রায়ও প্রকাশ করেছিলেন বাবার কাছে। কিন্তু আমার পিসিমার অমতের জন্য সে হয়নি। পিসিমা বলতেন—হরি পণ্ডিতের স্বভাবটা হল নিন্দুকের স্বভাব। রোজ নাকি জ্যেঠামশায়ের বাড়িতে খেতে বসে ঠাকুর থেকে কর্তা-কর্ত্রীকে পর্যন্ত তিরস্কার করতেন; তরকারিগুলি মুখে দেবার আগেই হাত দিয়ে নেড়েই শুরু করতেন—অখাদ্য অখাদ্য। এই কি মানুষে খেতে পারে? রাবিশ। রাবিশ।

ইস্কুলেও হরি পণ্ডিত ছেলেদের নাকি অনবরত গাল দিতেন—ড্যাম রাস্কেল ননসেন্স। এসব ছাড়াও বলতেন—কুত্তার বাচ্চা।

আপত্তি করলে বলতেন—ওরে হারামজাদ, সংসারে মানুষের বাচ্চার দুটো জাত। তা সে মানুষ বামুনই হোক আর চণ্ডালই হোক আর কাফ্রীই হোক। দুটো জাত। একটা হল ময়ূরের বাচ্চা—একটা কুত্তার বাচ্চা। ময়ূরের বাচ্চা দেখেছিস—প্রথমে রোঁয়া না, রং না, দেখলে গা ঘিন-ঘিন করে—কিন্তু যত বড় হয়—তত তার পালকে-পুচ্ছে-রঙে-নাচে বাহার খোলে; আর কুকুরের বাচ্চা ছেলেবেলায় মোটাসোটা নাদুশ-নুদুশ; আর ময়না কুর-কুর বলে ডাকলেই লেজ নেড়ে সারা। যত বড় হবে তত তার ঘেন্নার চেহারা খুলবে। রোঁয়া উঠবে, পাঁজরা সার হবে, মাঠে মাঠে অখাদ্য খেয়ে বেড়াবে। গায়ের গন্ধে ভূত পালাবে পাড়া ছেড়ে, কিছু বললে দুপাটি দাঁত বের করে—গ্যাঁ শব্দ করে কামড়াতে আসবে। এই যেমন তুই এখন গ্যাঁ-গ্যাঁ করছিস ঠিক তেমনি। আয়না থাকলে দেখিয়ে দিতাম তোমার দাঁত বের করা মুখ ঠিক সেই রকম হয়েছে। কুত্তার বাচ্চা রে—তোরা কুত্তার বাচ্চা। রোঁয়া উঠতে শুরু হয়েছে, মুখে গন্ধ বেরুচ্ছে কুখাদ্যের। তামাক টেনেছিস তারই গন্ধ উঠছে। দুদিন পর গাঁজা মদ খাবি তারই গন্ধ উঠবে। ড্যাম রাস্কেল সোয়াইন কোথাকার।

বাল্যকালে হরিপণ্ডিতের সঙ্গে আমার একটি মধুর সম্পর্ক হয়েছিল; রাস্তায় আমাকে দেখলেই তিনি ডাকতেন। জ্যেঠামশায়দের বৈঠকখানা এবং আমাদের বৈঠকখানা পাশাপাশি। কজেই দেখা হত নিত্য কয়েকবার। তিনি ডাকতেন—আমি যেতাম।

—ইউ বয়! কাম হিয়ার।

ইংরেজি তখন জানি না তবু ও কথা দুটোর মানে বুঝতাম। যেতাম। তিনি আমাকে ইংরেজিতে তালিম দিতেন।—এটা কি?—হেড। এগুলো?—হেয়ার। এটা?—ফোরহেড। এ দুটো? আই ব্রাউ। তার নিচে ও দুটো? আইজ। ইয়ারস? কান দুটো ধরে নেড়ে দিয়ে বলতেন—এই দুটো। সব শেষে বলতেন—শোনো। ইংরেজিতে কবিতা আবৃত্তি করতে শুরু করতেন। সে মিল্টন কি টেনিশন, কি

শেলি কি বায়রন—তিনিই জানতেন। আমি শুধু তাঁর মুখের দিকে চেয়ে অবাক্ হয়ে সেই ধ্বনিঝঙ্কার শুনতাম।

কান্তিমাস্টার এবং হরিপণ্ডিত দুজনেই প্রায় এক সঙ্গেই চলে গেলেন ইস্কুল থেকে। এঁদের জায়গায় নতুন মাস্টার এলেন। কান্তিমাস্টারের জায়গায় এলেন—আমাদের গ্রামেরই, আমাদের প্রতিবেশী গোবিন্দ সরকার। যেমন সুপুরুষ তেমনি দুর্লভ স্বাস্থ্য। পালোয়ানের মতো চেহারা। তেমনি ছিল সুন্দর হস্তাক্ষর। এ কালে যাঁরা হাতের লেখা শিল্পবস্তুতে পরিণত করেছেন এবং সেই শিল্পকেই জীবিকা করে নিয়েছেন—তাঁদের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ এবং প্রতিভার অধিকারী—গোবিন্দবাবু তাঁদের সমকক্ষ ছিলেন। কিন্তু সেকালে এই শিল্পের এত প্রসার হয়নি—এবং শিল্পকর্ম করে জীবিকার সংস্থানের কল্পনাও লোকে তখন করতে পারত না। সেই কারণে গোবিন্দবাবু সমস্তটা জীবনের কিছুটা ইস্কুলমাস্টারি কিছুটা কেরানিগিরি করে গেলেন। গোবিন্দবাবু ফুটবলেও খুব বড় খেলোয়াড় ছিলেন। ব্যাকে খেলতেন। গোষ্ঠ পালকে লোকে বলত চাইনিজ ওয়াল। গোবিন্দমাস্টার তেমনি ধরনের ওয়াল ছিলেন। তাঁর গায়ে ধাক্কা দিলে—যে ধাক্কা দিত সেই গড়াগড়ি দিত মাঠে। তেমনি ছিলেন খাইয়ে। পুরোদস্তুর খাওয়ার পর তিনি যখন মিষ্টি খেতে বসতেন তখন পঞ্চগ্রামের লোকের দৃষ্টি তাঁর উপর নিবন্ধ থাকত। তিনি নীরবে মাথা হেঁট করে খেয়ে যেতেন। পিতলের বালতি-ভরা মিষ্টি নিয়ে পরিবেশকরা দাঁড়িয়ে থাকত। এক-একবার দশ-বারোটা করে মিষ্টি পড়ত পাতে। এক-দুই-তিন-চারবার পড়ল।

—আর বিলিতি মাস্টার?

নীরবে সম্মতিসূচক ঘাড় একপাশে হেলে গেল। পড়ল আর এক দফা।

—আর?

এবার কথা বললেন মাস্টার—চারটে।

সে চারটে চলে গেল। —আর?

—দাও আর চারটে।

সে-ও শেষ হল। —আর না।

—আর চলবে না?

—অন্য মিষ্টি থাকে তো দুটো।

পঞ্চাশ-ষাটটা মিষ্টি খেয়ে মাস্টার উঠে গজেন্দ্রগমনে চলে যেতেন।

মাস্টারের নাম ছিল বিলিতি মাস্টার। তার কারণ বিচিত্র। মাস্টারের একটি স্বভাব ছিল বিজ্ঞাপন খোঁজা। চাকরির নয়। বিনামূল্যে জিনিস নমুনা হিসেবে পাঠাবার বিজ্ঞাপন। সেকালে এই বিজ্ঞাপন অধিকাংশই ছিল বিদেশী পণ্যের বিজ্ঞাপন। মাস্টার সেই বিজ্ঞাপন দেখে চিঠি লিখতেন অথবা কুপন পূরণ করে পাঠাতেন। যথা সময়ে জিনিস আসত ডাকযোগে। বিনামূল্যে তিনি জার্মানী থেকে কোষ্ঠী তৈরি করে আনিয়েছিলেন। রোজ যেতেন পোস্টঅফিসে। সেখান

থেকে লণ্ডন, প্যারিস, বার্লিনের চিঠির প্যাকেট নিয়ে বাড়ি ফিরতেন। এই জন্যই তাঁর নাম ছিল বিলিতি মাস্টার।

গোবিন্দবাবুর ভাই করালী সরকার আমার থেকে বছর তিনেকের বড়। দু' ক্লাস উঁচুতে পড়ত। করালীরও কিছু কিছু ওই সব গুণ ছিল।

গোবিন্দমাস্টার মারতেন না, কিন্তু তাঁর হাতের মুঠো দেখলেই ভয়ে প্রাণ উড়ে যেত।

গোবিন্দবাবু মাস্টারি নিলেন—নিয়ে একটু বিপদে পড়লেন। গোবিন্দবাবু যখন ছাত্র ছিলেন—তখন তাঁর একটি আড্ডা ছিল। নাম ছিল না আড্ডার, কিন্তু নাম দেওয়া যায়, ভালো নাম দেওয়া যায় বা যেত। ধূম্রলোক, বালাখানা, ছিলম-বিলাস, টোবাকো ক্লাব। অর্থাৎ তামাক খাওয়ার আড্ডা। যারা নতুন তামাক খেতে শিখত—তাদের জন্যে দ্বার ছিল অবারিত। সে যে বয়সেরই ধূমপায়ী হোক, আসরে স্থান দিতে আপত্তি করতেন না। এক কল্কে তামাকের অংশ পেতে হলে একটি কি দুটি পয়সা দিতে হত। পুরো এক কল্কে যদি কেউ আরাম করে খেতে চাইত তবে চার পয়সা দিতে হত। গোবিন্দবাবু যখন মাস্টার হলেন—তখন করালী ওই আড্ডার সহকারী কর্ণধার হয়েছে। এবং আড্ডায় সমানে ছোটদের আনাগোনা চলছে। সুতরাং মাস্টার বিপদে পড়লেন। শেষ পর্যন্ত আড্ডার সময় নির্দিষ্ট করলে করালী। ছেলেদের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে মাস্টার বাইরে চলে যেতেন।

ফিফ্‌থ মাস্টার এলেন রজনী সিংহ।

রুগ্ন মানুষ। শীর্ণ দেহ, লম্বা চেহারা। অনবরত গোঁফ টেনে দাঁতের ফাঁকে ঢুকিয়ে কট্ কট্ করে গোঁফ কাটতেন। একটু কথা আটকাত। মাসে বোধ হয় দশ-দিনের বেশি স্নান করতেন না। ভারি ভালো মানুষ, ভারি মিষ্টি মানুষ। হেড-মাস্টার মশায়ের ভাগ্নে তিনি। তিনিও বোধ হয় আমাদের ইস্কুলের প্রাক্তন ছাত্র। দীর্ঘদিন আমাদের ইস্কুলে মাস্টারি করে গেছেন।

শিক্ষক হিসেবে যোগ্য শিক্ষক ছিলেন। তাঁর কাছে যা পড়েছি তা আজও মনে আছে। অথচ তাঁকেই এক সময় অযোগ্য বলে অবসর নিতে বাধ্য করা হয়েছিল। অবশ্য অনেকদিন পরে। রজনীবাবুর হাতে আমাদের ইংরেজি এবং ইতিহাসের পড়া পড়ল।

তার আগে আমরা উঠলাম নতুন ক্লাসে—অনেক নতুন ছেলে এসে ভর্তি হল। সবই অবশ্য আশপাশ গ্রামের ছেলে। এর মধ্যে এল বৃত্তি পাওয়া ছেলে মন্মথ সিংহ। বেঁটে খাটো গোলগাল যেন একটি বাঁটুল। আর এল ভোলানাথ পণ্ডিত। বিভূতি মিশ্র। আর এল আমাদের গ্রামের ও পাড়ার গৌরীবিলাস। আরও এল অনেক। কিন্তু তাদের সকলকে মনে পড়ছে না। কিছু দিনের মধ্যে তারা পড়া ছেড়ে দিলে বা পিছনে পড়ে থাকল।

গৌরীবিলাস যত বুদ্ধিমান তত পরিশ্রমী। ক্ষুরধার বুদ্ধি। কিন্তু বিভূতি

মিশ্র বিচিত্র এবং প্রতিভাবান। বিভূতি এসেই ক্লাসে প্রতিটি ছাত্রের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা লাগিয়ে দিলে। এসেই শুনলে যে আমি পদ্য লিখতে পারি।

আমিই ক্লাসে সকলের চেয়ে ছোট। বিভূতি বিশ্বাসই করলে না প্রথমটা। বললে। লেখ পদ্য, দেখব।

আমাকে লিখতে হল। নইলে আমার সব যায়—মান-মর্যাদা কিছু থাকে না!

বিভূতি পড়লে। পড়ে প্রশংসাও করলে না, নিন্দাও করলে না, চুপ করে বসে রইল। ঠিক পরের দিন বিভূতি এসে বললে, আমি পদ্য লিখেছি।

সে দাঁড়িয়ে সেই পদ্য পড়লে। তার পরের দিন আবার লিখে আনলে। কিছু-দিন পরেই সে ক্লাসে দাঁড়িয়ে মুখে মুখে পদ্য রচনা করতে শুরু করে দিলে। দেখতে দেখতে এল হাফ-ইয়ারলি পরীক্ষা। ফল বের হল, গৌরীবিলাস সবেতেই প্রথম। কোনো বিষয়ে আমি দ্বিতীয় কোনটাতে বিভূতি। বিভূতি ইংরেজিতে বেশ কম নম্বর পেল। এর ফলে সে দাঁড়াল তৃতীয়। বিভূতি হঠাৎ পদ্য লেখা থামিয়ে দিলে। ইংরেজি গ্রামার মুখস্থ করতে লেগে গেল। দু-পাতা তিন-পাতা ট্রান-শেলশন করে আনে। বাৎসরিক পরীক্ষায় ইংরেজিতে আমাকে ছাড়িয়ে গেল। গৌরীবিলাসের গৌরব এক নম্বরের জন্য বেঁচে গেল।

আবার বিভূতি শুরু করলে পদ্য লেখা।

বিভূতি পদ্য লিখতে শুরু করলে—অনেক লিখলে। কিন্তু তার পদ্যের সুর, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের সুর ছাড়িয়ে নতুন কালের সুরের সঙ্গে সুর মেলাতে পারলে না। রবীন্দ্রনাথের কথা ও কাহিনী, এ সব আমি তখন পড়েছি। ওই সুর তখন আমার কানে বেজেছে। আমি ওই সুরে সুর মেলাতে চেষ্টা করি। বিভূতি যুক্তাক্ষরের ধ্বনি কিছুতেই ধরতে পারত না। একদিন তাকে কথা ও কাহিনী দেখালাম; বিভূতি পড়লে "পঞ্চ নদীর তীরে, বেণী পাকাইয়া শিরে—" তার ভুরু কুঁচকে উঠল, বললে—এ লাইনে সাত অক্ষর—ও লাইনে আট অক্ষর! এ আবার কি পদ্য? আরও একটু পড়লে—"জাগিয়া উঠিল শিখ! নির্মম নির্ভীক!" এখানে আবার আট—আর ছয়। সে সঙ্গে সঙ্গেই দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে ফতোয়া দিয়ে দিলে যে, এই কবিতাটি কবিতাই হয়নি।

ক্লাস দুই আরও উঠে বিভূতি একদিকে শুরু করলে নেসফিল্ড, রোজ-হিন্ট পড়তে, পড়তে নয়—মুখস্ত করতে শুরু করে দিলে। অন্যদিকে সে কবিগান গাইতে শুরু করলে। কবিতার চর্চা করতে করতে সে কবিয়ালদের কবি-গানের পাল্লায় আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। কবিয়ালদের প্রতিভা তার কাছে বিস্ময়কর বলে মনে হয়েছে। এক একদিন সে ইস্কুলে আসে শুধু একটা খাতা নিয়ে; দুটি চক্ষু লাল; সারারাত্রি কবিগানের আসরে গান শুনে প্রায় আসর থেকেই চলে এসেছে ইস্কুলে। ক্লাসে এসেই ঢোলে। শেষে অপারগ হয়ে শরীর খারাপ বলে ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে যায়। ক্লাসেই কবিগান করত। গালে হাত দিয়ে—কোমরে জামার উপর কাপড় বেঁধে ঠিক কবিয়ালদের মতো নেচে নেচে গায়—

ক য়ে কালী কপালিনী—খ য়ে খর্পর ধারিণী—।

কবিগানের আস্বাদন বিভূতি আমাকে প্রথম দিয়েছে। আমার কবি উপন্যাসের নিতাই কবিয়ালের 'ওই ক য়ে কপালিনী' গানও বিভূতির কাছেই শ্নেছিলাম। তখন কবিগানের অবস্থা—অষ্টাদশ শতাব্দীর পাঁচালীর মতো। এতে তখন অশ্লীল অংশ এত বেশি যে আমাদের লাভপ্রের ব্রাহ্মণ ভদ্র পরিবারের কেউ কবিগানের আসরে যান না। তখন ঝ্মুর এবং কবিগানে প্রায় অচ্ছেদ্য সম্পর্ক ছিল। কবিয়ালদের অধিকাংশেরই দোয়ার ছিল না, দোয়ারকি করত এই সব ঝ্মুর দলের মেয়েরা।

বিভূতি কেমন করে যে এই কবিগানে আকৃষ্ট হয়েছিল জানি না। কিন্তু ওতেই সে প্রায় উন্মত্ত হয়ে উঠল। মনে হল বিভূতি বড় হয়ে এই কবিগান করাকেই জীবনের চরম সার্থকতা মনে করেছে। সে রামায়ণ মহাভারত শ্রীমদ্ভাগবত থেকে নানা প্রাণ পড়ে ফেললে। পড়ে ফেলাই নয়—প্রায় কণ্ঠস্থ করে ফেললে। অঙ্কতে সে কিছ্ কাঁচা ছিল—ওতেই ছিল তার বীতরাগ। অঙ্ক ছাড়া আর সব বিষয়েই বেশ সাফল্যের সঙ্গে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ক্লাসের পর ক্লাস অতিক্রম করে চলেছিল—। হঠাৎ একদিন বিভূতি পড়া ছেড়ে দিলে। বোধ হয় তার পিতৃ-বিয়োগ হল।

তারপর অনেকদিন আর কোন সংবাদ পেলাম না।

শ্নলাম না নতুন বিভূতি কবিয়ালের আবির্ভাবের কথা।

ভোলানাথ পণ্ডিত—আমাদের ভোলা পণ্ডিত—পণ্ডিতজী বরাবর সঙ্গে আছেন। সামনের দ্টি দাঁত উঁচু। ওই উঁচু দাঁত দ্টি এবং তার ধীর রসিক প্রকৃতি বলে দিত—পণ্ডিতজী পড়া ছাড়বে না। সে পণ্ডিত হবেই। বিভূতি সম্পর্কে ভোলানাথের মামা। ভোলানাথের খবর পেলাম সে এখন খ্ব অঙ্ক কষছে।

—অঙ্ক কষছে? বিভূতি?

—স্দ কষা। কাঠাকালী। জমিদারী সেরাস্তার যাবতীয় অঙ্ক।

বিভূতি বাপের কাজ চালাচ্ছে। তাদের নিজের কিছ্ আদায় ছিল, তা ছাড়া তার বাপ করতেন কোনো জমিদারের আদায়ের কাজ। বেশ সন্তুষ্টচিত্তে যোগ্যতার সঙ্গে বিভূতি করে যাচ্ছে এ সব কাজ।

দেখাও হয়েছিল একদিন সেই সময়। দেখলাম খাঁটি বিষয়ী বিভূতি।

তারপর একদা পণ্ডিতজী বললে—ওহে বিভূতি প্রায় ঋষি হয়ে উঠেছে।

—মানে।

—মানে বেদ-বেদান্ত, উপনিষদ, দর্শন চর্চা শ্র্ করেছে। সে একেবারে তপস্যা।

অবিশ্বাস করিনি। বিভূতি সম্পর্কে অবিশ্বাস করবার কিছ্ই নাই। সে সব পারে—সব।

বছর ছয়েক আগে—কি বছর আষ্টেক আগে বিভূতির সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

একদিন নয় দু'দিন। একদিন পণ্ডিতজী তাকে নিয়ে এলেন আমার বাড়ি। দেখলাম—সত্যই তপঃশীর্ণ, সংস্কৃত শাস্ত্রের প্রভাবে মিষ্টভাষী—বিভূতি তার চেয়ে মধুর হেসে আমাকে জড়িয়ে ধরলে।

তারপর একদিন একা এল।

বললে—একা তোমার সঙ্গে কথা বলতে এলাম।

—বল।

বসল, সিগারেট খেলে।

বললাম—কি বলবে বলছিলে?

সে অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

আমি আবার ডাকলাম—বিভূতি।

—অ্যাঁ?

—বল।

—কি?

—কি বলবে বলছিলে?

—রাগ করবে না তো?

—না। তোমার কথায় আমি রাগ করব বিভূতি?

—ভুলে বলেছি কথাটা। দুঃখ পাবে না তো?

—না। বল তুমি, দুঃখ আমি পাব না।

—তোমার লেখা পড়লাম। একটি লেখা ছাড়া বাকী আমার ভালো লাগল না।

—একটি ভালো লেগেছে তো?

—হ্যাঁ। খুব ভালো লেগেছে।

—কোন্‌টি? কবি?

হাসলে বিভূতি। বোধ হয় তার নিজের কৈশোরের কবিয়ালীর মহড়া দেওয়া মনে পড়ে গেল। বললে—ওটি মন্দ নয়। ভালো। লোকটি খেয়া পেয়েছে পার হবে। আমার ভালো লেগেছে—গণদেবতা পঞ্চগ্রাম—দুইয়ে একটি বই। খুব ভালো লেগেছে। ন্যায়রত্নকে পেলে কোথা? দেখবে তুমি, ওই তোমার পুণ্যগ্রহ হয়ে থাকবে। দেখবে। আমাকে দু-একজন বললে অন্যকথা। কিন্তু—। সে ঘাড় নেড়ে অস্বীকার করলে।

আমি বললাম—আমি তোমার কথা মানি।

সেই তার সঙ্গে আমার শেষ দেখা। কয়েক মাস আগে বিভূতি মারা গেছে। তীর্থ করতে গিয়ে ট্রেন থেকে পড়ে গিয়েছিল। মেয়েরা ছিল মেয়েদের গাড়িতে। পুরুষদের গাড়িতে সে উঠতে গিয়ে উঠতে পারেনি। ফুটবোর্ডে ঝুলে আসছিল। তাকে কোনো ট্রেনের যাত্রী ঠেলে ফেলে দিয়েছিল। হাসপাতালে মৃত্যুকালে কোনো অভিযোগ করেনি। তার বুকে ঝোলায় ছিলেন তার নিত্য আরাধ্য শালগ্রাম শিলা, সঙ্গে বোঁচকায় ছিল কয়েকখানি কাপড় আর শাস্ত্রগ্রন্থ।

বিভূতির কথায় আবেগের বশে কৈশোর ছাড়িয়ে প্রৌঢ়ত্বে এসে পড়েছি, আবার ফিরে কৈশোরে।

রজনীবাবু আসতেন ক্লাসে। ইতিহাস পড়াতেন।

আগের ঘণ্টায় অঙ্ক হয়েছে। বোর্ডে লেখা রয়েছে অঙ্ক। রজনীবাবু অঙ্কগুলি মুছে দিয়ে তিন-চারটি অঙ্ক রেখে দিলেন।

৫৫৬—তার পাশে লিখে দিলেন—B. C.; —বল তারাশঙ্কর—ঐ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে কি হয়েছিল?

—কপিলাবাস্তুর নরপতি মহারাজ শুদ্ধোদনের ঔরসে তাঁহার পত্নী মায়াদেবীর গর্ভে বুদ্ধদেবের জন্ম হয়।

—ভাবীকালে তিনি কি প্রচার করেছিলেন?

—বৌদ্ধধর্ম।

—অহিংসা পরমো ধর্ম।

একদিন এমনি একটা ঘণ্টার পরই শুনলাম, বোর্ডিংয়ের ছেলে এবং গ্রামের ছেলেদের মধ্যে ভয়ানক ঝগড়া হয়ে গেছে।

আমার জীবনের ওই ঝগড়া একটা ঝড়। ঝড়ের মতো এল।

বোর্ডিং-এর ছেলে আর গ্রামের ছেলের মধ্যে ঝগড়া হয়ে গেল।

ফুটবল খেলার মাঠে হল ঝগড়া। তার জের এল ইস্কুলে। খেলার মাঠে ঝগড়াটা কি ভাবে ঘটেছিল জানি না। তখন ইস্কুলে তিনটে টিম। এ, বি, সি। আমরা সি টিমে খেলি। বোর্ডিং-এ ছোট ছেলের সংখ্যা খুব কম। মাত্র দু-একজন। সে সময় আমার সহপাঠী ওই বাঁটকুল মোনা সিং ছাড়া আর কেউ বোধ হয় ছিল না। আশপাশ গ্রামের ছেলেরাও কেউ খেলতে আসত না। আসত বোধ হয় কেবল মহুগ্রামের শরৎচন্দ্র। সে আমার চেয়ে বয়সে বড় হলেও মাথায় আমার মতোই ছিল। —দেখতে ছিল হিলহিলে। বাকি সব আমাদের গ্রামের ছেলে। বীরেশ্বর, বংশী, দ্বিজপদ, বদি, নারাণ, আর এক দ্বিজপদ তাকে বলতাম—বোবা দ্বিজ; তার কথায় ছিল জড়তা।

ফুটবল খেলা নিয়ে সে আমাদের কি মাতন। বিকেলে সাড়ে-চারটে থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যতক্ষণ ফুটবল নজরে পড়ে ততক্ষণ খেলা চলত আমাদের। এ-টিম একটু দূরে, সেখানে কি করে ঝগড়া হল। কখন হল সে দেখবার আমাদের অবকাশ কোথায়? তবে ঝগড়া হল শুনলাম। বোর্ডিং-এর ছেলেদের দলপতি—মনিটার-ক্যাপ্টেন—তিনিও কিন্তু গ্রামের ছেলে। স্বর্গীয় যাদবলালবাবুর প্রথম দৌহিত্র শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। লাভপুরেই বাড়ি—অন্ততঃ তখন ছিল; মস্ত মনোহর তিনতলা বাড়ি। তবুও ধীরেনবাবু থাকতেন বোর্ডিং-এ। ফার্স্ট ক্লাসে পড়তেন তখন।

এদিকের নেতা কালীকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় আর শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার মুখো-

পাধ্যায়। তাঁদের পিছনে গ্রামের ছাত্র এবং প্রাক্তন ছাত্রেরা অর্থাৎ বেকার যুবক সম্প্রদায় পর্যন্ত।

তার উপর গ্রামে তখন সমানে প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্ব চলেছে, স্কুল-প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় যাদবলালবাবুর বংশধর এবং গ্রামের ছাত্রদের মধ্যে।

এরও পরে গ্রামের ছেলেরা নানা আধুনিকতম আন্দোলন, ফ্যাশন হুজুগের সঙ্গে যোগ রেখেই নিজেদের মনে করে দিগ্‌গজ ; পড়াশুনায় এমন অবহেলা করে যে, কোন রকমে দু-কুড়ি সাতের খেলাও বজায় থাকে না ;—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাস মার্ক তিরিশের জায়গায় পঁচিশ ওঠে। কেবল ইংরিজী এবং বাংলাতে কোনক্রমে পাসটা হয়ে যায়। তাদের চুল ছাঁটার ঢং, টেরির বাহার, কামিজের ঝুল, ইস্কুলের অন্য ছেলেদের অন্তরে অতৃপ্তির অশান্তি জাগিয়ে তোলে।

এ দুটো কারণেই মাস্টারেরা একটু বিরূপই ছিলেন গ্রামের ছেলেদের উপর। গ্রামের বাবুদের ছেলেরা বেশ একটু বিলাসী, একটু আইনজ্ঞ, হয়তো বা একটু উচ্ছৃঙ্খলও ছিল, সেই কারণেই মাস্টারেরা বিরূপ ছিলেন। এখানে আইনজ্ঞ কথাটা একটু দুর্বোধ্য মনে হতে পারে। কিন্তু স্কুলেও আইন আছে, সে আইন অন্য ছেলেরা বিশেষ জানত না এবং জানলেও কোনো ক্ষেত্রে শিক্ষকেরা কেউ তা লঙ্ঘন করলেও সে আইন দেখাত না। এরা তা দেখাত। একটি গল্প—গল্প নয়, সত্য কথা বলি। আমাদের 'রাধাদাদা' ছিলেন। রাধাদাদা আমাদের ভাগ্নে গোষ্ঠীর ছেলে, আমাদের প্রতিবেশী ; দিব্যি ফুটফুটে চেহারা, মাথায় কার্তিকের মতো কোঁকড়া চুল ; বাপ-মায়ের বড় আদরের শেষ সন্তান। রাধাদাদাই আমাদের ইস্কুলের প্রথম ছাত্র। ইস্কুলের প্রথম ছাত্র-ভর্তির খাতাখানি আজও আছে—তার প্রথম পাতাতেই —No. I সংখ্যার পাশেই লেখা আছে তাঁরই নাম—শ্রীরাধাশ্যাম মুখোপাধ্যায়। একদা কোন একটা অপরাধের জন্য মাস্টার উঠে গিয়ে রাধাদাদার চুল ধরে পিঠে গালে কিলচড় মেরে তাঁকে পর্যুদস্ত করে বললেন—Stand up on the bench. রাধাদাদা শিক্ষকের দিকে একবার বক্রদৃষ্টিতে চেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে দিব্য বসে রইলেন।

মাস্টার হাঁকলেন—You, Radhashyam!

রাধাদাদা ঘাড় ফেরালেন।

—Stand up on the bench, stand up.

—ন্—ন্—নো। রাধাদাদা তোতলা ছিলেন।

—You stand up.

—ন্-ন্-নেভা—ভা-র!

—আমি বলছি। রাধাশ্যাম।

—আ—আ—প—আপনিই হোন আর যিনিই হোন—বে-আইনী অর্ডার আমি কারুর শুনব না। জজ ম্যাজিস্ট্রেটেরও না। নে—নে—ভার।

—হোয়াট বে-আইনী অর্ডার?

—ইয়েস। বে-বে-বে-আইনী অর্ডার।

এবার আশ্চর্য হয়ে গেলেন মাস্টার। বে-আইনী কথা? কি বে-আইনী কথা!

—ইয়েস—বে-আইনী অর্ডার। একসঙ্গে দুটো পানিশমেণ্ট হতে পারে না। মেরেছেন—ব্যস হয়ে গিয়েছে। যদি না-মেরে বলতেন—Stand up on the bench. —দাঁড়াতাম বেঞ্চের উপর। মার, বেঞ্চের উপর দাঁড়ানো —দু-দুটো পা—পা—পানিশমেণ্ট হতে পারে না একসঙ্গে।

এ আইন কোথায় আছে তা জানি না। তবে রাধাদাদার আইন সম্পর্কে ধারণাটা যে সূক্ষ্ম সে সত্য অস্বীকার করবার উপায় কোথায়? অপরাধ যেখানে একটা সেখানে শাস্তি দুটো তো হওয়া উচিত নয়। পেনাল কোডে অনেক অপরাধে দ্বিবিধ শাস্তির বিধান আছে; আছে—দুটোর একটা বা দুটোই প্রযোজ্য হতে পারে। কিন্তু অপরাধী এ কথা বলতে নিশ্চয় পারে। যাক সে কথা। রাধাদাদা কোনো-মতেই দাঁড়ায় নি সেদিন।

আরও একবার রাধাদাদা এমনি আইনের বলে প্রমোশনই নিয়ে নিলে। বছর তিনেক এক ক্লাসে থেকে সে বছর সটান হেডমাস্টারের কাছে গিয়ে বললে—আইন অনুসারে প্রমোশন পাব এবার। আমি প্রমোশন নিলাম।

সেবার রাধাদাদা পরীক্ষাই দেয়নি। হেডমাস্টার বললেন—দু-বছর পরীক্ষায় ফেল করেছিস—এ বছর পরীক্ষাই দিসনি। প্রমোশন নিবি কি?

—এবার পরীক্ষা দিলে—নি—নি—নিশ্চয় পাস করতাম। শরীর খারাপ ছিল—ডা-ডা-ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিতে পারি আমি।

তাতে হেডমাস্টার মশায় অবিশ্বাস করলেন। তিনি নিজেই ধরতে পারেন না গ্রামের ছেলের অসুখ খাঁটি কি-না। মেলা—মেলার সময় মাথায় সাবান ঘষে গায়ে কাপড় মুড়ি দিয়ে ছেলে এসে দাঁড়াল—স্যার, অসুখ করেছে। জ্বর এসেছে।

কপালে হাত দিয়ে স্যার দেখলেন—সত্যই জ্বর বলে মনে হচ্ছে। ছুটি দিলেন। বাড়ি ফিরে মাথায় তেল দিয়ে পুনরায় স্নান করে টেরি কেটে ছোকরা সেজে সিগারেট মুখে চলে গেল মেলা। খবরও পেলেন মাস্টার। শুনলেন—বগলে রশুন টিপে ঘণ্টাখানেক বসেছিল ছোকরা। এমন বিদ্যা অনেক জানে ওরা। অসুখে অবিশ্বাস না করে মাস্টার মশায় রাধাদাদাকে বললেন—ভাল, এ বছর যে তুই ভাল করে পড়া-শুনা করেছিস—ক্লাস টিচারদের কাছে লিখিয়ে নিয়ে আয়।

—কতজনের কাছে ঘু-ঘু-ঘুরব আমি?

—একজনের কাছে লিখিয়ে নিয়ে আয়।

হেডমাস্টার জানতেন, কোন শিক্ষকই তা দেবেন না।

কিন্তু তাই নিয়ে এল রাধাদাদা। ড্রিল মাস্টার —আমার মাস্টার ব্রজেন্দ্র পণ্ডিতের কাছে লিখিয়ে আনলে—রাধাশ্যাম ড্রিলে সত্যিই ভাল। এবং প্রমোশন নিলে রাধাদাদা ওরই জোরে—আইনের বলে।

রাধাদাদার মধ্যে তবু তো একটি আনন্দময় মানুষ ছিল যার জন্য তার আইন দেখানোটাও কৌতুকগুণে তিক্ত বা মর্যাদাহানিকর মনে হত না। কিন্তু অন্য-অন্য ছেলেদের উত্তর-প্রত্যুত্তরে শিক্ষকেরা ক্রোধে আত্মহারা হয়ে যেতেন। এবং ভয়ও করতেন। আমাদের গ্রামের নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় ভাল ছেলে, সে আমলে

তিনিই ছিলেন আমাদের ওখানকার তারুণ্যের প্রতীক। তিনিই আমাদের ইস্কুলের প্রথম এণ্ট্রান্স পরীক্ষার ছাত্র। ইস্কুল খোলার বছরেই ফার্স্ট ক্লাসে এসে ভর্তি হয়েছেন। কি অপরাধে ইস্কুল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অবিনাশবাবু তার দণ্ডবিধান করলেন—Three canes—তিনটি বেত্রাঘাত এবং সে বেত্রাঘাত হবে ইস্কুলের হলে, সকল ছাত্রের সম্মুখে। কিন্তু সে বেত্রাঘাত করবে কে? মাস্টারেরা নীরবে মাথা হেঁট করে রইলেন। তখন হেডমাস্টার ছিলেন শশী রায়। অগাধ পাণ্ডিত্য —নাস্তিক মানুষ। কিন্তু দুরন্ত ভীতু লোক। তিনি বললেন—আমি পারব না। একজন এগিয়ে এলেন। তাঁর নাম আজ ঠিক মনে নেই। তবে লচু মাস্টার বলেই তিনি পরিচিত ছিলেন। লচু মাস্টার বেত হাতে নিয়ে ইস্কুলের হলে, সর্বসমক্ষে টুলের উপর দণ্ডায়মান গোপালবাবুর পিঠে —ওয়ান—টু—থ্রি বলে বেত চালালেন। এর কয়েক দিন পরেই একদিন রাত্রে লচু মাস্টার লণ্ঠন হাতে ছাত্র পড়িয়ে গ্রাম থেকে বোর্ডিং-এ ফিরছেন—এমন সময় কার নিক্ষিপ্ত অবাধ-লক্ষ্য লোষ্ট্রাঘাতে লণ্ঠন চুরমার হয়ে গেল। কানের পাশ দিয়ে অন্ধকারের মধ্যে ঢেলা ডাক দিয়ে বেরিয়ে গেল। লচু মাস্টার ছুটলেন। ছুটে বাঁচলেন। এবং কয়েক দিন পরেই কাজে জবাব দিয়ে চলে গেলেন।

এই গ্রামেরই বাসিন্দা ছাত্র শম্ভু সরকার গোখরো সাপের বাচ্চা ধরে ছুরি দিয়ে বিষদাঁত ভেঙে পকেটে করে নিয়ে বেড়ায়। মাস্টার কানে হাত দিলে বলে,—খবরদার! গুরুর কান।

মাস্টার পিছিয়ে আসেন সভয়ে। কানে গুরু থাকলে পিঠে বাবা মহাদেবের বাহন ষাঁড় বাস করেন না কে বললে? গালে রামভক্ত হনুমান থাকেন না কে বললে? মনে হয়তো জেগে ওঠেন গোমাতা সুরভির ছবি—প্রতি লোমকূপে বাস করেন এক-এক দেবতা।

ওদের চেয়ে যারা ছোট, যারা ফিফ্‌থ—সিক্স্‌থ ক্লাসে পড়ে, তারা বেত্রাঘাত করলে যন্ত্রণায় মাথা ঘোরাবার অছিলায় হঠাৎ পেটে ঢুঁ মেরে বসে, ব্যাপারটা আকস্মিক দুর্ঘটনা ছাড়া অন্য কোন ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যা করা যায় না। তাতে শিক্ষকের বেত্রাঘাতের সময় শক্তি-প্রয়োগে মাত্রাজ্ঞান-হীনতাই প্রকট হয়ে পড়ে।

এই পটভূমিতে মাস্টার মহাশয়েরা বোর্ডিং-এর ছেলেদের পক্ষেই যদি ন্যায় দেখে থাকেন তবে ন্যায়-অন্যায় ছেড়ে দিয়েও অস্বাভাবিক বলব কি করে? এবং আজ বুঝতে পারি সেদিন অন্যায় যদি-ই বা ছিল বোর্ডিং-এর পক্ষের, তবু আভিজাত্যের ঔদ্ধত্যটা যে এ পক্ষের অসহনীয় পরিমাণেই ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নাই। এবং আরও একটু কিছু ছিল। সেটা ছিল ইস্কুল প্রতিষ্ঠাতাদের প্রতি মাস্টার মহাশয়ের অশোভন এবং ন্যায়হানিকর আনুগত্য। সুদীর্ঘকাল—অন্ততঃ গোটা ইংরাজ রাজত্বের আমল ভোরই—শিক্ষকেরা সরকারী ইস্কুল হলে সরকারের এবং বে-সরকারী ইস্কুল হলে—সরকার ও সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে ইস্কুল প্রতিষ্ঠাতাদের প্রতি যে সকৃতজ্ঞ আনুগত্য পোষণ ও প্রকাশ করে এসেছেন তাতে বহুক্ষেত্রেই বিচার সুক্ষ্ন হতে পায় নি। লাভপুরের ছেলেদের বহু অন্যায়ের সঙ্গে শিক্ষকদের

মানসিকতায় এই অন্যায়টুকু নিঃসন্দেহে ছিল। তবে তা ক্রমশঃ কমে এসেছে। এটা কিন্তু গোড়ার দিকে বেশী ছিল।

এই সব কারণেই ঝগড়াটা একদিনেই চরমাকার ধারণ করলে। সেদিন ইস্কুলে গিয়ে হঠাৎ হেডমাস্টার মশায়ের তীক্ষ্ণকণ্ঠের ক্রুদ্ধ উচ্চ চিৎকারে একবারে হতচকিত হয়ে উঠলাম আমরা—অর্থাৎ বালকবৃন্দ।

চিৎকার উঠছিল—নিকালো। আভি নিকালো। নেহি মাংতা হ্যায় তুমকো মাফিক স্টুডেন্ট—হাম নেহি মাংতা হ্যায়। Get out, get out.

দেখলাম লাইব্রেরী থেকে গলা ধরে হেডমাস্টার মশায় রামগোপালকে বের করে দিচ্ছেন।

রামগোপাল বেরিয়ে চলে গেল।

শুনলাম ফুটবল মাঠের ঝগড়ার বিচার হয়ে গেল।

সেইদিনই গ্রামে ফুটবল ক্লাবের পত্তন হয়ে গেলঃ দি ফুল্লরা অ্যাথেলেটিক ক্লাব। ক্যাপটেন—সুধীরকুমার মুখোপাধ্যায়। সন্ধ্যায় ক্লাবের পত্তন হল, রাত্রেই গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে বিস্তীর্ণ সমতল সবুজ প্রান্তরে মাঠ তৈরি আরম্ভ হয়ে গেল। পর-দিন অপরাহ্ণে আমরা দেখতে গেলাম ; —তাঁরা নিজেরাই কোদাল ধরে খেলার মাঠের দাগগুলি কাটছেন ; দড়ি ধরে সোজা লাইন, সবুজ ঘাসের মধ্যে বীরভূমের লাল মাটির লালচে দাগ চলে গেছে, দুপাশে গোলপোস্টও পোঁতা হয়েছে, চার কোণে চারটি লাল পতাকা উড়ছে ; নতুন একটা ফুটবলও এসেছে এরই মধ্যে ; কেমন করে এল তা জানি না। তবে এসেছিল। হয়তো দিনটা ঠিক পরের দিন না হয়ে আরও একদিন পরে হতে পারে। সম্ভবতঃ কলকাতায় লোক পাঠিয়ে আনা হয়েছিল।

গ্রামে তখন ছাত্র আর প্রাক্তন ছাত্র নিয়ে যে টিম সে প্রায় দুর্ধর্ষ মোহনবাগান। সত্যই তাঁরা খুব ভাল খেলোয়াড় ছিলেন। বিশেষ করে কয়েকজন। রজনীদা সেণ্টার ফরোয়ার্ড, বাঁ-পা ডান-পা সমান চলে এবং পায়ের বল চলে এঁকে-বেঁকে পাশ কাটিয়ে—কারও সাধ্য হয় না সে বল স্পর্শ করে। শুধু বল গোলের পাশ দিয়ে চলে যায় এই দোষ, আর কেউ রজনীদার দিকে বাঙ্গ ঠুকে এগিয়ে গেলেই তিনি বল ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়ান; ওসব গুঁতোগুঁতির মধ্যে তিনি নেই। আর আছে রাম-গোপাল। সে সত্যই দুর্ধর্ষ, সে সবেই রাজী—তাকেই সকলের বেশী ভয়। সে উত্তর জীবনে খেলার জন্যে কলকাতার জি. পি. ও.-তে চাকরি পেয়েছিল। আর আছে ওরম্বা—ফুলব্যাক। এরা ছাড়া—সুধীরবাবু, কালীকিঙ্করবাবু, এঁরাও ভালোই খেলেন।

দিন কয়েক, বোধ হয় দিন সাতেক পরেই ইস্কুলের ভিক্টোরিয়া অ্যাথেলেটিক ক্লাবের সঙ্গে ফুল্লরা অ্যাথেলেটিক ক্লাবের ম্যাচ হয়ে গেল। সে আমাদের কি উৎসাহ। দেবে, অন্ততঃ পাঁচ-সাতখানা গোল দেবেই ফুল্লরা অ্যাথেলেটিক ক্লাব।

রাধাদাদা খেলে না কস্মিনকালে। সে ফুল্লরা ক্লাবের উৎসাহদাতা। মোহনবাগানের ভাগ্যেও বোধ করি এমন উৎসাহ দাতা দু-একটির বেশি নেই। ঝিপ ঝিপ করে

বৃষ্টি নেমেছে সকাল থেকে। অপরাহ্ণে খেলার আগেই প্রচণ্ড বর্ষণ হয়ে গেল। ভাগ্য মোহনবাগানের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। তবে মাঠ আমাদের বিচিত্র। যতই বৃষ্টি হোক, পা পেছলাবে না। বরং একটু নরম হবে মাটি। খেলোয়াড়েরা বিয়ার খাওয়া ঘোড়ার মতো বোধ হয় বুঁদ হয়েছিলেন; বল পেলেই ছুটবেন হলদিঘাটের চৈতকের মতো। সামনে কেবল বাধা—ফুলব্যাকে গোবিন্দ মাস্টার, দি ওয়াইল্ড এলিফ্যান্ট। তা সকলেই চৈতকের মতো জোড়া পা তাঁর শুঁড়ের উপর তুলে দিতে বদ্ধপরিকর। শুধু একটু কাবু হয়েছেন ঘণ্টাখানেক মুক্ত প্রান্তরে প্রবল বর্ষণে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজে।

জল কম পড়লে—রিমি-ঝিমির মধ্যে এল ভিক্টোরিয়া ক্লাবের দল। খেলোয়াড়েরা দাঁড়াল—দেখলাম আমাদের ক্যাপটেন ও সেণ্টার হাফব্যাক সুধীরবাবু মাঠের বাইরে একটা বন্দুক হাতে দাঁড়ালেন। হুইসিল পড়বামাত্র তিনি ফায়ার করলেন একটা। তার পরেই বন্দুকটা ফেলে ছুটে গিয়ে নিজের জায়গা নিলেন।

আমাদের গোলে খেলছে রামধারী তেওয়ারী; থানার হেড কনেস্টেবল তার কাকা—তাকে এখানে ইস্কুলে পড়বার জন্যে এনেছে। বেশ একটু টান থাকলেও বাংলা ভালই বলে। লম্বা চেহারা, চেহারার অনুপাতে হাত দুখানার আকার বেশী লম্বা—আজানুলম্বিত যাকে বলে, তাই। তার নাগালের বাইরে দিয়ে বলের যাওয়া খুব সহজ নয়। আর এখানে এসে অবধি রামধারী এই সাধনাটিই নিয়মিত করেছে। তার কাকা বীরভূমেই এ-থানা ও-থানা করে বেড়িয়েছেন। রামধারী কাকার পরিত্যক্ত বাসায় স্বপাকে খেয়েছে। সিদ্ধি ঘুঁটেছে আর গোলে নিয়মিত গোলকিপারী করেছে আর নিয়মিত ফোর্থ ক্লাসেই পড়েছে। বোধ হয় সাত-আট বছরে মাত্র তিনটি ক্লাসের পড়া শেষ করে সে হঠাৎ একদা গেরুয়া পরে বেরিয়ে পড়েছিল। যাক। খেলার কথা বলি। খেলা শুরু হল। দুর্দান্ত খেলা। বেমক্কা বল ছুটতে লাগল বোর্ডিং-এর দলই কাবু হয়েছে কিন্তু বল গোলের দিকে যাচ্ছে না। মধ্যে মধ্যে গুঁতোগুঁতি হচ্ছে। বিলিতি মাস্টার বল ঠেকাচ্ছেন; আবার আসছে আবার ঠেকাচ্ছেন। হঠাৎ বলটা একবার হাফব্যাক লাইন পেরিয়ে চলে গেল ফুল্লরা ক্লাবের দিকে। বল পেলে ফুল্লরা ক্লাবের হাফব্যাক। সে বলটাকে ধাঁ করে নিজেদের গোল লক্ষ্য করে মেরে দিলে। রামধারীও আশ্চর্য, সে ধরলে না। গোল হয়ে গেল। সেমসাইড গোল।

তখন বোধ হয় সেমসাইড গোল, গোল বলে পরিগণিত হত না। অন্ততঃ সে খেলায় হয় নি। ভিক্টোরিয়া ক্লাবের এঁরাও দাবি করেন নি। ব্যাক লাইন থেকেই বলটা মারা হল। রাধাদাদা ছুটে গিয়ে হাফব্যাককে বললে—এ-এ-কি-কি হল? গ—গা—গাধা কোথাকার?

হাফব্যাক এ গোলটা ভিক্টোরিয়া ক্লাবের গোল মনে করেছিল সিদ্ধির ঝোঁকে। অথবা পায়ের বে-ঠিকে এ-দিকে মারতে ও-দিকে মেরে দিয়েছে। সে বললে—ওদের ফরোয়ার্ড বাঘের মতো এসে পড়েছিল তাই আমিই মেরে দিলাম। আমি না-মারলে সে মেরে দিত। কি হত তখন? রামধারী তো ঢুলছে।

রামধারী বললে—রামধারী ঢুলে না দাদা। সে ঠিক দেখেছে। ওরা মারত

রামধারী জান দিয়ে ধরত। কিন্তু সেমসাইড বল রামধারী ছোঁবে কোন্ মুখে! ছো—ছো—ছো! লজ্জা নাই রামধারীর?

যাক, এইভাবে প্রথম খেলা শেষ হল।

এরই ঠিক কয়েকদিন পরেই গ্রাম-জীবনের বিচিত্র আকর্ষণে আমি পড়ে গেলাম এই দ্বন্দ্বের মধ্যে—মধ্যে নয় ফুল্লরা ক্লাবের পুরোভাগে সকলে আমাকে খাড়া করে দিলে।

ব্যাপারটা হল এই।

যে জায়গায় ফুল্লরা ক্লাব খেলার মাঠ তৈরি করেছে—সে জায়গাটির মতো খেলার উপযুক্ত জায়গা কদাচিত পাওয়া যায়। সবুজ ঘাসভরা সুন্দর সমতল প্রান্তর। স্থানটি বিস্তীর্ণ। পাশাপাশি তিন-চারটি খেলার মাঠ হতে পারে। ইস্কুলের মাঠটি ইস্কুলের কাছে কিন্তু বীরভূমের তৃণহীন রুক্ষ পাথুরে ডাঙা ; সেখানে মা-ধরণী ব্যাঘ্রীর মতো হিংস্র। বাচ্চা আঘাত করলে বাঘিনী যেমন প্রতিশোধে কামড়ে রক্ত দেখে ছাড়ে, তেমনি ভাবেই এখানে কেউ মাটিকে আঘাত দিয়ে আছাড় খেলে মাটিতে খানিকটা রক্ত রেখে উঠতে হয়। এই সবুজ মাঠখানি ইস্কুল থেকে দূরে বলে হেডমাস্টার মশায় এদিকে আসতে দেন নি। তা ছাড়া এ জায়গাটি ইস্কুল কর্তৃপক্ষের সম্পত্তি নয়। যে স্থান তাঁদের সম্পত্তি নয় সেখানে তাঁদের ইস্কুলের ছাত্ররা খেলবে এটা তাঁরাও অনুমোদন করতেন না। এবার ফুল্লরা ক্লাবের ছেলেরা এখানে খেলতে শুরু করায় বোর্ডিং-এর ছেলেরা ধীরেন্দ্রবাবুর নেতৃত্বে এখানে এল খেলতে। খেলার মাঠ তারা দাগ দিয়ে ছকে গেল।

ফুল্লরা ক্লাবের ছেলেরা এসে আমাকে টেনে দাঁড় করালে সামনে। আমি হলাম ফুল্লরা ক্লাবের বি-টিমের ক্যাপটেন। এক মুহূর্তে সি থেকে বি-এ প্রমোশন এবং একেবারে কমিশন লাভ—ক্যাপটেন পদ প্রাপ্তি।

এর কারণ ওই বিস্তীর্ণ মাঠটি আমাদের মহলের সীমানাভুক্ত, জমিদারের খাস পতিত।

আমাকে সামনে দাঁড় করিয়ে ভিক্টোরিয়া ক্লাবের সঙ্গে ঝগড়া হল। ভিক্টোরিয়া ক্লাবকে স্বত্বের মামলায় পরাজিত হয়ে হঠে যেতে হল। তারা ফিরে গেল ক্রুদ্ধ হয়ে, ক্ষুণ্ণ হয়ে। আমরা প্রচণ্ড উৎসাহে খেললাম সেদিন। আমি ক্যাপটেন। সেদিন বুঝলাম না কি হল। ফুল্লরা অ্যাথেলেটিক ক্লাব আমার ঘাড়ে চাপল। বছর তিনেক এর পর সুধীরবাবু কালীকিঙ্করবাবুরা ছিলেন—তারপর তাঁরা চলে গেলেন। আমার ঘাড়ে ফুল্লরা ক্লাব চেপে রইল। আমি, বীরেশ্বর, বংশী নিত্য যাই। বল খেলি—বাড়ি এসে ক্লান্তভাবে শুয়ে পড়ি। ইস্কুলে হেডমাস্টার মশাই বিরূপ হলেন আমার উপর। গ্রাম্য দ্বন্দ্বের সূত্রে প্রচ্ছন্ন বিরূপতা একটু ছিলই। একথা নিঃসংশয়েই বলছি। সেটা বাড়ল, প্রকাশ পেলে এইবার। তাতে সহসা ঘৃতাহুতি পড়ল একটি ঘটনায়।

হেডমাস্টার মশায় গ্রামে বোর্ডিং-এ ম্যাচ নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন।

আমি এবং বীরেশ্বর একদিন পরামর্শ করলাম—আর তো ভাল লাগে না ভাই।

শক্তি পরীক্ষা না-করে আর তো থাকা যায় না। যার সঙ্গে হোক ম্যাচ খেলে তাদের হারিয়ে দিয়ে নিজেদের ধ্বজা না ওড়ালে বৃথাই এ জীবন।

অতএব ম্যাচ খেলা স্থির হল আমাদের গ্রাম থেকে সাত মাইল দূরের কীর্ণাহার ইস্কুলের টিমের সঙ্গে।

আমি তখন ফোর্থ ক্লাসে পড়ি। বয়স বারো। বীরেশ্বর থার্ড ক্লাসে, তার বয়স চৌদ্দ। সুতরাং এ-টিমের সঙ্গে কৌশলে যদি বা পারি শক্তিতে পারব কেন?

চ্যালেঞ্জ করা হল। তাঁরা যুদ্ধ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। এলেন। বেলা তখন প্রায় এগারটা। এলেন প্রায় পঁয়ত্রিশ জন। আমরা পনেরো জনের চাল-ডাল-মাছ-তরকারি যোগাড় করেছি—পঁয়ত্রিশ জনের খাদ্য বেলা বারোটায় কোথায় পাই? তবে পাওয়া গেল; বহু কষ্টে দেবস্থান ফুল্লরাতলায় খাবার ব্যবস্থা করলাম। খেতে বেলাও গেল—কষ্টও হল। আর তাঁরা এসেছেন প্রত্যেকেই আঠারো থেকে বিশ বছরের ছেলে—অর্থাৎ এ-টিম। এদিকে বোর্ডিং-এর ছেলেরা খবর পেয়ে এগিয়ে এলেন। মিল হয়ে গেল দু-পক্ষের অর্থাৎ গ্রাম ও বোর্ডিং-এ। একটা মিলিত টিম তৈরি হল। এঁরা বেঁকে বসছেন। আমাদের যোগ্য সম্মান হয় নি। খেলব না। প্রচুর রসগোল্লা এল। তাঁদের সম্মান করা হল—খাওয়ানোও হল। তাঁরা খেয়ে দেয়ে শেষ মুহূর্তে চলে গেলেন, খেললেন না।

কয়েকদিন পরেই হেডমাস্টার আমাকে ডাকলেন। বেত্রাঘাত করলেন এবং জরিমানা করলেন পাঁচ টাকা। ওদের হেডমাস্টার চিঠি লিখেছেন—তাঁর ছাত্ররা অভিযোগ করেছে। আমার হেডমাস্টার মশায় কিন্তু একবারও আমাকে আমার কথা বলবার সুযোগ দিলেন না।

পিসীমা, মা বাড়ি বসেই শুনেছিলেন।

বাড়ি থেকে লোক এল—পাঁচটি টাকা নামিয়ে দিয়ে বললে—তারাশঙ্করবাবুর জরিমানা।

হেডমাস্টার মশায় বললেন—ফুটবল খেলা তোর বন্ধ।

আমি কিন্তু সেই দিনই যথানিয়মে গেলাম ফুটবল খেলতে। চিত্তে বোধ হয় বিদ্রোহ এমনি করেই জাগে।

পাঁচ

সেই বোধ করি আমার জীবনে প্রথম বিদ্রোহ উপলব্ধি।

এর আগেও কি পারিপার্শ্বিকের বন্ধন, পীড়াদায়ক আদেশ. অতৃপ্তিকর অরুচিকর যা কিছু সে সমস্তকে লঙ্ঘন করবার চেষ্টা করি নি? করেছি—অনেকবার করেছি। বাল্যে বাড়ির গণ্ডির মধ্যে সে তো বারবার বহুবার ঘটেছে। শৈশবে যখন কথা ফোটে নি তখন ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঘুম পাড়াতে চেষ্টা করলে, খাওয়াবার চেষ্টা করলে চিৎকার করে বাড়ির শান্তি ছিন্নভিন্ন করে কেঁদেছি, সেও বিদ্রোহ। কিন্তু

তবু বলব—সে বিদ্রোহে আর এ বিদ্রোহে প্রভেদ আছে। হেডমাস্টার আদেশ করলেন—ওই গ্রামের ফুটবল টিম ফুল্লরা ক্লাবে আমি খেলতে পাব না। তিনি জানতেন আমি ছেড়ে দিলেই ওটা উঠে যাবে। ইস্কুলের ফুটবল ক্লাবে আমার খেলা বন্ধ করেন নি। সেখানে খেলতে গেলে তিনি খুশীই হতেন হয়তো। কিন্তু খেলার কথাটা তখন প্রশ্নই নয়। আমার প্রশ্ন অন্য। আমার প্রশ্ন—অধিকার নিয়ে। কোনো অন্যায় করি নি, তবু কেন আমি দণ্ডিত হলাম? শুধু প্রশ্নও নয়—ক্ষোভও ছিল। ক্ষোভ এই যে, ওদের স্কুলের শিক্ষক—নিজেদের ছাত্রের কাছে যা শুনলেন—তাই বিশ্বাস করে পত্র লিখলেন। আর আমার স্কুলের শিক্ষক একবারও আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন না—আমার কি বলবার আছে? তা ছাড়া, ফুল্লরা ক্লাব তখন আমার কৈশোর-কীর্তির কুতুব-মিনার। আমি তার ক্যাপ্টেন। সেই কীর্তিস্তম্ভকে কেউ যদি নিজের হাতে ভূমিসাৎ করে দিতে বলে—তবে কি তাই কেউ পারে? রক্তচক্ষু আদেশকর্তা যত জোরে উচ্চারণ করেন—ভাঙো, ঠিক তত জোরেই প্রতিধ্বনি ফিরে আসে—বিদ্রোহী আদিষ্টের মুখ থেকে—না।

আমার বিচারে উপলব্ধিতে আমার দিকে কোন ত্রুটি ছিল না। তাতেই পেলাম আমি অপরিমেয় শক্তি। সমস্ত দিন আমি নীরবে চিন্তা করলাম। ইস্কুলের পড়া একবর্ণ আমার কানে গেল না। আমি ভাবলাম—শুধু ভাবলাম। কিছুতেই আমার অন্তর ওই আদেশ পালন করতে সম্মত হল না। যে মুহূর্তে ভাবতে চেষ্টা করলাম যে, না—যাবে না, সেই মুহূর্তেই বুকের ভিতরটায় একটা প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হল, সে যেন একটা ঘূর্ণাবর্তে অন্তরটা মূলশুদ্ধ উপড়ে পড়বে বলে মনে হল, চোখ ফেটে জল এল, ঠোট দুটি থরথর করে কাঁপতে লাগল। একটা প্রশ্ন —শতবার শতদিকে ধ্বনিত হয়ে উঠল—কেন? কেন? কেন?

আজও মনে করতে পারি।

চোখ জ্বালা করছিল। আগুনের শিখার মতো কিছু যেন আমার অন্তরকে দগ্ধ করছিল। মাথার ভিতরে চিন্তার শক্তি বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। চোখের দৃষ্টিতে সব যেন অর্থহীন হয়ে গিয়েছিল।

বাড়ি ফিরলাম।

জল খেলাম। তারপর বৈঠকখানায় গিয়ে যে আলমারিতে আমার ফুটবল থাকত তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ধীরে ধীরে বলটি বের করলাম। হুইশিল গলায় ঝুলিয়ে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। মনে তখন আর প্রশ্ন নাই, শঙ্কা নাই, চোখের সম্মুখে পৃথিবী তখন অর্থহীন নয়, বুকের ভিতর সমস্যার অমীমাংসার কোনো উদ্বেগ নাই। আমি পথের উপর নামলাম। সামনে আমাদের গ্রাম্য রাস্তা মাঠের দিকে চলে গিয়েছে। মাঠ ভেঙে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা ধরে চললাম খেলার মাঠে। মুখের বাঁশী বাজাতে বাজাতে চলেছি। ডাক দিয়ে চলেছি—এস এস। শান্ত দৃঢ় পদক্ষেপ, ভয়শূন্য চিত্ত। চিন্তাশূন্য অন্তর, মাথা উঁচু করেই পথ হেঁটে এসে গ্রাউণ্ডে পোঁছেই বলটাকে সবল পদক্ষেপের আঘাতে ঊর্ধ্বলোকে পাঠিয়ে দিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই বীরেশ্বর এবং বংশী এসে উপস্থিত হল। আরও একজন বোধহয়

ছিল—বোবা দ্বিজপদ। তারা আমার আগেই এসেছে; মনের বেদনায় তারা খোলা-মাঠের ওদিকে বীরভূমে প্রসিদ্ধ খোয়াইয়ের মধ্যে বসেছিল। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে—তারা কেঁদেছিল হয়তো। ফুটবলের শব্দ পেয়ে তারা ছুটে এসে উপস্থিত হল। তারপর বাইশজনের বদলে চারজনে খেলা শুরু হল। দল নাই, গোল নাই, শুধু ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা। সে দিনের সে কি খেলা! বীরেশ্বরের সে দিনের কি শট। বংশীর সে কি ড্রিবলিং। উল্লাসে আনন্দ চারজনে আমরা যেন স্নান করে উঠলাম। প্রসন্ন পরিপূর্ণ অন্তর নিয়ে বাড়ি ফিরলাম।

এর পর এল চিন্তার পালা।

বিদ্রোহ করেছি, এর পর কাল ইস্কুলে বিদ্রোহ দমনের বেত্রহস্ত শক্তির সম্মুখীন হতে হবে। সমস্ত রাত্রি ঘুম হল না। ভয় নয় শুধু চিন্তা করলাম—কি বলব? কেমন ভাবে বলব? জানি বেত্রাঘাত হবে, সে বেত্রাঘাত কেমন ভঙ্গিতে সহ্য করব—সেই চিন্তা করলাম—ছবি আঁকলাম। কল্পনা করলাম, আবার কাল বৈকালে বেত্রাঘাত-জর্জরিত দেহে ফুটবল হাতে নিয়ে বাঁশী বাজিয়ে চলব খেলার মাঠে।

আমার পিসিমা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—কি হয়েছে রে? সমস্ত রাত্রিই জেগে রয়েছিস। নড়ছিস, এ-পাশ ও-পাশ করছিস?

আমার পিসীমা—আমার জীবনের এক বৃহৎ অধ্যায়। আমার মা, আমার বাবার পর এই পিসীমাই আছেন আমার জীবন জুড়ে। তিনি আমার কৈশোর জীবনের ছায়াছত্র। পিতৃবিয়োগের পর, তিনিই বসেছেন আমার পিতার আসনে। আমাদের ঘর-সংসার বিষয় আশয় তাঁরই অঙ্গুলি নির্দেশে পরিচালিত হয়। রোগ-মৃত্যু এবং দৈব-দুর্ঘটনার কাছে তিনি ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল, কিন্তু বাস্তব পৃথিবীর অপর কিছুতে তাঁর বিন্দুমাত্র শঙ্কা ছিল না। অসীম সাহসে তিনি দাঁড়াতে পারতেন। বাবার তিরোধানের পর প্রাচীন কালের বিষয়ী ঘরের আভিজাত্য-মহিমা তাঁকে আশ্রয় করেই আমাদের সংসার অক্ষুণ্ণ এবং অটুট ছিল।

আমার বয়স তখন তেরো বৎসর। পিসীমা এবং আমি এক ঘরে শুই। স্নেহময়ী আপন শয্যায় শুয়েও বুঝতে পেরেছেন আমার নিদ্রাহীন অবস্থার কথা। এক সময় তিনি প্রশ্ন করলেন। উঠে এসে বসলেন আবার মাথার শিয়রে।

—কি হয়েছে?

গায়ে হাত দিয়ে উত্তাপ দেখলেন। মাথায় হাত দিলেন।

—শরীর খারাপ হয়েছে?

—না।

—তবে ঘুম হচ্ছে না কেন?

চুপ করে থেকে বললাম—কি জানি?

তিনি এবার আলো জ্বালালেন। —বল তো কি হয়েছে?

—কি বলব? হয় নি কিছুই।

—হয়েছে। আমি বুঝতে পারছি তোর মুখ দেখে। বল।

বলতে হল। বললাম।

তিনি চুপ করে থাকলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন—তখনই আমি বলেছিলাম জরিমানার টাকাটা এমন করে দেব না। দিতে হলে আমি যাব। মাস্টারকে জিজ্ঞাসা করব—বিচার তিনি করেছেন কি না? তারপর দেব। কিন্তু বউ বললে—না। কোন কথা বলবার দরকার নাই। বাদ-প্রতিবাদ কিছু না করেই টাকাটা পাঠিয়ে দাও।

তারপর আবার বললেন—বারণই যদি করেছিল মাস্টার তবে তা শুনলি না কেন? গেলি কেন খেলতে?

—খেলা কি অন্যায়?

—অন্যায় নয়। কিন্তু এখানে খেলতে বারণ করেছিল; ওখানে না খেলে ইস্কুলে খেললেই হত।

—ওখানে খেলতে গিয়েও তো কোন দিন কোন অন্যায় করি নি। তবে যাব না কেন?

পিসীমা চুপ করে রইলেন।

আমি আবার বললাম—তা ছাড়া আমাদের গ্রামের ফুটবল টিম উঠে যাবে?

পিসীমা বললেন—কি করবি? কাল যদি অপমান করে কি মারে?

—মার খাব। অপমান সহ্য করব।

পিসীমা বললেন—ঘুমো। কাল যা হবার হবে!

আলোটা তিনি নিভিয়ে দিলেন। আমার মাথায় হাত বুলাতে লাগলেন। আমি ঘুমিয়ে গেলাম। পরদিন সকালে একবার মনে হল, যাব না ইস্কুল। কিন্তু সে দুর্বলতা জয় করলাম। গেলাম ইস্কুলে। প্রতীক্ষা করে রইলাম, কখন কেষ্ট চাকর এসে ডাকবে—তোমাকে ডাকছেন হেডমাস্টার। মনে হল সারা ইস্কুলে যে গুঞ্জন উঠেছে, সে গুঞ্জনের মধ্যে আমার কথাটাই বড় হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ ক্লাসে এসে ঢুকলেন নীলরতনবাবু—থার্ড মাস্টার।

নীলরতনবাবু আমার 'ধাত্রী-দেবতা'র রামরতনবাবু মাস্টার। এক মুখ দাড়ি গোঁফ—বিশালকায় পুরুষ, সদানন্দ মানুষ, দেবতার মতো চরিত্র,—বহু শতের মধ্যে এমন মানুষ মেলে; নির্লোভ, নির্ভীক, বিচিত্র। তেমনি কোমল, মধুর। লোকে বলত পাগল। ব্রজেন্দ্রবাবু এখান থেকে চলে গেলেন যখন তখন আমি সিক্সথ্ ক্লাসে পড়ি। ফোর্থ ক্লাস থেকে আমি নীলরতনবাবুর কাছে প্রাইভেট পড়তাম। নীলরতনবাবুর সঙ্গে কিন্তু ঘনিষ্ঠ সংস্রব তার অনেক দিন আগে থেকেই। তিনি আমাদের বাড়ির পাশের বাড়িতেই প্রাইভেট শিক্ষক হিসাবে থাকতেন। তাঁর ছাত্র দুটি পিতা-মাতার সমাদরের সন্তান। আদরে যে সৃষ্টি অনাসৃষ্টিতে পরিণত হয়, তাই। ষষ্ঠী এবং রাধাশ্যাম দুজনেই লেখাপড়া ছেড়ে দিলে। তবু তাদের অভিভাবকেরা নীলরতনবাবুকে ছাড়লেন না। মাস্টারও তখন স্নেহবন্ধনে বাঁধা পড়েছেন। বিচিত্র মানুষ। জাতিতে ছিলেন কুম্ভকার। আপন মনে চিৎকার করে ছড়া বলতেন—

কুম্ভাকারে ধুম্রাকার
ধুম্রাকারে মেঘাকার
মেঘাকারে জলাকার।

বাপু হে আমরা সামান্য নই। জলাকার বলেই না ধান হয়। বলে হা-হা করে হাসতেন।

ম্যালেরিয়া জ্বর যখন আসত তখন লেপ মুড়ি দিয়ে খামার বাড়িতে পোয়াল গাদায় গিয়ে শুতেন।

সুস্থ শরীর থাকলে শীতের দিনেও খোলা যায়গায় শুতেন। ষষ্ঠীর দাদা শীতের দিনে তাঁকে বাইরে মাত্র একখানা চাদর গায়ে শুয়ে থাকতে দেখে বলেছিল—মাস্টার, তুমি কি হে?

মাস্টার গম্ভীরভাবে উত্তর দিয়েছিলেন—আমি মহিষ।

আমাকে বড় ভালবাসতেন। কত বিচিত্র কথা বলতেন। আমাদের গ্রাম সম্পর্কে বলতেন—মাই বয়, তোমাদের গ্রামটি ভয়ঙ্কর, ভয়ঙ্কর গ্রামের ভয়ঙ্কর মানুষ যেন হবে না। এইটাই একমাত্র শিক্ষা আমার।

তারপরই চুপি চুপি বলতেন—তবে বলি শোন। তখন আমি আমেদপুর মাইনর স্কুলের হেডমাস্টার। স্টেশনে যাই—দেখি, সব বাবুরা নামছে। এই চুলকাটা, এই টেরি, এই জামা, এই অলেস্টার, এই নাইট ক্যাপ। বাপরে—বাপ রে—বাপ রে—। সে বাবু দেখে কেমন যেন হয়ে যাই। তারপর টগটগ টগবগ করে জুড়ি গাড়ি আসে। জিজ্ঞাসা করি কোথাকার বাবু? না লাভপুরের। ভাবি, না জানি লাভপুর কেমন? তারপর লাভপুরে ফোর্থ মাস্টারের পোস্ট খালি হল—দিলাম একটা দরখাস্ত করে। দরখাস্ত করে কিন্তু ভয় হল। কি জানি—যদি দরখাস্ত মঞ্জুর হয়। হে ভগবান, রক্ষা কর! লাভপুরে আমি যাব কি করে? আমার মোটা কাপড়, তিন বছরের জুতো এক জোড়া, সে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে, শীতের দিনে একটা চটের ওভার কোট গায়ে দি। গানি ব্যাগ কেটে সেটা আমিই তৈরি করেছিলাম নিজে। এই সব নিয়ে লাভপুর যাব কি করে? হে ভগবান! Oh God! হে আল্লা! রক্ষে কর। তা বাপু রক্ষে করলেন না তাঁরা! দিলেন ঠেলে বিপদের মুখে। মঞ্জুর হল দরখাস্ত। তা একবার ভাবলাম যাক মরুক গে, দিই লিখে—আমি যাব না। কিন্তু অদৃষ্টের টান—পড়লাম এসে।

বলেই হা-হা করে হাসতেন।

জীবনে নেশা ছিল না, বিলাস ছিল না, ছিল প্রাণভরা আনন্দ। ছিল ভিতরে বাইরে সুনির্মল পরিচ্ছন্নতা। অঙ্কের মাস্টার—বেড়াতে বেরিয়ে লাল মাটির উপর কাঠি দিয়ে অঙ্ক কষতেন। প্রিয় ছিল তাঁর মিল্টনের কাব্য। প্রিয় কবি ছিলেন তাঁর রবীন্দ্রনাথ। শান্তিনিকেতনের অনতিদূরে—বোধ হয় মাইল তিনেকের মধ্যেই তাঁর বাড়ি। রবীন্দ্রনাথের গল্প বলতেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্য তিনি ভাল করে পড়েন নি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রতি ছিল তাঁর আন্তরিক অনুরাগ।

নীলরতনবাবু থার্ড মাস্টার মশাই এসে ক্লাসে ঢুকলেন। বললেন—তারাশঙ্কর,

এস আমার সঙ্গে। ক্লাসের মাস্টারকে বললেন—দরকার আছে, ওকে একবার নিয়ে যাচ্ছি।

বেরিয়ে গেলাম। একেবারে ইস্কুল থেকে বেরিয়ে পাশের আম-বাগানে গেলেন। বললেন—হেডমাস্টার মশায়ের কাছে তোকে ক্ষমা চাইতে হবে।

আমি সবিস্ময়ে মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

নীলরতনবাবু বললেন—পিসীমা আমার হাতে একখানি পত্র দিয়েছেন হেডমাস্টার মশাইকে দিতে। দেখ—পত্রখানা।

আমার মায়ের সুন্দর হস্তাক্ষরে পত্র।

মান্যবরেষু,

মহাশয়, আমার ভ্রাতুষ্পুত্র তারাশঙ্করকে আমিই কাল বৈকালে যথারীতি খেলিতে যাইতে আদেশ করিয়াছিলাম। সে এ পর্যন্ত ওই খেলার সূত্রে কোনো অন্যায় করে নাই। অন্ততঃ আমাদের দৃষ্টিতে কোন অন্যায় চোখে পড়ে নাই। সেই কারণে এবং গ্রামের ছেলেদের এই খেলার দলটি উঠিয়া গেলে ছেলেরা দুঃখ পাইবে —গ্রামের পক্ষেও লজ্জার কারণ হইবে। এই কারণে তাহাকে খেলিতে আমিই বলিয়াছিলাম। আপনি এই লইয়া তাহাকে শাস্তি দিলে সে শাস্তি আমাকেই দেওয়া হইবে। ইতি—তারাশঙ্করের পিসীমা।

পত্র-রচনা আমার মায়ের কিন্তু প্রতিটি ছত্রে পিসীমায়ের কণ্ঠস্বর এবং দৃঢ় বাচনভঙ্গির পরিচয় প্রত্যক্ষ। কিন্তু পত্র পড়ে কি বলব? আমার বলবার আছে কি? আমি চুপ করে রইলাম।

নীলরতনবাবু বললেন—এ পত্র আমি হেডমাস্টার মশায়কে দিই নি। দেবও না। যা বলবার সে আমি তাঁকে বলেছি। তিনি হেডমাস্টার—শিক্ষক—গুরু, সেই কারণে তোকে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।

আমি তবুও চুপ করে রইলাম। আমার মনে সেই প্রশ্ন—কোথায় আমার অন্যায়? অন্যায় আদেশ প্রতিপালন না করাও কি অন্যায়?

মাস্টার মশাই আমার হাতের উপরে ধরে বললেন—চল।

নীরবেই আমি তাঁর অনুসরণ করলাম।

গিয়ে দাঁড়ালাম লাইব্রেরী বা আপিস ঘরে। হেডমাস্টার কিছু পড়ছিলেন, তাঁর পাঁশনে চশমা খুলে হাতে নিয়ে আমার দিকে তাকালেন। আমি ধীরভাবেই দাঁড়িয়ে রইলাম। চঞ্চল হই নি আমি। স্পষ্ট মনে আছে।

আশ্চর্য, কোন কথা আমার মুখ থেকে বের হল না। আমি বলতে পারলাম না—স্যার, অমি মাফ চাইতে এসেছি। কিন্তু চোখে জল এল, গড়িয়ে পড়ল গাল বেয়ে। সে কান্নায় কোন উচ্ছ্বাস ছিল না। ছিল শুধু চোখের জল। সে দিন চোখের জলই আমার সকল কথা ব্যক্ত করে দিয়েছিল।

নীলরতনবাবু বললেন—ও আপনার কাছে মাফ চাইতে এসেছে।

হেডমাস্টার মহাশয়ের কঠিন মুখ ক্রমশঃ যেন কোমল হয়ে এল। এল বোধ হয় আমার চোখের ওই ধারা দেখে। বললেন—আচ্ছা, এবার মাফ করলাম আমি। যাও, পড়াশুনা করগে।

চলে আসছি, আবার ডাকলেন।

বললেন—এবার থেকে কোথাও ম্যাচ খেলতে হলে আগে আমার পারমিশন নিতে হবে। বুঝেছ? খেলতে হয়—আমি বন্দোবস্ত করে দেব। ডু ইউ আণ্ডারস্ট্যাণ্ড?

ঘাড় নেড়ে জানালাম—বুঝেছি। স্বীকারও করে নিলাম সানন্দে।

পররাষ্ট্র নীতি তাঁর হাতে তুলে দিয়ে হাসতে হাসতে ফিরে এলাম। ফুল্লরা অ্যাথলেটিক ক্লাব বেঁচেছে। মরে নি।

বিদ্রোহ আমার জয়যুক্ত হল।

ছয়

বিদ্রোহ আমার জয়যুক্ত হল, কিন্তু সে জয় আমার সম্ভবপর হল দেবতা প্রসাদেই। পিসীমা এবং মা যদি না-থাকতেন, অনুকূল না হতেন, যদি আমাকেই একক লড়াই করতে হত, তাহলে আমাকে হয় হার মানতে হত অথবা আমাকে আমার ভবিষ্যৎ বলি দিয়ে বিদ্রোহকে জয়যুক্ত করতে হত। হয় শিক্ষকদের বিষদৃষ্টিতে পড়ে নিরন্তর গঞ্জনা এবং লাঞ্ছনা সয়ে সয়ে শিক্ষা-জীবনের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মে যেত। পড়া ছেড়ে দিতাম। আর একটা পথ ছিল অন্য ইস্কুলে চলে যাওয়া। কিন্তু সেও ঠিক জয় করা হত না। পলায়ন করা হত। ফুল্লরা অ্যাথলেটিক ক্লাব উঠে যেত। তবে জয় আমার শক্তিতে অর্জিত না হলেও তার স্বাদ আস্বাদনে হানি ঘটল না। জীবনে জয়ের তুল্য মধুরস্বাদী আর কিছু হয় না। শাস্ত্রে আছে, পুত্র এবং শিষ্যের কাছে পরাজয় আরও মধুর। হয়তো মধুর, কিন্তু কল্পনায় তাকে অতি মধুর করে তোলা হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। অর্জুনের হাতে দ্রোণের পরাজয় হয়েছিল। সে পরাজয় কত মধুর সে-কথা বলবার জন্য দ্রোণ বেঁচে ছিলেন না। রামের এবং অর্জুনের পুত্রের হাতে পরাজয় ঘটেছিল—সেও যে মৃত্যু, এ-কথা পুরাণকার গোপন করেন নি। কিন্তু ক্ষেত্রেই সীতা এবং উলুপীর সতীত্বগুণে, অলৌকিক করুণার মহিমায় তাঁরা যখন পুনর্জীবিত হলেন তখন বিজয়ী পুত্রেরা পিতার পদানত হয়েছে। এবং তাতেই পরাজয় মধুর হওয়া সম্ভবপর হয়েছে। শিষ্য ভীষ্মের হাতে পরাজিত হয়ে পরশুরাম তো চিরদিনের মতো আত্মগোপন করেছিলেন। মোট কথা, জয়ের আস্বাদের চেয়ে মধুর এবং তীব্র আর কিছু নাই—হয় না। সেদিন মা এবং পিসীমার স্নেহের বলে সে আস্বাদ পেয়েছিলাম। এ ক্ষেত্রে পিসীমাই ছিলেন আমার সবচেয়ে বড় শক্তি।

আমার পিসীমা আমার জীবনে একটি সুবৃহৎ অধ্যায়। আমার বাবার কথা, আমার শৈশব জীবনের কথা 'আমার কালের কথা'য় বলেছি। বলেছি—যুগসন্ধিক্ষণে তিনি যেন ছিলেন যে-কাল বিগত হচ্ছে, বিদায় নিচ্ছে, তারই প্রতীক। সে কালের

শিক্ষা-অশিক্ষা, দোষ-গুণ, আলো-ছায়া, উদারতা-সঙ্কীর্ণতা, পাপ-পুণ্য পূর্ণ মাত্রায় তাঁর মধ্যে বিকাশ লাভ করেছিল। তিনি আমার দৃষ্টিতে ছিলেন বিরাট বনস্পতির তুল্য। আকস্মিক মহাঝড়ে মূল বনস্পতির মতোই উৎপাটিত হয়ে পড়েছিলেন।

আমার কাল গণনায়—যুগসন্ধিক্ষণ উনিশশো পাঁচ সালের ৩০শে আশ্বিন। তিনি সেই বৎসরেরই পরবর্তী ৯ই আশ্বিন মহাপ্রয়াণ করেছিলেন। এই নূতন কালে বাবার মহাপ্রয়াণের পর আমার পিসীমা অতীতকালের মহিমার মতো আত্মপ্রকাশ করলেন। সূর্যাস্তের পরও যেমন পৃথিবীর বুকে তার উত্তাপ বিকীরিত হয় তেমনি-ভাবে আমার বাবার প্রভাবের মতোই তিনি আমাদের সংসারের সর্বক্ষেত্রে আসন নিয়েছিলেন। আমার জীবনে যাঁদের প্রভাব রক্তে-মাংসে, মেদে-মজ্জায়, চিন্তনে-মননে ধাতুগত হয়ে আছে, তাঁদের মধ্যে প্রথম তিনজনের তিনি একজন ; বাবা-মা-পিসীমা।

সাংসারিক ভাগ্যে তিনি ছিলেন হতভাগিনী যাকে বলে তাই। গ্রামেই তাঁর বিবাহ হয়েছিল। স্বামী ছিলেন সে কালের বিষয়ী ঘরের দৌহিত্র এবং পরম রূপবান। পিসীমা আমার গোড়া থেকেই ছিলেন তেজস্বিনী এবং দৃপ্তভাষিণী। এটি আমাদের বংশগত স্বভাব। বহু ক্ষেত্রে দোষ, বহু ক্ষেত্রে গুণ। এই কারণেই আমার পিসেমশাই পিসীমাকে নিয়ে তাঁর ভাইদের থেকে পৃথক হয়ে সংসার বাঁধতে বাধ্য হয়েছিলেন। দুটি সন্তান, স্বামী, স্ত্রী নিয়ে একটি সংসার। গ্রামেই প্রতিষ্ঠাবান বংশ পিতৃকুল, শ্বশুরকুল অর্থাৎ আমার পিসীমার পিতৃকুল অধিকতর প্রতিষ্ঠাবান। যেন চন্দ্র-সূর্যের আলোকে আলোকিত পৃথিবী; অন্ধকারের লেশমাত্র ছিল না কোথাও। ছেলে দুটি ছিল শুনেছি যুগল কার্তিকেয় অথবা শিশু কন্দর্পের মতো সুন্দর। এই সুখের নীড়ে অকস্মাৎ হল বজ্রাঘাত। স্বামী এবং বছর সাতেকের বড় ছেলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কলেরায় মারা গেলেন। পিসীমা ছোট ছেলেটিকে নিয়ে ফিরে এলেন পিত্রালয়ে। দেড় বছরের পর ছোট ছেলেটিও চলে গেল; সর্বরিক্ত হয়ে পিসীমা রইলেন পৃথিবীতে ; তিন তিনটে চিতার আগুন তাঁর বুকের মধ্যে অহরহ জ্বলতে লাগল।

এই শোকে তিনি যে কত কেঁদেছিলেন, সে আমি দেখি নি। তখন আমি জন্মাই নি। পরবর্তীকালে তাঁকে কিন্তু আমি কাঁদতে দেখি নি। আমি তাঁকে দেখেছি আগ্নেয়গিরির মতো রুক্ষ কঠোর উত্তপ্ত। তাঁর নিজের জীবনের বঞ্চনার ক্ষোভ রোষ তিনি ছড়িয়ে দিতেন অগ্নির মতো কুণ্ঠাহীন নির্বিচারে। মধ্যে মধ্যে এই ক্ষোভে বেদনায় তিনি অকস্মাৎ চেতনা হারিয়ে পড়ে থাকতেন, দীর্ঘক্ষণ পর জ্ঞান হত; ঘন ঘন কয়েকটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চোখ মেলতেন।

কিন্তু অন্যদিকে জীবনে তিনি ছিলেন আশ্চর্য রকমের নির্লোভ। আমাদের গোটা সংসারের কর্তৃত্ব তাঁর হাতেই ন্যস্ত হয়েছিল আমার বাবার মৃত্যুর পর। কিন্তু তিনি নিজের বলে একটা কপর্দকও সঞ্চয় করেন নি। বুদ্ধি তাঁর তীক্ষ্ণ ছিল না কিন্তু বোধ ছিল প্রবল। জমিদারী আমাদের কিছু ছিল, বার্ষিক তিন থেকে চার

হাজার টাকা আয়; সে জমিদারী পরিচালনায় তাঁর বোধের পরিচয় আমাদের সংসারকে বহু জটিলতা থেকে রক্ষা করেছে; বহুবার জয়যুক্ত করেছে। তাঁর চরিত্রের ছায়া 'ধাত্রীদেবতা'র পিসীমার উপর পড়েছে যথেষ্ট পরিমাণেই। দুটি ঘটনার কথা 'ধাত্রী-দেবতা'র মধ্যে যথাযথ ভাবেই তুলে দিয়েছি। একটি আমাদের বৈঠকখানায় বা সদর বাড়ির সংলগ্ন পুকুরের পাড়ের উপর জরিপের শিকল ফেলা নিয়ে ঘটনা। সরকারি জরিপে অবশ্য কোনো সীমানার উপর দিয়ে শিকল নিয়ে যেতে অনুমতি নিতে হয় না। কিন্তু এই জরিপটি ছিল আধা-সরকারী। দুই বিবদমান পক্ষের সীমানা নির্ধারণের জন্য আদালত থেকে আমিন এসেছিল জরিপ করতে। সংকীর্ণ স্থানে শিকল টানতে অসুবিধা হওয়ায় সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি নিয়ে আমাদের সীমানার উপর দিয়েই তাঁরা চলেছিলেন, আমাদের কিছুই জানান নি। পিসীমা সকালবেলা দেবতার দুয়ারে জল দিয়ে প্রণাম সেরে, লক্ষ্মীর ঘরের মার্জনা নিজের হাতে সেরে, ভিতর বাড়ির তদারকের ভার মায়ের উপর দিয়ে নিজে আসতেন বৈঠকখানায়। বৈঠকখানা গোশালা পুকুরঘাট তদারক করতেন। সেদিন পুকুরঘাটে এসে দাঁড়াবামাত্র চোখে পড়ল ওই দৃশ্য। বিস্মিত হয়ে নিজেই ডেকে প্রশ্ন করলেন—কারা ওখানে, কি হচ্ছে? উচ্চকণ্ঠে প্রশ্নটি করলেন, কিন্তু আমাদের পেয়াদাকে সম্বোধন করে। হেঁকে বললেন —কেষ্ট সিং, দেখ তো কারা ওখানে, কি হচ্ছে? কেষ্ট সিং তাঁর কাছেই দাঁড়িয়ে। সঙ্গে সঙ্গে ওপারের জনতা ঘুরে দাঁড়াতে বাধ্য হল। বিবদমান পক্ষের একজন চিৎকার করেই উত্তর দিলেন—ময়রাপুকুরের পাড় জরিপ হচ্ছে গো।

পিসীমা এবার একটু শঙ্কিত হলেন, ময়রাপুকুরের পাড় জরিপের শিকল আমাদের পাড়ের উপর দিয়ে চলার অর্থ তিনি অন্য রকম বুঝলেন; মনে ভাবলেন, আমাদের পাড়ের খানিকটা অংশ।—ময়রাপুকুরের পাড় জরিপ হচ্ছে তো আমার শান পুকুরের পাড়ের উপর শিকল কেন? তুলে নিন, শিকল তুলে নিন!

মুহূর্তে এক পক্ষ ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। আমাদের গ্রামে এই ব্যক্তিটি. শুধু ওই ব্যক্তিটি নয়, তাঁর বংশটিই ক্রোধের জন্য বিখ্যাত বা কুখ্যাত। তন্ত্রের নামে গঞ্জিকা কুলাচার তাঁদের এবং সে আচার বেশ খানিকটা উৎকট রকমের উগ্র। ভদ্রলোক ক্ষিপ্ত-প্রায় হয়ে গাল দিয়ে উঠলেন—আচ্ছা হারামজাদা মেয়ে তো! আমরা কি জায়গা তুলে নিয়ে যাচ্ছি নাকি?

পিসীমা গম্ভীর স্বরে আদেশ দিলেন—যাও কেষ্ট সিং, ওদের ওখান থেকে তুলে দিয়ে এস। সরকারি আমিনকে বলবে, আমার পাড়ের উপর দিয়ে শিকল টানতে সরকারি হুকুম আছে? থাকলেও কি আমাদের খবর দেওয়ার দরকার নাই?

কেষ্ট সিংকে যেতে হল না। আমিন তৎক্ষণাৎ শিকল টেবিল সরিয়ে নিয়ে, নিজে এসে ত্রুটি স্বীকার এবং দুঃখ প্রকাশ করে গেলেন।

আর একবার আমাদের একটা গাছ অন্য একজন কেটে নিয়েছিলেন। সীমানা গণ্ডগোলের অজুহাতে গাছটা আমাদের অজ্ঞাতসারে কেটে ফেললেন। পিসীমা কিন্তু সুকৌশলে আমাদের চাষীদের গাড়ি যোগাড় করে রাতারাতি সেই গাছ তুলিয়ে এনে ঘরে ঢোকালেন। অপর পক্ষের কাটাই খরচটা গেল। উপরন্তু সীমানার দখল আমাদের

সাব্যস্ত হয়ে গেল। পরদিন তিনি নিজে তাঁদের বাড়ি গিয়ে বলে এলেন, এবার আমাদের সীমানার মধ্যে তাঁদের যে সব গাছ আছে সেগুলি তিনি কাটাবেন। তাঁরা যদি পারেন তো রোধ করেন যেন। এ ক্ষেত্রে সীমানা এবং অধিকার এমনই সুনির্দিষ্ট যে তাঁদের সেখানে যাওয়া হত ট্রেসপাস।

এমনি ধারার ছোটখাটো ঘটনা নিত্যই প্রায় ঘটত। ছোটই হোক আর বড়ই হোক, জমিদারী—জমিদারী। বড় আর ছোট নিত্য একই ধরনের জটিলতা সর্বত্র। সে বর্ধমানের রাজবাড়ি থেকে লাভপুরের বাঁড়ুজ্জেদের সাত আনির বাড়ি পর্যন্ত। প্রতিটি ঘটনাতেই পিসিমা এইভাবে সে দ্বন্দ্বে উত্তীর্ণ হয়ে এসেছেন। ভয় ছিল তাঁর ইংরেজ রাজাকে, আর ভয় ছিল মৃত্যুকে। তাঁর মামার বাড়ি ছিল সিউড়ির উত্তর-পশ্চিমে মামুদ-বাজার থানা এলাকায় মহুলপুরে। বীরভূম ও সাঁওতাল পরগণায় যে সাঁওতাল বিদ্রোহ ঘটেছিল, সে বিদ্রোহ এবং ইংরেজদের কঠোর হস্তে নিষ্ঠুর বর্বর অত্যাচারে সে বিদ্রোহ দমন স্বচক্ষে দেখেছিলেন তাঁর মাতামহী। আমার বাবা এবং পিসিমা সেই অত্যাচারের কাহিনী শৈশব থেকে শুনে এসেছিলেন। বন্য সাঁওতালদের রক্তাক্ত উন্মত্ততার কাহিনী, সে অত্যাচারের কাহিনীর কাছে সমুদ্রের কাছে গোস্পদ। কাল-বৈশাখীর বজ্রনির্ঘোষের কাছে মানুষের হুঙ্কার! ইংরেজের নামে একটা জৈবিক আতঙ্ক ছিল তাঁর। পরিমাণে কম হলেও আমার বাবারও ছিল এই ভয়। কোনক্রমেই বয়স্ক জীবনের বুদ্ধি বা সাহস দিয়ে একে সম্পূর্ণ জয় করতে পারেননি। 'পদচিহ্নে' রাধাকান্ত চরিত্রের মধ্যে এ কথা পরিস্ফুট হয়েছে। বাল্যকালে পিসিমার কাছে আমি এই সাঁওতাল বিদ্রোহের গল্প শুনতাম। বলতে বলতে তাঁর নিজের কণ্ঠস্বর কাঁপতে থাকত। শঙ্কাতুর হয়ে উঠত। আমারও রোমাঞ্চ হত মুখে সিঁদুর মেখে, হাতে টাঙি আর তীর-ধনুক দিয়ে রক্তমুখ দানবের মতো সাঁওতালদের নাচের কথা শুনে। শাল জঙ্গলে মাদল বাজত, মশালের আলো জ্বলত চারিদিকে—তারই মধ্যে বিদ্রোহীরা নাচত।

পিসিমা বলতেন, সাঁওতালেরা বিশুবাবুর জয় দিত। বলত, বিশুবাবুই আমাদের রাজা। বিশুবাবু আমার মনের মধ্যে এমনই রেখাপাত করেছিল যে বিশুবাবুর সন্ধান আমি অনেক করেছি উত্তর জীবনে। কে ছিল বিশুবাবু? কেমন ছিল বিশুবাবু?* কোন সন্ধান পাইনি। 'কালিন্দী' উপন্যাস লেখার সময়েও পাইনি। কিন্তু শৈশব থেকে যে কল্পনা এই মানুষটির কীর্তি এবং নামকে অজানা এক বিচিত্র বীজের মতো মনোজগতে সযত্নে জল সিঞ্চন করেছিল সেই বীজ থেকেই 'কালিন্দী'র সোমেশ্বর উদ্ভূত হয়েছে হিংস্র কণ্টকাকীর্ণ রক্তপুষ্পময় বৃক্ষের মতো।

তাঁর এই ভয় এতই প্রবল ছিল যে, সে হয়ে দাঁড়িয়েছিল অচলায়তনের লৌহ

*পরবর্তী কালে স্বর্গীয় শরচ্চন্দ্র রায় মহাশয়ের ইতিহাস পড়ে সাঁওতালবীর 'বিরসা মহারাজ'-এর নাম পেয়েছি। বিদ্রোহী এই বীর সাঁওতাল যুবকই ছিলেন সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রেরণা। তাঁকে সাঁওতালেরা বলত—'বিরসা ভগবান'। বিশুবাবু বোধ হয় বিরসা মহারাজ। সাঁওতালেরা বিরসা মহারাজের জয়ধ্বনি দিত; এ দেশের সাধারণ মানুষ বিরসা মহারাজকে জানত না বলেই বিশু রাজা বা বিশুবাবু বলে মনে করত।

কপাটের মতো। তাঁর এই রাজভয় এবং মৃত্যুভয় বিশেষ করে মারীভয়—এই দুইখানি লোহার কপাটকে ভাঙতে হয়েছিল আমাকে। বিদ্রোহ করে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করে ভাঙতে হয়েছিল। বিদ্রোহ করতে তিনিই আমাকে শিখিয়েছিলেন। জয়যুক্ত হতে তিনি আমাকে সাহায্য করেছিলেন। ওই ইস্কুলের ফুটবল বিদ্রোহের কথা বলেছি। কিন্তু পিসিমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সহজ ছিল না।

তাঁর ব্যক্তিত্বের কথা বলেছি, ক্ষোভের কথাও বলেছি। আমার উপর সে ব্যক্তিত্ব কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল, কতখানি আমাকে অভিভূত করেছিল, সেই কথা বলি। আমার তখন বয়স সতেরো। ষোল পার হয়েছি। কিন্তু দুটো কারণে অকস্মাৎ অনেকখানি পদোন্নতি হয়ে বয়সে প্রায় বিশকে ছাড়িয়ে গিয়েছি। হঠাৎ আমার বোনের বিয়ের টানে আমার বিয়ে হয়ে গিয়েছে এবং বিয়ের প্রায় মাসখানেকের মধ্যে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়েছি। এই দুটোই ষোল বছরের একটি কিশোরকে বিশ-বাইশ বছরের যুবকের মর্যাদায় এবং মনোভাবে ভাবান্বিত করতে যথেষ্ট। আমার ভগ্নীপতি এবং শ্যালক লক্ষ্মীনারায়ণ আমারই বয়সী। বাল্যকালে মাতৃহীন হয়ে সে বোর্ডিংয়ে থাকার অবসরে সিগারেট অনেক আগেই ধরেছে। আমি এ বিষয়ে সত্যিই ভালো ছেলে ছিলাম। সিগারেট তামাক ধরিনি। যা নাকি সেকালে গ্রাম্যজীবনে বিস্ময়ের বস্তু ছিল। বিয়ের পর বোধ করি অষ্টমঙ্গলা উপলক্ষে শ্বশুরবাড়ি গিয়েছি। শ্বশুরবাড়ি বাড়ির দরজা থেকে হাত চল্লিশেক দূর। সেই দিন নারাণ আমাকে সিগারেট খাওয়ালে। বিয়ে হয়ে গিয়েছে। ইস্কুলের গণ্ডি পার হচ্ছি, চোখে একটা অকাল যৌবনের নেশা লেগেছে। মনে হল, নবযুবক মানাতে যেটুকু কমতি রয়েছে, সেটুকু ওই ধূমায়মান সিগারেট ঠোঁটে উঠলেই পূর্ণ হয়ে যাবে। তার আগেই বিয়ে উপলক্ষ করেই টেরি কেটেছি। আমাদের হেডমাস্টার মশায়ের ভারি আপত্তি ছিল টেরিতে। তিনি যে সদুপদেশগুলি ছাত্রদের দিতেন তার মধ্যে প্রথম ছিল—'Comb your hair everyday. But don't divide into parts;' অর্থাৎ সিঁথি কেটে টেরি কেটো না। আমিও কাটতাম না। কিন্তু বর যখন সাজলাম তখন টেরি কেটে দিলে দশজনে মিলে। শ্বশুরবাড়ি থেকে আয়না চিরুনি তেল পমেটম দেওয়া হল আমাকে, লাইসেন্স এল সমাজের সীলমোহর নিয়ে। যাক। টেরির পর সিগারেট। নারাণ সিগারেট ধরালে। বের করলে চৌকা একটা কৌটো, গোল্ডেন বার্ডসাই-এর টোব্যাকো; তার সঙ্গে সিগারেট বানাবার কাগজ এবং একটা কল। টোব্যাকোর গন্ধটা কিন্তু সত্যই ভালো লেগেছিল। সিগারেট খেলাম। কাশলাম, চোখ দিয়ে জল পড়ল, তবুও খেলাম। সন্ধ্যে থেকে গোটা তিনেক বোধ হয়। রাত্রে আমার দশ বছরের পত্নী এসেই বললে—ও খুকী দিদি, কি বিচ্ছিরি গন্ধ, সিগারেট খেয়েছে।

খুকী দিদি আমার স্ত্রী-সম্পর্কীয়া দিদি। তিনি হেসে বললেন—মর মর মর। এর পর তামাক সেজে দিতে হবে। তখন কি করবি? চাকরে সেজে দিলেও ফুঁ দিতে হবে। বেশ করেছে সিগারেট খেয়েছে।

শ্বশুরবাড়িতে ওই কথাটা মনে কিছু সাহস সঞ্চার করেছিল। আর সাহস ছিল পিসিমা। বাড়িতে রুপোর ফুরসী। রুপোর কাজ করা ফুরসী, তিন-চারটে গড়-

গড়ার সরঞ্জাম বাড়িতে ছিল। আমার বড় ঠাকুমা গড়গড়ায় তামাক খেতেন। পিসিমা সে সব গল্প করতেন মধ্যে মধ্যে। বলতেন—জিনিসগুলো নষ্ট হচ্ছে ব্যবহারের অভাবে। ছেলেরা বড় হলে তবে আবার ও-সবের কদর হবে।

কখনও কখনও বলতেন—কাছারিতে বসবি, রুপোর ফরসীতে তামাক খাবি, সামনে বাক্স থাকবে, লোকজনে গম গম করবে বৈঠকখানা, তখন আমার চোখ জুড়োবে।

সুতরাং তামাক সিগারেটে পিসিমার আপত্তি থাকার কথা নয়। ভয় ছিল মাকে। পিঙ্গল দুটি চোখের স্থিরদৃষ্টি কল্পনা করলেই বুক কাঁপত। তবে মা বাইরে বড় বের হন না, সেইটাই মস্ত বড় ভরসা। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিতে সিউড়ি গিয়ে দিন দশেকের মধ্যে সিগারেটে পাকা হয়ে ফিরলাম। গোল্ডেন বার্ডসাই টোব্যাকো দু' টিন, কাগজ, পাউচ কিনে নিয়ে এলাম। পাকাবার কল কিনলাম না। পাকাতে তখন হাত পেকে গিয়েছে। বাইরে বাইরে সিগারেট খাই। মুখ ধুয়ে নেবুপাতা চিবিয়ে বাড়ি ফিরি। মা আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশালিনী, বুদ্ধিতেও প্রখরা, কিন্তু আমি মায়েরই ছেলে। মাও সন্দেহ করলেন না।

দিন পনের পরে বোধ হয়।

আমার বোনের অকস্মাৎ প্রবল পেটের অসুখ হয়েছে।

রাত্রি তখন প্রায় সাড়ে-ন'টা। আমাদের গ্রামের সদর রাস্তার একটা নির্জন স্থানে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছি। আমার সঙ্গে নারাণ আছে, আরও দু-তিন জন বন্ধু আছে। অন্ধকারের মধ্যে সিগারেটের আগুন টানের সঙ্গে প্রদীপ্ত হয়ে উঠছে। হঠাৎ কানে অনুভব করলাম কঠোর এবং কঠিন আকর্ষণ। মুহূর্তে বুঝলাম—আমার জননী। সঙ্গে সঙ্গে ভোজবাজীর মতো সিগারেটটা আমার হাত থেকে অন্তর্হিত হল।

—তুই সিগারেট ধরেছিস?

মা নন, পিসিমা। কঠোর কণ্ঠে তিনিই প্রশ্ন করলেন। বিবাহিত, কলেজের দুয়ারে উপনীত-প্রায় যুবককে সকলের সমক্ষে কানে ধরে ওই প্রশ্ন করতে তাঁর সঙ্কোচ হল না, দ্বিধা হল না। আমারও সাহস হল না প্রতিবাদ করতে। শুধু চতুরতার সঙ্গে বললাম—না তো! কোথায়?

সত্যিই তো কই? কোথায়? পথে পড়ে থাকলেও তো আগুনটা অন্ধকারে দেখা যাবে। দেখাতে পিসিমা পারলেন না। সিগারেট তখন আমার জুতোর তলায় চাপা রয়েছে।

পিসিমা এবার কান ধরে মাথাটা নামিয়ে মুখ শুঁকে, দুই হাত প্রয়োগ করলেন, দুই হস্তে দুটি কর্ণ সজোরে মর্দন করে দিয়ে চলে গেলেন। এই ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা সহজ ছিল না।

আমার পিসিমা আমার জীবনে অন্ততঃ বিশ বৎসর পর্যন্ত প্রচন্ড প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। পূর্বেই তাঁর চরিত্রের কথা বলেছি। অত্যন্ত শক্ত, অনমনীয়, বিশ্ব-সংসারের উপর ক্ষুব্ধ ছিল তাঁর প্রকৃতি। সমাজ ও সংসারের মৌলিক নীতিগুলির উপর ছিল দৃঢ় বিশ্বাস। অন্য দিকে ঐ অল্প বয়সে চব্বিশ-পঁচিশ বৎসরের মধ্যে

পৃথিবীর প্রায় সকল আপনজন হারিয়ে মৃত্যুকে ছিল তাঁর প্রচণ্ড ভয়। এই কারণেই বোধ করি পৃথিবীর যত কিছু মৃত্যুসংক্রান্ত সংস্কার তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এই বয়সের মধ্যেই তাঁর স্বামী, দুই ছেলে, তিন বোন, বাপ মারা গেলেন। গেলেন মাত্র বৎসর তিন-চারের মধ্যে। পৃথিবীতে আপনার বলতে রইলেন এইমাত্র ভাই আর একটি বোন। ভাইয়ের সূত্রে ভ্রাতৃজায়া। এবং তাঁদের কোলে এলাম আমি। আমার গলায় হাতে রাজ্যের মাদুলি ঝুলিয়ে দিলেন। মাথার চুল রেখে দিলেন। ঠাণ্ডার ভয়ে গায়ে এমন জামা-জোব্বা পরিয়ে মুড়ে দিলেন যে বারো-চৌদ্দ বছর পর্যন্ত ঠাণ্ডা হাওয়া কোন রকমে গায়ে লাগলেই আমার সর্দি করত। স্নান বোধ হয় সপ্তাহে তিন দিন। চার দিনের তিন দিন গা-মোছা অর্থাৎ ভিজে গামছা দিয়ে গায়ের তেলটা মুছে দেওয়া। একদিন কিছুই না। এ চার দিন মাথায় জল ছোঁয়ানো নিষিদ্ধ ছিল। অথচ তিনি নিত্য দু'বেলা স্নান করতেন। স্নান ভিন্ন থাকতে পারতেন না। তাঁর মৃত্যুর আগের দিনেও তিনি জ্বর সত্ত্বেও তিনি স্নান করেছেন। বলেছেন, ও কিছু হবে না। দীর্ঘকাল হয়ওনি।

এর পর ছিল রাজ্যের বাধা-নিষেধ। হাঁচি, টিকটিকি তো আছেই; অশ্লেষা, মঘা, দিকশূল, যোগিনী এঁরা ছিলেন এবং এখনও আছেন, পঞ্জিকার পাতায় ছাপার হরফে রয়েছেন। বাংলাদেশে পঞ্জিকাই সব থেকে বেশি বিক্রি হয় এবং এই সব যে পঞ্জিকায় বিশদভাবে থাকে তারই বিক্রি সর্বাধিক, অন্ততঃ বৎসরে কয়েক লক্ষ। পিসিমা আমার ছিলেন মহাপঞ্জিকা। বললেন—কৃকলাস যদি গায়ে পড়ে তবে কয়েক মাসের মধ্যেই নিশ্চিত মৃত্যু। এবং নিশ্চিত প্রমাণ দিলেন যে, তাঁর বাবার গায়ে কৃকলাস পড়েছিল, চার মাসের মধ্যেই তাঁকে যেতে হল। তাঁর বাবা—আমার পিতামহ চুরাশি বৎসর বয়সে সে এক রকম দেহত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু তার জন্য দায়ী হল বেচারা কৃকলাস। এখন এই কয়েক মাসের মধ্যে আরও অনেক কিছু তাঁর গায়ে বসেছিল ও পড়েছিল। কিন্তু ঐ প্রাচীন প্রবাদ বাক্যের ধারা অনুসারে কৃকলাসই হল অপরাধী। এই বিশ্বাস এমনভাবে আমার মনে গেঁথে দিলেন পিসিমা যে, সে আমার মহা আতঙ্ক হয়ে গেল। কৃকলাস ছেলেবেলায় ঠিক চিনতাম না। অনেকেই চেনেন না। টিকটিকি ছাড়া সবই গিরগিটির নামে চলে যায়। এর মধ্যে বহুরূপীরা খানিকটা স্বতন্ত্র। এবং ওই জাতটার গলায় নীল রঙের যে থলিটা ফুলে ফুলে ওঠে সেটা বেশ একটু ভীতিপ্রদ। ওই ওকেই ভেবে নিয়েছিলাম কৃকলাস। এবং কত যে বহুরূপী বধ করেছি সে বয়সে, তার হিসেব করে শিউরে উঠি। অন্ততঃ শ' দুই-তিনের তো কম নয়। বৈঠকখানার সামনে ছিল বাগান—মালতী মাধবী লতার নিবিড় কুঞ্জ, আরও বড় বড় গাছ। আম পেয়ারা কাঁঠাল নেবু এবং একটি দুর্লভ ডালিম গাছও ছিল। আমার ছিল তীরধনুক, বেশ পোক্ত তীরধনুক। ওই বহুরূপী বধ করেই লক্ষ্যভেদে পাকা হয়ে উঠেছিলাম। এই কারণে জীবনে যেদিন প্রথম বন্দুক ছুঁড়লাম সেদিন প্রথম গুলিতেই লক্ষ্যভেদ করে একটি ঘুঘু মেরেছিলাম।

আমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে সদর রাস্তা পর্যন্ত গলি পথের ধারে আমার জ্যেঠামশায়রা তুললেন একটা চালা। তার চালটা ছিল নিচু, মাথায় ঠেকত। যাত্রাপত্রে

চাল মাথায় ঠেকা অত্যন্ত অশুভ লক্ষণ। পিসিমা আপত্তি করলেন, চাল তুলে দিতে হবে। আজ-কাল করে সেটা থেকেই গিয়েছিল। হঠাৎ আমার সম্পর্কিত এক দাদা কলকাতায় সাংঘাতিক পীড়িত হলেন। টেলিগ্রাম এল। তাঁর স্ত্রী কলকাতা রওনা হলেন। বাড়ি থেকে বেরিয়েই গলিপথে ওই চাল তাঁর মাথায় ঠেকল। এবং সেই অসুখেই দাদা মারা গেলেন। পিসিমা এর পর দুর্দান্ত বিরোধ শুরু করলেন। তাঁর তারাশঙ্কর বিদেশে যায়-আসে। চাল কোন্ দিন মাথায় ঠেকবে এবং—। শিউরে উঠতেন তিনি। আমি তখন প্রাপ্তবয়স্ক। অনেক বুঝিয়েছি, ফল হয়নি। চালা-খানি তুলে দিলে তিনি শান্ত হয়েছিলেন।

ভোরের স্বপ্ন নাকি সত্য হয়। তিনি প্রায়ই ভোরবেলা স্বপ্ন দেখতেন এবং সে স্বপ্নের নব্বুইটি দুঃস্বপ্ন। দুঃস্বপ্নের জন্য দেবতার পুজো হত নিয়মিত।

আমার যখন পাঁচ বৎসর বয়স তখন আমরা সপরিবারে গিয়েছিলাম বৈদ্যনাথধাম। আমাদের একটি বড় মামলায় জয়লাভের জন্য পিসিমা সেবার ধরনা দিয়েছিলেন। স্বপ্ন পেয়েছিলেন—জয়লাভ হবে। কিন্তু হয়নি। কোর্টের পর কোর্টে মামলা চলতে লাগল। আমরা হারতে লাগলাম। জয়লাভের কথা আমাদেরই। কিন্তু আইনের বিচিত্র বিধানে মামলাটির সময় তখনও হয়নি। বাবা বুঝেও সে-কথা বুঝতে চান নি। জিদের বশেই মামলা চালিয়ে চলেছিলেন। তিন বৎসর ব্যর্থ মামলা চালিয়ে বাবা মারা গেলেন। এর পর বৎসর দেড়েক মামলা বন্ধ রইল। তারপর এল সেই সময়, এবং মামলা দায়ের করা মাত্র নিচের আদালতেই ডিগ্রি হল। প্রতিপক্ষ আর অগ্রসর হলেন না। আমরা জিতলাম। সেদিন শুনলাম, এ সেই সাড়ে চার বৎসর পূর্বের স্বপ্নের সফলতা। মনের গঠন অনুযায়ী তাই বিশ্বাসও করলাম। মোটা টাকার পুজোও গেল বৈদ্যনাথে।

এত ভূতের সন্ধানও জানতেন পিসিমা। কোথায় আছে বেহ্মদৈত্য, কোথায় গলায়-দড়ে, কোথায় গলসে ভূত, কোথায় পেত্যা অর্থাৎ আলেয়া, কোথায় গোভূত—সব সন্ধান আমাকে জানিয়েছিলেন। একটা গোভূতের গল্প প্রায়ই বলতেন তিনি। তিনি সেটা চোখে দেখেছিলেন। একদা রাত্রে তিনি পুকুরে নেমেছেন, দেখলেন ঘাটের মাথায় সেটা দাঁড়াল। বাছুর ছিল, বড় হল, শিঙ গজাল, মাথা নাড়লে। পিসিমা রাম রাম বলতে সেটা ধীরে ধীরে চলে গেল।

সবচেয়ে আতঙ্ক ছিল কলেরা এবং ইংরেজ রাজাকে।

আমার যখন ন' বছর বয়স, তখন গ্রামে কলেরা হল। আমার জীবনে গ্রামে কলেরা হতে সেই প্রথম দেখলাম। আমার বাবার মৃত্যুর ছ'মাস পর। ষান্মাসিক শ্রাদ্ধ এবং সপিন্ডকরণ হবে, আয়োজন হয়েছে। গ্রামে শুরু হল কলেরা। পিসিমা ভয়ে শুকিয়ে গেলেন এবং সমস্ত পরিবারটিও তাঁর সঙ্গে আতঙ্কিত হয়ে উঠল। কি হবে? প্রথম দিনেই ব্যবস্থা হল, শ্রাদ্ধের আয়োজন সংক্ষিপ্ত করা হবে। গ্রাম থেকে পাড়া নিমন্ত্রণ। দ্বিতীয় দিন প্রভাতে শ্রাদ্ধের দিন শোনা গেল আরও কয়েক জনের কলেরা হয়েছে, আমাদের পাড়াতেও হয়েছে। শ্রাদ্ধ বন্ধ করা চলে না, অগত্যা

দ্বাদশ জনের মধ্যে নিমন্ত্রণ সীমাবদ্ধ করে, কোনক্রমে শ্রাদ্ধক্রিয়া শেষ হল। আমি গোয়াল ঘরের মধ্যে শ্রাদ্ধ করছি, পিসিমা এলেন, ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছেন তিনি। পাড়ায় আমাদের বাড়ির কাছে এসেছে রোগ। শ্রাদ্ধ শেষ হল—শ্রাদ্ধ করে সেদিন কোথাও যাত্রা নিষিদ্ধ। সারারাত্রি জেগে কাটিয়ে ভোরবেলা তিনি আমাদের নিয়ে পাশের গ্রামে, আমাদেরই একটি মহলে, এক ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকের বাইরের বাড়িতে এসে উঠলেন। সেই বাড়িতে আমাদের রেখে তিনি নিজে ফিরে গেলেন গ্রামে। তিনি সেখানেই থাকবেন। কিন্তু তখন তিনি ভিন্ন আমার ঘুম আসত না। তিনি সন্ধ্যায় না এলে আমি চলে যাব—এই ভয়ে সন্ধ্যার সময় এই গ্রামে আসতেন। সকালবেলা চলে যেতেন। একদিন রাত্রে বাইরে কুকুরের দুরন্ত চিৎকার শোনা গেল। পিসিমা সভয়ে উঠে বসলেন। তাঁর ধারণা, কলেরা এই গ্রামে ঢুকছে, তাই কুকুরেরা এমন চিৎকার করছে। কিন্তু গ্রামের লোকেরা বলল—মা, এ গাঁয়ের গ্রাম-দেবী মাকালী বড় জাগ্রত। এ গ্রামে একশো-দুশো বছরেও কখনও কলেরা ঢোকেনি। মায়ের ভয়ে ঢুকবার উপায় নেই।

পিসিমা দু'দিন পরে স্বপ্ন দেখলেন—তিনি যেন এই গ্রাম থেকে যাচ্ছেন লাভপুরে। গ্রামের মুখেই শুনলেন, কার শাসন বাক্য, আর কার কান্না। এগিয়ে গিয়ে দেখলেন, টকটকে লালপেড়ে শাড়ি পরা একটি কালো মেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মাথায় সিঁদুর, পিঠ-ভরা চুল, হাতে লাল শাঁখা। কালো হলে কি হবে, দেখে মনে হয় এমন সুন্দরী আর হয় না! তিনি হাত বাড়িয়ে আঙুল দেখিয়ে বলছেন—যা-যা। বেরো. বেরো। ওদিকে এই কঙ্কালসার একটা মেয়ে, পরনে কালো দুর্গন্ধময় কাপড়। সামনে ঠোঁটের উপর দুটো দাঁত বেরিয়ে আছে, চোখে ক্রূর দৃষ্টি, হাতে বড় বড় নখ, মাথায় খাটো খ্যাঙরা কাঠির মতো চুল। সে দু'পা দু'পা করে পিছু হটছে।

এই সময় রায়জী বলে একজন চাপরাশি ছিল আমাদের। প্রৌঢ় মানুষ. মস্ত ভুঁড়ি। থপ থপ করে হাঁটত। আমাদের বাড়ির সঙ্গে তার সম্পর্ক তিন পুরুষের। জাতে ছত্রি. মধ্যে মধ্যে আমাদের বাড়িতে কাজ করত। যখন আমাদের চাপরাশি না থাকত তখনই রায়জীকে খবর পাঠানো হত। রায়জী এসে কাজে লাগত। আবার তার অভাব হলেও সে বলত, এখন কিছুদিন আমাকে রাখতে হবে পিসিমা। এই রায়জীটি ছিল এমনি গল্পের একটি জাহাজ। ওই যে কলেরা-রূপিণী নারী-মূর্তি. ওটি রায়জীই কয়েক দিন আগে বর্ণনা করে পিসিমার এবং আমাদের মনে খোদাই করে এঁকে দিয়েছিল। বলেছিল কোন গ্রামের কলেরার গল্প। সে গ্রাম নাকি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, সেই গ্রামেই নাকি কলেরা হবার পূর্বে এমনটি একটি নারীকে ঢুকতে দেখা গিয়েছিল। হাতে ঝাঁটা, বগলে শবদেহ জড়ানো শ্মশানে পড়ে-থাকা চ্যাটাই, কঙ্কালসার দেহ, দন্তুর জ্বলন্ত-দৃষ্টি চোখ, হ্রস্ব পিঙ্গলকেশী একটি নারী সন্ধ্যার মুখে গ্রামে প্রবেশ করেছিল। গ্রামের লোক ভেবেছিল পাগলিনী। পরদিন সকালে আর তাকে দেখা যায়নি, কিন্তু তখন একজন কলেরায় আক্রান্ত হয়েছে। তারপর গ্রাম প্রায় শ্মশান হয়ে গেল। তখন একদা একজন ভোর রাত্রে দেখলে সেই মেয়ে বেরিয়ে গেল গ্রাম থেকে। বগলে চ্যাটাই, হাতে ঝাঁটা।

য়ক। আমারও সেই ন'বছর বয়সের কাঁচা মনে কলেরা রাক্ষসীর ছবি আঁকা হয়ে গেল। এর বছর-দুয়েক পরেই আবার লাগল কলেরা।

এবার পিসিমার আগেই আমি ভয় পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে পিসিমাও কাঁপতে লাগলেন এবং সেই দিনেই পালিয়ে গেলাম পাশের গাঁয়ে। এবার অন্য গ্রাম। এ গ্রামের মা-কালীও খুব জাগ্রত।

পালাত প্রায় সকলেই। স্বর্গীয় যাদবলালবাবুর বাড়ি এ বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন। তাঁর মেজ ছেলে স্বর্গীয় অতুলশিব একজন আদর্শ চরিত্রের সদাশিব মানুষ ছিলেন। বিদ্যোৎসাহী, পড়াশুনাই ছিল জীবনের বিলাস, সহৃদয় সত্যবাদী মানুষ। কিন্তু দুরন্ত ছিল তাঁর মৃত্যুভয়। কলকাতায় যেবার প্রথম প্লেগ হয় সেইবারই তিনি বি.এ. পরীক্ষা দিচ্ছেন। কয়েক পেপার দিয়েছেন এমন সময় খবর পেলেন কলকাতায় প্লেগ শুরু হয়েছে, রইল পরীক্ষা, তিনি সেই দিনই চলে গেলেন লাভপুর। তিনি আফিং খেতেন ; কেন খেতেন ঠিক জানি না, মাত্র বত্রিশ বৎসর বয়সে মারা গিয়েছিলেন। সুতরাং আফিং খাওয়ার বয়স হয়নি। মদ্য কোনকালে স্পর্শ করেননি যে মদ ছাড়বার জন্য আফিং ধরেছিলেন। হজমশক্তি, স্বাস্থ্য দুইই ছিল ভাল—সুতরাং সেদিক দিয়েও প্রয়োজন ছিল না। তবে আমার অনুমান এবং এই অনুমান সত্য বলেই আমার বিশ্বাস যে, পাছে তরল মল হয় সেইজন্যই তিনি আফিং খেতেন। সরল উদারহৃদয় মানুষটির এই ভয় নিয়ে লোকে তাঁর সঙ্গে রহস্য করত—বাবু, পাশের গাঁয়ে কলেরা হয়েছে শুনছি। অতুলশিববাবু রুপোর আফিংয়ের কৌটাটি বের করে খানিকটা আফিং মুখে ফেলে বলতেন, গৌরদাস জল আন। এই অতুলশিববাবু সর্বাগ্রে সপরিবারে রওনা হতেন—হয় সিউড়ি, নয় কলকাতা। তাঁর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পালাত রাধাদাদা—রাধাশ্যাম—যিনি ছিলেন আইনবিদ ছাত্র—বলতেন—একসঙ্গে দুটো পানিশমেণ্ট হতে পারে না।

তিনি পরবর্তী জীবনে হয়েছিলেন খবরের ডিপো। বসে থাকতেন—আর তাঁর কাছে রাজ্যের ছেলেরা আসত তামাক খেতে, তবলা বাজানো শিখতে, ফিস্ট করতে, চা খেতে। রাধাদাদা দিনে চা খেতেন বিশ-পঁচিশবার। আর পাশা বা দাবা খেলতেন। অবশ্য এক কাপ চা খাওয়া ছাড়া কোনটাতেই তিনি মাস্টার ছিলেন না। এই রাধাদাদা নিজে পালাতেন কলকাতা, নয় ধানবাদ, নয় অন্য কোন ভাল যায়গায়। গ্রামে কলেরার খবর পাওয়ামাত্র তিনি বাড়ির দিকে রওনা হয়ে পথেই অতুলশিববাবুর কাছারির দরজায় দাঁড়িয়ে হাঁকতেন—ম-ম-মধ্যম বা-বা-বাবু।

কণ্ঠস্বর শুনেই মধ্যমবাবু অতুলশিব বুঝতে পারতেন। তিনি আফিংয়ের কৌটা খুলতে খুলতেই উদ্বিগ্নকণ্ঠে বলতেন—রা-রা-রাধাই।

রাধাদাদা হাতের একটি আঙুল ইশারা করে দেখিয়ে ঘাড়টা দুলিয়ে বলতেন—হুঁ।

—লে-লে-লেগেছে ?

—পা-পালান। এ-একসঙ্গে দু-দ্-দ্-দ্ দু' জ্-জ্-জন।

—ত্-ত্-ত্-তুই ক্ ক্ ক্ কবে যাবি ?

—আ—আজই।

অতুলশিববাবু উঠতেন—ম্-ম্-ম্—ম্যানেজারবাবু, তি-তি-তি-তিনটের ট্রেনে গাড়ি চাই। আ—আ—আস্তাবলে বলে পাঠান।

অতুলশিববাবু এবং রাধাদাদা—দুজনেই ছিলেন তোতলা।

এর পরই রাধাদাদা আসত আমাদের বাড়ি। আমার পিসিমা ছিলেন তার ভিক্ষে মা। পৈতের পর মুখ দেখেছিলেন। রাধাদাদা নিজের বাড়ি না ঢুকে আসত আমাদের বাড়ি। পিসিমাকে তার ভয় ছিল। রহস্য করত না, গম্ভীরভাবেই বলত, ভিক্ষে-মা, গ্—গ্ গাঁয়ের খবর খারাপ। ময়রা পাড়ায় এই-এই হয়েছে। মধ্যমবাবু যাচ্ছেন ক্-ক্ কলকাতা, আমিও যা-যা যাচ্ছি। তোমরাও সর।

রাধাদাদাদের বাড়ির মেয়েরাও অনেকে আমাদের সঙ্গে যেতেন।

বৎসর খানেক পর আবার কলেরা হল। আবার পালালাম।

এর পরই বোধ হয় এল আমার সেই কৈশোরের জাগরণ। সেই আগুন নিভিয়ে বাড়ি ফেরার লগ্ন। সেবা সঙ্ঘের কাজে লাগলাম। বিবেকানন্দের বই পড়লাম। রামকৃষ্ণ মিশনের সেবা-ধর্মের কথা শুনলাম, পড়লাম। কলেরা সম্পর্কে তথ্য পড়লাম, জানলাম। তবু কলেরা সম্পর্কে আতঙ্ক গেল না। সে কি আতঙ্ক। কলেরা হয়েছে শুনলে আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যেত।

এর পর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিলাম। তার আগেই হল বিয়ে। তখন বয়স ষোল। ঠিক এই সময় গ্রামে লাগল কলেরা। বোধ হয় বিয়ের মাসখানেক পরেই। সরে যেতে হবে, নইলে কলেরায় মৃত্যু হবে। রাধাদাদা পালালেন যেন কোথায়। তখন অতুলবাবু নাই। তিনি মারা গেছেন ক-বছর আগে। বোধ হয় তৃতীয় বার কলেরায় কিছুদিন পর। এবং নিয়তির পরিহাসের মতো ব্যাপার এই যে, অতুলশিব মারা গেলেন ভেদ-বমি করেই, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই।

যাক। এবার স্থির হল যে আমরা যাবো পাটনায় আমার মামার বাড়ি। আমার বিয়ের সময় দিদিমা আসতে পারেননি, দাদামশাই পক্ষাঘাত রোগে পঙ্গু হয়ে পড়ে আছেন দীর্ঘকাল। সুতরাং মা এবার ছেলে-বউ মেয়ে-জামাই নিয়ে পাটনা যেতে চাইলেন। কিন্তু আমার শ্বশুর-পক্ষ থেকে দিদিশাশুড়ী স্বর্গীয় যাদবলালবাবুর স্ত্রী বললেন, এত দূর আমার নাতি নাতবউ পাঠাব না।

মা আপত্তি করলেন না। কি করবেন?

সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় দূত এল যে, তাঁর নাতনী, আমার পত্নী নিতান্ত নাবালিকা, দশ বছরের মেয়ে। তাঁর কাছ ছাড়া ঘুম হয় না, তাকে যেন এতদূর নিয়ে যাওয়া না হয়।

লেগে গেল কলহ।

প্রথমে স্বামিত্বের দাবি নিয়ে আমি। মায়ের ম্লান মুখ দেখে আমার পৌরুষ জেগে উঠল। বললাম—নিয়ে যাবই।

যাদবলালবাবুর গৃহিণী ও-অঞ্চলে প্রবল প্রতাপান্বিতা মহিলা ছিলেন। জমিদারী চালাতেন। নিজের ছেলেদের বলতেন—মারব গালে চড়। তিনি আমার

মতো ষোল বছরের একছটাক ছেলে নাতজামাইয়ের দাবি শুনবেন কেন? বলে পাঠালেন—আমি বিয়ে দিয়েছি নাতনীর, নাতনী বিক্রি করিনি।

এবার উঠলেন পিসিমা। ফণা তুলে উঠলেন। হোক বড়লোক, তবু এ বাড়িই বা খাটো কিসে? আমরা পুরাতন। আমাদেরও দূত গেল।

কিন্তু সে কথা থাক। পরে সে কথা। কলেরার কথা বলি।

সেবার পাটনা গেলাম। যাদবলাল-গৃহিণীই জয়যুক্তা হয়েছিলেন সেবার। আমার বোন, আমার স্ত্রী ও'দের পরিবারের সঙ্গেই গেল। আমরা তিন ভাই গেলাম মাকে নিয়ে পাটনা।

এর পর, বছর কয়েক পর আবার লাগল কলেরা।

সে কলেরার আক্রমণ ভীষণ। সর্ব জেলাব্যাপী। অনাবৃষ্টির বৎসরের পরবর্তী বৈশাখে। দেশ জলহীন। কলেরা লাগল আগুনের প্রতাপে। প্রখর গ্রীষ্মে খড়ের চালের গ্রামে আগুন লাগল যেন। 'ধাত্রীদেবতা'য় এই মহামারীর ছবি আছে। এক বিন্দু অতিরঞ্জন নাই। ডোম পাড়ায় ফ্যালা ডোমের বউ কলেরায় আক্রান্তা হয়ে পড়ে আছে। বাড়ির সকলে পালিয়েছে। দেখেছি—শকুনের পাল বসে আছে ভাঙা পাঁচিলের উপর।

এবার মনকে বাঁধলাম। পালাব না। এই কি জীবন? শুধু পালাব না নয়, সেবা সঙ্ঘের আমিই তখন সম্পাদক, সেবার স্বাদ আমি তখন পেয়েছি; বিবেকানন্দের মূর্তি চোখের সামনে ভাসত। এর একটা আরম্ভ আছে। মনে মনে যেটা আরম্ভ হয় মাটির তলায় বীজের অঙ্কুরিত হওয়ার মতো সে বৃত্তান্ত অপ্রকাশিতই থাকে, এই প্রকৃতির নিয়ম। তার প্রকাশের দিন থেকেই তার ইতিহাস হয় শুরু। সেই শুরুর কথাই বলি।

আমাদের সেবা সঙ্ঘের দুটি বিভাগ ছিল। একটি হল মুঠির চাল সংগ্রহ করা। আমার আগে এটি চালাতেন রাধাদাদা। চাল তুলে জমা রাখতেন এক বড় দোকানির দোকানে। চাল কেনা-বেচার কারবার ছিল তাঁর। শর্ত ছিল প্রয়োজনমতো চাল তিনি দেবেন। তখন এমন অবস্থা ছিল না দেশের। অনাহার এমন ছিল না। ভিক্ষুক যারা ছিল তারা ছিল পেশাদার ভিক্ষুক। মধ্যে মাঝে অসুস্থ লোকের সংসারে অভাব ঘটত। সেবা সঙ্ঘ থেকে তাকে সাহায্য দেওয়া হত। পাঁচ সের, দশ সের। বছরে চাল আদায় হত পনেরো-কুড়ি মণ। এর মধ্যে পাঁচ-সাত মণ রাধাদাদা খরচ করতেন গ্রামের চব্বিশ প্রহরে। রাধাদাদা ওরও পাণ্ডা ছিলেন। মদ মাংস সবই খেতেন, শাক্ত বংশের সন্তান রাধাদাদার ওটা ছিল আনন্দবিলাস। হরিনাম সংকীর্তন, কীর্তন হত, লোকে শুনত, রাধাদাদা পোয়াখানেক গাঁজা এনে হামানদিস্তের মধ্যে ফেলে ছেঁচতেন; আর লোককে ডেকে খাওয়াতেন। ভাল তামাক থাকত, তার সঙ্গে মেশাতেন। যে গাঁজা খেতে আপত্তি করত, তাকে ঐ তামাক খাওয়াতেন।

—বেশ, তামাক খাও। খাস বালাখানার তামাক।

যে খেত সে কিছুক্ষণ পর ভাম হয়ে যেত। রাধাদাদার এক খুড়ো কলকাতায় রাইটার্স বিল্ডিংস-এ চাকরি করতেন। তিনি গরুর গাড়িতে আমেদপুর গিয়ে ট্রেন

ধরবেন, কলকাতা আসবেন। রাধাদাদা তাঁকে বললেন—সে কি হয়? গ্‌ গ্‌ গাঁয়ের চ্‌ চ্‌ চব্বিশ প্রহর হচ্ছে, আপনি চলে যাবেন?

—দূর, কি সব যাচ্ছেতাই কীর্তন এনেছিস।

—ব্‌ ব্‌ বেশ, তামাক খেয়ে যান।

চব্বিশ প্রহরের ভান্ডার-ঘরের সামনে গাড়ি আটকে কথা বলছেন রাধাদাদা। —ব্‌ ব্‌ বালাখানার ত্‌ ত্‌ তামাক।

খুড়ো ঠিক না-জানা ছিলেন না রাধাদাদার কীর্তিকলাপ। কিন্তু তাঁর সঙ্গে রাধা যে রহস্য করবে এ ধারণা তাঁর ছিল না।

তামাক খেলেন তিনি। রাধাদাদা গাড়োয়ানটাকেও খাওয়ালেন। পুরো একটি কলকে সেজে তাকে দিলেন। রথী কাত হল না—সারথি কাত হল—সে সেইখানেই শুয়ে পড়ে বললে, সেই ভালো গো বাবু, কাল পরশু যাবেন! আমি মশাই আজ আর পারব না। গরু দুটোকে চার আঁটি খড় দিয়ো গো বাবা! আমি ঘুমুচ্ছি।

খুড়ো গাড়োয়ানকে ঠেলা দিয়ে বললেন—এই, এই বেটা, ওঠ! এই!

সে বললে—উঁহু। ভাড়া তো নি নাই গো, যে চল বললেই যেতে হবে আমাকে। যাব না।

খুড়ো এবার পায়ে করে ঠেলা দিলেন—গাড়োয়ান খিলখিল করে হেসে উঠে বললে—কি যে কাতুকুতু দিচ্ছেন মাইরি!

খুড়ো মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। রাধাদাদা তাঁকে এবার কীর্তনের আসরে টেনে এনে বসিয়ে সিগারেট দিয়ে বললেন—একটু কীর্তন শুনুন। আমি মাথায় জলটল দিয়ে বেটাকে খাড়া করছি না হয়।

চমৎকার নেভিকাট টোবাকোর হাতে পাকানো সিগারেট। রাধাদাদা তাতেও ভিয়েন করে রেখেছেন। সিগারেট খেতে খেতে খুড়ো মশায়ের কীর্তনের ভাব লাগে। মাথা দোলে। কিছুক্ষণ পর রাধাদাদা এসে বলেন—বেটাকে টেনে তুলেছি কোনো রকমে।

খুড়ো রাধার পিঠে চাপড় মেরে বলেন—বাহবা, আচ্ছা কীর্তন এনেছিস। বহুত আচ্ছা। ও বেটাকে আর টানিস না। যাব না আজ। গাইছে ভাল, শুনি।

রাধাদাদা আর একটা সিগারেট তাঁকে খাইয়ে এসে ভান্ডারের দাওয়ায় বসেন, দোসরা লোক খোঁজেন।

এই রাধাদাদার হাতে সেবা সঙ্ঘ চলছিল কোনো রকমে। রাধাদাদা বাঁচিয়ে রেখেছিলেন এই সঙ্ঘটিকে। এর জন্যই আমি অন্ততঃ আজীবন কৃতজ্ঞ থাকব। লাভপুরও থাকবে। রাধাদাদার হাত থেকে নিয়ে এতে আগুন নেভানো বিভাগ খোলা হয়েছিল। তারপর এল আমার হাতে। একদিন আমাদের গ্রামের স্টেশনে ট্রেন থেকে নামানো হল একটি জোয়ানের আহত দেহ। জোয়ানটি একটা ব্রিজের উপর এক পাশে দাঁড়িয়েছিল। ট্রেন পাস করছিল ; সেই সময় লোকটা ব্রিজ থেকে পড়ে গেছে। বেশ গুরুতর আহত হয়েছে। আমাদের এখানে হাসপাতালে পাঠানো গার্ডের অভিপ্রায়। নইলে সেই কাটোয়া। কাটোয়া পৌঁছুতে আড়াই ঘণ্টা। এখানে হলে এখনি

চিকিৎসা হতে পারে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর যা হয় ব্যবস্থা হবে। মোট কথা, গার্ড নিজের ঘাড়ের বোঝা নামাতে চায়। আহত লোকটা পড়ে রইল প্ল্যাটফরমে। স্টেশনে লোক নাই, হাসপাতালে ব্যবস্থা নাই, লোকটা যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে, লোকে ভিড় করে চারিদিকে দাঁড়িয়ে স্তব্ধ হয়ে দেখছে।

আমাদের ভিতরে সেই জাগল, যে জেগেছিল সেদিন আগুন লাগার রাত্রে।

কেমন যেন হয় এ সময়। পাশের মানুষ চোখে পড়ে না, বাধার কথা মনে থাকে না, পায়ে কাঁটা ফুটলে গ্রাহ্যের মধ্যে আসে না—একটা দৃঢ় সঙ্কল্প জাগে, কাজের পথে বেগবান হয়ে ছুটি. সামনে বাধা এলে অবলীলাক্রমে লাফ দিয়ে পার হই, কারও সঙ্গে ধাক্কা লাগলে তার মুখের দিকে চকিতের জন্য প্রসন্ন হাসিভরা মুখে তাকাই। তারপর আবার ছুটি। সেদিন ওই লোকটিকে নিয়ে গেলাম হাসপাতালে। স্ট্রেচার তৈরি করেছিলাম নিজে।

তারপর একদিন খবর এল—বাজার-পাড়ার নালার মধ্যে এক বৃদ্ধ পড়ে আছে। লোকটি বোধ হয় বাঁচবে না। গেলাম। এক সত্তর-আশি বছরের ভিক্ষুক—এক টুকরো কাপড় কোমরে জড়ানো, পড়ে আছে নর্দমার মধ্যে, পাশে লাঠিটা পড়ে আছে। একটি দাওয়ার উপর তার ঝুলিটা। ওই দাওয়ায় শুয়েছিল রাত্রে, সেখান থেকেই পড়ে গেছে। সমস্ত গায়ে কাদা আর তেমনি দুর্গন্ধ। লোকে নাকে কাপড় দিয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। গায়ে তার কাদা শুধু নয়, বিষ্ঠা। দাওয়াটা বিষ্ঠায় নোংরা হয়ে রয়েছে।

আমার সঙ্গে ছিল শ্যামু। শ্যামু আজ নাই। কিন্তু তার এতে যেন জন্মগত দীক্ষা ছিল।

শ্যামু আর আমি তাকে তুলেছিলাম নর্দমা থেকে। হাসপাতাল তাকে নিলে না। কি যেন হয়েছিল। তাকে সেবা সঙ্ঘের ঘরে এনে জল গরম করে সর্বাঙ্গ ধুয়ে পরিষ্কার কাপড় পরিয়ে শুইয়ে দিলাম। সেই হল সেবা বিভাগের শুরু।

তার পরই এই কলেরা।

সেবা সঙ্ঘের দায়িত্ব নিয়ে কলেরা-আক্রান্ত পাড়ায় ঢুকলাম। বুকটা মুহূর্তের জন্য কেঁপে উঠেছিল। তবু ঢুকলাম।

পিসিমা ছুটে এসেছিলেন খবর পেয়ে।

—যেতে পাবি নে।

—না পিসিমা। যাব, যেতে হবে আমাকে।

—আমি মাথা খুঁড়ব।

—না। সে তুমি পারবে না।

প্রচণ্ড বিরোধ শুরু হল।

—আমি কাশী যাব।

—যাও' আমি যাব। আমাকে যেতেই হবে।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি বিস্মিত হলেন। বিরোধ চলছিল। এমন সময় কলকাতা থেকে এলেন দুজন মেডিকেল স্টুডেন্ট স্বেচ্ছাসেবক। আমাদের বাড়িতে এসেই উঠলেন।

পিসিমা তবু আশ্বস্ত হলেন। আমারও সাহস বাড়ল। দাওয়া থেকে পড়ে গেছে কলেরার রোগী, বাড়ি থেকে সকলে পালিয়েছে, তাকে পাঁজাকোলা করে তুললাম, ব্লিচিং পাউডার গোলা জলে হাত ধুয়ে শিয়রে বসলাম, বাড়িতে কেউ নাই, মুখে জল দিতে হবে।

পিসিমা দাঁড়িয়ে দেখলেন সব। তিনি যেন পাথর হয়ে গেলেন।

সাত

ঠিক এমনিভাবেই পাথর হয়ে গিয়েছিলেন তিনি আর একদিন। উনিশশো সতেরো সালে যেদিন কলকাতা থেকে পুলিসের নির্দেশে বাড়ি ফেলে যেতে হল। বাক্স-প্যাটরা-বিছানা নিয়ে রাত্রি ন'টায় বাড়ি গিয়ে পেঁছিলাম। উনিশশো সতেরো সালের শেষ। তখন আমাদের ওদিকে ট্রেন হয়নি। লুপ লাইনে বোলপুরের একটা স্টেশনের পর দ্বিতীয় স্টেশন আমেদপুরে নেমে সাত মাইল পথ গরুর গাড়ির ব্যবস্থা। খবর একটা গিয়েছিল আগেই। অস্পষ্ট ভাসা ভাসা। (স্কুল জীবনে থার্ড কি সেকেন্ড ক্লাসে পড়ি। উনিশশো চোদ্দ সালে যুদ্ধ লাগল, সঙ্গে সঙ্গেই খবরের কাগজে সংবাদ বের হল—রডা কোম্পানির আমদানি করা মশার পিস্তল এবং গুলি বাক্স-বাক্স চুরি হয়েছে। এবং সে কাজ বাংলার বিপ্লববাদীদের। তখন দেশে বাংলা দৈনিক কাগজ ছিল না। ইংরেজী অমৃতবাজার আসত হেডমাস্টার মশায়ের কাছে। সেই সংবাদটা যখন শুনেছিলাম তখন রক্তে জোয়ার ধরেছিল।)

নূতন কাল এসেছে তখন।

আমার কালের কথায় সে কালের আবির্ভাবের কথা লিখেছি। ১৯০৫ সালে যে কালকে আবির্ভূত হতে দেখেছিলাম, সেই কাল। পৃথিবীর বাতাবরণের বিপুলায়তনের কোথায় একটি স্থানে ঝড় ওঠে প্রথমে, সেই ঝড় ক্রমে আপন গতিবেগে ছড়ায় দূর-দূরান্তরে। পৃথিবীর সৃষ্টিতে নূতনকে এনে দিয়ে যায়। তেমনি ভাবেই মহানগরীর কেন্দ্র হতে ধীরে ধীরে স্বাধীনতার সাধনার প্রতিটি ঝড় একে একে পেঁছে পেঁছে এই কালকে প্রসারিত করেছিল। মানিকতলা, দিল্লীর রাজসূয় যজ্ঞের শোভাযাত্রায় বোমা, ঘটনাগুলি ক্ষেত্র প্রস্তুত করেই রেখেছিল।

এইখানে আমাদের ওখানকার একটি ঘটনার কথা উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে। ঘটনাটি আমার মনে গভীর ছাপ এঁকে গেছে। নতুন থার্ড মাস্টার এলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। বোধ হয় পাঁচ সালেই। অগ্নিশিখার মতো দীপ্ত একটি তরুণ। বয়স তখন কুড়ি-বাইশ। তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ, খড়্গের মতো নাসা, তীক্ষ্ন দুটি চোখ। তিনি ভুবনমোহিনী প্রতিভার কবি ডাক্তার নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ভাইপো। তিনি বক্তাও ছিলেন ভালো। পাঁচ সালের পর একদিন তিনি বিলিতি কাপড় পুড়িয়েছিলেন। চোখের সামনে আজও ভাসছে—স্তূপীকৃত কাপড় পুড়ছে, চারিপাশে লোক দেখছে, মানুষ ছুটে এসে সেই বহ্নিকুণ্ডে সমিধ দানের মতো নিজের বিলিতি কাপড় এনে

নিক্ষেপ করছে। আমার মা আমার হাতে প্রথম রাখী বেঁধে দিয়েছিলেন। সেই আমার উপনয়ন। দ্বিজেনবাবুর এই বহ্ন্যুৎসব আমার জীবনে প্রথম যজ্ঞ, নিত্যগোপালবাবুর শারদীয়া পূজার কবিতা—'দেবাসুর সংগ্রামের এই তো সময়' বোধ হয় প্রথম মন্ত্রপাঠ। উনিশশো চৌদ্দ সালের ওই মশার পিস্তল লুঠের ঝাপটা একেবারে সোজা এসে লাগল বীরভূমে। হঠাৎ শুনলাম রামপুরহাটে দুকড়িবালা দেবী নামে একজন মহিলা গ্রেপ্তার হয়েছেন। তাঁর বাড়িতে সেই পিস্তলের পিস্তল পাওয়া গেছে। তাঁর বোনপো, তাঁর প্রায় সমবয়সীই, নাম নিবারণ ঘটক, তিনিই এনে রাখতে দিয়েছিলেন। শুনলাম ধরা পড়ে তিনি 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিতে দিতে পুলিসের সঙ্গে গিয়েছেন হাসিমুখে। তখন একটা গান ছিল—

যায় যাবে জীবন চলে
'বন্দেমাতরম্' বলে।

আজকাল ইনকিলাব জিন্দাবাদে বিপ্লবের আয়ু বাড়ে কিনা, বিপ্লববহ্নি বর্ধিততর শিখায় জ্বলে কিনা, সন্দেহ আছে। মনে হয় বিপ্লববহ্নির সে কালের অগ্নিদেবতার মতো যজ্ঞহবি ক্রমান্বয়ে পান করে অগ্নিমান্দ্য হয়েছে। ধ্বনি শুনে শুনে কানে ঘাঁটা পড়ে গিয়েছে। সে কালে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি উঠলে অগ্নিতে যেন 'স্বাহা' বলে ঘৃতাহুতি পড়ত।

উত্তেজনায় মনের আবেগে বাড়িতে লুকিয়ে রামপুরহাট গেলাম। কেন গেলাম জানি না। যুক্তি ছিল না। তবু গিয়েছিলাম। দুকড়িবালা তখন জেলে। রামপুরহাট নেমে ভয় হল, কাউকে জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না তাঁর কথা। ফিরে আসবার পথে স্টেশনে বিচিত্রভাবে আলাপ হল নলিনী বাগচীর সঙ্গে। তিনি তখন কলেজের ছাত্র। যাচ্ছেন নলহাটির পথে, নলহাটি থেকে ব্রাঞ্চ লাইন হয়ে নির্মতিতা। আমার থেকে বয়সে বড়। স্টেশনের পিছনে মুসাফেরখানায় তিনি পানিপাঁড়ের সামনে হেঁট হয়ে হাত পেতে জল খাচ্ছিলেন। আমিও জল খাবার জন্য পিছনে দাঁড়িয়েছিলাম। তিনি জল খাওয়া শেষ করে 'আঃ' বলে হাতের অঞ্জলির উদবৃত্ত অবশিষ্ট জলটুকু দিলেন ছড়িয়ে। একটা তৃপ্তি এবং একটা উল্লাস ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁর মনের ভিতর বোধ হয় কোন হেতুতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। কারণ যাই হোক, জলের অঞ্জলির সবটুকুই আমার মুখে এসে পড়ল। আলাপের সূত্র এই জলের সূত্র থেকেই। অনেকক্ষণ কথাবার্তা হয়েছিল। বোমা পিস্তলের কথা নয়। তাঁর কথাও বেশি নয়। আমিই কথা বলেছিলাম বেশি। নির্মতিতার কথা থেকে শুরু। বললাম—নির্মতিতা জানি। ওখানকার গৌরসুন্দরবাবুরা খুব বড় জমিদার। তার পরেই বললাম, ও'রা আমাদের পত্তনিদার।

কৌতুক অনুভব করেছিলেন তিনি। খুদে একটি জমিদার বা জমিদার-তনয়ের এমন কথা নিশ্চয় কৌতুকজনক। বলেছিলেন, তোমরা জমিদার?

—হ্যাঁ। আমাদের ১০৭২ নম্বর হুদা শ্যামপুর শাসন করতে না পেরে গৌরসুন্দরবাবুকে যেচে পত্তনি দিয়েছিলাম। খুব শাসন করেছেন কিন্তু গৌরসুন্দরবাবু।

এইভাবে আলাপ এগুতে এগুতে নিজের সব গুণপনার কথাই প্রকাশ করেছিলাম। আমি পদ্য লিখতে পারি। খুব ভালো পদ্য বলতে পারি। ইস্কুলে ক্লাসে সেকেন্ড থার্ড হই। তিনি আমাকে কাগজ পেন্সিল দিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন—লেখ তো একটা পদ্য। লিখেছিলাম বারো লাইন। কি লিখেছিলাম মনে নেই, তবে মাইকেলের 'রসাল কহিল উচ্চে স্বর্ণ লতিকারে',—এই কবিতার ছন্দ ধরে লিখেছিলাম। আমাদের 'সাহিত্য-পাঠে' এই ছন্দের কবিতার প্রাদুর্ভাব ছিল বেশি। পুজোতে তখন কবিতা লিখি ; বাড়িতে নিয়মিত লিখি দুর্লভ একসারসাইজ বুকে ; আমাদের লাভপুরে তখন মাসে মাসে সাহিত্যসভা বসে। প্রতি অধিবেশনে কবিতা লিখে পড়ি। বাড়িতে তখন এক মহাকাব্য ফেঁদেছি। নাদির শাহের ভারত অভিযান ছিল বিষয়বস্তু। সমস্ত রচনার মধ্যে এই ছন্দের রচনাই বারো আনা এবং ভারতের দুঃখে বিলাপ থাকত বেশি। সেদিন যে কবিতাটি বারো লাইন লিখেছিলাম সেটির মধ্যেও ওই ছন্দ এবং ওই বিলাপ ছিল। তিনি খুশি হয়েছিলেন। বলেছিলেন—তোমাকে চিঠি লিখব, উত্তর দিয়ো। কেমন?

তারপরই আসল কথাটি ফাঁস হয়ে পড়ল। প্রশ্ন করলেন—কোথায় এসেছিলে?

প্রথমে বললাম—ফুটবল খেলা দেখতে।

কিছুক্ষণ পর কেমন যেন অপরাধ বোধ করলাম—বললাম আসল কথা। দু'কড়িবালার বাড়ি দেখতে এসেছিলাম।

আলাপের বন্ধনটা দৃঢ় হয়ে গেল। তিনি নিজের কথা কিছু বললেন না, কিন্তু বললেন অনেক কথা, যার মধ্যে বিপ্লববাদের আভাষ ছিল। চিঠিপত্র কয়েকখানা লিখেছিলাম। চার পাঁচখানা। তার বেশি নয়। দেখাও হয়েছিল আর একবার। এবার দেখা করার স্থান ছিল—সাঁইথিয়া, ময়ূরাক্ষীর তীর। সেদিন তিনিই অনেক কথা বলেছিলেন। স্পষ্ট কথা। এর মধ্যে আরও এমন সঙ্ঘটন হয়েছিল. যাতে আমার অন্তরের এই আকর্ষণটা আরও প্রবল হয়ে উঠেছিল। বংশের কীর্তির যেমন একটা আকর্ষণ আছে, তেমনি আকর্ষণ। যার মধ্যে আছে একটা কর্তব্যবোধ। আমার সেজমামা হঠাৎ প্লেগে মারা গেলেন। তার আগে পত্রে বারকয়েক সংবাদ পেয়েছিলাম যে তিনি বাড়ি থেকে পালিয়েছেন এবং কাশী থেকে তাকে প্রায় ধরে আনা হয়েছে। মৃত্যুর পর সংবাদ পেলাম তিনি কাশীর বিপ্লবী দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়েছিলেন। স্বর্গীয় শচীন্দ্র সান্যালের কাছেই পালিয়েছিলেন। প্রতিবারই সেখান থেকেই ধরে আনা হয়েছিল। বড়মামা প্রায় বিস্তৃত বিবরণই জানিয়েছিলেন। এবং মা চোখের জল ফেলতে ফেলতে বলেছিলেন—গাগু (সেজমামার ডাকনাম) যদি ফাঁসি যেত প্লেগে না মরে, তবে যে সে অক্ষয় কীর্তি রেখে যেত।

এইভাবেই আমার মনে সেদিন নূতনকালের সাধনার বেদী বাঁধা হয়েছিল। কিন্তু যোগাযোগের অভাবে প্রত্যক্ষভাবে যজ্ঞবহ্নির সম্মুখীন হয়ে সমিধ যোগাতে পারিনি। ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে পড়তে এলাম। মাস ছ'য়েক পরে এই ঘটনা ঘটল।

পিসিমা একদা প্রায় জীবনের সর্বস্ব হারিয়ে অর্ধোন্মাদ অবস্থায় ফিরে এসে-

ছিলেন পিতৃগৃহে। তাঁর পৈতৃক সংসারও ছিল বৃহৎ সংসার; বহুজনের সংসার; বহুজনের সমারোহ ছিল সে সংসারে। শৈশবে মাতৃবিয়োগ হয়েছিল, পিতা ছিলেন পরম স্নেহপরায়ণ। তিনিই ধরেছিলেন সংসার। পাঁচ বোন এক ভাই ক্রমে যখন বড় হয়ে উঠলেন তখন বিশৃঙ্খল সংসার আবার সুশৃঙ্খল হয়ে উঠল, তারুণ্যের আনন্দে উল্লাসে মুখর হয়ে উঠল। সেকালের সম্পন্ন কুলীনের ঘর। মেয়েদের বিবাহ হল কুলীনের সঙ্গে। কুলীনের মেয়ের শ্বশুরবাড়ি কদাচিৎ ভাগ্যে জুটত। তবে সম্পন্ন শ্বশুরের ঘর হলে জামাতারা সেখানে বৎসরে অন্ততঃ মাস ছয়েকের জন্যে বসবাস করতেন। বাকী ছয়মাস অন্যান্য শ্বশুরগৃহে পরিভ্রমণ করে কর্তব্য পালন করতেন; তার সঙ্গে প্রাপ্য আদায় পেতেন জামাতাবিদায়। কাপড়, নগদ টাকা; এদিকে সম্পন্ন শ্বশুরঘরেও পোষ্য হওয়ার অনাদর কোনক্রমেই মাথা তুলে উঠতে পারত না। তাঁরা সব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ব্যক্তি ছিলেন—ভাগ্যে ঘিয়ের অভাব হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন না, পরিমাণ কম হয়ে এলেই ক্যাম্বিসের ব্যাগে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে একদা শ্বশুরকে প্রণাম করে বলতেন—আমাকে একবার যেতে হবে।

পিসিমার পৈতৃক সংসারেও জামাতাদের বাস ছিল। প্রথম দুই কন্যার এমনি কুলীন জামাতার সঙ্গে বিবাহ দেওয়ার পর আমার পিতামহ বাকী তিন কন্যার অবস্থাপন্ন কুলীনের ঘর খুঁজে বিবাহ দিয়েছিলেন। তার মধ্যে আমার ধাত্রীমাতা এই পিসিমাই প্রথমা। তিনি যখন স্বামীপুত্র হারিয়ে পিতৃগৃহে ফিরলেন তখনও সে সংসার জমজমাট। তারপর বৎসর চার-পাঁচের মধ্যেই এ সংসারও বিপর্যস্ত হয়ে গেল। পাঁচ বোনের তিন বোন গেলেন। ভাইয়ের সংসার ভাঙল। প্রথমা স্ত্রী গেলেন। তারপর গেলেন বাপ। এই দুর্ভাগ্যের ঝড়ঝঞ্ঝা ভোগ করে সংসারে বাঁচবার এবং প্রিয়জনকে বাঁচাবার যে একটি পথ তিনি পেলেন বা মনে মনে রচনা করলেন, সেই পথে চলতে তিনি আমার কাছেই পেলেন প্রথম বাধা এবং আমাকে হার মানাতে না পেরে তিনি নিজে হার মানবার ভয়ে ক্রমে ক্রমে আমার কাছ থেকে দূরে সরে গেলেন। কিন্তু এই সরে যাওয়ার আগে আমার সঙ্গে যে দ্বন্দ্ব তাঁর হয়েছে তাতে আমিও কম ক্ষত-বিক্ষত হইনি।

আমার সাহিত্যে নবদম্পতির বা তরুণ-তরুণীর রাগ-অনুরাগ, বিরহ-মিলনের কথা ও চিত্রের অভাব আছে। বাইরে থেকে এ অভিযোগ আছে এবং এ অভিযোগ সত্য বলেই আমি স্বীকার করি। তার কারণ আমার প্রথম যৌবনে পিসিমার সঙ্গে ওই দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব এমনি উত্তপ্ত এবং কঠোর হয়ে উঠল যে, আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমার জীবনের সম্পর্কের সকল মাধুর্য ও সরসতা প্রায় ঝলসে গেল, কঠিন হয়ে গেল। জীবনের প্রথমে তরুণ-তরুণীর জীবনে যে মধুর দিবা-বিভাবরী আসে, সে এল না বা আসেনি বললেই ঠিক বলা হবে।

আমার প্রথম সন্তান সনতের জন্মের পর পিসিমা তাকে কোলে তুলে নিয়ে খানিকটা সহজ হলেন বটে, কিন্তু আমাদের স্বামী-স্ত্রীর মিলিত জীবনের প্রতি তাঁর দৃষ্টি সরল সহজ হল না।

উত্তাপটা তাঁর পড়েছিল একদিকে বধূর উপর অন্যদিকে আমার কর্মজীবনের

উপর। আমি আমার কাজ নিয়ে যে কঠোরতার সঙ্গে সম্মুখে অগ্রসর হয়েছি, সে অনেকটা এই আঘাতে। যে সংসারে আমার জন্ম. আমার স্ত্রীর জন্ম. তাতে এইভাবে নিজেদের সুখ ও আনন্দের দিকটাকে বিসর্জন দিয়ে এ আঘাতের প্রতিঘাত দেওয়ার পদ্ধতিটাই ছিল একমাত্র মহত্ত্বপূর্ণ পদ্ধতি। তিনিও বোধ হয় তাই শেষ জীবনে আমার খ্যাতি, আমার প্রতিষ্ঠা, আমার নাগরিক জীবনকে দূরে রেখে লাভপুরের পল্লীজীবনে একান্তভাবে পৈতৃক ঘরদুয়ার নিয়েই কাটিয়ে গিয়েছেন। এখানে যখন মধ্যে মধ্যে আসতেন তখন একখানি ঘরের মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ রাখতেন। শুচিতার বাতিককে বড় করে তুলে আমাদের প্রবেশাধিকার রুদ্ধ করে রাখতেন।

দেনা-পাওনার মামলায় এবং হিসেবে আমার বঞ্চনাটা বড় নয়; তাঁর বঞ্চনাটাই বড়, অনেক বেশি, অনেক ভারি। জীবনে শুধু দিয়েই গেলেন অভিমান বশে। তিনি একমাত্র যাকে বঞ্চনা করে গেছেন তিনি হলেন আমার মা। নিয়ে যা কিছু গেছেন, তিনি তাঁর কাছ থেকেই। এবং এর জন্যে দায়ী যদি কেউ হয় সে তাঁর ভাগ্যদেবতা। তা ছাড়া আর কি নামে তাঁর জীবনের কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতাকে অভিহিত করব?

তাঁর মৃত্যুর কথা বলে পিসিমার কথা শেষ করব।

উনিশশো পঞ্চাশ সালের এপ্রিল মাসে কলকাতায় এলেন। তখন চোখের জন্য অত্যন্ত চিন্তিত হয়েছেন। চোখের দৃষ্টি কমে যাচ্ছে। এখানে দেখানো হল. ডাক্তার দেখে বয়স জিজ্ঞাসা করলেন। আশি পার হয়েছে বা হচ্ছে শুনে হাসলেন। বললেন, বাইরেটা দেখার বয়স ফুরিয়ে আসার সময় হয়েছে যে, ভিতরের দিকে চোখ ফেরাতে হবে। তিনি বললেন, বাবা, ভেতরের দিকে উপরের দিকে চোখ রেখে বাঁচা চলে পাহাড়ের গুহায় বসে, বায়ু আহার করে। মাটির উপর হেঁটে-চলতে হয়. ভাতের থালাটা টেনে নিয়ে ভাতের গ্রাস মুখে তুলতে হয় যে আমাদের মতো মানুষকে। হুঁচোট খাব, ভাতের থালায় হাত দিতে মাটিতে হাত দেব—এই জন্যই দেহটা যতদিন আছে চোখটা ততদিন সর্বাগ্রে চাই। ও বাবা. রত্ন; স্বামী পুত্র সবার অধিক। আমার বাবা, স্বামী পুত্র নাই, কিন্তু আমার ভাইপো—তাকে তো তুমি জান—সে আমার নিজের সন্তানের অধিক। সংসারে যাদের ছেলে আছে তাদের দশা তো দেখেছি, সে থাকা-না-থাকা সমান। আমার ভাইপো আমার সন্তানের অধিক। সে, তার বউ, তাদের ছেলে পুত্রবধূ আমার যে সেবা করবে সে আমি জানি, কষ্ট আমার হবে না; কিন্তু ভাতের থালায় হাত দিতে মাটিতে হাত দেব, এক পা হাঁটতে গিয়ে হুঁচোট খাব. এ আমি পারব না বাবা।

ডাক্তার ওষুধ দিলেন। খেয়ে তাঁর উপকার হল। দুপুরবেলা মহাভারত পড়তে শুরু করলেন। এর পরই ব্যস্ত হলেন লাভপুর ফিরবেন। আমি বললাম—না। এখন থেকে এখানেই থাক। বুঝিয়ে বললাম—দেখ, এত বয়স হল, সেবার দরকার, তা ছাড়া হঠাৎ যদি তোমার কিছু হয় তো তোমার সঙ্গে দেখা হবে না। কলকাতায়

গঙ্গা রয়েছেন, গঙ্গাতীরে তোমার শেষকৃত্য হবে, লাভপুরে আর যাওয়া উচিত নয়, যেও না তুমি।

ছেলেমেয়েরা সকলেই ধরলে তাঁকে।

তিনি বললেন—ওরে, বউকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। অর্থাৎ আমার মাকে।

মা বললেন—বেশ, আমিও এখানে থাকব। মাসে একবার লাভপুর গিয়ে ঠাকুর-দেবতার পুজোর ভোগের ব্যবস্থা দেখেশুনে আসব।

পিসীমা এবার বললেন—বেশ তাই হবে। তবে একবার তো যেতে হবেই।

—কেন?

—কেন? হাসলেন তিনি। তোদের বাসন-কোসন জিনিস-পত্র এতকাল আমি রেখেছি, তোর মা পর্যন্ত জানে না কি আছে কি নেই, কার কোন্‌টা। আমি গিয়ে সব দেখিয়ে দেব। তোদের তিন ভাইয়ের পৈতে, বিয়ে, তোদের ছেলেদের অন্নপ্রাশন, পৈতের বাসন পৃথক করে দেব। জিনিসপত্র দেখিয়ে বুঝিয়ে দেব। আর—। আর বাবা, আমার দেনা-পাওনা?

পরে শুনলাম—যে টাকা আমি পাঠাতাম তাঁকে নিজস্ব খরচের জন্য তাই থেকে তিনি কিছু ধার দিয়ে থাকেন।

বললেন—লোকে অভাবে চায়, দিই। বলি—একেবারে তো পারব না, এগুলি আমি রাখছি—ছেলেদের দিয়ে যাব, আমার শ্রাদ্ধ করবে তো—তাতেই দেবে।

এই কারণ দেখিয়েই তিনি সে মাসে লাভপুর ফিরলেন। সেখানে গিয়ে সকলের কাছেই বললেন—আসছে মাসে আমি কলকাতায় যাব, দেহটা সেখানেই রাখতে হবে —ছেলের হুকুম। যাবার সময় দেখা করতে পারি-না-পারি বিদায়টা নিয়ে রাখছি ভাই। দিনও আর নাই। সে আমি বুঝছি।

জুন মাসের শেষ দিকে আসবেন জানালেন।

জুন মাসের প্রথম সপ্তাহেই হঠাৎ এখানে খবর পেলাম, আমার ছোট ভাই যিনি লাভপুরে থাকেন তিনি রাজনৈতিক দলাদলির এমন জটলায় জড়িয়ে পড়েছেন যে তা থেকে হয়তো আমাদের বন্ধুবান্ধবের মধ্যে একটা প্রচণ্ড বিরোধের সৃষ্টি হবে, হয়তো বা মর্মান্তিক বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। তাঁদের দলের মিটিং আসন্ন—যে মিটিং-এ এই জটলার জটা বিস্ফোরণ হয়ে বিরূপাক্ষের আবির্ভাব হবে। আমি টেলিগ্রাম করে ছোট ভাইকে কলকাতায় আনালাম। ছোট ভাই কলকাতায় এল যেদিন সেদিনও পিসিমা সহজ এবং সুস্থ। তার পরদিন বেলা দুটোয় তাঁর জ্বর হল। পরদিন বেলা তিনটেয় তিনি দেহত্যাগ করলেন। হাসি মুখে। মৃত্যুর মিনিট কয়েক আগে পর্যন্ত বলেছেন—ভালো আছি। যাচ্ছেন বুঝতে পেরেছিলেন। কোন খেদ করেন নি। অথচ খেদ করবার ছিল। সংসারের মধ্যে তিনটি ভাইপো, তারা ঘটনাচক্রে সকলেই সেই ক্ষণটিতে বাইরে। শুধু পদশব্দ শুনলেই ফিরে তাকিয়েছিলেন। বুঝতে পারি, প্রত্যাশা করেছিলেন—আমরা এসেছি। নিঃশব্দে তাঁর জীবনের প্রিয়তমা সখী ভ্রাতৃবধূ আমার মায়ের হাতে হাতটা রেখে মহাপ্রয়াণ করলেন।

এই আমার পিসিমা। আমার ধাত্রীদেবতা। তাঁর কথা শেষ করবার সময় ধাত্রীদেবতার পরিশিষ্ট উদ্ধৃত করেই তাঁকে প্রণাম জানাব।

'সমস্ত জীবের ধাত্রী যিনি ধরিত্রী, জাতির মধ্যে তিনিই তো দেশ, মানুষের কাছে তিনিই বাস্তু। সেই বাস্তুর মূর্তিমতী দেবতা তুমি, তুমিই তো আমায় বাস্তুকে চিনিয়েছ, তাতেই চিনেছি দেশকে। আশীর্বাদ কর, ধরিত্রীকে চেনা শেষ করে যেন তোমাকে চেনা শেষ করতে পারি।'

আট

আমার দাম্পত্য জীবনের নিরসতার জন্য দায়ী কিন্তু একা পিসিমা নন। আমার জীবনে যেমন তিনি, তেমনি আমার স্ত্রীর জীবনে ছিলেন একজন; তিনি তাঁর দিদিমা।

অথচ এই দুই মহিলাই একদা উদ্যোগী হয়ে আমার কৈশোরে এবং আমার স্ত্রীর প্রথম বাল্যজীবনেই এক খাঁচাতেই দুটি পাখি পোষার শখের মতো শখে দু'জনকে বেঁধে দিয়েছিলেন। ভালো হয়েছিল কি মন্দ হয়েছিল সে কথা আজ তুলব না। শুধু একটি কথাই বলব, সেই কৈশোরে বিবাহ না-হলে আমার জীবনে আমি সাহিত্যিক খুবসম্ভব হতাম না; জীবনের প্রবাহ রাজনৈতিক খাতেই নিঃশেষিত হত। বন্দী-জীবনে পড়াশুনা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলিও উত্তীর্ণ হতাম এবং আজকের এই প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের দিনে ভোটপ্রার্থী হয়ে জোরালো বক্তৃতা করে বেড়াতাম। বিধানসভায় বা লোকসভায় আমার কণ্ঠস্বর শোনা যেত।

সে কথা থাক। বলি আমার বিয়ের কথা, কৈশোরেই যে ঘটনাটি আমাকে ডবল প্রমোশন দিয়ে যৌবনের সিংহদ্বারে খাড়া করে দিলে। অকালে পেকে উঠবার যোগ বা সুযোগই হোক আর দুর্যোগই হোক, এনে উপস্থিত করলে। যোগটা এল অতি অকস্মাৎ। ষোল বছর বয়স, ফার্স্ট ক্লাসে পড়ি, ম্যালেরিয়ায় ভুগি ঠিক পনের দিন অন্তর। অর্থাৎ বারো মাসে বারোটা জ্বরের পালা বাঁধা। এক এক পালায় ছ'-সাত দিন। বিয়ের কথাটা অবশ্য বাল্যকাল থেকেই শুনে আসছিলাম। সাত-আট বছর বয়স থেকেই শুনে আসছিলাম আমার বিয়ের সম্বন্ধ হয়ে আছে। মেয়েটির পিতামহ এবং আমার বাবা ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তিনি ছিলেন সে আমলের একজন নামজাদা পুলিস কর্মচারী; ওই মেয়েটি ছিল তাঁর প্রথমা পৌত্রী। মেয়েটির অন্নপ্রাশনে নিমন্ত্রণ রাখতে গিয়েছিলেন বাবা, সেই সময়েই এ প্রস্তাব দুই বন্ধুতে উত্থাপন এবং সমর্থন করে এসেছিলেন। বাবার মৃত্যুর পর বাবার মাতুল এসে আমাদের বাড়িতে কর্তা হলেন। তিনি আনলেন আর এক সম্বন্ধ। এক উকিলের পৌত্রী, উকিলের পুত্রী। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। বাবার মাতুলের প্রভাবে এই সম্বন্ধটিই ক্রমে প্রাধান্য লাভ করল। আমার যখন এগারো বছর বয়স তখন আমার এই পিতামহ (বাবার মাতুল) আমাকে তাঁর নিজের গ্রামে নিয়ে যাবার পথে ওই উকিলের বাড়িতে উঠলেন, আদালতে কাজকর্মও ছিল এবং তাঁর অন্য অভিপ্রায়ও ছিল। আমাকে মেয়ে দেখাবার

না হোক, উকিলবাবুদের তাঁর এই নাতি-রত্নটিকে দেখাবার অভিপ্রায় যে ছিল সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। আমার সে কি পরীক্ষা! কন্যার পিতামহ খ্যাতনামা উকিল, আমাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চললেন। চতুর প্রবীণ উকিল, তাঁর প্রশ্নে আমার নাড়ী-নক্ষত্র সব বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু তাতে আমি খুব গলদঘর্ম হই নি। বৃদ্ধ এমনই প্রসন্ন হৃদ্যতার সঙ্গে গল্পের ছলে কথা বলছিলেন যে আমি বিন্দুমাত্র অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি নি। কয়েকটা প্রশ্ন আজও মনে রয়েছে। জিজ্ঞেস করলেন—দিনে তো দশটার সময় খাও, ইস্কুল যাও। রাত্রে? রাত্রে ক'টার সময় খাও?

আমি উত্তর দিলাম—ন'টা-সাড়ে ন'টার সময়। পড়া শেষ করে।

—কে কে খাও একসঙ্গে?

—মোলপুরের দাদা (আমার পিতামহ, বাবার মামা), আমি, নায়েব। আমরা তিনজনে একসঙ্গে খাই।

—তোমার মাস্টার? বাড়িতে মাস্টার নাই?

—আছেন। তিনি বাড়িতে খান না।

—ও। আর চাকর-টাকর পরে খায়? কে? কে?

—হ্যাঁ। চাকর আর চাপরাশী।

—কে খেতে দেন? মা—না পিসীমা?

—না, সাতনদিদি।

—দিদি? কি রকম দিদি?

—আমাদের বাড়ি রান্না করেন, আমি দিদি বলি।

—বাঃ! তাই তো উচিত। ঝিকে কি বল? দিদি?

—হ্যাঁ। যমুনাদিদি বলি।

—ক-জন ঝি?

—যমুনাদিদি আর সোনা-পিসি। সে বাউরি, বাসন-টাসন মাজে।

এইভাবে শুধু বাড়ির কথাই নয়, আমার লেখাপড়ার কথাও জেনে নিয়েছিলেন। এমন কি কয়েক ছত্র কবিতা লিখিয়ে নিয়ে আমার হস্তাক্ষর এবং আমি কবিতা লিখতে পারি এই কথাটি সত্য কিনা তা'ও পরখ করে নিয়েছিলেন। এর পর পিঠে হাত বুলিয়ে তারিফ করে কানে কানে বললেন—একটি মেয়েকে দেখাচ্ছি, দাঁড়াও। এক্ষণি আসবে, বল তো কেমন মেয়ে?

উজ্জ্বল গৌরবর্ণা একটি মেয়ে, চোখ দুটি পিঙ্গল, বোধ হয় বছর আটেক বয়স, বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, তাকে ডেকে দেখালেন।

এবার কথাটা মনে করে এগারো বছর বয়সে লজ্জিত হলাম খুব।

আসল পরীক্ষা কিন্তু এর পরে।

সেদিন ছিল শনিবার। সেখানে পেঁাচেছিলাম সকাল দশটায়। তখন দেখেছিলাম আমার থেকে বছর চারেকের বড় একটি ছেলে বই বগলে ইস্কুল গেল। আলাপ হয় নি। বেলা দুটো, আমি একা দাঁড়িয়ে আছি বাড়ির ফটকে রাস্তার দিকে চেয়ে; প্রতীক্ষা করছি কখন মোলপুরের দাদা ফিরবেন। এমন সময় ফিরল সেই ছেলেটি।

ঠিক বোনের মতোই চেহারা। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, পিঙ্গল চক্ষু। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললে—তুমি তারাশঙ্কর?

—হ্যাঁ।

—এস আমার সঙ্গে। আমি...।

সঙ্গে গেলাম। একখানি ছোট ঘরে টেবিল চেয়ার আলমারি। বুঝলাম পড়ার ঘর। ছেলেটি বললে—চেয়ারে বস। কোন্ ক্লাসে পড়?

—ফোর্থ ক্লাস। (আজকালকার ক্লাস সেভেন)।

—ইংরেজি কোন্ বই পড়ান হয় ক্লাসে?

—Blakies' Indian Reader.

'ব্লাকিস ইণ্ডিয়ান রীডার' তখনকার দিনে বোধ করি দু-যুগ ধরে ছিল। ফার্স্ট সেকেণ্ড ক্লাসে ছিল ওয়েভার্লী নভেল।

বলবামাত্র ছেলেটি আলমারি খুলে তার পড়ে শেষ করা 'ব্লাকিস ইণ্ডিয়ান রীডার' বের করলে। একটা জায়গা বেছে বের করে বললে—রিডিং পড়। তারপর বললে—মানে কর।

তারপর বইখানা নিজের হাতে নিয়ে বললে—বানান কর। কঠিন একটা শব্দ—নিউমোনিয়া গোছের।

তারপর বইখানা আবার হাতে দিয়ে বললে—পার্সিং কর।

এর পর খাতা পেন্সিল হাতে দিয়ে ডিক্টেশন।

এর পর টেনে বের করলে—অ্যালজেব্রা এবং জ্যামিতি। তার সঙ্গে ব্যাকরণ কৌমুদী প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। মাসটা ছিল বোধ হয় মার্চের প্রথম, গায়ে তখনও সকালে গরম জামা পরতে হয়। আমি এক গা ঘামে প্রায় নেয়ে উঠলাম।

বীজগণিত জ্যামিতির পরীক্ষা শেষ হয় এই সময় এলেন আমার মোলপুরের দাদা। তিনি আবার ছিলেন এই ছেলেটির ভিক্ষে বাবা। অর্থাৎ উপনয়নের পর তিন দিনে ব্রহ্মচর্য পর্ব শেষ হবার পরদিন ধুতি-চাদর-জামা-জুতায় গৃহীর বেশ পরিয়ে তাঁর ধর্ম-পিতার গৌরব ও পুণ্য অর্জন করেছিলেন। তিনি ঘরে ঢুকে এক গাল হেসে সেই ছেলেটিকে বললেন—কেমন দেখছ? পারছে বলতে?

এবং আমার দিকে চেয়ে বললেন—দেখছ? পড়াশুনায় কেমন দড়?

এর পর চেপে বসে বললেন—নাও, তোমরা পড়, আমি শুনি।

ছেলেটি উৎসাহিত হয়ে ব্যাকরণ কৌমুদী তুলে নিলে।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম—মাথা ধরেছে।

মোলপুরের দাদা একটু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন—মাথা ধরেছে?

মাথা ধরে নি কিন্তু মাথায় যেন খুন চেপেছিল। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে গলায় আঙুল দিয়ে বসে পড়লাম একটা যায়গায়। বেলা ন্যরোটায় খেয়েছিলাম। তার ঘণ্টা চারেক পরে গলায় আঙুল দিয়ে বিশেষ কিছু বের করতে পারলাম না। কিন্তু মাথাটা ঘুরিয়ে ফেললাম সত্যসত্যই। অপর দিকে ইংরেজি-অঙ্ক-জ্যামিতিতে আমার অক্ষমতার ত্রুটি বেরিয়ে পড়ে নি, যাতে করে এটাকে অক্ষমতার লজ্জা ঢাকা

দেওয়ার অপচেষ্টা বলে মনে হয়। এবং ব্যাপারটা এমনি আকস্মিক যে, তেমন কিছু সন্দেহ করবার মতো অবকাশ তাঁরা পান নি। আমার ক্রোধ ক্ষোভ আমাকে নির্যাতিত করলে নীরবে। তাতেও পরিত্রাণ পেলাম না, ডাক্তার এলেন একজন, হজমের ব্যতিক্রম সন্দেহ করে ওষুধ লিখলেন, তাও খেলাম। সমস্ত রাত্রিটা প্রায়োপবেশন করে ক্ষিদের জ্বালায় বিনিদ্র হয়ে পড়ে রইলাম, সকালে উঠেই বললাম—বাড়ি যাব।

এমনিভাবে বিবাহের কথাবার্তা এবং পাত্রীপক্ষের সঙ্গে পরিচয় ছেলেবেলা থেকেই আমার ছিল। ওদিকে পুলিস কর্মচারীটি পুলিস সাহেব হয়ে আমাদের জেলায় এসে আমাদের বাড়ি যাওয়া-আসা করছিলেন। ওই দুই জায়গার এক জায়গায় আমার বিবাহ হবার কথা। কিন্তু আমার বোনের বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত কোনো স্থানে পাকা কথা কওয়াটা আমার মা-পিসিমার কাছে ছিল অন্যায় অধর্মের সামিল। এদিকে বাবার মাতুল মারা গেলেন। মা-পিসিমা আমার বোনের বিবাহের জন্য চিন্তিত হয়ে উঠলেন। কে দেখেশুনে পাত্রের খোঁজ করে? এবং টাকাকড়িরও অনটন হয়ে গেল হঠাৎ। বাবার মাতুলের মৃত্যুতে তাঁর উইল অনুযায়ী তাঁর সম্পত্তি আমরাই পেলাম। উইল প্রবেট নিতে এবং জমিদারের খারিজ ফিঃ দিতে হাতের নগদ টাকা শেষ হয়ে গেল। আসলে কর্মচারী যাঁরা, তাঁরাই আত্মসাৎ করলেন অধিকাংশ টাকা। এই অবস্থায় এক স্থানে আমার বোনের সম্বন্ধ স্থির হল। বেশ সম্পন্ন গৃহস্থ ঘর, ছেলেটি ভালো, স্বাস্থ্যবান, তখন আই. এ. পড়ছে। সেইবারই পরীক্ষা দেবে। পাত্রপক্ষ মেয়ে দেখতে এলেন কার্তিক মাসে।

এই সময়ে আমার পিসিমার সঙ্গে স্বর্গীয় যাদবলালবাবুর স্ত্রীর বেশ অন্তরঙ্গতা জন্মেছে। যাদবলালবাবুর স্ত্রীর ও অঞ্চলে ডাকনাম ছিল গিন্নীমা।

পিসিমা ডাকতেন গিন্নী।

আমার মা-ও বলতেন গিন্নী। গ্রাম সম্পর্কে আমার মা হতেন গিন্নীর মামী-শাশুড়ী। গিন্নী বলতেন বাঁকিপুরের মামী।

গিন্নীর সঙ্গে রাঘের পিছনে ফেউয়ের মতো আসত তাঁর মা-মরা নাতনী। দশ বছর বয়স, দেখে মনে হত আট বছরের মেয়ে। রংটা ফরসা, যত্নের অভাব দেহের শীর্ণতায় এবং বেশভূষায় পরিস্ফুট। দামী শাড়ি, কিন্তু সে ময়লা, নতুন অথচ ছেঁড়া। মেয়েটিকে লোকে বলত কটকটে। অর্থাৎ মুখরা।

গিন্নী প্রায়ই আমাদের বাড়িতে চোখের জল ফেলতেন মৃতা কন্যার জন্যে। প্রকাণ্ড বাড়ি শূন্য পড়ে আছে। নাবালক চারটি ছেলে এবং মেয়েটি মানুষ হচ্ছে তাঁর কাছে। বাপ আবার বিবাহ করেছেন কিন্তু প্রথমা স্ত্রীর শোকে এমনই মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়েছেন যে প্রায় অমানুষে পরিণত হয়েছেন। বাড়ি বিষয়-সম্পত্তি প্রথমা স্ত্রীর নামে বলে আলাদা বাড়ি করে বাস করছেন। এদের সম্পত্তি দেখেন মামারা। বড় ছেলে লক্ষ্মীনারায়ণ আমারই বয়সী। সে বোর্ডিং-এ থাকে। আমার শৈশবের বন্ধু। গিন্নীর বাসনা—নারাণের বিয়ে দিয়ে ওদের সংসার পাতিয়ে দিয়ে কর্তব্য শেষ করেন। মেয়েটির জন্য ভাবেন না, শৈশব থেকেই ওর বিয়ের সম্বন্ধ হয়ে রয়েছে,

গ্রামের একটি কুলীনের রূপবান ছেলে, কেশব চক্রবর্তীর সন্তান, বিষ্ণুঠাকুর বংশের পালটি ঘর। এর জন্য মায়ের উইলে ব্যবস্থা আছে—ভাইদের সঙ্গে সম-অংশে মেয়ে ভাগ পাবে। বিষয় কম নয় ; জমি, জমিদারী, কলিয়ারী ইত্যাদিতে বছরে বিশ-একুশ হাজার টাকা আয় এবং নগদ মজুত বোধ হয় দেড় লক্ষের কাছাকাছি।

ইনিই যে একদা আমার জীবনের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধবেন একথা ভূ-ভারতে কেউ মনে করে নি ; আমি তো করিই নি। আমরা স্থির জানতাম বংশীর (সেই ছেলেটির নাম) সঙ্গেই বিয়ে ওর আঠার আনা নিশ্চিত। মুখরা বলে এবং বন্ধুর ভগ্নী বলে বকেছি, দু-চার ঘা না-মেরেছি এমনও নয়। যে কার্তিক মাসের কথা বলছি সেই আশ্বিনে অর্থাৎ মাসখানেক আগের কথা বলি। পুজোর ঠিক আগেই, বোধ হয় দিন-দুই-তিন আগে অর্থাৎ যখন নারাণের মেজভাই চন্দ্রনারাণ আকস্মিক মরণাপন্ন রোগে আক্রান্ত হল। বিচিত্র রোগ। নির্ণয় হল না কি রোগ। ওদের বাড়িতে পুজোর ভিয়েন হচ্ছিল, অর্থাৎ মুড়কি, নারকেল নাড়ু প্রভৃতি তৈরি হচ্ছিল। দেশে তখন ম্যালেরিয়া ঢুকেছে। চন্দ্রনারায়ণ ম্যালেরিয়ায় ভোগে. দুর্বল শরীর, সে ঘরের মধ্যে ঢুকে খানিকটা মুড়কি নিয়ে লুকিয়ে খেতে গিয়ে হঠাৎ পড়ল মুখ গুঁজে। জ্বর নেই, কিন্তু অচেতন, শুধু একটা গোঙানি ছাড়া কোনো সাড়া নেই। কেউ বলে ধনুষ্টঙ্কার, কেউ বলে কিছু—কেউ বলে কিছু। যথাসাধ্য ডাক্তার বৈদ্যের ত্রুটি রইল না। হয়তো ভুল বললাম—আর্থিক সাধ্য বিচার করলে কলকাতা থেকে খুব বড় ডাক্তার আনার সাধ্য ছিল তাঁদের, কিন্তু সময় ছিল না। সিউড়ি থেকে ডাক্তার যখন এলেন তখন রোগীর শেষ অবস্থা ; নাড়ী ক্ষণে ক্ষণে ছেড়ে যাচ্ছে। ডাক্তার বলে গেলেন সাধ্যাতীত। রাত্রের মধ্যেই—।

এই অবস্থায় গিন্নী শিয়রে বসে কাঁদছেন। বাইরে শব সৎকারের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ চলছে। নারাণ নীরবে ম্লানমুখে বসে আছে, আমিও বসে আছি তার কাছে। হঠাৎ কি কারণে মনে নেই, বাড়ি আসবার জন্য উঠলাম। একটি গলি-পথ ধরে অল্প একটু পথ। সেই গলিতে দাঁড়িয়ে এই মেয়েটি আর একজনকে বিজ্ঞভাবে বুঝিয়ে বলছে—মেজদা আর বাঁচবে না। রাত্তির মধ্যেই মরবে।

সম্ভবতঃ তখনও মৃত্যু যে কি সে জ্ঞান মেয়েটির হয় নি। পরবর্তী জীবনে এমন মৃত্যু-ভয়াতুরা—হয়তো ভুল বলছি—, এমন উদ্বেলিত মমতাকাতরা নারী আমি খুব কমই দেখেছি। সে মমতা রবীন্দ্রনাথের 'যেতে নাহি দিব' কবিতায় পৃথিবীর মতো মমতা। আপনার জন যেখানে যে কেউ আছে এই মেয়েটি অহরহ তাদের দুহাতে আঁকড়ে ধর বসে আছেন, আর আর্তস্বরে বলছেন—'যেতে নাহি দিব'। অহরহ যেন অনুভব করছেন মৃত্যুর আকর্ষণ ক্ষণে ক্ষণে সবল থেকে সবলতর হয়ে উঠছে। থাক সে কথা।

সেদিন ওই কথা শুনে আমার রাগের আর সীমা রইল না। হৃদয়হীনা মেয়েটা অবলীলাক্রমে বলছে—রাত্তির মধ্যেই মরবে!

আমি ধমক দিয়ে উঠলাম—পাজি মেয়ে কোথাকার? ফের ওই কথা বললে মুখ ভেঙে দেব তোর। মরবে? কে বললে তোকে?

মেয়েটা মুখরা। সে সইবার পাত্রী নয়, ফোঁস করে উঠল—কই দাও দিকি মুখ ভেঙে! মুখ ভেঙে দেবে?

—বললেই মুখ ভেঙে দেব।

—বলবই তো। আমার দাদা মরবে তো তোমার কি? বেশ করবে মরবে। হাজার বার মরবে। নিশ্চয় মরবে।

সঙ্গে সঙ্গেই তার মাথায় আমি কয়েকটা চড় মেরেছিলাম। মুখ ভাঙতে পারি নি। ওটা বিধাতা আমার জন্যেই আমার হাত থেকে সেদিন বোধ হয় রক্ষা করেছিলেন। এমনি প্রহার আগেও করেছি বিবাহের পূর্বে। সব মনে নেই।

এখানে চন্দ্রনারাণের কথাটা বলে শেষ করে নিই। ওকে নিয়েই পরে ঘটনাচক্র বিস্ময়কর ভাবে প্যাক খেয়েছিল। চন্দ্রনারাণ কিন্তু সে রোগে মারা যায় নি। সে যেমন অকস্মাৎ অচেতন হয়ে পড়েছিল তেমনি অকস্মাৎ আরোগ্য লাভ করলে। সেইদিন রাত্রে প্রায় তিনটের সময় মুমূর্ষু অবস্থায় বার দুয়েক বমির আক্ষেপে খানিকটা গাঢ় শ্লেষ্মা তুলে ফেলেই অকস্মাৎ চিৎকার করে উঠল—দিদি! তার পরেই চোখ মেললে। ঘণ্টা ছয়-সাতের মধ্যেই আর কোনো রোগ রইল না।

এই ঘটনা থেকেই গিন্নী উঠেপড়ে লাগলেন—নারাণের বিয়ে তিনি দেবেনই, এই বৎসরেই দেবেন।

পাত্রীও ঠিক হয়েই ছিল। ও'দেরই আত্মীয় নারাণদের পালটি ঘর, কেশব চক্রবর্তীর সন্তান, খ্যাতনামা কর্মবীর রায় বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা। কার্তিক মাসেই আশীর্বাদ হবে।

এই সময়েই আর একটি ঘটনা ঘটেছিল যেটি আমি কোনমতেই ভুলে যাই নি। ভুলে যাই নি বলেই উল্লেখ করব। এবং আমার জীবনে এই টুকরোটুকুই একমাত্র পূর্বরাগ।

উমার, অর্থাৎ নারাণের এই বোনটির মারাত্মক ভূতের ভয়। একা উমার নয়, গিন্নীর বাড়িতে তাঁর পৌত্রীও তখন গুটি তিন-চার, সব প্রায় একবয়সী। সব কয়জনই সন্ধ্যে হলেই ভূতের ভয়ে হতচেতন হয়ে যায়। পুজোর পর কার্তিক মাস তখনও আসে নি। বাড়ির ভিতর রোয়াকে বসে আছি; গিন্নী ব্রিগেড,—এই মেয়ে কটিকে গিন্নীর চেলা কোং বলত সকলে,—এসে আমাদের বাড়িতে হুড়মুড় করে ঢুকল।

কি ব্যাপার? না সন্ধ্যে হয়েছে, বাড়ি যাবে। কিন্তু পথে যদি ভূতে ধরে, তাই রক্ষীর প্রয়োজন। একটু দাঁড়িয়ে দাও গো!

দাঁড়িয়ে দেবে আমাদের ঝি। তার হাতে কাজ রয়েছে, সন্ধ্যে জ্বালছে।

অতএব একটু অপেক্ষা করতে হবে। হঠাৎ বোধ করি উমাই আমাকে বললে—তুমি দাও না?

কে যেন, বোধ হয় আমাদের পাচিকা ঠাকরুণ বললেন—'তুমি' কি লা? কে হয় তোর? সম্বন্ধ ধরে বলতে পারিস নে?

সম্বন্ধটা একটু কৌতুকের। ষোল বছরের আমি দশ বছরের মেয়েটির গ্রাম

সম্পর্কে দাদামশাই হই। দাদা বলতে বাধে না ; কিন্তু ওর সঙ্গে মশাই যোগ করতে বাধে।

উমার মামাতো বোন বললে—ওইটুকু আবার ঠাকুরদাদা হয়?

তাদের আমি ঠাকুরদাদা।

সঙ্গে সঙ্গে সকলে খিল খিল করে হেসে উঠল। এবং এই উমা আমার পিছন-দিক থেকে পিঠে ধরে ছড়া কাটতে শুরু করে দিলে—

"ঠাকুর দাদা গালে কাদা বাগবাজারের দই,
ঠাকুর দাদার সঙ্গে দুটো মনের কথা কই।"

এরই ঠিক পনেরো-কুড়ি দিন পর। অত্যন্ত আকস্মিকভাবে আমার বিবাহের সম্বন্ধ হয়ে গেল। আমার বোনকে দেখতে এলেন রামপুরহাট অঞ্চল থেকে সেই পাত্রপক্ষ, যাঁদের কথা আগে বলেছি। ছেলেটি আই. এ. পড়ছে, মধ্যবিত্ত ঘর, ছয়-সাত ভাই, সব ভাইগুলিই উদ্যমশীল। বড়ভাই এসেছেন দেখতে। দেখা হল, কন্যা পছন্দ হল। দেনা-পাওনাও স্থির হয়ে গেল। বিবাহের দিনও স্থির হল অগ্র-হায়ণের শেষে। ভদ্রলোক বললেন—আমি তাহলে কন্যা আশীর্বাদ করে যাই। পঞ্জিকাতে দিন দেখেই তিনি প্রস্তাবটি করলেন—এমন ভালো দিন যখন পাওয়াই গেছে তখন এ কাজটি আমি সেরে যাই। আপনারা কয়েকদিন পর আদের ওখানে গিয়ে পাত্র আশীর্বাদ করবেন।

আমার মা-পিসিমা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে দেবতার চরণে প্রণতি জানাচ্ছেন। কন্যাদায় থেকে উদ্ধার পাচ্ছেন, বংশ ভালো, পাত্র ভালো, ঘর ভালো ; এর চেয়ে কাম্য আর কি হতে পারে? পুরুষ-অভিভাবকহীন সংসার, তার উপর বাবার মাতুলের উইল প্রবেট নিতে এবং ঐ সম্পত্তি দখল নিতে সংসারের সঞ্চয়ের ভাণ্ডার নিঃশেষিত-প্রায়। এ ক্ষেত্রে যখন মধ্যে মধ্যে অল্পবয়সী মৃতদার পাত্রের কথা মনে ওঠে, তখন এমন পাত্র যে কল্পনাতীত। তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলেন। যিনি বৈঠকখানা থেকে পাত্রপক্ষের প্রস্তাব বহন করে নিয়ে এসেছিলেন তিনি বোধ হয় আমাদের নায়েব। পিসিমা তাঁকে বললেন—দাঁড়াও বাবা, আগে ঠাকুরদের প্রণামী তুলে রাখি।

ঠিক এই সময় স্বর্গীয় যাদবলালবাবুর স্ত্রী গিন্নী আমাদের বাড়ি ঢুকলেন। পিসিমা হাসিমুখে বললেন—অ গিন্নি, মেয়ের বিয়ে পাকা হয়ে গেল। ওঁরা আজই আশীর্বাদ করে যাবেন।

গিন্নী বললেন—সেই শুনেই তো আসছি গো। কথা আছে তোমাদের সঙ্গে। বাঁকীপুরের মামী কই? এই যে! চল গোপনে বলব।

মা-পিসিমার বুকটা ধড়াস করে উঠল। আশীর্বাদের মুখে গোপনকথা? কী সে কথা? কালটা গণনায় বিংশ শতাব্দী হলেও পল্লীসমাজে তখন গাঁই-গোত্র-নিকষ-ভঙ্গ, পালটি ঘর, কুলের খুঁত ইত্যাদির প্রভাব চার আনা গিয়েও বার আনা বর্তমান।

ঘরের মধ্যে গিয়ে গিন্নী বললেন—আশীর্বাদটা বন্ধ রাখতে হবে বাছা।

—কেন? পাংশু হয়ে গেল মায়ের মুখ।

গিন্নী বললেন—কোনো ভয়ের কথা নয়। ভালো কথাই বটে। আমি আমার নাতি নারাণের বিয়ে দেব, মাঘ মাসেই বিয়ে দেব। ওদের সংসার পাতিয়ে না দিয়ে আমার মরণেও সুখ হবে না। আমি বাছা একটি সদ্‌বংশের সুশীলা কর্মক্ষমা মেয়ে চাই। বাঁকীপুরের মামীর মতো মায়ের মেয়ে বুড়ী (আমার বোনের ডাকনাম), আর ও যে কেমন কর্মক্ষমা সে আমি নিজের চোখে নিত্য দু-বেলা দেখছি। মনে আমার মাঝে মাঝে কথাটা ওঠে। ওই মেয়েকে যদি ঘরের বড় বউ করে সংসার পেতে দিতে পারি তবে ছোট দেওরগুলি সুখে থাকবে। বলতে পারি নি—অবিনাশের মেয়ের সঙ্গে বিয়ের কথা হয়ে রয়েছে, আর নারাণের বিয়েও এত শীগ্‌গির দেবার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু এবার চন্দ্রনারায়ণের অসুখের পর আমি মত বদলেছি। নারাণের বিয়ে আমি এবারই দেব। ঘণ্টাখানেক ছেলেটা অচেতন হয়ে মুখ গুঁজে পড়ে রইল, কেউ দেখলে না। কাল সন্ধ্যেতে শুনে গেলাম তোমাদের মেয়েকে দেখতে আসছে, সারা রাত্রি কথাটা ভেবেছি। আমি তোমাদের মেয়েটিকেই নিতে চাই। অবিনাশ আমার বোনপো। কিন্তু সে এখন বড়লোক। বড়লোকের মেয়ে আমি আনব না। আমি মনস্থির করেছি, অপেক্ষা শুধু ষষ্ঠীর মতামতের। তাকে আসতে আমি পত্র দিলাম। কাল পত্র পাবে। পরশু আসবে। তার মতও হবে। তোমরা আশীর্বাদটা হতে দিয়ো না।

মা পিসিমা আশাতীত সৌভাগ্যে স্তম্ভিত হতবাক হয়ে গেলেন।

নারাণদের বাৎসরিক আয় পঁচিশ-ত্রিশ হাজার টাকা, দেড় লক্ষাধিক নগদ টাকার মালিক। নারাণের দেহবর্ণ কাঁচা সোনার মতো। মুখশ্রী দেহসৌষ্ঠবে সে প্রিয়দর্শী। লেখাপড়াতে সে ক্লাসে ফার্স্ট হয়। এ যেন সেই গল্পের কথা, গরিবের মেয়ের ভাগ্যগুণে রাজপুত্রের বাড়ি থেকে এসে হাজির হল চতুর্দোলা।

গিন্নী আরও বললেন—দেনা-পাওনার জন্যে ভয় করো না। ওদের যা দিতে রাজী হয়েছ তাই দিয়ো নারাণকে। তাই নেব আমি।

কথা হয়েছিল সর্বসাকুল্যে দেড় হাজার টাকা। কিন্তু অনিশ্চিতের প্রত্যাশায় নিশ্চিত ধ্রুবকে ছাড়বেন কি বলে?

গিন্নী বললেন—জবাব তো দিতে বলছি না। ওঁদের বল আমাদের বংশে আশীর্বাদ আগে থেকে হতে নিষেধ আছে। আশীর্বাদ হয় বিবাহের আসরে, বিবাহে বসবার প্রাক্কালে। কথা যেমন স্থির তেমনিই রইল। যদি নারাণের সঙ্গে বিয়ে স্থির হয়ে যায় তবে তখন পত্র লিখে জবাব দেবে।

তাই ব্যবস্থা হল। কথাটা ঘুণাক্ষরে অন্য কেউ জানে না। পাত্রপক্ষও দেনা-পাওনার ফর্দ করে ফিরে গেলেন, তিনিও কোনো সন্দেহ করলেন না। এদিকে আশীর্বাদ বন্ধ করেও মা-পিসিমা নারাণের সঙ্গে বিবাহের প্রত্যাশায় আস্থা রাখতে পারলেন না। দুটি দিন ননদ এবং ভাজ বিনিদ্র হয়ে রাত্রে পরস্পরকে শুধু প্রশ্নই করে গেলেন।

—বউ!

—অ্যাঁ!

—জেগে আছ?

—রয়েছি ঠাকুরঝি।

—কি হবে বল তো?

—আমার তো মনে হয় না। কিন্তু আমি ভাবছি—

—কি?

—এখানকার পাত্রেরা যদি ভালো পাত্রী পায়? আমরা যেমন বাঁধা নেই, তেমনি তো তারাও নেই।

তৃতীয় দিন সকালে বড় ছেলেকে, আমাদেব ও অঞ্চলের বড়বাবুকে সঙ্গে নিয়ে গিন্নী এলেন আমাদের বাড়ি। বললেন—ফেলুকে সঙ্গে এনেছি। পাকা কথা দিতে এসেছি। কোষ্ঠীর মিলের অপেক্ষা শুধু। গ্রহাচার্যকেও আনতে পাঠিয়েছি। কাল সকালে যোটক বিচার হবে।

ষষ্ঠীকিঙ্করবাবু বললেন—আমি খুব খুশীমনে মত দিয়েছি বাঁকীপুরের দিদি। এ বিয়ে হলে নারাণ সুখী হবে। আমি সুখী হব।

পরেব দিন সকালে কোষ্ঠীর যোটক বিচার হল। বিচারে প্রায় রাজযোটকই হল। শুধু একটি খুঁত দেখা গেল। গ্রহাচার্য বললেন—এই পাত্রের জন্মলগ্নে গ্রহ-সংস্থানেব প্রভাবে কন্যাটিব কিন্তু স্বাস্থ্যভঙ্গ হবে, রোগে ভুগবেন।

আমার মা বললেন—ভুগুক। এত বড় ভাগ্য পেতে যদি সে রুগ্নই হয় তবে সেটুকু সে সহ্য করবে। আর আমাব মেয়ে—ওকে আমার বোগ ভোগ বোধ হয় এমনিই করতে হবে। আমি অম্লশূলের রোগী।

কথা পাকা হবার অল্প একটু বাকী রইল। অবিনাশবাবুকে জবাব দিতে হবে। নারায়ণের বিবাহ দিতে গিন্নী বদ্ধপরিকর হয়েছেন শুনে তিনি নাকি কয়েকদিন পরেই এখানে আসছেন—তাঁর কন্যার সঙ্গে যে সম্বন্ধের কথা হয়ে আছে বহুদিন থেকে, সেই কথা পাকা করবেন। নারায়ণকে আশীর্বাদ করে যাবেন।

অপরাহ্ণে আবার তাঁরা এলেন মাতাপুত্রে। আরও কয়েকটা কথা আছে।

—কি বলুন?

—নারাণের বিয়ে দেব, তার আগে বা তার সঙ্গে তার বোনের বিয়েও—

—বেশ তো। তার বিয়ের কথা তো স্থির হয়েই আছে।

—না। ওটিকে আপনাদের নিতে হবে। তারাশঙ্করের সঙ্গে ওর বিয়ে দিন।

মা-পিসীমা বিস্মিত হলেন—সে কি? আমরা তো তোমাদের পালটি ঘর নই? ঘর হিসেবে নারাণেরা বিষ্টু ঠাকুরের সন্তান, শ্রেষ্ঠ কুলীন। ওদের পালটি ঘর হল কেশব চক্রবর্তীর সন্তানেরা। আমরা রামেশ্বর চক্রবর্তীর সন্তান, কেশবের সঙ্গে একই বংশ হলেও মান্যে, প্রতিষ্ঠায়, গণনা গৌরবে ছোট ঘর। আমার কন্যা দিচ্ছি উঁচু ঘরে, তাতে বাধে না। তোমরা কন্যা নিচ্ছ তোমাদেরও বাধে না। কিন্তু কন্যা তোমরা দেবে কি করে?

—সে আমরা দেব। আমরা অনেক ভেবে ঠিক করেছি।

গিন্নী বললেন—বিয়ে দিয়ে কন্যা জামাইকে ঘরে অংশীদার করে আমি রাখব

না। তাতে ভাই-বোনে বিবাদ হবে। তা ছাড়া তোমরা আমাদের কাছে বাঁধা রইলে, আমরা তোমাদের কাছে বাঁধা রইলাম। মেয়েটি একটু কটকটে। আমার চোখের সামনে থাকবে। আর বাপু, আমার ভারী ইচ্ছে হয়েছে।

বিচিত্র ইচ্ছাটির মূলের স্বরূপ কি এবং কোথায় সে কথা গিন্নী বোধ করি নিজেও জানতেন না, ষষ্ঠীবাবুও না। নইলে যে ছেলেটির সঙ্গে বিয়ে স্থির হয়েছিল, তার সঙ্গে আমার তফাৎ কি ছিল? তুলনা করলে ছেলেটি রূপে রূপবান ছিল। আমার রূপ ছিল না।

গুণে অবশ্য প্রভেদ কিছু ছিল—আমি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিচ্ছি সে বছর, সে তখন ক্লাস-তিনেক নিচে পড়ে। বয়স দুজনেরই এক। কিন্তু এটুকু আর কতটুকু? তা ছাড়া এই দিকের বিচারটা তাঁদের অর্থাৎ গিন্নীর এবং বড়বাবুর করারই কথা নয়। তাঁরা এটাকে একটা বিশেষ বাঞ্ছনীয় গুণ বলে মনেই করেন না।

যেখানটায় তাঁদের বিচারের তফাৎ ছিল—সেটা হল পাত্রের বৈষয়িক মূল্যের তফাৎ। সে ছেলেটি কুলীন গৃহজামাতার পুত্র। কিন্তু গৃহস্বামী ছেলেটিকে তাঁর অর্ধেক সম্পত্তি উইল করে দেবেন একথা সর্বজনবিদিত। সেই অর্ধেক সম্পত্তি আমার প্রাপ্য পৈতৃক সম্পত্তির তুলনায় মূল্যে কিছু কম।

যাই হোক, কোন্ বিচার তাঁরা তখন করেছিলেন তাঁরাই জানেন, তবে ইচ্ছেটাই সমস্ত বিচারকে প্রভাবিত করেছিল নিঃসন্দেহে। এখানে এক কথায় রেহাই পাওয়া যায় প্রজাপতির নির্বন্ধ বলে। সেকালে লোকে তাই বলেছিল। লোকে অবশ্য আরও একটা কথা বলেছিল; কন্যাপক্ষের অবিভাবকদের উপর বৈষয়িক বুদ্ধির দোষারোপ করেছিল। তখন আইন হয়েছে যে, অবিবাহিতা কন্যা মায়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হবে, সেক্ষেত্রে মায়ের সম্পত্তিতে ছেলেদের অধিকার থাকবে না। এখানে মায়ের উইল ছিল, উইলে বিধান ছিল, জামাই যদি সম্পন্ন অবস্থার না হন তবে মেয়ে ভাইদের সঙ্গে সম-অংশে অংশীদার হবে; আর সম্পন্ন ঘরে বিবাহ হলে নগদ টাকা পাবে পাঁচ হাজার। তখনকার দিনে পাঁচ হাজার টাকাটা একটা মোটা অঙ্ক। সাধারণ সম্পন্ন মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ের বিবাহ হাজার থেকে দু-হাজার টাকার মধ্যেই হয়ে যেত। আড়াই হাজার হলেই সে বিয়েতে বড়লোকী ছোঁয়াচ লাগত। তিন হাজারে কথাই নেই, চার হাজারের উপরে উঠলে সে হত রাজকীয় বিবাহ। যাই হোক, লোকে বললে—সুকৌশলে কন্যাটিকে একভাগ থেকে বঞ্চিত করলেন অবিভাবকেরা। আর বললেন—অন্যত্র বিয়ে হলে আরও ভয় আছে; পাত্রপক্ষ হয়তো ভবিষ্যতে এই উইল নাকচ করবার চেষ্টা করতে পারে। এখন এমনভাবে বিনিময় করে বিয়ে হল যে, সে আশঙ্কা আর রইল না। নারায়ণের বড় মামার বৈষয়িক বুদ্ধির কুটিলতার অপবাদ আছে। ভদ্রলোক কুটিল না হোন বৈষয়িক বুদ্ধিতে জটিল, তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু একথা শপথ করেই বলব যে এ ক্ষেত্রে তাঁর বা তাঁর মায়ের এমন কোনো অভিপ্রায় ছিল না। আপন সংসারের পুত্র-কন্যাদের উপর এমন অগাধ অপরিমেয় স্নেহ সচরাচর দেখা যায় না। আমি যা বুঝেছি তাতে এই বিবাহ ব্যাপার আকস্মিক। এই ইচ্ছেটাই বড়। হঠাৎ মনে হয়েছে এই সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে দিয়ে

নিজেদের দায়িত্ব পালন সমাধা করলে কি হয়? তারপরই এসে [illegible] দিয়েছে—উৎসব, আড়ম্বর আনন্দের কল্পনা। ধনী মানুষের প্রকৃতিই ওই। ধনসম্পদের ধর্মই ওই। উৎসব আরম্ভ হলে তাকে যতখানি বড় করে প্রসারিত করা যায় তাই করলেন তাঁরা। শুধু ধনীর কথাই বা কেন, মানুষের স্বভাব হল আনন্দের সন্ধান করা।

থাক কারণ অনুসন্ধান। মোট কথা ও'রা ধরলেন—তাঁরা আমাদের মেয়ে নেবেন। বিনিময়ে তাঁদের মেয়েটিকেও আমাদের নিতে হবে। না হলে কথা এইখানেই থাক।

তখন পিসিমার মনেও ছোঁয়াচ লেগেছে। ষোল বছরের ছেলের সঙ্গে দশ বছরের মেয়ের বিয়ে দিয়ে পরিণত বয়সে পুতুল খেলার নেশা ধরেছে মনে। বললেন—কুষ্ঠী দেখানো হোক!

মা শুধু আপত্তি তুললেন। বললেন—ছেলেও ছোট, মেয়েও ছোট, বিয়ের সম্বন্ধ হয়ে থাক। বিয়ে দু-বছর পরে হবে।

সে কথা গিন্নী এবং পিসিমা নাকচ করে দিলেন।

গিন্নী বললেন—আমার নারায়ণেব বা বয়স কি? সে তো তারাশঙ্কর থেকে তিন মাসের ছোট গো।

পিসিমা বললেন—ইংরিজি ফেশান। আমার দাদার বিয়ে হয়েছিল পনেরো বছর বয়সে।

মাকে চুপ করতে হল। কারণ, না হলে ওই ঘরে কন্যার বিবাহ হয় না।

কোষ্ঠীর যোটক বিচারে বসলেন গ্রহাচার্য।

বিচারে দেখা গেল—যোটক হয় না। মেলে না কোনো রকমেই।

আবার এলেন নতুন গ্রহাচার্য। তিনি সব দেখেশুনে বললেন—মিল হয়েছে বই কি। মিল যদি না হবে তবে কন্যাপক্ষ পাত্রপক্ষ উভয় পক্ষের মনের মিল হয় কেমন করে? তা যখন হয়েছে তখন এ বিবাহে কোনো বাধা নেই। তবে—

—কি তবে?

—এই মানে, পাত্র এবং কন্যাতে ঝগড়াঝাঁটি হবে। ইনি বলবেন আমি বড়, আমার হুকুম মেনে চলতে হবে। উনি বলবেন—আমি বড়, আমার হুকুম মেনে চলতে হবে ; এই আর কি। ইনি যদি বলেন, দাও তো তেলের বাটিটা সরিয়ে, উনি বলবেন, নাও না হাত বাড়িয়ে টেনে, পারছি না। ইনি অম্বল খেতে চাইলে, উনি ঝোল খেতে চাইবেন। এই আর কি!

হাসির কলরোল উঠে গেল। এবং পাকা হয়ে গেল কথা।

গ্রামে কথাটা প্রচার হতেই অপবাদ রটে গেল আমার এবং নারাণের নামে। রটল—নানুরে চণ্ডীদাসের ভিটা দেখতে গিয়ে আমরা নিজেরাই এই বিয়ের সম্বন্ধ করে এসেছি। সেখানে শপথ করে এসেছি।

ঘটনাটি এইরূপ—

মাস কয়েক আগেই বাইসিক্ল হয়েছে। নারাণ এবং আমি একসঙ্গে বাইসিক্ল চাপা শিখেছি এবং একসঙ্গে এক কোম্পানির এক রকম বাইসিক্ল কিনেছি। ছেলে-মানুষের পা যত শক্ত হয় ততই সে বেশী হাঁটতে চায়। আমাদের বাইসিক্ল হতেই

ভ্রমণ-বাসনা উদগ্র হয়ে উঠেছিল। পুজোর ছুটিতে, চন্দ্রনারাণ সেরে ওঠার পরই নারাণ এবং আমি দুজনে পরামর্শ করে গেলাম নান্নুর চণ্ডীদাস। আমাদের গ্রাম থেকে এগারো-বারো মাইল পথ। নান্নুর দেখে এলাম, কিন্তু হলপ করে বলতে পারি পরস্পরের ভগ্নীকে বিবাহে বন্ধুত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাবার শপথ নেওয়া দূরে থাক, এমন কল্পনাও আমাদের মনে ওঠে নি।

বৃদ্ধ গ্রহাচার্য যিনি তিনিও হেসে বললেন—ও কথা আমি-মুখ দেখেই জানতে পেরেছিলাম।

বৃদ্ধ বহুদর্শী ছিলেন—ত্রিকালদর্শী না থাকুন। তিনি যে উভয়পক্ষের আগ্রহ লক্ষ্য করে তারই উপর নির্ভর করে এই বিবাহে যোটক বিচারে খুঁতগুলি উপেক্ষা করেছিলেন তার কারণ তিনি পরবর্তীকালে বলেছিলেন। বলেছিলেন—এমন ধরনের বিবাহ, যে বিবাহে কন্যা দুটি একেবারে নিরাপদ, মানে এ বাড়িতে বউ বকুনি খেলে এ বাড়ির বেটী ও বাড়িতে গঞ্জনা খাবে। ও বাড়ির বউয়ের গহনা হলে এ বাড়ির সাধ্য যদি না-ও থাকে তবে ও বাড়ির বেটী হিসাবে ও বাড়ি থেকেই এ বাড়ির বউয়ের জন্যে গয়না আসবে। এ বিবাহে যখন দু-পক্ষের এমন আগ্রহ তখন কি সামান্য ওই সব খুঁতের জন্য অমত করতে আছে? ওই রাজযোটক। ঝগড়াঝাঁটি—ও আর ক'দিন করবে বাবা? বাবা, জল আর পাথর, জলে পাথর কেটে নিজের পথ করে নেয়—পাথর দুই রেড় দিয়ে তাকে ধরে থাকে। তেমনি করেই জলে পাথরে মিলে মানিয়ে নেবে; 'দু-বছর', 'পাঁচ বছর', বড় জোর 'দশ বছর'! কত ঝগড়া করবে? শেষকালে ক্লান্ত হয়ে ক্ষান্ত দেবে।

বিয়ের দিন স্থির হল দশই-বারোই মাঘ। দশই মাঘ নারাণের বিয়ে, বারোই মাঘ আমার।

নয়

ছেলেবেলায় আমার এক সঙ্গী ছিল—আমার সম্পর্কীয়া এক ভাই-ঝি। চারু তার নাম। আমার চেয়ে বয়সে সে বড়। তার কথা 'আমার কালের কথা'য় বলেছি। চারুর এক সঙ্গিনী ছিল, তার নাম দুর্গা। 'দুগো' বলে ডাকত তাকে। যে দিকের সম্পর্কে চারু আমার ভাইঝি সেই দিকের সম্পর্কে দুর্গা ছিল আমার নাতনী। দুর্গার মা ছিলেন আমার ভাইঝি। ঠিক চারুর মতোই ভাইঝি। চারু এবং দুর্গা মাসী-বোনঝি কিন্তু সমবয়সী, পরস্পরের খেলার সঙ্গিনী। সেদিক দিয়ে ওদের সম্পর্ক ছিল—বেয়ান। দুর্গার ছেলে-পুতুলের সঙ্গে চারুর মেয়ে-পুতুলের বিয়ে হত। চারুর ছেলে-পুতুলের বিয়ে হত দুর্গার মেয়ে-পুতুলের সঙ্গে। বিয়েতে খুব ধুমধাম হত। গড়ের বাদ্যি থেকে দীয়তাং ভোজ্যতাং ভোজ। অবশ্য টিনের গড়ের বাদ্যি, আর ধুলোকাদার লুচিমণ্ডা। তা হলেও হত। আমি টিন বাজাতাম এবং খেতাম। তারপর খেলা শেষ হতেই লাগত দুই বেয়ানে ঝগড়া। ঝগড়ার কারণ অবশ্য প্রতিদিনই নতুন কিছু থাকত, কিন্তু পরিণতি হত এক। বিয়ে ভেঙে দিয়ে

যে-যার পুতুল নিয়ে বাড়ি চলে যেত। নিজের পুতুল পরের বাড়ি—হোক সে বেয়ান—প্রাণ ধরে কিছুতেই পাঠাতো না তারা। তার চেয়ে হোক বিয়ে বাতিল।

আমার বিয়ের পরই যে বিবাদটি বাধলো পাত্রপক্ষে আমার পিসিমায়ের সঙ্গে কন্যাপক্ষে উমার দিদিমার—সে বিবাদটিও আসলে ওই বিবাদ। ষোলো বছরের বর, দশ বছরের কনে। পাত্রপক্ষ যখন বলেন—বউ আমাদের ঘরে থাকবে, তখন পাত্রীপক্ষ বলেন—সে হবে না বাছা, এটা কি একটা কথা হল? ওই দশ বছরের মেয়ে, ও কি আমাকে ছেড়ে থাকতে পারে? না, আমি ওকে ছেড়ে থাকতে পারি? সে হবে না। আবার পাত্রীপক্ষ যখন কোনো উপলক্ষ দেখে জামাইকে প্রথামতো নিজেদের বাড়ি নিয়ে যেতে চান দু-চার দিনের জন্য, তখন পাত্রপক্ষ বলেন—বলো কি বাছা? এ আবার কি কথা? ষোল বছরের ছেলে শ্বশুরবাড়ি যাবে কি? দিনে নেমন্তন্ন কর, যাবে খাবে চলে আসবে। ও-সব হবে-টবে না।

ওদিকে মেয়েটি ইস্কুলে পড়ে ; গ্রামের পথ দিয়ে ইস্কুলে যায়, পথে কত শ্বশুর-ভাসুরের সঙ্গে দেখা হয়। বিয়ের পর বউ-মানুষ ইস্কুলে যাবে, এ এক সমস্যা। এ সমস্যাটা হঠাৎ একদিন একটি ঘটনায় গুরুতর হয়ে উঠল। গ্রামে এলেন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি ছেলেদের ইস্কুল, মেয়েদের ইস্কুল পরিদর্শন করলেন। তাঁর সঙ্গে গ্রামের ভদ্রলোকেরা পার্ষদের মতো সঙ্গে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আমার এক সম্পর্কিত দাদা। উমা ইস্কুলে মেয়েদের সারিতে দাঁড়িয়ে টেনে দিলে হাত-খানেক ঘোমটা। ঘটনাটা গ্রামে একটি সরস হাস্যরসাত্মক গল্প হিসেবে মুখে মুখে ফিরতে লাগল। এতে ষোল বছরের বরটি পেলে দারুণ লজ্জা। এবং নিজেকে অপমানিতও বোধ করলে। সে দিলে মাথা নাড়া। বউমানুষ ইস্কুলে পড়া আর হতেই পারে না। কখনই না।

আবহাওয়াটা ক্রমশ কালবৈশাখীর ঝড় ওঠার আগের গুমোট আবহাওয়ার মতো হয়ে উঠল। ঝড়ও এল একদিন। মাঘ মাসে বিয়ে হল, মাঝে ফাল্গুন-চৈত্র গেল বৈশাখী দুপুরের মতো ; তারপর বৈশাখের অপরাহ্ণে এল সেই ঝড়।

হঠাৎ গ্রামে আরম্ভ হল কলেরা।

রাধাদাদা হৈ-চৈ তুললেন—মহামারী! মহামারী! পালাও। পালাও। আমার মা এই সুযোগটি ধরে পিসিমাকে বললেন—আমি তা হলে ছেলে-বউ, মেয়ে-জামাই নিয়ে একবার পাটনা ঘুরে আসি। মা-বাবাকে দেখিয়ে আনি। এ কামনাটুকু তাঁর অন্তরের এবং বাংলার মেয়েদের পক্ষে স্বাভাবিক।

আমার মাতামহ এর প্রায় বছর দুয়েক আগে থেকেই শয্যাশায়ী হয়ে আছেন। মাথার শিরা ছিঁড়ে শরীরের একটা দিক পঙ্গু হয়ে গেছে। দিদিমাকে অহরহ তাঁর শিয়রে প্রয়োজন। এবং আমার মামাদের বাড়িতে তখন নানা বিশৃঙ্খলা এবং আর্থিক অবস্থাও অসচ্ছল। এই কারণেই আমাদের বিয়েতে তাঁদের কেউ-ই আসতে পারেন নি। এক্ষেত্রে ছেলে-বউ, মেয়ে-জামাই নিয়ে বাপের বাড়ি যাওয়ার সাধটা মেয়েদের একটা বড় সাধ। ভালো জামাই হয়েছে, রূপবান ছেলে, সম্পদশালী ঘরের সন্তান, লেখাপড়াতে ভালো। বউটি সুন্দরী নয়, কিন্তু অসুন্দরী বা কালো কেউ বলতে

পারবে না। ধনীর ঘরের মেয়ে, বউ এবং মেয়ের গায়ে এক-গা গয়না। সুতরাং দেখাবার অভিপ্রায়ের মধ্যে অহঙ্কার না থাক, গৌরব অনুভবের হেতু আছে। এই আশা নিয়েই ও'দের বাড়িতে আমার মা নিজেই গেলেন ; সবিনয়েই জানিয়ে এলেন অনুরোধ। ও'রা বললেন—ভেবে দেখি।

ভেবে চিন্তে উত্তর পাঠালেন—মেয়ে আমাদের ছোট। অত দূরে পাঠাতে পারব না বাপু।

মা বললেন—বেশ, বউমা এখন আপনাদের কাছে থাকুক। নারাণ এবং বুড়ীকে পাঠিয়ে দিন। এর পর বউমা অবশ্যই পাঁচবার যাবেন, যাবার সুযোগ হবে। কিন্তু নারাণ-বুড়ীর যাওয়া হয়তো ঘটবে না। ওদের নিয়ে যেতে চাই আমি।

আবার ভেবে চিন্তে উত্তর পাঠলেন—উ'হু। সে হবে না।

এবার পিসিমা গর্জে উঠলেন—তাহলে আমাদের ছেলে-বউ যাবে।

—না, তোমাদের ছেলে তোমরা নিয়ে যাও। আমাদের মেয়ে পাঠাবো না।

—তাহলে আমাদের মেয়েও পাঠিয়ে দাও। আমরা ছেলে মেয়ে নিয়ে যাব।

—উ'হু। তোমাদের ছেলের উপর জোর নেই। কিন্তু তোমাদের মেয়ে আমাদের বউ, তাকে পাঠাবো না।

ভালো-রে-ভালো! এ তো দেখি গায়ের জোরের কাণ্ডের মতো কাণ্ড! আমাদের বউ পাঠাবে না, বলবে আমাদের মেয়ে। আবার আমাদের মেয়েও পাঠাবে না, বলবে আমাদের বউ—তা হলে চলবে কেন? হয় আমাদের বউ দাও, নয় তো আমাদের মেয়ে দাও।

—উ'হু। মেয়েও পাবে না, বউও পাবে না। আমাদের মেয়ে ছোট, বড় হোক, তবে যাবে। তোমাদের মেয়ে আমাদের বউ, সেয়ানা। সে বাপের বাড়ি যাবে কি? শ্বশুরবাড়িতে থাকবে।

—একবার তার দাদামশায় দিদিমাকে দেখতে যেতেও দেবে না?

—না। বড় মেয়ে তাকে আর দাদামশায় দিদিমার আদর নিতে যেতে হয় না।

—হয় না?

—না। আমাদের মেয়েকে নিয়ে যেতে এসেছি। আমরা সপরিবারে সিউড়ি যাচ্ছি। সে আমাদের সঙ্গে যাবে।

বউ তার আগেই পালিয়েছে আমাদের খিড়কির পুকুরের কলাবাগানের আড়াল দিয়ে, ছাই-গাদা আঁস্তাকুড় মাড়িয়ে, পুকুরের জলনিকাশী নালা-পথ ধরে।

—ওর বাক্স-টাক্সগুলো দাও তবে।

এইবার বরটি উঠল ক্ষেপে।—কী? এত বড় অপমান। আমাদের একটা কথাও থাকবে না?

যিনি বউয়ের বাক্স নিতে এসেছিলেন তিনি যাদবলালবাবুর স্ত্রী গিন্নীর আশ্রিতা। মানুষটি বড় ভালো। বালবিধবা, গিন্নীর সেবাযত্ন করতেন। উমাকে খুব ভালো-বাসতেন। তিনি বললেন—কি করব? আমাকে যেমন বলেছেন—

—বেশ। তবে শুধু বউয়ের বাক্স-পেঁটরা গয়নাগাঁটিই নয়, সব—সব বিয়েতে

আমাকেও যা-কিছু দিয়েছ—তাও নিয়ে যাও! বউয়ের উপরেই যখন কোনো জোর নেই, অধিকার নেই, তখন চেন-ঘড়ি-আংটি শাল—এসব নিয়ে কি হবে? যাও, সব নিয়ে যাও।

হিড়হিড় করে টেনে বাক্স-পেঁটরা, গয়নার বাক্স, বরকে দেওয়া বাক্স-ঘড়ি-চেন-শাল-আংটি—সব বের করে দিলাম আমি।

—যাও, নিয়ে যাও। যাও!

ধূমায়মান অবস্থাটা হঠাৎ যেন জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে। ব্যাপারটা যত আকস্মিক তত রূঢ়। এ যেন বিয়ে-ফেরত হওয়ার ব্যাপার!

সকলে হতভম্ব হয়ে গেলেন। আমার পিসিমা পর্যন্ত। সকলে স্তব্ধ। হঠাৎ বাড়ির বাইরে থেকে বাড়ি ঢুকবার রাস্তা ঘরের গলিপথ বেয়ে গিন্নীর কঠিন কণ্ঠস্বর ভেসে এল—যাও গৌরদাস নিয়ে এস, সব নিয়ে এস। যাও।

গিন্নী বাইরের দরজার মুখে সন্ধ্যার অন্ধকারে এসে কখন দাঁড়িয়েছিলেন, শুনছিলেন সব কথা।

গৌরদাস নামক ভৃত্যটি এসে দাঁড়িয়ে মাথা চুলকাতে লাগল।

আমি দেখিয়ে দিলাম—এই যে!

—নিয়ে এস গৌরদাস।

আমিই তুলে দিলাম সব গৌরদাসের মাথার উপর। গৌরদাস একে একে বয়ে নিয়ে গেল। দুই বাড়ি প্রায় পাশাপাশি। দুই বাড়ির মধ্যে আছে আমাদেরই ঠাকুর-বাড়ি এবং এই ঠাকুরবাড়ির ভিতর দিয়েই ওঁদের বাড়ির সদর রাস্তায় যাওয়ার পথ। এই পথে গিন্নী এর পর থেকে নিত্যই যতবার যাওয়া-আসা করেছেন ততবারই একবার করে থমকে দাঁড়িয়ে শুনতে চেষ্টা করেছেন কি কথা হচ্ছে আমাদের বাড়িতে। এবং এই ঝগড়াঝাঁটি নিত্যই বেড়েছে। এর ফলে আমাদের বাড়িতে হাসির শব্দ শুনলে সন্দেহ করেছেন হয়তো সর্ববাদীসম্মত কোনো জবর ফন্দির হদিস এরা নিশ্চয় পেয়েছে যাতে তাঁরা জব্দ হবেন। কথান্তর শুনতে পেলে সন্দেহ করেছেন। এই নিয়েই মতভেদ হওয়ার ফলেই এই কথান্তর শুরু হয়েছে।

উপরের ঘটনা 'ধাত্রীদেবতা'য় প্রায় হুবহু দেওয়া আছে। এমন কি গৌরদাস এবং শ্রীপুরের বউ নাম দুটি পর্যন্ত।

আজকে পরিণত বয়সে পিছনের দিকে চেয়ে সমস্ত ঘটনাকেই হাস্যকর বলে মনে হচ্ছে। এবং এর স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে দুর্গা এবং চারুর পুতুল খেলার শেষের ঝগড়ার সঙ্গে কোন প্রভেদ চোখে পড়ে না। মনে হয় মানুষের শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত মনের খেলা একই খেলা; ওর আর দুই নেই। তফাতের মধ্যে যত বয়স হয় তত যুক্তিতর্করূপ ছদ্মবেশের বহর বাড়ে। আসলে ওটা ওই দুর্গা-চারুর ঝগড়া।

দশ

আমরাই সেদিন হারলাম। ওরা জোর করে মেয়ে বউ দুই-ই নিয়ে চলে গেল।

আমরাও তিন ভাই এবং মা চলে গেলাম পাটনা। পাটনায় আমার মামার বাড়ির সংসার একটি আশ্চর্য সাধনার সংসার এবং আশ্চর্য উদার সংসার। সেখানে আমার বড় মামার কঠোর শাসনে বাড়ির ছেলেদের চারিদিকে একেবারে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের গণ্ডী। ছেলেরা পড়ছেই, পড়ছেই, পড়ছেই। আর উদারতার দিকে এই বাড়িটিতে অভাব-অনটন সত্ত্বেও যে আত্মীয়, যে স্বজন এসেছেন কারুরই স্থানের অভাব হয় নি। অভাবের মধ্যে যা জুটেছে তাই সকলে মিলে সমান ভাগে ভাগ করে খেয়েছেন।

এখানে এসে সঙ্গী পেলাম আমার ন'মামাকে। আমার চেয়ে বছর দুয়েকের কি তিনেকের বড়; সোনার মতো গায়ের রং, তেমনি প্রিয়দর্শন। আই-এ পরীক্ষা দিয়েছেন। ছুটির অবসরে দু'জনের অন্তরঙ্গতা গাঢ় হয়ে উঠল। ইতিহাসে যেমন তাঁর অনুরাগ তেমনি ছিল তাঁর পড়াশুনা, জানাশুনা। পাটনার সিপাহী বিদ্রোহের আমলের ঐতিহাসিক স্থানগুলি থেকে শুরু করে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের আবিষ্কৃত সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের আমলে ভূগর্ভস্থ রাজধানীর সমস্ত কিছু তিনি দেখেছিলেন, জেনেছিলেন। সে সবগুলি আমাকে তিনি দেখাতে শুরু করলেন। এবং মুখে বলে যেতেন ইতিহাস। বড় বড় নজীর ছিল তাঁর কণ্ঠস্থ। সেই সব তিনি বলতেন আমাকে, শেখাতেন, বাড়িতে পড়তে দিতেন।

তখন সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের একশো স্তম্ভ দিয়ে গড়া সুবৃহৎ সভাকক্ষ মাটি খুঁড়ে বের করা হচ্ছে। সে এক বিস্ময়কর দৃশ্য। শত শত শ্রমিকে মাটি খুঁড়ে বের করে চলেছে অতীত কালের বাড়ি ঘর সভাগৃহ। মনে কল্পনার রথ ছুটে চলত। কত কাহিনী, কত রোমাঞ্চকর গল্পকথা মনে উঠে মিলিয়ে যেত।

সভাকক্ষের একশো স্তম্ভের যতগুলি অক্ষত ছিল, সেগুলির কতক গিয়েছিল বোম্বাইয়ের যাদুঘরে, কতক ছিল পাটনার যাদুঘরে, আর ভাঙা স্তম্ভগুলি পড়েছিল এই খোঁড়া জায়গার গর্তের মধ্যে। কি বিপুল তার পরিধি। দু'জন লোকে হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরতে পারত না। আরও বিস্ময় বোধ করেছিলাম সেদিন আর এক কারণে। এই স্তম্ভগুলি নাকি স্থাপিত হয়েছিল মজবুত কাঠের মঞ্চের উপর। সেই কাঠগুলির কিছু কিছু পাওয়া গিয়েছিল। কাঠ নয় বিশাল আয়তন শাল গাছের গুঁড়ি।

শাল্মলী বনস্পতি না বললে মন যেন ভরে ওঠে না। অবাক হয়ে দেখেছিলাম প্রথম দিন। দেখতে দেখতে কি মনে হয়েছিল। হাত দিয়েছিলাম, প্রায় দু-হাজার বছর আগেকার শালের গুঁড়ি।

কত শত বৎসর মাটির নিচে ছিল চাপা। সে পচেছে। হাতখানা ঢুকে গেল যেন সদ্য জলশূন্য কোনো দীঘির পঙ্কস্তরের মধ্যে। সে স্পর্শে দেহ শিউরে উঠেছিল। সভয়ে বের করে নিয়েছিলাম হাত। আমার হাতের দৈর্ঘ্যে তাকে পরিমাপ করাও সম্ভবপর ছিল না। তারপর একখানা বাখারী নিয়ে সেটার মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম। এবার পেলাম শক্ত অংশের সন্ধান। বাখারী দিয়েই প্রায় শিশুর মতো অথবা উন্মত্তের মতো ছাড়াতে লাগলাম পচা অংশটাকে। পচা অংশ ছাড়িয়ে ফেলতে গিয়ে জামা-কাপড় নষ্ট হয়ে গেল। মুখে লাগল তার দাগ। জিভে অনুভব করলাম তার স্বাদ। শেষে বের করলাম সেই কঠিন অংশটুকুকে। দু' হাজার দেড় হাজার

বৎসরেরও এই সার অংশটুকুকে কাল জীর্ণ করতে পারে নি। রক্তচন্দনের মতো বর্ণ সে অংশটুকুর। কোথাও পরিধিতে দু' ফুট, কোথাও তিন-চার ইঞ্চি, কোথাও বা সবটাই পচে গিয়ে পরবর্তী অংশের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে এই অংশটাকে। ওজনও তেমনি।

ন'মামা বললেন, হিমালয়ের শাল; নেপালের নিচে তরাই থেকে আনা হয়েছিল এই সব কাঠ।

হিমালয়ের পাদদেশে দু-হাজার বছর আগে বিশাল পল্লব মেলে দাঁড়িয়ে থাকত—এই শাল্মলী বনস্পতি। সূর্যকে বন্দনা করত।

সেই টুকুরোটুকু হাতে করে সেদিন বাড়ি এসেছিলাম। পথে ন'মামা এবং আমি কঙ্করবাগের নির্জনতায় স্তব্ধ হয়ে বসেছিলাম। মন সেদিন আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। কঙ্করবাগের আম গাছের তলায় তলায় তখন অন্ধকার গাঢ় হয়েছে। সন্ধ্যা নেমেছে দিগন্তে, কঙ্করবাগেও রহস্য ঘনীভূত হয়ে উঠেছে।

কঙ্করবাগ নবাবী আমলের প্রমোদ কানন। পরিত্যক্ত, নির্জন।

আমার সেজ মামা প্রথম কলেজ জীবনেই বিপ্লবী দলভুক্ত হয়েছিলেন, উত্তর ভারতের বিখ্যাত বৈপ্লবিক নেতা রাসবিহারী বসুর দলে মিশেছিলেন। স্বর্গীয় শচীন্দ্র সান্যালের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। দু'-দু'বার তিনি ঘর থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। একেবারে সকল সংস্রব ছিন্ন করে এই দলের কাজে ঝাঁপ দিয়ে পড়বার অভিপ্রায় ছিল তাঁর। কিন্তু দু'-দু'বারই তাঁর ছোট ভাই, আমার ন'মামা তাঁর উদ্দেশ্য আবিষ্কার করে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অনুসরণ করে ফিরিয়ে এনেছিলেন তাঁকে। কাশীতে সান্যালমশায়ের বাড়ি থেকেই ধরে এনেছিলেন। এর পরই তিনি প্লেগে মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর বিপ্লবী দলই মামাদের জানিয়েছিলেন যে, একটি রিভলভার তাঁদের বাড়িতে থাকার কথা। সেটি নাকি ছিল আমার মৃত মামার কাছে। তাঁরা সেটি ফেরত পাবার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। বাড়িতে কিন্তু পাওয়া যায় নি সেটি। পরে অনুসন্ধান করে তাঁর খাতাপত্রের মধ্য থেকে পাওয়া গিয়েছিল এর খোঁজ; 'কঙ্করবাগে রইল' এমনই ধারার কথা এই ন'মামাই বোধ হয় আবিষ্কার করেছিলেন। সে কথা তাঁদের বলেও দিয়েছিলেন। বিস্তীর্ণ ভেঙে-পড়া কঙ্করবাগের ভিতর থেকে তাঁরা এটি উদ্ধার করতে পারেন নি। অজ্ঞাত গুপ্তস্থানেই সেটি থেকে গিয়েছে।

সেদিন সন্ধ্যায় কঙ্করবাগে বসে ন'মামা সেই কথাটি আমার কাছে প্রকাশ করেছিলেন। এই সংবাদটি আমার মনে বিচিত্র এক রোমাঞ্চের সৃষ্টি করেছিল। ন'মামা সেদিন পাটনার নবাবী আমলের সমৃদ্ধ কঙ্করবাগের গল্পও বলেছিলেন। কাহিনীগুলি ভুলে গিয়েছি আজ, কিন্তু সুসমৃদ্ধ কঙ্করবাগের আলোকোজ্জ্বল সারেঙ্গী-নূপুর-ঝঙ্কার-মুখর রাত্রির স্বপ্ন-কল্পনা মন থেকে আজও মুছে যায় নি। সেই ষোল-সতের বৎসর বয়সে ভাঙা কঙ্করবাগেই আমার প্রথম পরিচয় ঘটেছিল নবাবী আমলের ঐশ্বর্য-বিলাসের সঙ্গে। এই ষোল বছর পর্যন্ত আমি লাভপুরের বাইরে বিশেষ কোথাও যাই নি। কয়েকবার সিউড়ি ছাড়া দশ বছর বয়সে গিয়েছিলাম বিহার

শরিফ। আমার মাতামহ বিহার শরিফে চাকরি করতেন। বিহার শরিফেও বড় আমীর মুসলমানের বাড়ি বাগান আছে—সে আমি দেখি নি। বিহার শরিফের দু'টি জায়গার স্মৃতি মনে আছে। বিহার শরিফের উত্তর দিকে খুব বড় কয়েকটি মাটির স্তূপ আছে। কেউ বলেন ওই স্তূপের তলায় আছে বৌদ্ধ বিহার, কেউ বলেন ওর তলায় পোঁতা আছে কামান বন্দুক। পাদপগুল্মহীন সেই মাটির স্তূপের দিকে বিস্ময় এবং কৌতূহলভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকতাম অপরাহ্নের পর অপরাহ্ন। নিত্য অপরাহ্নে সেদিকে যেতাম; এই দিকেই ছিল বিহার স্কুলের খেলার মাঠ। আর মনে আছে বিহারের পশ্চিম দিকে কয়েক মাইল দূরে একটি ছোট পাহাড়, সেই পাহাড়ের উপর একটি মসজিদ। মসজিদের গম্বুজের চারি দিকে ছোট ছোট খুপরিতে অসংখ্য টিয়া পাখির বাসা। আর পাহাড়টির একটি দিক আশ্চর্য রকমের খাড়া সোজা, মনে হয় কেউ যেন পাহাড়টির ওদিকের অংশটি তীক্ষ্ণধার অস্ত্র দিয়ে কেটে তুলে নিয়ে গিয়েছে। এক খাঁ-খাঁ-করা প্রান্তরের মধ্যে সেই পাহাড়টির উপর সেই মসজিদটি যেন স্বর্গ ও মর্তের মধ্যলোকে একটি সরাইখানার স্মৃতির মতো আমার মনের মধ্যে বাসা গেড়ে রয়েছে। বিহারের আর একটি কথা মনে পড়ছে। বিহারে ছিলাম আমরা তিন সঙ্গী। তিনজনের মধ্যে আমি আর দু'জন নেই। একজন আমার মাসতুতো ভাই মণি, সে আমার থেকে ছ'মাসের ছোট, আর একজন আমার পঞ্চম মাতুল বৈদেহীনাথ, আমার থেকে বছরখানেক কি বছর দেড়েকের ছোট। আমরা তিনজনে তর্ক করতাম, বাঁড়ুজ্জেরা বড় না মুখুজ্জেরা বড়, না চাটুজ্জেরা বড়? চাটুজ্জে মণির খুঁটি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, মুখুজ্জে বৈদেহীর মুখাগ্রে ছিল আশুতোষের নাম, আমার খুঁটি ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ হেমচন্দ্র। আমার মেজ মামা হাসতেন। তাঁর কাছেই তখন জেনেছিলাম ডবলিউ. সি. ব্যানার্জির নাম এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও শাণ্ডিল্য গোত্রীয়, বাঁড়ুজ্জেদের দলে পড়েন। কিন্তু এত প্রবল বল সত্ত্বেও আমার উচ্চতা খর্ব হয়ে যেত নন্দলাল বাঁড়ুজ্জের নামে। নন্দলাল বাঁড়ুজ্জে পুলিস ইন্সপেক্টর যিনি মোকামা স্টেশনে প্রফুল্ল চাকীকে ধরতে গিয়েছিলেন।

আমরা তিনজনে সেই সময়েই একটি বিপ্লবীর দল গঠন করেছিলাম। এবং প্রতিজ্ঞা করেছিলাম—কিংসফোর্ডকে আমরা মারব। কিংসফোর্ডের অপরাধ আমরা জানতাম না, তবে ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্ল চাকী যখন তাকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন তখন নিশ্চয়ই তাঁর অপরাধ ছিল অতি গুরুতর। একদিন এই নিয়ে গোপন পরামর্শ শুনে ফেলেছিলেন আমার মাতামহ নিজে। এবং খুব একচোট হেসে শেষে শাসন করেছিলেন। বলেছিলেন, কে কোথায় শুনবে। আমার সরকারি চাকরিটি তোরা খাবি।

আমাদের দলের আর একটি কর্ম ছিল চুরি। বাড়ির পাশেই ছিল একখানি ক্ষেত, পাকা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। তার মধ্যে প্রচুর শালগম এবং ফুলকপি হত। আমরা নিত্য দ্বিপ্রহরে কাঁচা শালগম এবং কপি তুলে ভক্ষণ করতাম। আর দরজা জানলা বন্ধ করে নিয়মিত ডন-বৈঠক করে শক্তি সঞ্চয় করতাম। মণি এবং মামা বৈদেহী বলতো বিহারীদের কাছে বাঙালীর দৈহিক দুর্বলতার জন্য পাতবার উপায় নেই। দুর্বল ভেতো বাঙালী। এ নিয়ে প্রতিবাদ করলেই ওরা হাত চেপে ধরে বলে, এসো,

প্রমাণ কর। একদিন সারা সকাল এই নিয়ে আমাদের উত্তপ্ত আলোচনা হল। ক্ষুদিরাম প্রফুল্ল চাকীর নজীরেও আমরা জিততে পারলাম না। বাড়ির সামনে থাকত পাগলা যাদ্দুবাবু, সেই যাদ্দুবাবু আমাদের হারিয়ে দিলেন। বললেন, আরে পিস্তৌল আউর বোম নিয়ে লড়াই তো যার খুশী করতে পারে। মেইয়া লোকেও পারে। উসমে শরীরের তাগদের পরিচয় কোথা? কিঙ্কর সিং, গোলাম, গামা, রাম মুরত—এঁদের তাগদের কথা জান। এরা চার ঘোড়ার আট ঘোড়ার গাড়ি বাঁ হাতে ধরে রুখে দেয়; বুকের উপর হাঁতী চাপায়। সাহেব লোকের স্যাণ্ডো-ওণ্ডো যত বড় বড় তাগদওলা আছে সবকোইকে কড়ে আঙুলে করে পটকে দেয়। আরে এরা যদি ইচ্ছে করে তবে আংরেজ লোককে এক কনুইয়ের গুঁতোতে ভাগিয়ে দিতে পারে। শুধু বলেই ক্ষান্ত হলেন না যাদ্দুবাবু, বাড়ির পাশ থেকে ডাকলেন এক পালোয়ানকে, তাঁর বিশাল দেহ দেখিয়ে বললেন, দেখ না এদের কাছে লাগো তোমরা? তোমাদের বাংগালী লোকের যে কোনো আদমিকে ডেকে আন। ডেকে আন তোমার মামাদের, এমন কি তোমাদের বুড়াবাবু দাদামশায়কে ডাক না। ও স্রেফ ফুঃ দিয়ে উড়িয়ে দেবে। তার প্রমাণ দেবার জন্যই বোধ করি যাদ্দুবাবু কোন ইঙ্গিত করলেন সেই পালোয়ানকে।

যাদ্দুবাবুর ইঙ্গিতে পালোয়ান বার কয়েক বাই ঠুকে জানুতে চাপড় মেরে এমন বিপুল শব্দ তুললে যে আমাদের তিনজনের কল্পনার বোমার শব্দও তার কাছে হার মেনে মাথা হেঁট করে স্বীকার করলে—নাঃ, এতখানি শব্দ আমরা ফাটলেও হবে না। হার মেনে ফিরে এসে তিনজনে পরামর্শ করলাম—শক্তি সঞ্চয় করে এ দুর্নাম মোচন করতেই হবে। উত্তেজনা সেদিন এতখানি হয়েছিল যে আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছিলাম। তখন কার্তিকের শেষ, ইস্কুল কাছারি কলেজ খুলেছে; বড় মামারা ইস্কুল কলেজে, দাদামশায় কাছারিতে, মাসিমা দিদিমা এঁরা বাড়ির ভিতরে গল্প করছেন; আমরা মুক্ত স্বাধীনের মতো বেরিয়ে পড়লাম। পুরানো শহর বেহার শরিফ, সংকীর্ণ রাস্তা, বিশেষতঃ বাজারের ভিতরটায়। দেখলাম একখানা সাইকেল চড়ে আসছে একটি নব্য বেহারী তরুণ। দেখেই আমাদের যাদ্দুবাবুর গল্প চার ঘোড়ার জুড়ি আটকানোর কথা মনে পড়ে গেল। আমি বললাম—আমি ওই সাইকেল আটকাব।

মণি এবং বৈদেহী প্রথমটা অবাক্ হয়ে গেল। বললাম—সাইকেল আটকে অভ্যেস করলে বড় হয়ে চার ঘোড়া কেন, আট ঘোড়ার জুড়িও আটকাতে পারব।

মণি বললে—কিন্তু ও যে মেজ মামার বন্ধু। আমাদের চেনে। মেজ মামাকে বলে দেবে।

আমি বললাম—আমাকে তো চেনে না। তোমরা সরে দাঁড়িয়ে থাক। বলেই আমি দাঁড়ালাম প্রস্তুত হয়ে। গাড়ি কেমন করে আটকায় কখনও দেখি নি। আটকাতে হলে সামনে দাঁড়িয়ে আটকানোর কথাই সেদিন দশ বছর বয়সের আমার মাথায় এসেছিল স্বাভাবিক ভাবে। ওদিকে সাইকেলটি কাছাকাছি এসে পড়েছে। ঘণ্টা পড়ছে। আমি খুঁট নিয়ে দাঁড়িয়ে ঠিক হ্যাণ্ডেলের নিচেই রড ধরে ফেললাম। ভদ্রলোক নিজেই বোধ হয়, বোধ হয় কেন নিশ্চয় সাবধান হয়েছিলেন, ব্রেক কষেছিলেন; নইলে আমার সেদিন পড়ে যাওয়াই ছিল গতিবেগ এবং ভারের মিলিত শক্তির অমোঘ অঙ্কফল।

ভদ্রলোক চট করে একটা পা নামিয়েও দিলেন নিচে। সেদিন আমি আমার বিস্ময়কর শক্তি সাফল্যে পুলকিত হয়ে উঠেছিলাম। আমার সে পুলক বিপুলতর হয়ে উঠল এবং অহঙ্কারে ও আত্মপ্রসাদে রূপান্তর লাভ করলে একটু পরেই। সেই বেহারী তরুণটি জিজ্ঞাসা করলেন—এমনভাবে ছুটে এসে আমার সাইকেল ধরলে কেন? পড়ে গিয়ে যে চোট লাগত।

আমি যতটুকু হিন্দীতে দখল ছিল সেই দখল মতো হিন্দী ভাষাতে কোন রকমে বুঝিয়ে দিলাম—বাঙালী দুর্বল নয়, ভীতু নয়, ভেতো নয়, এই প্রমাণ করতে আমি বাইসিক্ল রুখেছি। বড় হয়ে জুড়ি গাড়ি রুখব।

ভদ্রলোক খুব তারিফ করে বাঙালীর প্রশংসা করে হেসে চলে গেলেন। মণি এবং বৈদেহী মামা এবার অন্তরাল থেকে বেরিয়ে এল। সেদিন সন্ধ্যায় সাড়ম্বরে যাদুবাবুর কাছে সেই গল্প করলাম আমরা। যাদুবাবু অট্টহাস্য করে উঠলেন। সে অট্টহাসি আর থামে না।

এর পর ছ'বছর পর পাটনায় এলাম। বিহারের সেই স্তূপ এবং পাহাড়ের উপরের মসজিদ ছাড়া এর মধ্যে ইতিহাসের ছোঁয়াচ লাগা কোনো স্থান আমি দেখি নি। এবার দেখলাম মাটির তলায় চন্দ্রগুপ্তের রাজ-সভাকক্ষ; তার পাশে তখনও খনন-কার্য চলছে। বড় বড় ইঁটের প্রশস্ত কক্ষ সিঁড়ি বেরিয়েছে। প্রায় দু' হাজার বছর আগের শাল গাছের গুঁড়ির অংশ পেলাম আমার হাতে। কঙ্করবাগে শুনলাম ওই গল্প। আজ লিখতে বসে হিসেব করে দেখছি বিহারের এই সুরটি যেন স্পষ্ট হয়ে উঠল পাটনায়। কঙ্করবাগ যেন একটা আকর্ষণে বাঁধলে আমায়। ফাঁক পেলে একা চলে যেতাম কঙ্করবাগে। রাস্তা কম নয়, অনেকটা। কিন্তু বিহারের ভাগের এক্কার মতো সস্তা পরিবহণ ব্যবস্থার কল্যাণে পথের দূরত্ব বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে নি। আমার ন'মামা আমাকে প্রায় বেঁধে রাখতেন নিজের সঙ্গে। সকালে উঠেই বের হতাম দু'জনে। পাটনা সিটির নবাব বাড়ি, সিপাহী বিদ্রোহের ঐতিহাসিক স্থানগুলি, পাটনদেবীর মন্দির, শিখগুরু গুরুগোবিন্দ সিংহের জন্মস্থান হরমন্দির, ওদিকে গোলঘর ঘুরে বেড়াতাম দিনের-পর-দিন। তিনিই অপরাহ্নে নিয়ে যেতেন খোদাবক্স খাঁর ভারতবিখ্যাত গ্রন্থাগারে। সেখানকার প্রাচীন সংগ্রহ ছবি অস্ত্র পোশাক এক এক করে দেখিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলেন ইতিহাসের সঙ্গে। শুধু তাই নয়, কানিংহামের ভারতবর্ষের পুরাকীর্তির ইতিহাসের মধ্য থেকে একদিন বের করে দিলেন লাভপুরের নাম। অবাক্ হয়ে গেলাম। মনটা স্ফীত হয়ে উঠল। গৌরব অনুভব করলাম। লাভপুরের নাম রয়েছে? আমার লাভপুর তো সামান্য নয়। অবশ্য লেখা পড়ে বুঝলাম মল্লারপুরের সঙ্গে একটু গোলমাল হয়ে গেছে। লিখেছেন প্রাচীনকালে এখানে মল্লরাজারা রাজত্ব করতেন। টুকে নিয়ে এসেছিলাম লাভপুরের ইতিবৃত্তটুকু। এই নেশা আমাদের এমন পেয়ে বসেছিল যে এক একদিন সময়ের হিসেব ভুল হয়ে যেত। একদিন এমনি বেলার হিসেব ভুলে গিয়েছি, বেলা একটা বেজে গেছে। খেয়াল হতেই দ্রুত এসে দাঁড়ালাম চৌকে। একখানা এক্কা যাচ্ছিল তাতে সোয়ারী দু'জন।

একজন বসে রয়েছে। অপর জনটি প্রায় শুয়ে আছে। তার সর্বাঙ্গ আবৃত। সেখানাকেই থামিয়ে আমরা উঠতে চাইলাম। যে লোকটি বসেছিল গাড়োয়ান তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে। তারপর বললে—ওঠ। বৈশাখ মাস, বেলা একটা, আমরা বাড়ি ফিরতে ব্যাকুল। বাড়িতে তিরস্কারের আশঙ্কায় শঙ্কিত! উঠে বসলাম। বাঁকীপুরে আদালতের ধারে যখন নামলাম তখন চোখে পড়ল শায়িত লোকটির সর্বাঙ্গে জাত বসন্তের ঘা; ঘাগুলির মামড়ি তখনও লেগে রয়েছে। দেখে দু'জনের মুখ শুকিয়ে গেল। বাড়িতে কথাটা বলতে সাহস করলাম না; কিন্তু বাড়ি ফিরেই আবার সমস্ত জামা-কাপড়, মায় জুতো পর্যন্ত নিয়ে ছুটলাম গঙ্গার ঘাটে। একখানা কার্বলিক সাবান সর্বাঙ্গে মেখে অবশিষ্টটুকুতে কাপড় জামা গেঞ্জি কেচে নিয়ে বাড়ি ফিরলাম প্রায় আড়াইটের সময়। এর পর দিন পনেরো যে কি কঠিন উদ্বেগে কাটিয়েছিলাম সে আর বলার নয়, অন্ততঃ বলে বুঝানো যাবে না। শেষের দিনকয়েক পড়লাম একা। সঙ্গী ন'মামা কোথাও গেলেন, সম্ভবতঃ বেতিয়ায়। এ সময় গায়ে ঘামাচি বা ফুস্কুড়ি দেখলেই দিনরাত্রি সেই নিয়েই আতঙ্কিত হয়ে থাকতাম। প্রথম দিন তিনেকের পর এই দুশ্চিন্তা থেকে নিষ্কৃতি দিলে এই কঙ্করবাগ। সকালে বিকেলে সুবিধে পেলেই যেতাম কঙ্করবাগে। ঘুরে বেড়াতাম। খুঁজতাম সেজ মামার লুকিয়ে রাখা সেই পিস্তলটি। মনে হত যদি পাই তবে অস্ত্রহাতে বেরিয়ে পড়ি; দেশের শত্রু নিপাত করে ফাঁসিকাঠে ঝুলে জন্ম সার্থক করি।

পড়ি গেল কাড়াকাড়ি
আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান
তারি লাগি তাড়াতাড়ি।

সেদিন অস্ত্র হাতে করার মধ্যে প্রাণ নেওয়ার কথাটা বড় ছিল না, প্রাণ দেওয়ার কথাটাই ছিল বড়; একটি প্রাণ বলিদানে সহস্র প্রাণ জেগে উঠবে এই ছিল কামনা। নিজের মৃত্যুতে আসুক দেশমাতৃকার মুক্তি। সেদিন যেন তারই মধ্যে অমৃত প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল। হিংসা বা নরহত্যার পাপ স্পর্শ করত না; ফাঁসির আসামীর ওজন বাড়ত; মুখশ্রীতে ফুটে উঠত মুক্ত প্রাণের আনন্দদ্যুতি। সে এক দিব্য ভাব-প্রেরণা। সেই প্রেরণা তখনকার বাংলার আকাশে-বাতাসে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। সেই আকর্ষণে যেতাম কঙ্করবাগে। ঘুরতাম চারিদিকে। কিন্তু কোথায় সে অস্ত্র।

ঘুরে ক্লান্ত হয়ে বসতাম। কোনো কোনো দিন অন্ধকার হয়ে আসত। সেই অন্ধকারের মধ্যে মনে জেগে উঠত কঙ্করবাগের সমৃদ্ধকালের উৎসব রজনীর কথা। অন্ধকারের মধ্যে মনে হতো দেখতে পাব কোনো গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে কোনো তরুণ আমীর। পরণে চুস্ত পায়জামা, গায়ে আজানুলম্বিত মসলিনের আচকান, কোমরে কোমরবন্ধ, তাতে গোঁজা রয়েছে মখমলের খাপে হাতির দাঁতের বাঁটওয়ালা ছোরা, এক হাতে একটি ফুটন্ত গোলাপ, দূরে কোথাও উঠছে অলঙ্কারের মৃদু শব্দ। অনুমান করতাম আসছে অভিসারিকা, তার মূর্তি অবিকল খোদাবক্স গ্রন্থাগারে সংগৃহীত হাতির দাঁতের ফলকে আঁকা বেগমদের ছবির মতো। কত সন্ধ্যায় যে সেকালে এই কল্পনা মনে জেগে উঠেছে তার হিসেব নেই আর। শুধু এইটুকু

বলতে পারি যে উত্তরকালে সাহিত্য সাধনার সময় এই ধরনের গল্প যেগুলি লিখেছি তাতে নিশ্চয় আছে গুলজারবাগের সেই সন্ধ্যাগুলির মনের ছাপ। গুলজারবাগ আরও মনের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছিল রবীন্দ্রনাথের ক্ষুধিত পাষাণের প্রভাবে। এই সময়েই একদিন মামাদের ওখানে পড়লাম ক্ষুধিত পাষাণ।

এরই মধ্যে হঠাৎ একদা এল একখানি খামের চিঠি। আমার দশ বছর বয়সের বধূ উমার চিঠি। সে বেশ বড় চিঠি এবং ভাষার বিন্যাসে যথেষ্ট নৈপুণ্য আছে। সেকালে নববিবাহিতা বালিকাদের অভিভাবিকারা বসে পত্র লেখাতেন। যে তরুণ পত্রখানি পেত সে অবশ্যই বিশ্বাস করত যে এ পত্র তারই বধূর অন্তরের কথা। আমিও এই বিশ্বাস করেছিলাম। কিন্তু তবু সেই পত্রের উত্তর দিলাম না। আমি তখন আদর্শবাদী তরুণ। যে বধূ আমার মা পিসিমার অমর্যাদা করে তাঁদের আদেশ লঙ্ঘন করে দিদিমার বাড়ি চলে গেল তার অপরাধ সম্পর্কে আমার কোনো সংশয় ছিল না। সুতরাং তার পত্রের উত্তর দেব কি?

এরই কয়েক দিন পরেই এল পিসিমার পত্র। বাড়ি ফিরবার পরোয়ানা জারি করেছেন। এবং লিখেছেন—আমি বধূকে দীর্ঘ পত্র লিখেছি সে সংবাদ তিনি পেয়েছেন। সুতরাং ঘর সংসার সব বুঝিয়ে দিয়ে তিনি কাশী যাবেন। পত্রপাঠ সব বুঝে নেবার জন্য চলে আসা প্রয়োজন।

প্রয়োজন অনুসারে আয়োজন হল। মা কিছুতেই লঙ্ঘন করতে পারলেন না এ পত্র। আমি গুছিয়ে নিলাম আমার সামগ্রীগুলি। সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সভাকক্ষের কাঠের মঞ্চের কাঠ, প্রাসাদের ইঁট, পাথরের মূর্তিগুলি।

রওনা হলাম লাভপুর।

আজ ইঁট কাঠগুলি হারিয়ে গেছে। কোথায় গেছে জানি না। আজও সেগুলির সন্ধান করি। কঙ্করবাগ মনের মধ্যে অক্ষয় হয়ে আছে।

ফিরে এলাম পাটনা থেকে।

ওদিকে তখন আমার শ্বশুরকুলও ফিরে এসেছেন সিউড়ি থেকে। এবং এদিকে অর্থাৎ লাভপুরে আমার পিসিমা এবং উমার দিদিমার মধ্যে ঝগড়াটা এক বিচিত্র যুদ্ধপর্বে পরিণত হয়েছে। রামায়ণে আছে মেঘনাদ মেঘের আড়ালে লুকিয়ে যুদ্ধ করতেন। তাতে মাটির উপর যে প্রতিপক্ষ থাকত তারই হত মহাবিপদ। এক্ষেত্রে দুই পক্ষই পরস্পরের কাছে থাকতেন অদৃশ্য। এবং ঘর থেকে ছাড়তেন বাক্যবাণ। আশ্চর্যের কথা—কথাগুলি একেবারে এসে মর্মস্থলে বিদ্ধ হত। আরও একটা কাণ্ড ঘটত—দুই বাড়ির মধ্যস্থলে এসে গতিবেগের তীক্ষ্ণতা দ্বিগুণিত হয়ে উঠত প্রতিবেশিনীদের কাছ থেকে শক্তি লাভ করে।

পিসিমা হয় তো বললেন—কি ভুলই করেছি! কেন গ্রামে বিয়ে দিলাম। দিলাম তো নিজেদের থেকে বড়লোকের বাড়িতে দিলাম কেন? ছেলের বিয়ের তো অসময় হয় নি। কত জায়গা থেকে বিয়ের সম্বন্ধ এল। বিয়ের তো ভাবনা ছিল না।

ও বাড়িতে যখন কথাগুলি গেল—তখন কথাগুলি উলটে-পালটে বিচিত্র চেহারা নিয়ে গেল, এবং পরিশেষে আরও খানিকটা যুক্ত হয়ে গেল।—কি ভুলই করেছি। কেন মরতে গ্রামে বিয়ে দিলাম। দিলাম তো বড়লোকের বাড়িতে দিলাম কেন? বড়লোক বলে তেজ দেখাচ্ছে। কত জায়গায় কত বড়লোক পায়ে ধরে সেধে গিয়েছে। আমার ছেলের বিয়ের ভাবনা! আজই ইচ্ছে করলে আবার আমার ছেলের বিয়ে দিতে পারি। তাই আমি দেব।

উমার দিদিমা জ্বলে উঠলেন। বললেন—ওরা ছেলের বিয়ে দিতে পারে আমি পারি না আমার নারাণের বিয়ে দিতে? ওরা যেদিন বিয়ে দেবে তার আগের দিন আমি নারাণের বিয়ে দেব। আর আমাদের মেয়ে—তাকে আমরা বাড়ি করে সম্পত্তি দিয়ে রানী করে দিয়ে যাব!···

এ বাড়িতে সেই কথাগুলি এল যে চেহারা নিয়ে তাহল এই—ওরা ছেলের একটা বিয়ে দিলে আমি নারাণকে তিনটে বিয়ে দেব। আমাদের মেয়ের একটা সতীন হলে ওদের মেয়ের তিনটে সতীন হবে। আমাদের মেয়েকে বাড়ি দেব, সম্পত্তি দেব, সে রানী হয়ে থাকবে। আর ওদের বেটা তারই লোভে আমাদের মেয়ের গোলাম হয়ে গড়াগড়ি খাবে।

পিসিমাও শুনে জ্বলে উঠলেন, কিন্তু তাঁর লক্ষপতি ধনী গৃহিনীর মতো অর্থের জোর নেই এবং আরও একটা জায়গায় তিনি পৃথিবীতে বোধকরি কাঙালের কাঙাল। আমি তাঁর গর্ভের সন্তান নই। সংসারে তিনি সর্বরিক্ত; তাই জ্বলে উঠেও যে পথে গেলেন, সে পথটা একটু বিচিত্র পথ। সেই পথ ধরেই তিনি বললেন—তাই দেবেন ওঁরা। কিন্তু আমার ছেলে সে নয়, সে গোলামী করতে যাবে না। তার চেয়ে সে ভিক্ষে করবে। আর আমাদের মেয়ের জন্য ভাবি না। আমার বাবা বলতেন—কুলীন ব্রাহ্মণের ঘরের ভগ্নী উপবীতের চেয়েও বড়। উপবীত থাকে গলায়। ভগ্নীর স্থান মাথায়। শালগ্রাম শিলার মতো গলায় বেঁধে আমার ছেলে তাকে ভিক্ষে করে পুষবে।

ওদের বাড়ি খবর গেল, আমার পিসিমা বলেছেন—আমার মেয়েকে সম্পত্তি দিতে না-পারি, আমার ছেলেকে বলব গলায় দড়ি দিয়ে বোনকে গাছে ঝুলিয়ে দিয়ে নিজে বিবাগী হয়ে দেশান্তরে ভিক্ষা করে বেড়াবে।

সে সব কথা সমস্ত মনে নেই কিন্তু তার যেন আর শেষ ছিল না। আমার জীবন বিষাক্ত হয়ে উঠল। শোনা যায় আগেকার কালে পরিচ্ছদে বিষ মাখিয়ে রাজা-বাদশারা অনুগ্রহের ছলে নরহত্যা করতেন। যে হতভাগ্য সেই পোশাক গায়ে দিত সারা দেহ বিষাক্ত হয়ে উঠত। আমার জীবনটা

তখন ঠিক তাই হয়ে উঠল। নারাণের যন্ত্রণা এতখানি ছিল না। কারণ ঝগড়ার মধ্যে তার দাম্পত্য-জীবন প্রত্যক্ষভাবে জড়ানো ছিল না। সবটাই আমার ও তার বোনের জীবনের উপর ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া মাত্র। আমাকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে হলে তাকে আরও তিনবার বিবাহ করতে হবে। তার বোন পৈতৃক ধন-সম্পদে রাজা সম্পর্কহীন রানী হলে এবং আমি গোলামী না-করলে তবে তার স্ত্রীকে গলায় দড়ি দিয়ে ডালে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু আমার ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ।

যাক। এখন যা ঘটেছিল সেই ঘটনার কথা বলি। বাড়ি এসে পৌঁছুলাম। পিসিমা অভিমানে দুঃখে ক্রোধে ফেটে পড়লেন। প্রথম কথাই তিনি বললেন—বললেন আমার মা-কে। তোমার সংসার তুমি বুঝে নাও। আমাকে ছেড়ে দাও। আমি কাশী যাব। তারাশঙ্কর বউকে চিঠি দিয়েছে। আমি শুনেছি। বউকে দূরে রাখলে তার মনে কষ্ট হবে। তাকে নিয়ে এস। আমি থাকলে বউ আসবে না। আমি চলে যাব।

আমাকে অগত্যা উমার প্রথম প্রণয়লিপি বের করে তার হাতে সমর্পণ করতে হল। হস্তাক্ষর অবশ্যই উমার, কিন্তু পত্র রচনা কোন প্রাপ্ত বয়স্কার। তাতে অনুযোধ ছিল—বিবাহের পর এই প্রথম বিচ্ছেদের কালে আমি কোন পত্র লিখি নি, সেই প্রথম পত্র লিখেছে। এর চেয়ে তার মন্দভাগ্য আর কি হতে পারে! ইত্যাদি, ইত্যাদি, পত্রখানা পড়ে শোনালেন মা। পিসিমা তখনকার মতো শান্ত হলেন। ওদিকে ঝগড়া চলতে লাগল সমানে। এই ঝগড়ার মধ্যেও মাঝে মাঝে কৌতুকজনক ঘটনা ঘটত। বধূ উমা মধ্যে মধ্যে মা-পিসিমা দ্বারা সাময়িকভাবে বন্দিনী হত। আগেই বলেছি—পল্লীগ্রামের বিচিত্র ব্যবস্থায় আমাদের বাড়ির সংলগ্ন আমাদেরই ঠাকুরবাড়ির ভিতর দিয়ে উমার মাতামহদের বাড়ি থেকে সদর রাস্তায় যাবার পথ। সেই পথেই সে তার মাতামহের ঠাকুরবাড়িতে যায়, নিজের বাপের বাড়ি যায়; অর্থাৎ যে কোনো জায়গায় যেতে হোক আমাদের ঠাকুরবাড়ির ভিতর দিয়ে যেতেই হবে। এই যাতায়াতের পথে তাকে ধরে বাড়িতে এনে মধ্যে মধ্যে মা তার চুল বেঁধে দিতেন; সদুপদেশ দিতেন।

নারাণ এবং আমি অন্যান্য বন্ধুর সঙ্গে বিকেলবেলা যথা নিয়মে বেড়াতে যেতাম। নারাণ মিষ্ট প্রকৃতির মানুষ। তার চরিত্রের কোন দিকেই কোনো জোর কোনো কালেই নেই। সে কেবলই প্রশংসা করত উমার। এইভাবে আমাকে আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করত। একটা চেষ্টা তখন ও তরফ থেকে প্রকট হয়ে উঠেছে। মা-পিসিমার প্রতি আমার অনুরক্তি ক্ষুণ্ণ করে ওঁদের প্রতি আমাকে আকৃষ্ট করবার একটা চেষ্টা ওঁরা করেছিলেন। আমি

যে আমার জীবনের প্রথম প্রণয়লিপিখানি আমার মা-পিসিমার হাতে সমর্পণ করতে দ্বিধা করি নি এতে ওঁরা বেশ একটু ভীত হয়েছিলেন। এবং আমি এমনভাবে ঘোরাফেরা করি যে, ওঁদের এলাকার ত্রিসীমানার মধ্যে যাই না। এই অবস্থায় একদা একটা কৌতুককর ঘটনা ঘটল।

জ্যৈষ্ঠ মাস। গরমের ছুটিতে ইস্কুল বন্ধ। বেলা দশটা-এগারোটার সময় আমরা স্নান করতে যাই গ্রামান্তরের একটা পুকুরে। কাজল কালো জল টলোমলো দিঘি। বাইসিক্লের কেরিয়ারে কাপড় গেঞ্জি গামছা তোয়ালে বেঁধে চলে যাই। পিছনে একজন সঙ্গী থাকে। কোনো দিন থাকে, কোনো দিন থাকে না। ঘণ্টা দুয়েক জলে তোলপাড় করে বাড়ি ফিরি। এই পুকুরে যাওয়ার একটা সংক্ষিপ্ত পথ উমার মাতামহের বগোনের ভিতর দিয়ে। সুন্দর শখের বাগান। অনেক রকম দুর্লভ গাছ আছে বাগানটিতে। ভালো ভালো আমের গাছ, লিচু গোলাপজাম জামরুলের গাছ। কিছু ফুলের গাছও ছিল, একটি গাছ ছিল মুচকুন্দচাঁপার গাছ। গরমের সময় এই ফুলের গন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ত, বীরভূমের গুমোট গরমভরা স্তব্ধ রাত্রিতে গোপন মাধুর্যের মতো মনে হত। মুচকুন্দচাপা আমার বড় প্রিয় ফুল। আমি এই স্নানে যাওয়ার পথে গাছতলা থেকে ঝরাফুল দুটি চারটি নিত্যই কুড়িয়ে আনতাম।

সেদিন গাছতলায় বাইসিক্লটি রেখে ফুল কুড়াচ্ছি এমন সময় আমার ঠিক পাশের আমগাছ থেকে কেউ একজন ঝপ করে লাফিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় ওদিক থেকে একটা সাঁওতাল মেয়ে প্রায় বাঘিনীর মতো ছুটে এসে তার হাত চেপে ধরলে। মেয়েটা বাগানের আগলদারনী। এবং যে লাফিয়ে পড়ল সে আমার একজন সহপাঠী, নাম সতীশ মণ্ডল। সতীশ রামপুরহাট অঞ্চলের ছেলে, এখানে পড়ে এবং গ্রামেই এক ভদ্রলোকের শিশুপুত্রদের পড়ায়, তাঁর বাড়িতেই থাকে। গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ি যায় নি। এবং এই বাগানে সে নিয়মিত এসে আম্র ভক্ষণ করে ও পেড়ে গামছায় বেঁধে নিয়ে যায়। আগলদারনী লক্ষ্য করেছে কিন্তু ধরতে পারে নি কোনো দিন। সতীশ এমনিই চতুর। চতুর তাতে সন্দেহ নাই। আমি যে পাশের গাছতলায় ফুল কুড়াচ্ছিলাম আমিই টের পাই নি তার অস্তিত্ব। আগলদারনী তার হাত ধরেই বললে—চল, তুকে নিয়ে যাব আমি গিন্নী মায়ের কাছে।

সতীশ দুর্দান্ত ছেলে। কিন্তু গিন্নী মায়ের নাম শুনেই সে বিবর্ণ হয়ে গেল। সে জানে যে, মেয়েটার হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে গিয়েও সে নিস্তার পাবে না। বিশেষ করে গিন্নী মায়ের স্কুলের ছাত্র সে। গিন্নীমা মধ্যে মাঝে আম চুরির উৎপাতে বিরক্ত হয়ে হেড মাস্টারকে ডাকেন, বলেন—

ও মাস্টার, কেমন তোমার শাসন, কেমন তোমার ছাত্র, একটা আম পাচ্ছি না আমি। আমার আম চুরি গেলে তোমাকে ধরব কিন্তু। শাসন কর তুমি ছেলেদিগে।

আমি অবস্থা দেখে এগিয়ে গিয়ে বললাম—ওরে, ওকে ছেড়ে দে।

—কেন ছেড়ে দিব? আম জাম চুরি করে উ রোজ। আজ তু সুদ্ধ এসেছিস উর সাথে। হুঁ। তুকে সুদ্ধ নিয়ে যাব আমি। তুকে আমি চিনি। তু উমা দিদির বর বটে। বল্ তুকেও লিয়ে যাব আমি।

চমকে না উঠলেও বুকটা ধড়াস করে উঠল। এ সর্বনাশী বলে কি? আমি সতীশের সঙ্গে আম চুরি করতে এসেছি। আমাকে ধরে নিয়ে যাবে। কল্পনা চক্ষেই চকিতে ভবিষ্যতের একটা অধ্যায়ের ছবি ভেসে গেল। ধরে আমাকে নিয়ে যেতে পারবে না। আমি বাইসিক্ল চড়ে চম্পট দেব। কিন্তু ও-বাড়ি থেকে কথা আসবে আমাদের বাড়িতে, ওদের ছেলে ভালো ছেলে, আমাদের বাগানে আম চুরি করতে আসে। ছি—!

পিসিমা হয় তো মাথা কুটবেন।—ছি—ছি—ছি!

মা বিচিত্র বিষণ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাইবেন—ছি!

সতীশ বেচারা ট্যাঁক থেকে একটা দু-আনি বের করে তাকে দিতে চাইলে—এই নে। এই নে বাপু।

—না! উ তু রাখ। উ আমি লিব না। গিন্নী মা আমাকে বকছে। ভালো গাছে আম পাকে না কেনে? তুই ছোঁড়াটা পেড়ে নিয়ে যাস। গিন্নীমা বলে—তুরা খাস। তুকে নিয়ে যাব। উকে নিয়ে যাব। বুলব—এই দেখ তুদের জামাই মিতে নিয়ে যায়, চুরি করে খায়। কুথা পাব ভালো আম।

সে টানতে লাগল সতীশের হাত ধরে। সতীশের সর্বাঙ্গে পাকা আমের গন্ধ। কাপড়ে আমের রসের দাগ। মুখে লেগে আছে। হাতে আম-বাঁধা গামছার পোঁটলা। বাগানের চারি পাশেই গিন্নী মায়ের খাস তালুক; তাঁরই লোকজনে গিস্ গিস্ করছে। অন্তত আধ মাইল না গেলে সে এলাকা পার হওয়া যাবে না। বেচারা কেঁদে ফেললে।

আমি এবার আর থাকতে পারলাম না। এগিয়ে গিয়ে জোর করে ওকে ছাড়িয়ে দিলাম। বললাম—চলে যা সতীশ। তুই চলে যা। সঙ্গে সঙ্গে খুলে নিলাম বাইসিক্লের পাম্পটা। মেয়েটার নাম ছিল লুঙি। বললাম, এই দিয়ে পিটে তোর হাড় ভেঙে দেব। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক্। যা বলবি আমার নাম দিয়ে গিন্নীমাকে বলিস। আমি ছাড়িয়ে দিলাম। লুঙি দমবার মেয়ে নয়। কিন্তু এবার দমে গেল। সে গ্রামের অন্য জমিদার বাড়ির ছেলেদের খাতির করে না। সে জানে শুধু নিজের জমিদার ওই গিন্নী

মাকে। তবে আমি জামাই এই বলেই দমে গেল। নইলে পাম্পটা দেখে সে ঢেলা তুলত বা চীৎকার করে লোক জড়ো করত।

যাই হোক সতীশ ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করলে। এবং আমি বাইসিক্লটা টেনে নিয়ে চড়ে রওনা হলাম গ্রামান্তরের দিঘির দিকে। বাড়ি ফিরলাম এবং খাবার সময় কথাগুলি খুলেই বললাম মা পিসিমাকে। ভাগ্য ভালো ছিল ছাড়া আর কি বলব? বলতে গেলে বলতে হয় পিসিমার মেজাজটা ছিল ভালো। তিনি শুনে হেসে উঠলেন। বললেন, লুঙি তোকে ছেড়ে দিলে কেন? বেশ হত। মিথ্যে চোর হয়ে শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে দাঁড়াতিস। আর একদিন দাঁড়িয়েছিলি!

এগারো

পিসিমা বললেন, বেশ হত। মিথ্যে চোর হয়ে দাঁড়াতিস গিয়ে শ্বশুর বাড়িতে। আর একদিন যেমন দাঁড়িয়েছিলি।

হেসেছিলেন প্রচুর এবং সে হাসি প্রাণখোলা হাসি। কথাটা সেদিনও মনে পড়েছিল, আজও এই স্মৃতির কথা লিখবার সময় মনে পড়ছে। অনেক দিন আগে, বোধ করি এগারো-বারো বছর বয়সে একদিন গিন্নীমায়েদের চাপরাশী আমাকে পাকড়াও করেছিল চোর বলে। ফুল চোর বলে ধরেছিল। একা আমাকে নয়, আমাকে, আমার বোন, যিনি এখন গিন্নীমায়ের নাত-বউ, তাঁকে এবং আমার এক পিসতুত বোনকে—তিন জনকে পাকড়াও করেছিল।

সেদিন ছিল সাবিত্রী ব্রতের দিন। আমার পিসিমা এই ব্রত করেছিলেন। এবং ইহজন্মের এই বালবৈধব্যের বেদনায় পরজন্মে চিরয়ুষ্মতী হবার ব্যাকুল প্রত্যাশায় আকুল অন্তরের নিষ্ঠায় এই ব্রতটি পালন করতেন। তাঁর অন্তরের আকুলতা যেন প্রত্যক্ষভাবে গোটা সংসারটির উপর দীপ্ত দ্বিপ্রহরে মেঘোদয়ের মতো একটি ছায়া বিস্তার করত। অথবা গাঢ় অন্ধকার রাত্রে আকস্মিক এককলা চন্দ্রোদয়ের ফলে জ্যোৎস্নার মায়া বিস্তার করত। আয়োজনে অনুষ্ঠানে কোনো ত্রুটি হলে তাঁর আর আক্ষেপের সীমা থাকত না। চোখের জলে বুক ভেসে যেত। এই কারণেই গোটা সংসারটি সাবিত্রী ব্রতের দিন এই ব্রতানুষ্ঠানের সকল আয়োজনকে পূর্ণ থেকে পূর্ণতর করবার জন্য স্বভাবিকভাবে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠত, প্রাণ ঢেলে দিতে চাইত।

সাবিত্রী ব্রত চৌদ্দ বৎসরের ব্রত। চৌদ্দ বৎসরের ব্রতে সংখ্যায় চৌদ্দটি

করে চৌদ্দ রকম ফুল এবং চৌদ্দ রকম ফল প্রয়োজন। এছাড়া আরও অনেক আছে অবশ্য। কিন্তু আমি এবং আমার বোনেরা নিতাম চৌদ্দ রকম ফুল সংগ্রহের ভার। এর সঙ্গে যে কয়েক রকম পারি ফলও সংগ্রহ করে আনতাম। সে কালটা ছিল ধর্মবিশ্বাসে ব্রত পালন এবং নানা আচার অনুষ্ঠান পালনের কাল। গ্রামে অনেকেই ব্রত করতেন। সুতরাং এই ফুল সংগ্রহের পালাটা খুব সোজা ছিল না। ফুল সংগ্রহ করতে হলে উঠতে হত রাত্রি থাকতে। সব বাড়ি থেকেই বের হত এক একটি ছেলের দল।

পাড়াগাঁয়ে দু-চারটে সাধারণ ফুলের গাছ। যেমন—জবা, টগর, করবী কিছু নয়নতারার গাছ সব বাড়িতেই থাকত। কিন্তু যাকে বলে ফুলের বাগান, এ বড় একটা কারুর ছিল না। ছিল তিন বাড়িতে। আমার বাবার আমলে আমাদের বাড়িতে ছিল সত্যকারের একটি ভালো বাগান। বেল যুঁই, কামিনী, গোলাপ, চামেলী, মালতী, কৃষ্ণচূড়া গাছগুলি আজও আমার মনে পড়ছে। এছাড়া সাদা লাল পাতি থোপা করবী, টগর, জবা এসব তো ছিলই। আর এক রকমের গাছ প্রচুর জন্মাত তাকে বলতাম কস্তুরী। (এ গাছগুলিকে কলকাতায় এসে মরশুমি ফুলের মহলে 'হলিহক' বলে পরিচিত হতে দেখেছি)। আমাদের বাড়িতে বাবার আমলে নিত্য প্রভাতে গ্রামের সকল দেব মন্দিরের পূজারীই উপস্থিত হতেন। সে কালে এটা একটা মহাভাগ্য ছিল। গ্রামের সকল দেবপূজার্থীর পদধূলি পড়া তো কম ভাগ্যের কথা নয়। আমার "পদচিহ্ন" উপন্যাসে এই ফুলের বাগানটি থেকেই হয়েছে প্রচণ্ডতম দ্বন্দ্বের সৃষ্টি।

যে সময়ের কথা বলছি সে সময়ে কিন্তু আমাদের বাগান শ্রীভ্রষ্ট হয়ে গেছে, যত্ন করবার মানুষ নাই; তার উপর বাবার মৃত্যুর পরই আমার বাবার মাতুল এসে আমাদের সংসারের কর্তৃত্বভার নিয়েছিলেন। তিনি ফুলের বাগানের উপর খুব প্রসন্ন ছিলেন না। শুধু মা এবং পিসিমা বাবার শখের বাগানটি নষ্ট করতে দিতে চাননি বলে বড় বড় গাছগুলি বেঁচে ছিল, নইলে সেগুলিকে কেটে তিনি সেখানে ধানের মরাই বাঁধার পক্ষপাতী ছিলেন। সে আমলের বাগান থাকলে ফুলের জন্যে আমাদের বাইরে যেতে হত না।

যে দিনের কথা বলছি—সেদিন ভোরবেলা তখনও অল্প অল্প অন্ধকার আছে। উঠে সাজি হাতে তিন ভাই বোনে প্রাথমেই এসে হাজির হলাম আমাদের বাগানে। এসে দেখি বাগান শূন্য। এর আগেই কারা এসে বাগান প্রায় মুড়িয়ে ফুল তুলে নিয়ে গেছে। কান্না পেল আমাদের। কাঁদতে কাঁদতেই চীৎকার করে বকতে লাগলাম—আমাদের বাড়ির চাকর চাপরাশীকে। যে ফুলগুলি ছিল সংগ্রহ করলাম—তাতেই সাজিটা প্রায়

তিন অংশ ভর্তি হল। তারপর ছুটলাম আর দুটি বাগানের উদ্দেশ্যে। একটি আমাদের বাড়ির কাছাকাছি, অপরটি হল গিন্নী মায়ের বাগান, গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে ইস্কুল এলাকায়। বিস্তীর্ণ বাগান, পুকুর, পুকুরের চারিপাশে ফলের বাগান, এরই মধ্যে আবার একটি বাগান, নাম 'ঘেরা বাগান' অর্থাৎ চারিদিক পাকা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। এই ঘেরা বাগানের মধ্যে এককালে খুব ভালো ফুলের বাগান ছিল। কিন্তু ফলের বাগানের আওতায় ফুল বাগান তখন নষ্ট হয়েছে—কিছু কিছু ভালো গাছ বেঁচে আছে তাদের স্বাভাবিক পরমায়ুর জন্য। এখানে দু-রকমের দুর্লভ ফুল ছিল। মুচকুন্দ-চাঁপা ও গন্ধরাজ। এ ছাড়া ছিল জবা, টগর, গুলঞ্চ—এইসব সাধারণ ফুল। বাড়ির কাছে যে বাগানটি সেখানে গিয়ে দেখি সেখানেও সেই "সাত ভাই চম্পা" গল্পের বাগানের অবস্থা; ফুল যে কটি আছে সে আছে উঁচু ডালে, নিচের ডালে ফুল বলতে নাই। কারা এসে এর আগেই তুলে নিয়ে গেছে। তিন ভাইবোনে এবার ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলাম মাঠ ভেঙে। গ্রামের পশ্চিমে ইস্কুল এলাকায় গিন্নী মায়ের বাগান: এই এলাকাটি গ্রামের বসতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংলগ্ন নয়; মধ্যে আছে অনেকটা ধানক্ষেত, কয়েকটা পুকুর। মাঝখান চিরে একটি অপরিসর অপরিচ্ছন্ন সড়ক আছে, কিন্তু সে পথ ধরতে খানিকটা ঘুর হবে বলে মাঠে মাঠে ছুটে এসে উঠলাম বাগানের ধারে। চারিদিক পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। দরজায় তালাচাবি বন্ধ। পাঁচিল ডিঙিয়ে ভিতরে যেতে হবে। থমকে দাঁড়ালাম। এমন সময় আমার অজানা—পাঁচিলের একটা ভাঙা জায়গা থেকে ছুটে বেরিয়ে এল একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। হাতে সাজি; এবং আমাদের সামনে দিয়েই বোঁ-বোঁ করে ছুটে বেরিয়ে গেল। দেখলাম—আমাদেরই পাড়ার নিশাপতি এবং "ভাইঝি"। ভাইঝির নাম প্রভা। কিন্তু সে বিশ্বসংসারে "ভাইঝি" বলেই পরিচিত থেকে গেছে সারা জীবন।

ভাইঝি এবং নিশাপতি ছুটে পালাল। আমরা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। কিছু বুঝতে পারলাম না। এমন সময় লাফ দিয়ে পাঁচিল ডিঙিয়ে এক শালপ্রাংশু মহাভুজ দুপ শব্দে এপারে আমাদের সামনে পড়েই বললে—আব মিলা হ্যায়। পাকড়া গিয়া।

লোকটির নাম মহাবীর সিং। চমৎকার দেহ ছিল মহাবীরের। মহাবীর বাগানের মধ্যে ডন-বৈঠক দিচ্ছিল এবং বাগানের ফলফুল পাহারা দিচ্ছিল।

নিশাপতিরা তা বুঝতে পারেনি। গিন্নীমা নতুন বন্দোবস্ত করেছিলেন। নিশাপতিরা এবং ভাইঝি ফুল তুলছে—এমন সময় মহাবীর ওপাশ থেকে

দেখে ছুটেছে। নিশাপতি ও ভাইঝি ছুটে বেরিয়ে পড়েছে জানা ভাঙন দিয়ে। মহাবীর লম্ফ মেরে পাঁচিল ডিঙিয়ে এ পাশে পড়ে আমাদের পেয়ে ধরেছে। আব মিলা হ্যায়। চলো গিন্নীমাকে পাশ।

আমার মাথায় সেদিন রক্ত চড়ে গিয়েছিল। ক্ষুদ্র জমিদার হলেও আমার বাবার এবং তাঁর প্রভাবে আমাদের বাড়ির মর্যাদাবোধ ছিল যে-কোনো বড় জমিদার বংশের সমান। মহাবীরকে ধমক দিয়েই বলেছিলাম—হাত ধরো না আমার।

ধমক আমার ব্যর্থ হয় নি। মহাবীরকে শুনতে হয়েছিল কথা। সে এবার সুর নরম করেই বলেছিল—ফুল চুরি করেছ কেন?

অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। দেবতা পুজার জন্য ফুল তোলায় কোনো বাধা আমাদের ওখানে কখনও ছিল না। দেবতা পুজার জন্য ফুল তোলায় বাধা দেওয়া সম্পর্কে একটি গল্প আমাদের ওখানে প্রচলিত ছিল। সে আমি জানতাম। গল্পটি হল এই:

এক রাজবাড়ির বাগানে নাকি অজস্র ফুল ফুটত। বাড়িতে ছিল বিগ্রহসেবা। এই বিগ্রহের পুজার জন্য রাজা যত্ন করে বাগান করেছিলেন। সেখানে এলেন এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ। তাঁর ভিক্ষার ঝুলির মধ্যে একটি ছোট বিগ্রহ মুর্তি। রাজবাড়ির বিগ্রহ যদি হয় শক্তির, তবে ব্রাহ্মণের বিগ্রহ বিষ্ণুর। আর রাজার দেবতা যদি বিষ্ণু হন তবে ব্রাহ্মণের বিগ্রহ ছিলেন মাতৃকা দেবতার।

ব্রাহ্মণ গ্রামপ্রান্তে আশ্রয় নিয়ে একটি কুটির বাঁধলেন এই বাগান দেখে। এত ফুল। দেবতাকে তিনি প্রাণভরে ফুল দিয়ে পুজা করবেন। নিত্য ভোরে এসে এই ফুল তুলে নিয়ে যেতেন। এবং প্রাণভরে পুজা করতেন। এদিকে রাজবাড়িতে হল ফুলের অভাব। রাজবাড়ির দেবতা-পুজার ফুল নাই। রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে পাহারা বসালেন।

ব্রাহ্মণ ধরা পড়লেন।

রাজা বললেন—ব্রাহ্মণ হয়ে তুমি চুরি কর?

—চুরি? ফুল কি তোমার? যিনি ফুল ফোটান তাঁর জন্যে আমি ফুল তুলি। এর ওপর তোমার অধিকার কোথায়?

রাজা বললেন—তোমার প্রগলভতার উপযুক্ত শাস্তি দিতাম যদি তুমি ব্রাহ্মণ না হতে। তারপর রাজা তাঁর পুজক ব্রাহ্মণদের আদেশ করলেন—ফুলগুলি কেড়ে নাও। এবং ব্রাহ্মণকে এ এলাকা থেকে দূর করে দাও।

তাই হল। রাজার আদেশ প্রতিপালিত হতে দেরি হল না।

রাজা প্রসন্নমনে কার্যান্তরে মনোনিবেশ করলেন। এমন সময় দেবতার পুজক ছুটে এল—মহারাজ। আশ্চর্য ঘটনা।

পিসিমা লুঙিকে একটাকা বকশিশ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—তা ছেড়ে দিলি কেন? জামাইকে গিন্নী মায়ের কাছে ধরে নিয়ে গেলে বেশি বকশিশ পেতিস!

বাড়ির পিছনে দাঁড়িয়ে গিন্নীমা খুক খুক করে হেসেছিলেন।

ঠিক এর দিন-দুই পরেই, কি দিন-চারেক পরেই, আবার লেগে গেল তুমুল গণ্ডগোল।

আবার মাস দুয়েক পরেই একদিন এমনি একটা বিচিত্র ঘটনা উপলক্ষে দুপক্ষের মধ্যে একটি মধুর সংযোগ স্থাপিত হল এক দিনের জন্য।

আমি পড়ে গেলাম রেল রাস্তার উপর, লাইনের পাশে, লাইনের সঙ্গে সমান্তরালভাবে এবং একখানা ট্রেন চলে গেল লাইনের উপর দিয়ে, ট্রেনখানার ফুটবোর্ডটা আমার মাথার উপর দিয়ে চলে গেল। রেল লাইনের সঙ্গে আমার শরীরের তফাৎ ছিল ফুট খানেক, এক হাতের আঙুলগুলি ছিল লাইন ছুঁয়ে।

ঘটনাটির একটি দিক যেমন কৌতুকজনক অপর দিকটি তেমনি মারাত্মক না হোক রোমহর্ষক। মারা যাইনি বলেই মারাত্মক নয়। সামান্য এদিক-ওদিক হলেই কিন্তু আমার জীবনান্ত ঘটত সেদিন। এর কারণ নিছক আমার কৈশোর-চাপল্য; ষোলো বছরে যদি যুবা বলতে হয় তবে বলব সদ্য-যৌবনে-উপনীত আমার তরুণ মনের উদ্ভট খেয়াল। কিন্তু আমাদের দেশের সমাজ প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী এর হেতু আমার পিতৃকুল এবং শ্বশুরকুল নির্ণয় করলেন, কোন্দল-পরায়ণা কোনো এক বিধবার অভিশাপ। এবং আমার এই অভাবনীয় রূপে রক্ষা পাওয়ার হেতু নির্ণয় করলেন আমার পত্নীর আয়তির পুণ্য ও শক্তি। সমস্ত ঘটনাটা আমার উপর দিয়ে গেলেও আমি হয়ে গেলাম নেহাতই 'ফাউ'।

যে দিনের ঘটনা সেদিন দুপুর বেলা খাওয়া দাওয়ার পর আয়তি পুণ্যবতী আমার স্ত্রী উমা এবং আমার বোন কমলা দুই ননদভাজে আমার শ্বশুরদের ছাদে উঠেছিলেন। আলিসায় ঠেস দিয়ে গল্প করেছিলেন এবং পান চর্বণ করছিলেন। যে সময়ের কথা সে সময়ে আমার বোন পান খেতে অভ্যস্ত ছিল না। আমার মা এদিক দিয়ে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। মেয়েকে তিনি পান খেতে দিতেন না। সে অভ্যাসটা তখনও আমার বোনের বজায় ছিল। আমার স্ত্রী ছেলেবেলা থেকেই পান খেত। দেখিয়ে খেত, চুরি করে খেত, আঁচলের খুঁটে পান বেঁধে রাখত, নিজের ভবিষ্যৎ-কল্পনার বিলাসে পানের সঙ্গে জর্দা-সুঁতি-দোক্তা খাওয়া স্বপ্ন দেখত।

"ধাত্রী-দেবতা"র এক জায়গায় গৌরীর কার্যকলাপের মধ্যে দেওয়ালের ছবি

পরিষ্কার করতে গিয়ে ছবি ভেঙে পড়ার ঘটনা বর্ণার মধ্যে এর উল্লেখ আছে। গৌরী একসঙ্গে পাঁচ-ছটা পান মুখে পুরে সামলাতে পারেনি। পানের পিক গড়িয়ে কাপড়ে পড়েছে ; তাই দেখে সকলেরই প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়েছে ভাঙা কাচের ফলায় কেটে রক্তাক্ত হয়ে গেছে ছোট বধূটি। ছবির কথাটি বানানো হলেও, পান খাওয়া সম্পর্কে অতিরঞ্জন হয়নি বলেই আমার বিশ্বাস। সে যাক।

এখন ঘটনার কথাই বলি। ছাদে আলিসায় দাঁড়িয়ে গল্প করতে করতে পানের পিক ফেলতে হচ্ছিল। এত পিক গিলে শেষ করা যায় না। ফেলছিল মুখ ফিরিয়ে ছাদের উপরেই। কারণ, যে দিকের আলিসায় ভর দিয়ে তারা দুজনে দাঁড়িয়েছিল—সে দিকে এক বিধবা ভদ্র মহিলার বাড়ি। দুই বাড়ির মধ্যে হাত দুয়েক প্রশস্ত একটি গলি। এই গলিতেই ছাদের জল পড়ে। ছাদের জল ছাড়া অন্য কোনো কিছু পড়লেই এই ভদ্রমহিলা তীব্র প্রতিবাদ করেন। ভদ্রমহিলা আমাদের গ্রামে কোন্দলের জন্য বিখ্যাত। সেকালে পাড়াগাঁয়ে কোন্দল-কলহ একটি যাকে বলে 'আর্ট', তাই ছিল। এমনভাবে গুছিয়ে গুছিয়ে কবিতার মতো ছন্দোবদ্ধভাবে সর্বনাশ কামনা করা সহজ নয়। "স্বামী যাবে, পুত্র যাবে, ভাই যাবে, ভাবী যাবে, ঘর পুড়বে, দোর পড়বে, পথে দাঁড়াবে। হাত যাবে, চোখ যাবে, কাণা হবে ; ভাতের থালায় হাত দিতে মাটিতে হাত ঘষবে ; ভিক্ষের ভাতে ছাই পড়বে। নালায় খালায় পা পড়বে। যে গতরের তেজে লঘুগুরু মানে না সেই গতর চূর্ণ হবে। ছ-মাসকে ধরবে, ময়লায় মাটিতে মুখ ঘষবে, মুখে পোকা পড়বে।" এ-তো হল সাধু সংস্করণ। এর আবার ব্রাত্য সংস্করণ আছে। "ভাতারের মাথা খা-লো, বেটার মাথা খা-লো, ভাইয়ের মাথা খা-লো, ভাবী-সাবী মরুক লো।" এর নিদর্শন "হাঁসুলী বাঁকের উপকথা"য় নিখুঁতভাবে দেওয়া আছে।

হিসেব করে দেখলে এর মধ্যে ছন্দ একটা পাওয়া যাবে এবং দেখা যাবে সর্বনাশের এমনি গোলাকার গণ্ডী টানা হয়েছে চারিদিকে যে-কোনো একটি ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়বার কোনো পথ নেই। হারাধনের দশটি ছেলের ছড়ায় শেষ ছেলেটি মনের দুঃখে বনে গিয়েছিল। মরেনি তাই আবার একটি থেকে দশটি হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা জলে ভেসে গিয়েছিল, সে মরে গেল কথাটি বঙ্কিমচন্দ্র বলেন নি এই ফাঁকের বাঁকে দামোদর 'মৃন্ময়ী'কে উদ্ধার করে সুখের সংসার গড়ে দিয়েছেন। আমাদের দেশে কোন্দলদক্ষ যাঁরা তাঁদের দৃষ্টি এদিক দিয়ে একেবারে নির্ভুল। আগে স্বামীর মৃত্যুর অভিশাপ দিয়ে তবে ছেলের মৃত্যুর অভিশাপ দেন।

যাতে এক ছেলে হারিয়ে অন্য সন্তান প্রাপ্তির আশা না-থাকে। স্বামী পুত্রের পর আশ্রয়দাতা ভাই। তখন ভাইয়ের মৃত্যুর ব্যবস্থা করেন। এমনিভাবে হিসেব করলে দেখতে পাওয়া যাবে কোন দুঃখ-দুর্দশা থেকেই পরিত্রাণ নেই।

শুধু এইখানেই শেষ নয়, এই গালিগালাজগুলিকে প্রাণবন্ত করবার জন্য উচ্চারণের বিচিত্র ভঙ্গি আছে, এবং তার সঙ্গে আছে নানারূপ অঙ্গভঙ্গি। অভিনয়ের কালে অঙ্গভঙ্গি, হাত-পা নাড়া, চলা-ফেরা যেমন বক্তব্যকে প্রাণবন্ত করে তোলে ঠিক তেমনি আর কি। কখনও সামনে ঝুঁকে দুলে-দুলে, কখনও আকাশের দিকে তাকিয়ে দুই হাত উপরে তুলে, কখনও কখনও বা নেচে নেচে গালিগালাজ দেওয়ার রীতি ছিল সেকালে। আজকালকার চরমপন্থী রাজনৈতিক নেতারাও এমন গরম করে তুলতে পারেন না আসর।

এই ভদ্রমহিলা ছিলেন একজন নিপুণতমা কোন্দলপারদর্শিনী। গল্পে মত্ত হয়ে পড়ে কখন যে আমার পত্নী পচ করে একদফা পিক ওই গলির দিকে ফেলেছিল—সে তার খেয়াল ছিল না। খেয়াল হল ওই ভদ্রমহিলার তীব্র প্রতিবাদে।

—বলি, হ্যাঁ-লা! কে-লা? বলি তুই কে-লা? কোন্ গরবিনী সোহাগিনী রাজনন্দিনী লা? বলি, কোন্ গরবে এমন করে পানের পিক ফেলিস-লা?

আমার পত্নী অত্যন্ত ভীতু মানুষ কিন্তু দোষ এই যে গোড়াতেই পিছপাও হন না। প্রথম একদফা তেড়ে-ফুঁড়ে উঠতে চেষ্টা করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অর্থাৎ শতকরা নিরানব্বুইটি ক্ষেত্রেই প্রতিপক্ষের কাছে পরাজয় মেনে ঘরে ঢোকেন, কখনও কখনও ক্ষমা চান, কখনও দেবতাকে মানত মানেন। এ ক্ষেত্রেও তিনি, ওই গলিটির উপর তাঁর পৈতৃক মালিকানা স্বত্বের জোরে একবার ঝেঁকে উঠলেন—কেন? আমাদের গলিতে পানের পিক ফেলেছি—তাতে হয়েছে কি? তোমার ঘরে তো ফেলিনি।

—ফেলিস নি? পিকের ছিটে আমার ঘরের দেওয়ালে লাগেনি? দেওয়াল এঁটো হয়নি? আর হ্যাঁ-লা, হারামজাদী! তোদের গলি? তোদের একার গলি কিসের লা? আমার ঘরের ছাদের জল পড়ে ওই গলিতে, ও গলিতে আমার ভাগ নাই না-কি লা?

—আমাদেরও তো ভাগ আছে! সেই ভাগে ফেলেছি আমি বেশ করেছি! আর দেওয়াল কখনো এঁটো হয়?

—হয় না?

—হয়? এ কথা তো কোনোকালে শুনি নি!

শুনিস নি ? কি করে শুনীব ? মাছ-ভাত খাস, সিঁথিতে সিঁদুর, হাতে শাঁখার কোলে সোনার চুড়ি, পরণে নীলাম্বরী, পায়ে পায়জোর, ঝমঝমিয়ে চলিস, আচার-আচরণের বালাই নাই, ধরাকে ভাবিস সরাখানা, জানবি কি করে, শুনীব কি করে। আমি যে বিধবা-লা ? আমার মতো তুই হ তখন জানবি। তখন বুঝবি। এই তিন দিন, তিন দিন ; তিন দিনের মধ্যে তুই বুঝবি, জানবি। আমি বললাম, আমার বত্রিশখানা দাঁত, আমার জিভ নাকের ডগায় ঠেকে, আমার কথা আফলা হয় না। ফলবে, ফলবে, ফলবে। তিন দিন, তিন দিন, তিন দিন।

তারপর তুললেন আকাশের দিকে হাত।

—হে ভগবান বিচার করো। হে মা কালী, হে মা দুর্গা, হে মা ফুল্লরা। হে বাবা বুড়ো শিব, হে বাবা ধর্মরাজ, বিচার কর, সাক্ষী থাক !

এবার বালিকা দুটি সভয়ে দ্রুতপদে ছাদ থেকে নেমে এসেই ক্ষান্ত হল না। ওই বাড়ি থেকে একেবারে পালিয়ে এল মাতামহীর বাড়ি, সেখান থেকে অভিসম্পাত শুনতেও পাওয়া যায় না এবং সেখানে প্রবল ভরসা দিদিমা আছেন। কিন্তু কথাটা বলতে পারলে না। চেপে গেল।

এ দিকে বিকেলবেলা পাঁচটার পর বেড়াতে বেরিয়েছি আমি ! তিন সঙ্গী সেদিন। আমি, দ্বিজপদ এবং বৈদ্যনাথ। দ্বিজপদ আমার সাহিত্যের মধ্যে আছে, "কবি" উপন্যাসে সে বিপ্রপদ ; "আমার কালের কথা"র মধ্যেও দ্বিজপদের কথা আছে। তার সঙ্গে কোথায় ছিল আমার একটি মধুর মিষ্ট সম্পর্ক জানি না, তবে ছিল। বৈদ্যনাথ গ্রামের অন্যতম প্রধান জমিদার স্বর্গীয় হিরণ্যভূষণ-বাবুর ছেলে। বৈদ্যনাথ বেঁচে আছে। তার সঙ্গে বাল্যকালের প্রীতির সম্পর্ক আজও আছে আমার। ভারী ভালো মানুষ। বেচারা একালের বিদ্যায় পারঙ্গম নয় এই তার জীবনের খুঁত। এই খুঁতটা সে নিজেই অনুভব করে অতিরিক্ত মাত্রায়, সেই কারণে নিজেকে সে আজীবন ঘরের মধ্যেই লুকিয়ে রাখলে। আমি কিন্তু মনে করি তার মধ্যে আছে এক দুর্লভ মানুষ। যেমন তার মর্যাদাবোধ, তেমনি তার মধুর প্রকৃতি ; মানুষের কাজে-কর্মে এমন বন্ধু আর পাওয়া যায় না।

কৈশোরে সে-কালে স্কুলে পরস্পরের সঙ্গে অনেকটা পার্থক্য স্বত্ত্বেও আমরা ছিলাম ঘনিষ্ট বন্ধু। একসঙ্গে বেড়াতাম, একসঙ্গে খেলতাম। যৌবনে একসঙ্গে অভিনয় করেছি। সেদিন তিনজনে বেড়াতে বেরিয়ে মাইল দুয়েক দূর নদীর ঘাটে চলে গেছি। পথ আছে পাকা শড়ক। আমরা

কিন্তু হাঁটি রেল লাইন ধরে। ম্যাকলাউড কোম্পানির ছোট লাইন। স্টেশন থেকে একশো-কি-দেড়শো গজ সমতল ভূমির উপর রেল লাইন চলার পরেই উঁচু বাঁধের উপর দিয়ে রেল লাইন চলে গেছে নদীর ধার পর্যন্ত। "কবি" উপন্যাসে এই বাঁধের উপরের লাইনের বর্ণনা আছে। এই পথটির একটি এমন কোনো সৌন্দর্য আছে যা আমাকে চিরদিন গভীরভাবে আকর্ষণ করে। শুধু আমাকেই নয়, অধিকাংশ লোককেই করে। পাকা শড়ক ফেলে এই বাঁধের উপর দিয়েই লোকজন বেশি হাঁটে। সেদিনও এই পথ ধরে নদীর ধারে বসে অপরাহ্ণটা কাটিয়ে সন্ধ্যার মুখে উঠলাম। ধরলাম এই লাইনের পথ। তিনজনে গান গাইতে গাইতে ফিরছিলাম সে কথা আজও মনে আছে। তখন সন্ধ্যার মুখে আমাদের গাইবার একটি অত্যন্ত প্রিয় গান ছিল।

"সম্মুখে রাঙা মেঘ করে খেলা
তরণী বেয়ে চল না—হি বেলা।
আধ আধ দেখা যায় কনক ভূমি—
সেথা কি গো তরী বেয়ে যা—বে তুমি।"

গলা ছেড়েই গান গাইছিলাম তিনজনে।

হঠাৎ ট্রেনের বাঁশি বেজে উঠল।

তখন সন্ধ্যার সময় একটা ট্রেন ছিল; আমদপুর থেকে যেত কাটোয়া, লাভপুরে আসত সাড়ে-ছ-টার সময়। বুঝলাম ট্রেনটা ছাড়ল লাভপুর স্টেশন। আমরা তিনজনেই নামলাম লাইনের উপর থেকে। লাইনের উপর থেকে মানে লোহার লাইনের উপর থেকে। তখন ওই লোহার লাইনের উপর দিয়ে হাঁটা আমাদের একটা নেশা ছিল। একটি লাইনের উপর পা ফেলে চলে আসতাম সার্কাসের তারের উপর দিয়ে হাঁটার মতো। শূন্যে ঝোলানো তারের উপর হাঁটার সঙ্গে অবশ্য তুলনাই হয় না এর, তবুও এ হাঁটা খুব সোজা নয়। ছোট লাইনের সরু লাইনের উপর হাঁটা খুব সোজা নয়। যাই হোক রেল লাইন থেকে নেমে পাশের পায়ে-চলা-পথের রেখা ধরে হাঁটতে শুরু করলাম। ছোট লাইনের বাঁধ, বড় লাইনের মতো প্রশস্ত নয়, সঙ্কীর্ণ। লাইনের উপর ট্রেন যখন চলে তখন যথেষ্ট সাবধান হতে হয়। ট্রেনের বাতাস গায়ে লাগে। দরজা খোলা থাকলে কথাই নেই। অধিকাংশ লোকেই পথ ছেড়ে ঢালের গায়ে নেমে দাঁড়ায়। আমরা নেমে দাঁড়াই না। খানিকটা গ্রামীণ ব্যক্তিদের সাবধানতাকে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ করে দ্রুত ধাবমান ট্রেনের সঙ্গে মাত্র হাত দুয়েক ব্যবধান রেখে স্বচ্ছন্দে পথ হাঁটি। অনেক সময় ওই পায়ে-চলা সঙ্কীর্ণ পথটির উপর দিয়ে অনায়াসে বাইসিক্ল চড়েই চলি।

যে-সব দুঃসাহসীরা ট্রেন দেখেও সাইক্ল থেকে নামে না আমি ছিলাম তাদেরই একজন।

আমরা স্টেশনের দিকে আসছি, ট্রেন স্টেশন থেকে ছেড়েছে। স্টেশন কম্পাউণ্ডের শেষ যেখানে হয়েছে সেখানে একটা লোহার পোস্ট পোঁতা আছে, গায়ে একটা বোর্ড আঁটা আছে, তাতে লেখা আছে Shunting Limit.

আমরা হাঁটছি—সর্বাগ্রে আমি, তারপর দ্বিজপদ, তারপর বদি বা বৈদ্যনাথ। ট্রেনটার ইঞ্জিন গজ পাঁচেক দূরে, Shunting Limit গজ পঁচিশেক দূরে। হঠাৎ আমার কি খেয়াল চাপল কে জানে? হয় তো বা ট্রেনের গতি ও দূরত্ব নিয়ে যে সব অঙ্ক করতাম ইস্কুলে তার কিছু প্রভাব ছিল। পিছন ফিরে দ্বিজপদ এবং বৈদ্যনাথকে বললাম—চল ছুটব। ট্রেনটার শেষ গাড়ি অর্থাৎ গার্ড ভ্যানটা Shunting Limit পার হতে হতে আমরা Shunting Limit-এর Post-এ গিয়ে পেঁছুব।

ওরাও বললে—চল। ছোটো।

ছুটলাম।

পাশ দিয়ে বিপরীত মুখে ট্রেনখানা ছুটছে। বাতাস লাগছে সর্বাঙ্গে। কানে আসছে বিচিত্র ট্রেনের শব্দ। সড়াৎ—সড়াৎ—সড়াৎ। আমার দৃষ্টি সম্মুখের দিকে আবদ্ধ, তবুও চলন্ত ট্রেনের কামরার আলো জানলা দিয়ে আমার মুখে ছটা ফেলে চলে যাচ্ছে। আমি ছুটছি। ওই যে গার্ডের গাড়ির আলো। মনে হলো পারব না পেঁছুতে ঠিক সময়ে। গার্ডের গাড়ি আগেই শান্টিং লিমিট পার হয়ে যাবে। আমি গতিবেগ বাড়িয়ে দিলাম। কি হবে জানি না তবু খেয়াল, পেঁছতে হবে, পেঁছুলেই আমার জয়। নইলে আমার হার। সে নেশা প্রচণ্ড নেশা। আরও গতিবেগ বাড়াতে চেষ্টা করলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার পায়ে জুতোর মুখে কিসে লাগল প্রচণ্ড আঘাত, বাধা। মুহূর্তে পড়ে গেলাম। কিভাবে পড়লাম কি আঘাত পেলাম, কোথায় পড়লাম এ সবের কোনো বোধই রইল না। সে বোধ হয় আধ মিনিট কি এক মিনিট। তারপরেই কানে শব্দ এল—সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করলাম—আমার কানের পাশে চলছে লাইনের উপর ট্রেনের চাকাগুলি,—মাথার উপর চলছে লম্বা টানা ট্রেনটার ফুটবোর্ড। একখানা দুখানা তিনখানা—। তারপর আর নাই! লাইনের উপর চাকা চলার শব্দ চলে যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে—একটু দূর, আরও একটু দূর, আরও দূর, আরও দূর। আরও অনেক দূর। ক্ষীণ শব্দ শুনছি লাইন বেয়ে আসছে কাছে। হঠাৎ কানে এল মানুষের ডাক—তারাশঙ্কর! শঙ্কর।

দ্বিজপদ এবং বদি ডাকছে।

কি হয়েছিল কে জানে—অসাড় হয়েই পড়েছিলাম এতক্ষণ, এতটুকু নড়িনি। নড়লে বাঁচতাম না। মাথা তুলবার চেষ্টা করলেই ফুটবোর্ডের নিচের বোল্টের ঘায়ে খুলিটা ভেঙে চুরমার হয়ে যেত। হাত নাড়লে চাকায় টানত। একখানা হাত ও মাথাটা বিচিত্রভাবে পিছলে গিয়ে পড়েছিল লাইনের পাশের শ্লিপারের উপর। নড়িনি তাই বেঁচেছি। পথের উপর রেলওয়ের সার্ভে বিভাগ মাপের চিহ্ন একটা বাঁশের খুঁটি পুঁতেছিল—তাতেই চোট খেয়ে পড়েছি এমনভাবে। বৈদ্যনাথ এবং দ্বিজপদের ডাক শুনে সম্বিৎ ফিরল। এতক্ষণ একটা বিচিত্র অবস্থা গিয়েছে। ভয় ছিল না, বোধ ছিল না, শুধু চলন্ত ট্রেনের আভাস অনুভব করেছি শব্দ শুনেছি। এবার সম্বিৎ ফিরে পেয়ে উঠবার চেষ্টা করলাম! মনে হল সর্বাঙ্গটা মাটির সঙ্গে কাঁকরে-পাথরে গেঁথে গিয়েছে। ওরা এতক্ষণ মহাভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। চোখে দেখেছিল আমার মাথাটা ট্রেনের ফুটবোর্ডের তলায় ঢাকা। ভেবেছিল কাটা পড়েছি। অস্ফুট আর্তনাদ করে থেমে গিয়েছিল। এতক্ষণে আমাকে গোটা পেয়ে ওরা টেনে তুললে।

বাঁ দিক চেপে পড়েছিলাম। হাঁটু ও কনুইয়ের কাপড় জামার অংশ নাই, চামড়া নাই, মাংস থেঁতলে গেছে। জুতোর ডগাটা ফেটে গেছে। আমি বেঁচেছি।

ওরা বললে—ওরা গোড়াতেই বুঝতে পেরেছিল এতে বিপদ আছে। ওরা থেমে গিয়েছিল। আমাকে প্রাণপণে ডেকেছিল। ছুটো না ছুটো না, ছুটো না। কিন্তু—। তাবপর হঠাৎ।

তারপর হঠাৎ ওরা দেখলে আমাকে পড়ে গিয়ে চলন্ত ট্রেনের তলায় ঢুকে যেতে। ওরা ভুল দেখেনি। হোঁচোট খেয়ে পড়ে কিভাবে কেমন করে যে চলন্ত ট্রেনের ফুটবোর্ডের তলায় ঢুকে গিয়েছিলাম এ বিশ্লেষণ করে বুঝে ওঠা মুশকিল। বোধ করি আছাড় খেয়ে পড়েও গতিবেগে ছেঁচড়ে খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিলাম। এই অবস্থা দেখে ওরা মুহূর্তে বদ্ধবাক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ভেবেছিল ট্রেনটা চলে গেলে ছিন্নমুণ্ড অবস্থায় আমাকে দেখতে পাবে।

যাই হোক, বেঁচে গিয়েছি দেখে দুজনের যত আনন্দ, আমার শরীরের বাঁ দিকে তত যন্ত্রণা, তত জ্বালা। ওরা দুজনে আমাকে ধরে রেল কোম্পানির কুয়োর ধারে এনে সেই সমস্ত ক্ষতে জল সিঞ্চন করে জ্বালা-যন্ত্রণা দ্বিগুণিত করেই ক্ষান্ত হল না, রেল কোম্পানির ডাক্তার নরহরিবাবুর ওখানে টিঞ্চার আয়োডিন প্রয়োগ করে শতগুণিত করে তবে ছাড়লে। এবং ওদের ব্যাখ্যাতেই আমার এ এক মহা-পরিত্রাণ বলে ব্যাখ্যাত হল। বললে—এ-বাঁচা অসম্ভব বাঁচা। কি করে বাঁচল ভগবান জানেন।

তার ব্যাখ্যা করলেন গ্রামের বিজ্ঞজনেরা। সে ব্যাখ্যার কথা আগেই

বলেছি। আমার পত্নীর আয়তির শক্তি, সিঁথির পয়ে সিঁদুর হয়েছে পাকা, হাতের পয়ে বজ্রকঠিন হয়েছে শাঁখা। আর এই বিপদে পড়ার হেতু আমার বয়সের চাঞ্চল্য নয়, আমার বুদ্ধিচাপল্য নয়, হেতু হল এই বিধবা মহিলাটি বত্রিশটি দন্ত-বিশিষ্ট মুখের তীব্র রসনায় উচ্চারিত অভিশাপ।

এই সুখটি অবলম্বন করে আবার একদিন দুপক্ষ কাছাকাছি এসে পাশাপাশি দাঁড়ালেন। পূজা দিলেন দেবস্থলে, আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে সধবাদের আহ্বান করে "ঠারগুয়া" অর্থাৎ পান সুপারি দিয়ে বরণ করা হল, তাঁদের সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দেওয়া হল, তাঁরা প্রত্যেকেই আমার পত্নীর সীমন্তে সিঁদুর পরিয়ে দিলেন।

আমার স্ত্রী আজও এ অহঙ্কার ছাড়েন নি। আমার অসুখ-বিসুখ হলে তিনি জোর করেই বলেন—আমি না মরলে তো কোনো বিপদ হবে না।

উনিশশো ত্রিশ সালে জেল থেকেই চোখের অসুখ নিয়ে এসেছিলাম। ভুগেছি প্রায় বছর পাঁচেক। এর মধ্যে একজন তান্ত্রিক জ্যোতিষী এসেছিলেন আমাদের গ্রামে। তিনি আমার কোষ্ঠী বিচার করে অনেক কথা বলেছিলেন। বুদ্ধি ও যুক্তির পথে কোষ্ঠী-বিচারকে আমি মানি না। তবুও সত্যের খাতিরে বলতে হবে সে গণনার অন্তত ষাট-সত্তর ভাগ মিলে গিয়েছে। এই জ্যোতিষী আমার চোখের অসুখের কথাও বলেছিলেন। বলেছিলেন—ইনি কি এখন চোখের অসুখে ভুগছেন? এবং প্রতিকার হিসেবে কি জানি যেন কোন গ্রহের জপ করতে বলেছিলেন। আমি চিকিৎসা করিয়েছি, তিনি গ্রহের জপ করেছেন; চোখ ভালো হয়েছে। তিনি বলেন—ওই জপ, জপের জোরেই চোখ সেরেছে তোমার। আজও তিনি যে জপ করেন এবং বলেন—দেখো, চোখের অসুখে আর কখনো তুমি ভুগবে না।

এখনকার কথা থাক। তখনকার কথা বলি। ১৯১৫ সাল তখন। তখনকার দিনে এ কথা নিয়ে পরিহার করার মতো মন বড় কারও ছিল না। সেদিন ওই ব্যাখ্যাই সকলে নির্বিচারে মেনে নিয়েছিল। এর মধ্যেই পাওয়া যাবে ভাবীকালে কোন্ বিচিত্র পথে ওই বিচিত্র বিবাদের অবসান হয়েছিল।

বারো

এরপর আবার কি যেন একটা তুচ্ছ ছুতো নিয়ে ঝগড়া উঠল ঘনীভূত হয়ে। ঠিক মনে নেই। তবে এমনি ধরনের কিছু। যেমন হয় তো এই ঘটনাকে উপলক্ষ করেই আমাদের বাড়িতে বধূর অতিরিক্ত পান খাওয়ার সমালোচনা হল। এত পান খাওয়া, এই বয়সে এ কি ভালো?

ও বাড়িতে রিপোর্টারের রিপোর্ট গেল—এত পান খাওয়া? মা-গো! বয়সকালে তা হলে হবে কি? এই বেতরিবৎ শুধু দিদিমার আদরে! এ বাড়িতে এলে পান খাওয়া ঘুচিয়ে তবে ছাড়ব।

ও বাড়িতে কি কথা হল কে জানে, এ বাড়িতে টেলিপ্রিণ্টারে মুদ্রিত হয়ে এল—ঘুচিয়ে ছাড়বে। ঘোচালেই হল আর কি? দাসী-বাঁদী কি-না? এমনি নিয়েছে মেয়ে? পেটে কিল মেরে পান আদায় করবে।

এরপর আর সম্প্রীতি থাকে কি করে?

জোর করে ছাড়ালে পান খাওয়া ছাড়তে কে রাজি হয়? আর বেশী পান খেতে বারণ করলে পেটে কিল খেতেই বা রাজি কে হয়? সুতরাং ঝগড়া বেড়ে চলে।

এরই মধ্যে হয়ে গেল ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা।

মনে পড়ছে আমাদের সহপাঠী। বর্তমানে লাভপুর ইস্কুলের শিক্ষক, হেলারাম—গায়ে হলুদ, চোখে কাজল, হাতে হলুদ-মাখা সুতো নিয়ে, বিয়ের ঠিক পরদিনই গেল পরীক্ষা দিতে।

পরীক্ষা দিতে সিউড়ি গেলাম।

সেখানে দেখা হল একজন পরীক্ষার্থীর সঙ্গে, সে নাম করলে নলিনী বাগচীর। বার বার নলিনীদার দোহাই দিয়ে কথা বলছিল সে। ভালো ভালো কথা। জিজ্ঞাসা করলাম—নলিনীদা কে?

সে বললে—আমাদের ওখানকার, কাঞ্চননগর-কাপ খেলা হয় যেখানে, নির্মতিতা অঞ্চলের নাম শুনেছেন?

শুনেছি বই কি। শুধু নির্মতিতা কাঞ্চননগর নয়। নলিনী বাগচীর নামও জানি। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। তাঁকে কবিতা লিখে

দেখিয়েছিলাম। তিনি আমাকে চিঠি লিখেছিলেন। উত্তরে তাঁর কথামতো আরও কবিতা লিখে পাঠিয়েছিলাম।

হ্যাঁ। তিনি। তিনি আর বড় দেশে আসেন না। স্বদেশী করেন কি-না। দেশে পুলিস কড়া নজর রেখেছে। এলেই ধরে ফেলবে। তাঁরই কথা বলছি।

মনে পড়ে গেল তাঁকে।

পরীক্ষা দিয়ে দেশে ফিরে তাঁকে মনে করে অকারণে একদিন রামপুরহাট গিয়েছিলাম। নিতান্ত অকারণে।

এ সময়ে কিন্তু রামপুরহাট, সিউড়ি, এ সব জায়গাগুলি ছাত্রজীবনের পক্ষে খুব স্বাস্থ্যকর ছিল না। যাঁরা না-কি জীবনে মেধাবী ছাত্র, প্রতিভাবান, তাঁরা পরীক্ষার ফল ভালো করেছেন কিন্তু জীবনে যতখানি মানুষ হতে পারতেন তা হতে পারেন নি।

এই ১৯১৪।১৫।১৬ সালের মফঃস্বল শহর বিচিত্র স্থান ছিল। শিক্ষা-কেন্দ্রগুলি লেখাপড়া শিখিয়েছে, পরীক্ষায় পাস করিয়েছে। কিন্তু চরিত্রের উপর বিদ্যা ও শিক্ষার প্রভাব পড়তে পারেনি। সিগারেট তো নির্দোষ বস্তু, সিগারেটের মধ্যে চলত চরস। ভাং অর্থাৎ সিদ্ধি ছিল উপাদেয় পানীয়। ছেলেরা বলত, সিদ্ধি খেলে বুদ্ধি বাড়ে। সিদ্ধি খেয়ে বুদ্ধি বাড়ুক-না-বাড়ুক, ক্ষিধে বাড়ত। এক একটি ছেলে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশখানি রুটি খেয়ে তবে উঠত। মধ্যে মধ্যে দু-চারজন পাগল হয়ে যেত। এমন একটি ছেলের কথা আমি জানি। আমাদের থেকে এক বছর কি দু-বছরের পরের ছাত্র। বয়সে সমবয়সী। নাম বৈদ্যনাথ মণ্ডল। হুগলী নর্মাল স্কুলে খুব ভালোভাবে পাস করে এসে ইংরেজি পড়তে ভর্তি হল। বৈদ্যনাথ ছিল প্রতিভাবান ছাত্র। অঙ্কে-সংস্কৃতে-বাংলায়-ইতিহাসে ইস্কুলের শিক্ষকদের সমকক্ষ। ইংরেজিতেও অল্পদিনে সে পাকা হয়ে উঠল। শিক্ষকেরা আশা করলেন, বৈদ্যনাথ ম্যাট্রিকে খুব উচ্চস্থান অধিকার করবে। অন্যায় আশা তাঁরা করেননি। বৈদ্যনাথ ফার্স্ট ক্লাশে উঠে হঠাৎ একদিন সিদ্ধি খেয়ে পাগল হয়ে গেল। ফার্স্ট ক্লাশের ছাত্রেরা তখন দল বেঁধে সিদ্ধি ঘুঁটে খায়। খায় কিন্তু অভিযোগ করে, খেয়ে কিছু হয় না। বুদ্ধি আশানুরূপ বাড়ে না। একদিন এই অভিযোগে বিরক্ত হয়ে তাদের নেতা বৈদ্যনাথ মুখুজ্জে কি অনুপান সহযোগে সিদ্ধি ঘুঁটলে কে জানে, সেই সিদ্ধি খেয়ে বৈদ্যনাথ মণ্ডল প্রথম হাসতে শুরু করলে, তারপর বক্তৃতা শুরু করলে, সেই বক্তৃতায় আকৃষ্ট হয়ে গোটা বোর্ডিংয়ের ঘুম ভাঙল, হেডমাস্টার এলেন, বৈদ্যনাথ তাঁকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে বললে—

—**Twinkle, twinkle, little star.**

—নীল উজ্জ্বল তারাটি!

—মাস্টারমশাই, ওই যে তারাটি দেখছেন, ওটি কি বলছে জানেন? কিছুক্ষণ মুখে আঙুল দিয়ে ভেবে-চিন্তে বললে—কি বলছে বুঝতে পারছি না, কিন্তু কিছু বলছে।

বৈদ্যনাথ পাগল হয়ে গেল। দড়ি বেঁধে তাকে বাড়ি পাঠানো হল। সে বৎসর সে পরীক্ষা দিতে পারলে না। দীর্ঘদিন পরে সুস্থ হয়ে আবার ফিরল বৈদ্যনাথ, কিন্তু তার সে প্রতিভা তখন নষ্ট হয়ে গেছে। পরীক্ষায় ফার্স্ট ডিভিসনে পাস করে সে লাভপুরেই শিক্ষকতা করছে। আজও আছে। এমন উচ্চস্তরের শিক্ষক দুর্লভ কিন্তু আজও তার পূর্ব মস্তিষ্ক সে ফিরে পায় নি। আজও সে মধ্যে মধ্যে অকারণে হাসে।

সে সময়ে এমনিভাবে বহু প্রতিভা নষ্ট হয়েছে। এরপর আমি দেখেছি লাভপুরে ছাত্রজীবনের আরও অধঃপতন। মদ্যপান করতে দেখেছি। সে-ও এসেছিল শহর থেকে। লাভপুরও তখন শহর না হয়েও শহরের বাড়া। লাভপুরের সংস্কৃতিগৌরব নাকি বীরভূমের সকল স্থানের গৌরবকে ম্লান করে দিয়েছে।

যাক। রামপুরহাটে তখন এমনি একটি সংস্কৃতিবানের দল ছিল। লাভপুরের ছাত্রদের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। দীর্ঘ দীর্ঘ পত্র, তার মধ্যে হৃদয় বিগলিত করা খণ্ডকাব্য, উচ্চস্তরের লিরিক; এই ধরনের পত্রের আদান-প্রদান চলত নিয়মিত। সুতরাং রামপুরহাট যাওয়ার মধ্যে নলিনী বাগচীকে খুঁজতে যাওয়ার সন্দেহে সন্দেহভাজন হওয়ার সম্ভাবনা আদৌ ছিল না। দুকড়িবালাও তখন জেলে। কিন্তু আমার আকুলতা যতই থাক নলিনী বাগচীকে কোথায় পাব? রামপুরহাটে কেউ তার সন্ধানই জানত না। সেই ছেলেটির বাড়ি পর্যন্ত যেতে হল। নলহাটি-আজিমগঞ্জ লাইন ধরে আজিমগঞ্জ গেলাম। আজিমগঞ্জেরই একটা ঠিকানা সে আমাকে দিয়েছিল। কিন্তু সেখানে তাকে পেলাম না। অগত্যা আজিমগঞ্জে শেঠদের বাগান দেখে গঙ্গাস্নান করে ফিরে এলাম।

কবিতা লিখেছিলাম গঙ্গার ঘাটে বসে।

বাড়ি ফিরলাম। এর ঠিক দু-দিন কি চার দিন পরেই শুনলাম বাঙালী পল্টন তৈরি হচ্ছে। বাঙালী পল্টন যুদ্ধে যাবে। সেই বাঙালী পল্টনের জন্য লাভপুরে মিটিং হবে। ম্যাজিস্ট্রেট আসছেন, পুলিস সাহেব আসছেন, তার সঙ্গে আসছেন কুলদাপ্রসাদ ভাগবতরত্ন।

তিনি মিটিং-এ বক্তৃতা দিলেন। সে কি বক্তৃতা! দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'মানুষ আমরা নহি তো মেষ' এই লাইন দিয়ে শুরু করলেন। আজও মনে হয় এমন বক্তৃতা আর জীবনে শুনিনি।

বক্তৃতা শেষ হল, আমি উঠে দাঁড়ালাম। আমি যেতে চাই যুদ্ধে।

আমি যুদ্ধে যেতে চাই বলে উঠে দাঁড়াবার পরই আরও দু-তিন জন উঠে দাঁড়াল। হাততালি পড়ল।) আমাদের ডেকে নিয়ে গিয়ে আলাদা বসানো হল। তারপর সভার শেষে নির্মলশিববাবুদের গেস্ট হাউসে মাথা থেকে পা পর্যন্ত মাপ নেওয়া হল। হল অনেক কিছু। এমন সময় কে এসে যেন নির্মলশিববাবুকে ডেকে নিয়ে গেল। তারপরই আমাকে।

বেশি দূর না। রশি দুয়েক দূরেই রথতলা। ওই রথতলাতেই ইস্কুলডাঙা থেকে আমাদের পাড়ার সোজা রাস্তা। গিয়ে দেখি রথতলাতে দাঁড়িয়ে দুই ব্যাঘ্রী, যে ব্যাঘ্রী দু-জন বছর দুয়েক ধরে প্রচণ্ড বিক্রমে হুঙ্কার-যুদ্ধ করেছেন তাঁরা আজ একযোগে এসে দাঁড়িয়েছেন এবং হুঙ্কার ছাড়ছেন। শান্তস্বভাব নির্মলশিববাবুকেই তখন সহ্য করতে হচ্ছে সে হুঙ্কার।

—ছেলেধরা নিয়ে এসে এ সব হচ্ছে কি? যুদ্ধে যাবে? যুদ্ধে যাবে কি? কেন যাবে? এ সব মচ্ছুন্দিপনা তোমার করা কেন? কার হুকুমে ছেলে নিয়ে যাবে? কিসের যুদ্ধ? কার যুদ্ধ?

আমি যেতেই গিন্নী বললেন—যুদ্ধে যাবে? তুমি যুদ্ধে যাবে? দাও আমাদের বিয়ে ফেরত দাও। আগে বল তুমি বিয়ে করলে কেন? বল তুমি, আমার নাতনিকে তুমি কেন বিয়ে করলে? বিয়ে করলে তো যুদ্ধে যাবে কার হুকুমে।

আমি যুদ্ধে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াবার সময় এতটা ভাবিনি। ভাববার সময়ও ছিল না। এবং আমি যে ইতিমধ্যে এতখানি বাঁধা পড়ে গেছি তাও বুঝিনি। যুদ্ধে গিয়ে গোলাগুলির আক্রমণ সম্পর্কে একটা-আধটা কথা বুকের মাপ দেবার সময় মনে হয়েছে, ভয়ও লেগেছে কিন্তু তার আগেই যে এমন ভাবে বাক্যবাণের সম্মুখীন হতে হবে একথা আদৌ মনে হয়নি। তাই ডাহা হতভম্ব হয়ে গেলাম। কিন্তু মুখে কোনো উত্তরই যোগাল না। কি উত্তরই বা দেব? বিয়ে ফেরত কিভাবে হয় তাও জানি না।

ইতিমধ্যে পিসিমা এগিয়ে এসে আমার হাতখানা ধরে বললেন—চল, বাড়িতে বঁটি আছে, তাই দিয়ে আমাকে, তোর মাকে, আর ওই বালিকা বউকে কেটে যুদ্ধ শিখে যুদ্ধে যাবি। চল, কাটবি চল আমাদের তিনজনকে।

বিয়ে ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা জানা ছিল না এবং সকলকে কেটে যুদ্ধ শেখাও অসম্ভব ছিল, সুতরাং যুদ্ধে যাওয়া হয়ে গেল। সুড় সুড় করে বাড়ি ফিরলাম। দু-তিন দিন গিন্নী ঠাকুরবাড়ি যাওয়া-আসার পথে আমাদের চণ্ডীমণ্ডপের দরজায় দাঁড়িয়ে আমার খবর নিয়ে গেলেন। অর্থাৎ আমার কার্য-কারণে কোনো রকম বদ মতলব দেখা যাচ্ছে কিনা?

যাই হোক ; এই ধরনের কড়া দৃষ্টির মধ্যে নানাপ্রকার বিচিত্র কথা শুনতে পেলাম, কথা একটাই, তারই বহু বিচিত্র রূপ। আমার পিসিমা ইঙ্গিতে বন্ধুবান্ধবদের দিয়ে প্রশ্ন করালেন—বধূকে নিয়ে আসবেন কিনা ?

—সেই জন্যই কি যুদ্ধে যেতে চাই ? না—কি ?

একদিন নিজেই বললেন—বউমাকে এইবার নিয়ে আসি, কি বল ?

মা বাধা দিয়ে বললেন—বউমাকে তো আমরা পাঠিয়েই দিইনি। ও'রাই নিয়ে গেছেন। ও'রা যদি না পাঠান ?

—তা না হয় আমাদের অপমান হবে ?

আমি পড়লাম মহাবিপদে। কি বলব আমি। সত্য বলতে কি বধূর জন্য বিরহ অনুভবের কোন লক্ষণই আমার মধ্যে আমি অনুভব করি নি।

ওদিকে ও'দের বাড়িতে বধূ তিরস্কৃত হল দিদিমার কাছে।—হারামজাদী খুকী। দিদিমা, দিদিমা করে পাগল। দিদিমার জন্যে শ্বশুরবাড়ি থেকে পালিয়ে এল। দশ ক্রোশ বিশ ক্রোশ নয়, বাড়ির দোরে বিয়ে দিয়েছি, তা-ও থাকতে পারলেন না খুকী। এখন ছোঁড়া যুদ্ধে যেতে চায়। নে, এখন ঠ্যালা নে। সামলায় কে দেখ! এখন যা, সুড় সুড় করে নিজে থেকে যা!

কিন্তু তাই-বা কি করে হয় ? যদি ঘরে ঢুকতে না দেয় ? তা অবিশ্যি পারবে না। কিন্তু পিসশাশুড়ী জ্বালালে কি হবে ?

এই জল্পনা-কল্পনার মধ্যে একদা সংবাদ এল, আমি পাস করেছি।

পাস করার আনন্দটা (আমি জীবনে ওই একটা পাসই করেছি) একটা অভূতপূর্ব অদ্ভুত আনন্দ। অন্তত আমার কাছে তাই মনে হয়েছিল। এমন বিপুল উল্লাস কখনও অনুভব করিনি। বিয়ে আমার একরকম ছেলেবেলায় হয়েছে, বিয়েতেও না। পরবর্তী জীবনে সম্মান পেয়েছি, তাতেও না। বি-এ এম-এ-যাঁরা পাস করেছেন তাঁদের জিজ্ঞাসা করি নি তবে আমার মনে হয়, ওই প্রথম পাসের আনন্দের মতো বিপুল আনন্দ আর কোনো পাস করে হয় না।

হয় বোধ হয়। পরে যে পরীক্ষায় পাস করে মানুষ ভালো চাকরি অর্থাৎ বিদ্যাগৌরবের সঙ্গে জীবনে প্রতিষ্ঠাগৌরবও পায় তাতে হয়। আমি শুনেছি আগে আই-সি-এস, আই-পি-এস ধরনের পরীক্ষা পাস-করা ছাত্র সারা রাত্রি নৃত্য করেছে, গলা না থাকলেও গান করেছে। হল্লা করেছে। তবে একে বোধহয় পরীক্ষা পাসের সামিল করা যায় না। পাস বলতে ওই এম-এ পর্যন্ত।

দশ বছর ধরে যে পরীক্ষাটি পাস করবার জন্য বছরে চার-চারটে পরীক্ষার

পড়া তৈরি করেছি, ইস্কুলে কঠোর শাসনের মধ্যে কাটিয়েছি হঠাৎ ওই খবরটি এসে অনেক কথার মধ্যে এই কথাটিও বলে—খালাস তুমি ওই ইস্কুল থেকে। ব্যাপারটা কত বড় বুঝুন, ওখানে স্বেচ্ছায় গিয়ে যদি বলি, আমি আর একদিন পড়ব, তবে মাস্টাররা বলবেন—হবে না বাপু। আর ক্লাশ নেই। এ যেন সোনার তরীর উলটো ব্যাপার। ঘাটের উপর বসে আছি ধানের বোঝা মাথায় নিয়ে, হঠাৎ সোনার তরী এল, এসে বললে—তোমার মাথার ধান সোনা হয়ে গেছে, তুমি আমার নৌকায় উঠে এস। ওপারে চল। ঘাটের লোকও বললে—যারা না-কি সারা বর্ষা-শরৎ-হেমন্ত-শীত—চারটে ঋতু পর্যন্ত চোখ রাঙিয়ে ধান পুঁতিয়েছে, নিড়িয়ে নিয়েছে, সিচন দিইয়ে নিয়েছে, কাটিয়েছে তারাও বলে—আর না, তোমার ফসল যখন সোনা হল তখন আর এ-পারে চাষ তোমাকে দিয়ে চলবে না। ও-পারে গিয়ে লেগে পড়।

হয়তো উচ্ছ্বাসটা বেশি বলেই মনে হবে অনেকের, সে যারা চারটে-পাঁচটা-সাতটা পাস করেছেন। ডাঃ শ্রীকুমার-সুনীতিকুমার-মেঘনাদ—এঁদের মনে হবে। হয়তো প্রমথ বিশী, জগদীশ ভটচাজ এদেরও হবে। হয় তো এম-এ পাস আমার বড় ছেলে বড় জামাইয়েরও মনে হবে। কিন্তু যারা আমার মতো একটা পাস তাদের বেশি মনে হবে না। এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। দশ বছর পড়ে দশ বছরে অন্তত একচল্লিশটা পরীক্ষার পর (বছরে কোয়াটারলি ধরে এবং টেস্ট ও ফাইনাল ধরে) পাসটার স্বীকৃতির সঙ্গে দু-বছরে এক-একটা পাসের স্বীকৃতির কি তুলনা হয়? ও-তো তৈরি ভাত-ডাল মেখে গ্রাস বানিয়ে মুখে তোলা। আর এ হল উনোনে আঁচ দেওয়া থেকে শুরু করে বাটনা বেটে, তরকারী কুটে, চাল ধুয়ে, রান্না করে, জায়গা করে খাওয়ার মতো ব্যাপার।

সারাটা দিন গ্রামের পথে পথে বেড়িয়েছিলাম। লোককে দেখবামাত্র প্রণাম করেছিলাম। একরকম উপবাস করে ছিলাম। খেতেই পারিনি ভালো করে। রাত্রে ফিস্ট করেছিলাম। এবং গান করেছিলাম। সেদিন সিদ্ধিও খেয়েছিলাম।

বিয়ে নিয়ে ঝগড়াবিবাদের অশান্তি কোথায় উপে গেল।

পরের দিন থেকে গবেষণা চলতে লাগল—কোথায় পড়তে যাব?

পিসিমা জানালেন কলকাতায় পাঠাতে তিনি রাজি নন। বললেন—কলকাতা ভয়ঙ্কর জায়গা। সেখানে লোকে দিক ভুলে হারিয়ে যায়। সন্ধ্যের অন্ধকারে গুণ্ডায় ছুরি মারে, একটুখানি অন্যমনস্ক হলে বড় বড় জুড়ি গাড়ির তলায় চাপা পড়ে। ট্রামের তার কেটে পড়বামাত্র লোকে মরে যায়।

গাড়ি-চাপা-পড়া তিনি স্বচক্ষে দেখেছিলেন। জগন্নাথ যাবার পথে হাওড়া স্টেশনেই আমাদের গ্রামের একটি বালক চাপা পড়ে মরেছিল। কলকাতার কথা হলেই শিউরে উঠে তিনি এই গল্পটি করে তারপর চিড়িয়াখানা যাদুঘর কালীঘাটের কথা বলতেন।

ট্রামের তার কেটে গায়ে পড়ে মৃত্যুর কথা গল্প করতেন আমার বউদিদি। আমার বউদিদির মায়ের ফিটের ব্যারাম ছিল। তার উদ্ভব না-কি ট্রামের তার-কাটা থেকে। বউদিদির দাদা কয়লার ব্যবসায়ী ছিলেন। কলকাতায় ঘুরতে হত অনেক। একদিন কেউ এসে গল্প করেছিল বাড়িতে—ওই ট্রামের তার-কাটার গল্প। ট্রামের তার কেটে একজনের গায়ে পড়বামাত্র লোকটা মরে গেল। শুনবার পর বউদিদির মা অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। কেউ জিজ্ঞাসা করলে—কি হল? এমন করে বসে কেন?

বউদিদির মা বললেন—আমার সুশীল দিনরাত কলকাতার রাস্তায় ঘুরছে, ট্রামের তার কেটে যদি সুশীলের গায়ে পড়ে? এরপরেই তিনি অস্ফুট আর্তনাদ করে পড়ে গেলেন মাটির উপর। সেই তাঁর ফিটের ব্যাধির শুরু।

ব্যাপারটা বারবার শুনে সে আমলে আমার মনেও একটি আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল। যাই হোক, পিসিমা এসব গল্প বলে সর্বশেষে মাকে বললেন—আরও একটা কথা আছে বউ।

মা বললেন—কি?

—ওখানে ছেলেকে পাঠাব। ওখানে ওদের (অর্থাৎ আমার মামা-শ্বশুরদের) মস্ত ব্যবসা, বাসা। আমরা থাকব না। এখন ছেলেটিকে ডেকে নিয়ে আদর-যত্ন করে যদি ওদের কোলগত করে নেয়, তখন?

মা বললেন—কলকাতা পাঠাতে আমি বলছি না কিন্তু ছেলেকে অবিশ্বাস করছ কেন? সে তো কোনো অবিশ্বাসের কাজ করেনি। এই তো বাড়ির দোরে শ্বশুর-বাড়ি। বুড়ী (আমার বোন) রয়েছে সেখানে, তার সঙ্গে দেখা করার ছুতো করেও তো যায়নি। বউমার চিঠি পর্যন্ত সে আমাদের দিয়েছে।

পিসিমা অপ্রস্তুত হলেন, বললেন—না না। সে কথা আমি বলিনি। তবে মন না মতিভ্রম। ছেলেমানুষ! এই বয়সেই তো শ্বশুরবাড়ির শখ। যাওয়ারই তো কথা। বউ তো আনতেই হবে। বিয়ে তো আর দিতে পারব না। সে কালও নাই, কাল না মানলেও পথ নাই। বুড়ীর সঙ্গে বদলে বিয়ে হয়েছে। তবে আমি শিক্ষা দিতে চাই। বলে কি-না আমি কে? আমি থাকতে মেয়ে পাঠাবে না।

বলতে বোধ হয় ভুলেছি, এমন কথা উঠেছিল, বলেছিলেন ওঁরা।

সেই আঘাতটা তাঁকে লেগেছিল। তবে ঝগড়া-ঝাঁটি যাই হোক এবং তার কারণ স্বরূপ নানা কঠিন কথার যতই উল্লেখ করে থাকি আসল কারণটা ছিল ছেলে হারাবার ভয়। যে কারণে চিরদিন একশো শাশুড়ী একশো বউয়ের মধ্যে নিরেনব্বুই ক্ষেত্রে বিরোধ বাধে। চিরদিন হয়ে আসছে। অন্তত আমাদের দেশে, আমাদের সমাজে। এ সমাজ যতদিন থাকবে ততদিন হবে। যে-বউ শাশুড়ীর কটু-কথা শোনেন নিজের বধূ-জীবনের প্রথমভাগে সেই বধূই শাশুড়ী হয়ে নিজের বধূকে কটু-কথা বলেন। পিসিমা ছিলেন জীবনে সর্বহারা। সর্বহারার সত্যকার অর্থে সর্বহারা। এই সর্বহারা নারীর জীবনে আমিই ছিলাম একমাত্র অবলম্বন, তাই আমাকে হারাতে, আমাকে ছাড়তে, কাউকে আমার মতো বস্তুটিকে হাতে তুলে দেবার শক্তি তাঁর ছিল না! তার চেয়ে মৃত্যু তাঁর ভালো ছিল।

আমার কিন্তু কলকাতায় আসবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা। আমি তখনও কলকাতা দেখিনি। শুনেছি পড়েছি কলকাতার গল্প। বিরাট বিচিত্র মহানগরী। কলকাতায় বিরাট বিশ্ববিদ্যালয়। পাণ্ডিত্যের মূর্তিমান অধ্যাপক, কলকাতায় সাহিত্যের কেন্দ্র, বড় বড় কাগজের আপিস; বড় বড় সাহিত্যিক সেখানে থাকেন; কলকাতায় স্বপ্নের যাদুপুরী রঙ্গমঞ্চ, কলকাতায় মোহনবাগানের খেলা, যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, সার্কাস, বড়দিন; বিরাট নগরীর একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত বিচিত্র ট্রাম যানের ব্যবস্থা, অবিরাম চলছেই চলছেই। আমার তখন ধারণা ছিল ট্রাম আদৌ থামে না, সে চলেই চলেই, সেই চলন্ত অবস্থাতেই উঠতে হয়, নামতে হয়। কলকাতায় ভারতবর্ষের যত করদরাজ্যের রাজারা আসেন। উদয়পুরের মহারাণা আসেন। কলকাতায় ঘোড়দৌড় হয়। কলকাতায় বায়স্কোপ (তখন সিনেমাকে বায়স্কোপ বলতাম) আছে, কলকাতায় রাত্রি নাই। শৈশব থেকে শুধু শুনেই এসেছি, দেখতে পাই নি। একবার আসবার সমস্ত আয়োজন করেও আসা হয় নি। সে দুঃখ আমার মনে সমান প্রবল হয়েই ছিল তখনও পর্যন্ত। আরও আকর্ষণ ছিল। আমাদের গ্রামের যাঁরা কলকাতায় থাকতেন তাঁদের বিচিত্র বেশ; মার্জিত বহিরঙ্গেরও একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল। একালে এখনও গ্রাম্য বালকেরা বোধকরি এ আকর্ষণ অনুভব করে। সেকালে বলত—কলের জল, বালাম চাল তিনমাস পেটে পড়লেই আলাদা মানুষ। কালো-কুচ্ছিতও কলের জলে বালাম চালে "ছিরি" অর্থাৎ শ্রীমন্ত হয়ে ওঠে।

একটি ষোলো বছরের ছেলের পক্ষে এ আকর্ষণ দুর্নিবার। তবুও তাকে অন্তরের মধ্যেই নিবারণ করতে হল। মা বললেন, পিসিমা বললেন, আমিও বললাম, বলতে হল—বেশ। স্থির হল বহরমপুরে ভর্তি হব। বললাম—বেশ।

তা. স্মৃ. (প্রথম)—১৬

খুশি হয়ে পিসিমাই আমাকে নিয়ে বহরমপুর রওনা হলেন। আমি যখন ফার্স্ট ক্লাশে পড়ি তখন আমাদের স্কুলে এসেছিলেন থার্ড মাস্টার। তাঁর নাম প্রমথনাথ মৈত্র। তিনি আমার গৃহ-শিক্ষক হয়েই আমাদের বাড়িতেই ছিলেন। মাস আষ্টেক থেকে ওখান থেকেই মোক্তারি পাস করে তিনি তখন বহরমপুরে মোক্তারি করছেন। তাঁকে পত্র লিখে আমায় নিয়ে তাঁর ওখানেই গেলেন। তখনও কলেজ খোলে নাই। ভর্তি শুরু হয় নাই। কয়েকদিন থেকে ওখানকার ব্যবস্থা করে পিসিমা আমাকে নিয়ে ফিরলেন। হোস্টেলে থাকব। প্রমথবাবু সব ঠিক করে দেবেন বললেন। এর সপ্তাহ-দুয়েক পরই বাক্স-পেঁটরা বেঁধে বহরমপুর রওনা হলাম। এবার আমি একা। এই আমার জীবনে প্রথম একক স্বাধীনভাবে যাত্রা। অবশ্য সিউড়ি, রামপুরহাট বাদ দিয়ে। মাকে সঙ্গে নিয়ে পাটনা এর আগে গিয়েছি এসেছি কিন্তু সে ক্ষেত্রে মাকে আমি নিয়ে যাই নি, মা আমাকে নিয়ে গেছেন।

তখনও ভাগীরথীর এমন দুরবস্থা হয় নি। বর্ষার সময় দুকূল-প্লাবিনী গঙ্গায় স্টীমারে আজিমগঞ্জ থেকে বহরমপুর পেঁছিলাম। ভারি ভালো লেগেছিল এই পথটুকু।

বহরমপুর পেঁছে প্রমথবাবুর বাড়িতে উঠলাম। কিন্তু প্রমথবাবু কোনো ব্যবস্থাই করে রাখেন নি। অর্থাৎ প্রধান সমস্যা হোস্টেলের সিটের কোনো ব্যবস্থা করতে অবকাশ পান নি। ভেবেছিলেন এলেই ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কিন্তু সমস্যাটা এত সোজা ছিল না তখন। কলকাতায় ভারত-রক্ষা আইনের প্রবর্তনের ফলে বহরমপুর কলেজ, হোস্টেল তখন আকণ্ঠ ভরে উঠেছে। প্রমথবাবুর এক ভাই কলেজে পড়তেন সেকেণ্ড ইয়ারে—তাঁর নামটি বেশ—কীর্তিবাস মৈত্র। তাঁর সঙ্গে প্রথমেই দেখতে গেলাম হোস্টেলের সিট। প্রমথবাবু বলে দিলেন। কিন্তু বেলা একটা থেকে সন্ধ্যে ছ-টা পর্যন্ত হোস্টেলে হোস্টেলে ঘুরে ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে ফিরে এলাম। মহারাজা হোস্টেল বলে একটি হোস্টেলে একটি সিট ছিল চাকরদের ঘরের সংলগ্ন। অন্ধকার, স্যাঁতসেতে; ঘরের একটি মাত্র জানলার ওপাশে একটি সাপের খোলস ঝুলতে দেখে আমি ওখানে থাকতে রাজি হলাম না।

প্রমথবাবু সত্যই আমাকে স্নেহ করতেন। তিনি ব্যবস্থা করে রাখেন নি সেটা তাঁর অবহেলা নয়, ভেবেছিলেন এলেই হয়ে যাবে; এতটা ভাবতে পারেন নি। তিনি বললেন—তাহলে আমার এখানেই কয়েক দিন থাক—তারপর একটা ব্যবস্থা হবে।

এদিকে তখন এই অকল্পিত অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে বিচিত্রভাবে আমার মনে কলকাতা আসবার বাসনা প্রবল হয়ে উঠল। এই তো হয়েছে।

এই তো সুযোগ। মন আমার উল্লাসে নেচে উঠল—এ সুযোগ আর কিছুতেই ছাড়ব না। আজ রাত্রে, আজই রাত্রে রওনা হব। নইলে কলকাতা যাওয়া অন্তত দু-বছর পিছিয়ে যাবে। মহানগরী আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে তখন।

আমি বললাম—না। আমি কলকাতা যাই তা হলে, দেরি হলে সেখানেও এই অবস্থা হবে।

একটু রাগও দেখালাম। বললাম—ব্যবস্থা যখন করেন নি তখন আর পরে ব্যবস্থা হবে বলে কি লাভ? আমি কলকাতাই যাব।

প্রমথবাবু আর কিছু বললেন না।

আমি সেই রাত্রেই রওনা হলাম। সারারাত্রি ট্রেনে এসে ভোরবেলা নামলাম শেয়ালদা স্টেশনে।

তখনও স্টেশনের ইলেকট্রিক লাইটগুলি জ্বলছে। সামনে জনহীন সারকুলার রোড ঘুমন্ত অজগরের মতো নিথর।

কুলি বললে—কি বাবু? ঘোড়ার গাড়ি?

বললাম—থাম। রাখ জিনিস এইখানে। সকাল হোক।

বিরাট ঘুমন্ত মহানগরীর প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে বুকটা কেঁপে উঠল। কোথায় যাব? কেমন করে যাব? মহানগরী শুধু বিচিত্রই নয়; পাণ্ডিত্যের লীলাভূমি, বিদ্যা, সাহিত্যের তীর্থক্ষেত্রই নয় মহানগরী হিংস্র প্রবঞ্চকের, পরস্বাপহারীরও আবাসস্থল। পরক্ষণেই সাহস ফিরে পেলাম। কিসের ভয়? ফুটুক, আলো ফুটুক!

হঠাৎ শব্দ শুনে দেখলাম লম্বা আকারের হলুদ রঙের ছোট ট্রেনের মতো গাড়ি চলছে রাস্তার উপর দিয়ে, গাড়ির মাথায় একটা ভাঙা রেফের মতো বেঁকে উঠে তারের সঙ্গে লেগে রয়েছে।

তেরো

ট্রাম গাড়ি। এই সেই ট্রাম গাড়ি! জীবনে প্রথম দেখলাম। ছাদের লম্বা ডাণ্ডাটা মারফৎ বিদ্যুৎশক্তি নিচ্ছে তার থেকে। পথের উপরে পাতা লাইন বেয়ে চলেছে। তখন ট্রাম গাড়ির রং ছিল হলুদ। দরজা ছিল পাশে, খোলা দরজা। পাশাপাশি ছ-সাতটা দরজা। লোকাল ট্রেনের মতো। ট্রামখানা চলে গেল হ্যারিসন রোড ধরে। আমি বসে রইলাম।

আলো ফুটে উঠলো বোধকরি আধঘণ্টার মধ্যেই। এরই মধ্যে দেখলাম সারকুলার রোড যান-বাহন জনতায় জেগে উঠল। সেই প্রথম দিনই দেখে-ছিলাম, শেয়ালদহ স্টেশন থেকে কি বিপুল পরিমাণ শাক-সবজি তরি-তরকারি বোঝাই গরুর গাড়ি, এবং বড় বড় ঝুড়ি মাথায় শয়ে শয়ে মুটে বের হয়ে চলেছে কলকাতার ভিতরে। সারি সারি—তার আর শেষ নাই। মাছের গন্ধ পেলাম। দেখলাম বাক্স চলেছে। তখন মোটরের যুগ ছিল না। সে সময় কলকাতায় কতগুলি মোটর ছিল জানি না। সেদিন মোটরকার চোখে পড়ে নি। শেয়ালদহ স্টেশনে ট্যাক্সি দেখেছি বলেও মনে পড়ছে না।

শেয়ালদহ স্টেশনে সেই আধঘণ্টার মধ্যেই বোধ হয় খান-তিনেক ট্রেন এসেছিল। তিনবার জনস্রোত আমার চোখের সামনে স্টেশন সীমানা পার হয়ে রাস্তায় পড়ে বোধ হয় তিন-চার মিনিটের মধ্যেই কে-কোথায় মিলিয়ে গেল! তারপর জাগল কলকাতা। সারকুলার রোডের অবস্থা দেখে তাই মনে হল। আমি এবার একখানা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করলাম। আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলাম, কোথায় যাব। যাব এণ্টালী, ক্যাণ্টোফার লেন। আমার মেসোমশায়ের বাড়ি। একই বাড়িতে আমার দুই মাসিমার বিবাহ হয়েছিল দুই সহোদরের সঙ্গে। সেখানে উঠে তারপর কলেজে ভর্তি হব এবং হোস্টেলে যাব। কোথায় ক্যাণ্টোফার লেন তা জানি না। শুধু জানি, ট্রাম কোম্পানির পাওয়ার হাউসের পিছনে। গাড়োয়ানকে বললাম সে কথা। বললাম, দেখ কলকাতায় আমি নতুন এসেছি। আমাকে এই ঠিকানায় পেঁছে দিতে হবে। ভাড়া তাঁরা যা বলবেন তার থেকে একটাকা বেশি দেব। তোমাকে কিন্তু একটি কথা বলতে হবে।

সে প্রশ্ন করলে—কি?

বললাম—তুমি আল্লার নাম নিয়ে বল যে আমার কোনো বিপদ হবে না।

সে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলে। বললে—বাবুজী বোধহয় কলকাতার কেচ্ছা অনেক শুনেছ! ওঠ বাবু, কোনো ডর নাই তোমার। তুমি যা বললে তাই বলছি আমি। খোদাতায়লার নাম নিয়ে বলছি—চল, আমি তোমাকে ঠিক পেঁছে দেব। কোনো বিপদ হবে না তোমার।

উঠে বসলাম গাড়িতে। গাড়ির ছাদের উপর বাক্স-বিছানা তুলে বেঁধে নিলে। আমি নিশ্চিন্ত হয়ে বসলাম। বাক্সের মধ্যে আমার অনেক দামী জিনিস ছিল। সাধারণ পড়ুয়া ছেলের যা থাকে তা থেকে অনেক বেশি; আমার তখন বিয়ে হয়ে গিয়েছে। সোনার ঘড়ি-চেন-বোতাম, হীরের আংটি প্রভৃতি জিনিসগুলি আমার সঙ্গে এবং বহরমপুর স্টেশনে ট্রেনে উঠবার আগে সেগুলিকে বাক্স-বন্ধ করেছি। ভয় হয়েছিল ট্রেনে কেউ না ঘুমন্ত অবস্থায়

খুলে নেয়। বাক্সটা ছাতের উপর চড়াতেই একবার মনটা কেমন ছ্যাঁৎ করে উঠলো। গাড়োয়ান একা নয়, তার একজন ছোকরা সঙ্গী রয়েছে। কিন্তু পরমুহূর্তে নিজেই লজ্জা পেলাম। গাড়োয়ান তার ঈশ্বর আল্লার নামে শপথ করেছে। তবু তাকে অবিশ্বাস করছি কেন?

আমার বাল্যকাল থেকে বাড়িতে শুনে এসেছি—কেউ যদি ভগবানের নামে শপথ করে সে শপথ ভাঙে তবে তার পাপ তার দায়িত্ব ভগবানের। তুমি তাকে অবিশ্বাস কোরো না, করলে ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বাসের পাপ স্পর্শ করবে তোমাকে।

এ কথাগুলি আজকের যুগে হয় তো অচল। লাখো লাখো প্রমাণ হাজির হবে—ভগবানের নাম নিয়ে কত জাল কত জুয়াচুরি পৃথিবীতে ঘটেছে। এবং ভগবানই যেকালে অলীক মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে, সেকালে এ-কথা হাস্যরসেরই খোরাক যোগাবে। কিন্তু আজও আমি বলব—ভগবান আছেন বলে কোমর বেঁধে তর্ক আমি করব না কারুর সঙ্গে, ভগবান আছেন প্রমাণের জন্যে ভূতের গল্পেরও আমদানি করব না, অলৌকিক ঘটনার নজিরও খাড়া করব না; শুধু বলব ভগবানের নাম নিয়ে লাখো লাখো পাপকর্ম যেমন ঘটেছে পৃথিবীতে তেমনি ভগবানের নাম কোটি কোটি—বহু কোটি মানুষকে পাপপ্রবৃত্তি থেকে রক্ষা করেও এসেছে। এই বিংশ শতাব্দীর খানিকটা অবধি মানুষের সভ্যতা যে এতদূর এগিয়ে এসেছে তার এই পথচলার সবচেয়ে বড় পাথেয় হল ভগবান, ভগবানের নাম।

সেদিন ভগবানের নাম এবং ভগবানের উপর বিশ্বাসই ছিল আমার মনের বল। ওই বলেই আমি নিশ্চিন্ত হয়ে গাড়ির মধ্যে বসে বহু প্রত্যাশার এই মহানগরীকে দেখতে পেরেছিলাম দু-পাশে চোখ মেলে।

ষোলো বছর বয়স পর্যন্ত কলকাতার কত কথা কত গল্প শুনেছি। কত বিচিত্র কথা। যত শুনেছি তত আকর্ষণ অনুভব করেছি। কিন্তু অভিভাবকহীন একটি বালকের সে প্রত্যাশা পূর্ণ হয় নি। একবার যাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ করে গাড়িতে উঠবার সময় বাধা পড়েছিল। কলকাতা আসা ঘটে নি। সে-যে কি ক্ষোভ আমার হয়েছিল সে আর আজ প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ঘটনাটুকু এখানে অবাস্তব হবে না।

১৯১২ সাল। সম্রাট পঞ্চম জর্জের রাজ্যাভিষেক; দিল্লীর দরবারের পর সম্রাট আসবেন কলকাতা। সুন্দরী রূপসী কলকাতা তার জন্য অপরূপ সজ্জায় সজ্জিত হচ্ছে। গ্রামে বসেই তার সংবাদ পাচ্ছি। সে না কি এক বিরাট উৎসব। সে উৎসবের রূপসজ্জায় সমারোহের আড়ম্বরের তুলনা

ভারতবর্ষের ইতিহাসে নাই। সেই উৎসব দেখবার জন্য বাড়িতে মা-পিসিমার কাছে আবেদন জানিয়েছিলাম। তাঁদের আপত্তি কোথায় তখন ঠিক বুঝতাম না। আমার বয়স তখন চৌদ্দ। তাঁদের আপত্তি নয়, সমস্যা ছিল, কার সঙ্গে আমাকে পাঠাবেন? কোথায় পাঠাবেন? সে বার তাঁরা "না" বললেন না। ষষ্ঠীকিঙ্করবাবুর জামাই অমরেন্দ্রনাথ; তিনি আমাদের গ্রামেরই মানুষের মতো এবং একটি সর্বজনপ্রিয় মধুর প্রকৃতির তরুণ। মানুষটি সেকালে আমাদের কিশোর সমাজের ভালোবাসার জন 'গাবুদা'কে দেখলে আমাদের দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠত। গাবুদার মতো ভালোবাসা আমাদের ওখানে আর কোনো তরুণ পেয়েছেন কি-না জানি না। আমার বিশ্বাস পান নি। সে সময় গাবুদা কলকাতাতেই থাকেন। পড়া শেষ হয়েছে কি হবে। কয়েক দিনের জন্যে লাভপুরে এসেছেন। উৎসব-সমারোহের আগেই কলকাতা ফিরে যাবেন। গাবুদার জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ তাঁর সত্য সত্যই মায়ের মতো, বাল্যে মাতৃহীন গাবুদাকে তিনিই মানুষ করেছেন। তিনি আবার ষষ্ঠীকিঙ্করবাবুর জ্যেষ্ঠা ভগ্নী, স্বর্গীয় যাদবলালবাবুর প্রথমা কন্যা। দাদার কাছেই গাবুদা তখন থাকেন। আমার পিসিমা গেলেন গাবুদার কাছে।—বাবা অমর, তুমি যদি শঙ্করকে নিয়ে যাও তোমার সঙ্গে! রাজা আসছেন, কলকাতায় অনেক ধুমধাম, তার দেখতে বড় সাধ। তা ছাড়া সে কলকাতা কখনও দেখে নি।

গাবুদা সম্ভ্রম এবং আগ্রহের সঙ্গে বললেন—বেশ তো। নিয়ে যাব আমি, এরজন্য আপনি এলেন কেন? আমায় তো ডেকে পাঠালেই পারতেন। আমি নিয়ে যাব, দেখাব সব।

পিসিমা বললেন—ওকে নিয়ে গিয়ে ওর মাসির বাড়ি পেঁৗছে দিলেই হবে।

গাবুদার বৌদি—স্বর্গীয় যাদবলালবাবুর কন্যা, তিনি বলে উঠলেন—সে-কি? সেখানে একদিন যাবে, দেখা করে আসবে, সেখানে থাকবে কেন? থাকবে আমাদের ওখানে। আমরা কি পর? দেখ তো, ও-তো আমাদেরও ছেলে!

এই গুণটি, (শুধু গুণ বললেই যেন বলা হচ্ছে না বলে মনে হচ্ছে) এই সুদুর্লভ গুণটি যাদবলালবাবুর প্রকৃতির দান, এই মহৎ গুণটি তাঁর সন্তানদের মধ্যে পূর্ণভাবে সঞ্চারিত ছিল; মানস সরোবর থেকে নির্গত গঙ্গা ব্রহ্মপুত্রের ধারার মতো। পরবর্তী পুরুষেও সে ধারার মহিমা সম্পূর্ণ রূপে বিলুপ্ত হয় নি। তবে সমতল ক্ষেত্রের ধূলিকণা তার মধ্যে মিশে গিয়ে তার রং এবং স্বাদ অনেক পরিমাণে বদল করে দিয়েছে।

সে কালে তাঁদের বাসায় লাভপুর এবং লাভপুরের আশপাশের লোকের

প্রবেশাধিকার এবং দু-দশ দিনের জন্য থাকার অধিকার ছিল অবারিত। এবং যে যে-সম্মানের মানুষ তাতে তার থেকে অধিক সম্মান দিয়ে তাঁরা অভ্যর্থনা করেছেন।

যাই হোক ঠিক হয়ে গেল আমি যাব। দিন স্থির করে গাবুদা বলে পাঠালেন। ট্রেন বোধ হয় সন্ধ্যায়। আমদপুর-কাটোয়া রেল লাইন তখন হয় নি। লাভপুর থেকে সাত মাইল এসে আমদপুর ট্রেন ধরতে হবে। ষষ্ঠী-কিঙ্করবাবুদের ঘোড়ার গাড়িতে আমদপুর পর্যন্ত যাওয়ার ব্যবস্থা। রওনা হব চারটে সাড়ে-চারটের সময়। তখন স্যুটকেশের চলতি ছিল না। ব্যাগ বলতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্যাম্বিসের ব্যাগ ছিল, অবস্থাপন্ন লোকেরা চামড়ার তৈরি গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগ ব্যবহার করতেন। আমাদের একটি গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগ ছিল। সেই ব্যাগটি গুছিয়ে নেওয়া হয়েছে। বিছানার দরকার হবে না বলে পাঠিয়েছেন গাবুদা। আমি ভাত খাওয়ার পর থেকেই দু-দশ মিনিট অন্তর ঘড়ি দেখছি। তখন বড়দিনের ছুটি। ঘড়ি চলছে না মনে হচ্ছে। অধীর হয়ে আমাদের বৈঠকখানার সামনে বাগানে, খামার বাড়িতে ঘুরছি। মধ্যে মধ্যে বাড়ি এসে একবার ব্যাগটা খুলে কোন একটা জিনিস বের করছি—আবার পুরছি। বেলা যখন তিনটে সাড়ে-তিনটে—তখন শরীরটা যেন কেমন করে উঠল। এ কেমন-করে ওঠাটা যাঁরা ম্যালেরিয়ায় ভোগেন নি তাঁরা বুঝতে পারবেন না। প্রথমটা বেশ মিষ্টি পা শির-শিরে শীত অনুভব করার মধ্যে মনে হয় পায়ের গোছে কেমন যেন অস্বস্তি। তারপর কম্প। তারপর দেখতে দেখতে গায়ের উত্তাপ সাড়ে-তিন সাড়ে-চার, পাঁচ, সাড়ে-পাঁচ। দুরন্ত মাথায় যন্ত্রণা, সর্বশেষ বমি। বমি করে পেটের খাদ্য শেষ কণা বেরিয়ে গেলে জ্বর কমতে থাকে।

আমার মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল।

কি করব? কি করি? কি করে একে ঠেকানো যায়?

ছুটে বাড়ি এলাম। দুটো কুইনিনের বড়ি লুকিয়ে গিলে ফেললাম। আবার বৈঠখানায় গেলাম মনকে দৃঢ় করে ভাবতে চেষ্টা করলাম, কিছুই হয় নি আমার। কিছু হলেও কাউকে জানতে দেব না। জানাব না। কলকাতায় গিয়ে যা হয় হবে। অন্যের বাসা, অন্যেরা বিব্রত হবেন সে-সব বিবেচনা আমার কিশোর জীবনের বিপুল আগ্রহের কাছে তুচ্ছ হয়ে গেল। মনেই হল না। কিন্তু কিছুই হয় নি ভাবলে কি হবে! ম্যালেরিয়ার প্যারাসাইটগুলি যে তখন শরীরের ভিতর নৃত্য শুরু করে দিয়েছে। দেহের অবস্থা তখন নর্তকীদলের নৃত্যপরা চরণ-মুখর রঙ্গমঞ্চের পাটাতনের মতো। গলার ভিতর দিয়ে শব্দ

বের হচ্ছে এক রকম এবং কাঁপতে শুরু করছে শরীর। ঘরের ভিতর র‍্যাপার মুড়িতে শীত কাটছে না, অসহ্য হয়ে উঠছে। বেরিয়ে এলাম, রৌদ্রে দাঁড়াব। রোদ ভারি মিষ্টি লাগে এ সময়। এবং পাছে কেউ এ অবস্থা দেখে ফেলে তাই খামার বাড়িতে গিয়ে ধানের পোয়ালের আড়াল দিয়ে একটি নিরালা জায়গায় বসলাম। হঠাৎ মাথায় এল—বমি করে পেটের অন্ন তুলে ফেলতে পারলে জ্বরটা কম থাকতে পারে! ভাবনা মাত্রে কোশিস অর্থাৎ চেষ্টা আরম্ভ করে দিলাম। গলায় আঙুল দিলাম। প্রথমেই উঠল—গলিত কুইনিন, যা ঘণ্টাখানেক আগে খেয়েছি। তারপর আর চেষ্টা করতে হল না। আপনা আপনিই সব নির্গত হয়ে গেল। এবং সমস্ত শরীরটা ঘামে ভিজে গেল। কিন্তু মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা।

ঠিক এই সময়েই ডাক শুনলাম। পিসিমাই ডাকছেন—কই রে? কোথায় গেলি? আয় ওদের গাড়ি এসেছে। যাত্রা করবি আয়।

অর্থাৎ কপালে দইয়ের ফোঁটা দিয়ে মাথায় একশো আটবার দুর্গানাম জপ করে দেবেন।

তখন আমার যেন দাঁড়াবারও শক্তি নাই এমন অবস্থা। তবুও প্রাণপণে শক্তি সঞ্চয় করে কোনো রকমে উঠে দাঁড়ালাম—বেরিয়ে এলাম পোয়ালের আড়াল থেকে।

আমার মুখ দেখেই পিসিমা বললেন—ও কি রে? মুখ এমন ফন ফন করছে কেন?

—না। কিছু না। রোদে ছিলাম কি-না?

—রোদে কেন?

—বেজির বাচ্চা দেখছিলাম।

—না। দেখি তোর কপাল দেখি। এ-কি? গা-যে পুড়ে যাচ্ছে।

—রোদে ছিলাম যে!

মানুষ ভগবানকে বলে ছলনাময়। কিন্তু দুঃখ এই, মানুষের ছলনা রাখতে এতটুকু সাহায্য করেন না তিনি। শেষের কথা কয়টা শেষ করতে করতে আমার পেটের খাদ্য মোচড় দিয়ে উঠে এল গলায়; বসে পড়তে পড়তে হুড় হুড় করে বেরিয়ে এল।

এরপর বিছানায় গিয়ে শুতে হল। গাবুদার গাড়ি চলে গেল।

শুয়ে আমি কাঁদতে লাগলাম। মনে হল, এ জীবনে আর আমার কলকাতা যাওয়া হবে না। সে দিন জ্বর কমে এলে নিজের মনেই গান করেছিলাম—

"আমার সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল, সকলি ফুরায়ে যায় মা।"

এই গান গাওয়ার কথা "সন্দীপন পাঠশালা"য় আছে। সীতারামকে যখন হুগলী পড়তে পাঠাতে তার বাপ অমত করলে—তখন সীতারাম রাত্রে উঠে বারান্দায় বসে গান গাইছে।

"আমার সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল—ইত্যাদি।"

এই গানটি সে আমলে ছাত্র মহলে খুব প্রিয় গান ছিল। আজ ভাবি এবং ভেবে পাই না—এই ধরনের বিষাদের সুর কেন ত জীবনে ভালো লাগত? অবশ্য সেদিন ও গানটা আমার পক্ষে খুবই ে ুক্ত রূপে খাপ খেয়েছিল সন্দেহ নাই।

সেই কলকাতায় এসেছি।

তখনও রোদ্দুর ওঠে নি! জুলাই মাস! আকাশে মেঘ ছিল কিনা মনে পড়ছে না! তবে রোদ্দুর ওঠবার সময় তখনও হয় নি। ছটাও বাজে নি।

আজও মনে পড়ছে শেয়ালদার সামনে, সারকুলার রোডের উপরে একখানা লাল রঙের বাড়ি। সে বাড়িখানা কোন্ বাড়ি আজ বুঝতে পারি না। তবে চোখের সামনে ভাসে লাল রঙের বাড়িখানা। চোখে পড়ল সদ্য-ধোওয়া রাজপথ! তখন বোধ হয় পিচ হয় নি।

মনে পড়ছে বউবাজারের মোড়ে একটা গির্জা। এগিয়ে এসে জোড়া গির্জা। দুপাশে বড় বড় বাড়ি। ট্রাম লাইনে হলুদ রঙের ট্রাম গাড়ি চলছে।

ট্রামে কিভাবে চড়ব, কি করে নামব—সেই নিয়ে মনে দুশ্চিন্তা। ট্রাম থামে না, চলেই, চলেই! চলন্ত ট্রামেই উঠতে হয়, নামতে হয়। লক্ষ্য করে দেখলাম, না, ট্রাম তো থামে। অনেকে ছুটে গিয়ে উঠছে এবং চলন্ত ট্রাম থেকেই নামছে বটে, কিন্তু থামে। ট্রামে পোস্টের গায়ে-লেখা প্লেটগুলি চোখে পড়ল। লেখাগুলিও পড়লাম এবং আশ্বস্ত হলাম। তবু লক্ষ্য করে দেখলাম—চলন্ত ট্রামে ছুটে গিয়ে যারা চড়ছে এবং চলন্ত ট্রাম থেকে যারা নামছে তাদের ওঠা-নামার কৌশল।

গাড়িখানা বাঁয়ে বেঁকেছিল সেদিন—এন্টালী মার্কেটের পাশ দিয়ে। তারপর অলিগলি ঘুরে চলতে লাগল। মধ্যে মধ্যে দাঁড়িয়ে গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করে নিলে। কোন্ দিকে ক্যাণ্টোফার লেন। প্রথমে নিয়ে গিয়ে তুলেছিল ক্রিস্টোফার রোড-এ। সেখান থেকে ঘুরে ঘুরে এমন পল্লীর মধ্যে এলাম যে মনটা শঙ্কিত হয়ে উঠল। শুধুই বস্তি, বস্তি, বস্তি। সঙ্কীর্ণ পথ, বিচিত্র গন্ধ, বিচিত্র মানুষ। শুধুই মুসলমান! মুসলমান! মুসলমান!

আজ সত্য বলতে হ'লে বলতে হবে আমাদের সমাজের এমনি একটা সংস্কার বা শিক্ষা যাই হোক ছিল, যা আমার মনেও সেদিন ছিল, যে পরিমাণ ভয় ওই মুসলমান বস্তিতে পেয়েছিলাম সে পরিমাণ ভয় অনুরূপ হিন্দু বস্তিতে আমার হত না, অথচ ওই মুসলমান গাড়োয়ানটিই আমার ভরসা।

একবার তাকে হেঁকে বললাম—এ কোথায় নিয়ে এলে? ক্যাণ্টোফার লেন কতদূরে?

সে উপর থেকে ঝুঁকে আমাকে বললে—কিছু ভয় নেই খোকাবাবু, আমি ঠিক নিয়ে যাচ্ছি। আর এসে পড়েছি।

ঠিক এই সময়েই ডান দিকে একটা কাঠের পোস্টে লোহার প্লেটে লেখা দেখলাম ক্যাণ্টোফার লেন।

ক্যাণ্টোফার লেনের দুধারে মুসলমানদের বস্তি।

একেবারে লিণ্টন স্ট্রীটের মোড়ের দিকে প্রথম বাড়ি আমার মেসো-মশাইদের। বড় দোতলা বাড়ি। বাড়ির ফটকের পাশেই মার্বেল ট্যাবলেটে লেখা—শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—বি-এল, উকিল।

চীৎকার ক'রে বললাম—থামো, থামো।

চোদ্দ

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, আমার ছোট মেসোমশায় একটি দুর্লভ চরিত্রের মানুষ। যেমন রূপবান সৌম্য-দর্শন মানুষ তেমনি অন্তরের ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান। সহস্রের মধ্যেও বোধ করি এমন মানুষ মেলে না। স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাবে প্রভাবান্বিত দৃঢ় চরিত্রের লোক, অথচ শান্ত স্নিগ্ধ মধুর-ভাষী। একালে এমনি একটি মানুষ দেখেছি যুগান্তর দলের শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র-নাথ দত্তের মধ্যে। দু জনের মধ্যে রূপের পার্থক্য অনেক কিন্তু দু জনেরই দেখেছি—হাসলে যেন স্থানটিতে উত্তাপহীন আলো জ্বলে ওঠে। অথচ এই যুগেই রূপবান এক বিপ্লবী নেতাকে দেখেছি—হাসির মধ্যেও বাঁকা তরোয়ালের ধার, হাসিতেও মানুষকে আঘাত করবার প্রবৃত্তি। মানুষের সাধনার পার্থক্যে বোধ হয় এটা ঘটে থাকে।

এঁরা অর্থাৎ নগেন্দ্রনাথেরা ছিলেন আট ভাই। নগেন্দ্রনাথ ছিলেন মেজভাই। আমি যখন এঁদের ওখানে গেলাম তখন পাঁচ ভাই সংসার ও কর্ম জীবনে প্রবেশ করেছেন, তিন ভাই পড়ছেন। পাঁচ ভাইয়ের চার জন প্রতিষ্ঠাবান

তখন। বাড়িটিই প্রতিষ্ঠাবানের বাড়ি। একটি বিশেষ উচ্চমানের সংস্কৃতি এ বাড়িটিতে শক্ত ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এবং নগেন্দ্রনাথই ছিলেন এ বাড়ির কেন্দ্রমণি। বাহিরের উকিল হিসেবে খুব খ্যাতিমান উকিল না-হলেও করপোরেশন থেকে পাড়ার ছোট প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে তাঁর ছিল অন্তরের যোগ। চৈতন্য লাইব্রেরির সঙ্গে তিনি ঘনিষ্টভাবে যুক্ত ছিলেন। পাড়ার মুসলমানদের তিনি ছিলেন নির্ভরের স্থান, বিশ্বাসের পাত্র। তিনিই ছিলেন বাড়ির কর্তা।

বড় ভাই ছিলেন বড় কণ্ট্রাকটার। তখন তিনি থাকতেন রংপুরে। তৃতীয় ভাই ছিলেন খ্যাতিমান ডাক্তার। সিভিল সার্জেন হয়ে রিটায়ার করেছিলেন তিনি। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সময় তিনি ছিলেন ওখানকার সিভিল সার্জেন। চতুর্থ ভাই ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ইঞ্জিনীয়ার এবং ইনিও আমার এক মেসোমশায়। পঞ্চম ভাই তখন ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের ক্যাশ ডিপার্টমেণ্টে সদ্য ঢুকেছেন। পরে ট্রেজারার হয়েছিলেন। ষষ্ঠ ভাই এম-বি পড়ছেন তখন। তারপর জিতেন্দ্র। সে আমার থেকে কিছু বড়, সে তখন সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে। ছোট নৃপেন ইস্কুলের ছাত্র। এছাড়াও তাঁদের বাড়িতে অনেক ছেলে; তারাও পড়ে ইস্কুলে।

আর ছিলেন এঁদের মা। তিনি আমার দিদিমার বাল্যসখী। হাঁ, এই একটি মায়ের মতো মা দেখেছি। এমন ব্যক্তিত্বময়ী মহিলা খুব কম দেখা যায়। এবং তিনি ছিলেন এই রূপবান সন্তানদের যোগ্য জননী। তাঁর বাবা তখনও বেঁচে। কন্যা দৌহিত্রদের কাছেই থাকতেন! নাতিরা বলতেন— নানাদাদা। পাকা সোনার মতো গায়ের বর্ণ, ঠিক দাদামশায়ের মতোই স্থূলোদর নাদুসনুদুস পক্বকেশ। বৃদ্ধ প্রায় বড়াই করতেন—'দেখ-দেখ গায়ের রং। কখনও সাবান মাখি নি আমি।' নাতিদের সঙ্গে রসিকতা, রহস্যালাপ শুনবার মতো। সকালবেলা থেকেই বাড়িখানি আনন্দে উল্লাসমুখর হয়ে থাকত। সত্যকারের আনন্দের সংসার যাকে বলে তাই। এবং আজ সেই বাড়ির কথা লিখবার সময় এই কথাই মনে হচ্ছে যে, পুণ্য এবং ধর্ম না থাকলে আনন্দের সংসার হয় না। এ বাড়িতে ধর্ম ছিল, পুণ্য ছিল। মা ছিলেন সংসারে ধর্মের খুঁটির মতো। কোন অন্যায়, কোন অধর্ম, কোন অসত্যকে কখনও প্রশ্রয় দিতেন না তিনি। এবং এমনই দীপ্তিময়ী ছিলেন যে, কোন কারণে রুষ্ট হলেই অগ্নিশিখার মতো যেন জ্বলে উঠতেন। প্রতিষ্ঠাবান পুত্রেরাও ত্রস্ত হয়ে উঠতেন। ভীত হতেন না কেবল মেজ ছেলে নগেন্দ্রনাথ। প্রসন্ন হাস্যের সঙ্গে তিনি মায়ের সম্মুখীন হতেন এবং সকল উত্তাপ সকল দহন আত্মসাৎ করে নিতেন। মায়ের মুখ প্রসন্ন হত, হাসি ফুটত। বাড়িটিতে

ন্যায়পরায়ণতার এমন একটি মান আমি দেখেছি যাতে শুধু বিস্মিতই হই নি, সংস্পর্শে এসে লাভবান হয়েছি।

শুধু একটি ক্ষেত্রে অসংযম দেখেছি, সেটি প্রকাশ পেত তাঁদের সমালোচনার আসরে। মানুষকে সমালোচনা করতেন তাঁরা নির্দয়ভাবে। সহজে কাকেও স্বীকার করার প্রবৃত্তির যেন অভাব ছিল। নগেন্দ্রনাথের মধ্যে এ দোষও ছিল না। আমার দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন সর্বগুণান্বিত একটি পবিত্রাত্মা মানুষ।

পূর্বেই বলেছি স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাবে প্রভাবান্বিত চরিত্রবান মানুষ ছিলেন তিনি; উত্তর জীবনের তিনি দীক্ষাও নিয়েছিলেন বেলুড় মঠে। ভোর চারটের সময় উঠে প্রাতঃকৃত্য সেরে শাস্ত্রপাঠ করতেন। হিন্দু দর্শন, ইউরোপীয় দর্শনে পণ্ডিত ছিলেন। আবার রাত্রে এই আলোচনা ও পাঠ চলত নিয়মিতভাবে। অসাধারণ সহ্যগুণ, বিস্ময়কর বিবেচনাশক্তি।

একবার তাঁদের ভাইদের আসরে ইংরিজি সাহিত্য নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। ভাইরা ছাড়াও আরও আত্মীয় কয়েকজন আছেন। বাড়িতে দেশ-দেশান্তরের আত্মীয় বন্ধুদের জন্য দ্বার ছিল অবারিত, সমাদর প্রীতি ছিল অজস্র এবং অকপট। কেউ কখনও একটি কাঁটার স্পর্শ অনুভব করেন নি। সকলকে নিয়ে সন্ধ্যার আসর বসত। কোনদিন চলত রাজনীতির আলোচনা, কোনদিন সাহিত্যের, কোনদিন শিল্পের। ধর্মনীতির আলোচনা বড় বসত না, কারণ এক নগেন্দ্রনাথ ছাড়া সকলেই ছিলেন ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর সংযোগ-কালের বাস্তব-ন্যায়-মার্গী মানুষ। সে দিন এই আসরে মেরী করেলীর (যতদূর মনে পড়ছে) কোন উপন্যাসের কথা উঠল এবং সেই নিয়ে নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর এক ভাইয়ের মতভেদ ঘটল। নগেন্দ্রনাথ যা বললেন তাতে প্রতিবাদ করে তাঁর ভাই বললেন—না, ভুল হল তোমার। ওখানটায় তুমি যা বলছ তা নয়, সেটা হল এই।

নগেন্দ্রনাথ হেসে বললেন—না না, তুমি মনে করে দেখ। এই বটে।

ছোট ভাই বললেন—না। আমার স্পষ্ট মনে পড়ছে।

কয়েকবার বাদ-প্রতিবাদের মধ্যেই ভাই উত্তপ্ত হয়ে বলে উঠলেন—না। আমি যা বলছি, তাই ঠিক। এবং মন্তব্য করে বসলেন—বই পড়তে হলে পড়ার মতোই পড়া উচিত। এবং না নিশ্চিত হয়ে তর্ক করা উচিত নয়। বের কর বই।

ওঁদের বাড়িতেই একটি সুন্দর লাইব্রেরি ছিল। ইংরিজি, বাংলা, সংস্কৃত, উপন্যাস, ইতিহাস, দর্শনের বইয়ের সংগ্রহ ছিল এবং প্রতি মাসেই কিছু কিছু বই নিজে বাছাই করে কিনে আনতেন নগেন্দ্রনাথ। অন্য ভাইয়েরাও

দু-চারখানা আনতেন। একখানা ইস্‌্ বই ছিল, একজনের উপর ভার ছিল। চাবি থাকত নগেন্দ্রনাথের কাছে। বই বাড়ির লোকদের মধ্যেই আবদ্ধ থাকত, বাইরে যেত না।

সে সময়টায় মেরী করেলীর নাম খুব; তাঁর অনেক বই ছিল এঁদের লাইব্রেরিতে এবং আলোচ্য বইখানিও ছিল। ছোট ভাই বললেন—বের কর বই!

নগেন্দ্রনাথ বললেন—থাক। আজ থাক।

—না। থাকবে না। বের কর।

ভাই যেন সেদিন বেশী উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিলেন, ধৈর্য হারিয়েছিলেন। আমার যতদূর বিশ্বাস তাতে তাঁর মনের ভাব ছিল এই নগেন্দ্রনাথের উপরে এ সকল বিষয়ে পরিবারের সকলেরই এমনই গভীর শ্রদ্ধা ছিল যে তাঁর কথা ঠিক বিশ্বাস করছে না কেউ। এই কারণেই তিনি অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিলেন। তাই তিনি জেদ ধরলেন—বের কর বই। আন, চাবি আন আলমারির।

তিনি নিজেই উঠলেন।—কই চাবি?

নগেন্দ্রনাথও উঠলেন।—আনছি চাবি। বেরিয়ে গেলেন। এবং ফিরে এলেন—চাবি কোথায় গেল প্রশ্ন নিয়ে। কোথায় গেল চাবি? কে নিলে? তন্ন তন্ন করে খুঁজে চাবি পাওয়া গেল না।

চাবিটা তিনি নিজেই লুকিয়ে ফেলেছিলেন। যিনি এই লুকানো লক্ষ্য করেছিলেন তিনি আড়ালে তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন—নগেনদা, চাবিটা আপনি লুকোলেন কেন? আমি তো জানি, আপনি যা বলেছেন—তাই ঠিক। গোলমাল করে ফেলেছেন উনি!

নগেন্দ্রনাথ হেসে মৃদুস্বরে বললেন—এই উত্তেজনার মুখে বই বের করলে ও অত্যন্ত অপ্রতিভ হবে ভাই। সকলের সামনে কঠিন লজ্জা পাবে। সেই জন্যেই চাবিটা লুকিয়েছি। এর পর কাল বা পরশু ও নিজেই দেখবে এবং ভুল বুঝতে পারবে।

দিন দুয়েক পর চাবিটা পাওয়া গেল। পাওয়া গেল দশটার সময়। বাড়ির সকলে আফিস আদালত কলেজ ইস্কুল চলে যাবার সময় চাবিটা টেবিলের উপর রেখে দিলেন তিনি। যে ভাই তর্ক করেছিলেন তিনি তখন ছুটিতে, তিনিই একমাত্র থাকবেন বাড়িতে।

আর দু-একটি ঘটনার কথা বলব।

তাঁর মেজ ছেলে শচী। শচীন্দ্রনাথ। শুচ্যা ছিল আদরের নাম।

ষোলো-সতেরো বছরের শচীর হ'ল টাইফয়েড। এ অবশ্য অনেক পরের কথা।

টাইফয়েডে শচী ভুগেছিল আশি বা চুরাশি দিন। শচীর বিছানায় আশি দিন বসে তার সেবা শুশ্রূষা করে উঠলেন তিনি শচীর মৃত্যুর পর। নিজেই ব্যবস্থা করলেন সব। যেমন বাড়ির সকল কাজের ব্যবস্থা তিনিই করেন ঠিক তেমনি ভাবে।

আর একবারের কথা।

এ কথাটা আবার অনেক দিন আগের কথা। অর্থাৎ তখন আমার বয়স বারো বছর। তেরো বছরে আমার উপনয়ন হয়েছিল, আর আগের বছরে উপনয়ন হল আমার বড় মাসিমার ছেলের, রমাপতি দা'র। তাঁদের বাড়ি বর্ধমান জেলায় ধবণী গ্রামে। কবি ও গায়ক সাধক নীলকণ্ঠের বাড়ি যে ধবণী গ্রামে—সেই ধবণী। গেলাম এই উপলক্ষে। দুর্গাপুরে নেমে ক্রোশ পাঁচ-ছয় পথ। পথটার ক্রোশ আড়াই তিন দুর্গাপুরের জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড নয়, একেবারে খাঁটী বনপথ। দুপাশে চাকার দাগ, মাঝখানে ছোট ছোট শালের চারা, শতমূলী ও অনন্তমূলের লতা, চাকার দাগের দু'ধারে ঘন শাল বন। তিরিশ ফুট চল্লিশ ফুট উঁচু নিবিড় শালবন। বর্ধমান ছাড়িয়ে অণ্ডালের মধ্যে রেল লাইনের পাশে পাশে বিশাল এই জঙ্গলটি জঙ্গল নয়, সত্যিকারের বনভূমি। বর্ধমানের প্রান্তদেশ থেকে বাঁকুড়া মেদিনীপুর পর্যন্ত বিস্তৃত। বিখ্যাত ঝাড়খণ্ডের অরণ্যভূমের একাংশ। বাঘ-ভালুক আছে; মধ্যে মধ্যে ডোরাদার রাজকীয় মহিমান্বিতেরও আবির্ভাব হয়। এর চেয়েও বেশী ভয় ডাকাতের ঠ্যাঙাড়ের! আমরা ধবণীগ্রামে সকাল নটা-দশটায় পৌঁছুলাম, শুনলাম—অপরাহ্নে দুর্গাপুরে নেমে রাত্রি আটটা নাগাদ আসবেন ছোট মেসোমশাই এবং মেজমামা। আমার মেজমামা এই ক্যাণ্টোফার লেনের বাড়িতে থেকেই কলকাতায় পড়তেন। এ বাড়িতে তিনি বোন-ভগ্নীপতির বাড়ি বলে থাকতেন না, থাকতেন মাসির বাড়ি ব'লে। আমার দিদিমা—মায়ের মা এবং নগেনবাবুর মা বাল্যসখী, বাল্যজীবনে পাটনায় এক বাড়িতে এক সঙ্গে থেকেছেন, একটি নিবিড় প্রেমের সূত্রে দুজনে আবদ্ধ ছিলেন। এবং উত্তরকালে সাত কন্যার জননী সখী আমার দিদিমাকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করবার জন্যই সখীর শেষ দুই মেয়েকে তাঁর পুত্রবধূ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। কলকাতা থেকে মেজমামা এবং ছোট মেসোমশায় দুজনে আসবেন শুনে খুব খুশী হয়েছিলাম। সেই ছেলেবেলা থেকেই এই মানুষটিকে বড় ভালো লাগত আমার। শুধু আমার কেন, সকলেরই লাগত। এর উপরে ধবণীতে গিয়ে অত্যন্ত বিব্রত বোধ করছিলাম। ওখানের ছেলেরা, বিশেষ করে জয়ধর কি জয়চন্দ্র যাই হোক, জয়া নামে একটি ছেলে আমার পিছনে এমনি লেগেছিল যে উত্ত্যক্ত করে

তুলেছিল প্রথম দিনেই কয়েকটা ঘণ্টার মধ্যে। আমার অপরাধ আমি তার থেকে বয়সে মাস কয়েক কি এক বছরের ছোট হয়েও তার উপরে পড়তাম। মেসোমশায় এলে, তাঁকে আঁকড়ে থাকলে এ উৎপাত থেকে রক্ষা পাব, এই আশাতেই তাঁর প্রতীক্ষায় বেশি আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছিলাম আমি। সন্ধ্যা থেকে রাত্রি নটা পর্যন্ত প্রত্যাশা করে শেষে হতাশ হলাম। তাঁরা এলেন না। গাড়িও ফিরল না। ঘুমিয়ে গেলাম। সকালে উঠে শুনলাম রাত্রি প্রায় সাড়ে-বারোটা একটায় তাঁরা এসে পেঁাচেছেন। এবং বহু কষ্টেই পেঁাচেছেন। মাঝ বনের মধ্যে গাড়ির "লিখে" অর্থাৎ এ্যাক্সেল ভেঙে গিয়েছিল। রাত্রি তখন আটটা। গাড়োয়ান নিরুপায় হয়ে বলেছিল—বাবু মহাশয়েরা দুর্গা দুর্গা হরি হরি বলেন, আর আশপাশে খসখস শব্দ শুনলে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠেন। এ ছাড়া আর উপায় নাই। তারপরে সকাল হলে পর যা হয় হবে।

মেসোমশাই প্রশ্ন করলেন—কি হবে!

—দুর্গাপুর ইস্টিশানে হেঁটে যাব আমি, আপনারা থাকবেন বসে। লিখে কিনে আনব, মিস্ত্রী আনব, লিখে লাগাব, তারপর যাব।

—আর কোন উপায় হয় না?

—হয়। হেঁটে যেতে পারেন। কিন্তু লটবহর বইবে কে?

—তাও বলছি না। কোন রকমে—ওটাকে জুড়ে-টুড়ে নেওয়া যায় না? মেরামত হয় না?

—হয়। তায় অস্তর-টস্তর পাই কোথা?

—কি অস্ত্র চাই?

—দা' একখানা; আর ধরুন পেরেক হাতুড়ি। দড়িও চাই। তা অবিশ্যি খুলে টুলে নিলে হয়।

মেসোমশায় তৎক্ষণাৎ তাঁর ট্রাঙ্ক খুলে—একখানি উৎকৃষ্ট ধারালো দা' হাতুড়ি, পেরেক, একখানা বড় ছুরি দড়ি বের করে দিলেন।—নাও।

এবং দেশলাই বাতি বের করে বাতিটি জেবলে, কিছু পাতা ও শুকনো কাঠ কুড়িয়ে আগুন জেবলে বললেন—বল আর কি করতে হবে?

সেই রাত্রে জঙ্গলের একটি সরু শাল গাছ কেটে, ভাঙা লিখেটার নিচে জোড়া দিয়ে পেরেক ঠুকে, দড়ি বেঁধে নিয়ে রাত্রি সাড়ে-বারোটার সময় এসে পেঁাচেছেন।

এই ধরনের গোছানো মানুষ ছিলেন তিনি।

গোটা বাড়িটাতেই একটি পরিচ্ছন্ন গোছালো ভাব ছিল। বাড়ির প্রতিটি জিনিস নির্দিষ্ট স্থানটিতে থাকত, এবং একচুল এদিক ওদিক বেঁকেচুরে থাকত

না। বড় থেকে ছোট পর্যন্ত প্রত্যেকের কাপড় জামা ধবধবে পরিষ্কার থাকত। প্রত্যেকের নিজের গায়ে মাখা সাবান এবং কাপড়ের সাবান থাকত। গামছা রুমালে নিত্য সাবান দিতেন নিজে নিজে। প্রত্যেকের জুতোজোড়াটির পালিশ থাকত আয়নার মতো চকচকে। জামা কাপড়ে মহার্ঘতা ছিল না কিন্তু পরিচ্ছন্নতায় এবং শুভ্রতায় ছিল চোখ-জুড়ানো। শুভ্রতার উপর এঁদের বাড়ির একটা ঝোঁক দেখেছিলাম। নগেনবাবুদের পাঁচ ভাই যাঁরা তখন কর্মজীবনে প্রবেশ করেছেন—তাঁদের সকলের বয়স পঁয়ত্রিশের নিচে ; কিন্তু তাঁরা তখন থেকেই সাদা পাড় অর্থাৎ থান ধুতি ব্যবহার করতেন। এটি আমার নিজের খুব ভালো লাগত। আমার বাবার এই রুচি দেখেছিলাম। তিনি একচল্লিশ বছর বয়সে মারা গেছেন। আমার মনে পড়ে তিনিও এই থান ধুতি পরতেন। থান ধুতিতে আমার নিজেরও শখ ছিল বা আছে। এঁদের বাড়ির মহার্ঘতা ছিল জুতোতে এবং গেঞ্জিতে। এ দুটো তাঁরা বেশ দামী ব্যবহার করতেন এবং এ সবের উপর এমন যত্ন ছিল নিজেদের যা আমার সেই কিশোর মনকে মুগ্ধ করেছিল। ছেলে থেকে শুরু করে প্রাপ্তবয়স্ক উপার্জনশীলেরা প্রত্যেকে নিজের রুমাল গেঞ্জি গামছায় সাবান দিচ্ছেন, নিজের কাপড় নিজে কাচছেন, নিজের জুতো নিজে পরিষ্কার করছেন ; চাকর দূরের কথা, নিজেদের স্ত্রীর উপরেও এ কাজের বোঝা চাপাতেন না।

বাড়ির বধূরাও ছিলেন তেমনি। বধূ তখন ছ'জন, এম-বি পড়ছিলেন যিনি তিনি তখন সদ্যবিবাহিত। ছ'জনের মধ্যে দুই বধূ বিদেশে বিদেশবাসী ছেলের কাছে। বাকী চারজনের মধ্যে সদ্যোবিবাহিতা পিত্রালয়ে। তিনজন থাকতেন এখানে। তার মধ্যে দুজন ছিলেন আমারই মাসিমা। ভোর বেলা থেকে তাঁদের কাজ শুরু হত। সে কি শৃঙ্খলা, কি নিয়মানুবর্তিতা। কখন যে তাঁরা উঠে স্নান সেরে পরিচ্ছন্ন কাপড়খানি পরে আপন আপন কাজে লাগতেন আমি কোনদিন জানতে পারি নি।

সকালে উঠেই দেখতাম, গ্যাসের স্টোভে লুচির কড়াই চেপেছে, পাশে রয়েছে প্রকাণ্ড কেৎলী। ঘরের মধ্যে দিদিমা তরকারী কুটছেন। রান্নাঘরে বৃদ্ধ বেহারী মহারাজ রান্না চড়িয়েছে। বধূরা ঘড়ির কাঁটার মতো কাজ করে চলেছেন।

সাতটার মধ্যে সারি সারি বড় বড় পিঁড়ি বিছানো হয়ে গেল—বোধ করি কুড়ি-বাইশখানি। ছোট ছেলেদের বাদ দিয়ে, ভাইয়েরা এবং বাড়ির কুটুম্ব আত্মীয়েরা সব বসে গেলেন ; রেকাবীতে লুচি আলুভাজা নয় তো হালুয়া ডিম, তার সঙ্গে চা খাওয়া হয়ে গেল। খাওয়ার সময় দিদিমা এসে বসতেন। এটুকু ছিল যেন তাঁর জীবনধর্ম। কেউ খেতে না পারলে আপনি এসে কাছে বসতেন—খাও, নয় তো বল খাইয়ে দি।

আবার দশটায় একদফা পড়ত পিঁড়ির সারি।

আবার রাত্রি সাড়ে-নটা থেকে দশটার মধ্যে। রাত্রির খাওয়া ছিল এঁদের বিলাসের খাওয়া। প্রতিদিন মাংস ছিল বাঁধা বরাদ্দ।

এই বাড়িতে এসে পড়লাম।

এঁদের বাড়ির আর একজনের কথা না বললে অন্যায় হবে। তিনি এ বাড়ির মালিকদের মাতামহ। 'নানাদাদা'। নানা এবং দাদা দুটো কেমন ক'রে কোন্ নিয়মে কোন্ সমাস অনুসারে নানাদাদা হয়েছে সে বিশ্লেষণ থাক। 'নানাদাদা'ই তাঁর নাম, আসল নামটা চাপাই পড়ে গিয়েছিল। আমি যে কালে ওই বাড়িতে গিয়েছিলাম সে কালে কারুর কাছেই শুনতে পাই নি। নানাদাদা কর্মজীবনে পাটনায় থাকতেন, একটিমাত্র কন্যাই ছিল সংসারের বন্ধন, সেই বন্ধনে বৃদ্ধ তখনও বাঁধা আছেন, একটি আশি বছরের পরম দামাল শিশু।

কাঁচা সোনার মতো রং, শরতের সাদা মেঘের মতো সাদা হাল্কা চুল, মোটাসোটা মানুষ, এখনি হা-হা শব্দে হাসছেন, আবার পর মুহূর্তেই কোন নাতি বলছে, দেখুন তো নানাদাদা অন্যায়টা—; অমনি সঙ্গে সঙ্গে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছেন নানাদাদা—মহা অন্যায়! অত্যন্ত অন্যায়! আমাদের আমল হলে এর জন্যে হৈ-চৈ পড়ে যেত। পাজী-ছুঁচো বদমাশ কোথাকার!

তারপর তিনি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাতেন তার দিকে। বোধ হয় প্রশ্ন করতেন—কার বল তো? এবং কি অন্যায় বল তো?

নাম বললেই আর একদফা শুরু হ'ত। কেবলমাত্র মেজ নাতি অর্থাৎ নগেন্দ্রনাথের নাম করলেই তিনি হেসে বলতেন—না-না-না। মিথ্যে কথা, হতে পারে না।

তারপর রেগে উঠতেন অভিযোগকারীর উপরেই, বলতেন—মিথ্যে কথা বলছ তুমি? ঠাট্টা করছ আমার সঙ্গে?

খুব চটে উঠলে হাতের লাঠিটাও তুলতেন—মারব তোকে।

এ প্রায় সারাদিনই চলত। আনন্দের সংসার, কৃতী নাতির দল মাতামহটিকে ঘিরে আনন্দের তুফান তুলতেন। শুধু নাতিই নয়, নাতিদের ছেলেরাও সব বড় হয়েছে। বড় নাতির বড় মেয়েরও ছেলেপুলে হয়েছে। আরও দুটি মেয়ের অর্থাৎ নাতির মেয়েরও বিয়ে হয়েছে।

বৃদ্ধের আর একটি বাতিক ছিল। সাবান মাখা দেখলে তিনি চটে যেতেন। নিজের রং ছিল কাঁচা সোনার মতো, ওই অত পরিণত বয়সেও দেহের সে বর্ণে কোথাও এতটুকু মালিন্য পড়েনি। সেই রঙের দিকে দেখিয়ে

বলতেন—দেখ্, দেখ্, এই রং দেখ্! ও-রে সাবান মাখলে কেউ কখনও ফরশা হয় না। আমি কখনও সাবান মাখি নি। তবু দেখ্।

বিশেষ ক'রে কালো মানুষ সাবান মাখলে বেশী চটতেন। যতক্ষণ সে সাবান মাখত ততক্ষণ তিনি গালাগাল ক'রে যেতেন। সে আমলে ঢাকা ঘেরা স্নানের জায়গা অর্থাৎ বাথরুমের প্রচলন হয় নি। খুব বড় বা পুরো সাহেবী-ভাবাপন্ন বাড়ি ছাড়া বাথরুম থাকত না। বাঁধানো একটু উঁচু একটা প্রশস্ত চাতাল, তার সঙ্গে চৌবাচ্চা এবং কল, এই ছিল স্নানের জায়গা। ও বাড়িতে বারান্দার কোলে একফালি বাইরের উঠানেই ছিল স্নানের জায়গা এবং সামনেই বারান্দায় একখানি চৌকীর উপর ছিল নানাদাদার আসন। তখন অর্থাৎ পঁয়ত্রিশ বৎসর আগেও জীবনের মান এমন ছিল যে জীবনে বিস্ময় না মেনে উপায় থাকে না। ইলেকট্রিক লাইট ওঁদের বাড়িতে অনেক দিন থেকেই আছে, কিন্তু মাত্র খান কয়েক ছাড়া ফ্যান ছিল না। এখন ও বাড়িতে পাঁচ ছটা আধুনিক রুচিসম্মত বাথরুম এবং খান তিরিশেক পাখা হয়েছে। আরও অনেক কিছু—কিন্তু সে থাক। নানাদাদার কথা বলি। গরমের কয় মাসই আমি ছিলাম ও বাড়িতে—জুন মাস থেকে অক্টোবরের প্রথম অর্থাৎ পুজোর আগে পর্যন্ত। নানাদাদা একখানি তালপাতার পাখা হাতে বসে থাকতেন—মধ্যে মধ্যে বাতাস খেতেন, বাকী সময়টা হাতেই থাকত—রাগলে পাখা ছুঁড়েও মারতেন। খুব গরমের সময় নাতিদের ছোটরা বা নাতিদের ছেলেরা এসে পাখাখানি আত্মসাতের চেষ্টা করত। টেনে নিয়ে বলত, আমি হাওয়া করি।

সৌম্যদর্শন বৃদ্ধের মুখ প্রসন্ন হাস্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠত, বলতেন—তুই হাওয়া করবি? তার চেয়ে তুই বস্, আমি হাওয়া করি।

তাঁর হাতের পাখা এবার জোরে নড়তে শুরু করত। এবং নিজেই ঢুলতে শুরু করতেন। হাতের মুঠো আল্গা হত। অমনি দুষ্টবুদ্ধি বালকটি পাখাখানি সন্তর্পণে টেনে নিয়ে সটকাতো। কয়েক মিনিট পরে গরমে ঘেমে জেগে উঠতেন, চীৎকার করতেন—ও-রে সয়তান, ও-রে পাজী!

ছোট নাতি নৃপেন, সে প্রায় আমারই সমবয়সী তাকে বড় ভালোবাসতেন নানাদাদা। পূর্বেই বলেছি কালো মানুষ সাবান মাখলে চটতেন; কালো লোকের মধ্যে আমিও ছিলাম তবে আমি নতুন আগন্তুক আর সাবান মাখার খুব নেশা আমার ছিল না। আমার কাছে দেশের কথা শুনতেন এবং রহস্য করে মধ্যে মধ্যে বলতেন—হ্যাঁ-রে, অ প্রভার ছেলে, তোদের দেশে নাকি বড় রুই মাছের মাথা অম্বলে রেঁধে খাব? তেঁতুল-গোলা জলে সেদ্ধ ক'রে? আ-রে রাম রাম। তোদের পুকুরে বড় বড় মাছ আছে? বারো সের চোদ্দ

সের? এ্যাঁ? বলিস কি, আধমন পঁচিশ সের মাছও আছে? তাহলে আমি তোদের দেশে যাব একবার। ছিপে মাছ ধরব।

তাঁর যৌবনকালে ছিপে মাছ ধরার প্রবল শখ ছিল; সে শখ তাঁর বৃদ্ধ-বয়সেও যায় নি। বড় মাছের কথা শুনলেই বলতেন, যাব। আমায় নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিবি। তারপর দেখবি। পুকুরে একটা মাছও থাকলে সেইটাকেই ধরে নিয়ে আসব।

সঙ্গে সঙ্গেই ডাকতেন মেয়েকে। অ—!

মেয়ে এই সব দিক্‌পালের মতো ছেলেদের মহিমময়ী মা, হাসিমুখেই এসে দাঁড়াতেন, বুঝতেন অসময়ে বাপের আহ্বানে গিয়ে নিশ্চয়ই কোন অসম্ভব কিছু আবদার শুনবেন।

বাপ বলতেন—শুনেছিস প্রভার ছেলে কি বলছে? ওদের পুকুরে বড় বড় মাছ আছে। আমি যাব একবার। ওদের ওখান থেকে কীর্ণাহার ঘুরে আসব। বড় বড় মাছ ধরে আনব। কি বলিস?

—বেশ তো! প্রসন্ন হাস্যের সঙ্গে মেয়ে উত্তর দিতেন।

এই সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ ছিলেন এই আনন্দের সংসারের ধ্বজার মতো। বাইরেই বসে থাকতেন, বাড়িতে ঢুকে তাঁকে দেখলেই যে কোন আগন্তুকের মন প্রসন্ন এবং পুলকিত হয়ে উঠত। সংসার ছিল সুবৃহৎ। মেয়ের সাত ছেলে—তাদের ছেলে-মেয়ে। বিবাহিত মেয়েদের স্বামী-সন্তান। এই এত বড় সংসারে নানাদাদা যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন কোন অকল্যাণ ঘটে নি। বিয়োগবেদনার এক ফোঁটা অশ্রুও এ বাড়িতে ঝরতে পায় নি। অনেক কাল আগে একটি নাতি বাল্যকালে মারা গিয়েছিল। মেয়ের ছেলে আটটি, তার মধ্যে একটি নাই। আর তার আগে জামাই গিয়েছেন। এদের মৃত্যুর পরই নানাদাদা মেয়ের সংসারে এসেছেন। আগে নয়।

এমন মানুষ আমি জীবনে আরও দু-চারজন দেখেছি। যাঁরা নাকি এক একটি সংসারকে পরিপূর্ণ আনন্দময় করে রাখেন। এযুগ ভাগ্য-মানার যুগ নয়, পুণ্যের পুঁজির কথাও অচল, ও পুঁজি বাতিল রাজার আমলের নোট। সে হিসেবে একে নেহাতই আকস্মিক বললে বা কাকতালীয় ন্যায় বলে ব্যাখ্যা করলে বাদ-প্রতিবাদ করব না। তবে এ আমি দেখেছি। দেখার দার্শনিক মূল্য দাবি না ক'রে শুধু দেখাব সত্য হিসেবেই লিখছি। এই মানুষেরা যতদিন থেকেছেন ততদিন সংসারে আনন্দের হিল্লোল বয়েছে। পরিপূর্ণ থেকেছে সংসার।

নানাদাদা সেই বিরল ভাগ্যবান পুণ্যবান মানুষদের একজন, তাই বলছি, তাঁর কথা না বললে অপূর্ণ থাকবে এ কথা।

পনেরো

এবার ঘটনার কথা বলি।

প্রথম ও বাড়িতে নেমেছিলাম প্রায় ভোরবেলা। সকলেই অপরিচিত, চেনা মানুষের মধ্যে ছোট মেসোমশায় নগেনবাবু। আর দুই মাসিমা। পরিচয় দিয়ে হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে ছিলাম স্বাভাবিকভাবে। কিন্তু ওই বাড়িতে দূর দূরান্তর সম্পর্কের আত্মীয়ের আসা-যাওয়া খুবই সাধারণ ব্যাপার। ছেলেরা এতে অভ্যস্ত। চাকরেরাও তাই। ছেলেরাই আমাকে সমাদর ক'রে ঘরে নিয়ে গেলেন। কেউ কোন কথা না-বলতেই চাকরেরা বিছানা বাক্স তুলে নিয়ে দোতালায় যত্ন ক'রে রেখে দিলে। মেসোমশায় খবর পেয়ে বেরিয়ে এলেন তাঁর আপিস ঘর থেকে। পূর্বেই তাঁর সুন্দর চেহারা এবং সৌম্য প্রসন্নতার কথা বলেছি। হেসে বললেন—বাড়ির মধ্যে যাও। দিদিমাকে মাসিমাদের প্রণাম ক'রে এস। মুখ হাত ধুয়ে ফেল, চা খাও।

ওঁদের বাড়ির ছোট দুই ভাই জিতেন্দ্রনাথ এবং নৃপেন্দ্রনাথ আমার বয়সী। জিতেন্দ্রনাথ তখন সেকেণ্ড ইয়ারে উঠেছেন, কলেজের ছাত্র; নৃপেন ইস্কুলে পড়ে, বোধ করি সেকেণ্ড ক্লাসে; দুজনের মধ্যে কলেজী গোষ্ঠীর দাবিতে জিতেনের সঙ্গেই আলাপটা প্রথমেই জমে গেল। মেসোমশায় বললেন—জিতেন, তুমি তারাশঙ্করকে নিয়ে যাও, আগে তোমাদের কলেজে দেখ। চেষ্টা কর। যদি ওখানে না-হয় তবে যেখানে হোক ভর্তি করে দাও।

খেয়ে দুজনে দশটাতেই বের হলাম। আমার শরীর তখন অবসন্ন, চোখের পাতা ঘুমে যেন ঢুলে পড়ছে।

জিতেন বাড়ি থেকে বেরিয়েই বললেন—কলকাতায় তো এই প্রথম? না?

বললাম—আজ্ঞে হ্যাঁ।

সুতরাং জিতেন আমাকে কলকাতার সঙ্গে পরিচয় করাতে শুরু ক'রে দিলেন সঙ্গে সঙ্গেই। ওঁদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে অল্প খানিকটা গিয়েই বিজলী রোডের উপর একদিকে ট্রাম্‌ওয়ের পাওয়ার হাউস, অন্যদিকে সেই কৃশ্চানদের সমাধিক্ষেত্র যার মধ্যে "দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন"-এর সমাধি আছে। জিতেন দেখালেন। বললাম—চলুন দেখে আসি। মনে পড়ে গেল

তাঁর প্রসিদ্ধ কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তি। "দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব বঙ্গে।" কিন্তু দেখা হ'ল না। তখন ফটক বন্ধ ছিল।

ট্রামে উঠেই ঢুলতে শুরু করলাম। জিতেন কিন্তু দেখিয়েই চলেছেন। বলেই চলেছেন—এইটে হল জোড়া গির্জে। দুটো টাওয়ার!

কানে অস্পষ্ট শুনলাম, কিন্তু চোখ তুলে তাকিয়ে দেখতে পারলাম না। পরে জিতেন আমাকে বলেছিলেন যে তিনি সেদিন ভারী বিরক্ত হয়েছিলেন এই গোঁয়ো ছেলেটির গুমোর দেখে। সবই যেন তুচ্ছ—কিছুই দেখতে চায় না!

শেয়ালদা'য় খোঁচা দিয়ে ডেকে আমাকে নামতে বললেন। সে কালের ট্রামগুলি ছিল লোকাল ট্রেনের ঢংয়ের—পাশাপাশি সারি সারি আটটা-দশটা দরজা; প্রতি দরজায় ঢুকে মুখোমুখী দুখানা লম্বা বেঞ্চ, এ দিকের দরজা থেকে ও দিকের জানলা পর্যন্ত। রং ছিল হলদে। দরজার সামনে লম্বা ফুট বোর্ড। সে ট্রামের আর একখানাও এ আমলে দেখা যায় না। হাওড়ায় আছে।

বঙ্গবাসী কলেজে সিট পেলাম না। তবে আচার্য গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয়কে দেখলাম। জিতেন দেখালেন। একালে "বর্ধমান সম্মিলনী" ইত্যাদির কার্যকলাপে দেখি আচার্য গিরিশচন্দ্রের সুযোগ্য পুত্র অধ্যক্ষ শ্রীপ্রশান্ত বসুর নাম। ও'দের বাড়ি বর্ধমান জানলে সেদিন পাশের জেলা বীরভূমের লোক হিসেবে নিশ্চয় একটা দাবি জানাতাম।

ওখান থেকে রিপন, সেখান থেকে মেট্রোপলিটান। তখন এ কলেজগুলি ঐ নামেই পরিচিত ছিল; তখনও সুরেন্দ্রনাথ কলেজ বা বিদ্যাসাগর কলেজ নামকরণ হয়নি।

কোথাও সিট নেই। আমি এবার ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। তাহ'লে কি করব? ঘুম ছেড়ে গেল! আর হয় তো বহরমপুর ফিরে গিয়েও সিট পাব না। জিতেন বললেন, চলুন, সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে দেখি।

কোথা দিয়ে যে সেদিন সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে গিয়েছিলাম মনে নেই। তবে পার্ক স্ট্রীট মনে আছে। পার্ক স্ট্রীট তখন সত্যসত্যই পার্ক স্ট্রীট ছিল। দুপাশের ফুটপাথের উপর বড় বড় ঘন-পল্লব গাছ; পথখানি ছায়ায় ঢাকা। লোকজনের ভিড় নেই। এত বড় বড় ঝকমকে দোকানদানীরও তখন কিছুই ছিল না। চৌরঙ্গীর মোড়ে ছিল শুধু হল এ্যাণ্ড এ্যাণ্ডারসন। সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের সামনেটাও তখন অন্য রকম ছিল—বড় বড় গাছ; প্রায় একতলা সমান উঁচু সিঁড়ি ভেঙে কলেজ হলে ঢুকতে হ'ত। সামনে

ছিল প্রকাণ্ড বড় বড় কয়েকটা থাম। সেনেট হলের সামনের চেহারার সঙ্গে অনেকটা সাদৃশ্য ছিল। কলেজ হলে ঢুকে অবাক হয়ে গেলাম। সামনে চমৎকার থিয়েটারের স্টেজ। এবং হলের মেঝেটি সুন্দর মসৃণ কাঠের। পা পিছলে যায়। বঙ্গবাসী, রিপন বা মেট্রোপলিটান কোন কলেজের চেহারাই এমন আকর্ষণীয় নয়। সেই কারণেই মনে হল ওসব কলেজেই যখন জায়গা পাই নি তখন কি এখানেই জায়গা হবে?

হল্ পার হয়ে দক্ষিণ দিকের বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। সামনেই রেক্টরের ঘর, কলেজের আপিস। ওদিকে নিচে দক্ষিণে সুপ্রশস্ত সবুজ মাঠ। আজও মনে রয়েছে সেদিন আকাশে মেঘ ছিল না, দুপুরের রৌদ্রে সবুজ মাঠ ঝলমল করছিল। এবং সেই মাঠে ইউরোপীয় এবং এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছেলেরা ফুটবল খেলছিল। মাঠের দক্ষিণ দিকে জুনিয়র কেম্বিজ কোর্সের ইস্কুল ছিল তখন। মস্ত দোতালা বাড়ি। আর দেখলাম সাদা পাদরীর পোশাক প'রে একেবারে খাঁটী ইউরোপীয় ফাদারেরা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। একজনও দেশী অধ্যাপক দেখলাম না। প্রত্যেকেরই মুখে দাড়ি। জিতেন বললেন, এঁরাই প্রফেসর সব। রোম্যান ক্যাথলিক পাদরী। সত্য বলতে কি, ভড়কে গেলাম খানিকটা।

একটা গল্প মনে পড়ে গেল। আমাদের দেশে লাভপুরে তখন নতুন ইস্কুল হয়েছে। সেই ইস্কুলে এক গ্রাম্য পুরোহিত তাঁর ছেলেকে ভর্তি করতে নিয়ে এসেছিলেন। ছেলেটি বাপের সঙ্গে সারি সারি গোল থামওয়ালা প্রশস্ত বারান্দা অতিক্রম করে স্কুলের বড় হলে ঢুকে বাপের চাদরের খুঁট টেনে ধরে কাতরভাবে বলেছিল, বাবা! এতবড় স্কুলে আমি পড়তে পারব না বাবা! আমারও সেদিনের অবস্থা প্রায়ই সেইরকম হয়েছিল। দাঁড়িয়ে সেই কথাই ভাবছিলাম। ঠিক তখনই জিতেন আপিস ঘর থেকে ফর্ম এনে বললেন, এখানে সিট আছে! নিন ফিল্ আপ করুন।

তখন ফাউণ্টেন পেনের আমল নয়। কিন্তু জিতেনদের বাড়িতে ফাউণ্টেন পেন ছিল কলেজে ভর্তি হওয়ার অধিকার অর্জনের পুরস্কার। সোয়ান পেন আর পকেট-ঘড়ি। আমিও বিয়ে উপলক্ষে পেয়েছিলাম একটি ব্ল্যাকবার্ড পেন। কলেজের হল্‌টি অভিনয়ের সময় হত প্রেক্ষাগার, অন্য সময়ে ওইটিই ছিল কমন রুম। প্রকাণ্ড বড় একখানা কালো-বার্নিশ টেবিলের পাশে অনেক-গুলি চেয়ার। সেইখানে এসে ফর্ম পূরণ ক'রে টাকা হিসেব ক'রে জমা দিয়ে ভর্তি হয়ে বাড়ি ফিরলাম। আমার রোল নাম্বার হ'ল ১১৭।

আমার সঙ্গেই বেরিয়ে এল আরও দুটি ছেলে। একজনের নাম্বার ১১৬ একজনের ১১৮। সুশীল আর অনাথ। সেণ্ট জেভিয়ার্সে তখন নাম্বার

অনুযায়ী বসবার নিয়ম ছিল। মনে হচ্ছে বেঞ্চে ও হাইবেঞ্চে নাম্বারগুলিও লেখা থাকত। আমার দুপাশের দুজন সহপাঠীর সঙ্গে প্রথমেই আলাপ হয়ে গেল। বেশ শক্ত সমর্থ দেহ। তারা দুজনেই এক ইস্কুল থেকে পাস ক'রে এসেছে। ঠিক মনে পড়ছে না—মুরশিদাবাদ বা ওই অঞ্চলের ছেলে।

এরপর সমস্যা, কোথায় থাকব? সেণ্ট জেভিয়াসে'র তখন কোন হোস্টেল ছিল না। অথচ তখন প্রথম মহাযুদ্ধের আমল, ইণ্ডিয়া ডিফেন্স এ্যাক্ট্ পাস হয়েছে। বিনা বিচারে আটকের ব্যবস্থা। কলেজের ছাত্রদের উপর কড়া নজর। পুলিশের নির্দেশে—কলেজ কতৃপক্ষ যে কোন মেসে বা বোর্ডিংয়ে থাকা অনুমোদন করেন না!

মেসোমশায় এবং দিদিমা বললেন—যতদিন তেমন ভালো মেস বোর্ডিং না হয় এখানেই থাকবে তুমি।

সেণ্ট জেভিয়াস' কতৃপক্ষ অবশ্য শীঘ্রই বোর্ডিং মেস খুলবেন।

এই কারণেই সেণ্ট জেভিয়াসে' বাইরের ছাত্রের ভিড় কম। সিট তখনও খালি।

রাস্তায় খানকয়েক একসারসাইজ বুক এবং একটা কপিং পেনসিল কিনে দিলেন জিতেন।

ষোলো

সেণ্ট জেভিয়াসে' আমার কলেজ-জীবন মাত্র মাস কয়েক।

এ কয়েক মাসের মধ্যে কলেজ কতৃপক্ষ কোন হোস্টেল খুলতে পারেন নি, কোন মেসও না। তাই এই কয়েক মাস ইট্‌লিতে মেসোমশায়দের বাড়িতেই থেকে গেলাম।

সেণ্ট জেভিয়াসে' অধ্যাপকেরা সকলেই ছিলেন ইউরোপীয়। এ'দের মধ্যে ফাদার পাওয়ার, ফাদার কারবেরীকে মনে আছে। ও'রা দুজনেই ইংরিজির অধ্যাপক ছিলেন। আর একজন ছিলেন বেলজিয়ান-ফাদার। তাঁকে মনে পড়ে কিন্তু নাম মনে নেই। আর অতি অল্প বয়স, মাথার চুল লালচে, ফুরফুরে সদ্য-ওঠা দাড়ী গোঁফ, বোধ করি নাম ছিল ফাদার লালেমো, ছেলেরা তাঁর নাম দিয়েছিল লালমোহন। ছেলেদের সঙ্গে তাঁর ভারি ভাব ছিল। বাইশ থেকে চব্বিশের মধ্যে বয়স, জীবনে তারুণ্যের চঞ্চলতা গোপন রাখতে পারতেন না।

ক্লাসে প্রায় ১৬০।১৭৫ জন ছেলে। কলকাতায় বাসিন্দাদের ছেলেই বেশি। তাদের কলকাত্তাই চালের কাছে আমরা সন্ত্রস্ত কোণ-ঘেঁষা হয়ে থাক্‌তাম।

এক নম্বর রোল ছিল যার তার নাম হালিম। ওই পার্ক স্ট্রীট সারকুলার রোড জংসনের কাছাকাছি বাড়ি। এক মুসলমান ব্যবসায়ীর ছেলে। যত উগ্র তত মুখর ছিল এই ছেলেটি। আমরা এর থেকে সভয়ে দূরে থাকতাম। সে সিঁড়ি উঠত দড়বড় শব্দ তুলে, নেমে যেত এমনি শব্দ তুলে; মধ্যে মধ্যে ক্লাসরুমের কাঠের মেঝেতে জুতো ঘষত।

আর একজন ছিল, ক্লাসের মধ্যে রূপের দীপ্তিতে সব চেয়ে উজ্জ্বল, প্রাণচাঞ্চল্যে সব চেয়ে চঞ্চল অথচ মিষ্ট ছেলে, তার নাম ছিল সঞ্জীব। ছেলেটি কোন কর্মেই তেমন কর্মঠ ছিল না কিন্তু সকল কর্মেই প্রাণপ্রাবল্যে, উৎসাহের উল্লাসে সকলের আগে এসে স্থান ক'রে নিয়ে দাঁড়াত। অভিজাত বংশের রক্ত ছিল তার দেহে। পাইকপাড়ার কুমার অরুণ সিংহের ভাগ্নে ছিল সে। নিত্য নূতন জামা প'রে চমৎকার একখানি সাইকেলে চড়ে কলেজে আসত। থাকত খুব কাছেই, হ্যারিংটন স্ট্রীট কি হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীটে তখন কুমার অরুণ সিংহ থাকতেন। দুপুরে টিফিনের সময় কলেজের পিছন দিকে ফুটবল গ্রাউণ্ডে কলেজের ছেলেরা ফুটবল খেলত। জন কয়েক পুরানো ছাত্র, নিয়মিত-খেলোয়াড় ছাড়া নতুন ছেলেদের ভিড় জমে যেত। এক একদিন জন কয়েক ক'রে খেলার সুবিধে পেত। কিন্তু সঞ্জীব, নতুন ছাত্র হলেও এবং খেলোয়াড় হিসেবে তার কোন পারঙ্গমতা না-থাকলেও নিজের স্থানটি সে নিত্যই করে নিত অবলীলাক্রমে। সে হিসেবে সে ছিল নিত্যকার টোয়েন্টিথার্ড ম্যান। এবং নিত্যই জুন-জুলাই-আগস্ট মাসের ভিজে মাঠে একটি বা দুটি বা চারটি আছাড় খেয়ে জামার সর্বাঙ্গে কাদা মাখিয়ে ঝাঁ ক'রে বাইসিক্ল চড়ে বাড়ি গিয়ে আবার পরিচ্ছন্ন পোশাক প'রে কলেজে ফিরে আসত মিনিট দশেকের মধ্যেই। সঞ্জীবের বাড়ি ছিল আমাদের ওদিকেই। আমদপুর-কাটোয়া লাইনে ধাঁধলসা স্টেশন পত্তন সঞ্জীবের বাড়ির চেষ্টাতেই হয়েছিল। সঞ্জীবের ভগ্নীপতি ছিলেন ম্যাকলাউড কোম্পানীর রেলওয়ে বিভাগের সর্বময় কর্তা।

আর একজন ছিলেন, তাঁর নাম গোপনই করব, করে বলব নিত্য রায়, মধ্যে মধ্যে বয়েজ স্কাউটের দলের স্কাউটের পোশাক পরেই কলেজে আসতেন; কলেজের শেষে স্কাউট দলে যোগ দিতে চলে যেতেন। চলায়-ফেরায়, কথায়-বার্তায় অমন অহেতুক স্মার্ট ছেলে আর আমি দেখি নি। সে তখন থেকেই নিটা রে। নিত্য থেকে 'নিটা' বলে ডাকলেই খুশী হত।

চট করে ঘাড় ফিরিয়ে হেসে বলত—ইয়েস্‌। র-শেষান্ত কথাগুলোর

'র' উচ্চারণটা তখন থেকেই সে মুছে ফেলেছিল। হিয়ারকে বলত হিয়া—, স্যারকে বলত সা—।

নিত্য রায় কিন্তু উত্তরজীবনে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। ভালো চাকরি করে। এর আট ন বছর পর আমি কানপুরে গিয়েছিলাম আমার শ্বশুরকুলের ঠ্যালায়। তাঁরা তখন আমাকে কয়লা-ব্যবসায়ী বানিয়ে তুলবার জন্য বদ্ধপরিকর। সেই সূত্রে কানপুরে থাকি এবং ওদিকে কানপুর ওয়াটার ওয়ার্কস এবং এদিকে রেলওয়ে স্টেশনে ছুটোছুটি করি। সেই সময় নিত্য রায়কে স্টেশনে রেলের কোন বিভাগে পদস্থ কর্মচারী হিসেবেই দেখেছিলাম। একলা একটা বড় ঘরে বড় টেবিলে নিটা রে বসে কাজ করত। বাইরে আর্দালী থাকত। আমি দেখেই তাকে চিনেছিলাম। মোটা একটু লেগেছিল কিন্তু চেহারার কোন পরিবর্তন হয় নি। তবুও সন্দেহ একটু হ'ত বই কি! একদিন সন্দেহ ঘুচে গেল। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছি শুনতে পেলাম ভিতরে টেলিফোনের ঘণ্টা বাজছে। ঘণ্টা থামল। সঙ্গে সঙ্গে শুনলাম—নিটা রে।

—ইয়েস, ইয়েস। নিটা স্পী-ই-কিং!

ঘুচে গেল সন্দেহ। বুঝলাম এই সেই নিত্য।

এরপর আরও দু-চার জায়গায় দেখা হয়েছে। শেষবার বোধ হয় ১৯৩৯।৪০ সালে অধ্যাপক নির্মল বোস, আমি এবং সুধীর রাহা তিন জনে গিয়েছিলাম দুমকা বেড়াতে। পুজোর ঠিক পরেই। আমদপুরে দেখি নিত্য রায়। ফার্স্ট ক্লাস থেকে নেমে আমাদের সঙ্গে বাসে সঙ্গী হয়ে চড়ে বসল। আমি চিনলাম। নিটা রে আরও খানিকটা মোটা হয়েছে। সিউড়ীতে আমাদের সঙ্গেই নামল। নির্মলবাবুকে আমি বললাম নিত্যর কথা। আমার তিন মাসের কলেজ-জীবনের ক্লাস ফ্রেণ্ড।

নির্মলদা বললেন—আলাপ করব?

বললাম—করুন না।

নির্মলদা আলাপ করলেন এবং এসে আমার স্মৃতিশক্তির তারিফ ক'রে বললেন—হ্যাঁ, হি ইজ মিস্টার নিটা রে। ই. আই. আর.-এর কর্মচারী। চলেছেন আমদপুর-সিউড়ী-দুমকা-ভাগলপুর বাসের প্যাসেঞ্জার কেমন হয় দেখতে। আলাপ ক'রে জিজ্ঞাসা করলাম—মশায়ের নামটি জানতে পারি? বললেন—এন্ রে। আবার বললাম—এন্ রে? পুরো নামটি কি বলুন তো। এবার ভুরু কুঁচকে বললেন—নিটা রে। বললাম—ইউ মিন নিত্য রায়! বললেন—ইয়েস, নিটা রে। এ সব হল আমদপুরে। সিউড়ীতে নেমে নিত্য কিন্তু সকলকে স্তম্ভিত ক'রে দিলে তার স্মার্টনেসে। উনিশশো চল্লিশ সাল, ইংরেজ রাজত্বের

শেষ জৌলুষ তখন পুলিশি প্রচণ্ডতায় তৈলহীন দীপের উস্কে-দেওয়া পলতের আলোয় লাল্‌চে এবং কাল্‌চে হয়ে জ্বলছে। তার উপর এর আগেই সিউড়ীতে সদ্য সদ্য পার হয়েছে স্বনামকুখ্যাত দোহা সাহেবের আমল। লোকের অন্তরে যাই থাক, বাইরের দেওয়ালে রাজার ছবি প্রায় সব ঘরেই শোভা পায়। সিউড়ী-আমদপুর-সাঁইথিয়া-দুমকা বাস সার্ভিসের আপিস-ঘরের দেওয়ালেও ষষ্ঠ জর্জের ছবি টাঙানো ছিল। ঘরে ঢুকলেই সামনে পড়ত। বাস সার্ভিসের মালিক ভূপেনদা আমার বন্ধুস্থানীয়। আমরা ঘরে ঢুকলাম। ও বেলা দুমকার বাসের টিকিট কিনব। রায়ও ঘরে ঢুকল। ঢুকেই টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে ছবিখানার দিকে আঙুল দেখিয়ে ইংরেজিতে বলে উঠল—এই যে ভদ্রলোক, ও'র সঙ্গে ল্যাণ্ডনে বাকিংহাম প্যালেসে এক টেবিলে ডিনার খাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তখন উনি অবশ্য ছিলেন প্রিন্স্‌ অব্‌ ওয়েলস্‌।

নিটা রে স্কাউট হিসেবেই বিলেত গিয়েছিল এবং সেই হিসেবেই প্রিন্স্‌ অব্‌ ওয়েলসের নিমন্ত্রণ পেয়েছিল, সে সব কথাই সে সেখানে শুনিয়ে দিলে।

আর একজন—তিনিও সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে, বাড়ির গাড়িতে চড়ে আসতেন। চমৎকার চেহারা। বড় শান্ত মানুষ, মধুর প্রকৃতি। কোঁকড়া চুল, মাঝখানে সিঁথি, গৌরবর্ণ রং। তাঁর সঙ্গে দুবছর পরে তখনকার মেট্রোপলিট্যান কলেজে দেখা হয়েছিল। নাম তাঁর মনে নেই।

আমাদের দেশের আশু দাসও সেণ্ট জেভিয়ার্সে পড়ত। লাভপুর ইস্কুলেরই ছাত্র। তাকেও পেলাম এখানে। তাকে পেয়েই ক্লাসের ছেলেদের সঙ্গে আলাপের চাহিদাটা কমে গেল। আশু পরে পুলিশে চাকরি নিয়েছিল, শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীটে একটা হাতখানেক লম্বা পায়ের ছাপ ওই আশুই আবিষ্কার করেছিল।

(এরা ছাড়া নিবিড় আলাপ হ'ল আমার দুপাশের দু'জনের সঙ্গে। সুশীল আর অনাথ।) সুশীল লম্বা, অনাথ মাথায় একটু খাটো। কিন্তু দুজনেই সবল দেহ। ব্যায়াম-করা পেশীসবল শরীর। দু'জনেই একজায়গার ছেলে। এক ইস্কুল থেকে পাস করেছে। বাসা দু'জায়গায় কিন্তু থাকে প্রায় একসঙ্গে অহরহ। কলেজে তাদের দু'জনের মধ্যে আমি ছেদের সৃষ্টি করি। অন্যের সঙ্গে কথা বলে কম। আমার সঙ্গে কথাবার্তা বাধ্য হয়েই বলতে হ'ত। সেই বাধ্যতার মধ্য দিয়েই আলাপ ধীরে ধীরে গাঢ় হয়ে উঠতে শুরু করল। টিফিনের সময় কলেজের একদল ছুটত ফুটবল গ্রাউন্ডে, একদল ফুটপাথে। ওদিকে ওয়েলেসলী পার্ক স্ট্রীটের জংসন, তার ওপারে

এ্যালেন গার্ডেন। এদিকের ফুটপাথে ছড়িয়ে ঘুরে বেড়াত। আমি বেশির ভাগ খেলাই দেখতাম। খেলতে খানিকটা পারতাম, এক সময়ে মোহনবাগানিয়া-বীর-পদবী লাভের লোভ ছিল মনে মনে, কিন্তু তবুও মাঠে নামতে পারতাম না। সে ওই সঞ্জীবের মতো সকল কাজে এগিয়ে দাঁড়াবার দুঃসাহস যাদের আছে তারাই পারে। বাইশ জনের খেলা বত্রিশ জনে মিলে খেলতে ভালো লাগত না। মধ্যে মধ্যে এ্যালেন গার্ডেন-এ এসে বসতাম। অনাথ সুশীল এখানে একখানি বেঞ্চ অধিকার করে বসে থাকত। কথাবার্তা বলত। ওদের কাছে বসলে ওরা খুব খুশী হ'ত না।

হঠাৎ আলাপটা একদিন জমে গেল আমার খাতার পাতায় লেখা একটি কবিতা উপলক্ষ করে। আমাদের লাভপুরে অতুলশিব লাইব্রেরিতে মাসে মাসে সাহিত্যসভা হ'ত। সেখানে পাঠাবার জন্য কবিতা লিখেছিলাম। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার অনুকরণ। প্রথম লাইন দুটো আজও মনে আছে—

"বাস করে যারা কেউটে তাড়িয়ে সোঁদর বনের শেলেদা বাঘ।
ভেতো সে বাঙালী ভীতু সে বাঙালী-জাতির কপালে পড়েছে দাগ।"

তারা পড়ে খুব খুশী। বললে—তোমার লেখা?

বললাম—হ্যাঁ।

—নকল ক'রে নেব এটা!

তখন এমন অহঙ্কার ছিল না যে কবিতাটা মারা যেতে পারে। তখন ধারণা ছিল খুব পণ্ডিত অথবা বেশ বড় লোক না হ'লে কাগজে লেখা সহজে ছাপা হয় না। অথবা বেশ বড় লোকের পৃষ্ঠপোষকতা থাকা চাই। আপত্তি করলাম না। তারা নকল ক'রে নিয়ে গেল। দিন কতক পর নিজেরাই একটা কবিতা চাইলে। বললে—কই নতুন পদ্য কই?

কবিতার তখনও পদ্য নাম চলতি ছিল। চোদ্দ অক্ষরের চলতি খুব কমে গিয়েছে। ত্রিপদীর প্রথম দুই পদের মিলের হাঙ্গামা ঘুচিয়ে তাকে সোজা-লাইনে সাজিয়ে কাব্যরচনাই তখন বেশী চলেছে এবং চলতির জন্য সোজাও মনে হ'ত। কলেজে দুই পাশে এমন কাব্যোৎসাহী দুই বন্ধুকে পেয়ে উৎসাহ অনুভব করলাম। একটি কবিতা রচনাও করা ছিল আগামী মাসে লাভপুরের সাহিত্যসভার জন্য। কবিতাটির নাম ছিল—"খোকার ত্যাগ।" একটি খোকা তার সদ্য মাতৃহীন বন্ধুর সঙ্গে খেলা করতে গিয়েছিল, কিন্তু বন্ধু কেঁদেছে, বলেছে কাল রাত্রে তার মা যে কোথায় চলে গেছে খুঁজে পাচ্ছে না; সেই কারণে তার আর কিছুই ভালো লাগছে না, সে খেলতে পারবে না। এ খোকাটি ক্ষুণ্ন হয়ে বাড়ি ফিরে নিজের মাকে বলছে, ওর মা কোথায় গিয়েছে তুমি খুঁজে এনে দাও। মায়ের চোখে জল এল, তিনি বললেন—

ওরে পাগল, ওর মা যে স্বর্গে গেছেন, অনেক দূর। কি ক'রে ডেকে আনব তাঁকে? তা হ'লে আমাকেও খুঁজে পাবি নে তুই। খোকা মায়ের মুখের দিকে বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে—না, তা হ'লে তুমি খুঁজতে যেয়ো না। কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে এস। ওই খোকাকে ডেকে নাও! ওর চোখ মুছিয়ে কোলে নাও। আমি হেঁটেই আসব। ও আমাদের বাড়িতেই থাকবে। মাগো, আমার মায়ের ভাগ আমি ওকে দেব। শেষ দুটো লাইন ছিল—

"ওরই দিকে নয় মুখ রেখে শোবে, আমি করব না রাগ,
সত্যি বলছি—আমি ওকে দেব আমার মায়ের ভাগ।"

আমার ভালো লেগেছিল কবিতাটি। দিলাম ওদের। কিন্তু ওদের ভালো লাগল না। বললে—সেই রকম পদ্য লেখ। সেই দেশের কথা নিয়ে। সেই ধরনের পদ্য চাই।

তখন বোধ হয় আগস্ট মাস, পুজো আসছে সামনে। সে কালে পুজোর সময় সাহিত্যের আসরে আগমনী কবিতার স্থান ছিল প্রথমেই। বাংলা দেশের প্রাচীন সংস্কৃতির ধারাটি জাতীয়তাবাদের কল্যাণে পুনরুজ্জীবিত হয়ে তখন প্রবল এবং গভীর ধারায় প্রবাহিত হ'ত। এ কালে ইজমে'র স্রোতের ধাক্কায় বালির চড়া পড়ে সে খাত মজে এসেছে। লোকসঙ্গীতের ধুয়োকে যাঁরা প্রবল ক'রে তুলতে চাচ্ছেন তাঁরা শারদীয়া পূজাকে উচ্চবিত্ত এবং সম্পন্ন মধ্যবিত্তের উৎসব বলে এবং এর মধ্যে আধ্যাত্মিকতা "ব্যাধি"র বীজাণু আছে বলে আগমনী সঙ্গীতকে পরিহার করেছেন এবং কলকাতা শহরে এখন হাজার দরুণে বারোয়ারী দুর্গা পূজা গজিয়ে ওটা সত্ত্বেও আগমনীর পাতা সাহিত্যপত্রিকা থেকে আজ উঠে গেছে। কিন্তু বাংলা দেশের লোকসমাজে আজও শরৎকালের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই বাউল-বৈরাগীরা একতারা, ডুব্‌কী, বাঁয়া, মন্দিরা, গাবগুবাগুব বাজিয়ে গৃহস্থের দুয়ারে বাজারে হাটে হাজির হয়ে গাইতে শুরু ক'রে দেয়—

"গিরি—গৌরী আমার এসেছিল।
স্বপ্নে দেখা দিয়ে মা-মা বলিয়ে
স্বপ্ন ঘোরে আবার কোথা লুকাইল।"

মানুষেরা আজও পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। সেই আগেকার কালের মতোই ওঠে। অভাব-অভিযোগ রোগ-শোক অপার বেদনারও পারে এসে পেঁছয় তারা। এবং বুক বেঁধে ভক্তিশুদ্ধ চিত্তে পূজার প্রত্যাশা করে। এইখানেই এ উৎসব হয়ে ওঠে সার্বজনীন। এবং বাংলা দেশে যদি সর্বজনীন উৎসব বলে কোন উৎসব পার্বণ থাকে, তা এই শারদীয়া উৎসবই। ধনী

মধ্যবিত্তের সাধ্য কি যে এ পার্বণের ভাবানুভূতিকে নিজেদের নাট-মন্দিরের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখে। শুধু ধনী দরিদ্রের মধ্যেই এ পূজা আবদ্ধ নয়, রাঢ় বঙ্গে হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায় নির্বিশেষে সম্প্রসারিত। সেকালে কিন্তু এর প্রভাব সাহিত্যে প্রবলভাবেই পড়ত। আমি সেই উপলক্ষ করেই "আগমনী" কবিতা লিখেই ওদের হাতে দিলাম। প্রথম জার্মান যুদ্ধ তখন প্রবলভাবে চলছে। সেই সুরও এসে পড়েছিল।—

"মাগো, আর একবার নাচতে হবে।
ওদের দেশে নাচিস মাগো তা থৈ তা থৈ,
মোদের দেশে নাচবি কবে?
সত্যি রূপে হোথায় গেলি,
মিথ্যে সেজে হেথায় এলি,
আঁকা তিনটে চক্ষু মেলি রইলি চেয়ে,
পলক ফেলে জাগ্ মা ভবে।"

ওরা এ কবিতা পেয়ে মহানন্দে নেচে উঠল। বললে যে, এ কবিতা তারা হাতে লিখে বা ছেপে বিলি করবে। কবিতা ছাপা হয়েছিল প্রীতি-উপহারের মতো। কিন্তু তাতে আমার নাম ছিল না। এতে দুঃখ হয়েছিল। ঠিক ব্যাপারটা বুঝতে পারি নি তখন। এরপর নিত্যই এ্যালেন গার্ডেনে বসে আমাদের কাব্যচর্চা চলত। ওদের কাছ থেকে কিছু কিছু বইও পেয়েছিলাম। সখারাম গণেশ দেউস্কর, স্বামী বিবেকানন্দের বই। স্বামীজীর বই আমি লাভপুরেই পড়েছিলাম। তবুও আবার পড়লাম। আরও কিছু কিছু বই পড়েছিলাম। একদিন আমাকে ওরা নীলচে ধরনের মলাট দেওয়া একখানি বই দিয়ে বললে, এখানা তোমাকে প্রাইজ দিয়েছেন আমাদের এক দাদা। তোমার ভালো পদ্যের জন্যে দিয়েছেন। বইখানির মলাটে ঠিক মাঝখানে তেরচাভাবে বেশ টানা হাতের লেখার মতো হরফে সোনার জলে লেখা "বন্দেমাতরম"। খুলে দেখলাম, স্বদেশী গানের বই। সে আমলের সমস্ত স্বদেশী গানই তার মধ্যে ছিল। বইখানি অনেক যত্নে রেখেছিলাম। কিন্তু উনিশশো তেত্রিশ-চৌত্রিশে বীরভূমে ওই দোহা সাহেবের বীরভূম কনস্পিরেসী কেসের আমলে অনেক বইয়ের সঙ্গে ওখানিকেও উই পোকার মুখে শেষ হতে দিতে হয়েছে। তখন বাড়ি কবে সার্চ হবে তার কোন ঠিক নাই। তাই নেহাৎ নিরীহ ধরনের বই কিছু রেখে বাকী সবই আমার এক পিসতুত ভাইয়ের খালি বাড়িতে বাক্সবন্দী ক'রে রেখেছিলাম। আমি রাখি নি, রেখেছিলেন আমার কথামতো আমার বাড়ির লোকে। আমি তখন সাধ্যমতো বীরভূমের বাইরে বাইরেই থাকি। তাঁরা কাঠের প্যাকিং বাক্সে বইগুলি পুরে ও বাড়িতে

রেখেছিলেন। তার ওপর ঢাকা দিয়েছিলেন ঘুঁটের স্তূপ। পরে যখন ঘুঁটের স্তূপ সরানো হ'ল তখন কাঠের বাক্সটি একটি উই ঢিপিতে পরিণত হয়েছে। ভেঙে পাওয়া গিয়েছিল প্যাকিং কেসের কয়েকখানা পাতলা কাঠ, কিছু আধ-খাওয়া-মলাট এবং আধ-খাওয়া কিছু কাগজ।

একদিন ওদের সেই দাদাকে দেখলাম।

মধ্যে মধ্যে এক একদিন ওদের এক একজন, কখনও বা দু'জনই এ্যালেন গার্ডেনে অনুপস্থিত থাকত। বলত—একটু কাজ ছিল।

একদিন অনাথ ছিল, সুশীল ছিল না। তার কাজ আছে। আমি এবং অনাথ বসে আছি, কথা বলছি, এমন সময় সুশীল ফিরে এল। বললে—ওঠ, তারাশঙ্কর!

—কোথায়?

—এস না।

অনাথ কোন প্রশ্নই করলে না। তিনজনে পূর্বমুখে সারকুলার রোডের দিকে হেঁটে চললাম। সারকুলার রোড জংসনের একটু আগে পার্ক স্ট্রীটের দুই পাশে প্রাচীন কালের কয়েকটি কবর স্থান। সেইখানে নিয়ে গেল। তখনকার পার্ক স্ট্রীট স্বতন্ত্র পার্ক স্ট্রীট ছিল। বড় বড় গাছ দুই পাশে। গাছের আড়াল দিয়েই একরকম যাওয়া চলত।

কবরস্থানের চারিপাশের পাঁচিলের একটা অল্পস্বল্প ছাড়ানো জায়গা দিয়ে ভিতরে ঢুকে একজন মানুষকে দেখলাম! একটা বড় কবরের আড়ালে বসে আছেন। তাঁর চেহারা আমার মনে আজ আবছা হয়ে এসেছে। তবে তাঁর মুখে তখন দাড়িগোঁফ, মাথায় চুল ছিল। শ্যামবর্ণ রং। বেশ স্বাস্থ্যবান ভারিক্কে ধরনের মানুষ। বয়স তিরিশ হয় তো হবে। মাথায় একটা টুপি ছিল। মুসলমানী ঢঙের।

আমার পদ্যের প্রশংসা ক'রে বললেন—প্রাইজ পেয়েছ? পড়বে সমস্ত গানগুলি।

অনাথ সুশীলের দিকে সস্নেহে দৃষ্টিপাত ক'রে বললেন—এ দুটো গুণ্ডা। এরা তোমার মতো পদ্য লিখতে পারে না। তোমার কিন্তু শরীরটা দুর্বল। তোমার শরীরটা ভালো করো।

তারপর বললেন—বছর দুয়েক আগে নলিনীর সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছিল, রামপুরহাটে? কখানা চিঠিও লিখেছিলে। না?

আমি অবাক হয়ে গেলাম। বললাম—হ্যাঁ।

তিনি বললেন—দেশ স্বাধীন হবে। তৈরী হও সব। বুঝলে?

কেঁপে উঠলাম।

আর কোন কথা না বলে তিনি বললেন—যাও আজ। সুশীল তুই থাক।

আমি অনাথ চলে এলাম। পথে অনাথকে জিজ্ঞাসা করলাম—অনাথ, উনি কে?

অনাথ বললে—নাম জেনে কি করবে? উনিই আমাদের দাদা।

পুজোর দিন পনেরো আগে সুশীল অনাথ হঠাৎ কলেজে অনুপস্থিত হ'ল। এবং পুজোর ছুটি পর্যন্ত আর এলই না কলেজে। দ'পাশে দু'জনের সিট খালি পড়ে থাকত, মাঝখানে আমি বসে থাকতাম। ক্লাসে সঙ্গী বলতে ওরাই দুজনে ছিল, অন্যদের সঙ্গে বড় আলাপ হয় নি। ক্লাসের পর বেরিয়ে এসে আশুর সঙ্গে দেখা হয়। তারই সঙ্গে কথাবার্তা ব'লে হাঁপ ছাড়ি। এদিকে সামনে পুজো। কলকাতার বাজারে লেগেছে ছোঁয়াচ, রঙীন বসনে ভূষণে রংচঙে হয়ে উঠেছে। কলেজেও ছোঁয়াচ লেগেছে। পুজোর বন্ধের আগের দিন এবং পরের দিন, দু'দিন অভিনয় হবে। সেকালে অন্য কলেজে অভিনয়ের বড় রেওয়াজ ছিল না কিন্তু সেণ্ট জেভিয়ার্সে ছিল। কলেজ হলেই স্থায়ী রকমের স্টেজ সাজানো ছিল এবং এই ইউরোপীয়ান ধর্মযাজক অধ্যাপকেরা এ দিক দিয়ে ছিলেন উদার। তাঁরা অভিনয়ে উৎসাহই দিতেন। কলেজ বোর্ডে নোটিশ পড়ে গেল গেল—যাঁরা অভিনয়ে অংশ নিতে ইচ্ছুক তাঁরা স্বাক্ষরকারীর কাছে নাম দিয়ে আসুন। স্বাক্ষরকারী ছিলেন নীতিন রায়। নীতিন রায় কলেজে প্রায় সর্বজন-পরিচিতই ছিলেন। বোধ হয় তখন থার্ড ইয়ার তাঁর। আশুর সঙ্গে খুব আলাপ। ভদ্রলোকের চেহারাখানি সকল ছেলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করত। একটু সায়েবী ঘেঁষা ফরশা রং, চোখ দুটিও কটা, বিড়ালাক্ষ যাকে বলে, দোহারা শরীর একটু স্থূলতার দিকেই ঝুঁকেছে, ভদ্রলোক চলতেন বেশি ভারী রকমের পা ফেলে। মাথায় একটু খাটো মনে হ'ত। আর একজন ছিলেন বেশ লম্বা, শ্যামবর্ণ, একটু মিষ্টি বাঙালী চেহারার ভদ্রলোক, তিনিও থার্ড ইয়ারের ছাত্র, তিনিও ছিলেন অভিনয়দক্ষ ব্যক্তি। তবে নীতিনবাবুরই নাম বেশি। আমার মেসোমশায়ের ভাই ভুলুবাবু ছিলেন সেণ্ট জেভিয়ার্সের ছাত্র, আই-এসসি পাস করে মেডিকেল কলেজে তখন পড়তেন, তিনি নীতিন-বাবুর গল্প করতেন।—নীতিন খুব ভালো থিয়েটার করে! সাহস আছে! "চন্দ্রগুপ্ত" প্লের সময় যা সাহস ও দেখিয়েছে!

ব্যাপারটা তাঁদের আমলের। "চন্দ্রগুপ্ত" নাটকে চাণক্যের ভূমিকা নিয়েছিলেন ওই শ্যামবর্ণ ভদ্রলোকটি, তিনি তখন থার্ড ইয়ারের ছাত্র। নীতিন বাবু কলকাতারই ছেলে, ভবানীপুরে বাড়ি, বোধ করি স্কুলজীবনেই সে

আমলে পাণ্ডা হিসেবে খ্যাত হয়েছিলেন! তবে কলেজে এসে নিজেই ঠাঁই করে নিয়েও এই ভদ্রলোকের পিছনেই ছিলেন তখন পর্যন্ত। কাজেই তিনি নিয়েছিলেন চন্দ্রগুপ্তের ভূমিকা। এরপর রিহারশালের সময় চাণক্যের ভূমিকায় ভদ্রলোক অকস্মাৎ নিজের দুর্বলতা অনুভব ক'রে বলেছিলেন— বই বদলাতে হবে। চাণক্য আমি পারব না। এ দিকে তখন সময় কমে এসেছে। কি হয়? ছেলেদের কাছে অভিনয় হবে বলে চাঁদা নেওয়া হয়েছে। নতুন নাটক ধরবার সময় কোথায়? তখন নীতিনবাবু এগিয়ে এলেন, বললেন—আমি করব চাণক্যের পার্ট। তখন ভূমিকার নাম পার্টই ছিল বাংলা ভাষায়। এবং নাকি ভালো অভিনয়ই করেছিলেন। ভুলুবাবু বলতেন—তবে ওই জায়গাটা বুঝেছ, যেখানটায় আছে না—এই শীর্ণ ব্রাহ্মণ বলে বুকে ঠুকে চাণক্য নিজেকে দেখাবে সেই জায়গাটায় লোকে একটু হেসেছিল।

সেবারে হ'ল "সিংহলবিজয়" অভিনয়। নীতিনবাবু বিজয়সিংহ। সেই ভদ্রলোক সিংহবাহু। আশু আমাকে ধরলে—তোকে পার্ট নিতে হবে। আমি নীতিনকে বলেছি।

আমি ভয় খেয়ে গেলাম। অভিনয় কখনও তো করি নি। আশু বললে— ওরে, তুই লাভপুরের ছাওয়াল। লাভপুরে থিয়েটারের ট্রেনিং ছেলেবেলা থেকে। তাছাড়া তুই ইস্কুলে যে সব রেসিটেশন করেছিস আমি তো দেখেছি।

আশু যেবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেয়, আমি ফার্স্ট ক্লাসে উঠি, সেবার প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন উপলক্ষে আমি আর লক্ষ্মীনারায়ণ একলব্যের গুরুদক্ষিণা আবৃত্তি করেছিলাম স্বর্গীয়া কামিনী রায়ের "পৌরাণিকী" থেকে। নাটকের আকারে লেখা একলব্য কাব্যনাটকটি আজও আমার বড় ভালো লাগে। আমি একলব্যের ভূমিকা আবৃত্তি করেছিলাম, নারাণ ছিল দ্রোণ। স্বর্গীয় গুরুসদয় দত্ত বোধ হয় তখন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি আমার খুব প্রশংসা করেছিলেন। শ্রোতাদের খুব ভালো লেগেছিল।

আশুর ধারণা সেইটুকুর উপর ভিত্তি ক'রে। সে জোর করেই নিয়ে গেল নীতিনবাবুর কাছে। তখন তাঁদের নায়িকা কুবেণীর ভূমিকা নিয়ে পছন্দ চলছে। আশু বললে—একে দাও। পরীক্ষার দিন ধার্য হ'ল দু'দিন কি তিনদিন পর। হঠাৎ এর মধ্যে এক চিঠি কলেজের কাচে-ঢাকা বাক্সে এসে হাজির হল। সুশীল লিখেছে—কদাচ থিয়েটার করিবে না। দাদা বারণ করিয়াছেন।

আশ্চর্য হয়ে গেলাম। সুশীল চিঠি দিয়েছে, কোন ঠিকানা নাই। নিজের কোন খবর নাই। শুধু থিয়েটার করতে বারণ করেছে। মনে থিয়েটার নিয়ে শখও ছিল, ভয়ও ছিল। এ দিকে সেই রহস্যময় দাদা ব্যক্তিটির প্রতি একটি

আকর্ষণও ছিল। এই দ্বন্দ্বে পড়ে শেষ পর্যন্ত ভয় এবং দাদার আকর্ষণই জয়ী হ'ল। নির্দিষ্ট দিনে বেরিয়ে পথ থেকে ফিরে গেলাম। সে দিনটা ছিল বৃহস্পতিবার—সেণ্টজেভিয়ার্সের ছুটি। পার্ক স্ট্রীটে ঢুকেও ফিরলাম। ফিরে চলে গেলাম কলেজ স্ট্রীটে কমলালয়।

পুজোর সময়; বোনের, ভগ্নীপতির তত্ত্ব, বউয়ের তত্ত্ব করতে হবে; নিজের এবং ভাইদের জামা চাই। বাড়ি থেকে ফর্দ এসেছে। এতদিন এর জন্যে কলকাতায় যে আত্মীয়-স্বজন থাকতেন তাঁদের কাছে ফর্দ পাঠানো হ'ত, টাকা পাঠানো হ'ত। পাঠাবার সময় পিসিমা কাঁদতেন। আজ অন্যের উপর নির্ভর করতে হয়। পছন্দ-অপছন্দ সম্পর্কে একটা কথা বলা চলে না। নিজেদের একটু অনুগ্রহের পাত্র বলে অনুভব করতে হয়। এবার আমি কলকাতায় এসেছি। আমার কাছে এসেছে ফর্দ, টাকা। লিখেছেন—তোমার মেসোমশায়ের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে সঙ্গে কাউকে নিয়ে জিনিসপত্র কিনো। অন্য জিনিস মেসোমশায় কিনে দিয়েছিলেন, জামাগুলির জন্যে বলেছিলেন, কোন দোকানে মাপ দিয়ে করিয়ে নাও।

কমলালয় তখন মাত্র বছর দেড় কি দুই খুলেছে। কলেজ রোয়ের যে মুখটা হ্যারিসন রোডে মিশেছে সেই মুখে একখানা বাড়ির পরই একটি ছোট ঘরে ছিল কমলালয়। খোলা অবধি লাভপুরের লোকেদের সঙ্গে এঁদের হৃদ্যতা ছিল। কমলালয়ের কর্ণধার শ্রীযুক্ত খগেন চক্রবর্তী আমার থেকে হয়তো চার-পাঁচ বছরের বড়। তিনি নিজে টেলারিং শিখে কাজ শুরু করেছিলেন। সে আমলে এই কৃতী পুরুষটির অক্লান্ত পরিশ্রম দেখেছি। ব্যবসায়ে যাকে বলে স্পেকুলেশন, কমলালয়ের সাফল্যের মধ্যে তা কতটা আছে সে জানিনে, কিন্তু এই মানুষটির পরিশ্রম এবং ভদ্র মিষ্টি ব্যবহার, ঠিক নির্দিষ্ট দিনে জিনিস দেওয়ার নীতি যা দেখেছিলাম সেই প্রথম থেকে তাতে সাফল্য তাঁর প্রাপ্য। আজকের কথা জানি নে। আমি সেই প্রথম আমলের কথা বলছি।

কমলালয়ে জামার বরাত দিয়ে ফিরবার পথে হঠাৎ শেয়ালদার মোড়ে সেই টুপিপরা মানুষটির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সেই পার্ক স্ট্রীট গোরস্তানের দাদা। চড়লেন ট্রামে এবং সঙ্গে সঙ্গেই নেমে গেলেন। মনে হ'ল আমাকে নামতে বললেন।

নামলাম। অনুসরণ ক'রে গেলাম বৈঠকখানা বাজারে। সেখানে তিনি অল্প কয়েকটি কথা বললেন—থিয়েটার করছ না তো?

বললাম—না।

—চিঠি পেয়েছ?

—পেয়েছি।

—ভালো। দেশকে স্বাধীন করতে হবে। এখন শুধু এই ভাবনা। আর কিছু না। বুঝেছ? পুজোর ছুটিতে আরও অনেক ভালো পদ্য লিখে আনতে হবে। যাও। বাড়ি যাও।

আমি প্রশ্ন করলাম—সুশীল অনাথ—

—পুজোর পর দেখা হবে তাদের সঙ্গে।

চলে গেলেন তিনি, আমার শরীরে রক্তস্রোত চঞ্চল উত্তপ্ত হয়ে উঠল। বুঝতে পারলাম—যা অস্পষ্ট ছিল স্পষ্ট হয়ে গেল। উত্তেজনায়, একটা অজানা আশঙ্কায় মাথার চুল পর্যন্ত খাড়া হয়ে উঠল। বাড়ি চলে গেলাম।

পরের দিন কলেজে আশু বললে—তুই কাল এলি নে?

কথা বলতে গিয়ে চুপ করে গেলাম। মনে পড়ল আশুর দাদা সি-আই-ডি সাব-ইনস্পেক্টর।

আশু মনে করলে আমি ভয় পাচ্ছি। সে বললে—এত ভয় কেন রে? চল একদিন রিহারশ্যাল দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি এখনও ঠেকিয়ে রেখেছি।

বললাম—না ভাই। পারব না।

অগত্যা আশু বললে—তবে থাক। নে সিগারেট খা।

আশু ক'দিন আগে টিফিনে সিগারেট ধরিয়েছে। ওই একটা সিগারেটই দিলে।

সে দিন বললাম—না। ও ভালো লাগে না আমার। জামাতে গন্ধ হয়। মেসোদের বাড়িতে টের পাবে।

মোট কথা আমার কানে বাজছে সেই কথাগুলি—এখন দেশের ভাবনা ছাড়া আর কিছু না। দেশকে স্বাধীন করতে হবে। ওই কথাগুলি শোনা অবধি উপলব্ধির মুহূর্ত থেকে আমার সমগ্র দেহে মনে একটা শুদ্ধির তপস্যা শুরু হয়ে গেছে। একটা ক্রিয়া চলছে।

আজ তাই ভাবি। সে কালের জাতীয়তাবাদের মধ্যে মন্ত্রগুপ্তি আত্মগুপ্তিটা বড় ছিল না, তার চেয়েও বড় ছিল চিত্তশুদ্ধি আত্মশুদ্ধির তপস্যা। দেশের মুক্তিসাধনার সঙ্গে মানুষের চরিত্রগঠনের কাজ চলেছিল প্রবলতর বেগে। সে কালে কেউ এ কালের ধারা কল্পনাও করতে পারতেন না। ওই দিকটা যেন কাটা ঘুড়ির মতোই মিলিয়ে যাচ্ছে। চরিত্রবান মানুষের প্রয়োজন শেষ হয়েছে; উপহাসের সামগ্রী হয়েছে। তাই আজ সাহসী মানুষ, সৎ অসৎ যে বাছবে না, যে মিথ্যায় হোক সত্যে হোক কাজ হাসিল করবার মতো কূট কৌশলী সেই আজ সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি। যাক সে কথা। প্রকৃতি অনাচার সয় না। প্রকৃতির প্রতিক্রিয়া অবশ্যই হবে।

এরই মধ্যে একটি বৃহস্পতিবারে, তারিখ মনে নেই তবে খুঁজলে বের হবে—হ'ল সাইক্লোন। ১৯৪২ সালের সাইক্লোনের মতোই সে সাইক্লোন। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়সের মানুষ যাঁরা তাঁদের নিশ্চয় মনে আছে। সেই-বারের সাইক্লোনেই হ্যারিসন রোড বৃক্ষশূন্য হয়ে গেল। পার্ক স্ট্রীট ন্যাড়া হ'ল। তার আগে শেয়ালদার মোড় থেকে কলেজ স্ট্রীট পর্যন্ত হ্যারিসন রোডের দু'পাশে বড় বড় গাছ ছিল। পার্ক স্ট্রীটের সে পরিচয় নামেও আছে এবং কিছু গাছ এখনও পুরনো গোরস্তানের পাশে আজও আছে। আমি বৃহস্পতিবারের সুযোগে দশটায় খেয়ে দেয়ে কমলালয়ে এসেছি। সকাল থেকেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। এলোমেলো হাওয়া, টিপি টিপি বৃষ্টি। আশ্বিন মাসে যেটা অত্যন্ত সাধারণ। মেসোমশায়দের বাড়ির যে যার আপিসে কলেজ ইস্কুলে বেরিয়ে গেলেন। যদিও মেঘ ঘোরালো হচ্ছে, হাওয়া জোরালো হচ্ছে, বৃষ্টির ঝাপটা তেজালো হচ্ছে তবুও কেউ কোন শঙ্কা করলেন না। আশ্বিন মাসের বৃষ্টি হাওয়া, শরৎকালের মেঘ, এসেছে আবার চলে যাবে বিকেলের আগেই।

পল্লীগ্রামের লোকেরা অবশ্য আশ্বিনের ঝড় সম্পর্কে শঙ্কিত। ধানের থোড় সুদ্ধ ধানগাছগুলিকে শুইয়ে দিয়ে যায়। তার বেশি কিছু না। তার কারণ আশ্বিনের সর্বনাশা সাইক্লোন এর আগে বোধ করি ত্রিশ বৎসরের মধ্যে হয় নি। কি তারও বেশী।

আমার মনে পড়ছে—কমলালয়ে বসে আছি, কথা বলছি, সাড়ে-বারোটা বেজেছে, বাইরে ওদিকে ঝড় উঠেছে খেয়াল হয় নি। হঠাৎ হ্যারিসন রোডে নবীন ফার্মেসীর সামনে একখানা ছ্যাকরা গাড়ি গেল উলটে। বাতাস বইছিল পুব দিক থেকে। প্রচণ্ড একটা দমকা এসেছিল, ঠিক সেই মুখেই গাড়িটা মোড় নিচ্ছিল। একখানা পানের দোকানের মাথার চাল উড়ে গেল। ঝাপটাটার দমকটা পাক খেয়ে কলেজ রোয়ের ভেতরে ঢুকেও ক্ষান্ত হল না, কমলালয়ের চওড়া কাঠের পাল্লাতেও বার দুই মাথা ঠুকে চলে গেল। এবার চকিত হয়ে উঠল সকলে। বাইরের দিকে তাকিয়ে বৃষ্টির ধারা এবং ঝড়ের মাতন, আকাশের রং দেখে মনে হল—এ আবার কি রকম? বোধ করি মিনিট চারেকের মধ্যে খবর চাউর হয়ে গেল—সাইক্লোন আসছে, সাইক্লোন। হাওড়া ব্রিজে পোর্টকমিশনার থেকে দশ নম্বর (ঠিক মনে নেই কত নম্বর, তবে যেন দশ নম্বর বলেই মনে হচ্ছে) ফ্ল্যাগ উড়িয়েছে। হাওড়া ব্রিজ হওয়া অবধি এ ফ্ল্যাগ এ পর্যন্ত একবার উড়েছে। এই দ্বিতীয় বার। বন্ধ কর। সব বন্ধ কর। হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। আমি বেরিয়ে এলাম। রাস্তায় হ্যারিসন রোডে দাঁড়ানো যায় না। বাতাসে ঠেলে ফেলে দেয়। বৃষ্টি

সূঁচের তীক্ষ্ণতা নিয়ে মুখে বিঁধছে। ট্রাম বন্ধ হয়ে গিয়েছে কখন। কি করব? হেঁটেই পাড়ি দিলাম। পূব দিক থেকে হ্যারিসন রোড বেয়ে ঝড় বইছে প্রচণ্ড বেগে। তখন অন্তত তিরিশ মাইল বেগে বোধ হয়। আমি চলেছি শেয়ালদার মুখে। খানিকটা আসবার পর পিছনেই ভেঙে পড়ল একটা গাছের ডাল। আমি শঙ্কিত হয়ে দক্ষিণ ফুটপাথে এসে দক্ষিণমুখি গলি-পথ ধরলাম। ক্যাণ্টোফার লেনে যখন এসে পৌঁছুলাম তখন বেলা আড়াইটে। ও'দের বাড়ির ফটক পূর্বমুখী। কাঠের দরজার পাল্লা দু'খানা মাথার লোহার আংটায় আটকে আছে বটে কিন্তু পিছনের দিকে দু'টো পাল্লা ঠ্যালা মেরে আর্তনাদ করছে। যেন কোন অদৃশ্য বুনো হাতি মাথা লাগিয়ে ঠেলছে।

সে আংটা খোলা প্রচণ্ড শক্তিশালী লোকেরও অসাধ্য।

তখন কিন্তু বাড়ির মানুষেরা উপায় উদ্ভাবন করে ফেলেছেন। বাড়ির সকলেই ফিরেছেন প্রায়। আপিস ইস্কুল কলেজ আগেই খবর পেয়েছিল। সব বন্ধ হয়ে গেছে বারোটা নাগাদ। তখনও ট্রাম ছিল।

আমি চীৎকার করে ডাকতেই তাঁরা হেঁকে বললেন—দাঁড়াও।

পাঁচ-ছ জনে দু'টো বাঁশ দিয়ে দরজাটাকে সামনে ঠেলে ধরে বললেন—এবার তুমি আংটাটা খোল। আংটাটা খুলতে তাঁরা ধীরে ধীরে বাঁশ নিয়ে পিছিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে দিলেন। এমনি হঠাৎ ছেড়ে দিলে দরজার পাল্লা দু'খানা আছাড় খেয়ে পড়ত দু'দিকের দেওয়ালে। কিন্তু এতেও ক্ষতি আটকাল না। এ দরজা দু'পাল্লার, কিছু হ'ল না বটে কিন্তু দরজার পরেই বাড়ির প্রথম ঘরখানার একটা জানলার ছিটকিনি ঝড়ের বেগে খুলে গিয়ে এক পাল্লা জানলা সজোরে খুলে গেল, আবার ফিরে এল, আবার খুলল; শুধু খুলল না—কব্জার বাঁধন ছিঁড়ে প্রায় ঘুড়ির মতো উড়ে গিয়ে পড়ল পাশের বাড়িতে।

তারপর রাত্রে সে কি ঝড়ের তাণ্ডব! সে কি শব্দ, সে কি গোঙানি! যেন প্রলয় হয়ে যাবে। কৈশোর যৌবনের সন্ধিস্থল পর্যন্ত এমন প্রচণ্ড এবং এত দীর্ঘক্ষণস্থায়ী প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখিনি। আতঙ্ক এবং কৌতূহলের সীমা ছিল না। রাত্রি তখন কত জানি না, বারোটার পর তাতে সন্দেহ নেই—হঠাৎ প্রচণ্ড একটা শব্দে বাড়িটার ছাদখানা থরথর ক'রে কেঁপে উঠল। বিরাটকায় বিপুল ওজনের একটা কি যেন আছাড় খেয়ে পড়ল সেখানে। সমস্ত বাড়িটা আতঙ্কে উঠে বসল। সেটা একখানা বিরাটকায় টিনের চালা। উড়ে এসে পড়ল এ বাড়ির ছাদে। রাত্রি দুটো থেকে ঝড় কমতে লাগল। সকাল হল। আকাশে তখনও মেঘ, বাতাসও আছে, তবু প্রসন্ন সূর্যালোক বলে দিলে—বিপদ বিগত হয়েছে।

আমরা উঠলাম, বাড়ির বাইরে দেখলাম—নালা বেয়ে তখনও প্রবল জলস্রোত বইছে। রাস্তায় জল জমে রয়েছে। ওই পাড়ায় মেসোমশায়দের বাড়ির পূব দিকে রেললাইন পর্যন্ত ছিল বাগানের-পর-বাগান, নারকেল এবং নানান গাছের সমারোহ। দেখলাম সব যেন ফাঁকা হয়ে গেছে। আমরা দল বেঁধে বেরিয়ে দেখে এলাম। ধরাশায়ী গাছগুলোর শাখাপল্লবে মাটি ঢেকে গেছে। মরা কাক, বাদুড়, ছোট ছোট পাখী ছিটিয়ে পড়ে আছে চারিদিকে।

এরপরই কলেজের প্রথম পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি রওনা হলাম। সুশীল অনাথ পরীক্ষা দিতেও এল না। দু-একদিন শেয়ালদার মোড় ঘুরে এলাম। সেই মানুষটির সঙ্গে দেখা হল না।

মনে আছে বাড়ি গিয়েছিলাম সন্ধ্যের ট্রেনে। ওই ট্রেনখানার নাম ছিল লুপ মেল। মধ্যরাত্রে আমদপুর পেঁছুবে। নিছক মেল ট্রেনে চড়বার জন্যে ওই ট্রেনে গিয়েছিলাম। হাওড়ায় এসে লুপের কাউণ্টারে টিকিট কিনতে গেলাম। প্রচন্ড ভিড়, ওরই মধ্যে একজন পিছন থেকে বললেন—আমার একখানা টিকিটও নেবেন ভাই দয়া করে। আমদপুর।

—আমদপুর? পিছন ফিরে তাকালাম—ভাবলাম পরিচিত কেউ হবে।

না, পরিচিত কেউ নন। অপরিচিত একজন বেশ পরিচ্ছন্ন ভদ্রলোক। একখানা পাঁচটাকার নোট আমার হাতে বাড়িয়ে দিলেন। দু'খানা টিকিট কিনে বাইরে এলাম। মালপত্র নিয়ে কুলী বসে ছিল, তাকে নম্বর খুঁজে বের করে ট্রেনে এসে চড়লাম। সেই ভদ্রলোকও চড়লেন। স্টেসনে তিনি একটা কাঠের বাঁশী কিনলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—কিনবেন আপনি?

—আমি তো বাজাতে জানি না।

—শিখবেন। ও শিখতে আর কি লাগে।

কিনলাম দেখাদেখি। ট্রেনে ভিড় খুবই ছিল। তবু জায়গা মন্দ মিলল না। বড় বগী ইণ্টার ক্লাসের দরজার দু'পাশের দু'টো বাঙ্কে তিনি বেশ কায়দার সঙ্গে জিনিস ঠেলে ঠুলে জায়গা ক'রে একটায় আমাকে উঠিয়ে নিজে অন্যটায় চড়ে বসলেন। মাঝখানে দরজাটা রেখে বুকে বালিশ দিয়ে আমার দিকে মুখ করে আলাপ শুরু করলেন। নিজেই পরিচয় দিলেন।

কলকাতায় বাড়ি। আমাদের ওই দিকেই লাভপুর থেকে কয়েকমাইল উত্তরে তাঁর বোনের বিয়ে হয়েছে। সেখানে যাবেন। বোনকে তারা পাঠায় না। অথচ কলকাতায় মানুষ বোনটির কত কষ্ট হচ্ছে ভেবে বড় কষ্ট পাচ্ছেন। এবার পাঠাবে। তাই খুশি হয়ে যাচ্ছেন। আমায় প্রশ্ন করলেন—আপনার নামটি কি ভাই?

বললাম। তিনি খুব খুশি হয়ে বললেন—চমৎকার নাম তো! তারাশঙ্কর! বাঃ! আমাদের দেশে একজন লেখক ছিলেন জানেন? পণ্ডিত তারাশঙ্কর তর্করত্ন? কাদম্বরীর অনুবাদ করেছিলেন? বললাম—জানি। পড়েছি কাদম্বরী।

—আপনি তো এই বয়সে অনেক পড়েছেন! নিজে লেখেন-টেখেন না? এমন নাম! এর মধ্যে কাদম্বরী পড়েছেন! আর কি পড়েছেন? শুধু নাটক নভেল? না আরও কিছু পড়েন? এই বয়সে নীলবসনা সুন্দরীর ফাঁদে পড়েই সর্বনাশ হ'ল দেশটার! আমার ভগ্নীপতিকে তাই বলি আমি। বলি, বিবেকানন্দ পড়! আপনি পড়েছেন?

—পড়েছি।

—পড়েছেন? বাঃ বাঃ। ভালো ছেলে আপনি। নিজে লেখেন-টেখেন কিছু? আপনারই মতো আমার এক খুড়তুতো ভাই আছে, চমৎকার লেখে।

আমি চুপ করে রইলাম। বলতে লজ্জা পেলাম।

তিনি উৎসাহিত হয়ে বললেন—তা হ'লে লেখেন। বাঃ, বেশ! বেশ! কবিদের লেখকদের লজ্জা পাওয়াটাই স্বাভাবিক। My shame in crowd but solitary pride! তাই না? হাসতে লাগলেন, তারপর বললেন, শোনান না আপনার লেখা! আচ্ছা। আগে আপনাকে আমার বাঁশী শোনাই। নিজের বাঁশীটা ফেলে এসেছি। এগুলোতে সুর ঠিক থাকে না অনেক সময়। পথে রাত্রি কাটাতে হবে বলে কিনলাম। বাজাতে লাগলেন বাঁশী।

চমৎকার বাজান। সমস্ত ট্রেনটাই প্রায় বাঁশী বাজালেন। আমদপুরে নেমে বললেন—এইবার আপনার পালা। দাঁড়ান একটা ব্যবস্থা করি। স্টেশন মাস্টারকে বলে ওয়েটিং রুম খুলিয়ে নি। সেই ভোর বেলা গাড়ি ভাড়া ক'রে রওনা, কি বলেন? হাঁটব মশাই। মাল থাকবে গাড়িতে।

সত্যিই ওয়েটিং রুম খোলালেন। আলো আনালেন। অদ্ভুতকর্মা ভদ্রলোক। তারপর আমার লেখা শুনলেন। আজও আমি তাঁর তারিফ কানে শুনি!—

"মাটির হাতে আর খেলার প্রহরণ
জননি মিনতি গো, ধরো না—ধরো না!"

বাঃ বাঃ। ঠিক বলেছেন। জাগতে হয় জাগ! কালীমূর্তিতে জাগ! বন্দুক পিস্তল ধর! নইলে মিছে! পুতুল পুজো।

সমস্ত রাত্রি কাটিয়ে সকাল বেলা রওনা হলাম। লাভপুরের কাছাকাছি এসে বললাম—আর পৌঁছে গেছি। আপনি কিন্তু এ বেলা আমাদের বাড়ি খেয়ে রওনা হবেন।

মনে রয়েছে তিনি বলেছিলেন—তা যাব। কিন্তু মনটা দমে যাচ্ছে যত কাছাকাছি হচ্ছি, বুঝলেন না? পুলিসের সঙ্গে কারবার কি করে! আমার ভগ্নীপতির বাপ হলেন রিটায়ার্ড পুলিস অফিসার। চিঠি লিখেছেন পাঠাব। কিন্তু গেলে যে কি বলবেন সে বোধ হয় দেবতাতেও বলতে পারে না। না পাঠালে কিন্তু থানায় আমি ডায়রি করে যাব। বুঝেছেন!

এক বেলা কিন্তু থাকলেন না তিনি। চা জল খেয়েই রওনা হলেন। ফিরে এলেন একলা সন্ধ্যে বেলা। বললেন—পাঠালে না! আমি মশায় থানা থেকে ঘুরে আসি। ডায়রি করব আমি। রাগে ভদ্রলোকের সে কি মূর্তি! সত্যই থানায় গিয়ে ডায়রি করে এলেন।

সে ভদ্রলোক চলে গেলেন।

বলে গেলেন—কলকাতায় নিশ্চয় দেখা করব। হয় তো শীগ্‌গির আসতেও পারি। আমার বোনকে নিয়ে যাবার জন্য যদি আইন আদালত করি, বাড়িতে পরামর্শ করে ঠিক হবে অবশ্য; তা হ'লে আপনি এখানে থাকতে থাকতেই আসব।

তখনও দেশের অবস্থা এমন রিক্ত অবস্থায় পেঁছয় নি। (প্রথম মহাযুদ্ধ চলছে। বাজার দর চড়েছে। মনে পড়ছে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় কাপড়ের দামই সব থেকে বেশী চড়েছিল বলে মনে হয়েছিল। মিলের ভালো ধুতি শাড়ি ছ টাকা জোড়া দাম হয়েছিল। তাই মনে হয়েছিল অগ্নিমূল্য!) তবে তখনও দেশে সঞ্চয় ছিল। যে যেমন সে তেমনি দুশো, পাঁচশো, হাজার, পাঁচ হাজার নিয়ে নাড়াচাড়া করত। কাজেই চড়া বাজারেও পুজোর আনন্দ ম্লান হয় নি। আমাদের গ্রাম তখন জমজমাট গ্রাম। প্রাণ-প্রাচুর্যও যথেষ্ট। পুজোর ক'দিন আনন্দ যেন উথলে পড়ত।

ওই পুজো মণ্ডপেই দেখা হল আমার বালিকা বধূর সঙ্গে।

মনে হ'ল তার যেন একটা পরিবর্তন এসেছে। আমাদের দুই বাড়ির কলহের মধ্যে পড়ে এই এগারো বছরের মেয়েটি যেন হাঁপিয়ে উঠেছে। সে-কালে এগারো বছরের মেয়ের সাংসারিক চেতনা একালের ষোলো-সতেরো বছরের মেয়েদের থেকে অনেক বেশী জাগ্রত হ'ত। তাদের স্বপ্ন বলতে সংসার স্বপ্ন।

গ্রামে তখন নানান গুজব। পাড়াপ্রতিবেশীদের জল্পনা কল্পনা সুদূর-প্রসারী। তারা অনুমান করে এই আশ্বিন-কার্তিক কাটলেই অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুনের মধ্যে আবার দুই বাড়ির দরজায় রসুনচৌকি বেজে উঠবে। অর্থাৎ আমার এবং আমার ভগ্নীপতি নারাণের আবার বিয়ে সুনিশ্চিত। দোষটা তাঁদের ষোল আনা এ কথা নয়, আমাদের দু-পক্ষের অভিভাবকদের মনোভাবও অনেকটাই তাই ছিল! আমার বোনকে নিয়ে গণ্ডগোল ছিল না! ওদের

বাড়িতেই শুধু আমার বোনের বিয়ে হলে কোন গণ্ডগোলই ঘটত না। তবে একা আমার বিয়ে হলে, ঝগড়াটা যেভাবে পেকে উঠেছিল তাতে আমার কপালে দুই পত্নীযোগ এক রকম সুনিশ্চিতই ছিল। এই সব গুজব মেয়েটিকে ওই বয়সেই ম্লান ক'রে তুলেছিল।

পুজোর পর আকস্মিকভাবে উমার সঙ্গে একদিন একান্তে দেখাও হয়ে গেল। আমার যেটি খাঁটি শ্বশুরবাড়ি অর্থাৎ শ্বশুরমশায়ের নিজবাড়ি সে বাড়ি পড়ো-বাড়ির মতোই খাঁ খাঁ করত তখন। শ্বশুর মশায় আবার বিবাহ করে আলাদা বাড়ি করে সংসার পেতেছেন। এ ছেলেমেয়েরা থাকে মাতামহীর কাছে মামার বাড়িতে। অবশ্য তফাৎ মাত্র রশি দুই আড়াই। সেবার পুজোর পর ওই বাড়িতে নাতি-নাতবউদের সংসার পাতবার আয়োজন করছেন মাতামহী। সেই কারণে বাড়িটার তালা খোলা হয়েছে। আমার বোনই সংসারের কর্ত্রী হবেন! কর্তা হবেন ভগ্নীপতি নারাণ। ভাইরাও আসবে। আসবে না কেবল উমা অর্থাৎ আমার স্ত্রী। তাঁকে মাতামহী তাঁর জীবনের সঙ্গে প্রায় জাহাজের জালিবোটের মতো বেঁধে রেখেছেন। এই সময়ে তারই উদ্যোগপর্ব চলছে। নারাণচন্দ্র সকাল বিকেলে চায়ের আসর খুলেছেন। ওদের সংসার দেখাশুনার জন্য এক বামুন ঠাকুমা নিযুক্ত হয়েছেন, তিনি চায়ের আসরে নিষ্টান্নের ব্যবস্থাও করেছেন। তখন নারাণদের বাড়িতে সেই গল্পের মতো ঘড়া ভর্তি দুধ হয়। সাত আট সের দুধ। তাই থেকে ছানা ক্ষীর তৈরী করে মিষ্টি করতেন তিনি। সুতরাং আসর জমে উঠতে দেরী হয়নি। কিন্তু এ আসরে আমি সভ্য ছিলাম না। ছিলাম না ওই ঝগড়ার কারণেই। বিকেলে আমার গতিবিধি ছিল নদীর দিকে। পুজোর পর আমাদের কুয়ে নদীতে জল থাকত হাঁটু-খানেক, তাতে নৌকা বা ডোঙা চলত না। সেগুলি বাঁধা থাকত দহে। সেখানে গিয়ে সন্ধ্যে পর্যন্ত ওই নৌকা বা ডোঙা খুলে নৌবিহার করে আসতাম। এতে সঙ্গী ছিল বীরেশ্বর। বীরেশ্বরের কথা আগে বলেছি। বীরেশ্বরের নাম সার্থক। সত্যিকারের বীর সে তাতে সন্দেহ নেই। এমন দুঃসাহসী এবং এমন শক্তিশালী মানুষ কদাচিৎ চোখে পড়ে। পৃথিবীর কোন কিছুতে তার ভয় দেখিনি এবং এমন কোন খেলা বা শক্ত কাজ নেই যা সে পারে না। বিদ্যায় পাণ্ডিত্যে তার পারঙ্গমতা নেই, ওদিকে তার রুচিও নেই, কিন্তু যে কোন কঠিন খেলা ব্যায়াম কসরত সে সামান্য চেষ্টাতেই আয়ত্ত করতে পারত; শুধু তাই নয়, অসামান্য কৃতিত্ব অর্জন ক'রে সকলের সামনে দাঁড়াবার যোগ্যতাও তার ছিল। বীরেশ্বরের কথা যখন মনে হয় তখন আপশোশ হয় যে এমনি একটি সাহসী শক্তিশালী ছেলে পরাধীন দেশে জন্মগ্রহণ করে ব্যর্থ হয়ে গেল। বীরেশ্বরের কর্মক্ষেত্র ছিল যুদ্ধবিভাগ।

যুদ্ধবিভাগে প্রবেশাধিকার পেলে বীরেশ্বর একজন রণপণ্ডিত হতে পারত। আরও একটা ক্ষেত্র তার ছিল। সে যদি সেকালে বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পেত তবে সে সার্থক হতে পারত। কিন্তু সে সুযোগও তার হয়নি। আমাদের গ্রামের পরিবেশ তেমন ছিল না। বাড়ির আবহাওয়াও না। সেই কারণে বীরেশ্বর নিতান্তই সাধারণ মানুষ থেকে গেল। পুলিশে চাকরি পেলে বীরেশ্বর নরখাদক বাঘের মতো ভয়ঙ্কর পুলিস কর্মচারী হ'ত। কি যে তার দুঃসাহস এবং ওই দুঃসাহসে যে তার কত কৌতুক ছিল তার আর কি বলব! আমাদের লাভপুর থানার উঠানে থানা বিল্ডিং-এর সামনের বারান্দা থেকে হাত বিশেক দূরে একটি আম গাছ ছিল। এই গাছের আম আমাদের চাকলায় সব থেকে আগে ধরত এবং পাকতো। এবং আম গাছের পাশে গোটা দুই-তিন খেজুর গাছ ছিল; শীতের সময় প্রতি বৎসরই সেপাইরা এই গাছ কামিয়ে খেজুর রস সংগ্রহ করত। বীরেশ্বরের কৌতুক ছিল—এই আম চুরি করা এবং খেজুর রস সংগ্রহ করা। এ কাজ সে অন্তত পক্ষে ক্রমান্বয়ে সাত-আট বছর করেছে। পুলিশ কিন্তু কোনদিন ধরতে পারে নি।

এই নৌবিহার ছিল বীরেশ্বরের আবিষ্কার। আগে বলেছি—বীরেশ্বর ফুটবলে একজন অসামান্য কৃতী খেলোয়াড় ছিল। বাল্যকাল থেকে বীরেশ্বরের সঙ্গে আমার প্রীতি ওই ফুটবল খেলার সূত্র ধরে। আমার জীবন নিত্য কয়েক-ঘণ্টা ওর সঙ্গে নিয়মিতভাবে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে থাকত।

একবারকার কথা মনে পড়ছে।

শীতকাল, পৌষমাসের শেষ। আমরা খেলা শেষ করে বাড়ি ফিরছি। সে আমলে আমাদের ফুটবল খেলা চলত বারোমাস। চাষের ক্ষেতের মধ্য দিয়ে পথ। দু'পাশে রবি ফসলে ক্ষেতগুলি ভ'রে উঠেছে। সে দিন বোধ করি জন চারেক ছিলাম আমরা। হঠাৎ বীরেশ্বর এবং দ্বিজপদ দাঁড়িয়ে গেল। এ দ্বিজপদ "কবি"র বিপ্রপদ নয়, এ আর এক দ্বিজপদ—বীরেশ্বরের প্রতিবেশী এবং আত্মীয়। বললে—চল তুমি। আমাকে সরিয়ে দেবার চেষ্টাটা আমি বুঝতে পারলাম। কাজেই আমার কৌতূহল বেড়ে গেল। তখন বীরেশ্বর প্রকাশ করলে—পরের দিন তাদের পৌষলা হবে—তার জন্য তারা আলু চুরি করবে ক্ষেত থেকে।

আমি সবিস্ময়ে বলেছিলাম—সে কি! কিনলেই তো হয়।

বীরেশ্বরের যুক্তি হল—চুরি ক'রে যদি পৌষলা না করলে পৌষলার আমোদটা কোথায়? মিষ্টত্ব কোথায়?

আমার মনেও নেশা লেগেছিল সেদিন। আমিও ক্ষেত থেকে ওদের

আঁচলে আলু তুলে দিয়েছিলাম। হঠাৎ লোক এসে পড়েছিল। আমরা প্রচণ্ড দৌড় মেরে ঘুর-পথে গ্রামে ঢুকেছিলাম। বীরেশ্বর বলেছিল—এই তো আমোদ।

পরের দিন কিন্তু ওই জমির চাষী ঠিক আমাদের বাড়ি এসে হাজির হয়েছিল। সে সকলকেই চিনেছিল কিন্তু এসেছিল আমার মায়ের কাছে। বলেছিল—উনি কেন গেলেন মাশায়, তাই আপনাকে নিবেদন করতে এসেছি।

মা জিজ্ঞাসা করলে মিথ্যা বলতে পারিনি। স্বীকার করেছিলাম। মা প্রশ্ন করেছিলেন—তুমি তো ওদের সঙ্গে পোষলা করতে যাবে না, তুমি কেন গেলে? চুরি করতে গেলে?

আমি ভেবে-চিন্তে নিজেকে খতিয়ে দেখে বলেছিলাম—চুরি করতে কেমন লাগে তাই দেখলাম।

মা বলেছিলেন—কিন্তু এ কথা কি ভেবেছিলে যে, যে-চাষী চাষ করছে সে সকালে উঠে দেখে—তোমার পিতৃপুরুষের মুখে বিষ্ঠা পড়ুক বলে গাল দিতে পারে? ঘটনাটি "সন্দীপন পাঠশালা"য় আছে। এ ঘটনাটি মায়ের ওই কথায় এবং সেদিন চাষীর তাড়ায় পালাবার সময় বুকের মধ্যে যে উদ্বেগ বোধ করেছিলাম তার স্মৃতিতে আমার জীবনে অক্ষয় হয়ে আছে।

এই বীরেশ্বর।

বীরেশ্বরের সঙ্গে সেবার 'আলাপটা নতুন ক'রে জমেছিল—কলকাতার ফুটবল খেলার গল্প নিয়ে। সেবার আমি কলকাতায় লীগ এবং শীল্ড খেলা দেখে গিয়েছি, সেই খেলার গল্প শুনতে আসত সে। এবং এই গল্পের আসর বসত নদীতে ওই নৌকার উপর। বেলা তিনটে হতে-না-হতে চলে যেতাম, বাড়ি ফিরতাম সাড়ে-সাতটায়। আর একজন সঙ্গী আমাদের ছিল। আসলে সে বীরেশ্বরের বন্ধু। আমার চেয়ে বয়সে বছর চার-পাঁচের বড়। আমাদের গ্রামের দত্তদের ছেলে। ইস্কুলে আমাদের থেকে উঁচুতে পড়ত। আমাদের মধ্যে সে আমলের একটা সামাজিক ব্যবধান ছিল। কালিদাস দত্ত প্রথম দু-তিন দিন একটু সমীহ করত। তারপর সে সহজ হল। তখন এই চারঘণ্টা কালিদাস এক নাগাড় হাসিয়ে যেত। হাসাত' সে বক্তৃতা ক'রে। এবং এই বক্তৃতায় "মান" শব্দ সহযোগে অজস্র নূতন শব্দ তৈরী করে যেত। আরম্ভ করত—"ওই যে দোদুল্যমান ভাসমান তরণী এই কলকলায়মান প্রবহমান নদীতরঙ্গে দ্রুত ধাবমান—হঠাৎ যদি টলটলায়মান হইয়া উলটায়মান হয় তখন নিমজ্জমান হইয়া তোমরা কি ক্রিয়মান হইবে?"

বীরেশ্বর সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিত—সন্তরণ করিব।

—মূর্খ! বল—সন্তরণমান হইব। কিন্তু অভ্যন্তর হইতে যদি কুম্ভীর

উত্থায়মান হইয়া আক্রমণমান হয় এবং ঠ্যাং জলতলে নিমজ্জমান হয়, তবে কি করিবে ?

—তাই তো ? ! কি করিব আপনি বলমান হউন ।

—বাহবা ! কালিদাস বাহবা দিত । তারপর বলত—সেই কারণে বলিতেছি নিমজ্জমান হইবার পূর্বেই ঝম্পমান হইয়া ওই যে শেওড়া বৃক্ষের ডাল জম্বু বৃক্ষের ডাল বায়ুতে দোলদোলায়মান দেখিতেছ তাহাই আঁকড়াইয়া ধরিয়া ঝোঝুল্যমান হইবে । এবং চিল্লায়মান হইয়া লোক ডাকিবে বুঝিয়াছ ?

আমার জীবনে এই নৌকাবিহারের স্মৃতি কালিদাসের এই রসকাব্যের স্মৃতিতে মধুর হয়ে আছে ।

এরই মধ্যে একদিন, সে দিন পুজোর পর আমাদের ওখানে যে সাহিত্য সভা ছিল তারই অধিবেশন হবার কথা । সন্ধ্যার সময় অধিবেশন হবে । আমি কবিতা দিয়েছি এবং ওখানকার ঠাকুরপাড়ার মুসলমান মিয়াদের সম্পর্কে প্রবাদ গল্প নিয়ে একটি প্রবন্ধও দিয়েছি । এই কারণেই সেদিন নৌবিহার স্থগিত ছিল । সে দিন বিকেলে বেরিয়ে নারাণদের বাড়ির সামনে আমার পাড়ার বন্ধুদের সামনে পড়ে বাঁধা পড়লাম । আমাদের পাড়াটা সে কালে অভিজাত পাড়া বলে গণ্য হ'ত আমাদের গ্রামে ! পাড়ার বন্ধুরা আমাকে অবজ্ঞা করতে পারত না, কিন্তু ঠিক তাদের সঙ্গে জলের সঙ্গে জলের মতো মিশে না-যাওয়ার জন্য আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করত । সে দিন তারা যখন পাকড়াও করলে তখন আর "না" বলবার যো রইল না । বাড়ির ভিতরে চায়ের মজলিশে নিয়ে গেল ।

এইখানে সেদিন দেখা হল উমার সঙ্গে ।

ওই যে ওদের বাড়িতে ছিলেন অভিভাবিকা ঠাকুরমা—তিনিই সুকৌশলে আমাকে বন্দী করলেন একটি ঘরে । ডাকলেন, তোমাকে নারাণ ডাকছে একবার উপরে । কি বলবে ।

বুঝলাম নারাণ বলবে ঝগড়ার কথা । সেটা আমার পক্ষে প্রীতিপ্রদ ছিল না । কিন্তু এতগুলি বন্ধু-বান্ধবদের সম্মুখে না বলে ঝগড়ার গুরুত্বের প্রমাণ দিতে লজ্জা হল ।

—ওই ঘরে । বলে দেখিয়ে দিয়ে ঠাকুরমাটি পাশে সরে দাঁড়ালেন । এবং আমি ঘরে ঢুকেতেই বাইরে থেকে দরজা বন্ধ হয়ে গেল ।

ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল আমার বালিকা বধূটি ।

সে দিন সে জিজ্ঞাসা করেছিল—লোকে বলছে তুমি আবার বিয়ে করবে ?

ছুটির মধ্যে আর কয়েক দিনই বউটির সঙ্গে এই ভাবেই দেখা হয়েছিল । বোধ করি আমার সারা জীবনে রোমান্স বলতে এই ক'টা দিনের দেখাশুনা ।

পুজোর ছুটি শেষ হল।

কলকাতায় এলাম। মেসোমশায়দের বাড়িতে উঠলাম। বোধ হয় ঠিক পরের দিন গেলাম কালীঘাট মহিম হালদার স্ট্রীটে আশু দাসের সঙ্গে দেখা করতে।

আশু দাসের বড় দাদা মাখন দাস ছিলেন সি-আই-ডি সাব-ইনস্পেক্টর কি ইনস্পেক্টর। সেখানে আশুর সঙ্গে কথা বলছি এমন সময় দেখলাম সেই ভদ্রলোক এসে ঢুকলেন ওদের বাড়িতে। যিনি, পুজোর ছুটির সময় বাড়ি যাবার ট্রেনে আমার সঙ্গী ছিলেন, যিনি বোনকে আনবার জন্য গিয়েছিলেন, তিনি।

হেসেই তিনি বললেন—কাল এসেছেন?

—হ্যাঁ। বিস্ময়ের আর অবধি রইল না আমার। কিন্তু আপনি—?

—মাখনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

এর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার পাঠ্য জীবন শেষ হয়ে গেল।

তিনি সি-আই-ডি অফিসার। ওই সুশীল অনাথ এবং সেই মুসলমানী টুপিপরা রহস্যময় দাদা ব্যক্তিটির সঙ্গে আমার সংযোগ সূত্র আবিষ্কার করেছেন তিনি। তিনি সে কালের বিখ্যাত পুলিস কর্মচারী ৺পূর্ণ লাহিড়ী মহাশয়ের আত্মীয়। সেই সূত্রে তিনি লাহিড়ী মশায়কে আমার কথা বলেছিলেন। কারণ ছিল এই যে, ৺পূর্ণ লাহিড়ী মশায় এক সময় লাভপুরে সাব-ইনস্পেক্টর ছিলেন এবং আমার বাবার সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা ছিল ঘনিষ্ঠ। এদিকে আশু দাসের সঙ্গে আমার প্রীতির সম্পর্ক জেনে আশুর দাদা মাখনবাবুকেও জানিয়েছিলেন। মাখনবাবুও আমাদের দেশের লোক। এই সব যোগাযোগের জন্যই আমার ভাগ্যে বন্ধন-যোগটা গৃহে-বন্ধন-যোগেই পর্যবসিত হল। পড়া ছেড়ে বাড়িতে আবদ্ধ থাকতে হল।

তবু বন্ধন—বন্ধন।

এই বন্ধনের মধ্যেই কৈশোর পার হয়ে উপনীত হলাম যৌবনে।

ঘরে বসে এই বন্ধন মুক্তির স্বপ্ন দেখতাম।

একদিন বন্ধন অর্থাৎ বাধা-নিষেধ কাটল। সে বোধ হয় আঠারো সাল। কিন্তু তখন পরাধীন ভারতবর্ষই আমার কাছে কারাগারে পরিণত হয়েছে।

দাঁড়ালাম—কি করব? কোন্ পথে যাত্রা করব শুরু?

হঠাৎ শুনতে পেলাম—জালিনওয়ালাবাগের ধ্বনি।

শুনলাম—অহিংসার পথে গান্ধীজীর আহ্বান!

সেই পথেই যাত্রা আমার শুরু হল।

আমার সাহিত্য-জীবন

(প্রথম ভাগ)

এক

নিজের জীবনকালের কথায় নিজের জীবনকে গৌণ করে কালকে বড় করে শৈশবের কথা এবং কৈশোরের কথা লিখে সাহিত্য-জীবনের কথা লেখার সংকল্প যখন করেছিলাম তখন এ কাজ যে কতো কঠিন তা ভেবে দেখি নি। লিখতে বসে মনে হচ্ছে এমন কঠিন কাজে হাত না-দেওয়াই ভালো ছিল। মনে পড়ছে বাল্যজীবনে প্রথম যেদিন কবি হিসাবে আত্মঘোষণা করি, সেই দিনের কথা।

আমার জীবনের প্রথম রচিত কবিতা খড়ি দিয়ে লিখেছিলাম আমাদের বৈঠকখানা-বাড়ির একটা খড়খড়িওয়ালা দরজার গায়ে। তখন বয়স আমার সাত বৎসর—আটে পড়েছি। সুদীর্ঘকাল—বোধ হয় সতেরো-আঠারো বৎসর ওই লেখা শিলালিপির মতো ধুলার আস্তরণের নিচে থেকে বিবর্ণ সাদা অক্ষরে আঁকা ছিল। আমার বয়স যখন ছাব্বিশ-সাতাশ তখন আমিই নিজে একদিন সাদা রং দিয়ে দরজাটা রং করে সে লেখা মুছে দিয়েছি।

অল্পস্বল্প ছড়া কবিতা—এ ছেলেরা ছ-সাত বছর থেকেই মুখে মুখে রচনা করে চিরকাল। যে সবচেয়ে কম রচনা করে—সেও অন্তত অন্যের উপর বিরক্ত হয়ে তার নাম নিয়ে ব্যঙ্গ করে বিদ্রূপাত্মক কাব্য রচনা করে থাকে। ওই লেখা রচনাটির আগেও আমার আশৈশব বন্ধু নারাণকে ভেঙিয়ে আমি রচনা করেছি—নায়ে, খায়ে, টায়ে, মায়ে, ঘায়ে, য়ে-য়ে-য়ে-য়ে ইত্যাদি। একালের ছেলে-মেয়েদেরও লক্ষ্য করেছি—আমার পাঁচ বছরের পৌত্র বারু (ডাক নাম) আমার চার বছরের দৌহিত্রকে ভ্যাঙায়, বাবলু—খাবলু।

বাবলু বলে, বারু—খারু।

আমার দরজার লেখা কবিতাটি কিন্তু এ ধরনের ব্যঙ্গ-কবিতা নয়। যাকে বলে জাত-কবিতা, তাই। দস্তুরমতো করুণ রস অবলম্বন করে লেখা। তিন বন্ধুতে খেলা করছিলাম, হঠাৎ আমাদের বৈঠকখানার সামনের বাগানে একটি গাছের ডালের পাখির বাসা থেকে একটি পাখির বাচ্চা পড়ে গেল মাটিতে। তিন বন্ধুতে ছুটে গিয়ে তাকে সযত্নে তুলে এনে বাঁচাবার এমনই মারাত্মক চেষ্টা করলাম যে বাচ্চাটি বার কয়েক খাবি খেয়েই মরে গেল। বালক-মনে একটি করুণ রসের ধারা সঞ্চারিত করে গেল। আমার সঙ্গীদের মধ্যে একজন ছিল পাঁচু। তার জিহ্বায় ছিল জড়তা, সব সময় সব তাতেই সে হি-হি করে হাসত। আর-একজন ছিল, তার নাম দ্বিজপদ। তিনজনেই

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিলাম বোধ হয়। তারপর কল্পনা করেছিলাম বাগানের মধ্যে পক্ষীশাবকটির সমাধি রচনার। যেমন কল্পনা তেমনি কাজ। ভাঙা ডালের টুকরা নিয়ে মাটি খুঁড়তে লেগে গেলাম। ইতিমধ্যে এমন একটি ঘটনা ঘটলো যে-ঘটনাটুকুর জন্য সমস্ত ঘটনাটিই মনের মধ্যে অক্ষয় হয়ে গেল এবং সাহিত্যরচনার প্রেরণা এসে গেল আমার জীবনে।

পাঁচু হঠাৎ বললে—দেখ দেখ।

—কি ?

—পাখিতার মা এচেছে। দাকছে।

সত্যিই পক্ষীমাতা বাসায় ফিরে শাবকটিকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে মরা ছানাটির পাশে এসে ঠোঁট দিয়ে তাকে নাড়া দিচ্ছে—ডাকছে। একটি আহা শব্দ আমাদের তিনজনের মুখ দিয়েই বোধ হয় বেরিয়েছিল। কিন্তু বালক-চরিত্র বিচিত্র। সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিজপদ পা টিপে টিপে পক্ষীমাতাকে ধরবার জন্য অগ্রসর হল। পক্ষীমাতা উড়ল। এবং কিচ-কিচ শব্দ করে পাক দিয়ে ঘুরতে লাগল মাথার উপর।

হঠাৎ পাঁচুর হাত দিয়ে কবিতা বেরিয়ে গেল। আদিকবি বাল্মীকির কবিতা মুখ দিয়ে বেরিয়েছিল—কামার্ত ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে নিহত হতে দেখে। পাঁচুর কাব্য নিঃসৃত হয়েছিল অনুরূপ প্রেরণায়। সে একটা খড়ি দিয়ে আমাদের ওই দরজায় খসখস করে দু-লাইন কবিতা রচনা করে ফেলল।

"তারাদাদার পাখির ছানা মরিয়াছে আজি
তার মা এসে কাঁদিতেছে কেঁউ কেঁউ করি।"

"পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল" কবিতার ছন্দ পাঁচুর তখন আয়ত্ত হয়ে গিয়েছিল। দ্বিজপদ এ সবের ধার কোনদিনই ধারে নি, সে-দিনও না। আমার মনে কিন্তু দোলা লেগে গেল। পাঁচু—পেঁচো! যার জিহ্বায় জড়তা, অহরহ অস্থির চঞ্চল যে পেঁচো, পাঠশালা-পলাতক যে পেঁচো সেই পেঁচো, খসখস করে পদ্য লিখে ফেললে? একেবারে ছন্দে গেঁথে মিল দিয়ে পদ্য! প্রাপ্তবয়স্ক রসিক জন ও কবিতায় মিল খুঁজে পাবেন না। কিন্তু আমি সেদিন মিল পেয়েছিলাম—'আজি' এবং 'করি' শব্দ দুইটি হ্রস্বইকারান্ত, ওই হ্রস্ব-ই—হ্রস্ব-ইয়ে মিল দেখেছিলাম। আর কিছু বয়স্ক হলে পাঁচু সহজেই "মরিয়াছে আজি" না লিখে "আজি গেল মরি" লিখে পরের লাইনের "কেঁউ কেঁউ করি"র সঙ্গে প্রথম শ্রেণীর মিল দিয়ে দিত। কিন্তু বালক কবিচিত্ত ওতেই পরিতৃপ্ত হয়েছিল, ছন্দে গেঁথে তার মনের কথা বলা তো হয়েছে—আর বেশীর দরকার কি? আমার কাছে সে কবিতা সেদিন প্রথম শ্রেণীর কবিতা বলে মনে হয়েছিল!

দ্বিজপদ কিন্তু এতে একটুও চঞ্চল হয় নি, প্রেরণাও পায় নি। আমি হলাম, আমি প্রেরণা পেলাম। কবির সম্মান, কবির মূল্য, কাব্যসাধনার মহিমা সেদিন নিশ্চয়ই বুঝি নি, তবু সেদিন এটুকু বুঝেছিলাম যে, পাঁচু যা করেছে তা মহাগৌরবের, তার মূল্য অর্থের নয় মহিমার। ওদিকে পাখির মা তখনও কাঁদছে, একবার এসে ছানার পাশে বসে তাকে ঠোঁট দিয়ে নাড়ছে আবার উড়ে গিয়ে ডালে বসছে। আমিও পাঁচুর খড়িটি নিয়ে পাঁচুর কবিতার নিচে লিখলাম—

"পাখির ছানা মরে গিয়েছে
মা ডেকে ফিরে গিয়েছে
মাটির তলায় দিলাম সমাধি
আমরাও সবাই মিলিয়া কাঁদি।"

এমনি পোষা জীবজন্তুর সমাধি লক্ষ্য করলে অনেক বালক-কবির রচনা দেখতে পাওয়া যায়। মানুষ মরলে শিশু বালক তেমন উপলব্ধি করতে পারে না, কিন্তু তার প্রিয় পাখিটি কি কুকুরটি যখন মরে তখন সে কাঁদে, তাকে সমাধি দেয়, তার উপর তার চিত্তের স্বতোৎসারিত বেদনাপ্লুত কাব্য উৎকীর্ণ করে দেয় সে। আমাদের গ্রামে ঢুকবার মুখেই পথের পাশে এমনি একটি কুকুরের সমাধি ছিল। তার উপরে আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা ছিল—

"সমাধি মোদের ভুকুর
আমাদের ভালো কুকুর।"

কুকুরটার নাম ছিল ভুকু।

মাটির তলার পাখির ছানাকে সমাধি দিয়ে দরজার গায়ে খড়ি দিয়ে প্রথম কবিতা রচনা করেছিলাম পাঁচুর প্রেরণায়। পাঁচু এর পর এমন কবিতা আর রচনা করেছিল কি না জানি না, তার আর কোনো লক্ষণ আমার চোখে পড়ে নি। কিন্তু আমার নেশা লাগল। এর পরই পুজোর সময় পুজোমণ্ডপের দেওয়ালের গায়ে আমাদের গ্রামের নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়ের রচিত আগমনী কবিতা চোখে পড়ল। হাতে লিখে দেওয়ালে সেঁটে দিয়েছেন। প্রতিবৎসরই তিনি কবিতা লিখে এইভাবে দেওয়ালে সেঁটে দিতেন। আমারও সাধ হল পুজো উপলক্ষে কবিতা লিখব।

আমার বাল্য-সাথী ছিল লক্ষ্মীনারাণ। তাকে সঙ্গে নিয়ে পর বৎসর আগমনী কবিতা রচনা করলাম। প্রথম দু-লাইন আজও মনে আছে—

"শারদীয়া পুজা যত নিকটে আইল
তত সব লোকের আনন্দ বাড়িল।"

আরও এক লাইন মনে পড়ছে—'চারিদিকে বাজিতেছে কত ঢাক ঢোল'।

এর সঙ্গে কি মিল দিয়ে কি লাইন রচনা করেছিলাম তা মনে নেই তবে 'গোলে হরি বোল' দিই নি এটা মনে আছে। যাই হোক এই কবিতা আমরা লিখেই ক্ষান্ত হই নি, রীতিমতো ছাপিয়ে সকলের মধ্যে বিলি করে কবি সাহিত্যিক হিসাবে আত্মঘোষণা করেছিলাম। আজ সাহিত্যিক জীবনের কথা লিখতে গিয়ে সেই দিনের স্মৃতি মনে জেগে উঠছে। আমার বাল্যকালের স্মৃতির কথা "আমার কালের কথা"য় যা লিখেছি তাই তুলে দেব।

সপ্তমীর দিন সকালে ছাপা কবিতার তাড়া নিয়ে দুটি শিশু-কবি সর্বসমক্ষে সলজ্জ বিনয়ের অন্তরালে সগৌরবে আত্মঘোষণা করলে—'আমাদের পদ্য পড়ে দেখুন'। আমার এই আত্মঘোষণার সময় কাল নিশ্চয় বিচিত্র হাসি হেসেছিলেন। বুঝতে পারি নি আমি সেদিন আমার জীবনের সঠিক চলার পথে পা দিলাম।

যাক আমার আত্মঘোষণার কথাই বলি। বাংলার ক্ষুদ্র একটি পল্লীতে সে-কালের সমাজে আত্মঘোষণা খুব কঠিন ছিল না। বাংলাদেশে তো কবির অভাব ছিল না। অনেক আউল কবি, বাউল কবি, তন্ত্রসাধক কবির নাম বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে আছে আরও অনেক অনেক জনের নাম কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। তারা ছাড়াও খেয়া-ঘাটের মাঝি ছিল কবি, হাল-বলদের লাঙলের কারবারী চাষীও ছিল কবি, মুদি ছিল কবি, ময়রা ছিল কবি—চন্ডাল বলতাম যাদের তাদের মধ্যেও অনেক কবি জন্মেছে। উদ্ধারণপুরের শ্মশানঘাটে এমনি এক চন্ডাল কবির সঙ্গে দেখা হয়েছিল, আলাপ হয়েছিল, এক রাত্রি তার সঙ্গে ঘন জঙ্গলে ভরা গঙ্গার তটভূমের উপর শ্মশানের টিনের চালায় বাস করেছিলাম। পৈত্রিক পেশা তার—শ্মশানে শবদাহ করা, কড়ি আদায় করা, শবের সঙ্গে থেকে কাপড় খুলে নেওয়া, বিছানাপত্র জড়ো করে একদিকে রেখে দেওয়া—সে তাই করছিল। পোড়া শবের গন্ধ ওঠে, সেইখানেই আসে তার ভাত—সেই ভাত সে হাত মুছে খেতে বসে যায়; মদ খায়; নির্লিপ্ত চিত্তে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চিতার দিকে চেয়ে বসে গান গায়—

"আমার মনের চিতে নিভল না।
দেহের জ্বালা জুড়ালো রে চিতের আগুনে,
আমার মনের চিতে নিভল না।"

আমাদের গ্রামে বাউড়ীদের মধ্যে ডোমেদের মধ্যে কত কবি আছে। তাদেরই একজনকে নিয়ে আমার মানস সরোবরে স্নান করিয়ে আমার "কবি" উপন্যাসের নায়ক হিসাবে অভিষেক করেছি।

বাংলাদেশটাই কবির দেশ। কবি অনেক আছে, কবির কাব্য শুনবার লোকেরই বরং অভাব, শ্রোতা নেই। তাই আগের কালের কবিরা কাব্য রচনা

করে তাতে সুর যোজনা করে নিজেকেই নিজে শুনাত। মাঠের মধ্যে হাল বইতে বইতে চাষী-কবি গান বেঁধে সুর দিয়ে আপন মনেই গেয়ে উঠত—পাশে পথের উপর দাঁড়িয়ে আমি সে-গান শুনেছি।

'চাষকে চেয়ে, গোরাচাঁদরে মান্দেরী ভা-লো—' গোরাচাঁদ কোনো বন্ধু চাষী নয়, গোরাচাঁদ—বাংলাদেশের মানুষের প্রাণের গোরাচাঁদ—শচীমায়ের দুলাল। তাকে ছাড়া কাকে বলবে দুঃখের কথা? আমার ব্রজজ্যাঠা ছিলেন পোস্টাপিসের চাকুরে, তন্ত্র-মন্ত্র সাধক, গাঁজা খেতেন, মদ খেতেন, আধপাগলা আত্মভোলা মানুষ; সুকণ্ঠ গায়কও ছিলেন। দারুণ গ্রীষ্মে কুটুম্ববাড়ি যাওয়ার পথে জুতো জোড়াটা ছিঁড়ে গেল। উত্তপ্ত বীরভূমের লাল কাঁকরের পথে খোঁড়াতে খোঁড়াতে কুটুম্ববাড়িতে (মস্ত জমিদারবাড়ি) উপস্থিত হলেন। কুটুম্ব সত্যেশচন্দ্র সরকার মহাশয় বারান্দায় বসে ছিলেন; তিনি ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'এ কি ব্রজবাবু, খোঁড়াচ্ছেন কেন? কি হল?'

ব্রজজ্যাঠা সেই অবস্থাতেই সঙ্গে সঙ্গে গান রচনা করে খাঁটি মনোহরশাহী কীর্তনের সুরে গেয়ে উঠলেন—

"ভাস্করেরই কর (ও) অতীব প্রখর (ও)
ফোসোকা (ফোস্কা) পড়িল পায়ে।
তাহার (ও) উপর (ও)—পথেতে কাঁকর (ও)
লবণের ছিটা ঘায়ে।।"

সুতরাং এদেশে কবি হওয়াটা এমন আর কি বিস্ময়ের কথা?

কিন্তু না। বিস্ময়ের কথা বটে।

ছাপানো হরপে, আধুনিক কালের ধারায় আগমনী কবিতা। এতে শারদীয়া শব্দটি আছে, বহিরঙ্গের রূপ আছে, ঢাক-ঢোল আছে, বিচিত্রবর্ণ বেশভূষার উল্লেখ আছে কিন্তু আগমনীর মধ্যে গিরিরাজ কই? গিরিরানীর মেনকা কই? নূতন কালের নূতন ধারা যে এ কাব্যরচনার মধ্যে স্পষ্ট। এ যে রীতিমতো মাইকেল, বঙ্কিমবাবু, নবীনবাবু, হেমবাবুর মতো একটা কেউকেটা হবার চেষ্টা!

কবিতাটি ছাপানো হয়েছিল কলকাতায় কালিডোনিয়ান প্রেসে। মস্ত বড় প্রেস—সাহেব কোম্পানির ছাপাখানা, ছাপা চমৎকার—নীল কালির হরপগুলি চোখ জুড়িয়ে দেয়। আমার বন্ধু নারাণের পিতামহ ছিলেন কালিডোনিয়ান প্রেসের বড়বাবু। তাঁর কাছে পাঠিয়েছিল নারাণ—তিনি ছাপিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

কাব্য যেমন হোক তার প্রকাশের আড়ম্বর এবং সমারোহ দেখে লোক একবার কাগজখানার দিকে, একবার আমাদের দিকে ফিরে তাকালে। আমাদের

গ্রামের অবস্থা তখন বিচিত্র। গ্রাম্য সমাজে উচ্চতম আসনের অধিকার নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের মতো দ্বন্দ্বজর্জর। কুরুক্ষেত্র বললে অত্যুক্তি হয় না। অর্থাৎ পদাতিক এখানে নগণ্য—গৌণ, মুখ্য এখানে রথীর দল। শিক্ষায় সভ্যতায় সম্পদে আমাদের গ্রামের ব্রাহ্মণ সমাজ সত্যই তখন রথীপদবাচ্য। কিছু জমিদার, কিছু জমি, পুকুর, বাগানের মালিক সকলেই। সকলেই মহামানী দুর্যোধনের মতো মানী। সকলেরই পণ—বিনা রণে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী। এঁরা তো শল্য প্রভৃতির মতো রথী। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, ভীম, অর্জুনের মতো রথীও ছিল। স্বচ্ছল জমিদারি—বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্র, প্রাচীন কালের শিক্ষা ও আভিজাত্য-সম্পন্ন কয়েকটি পরিবারও ছিল। কলকাতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক—সমগ্র ভারতে সম্প্রসারিত কয়লার ব্যবসায় প্রচুর অর্থ, এমন পরিবারও ছিল একটি। তাঁকে কেন্দ্র করে তাঁর আত্মীয়স্বজনেরা ছিলেন। তাঁরা বারোমাস থাকতেন কলকাতায়। এ ছাড়া উকিল ছিলেন, চাকুরে ছিলেন কয়েক জন। এই প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্বজর্জর লাভপুর ক্ষেত্রে সকলেই ছিলেন যুধ্যমান। তাঁদের কাছে কাগজে ছাপিয়ে কবিতা বিলি করে আত্মঘোষণার অর্থ সম্পূর্ণ আধুনিক। তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নিলেন বালক দুটি কোন্ কালের কবি হতে চায়। এবং সে কবিকে এ কালের বিধি অনুযায়ী কোন্ প্রাপ্য দিতে হবে।

ব্রজজ্যাঠা জমিদার সত্যেশবাবুর বাড়িতে যখন গান রচনা করে গেয়ে ঢুকলেন "ভাস্করেরই কর অতীব প্রখর—ফোসোকা পড়িল পায়ে" তখন গৃহস্থ সঙ্গে সঙ্গে শীতল জলে কবির পদসেবার ব্যবস্থা করে এক জোড়া জুতাও তাঁর পায়ে সপ্রেমে পরিয়ে দিয়েছিলেন। সে-কালের কবিরা ছিলেন মানুষের প্রাণের মানুষ, রাজসভায় সভাকবি, দেশের মধ্যে কীর্তনীয়া, কবির সর্বোচ্চ আসন ছিল মহাজনত্ব। এ-কালের কবিরা কাল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে বাহিরে পরিবর্তিত হয়েছেন। তাঁরা রাজসভায় যান না। রাজার বন্দনা রচনা করেন না। জনতার সভায় সভাপতির আসনে বসে অভিভাষণ দেন; গান তাঁরা আর গেয়ে শোনান না। এ-কালের কবির দাবি অনেক; দম্ভ না হোক—মর্যাদা আকাশস্পর্শী। কাজেই এ-কালে কবি বা সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠাকামী যাঁরা, তাঁদের পথ হয়েছে দুর্গম কণ্টকাকীর্ণ। সেকালের কবিদের পরস্পর সম্পর্ক ছিল ভাববিনিময়ের—রস-সাধনায় সহযোগী ছিলেন তাঁরা। একালে আমাদের সাহিত্যিকদের পরস্পরের সম্পর্ক প্রতিযোগিতার। রস-সাধনায় আমরা প্রতিযোগী—হয়তো ছিদ্রান্বেষীও। একালে সাহিত্যে সমালোচনা আছে, সমালোচনার পত্রিকারই কদর বেশী। পাঠকেরাও প্রিয় কবি সাহিত্যিককে জনতায় অপদস্থ দেখে প্রীতিলাভ না করলেও কৌতুক খানিকটা

উপভোগ করেন। এ পরিবর্তনের কারণ বোধ হয় ওই। প্রাণের মানুষ গুরুঠাকুর হয়ে বসেছেন, নিজেদের দুর্লভ করেছেন বলেই বোধ করি পুজোর ফুলের ভিতরের কীটদংশন স্বাভাবিকভাবেই অনুভব করছেন।

এই কালের প্রারম্ভ তখন। ইংরাজি উনিশশো চার-পাঁচ সাল। শহরে এর অনেক আগেই হয়তো এ-কাল আরম্ভ হয়েছে কিন্তু গ্রামাঞ্চলে এ-কালের তখন প্রারম্ভ। আমাদের গ্রাম অন্য গ্রাম থেকে খানিকটা এগিয়ে ছিল। সুতরাং সেদিন কবি হিসাবে আমাদের আত্মঘোষণায় সকল রথীই উদ্যত ধনুর্বাণ হস্তে একবার সংশয়তীক্ষ্ম তির্যক দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে ইঙ্গিতেই প্রশ্ন করেছিলেন, সত্যই তোমরা প্রতিষ্ঠাকামী? যে অস্ত্র হাতে নিয়ে প্রবেশ করেছ—সে অস্ত্র সত্যই তোমার? প্রয়োগবিধি জান তুমি? মনে পড়ছে বহুজনের দৃষ্টিকোণে এই সংশয় দেখে ভীত হয়েছিলাম। সংকুচিত হয়ে পড়েছিলাম।

শুধু তিনজনকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি। একজন স্বর্গীয় নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়, একজন তাঁর মেজদাদা স্বর্গীয় অতুলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়, একজন শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়।

সঙ্গে সঙ্গে একজনের অতি কটুবাক্য মনে পড়ছে, আজ পর্যন্ত ভুলতে পারি নি। তাঁর নাম করব না, তিনি আজও জীবিত—বলেছিলেন, হরিবাবুর ছেলেটা ইঁচড়ে পেকে গেল! চুরি করে পদ্য লিখে ছাপিয়ে বিলুচ্ছে। উচ্ছন্নে যাবে।

দুই

ওই কথা মনে পড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ছে যখন সাহিত্যক্ষেত্রে সত্যসত্যই প্রবেশ করলাম তখনকার কথা। তারপর এই দীর্ঘকালের কথা। বাংলা ১৩৩৪ সালের ফাল্গুন মাসের কল্লোলে আমার প্রথম গল্প 'রসকলি' প্রকাশিত হয়। ১৩৩৫ সালের বৈশাখে 'হারানো সুর'। '৩৪ সালের ফাল্গুনের কল্লোলে 'রসকলি' প্রকাশিত হওয়ায় ষাণ্মাসিক মূল্য দিয়ে কল্লোলের গ্রাহক হলাম। 'হারানো সুর' প্রকাশিত হল এক মাস পর; তখন সম্পাদক জানালেন, আমাকে আর কল্লোলের জন্য মূল্য দিতে হবে না, কল্লোল আমি নিয়মিত পাব এর পর থেকে। সুতরাং এই ১৩৩৫ সালের বৈশাখ থেকেই আমার সাহিত্যিক জীবনের কাল গণনা শুরু করব। ১৩৩৫ থেকে ১৩৫৭

সাল পর্যন্ত চব্বিশ বৎসর পূর্ণ দুটি যুগ। এই চব্বিশ বৎসরে বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা আমার বাল্যের ঐ দিনটি থেকে তো পৃথক নয়। প্রকৃতিতে এক। দ্বন্দ্বজর্জর। হবে নাই বা কেন? মাইকেল বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের পূজোমণ্ডপকে ঐশ্বর্যে, মহিমায়, শোভায় তীর্থস্থলে পরিণত করেছেন, সমগ্র বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে এই তীর্থক্ষেত্রের পানে। এখানে সেবাইতের অধিকার পাবার জন্য প্রবেশপত্র পাওয়া তো সাধারণ কথা নয়! প্রতিযোগিতার দ্বন্দ্ব সেও সহজ দ্বন্দ্ব নয়। একই দলের সাহিত্যিকদের মধ্যে যে ঈর্ষা যে জর্জরতা দেখেছি, যে সমস্ত মন্তব্য উচ্চারিত হতে শুনেছি সে সব প্রকাশের অধিকার আমার নাই। নাই এই কারণে যে, তার মূলে বিদ্বেষটা খাঁটী সত্য ছিল না। যার নিন্দা করেছে তারই জন্য ব্যক্তিগতভাবে তার প্রাণ উতলা হয়েছে—আকুল হয়েছে—তাকে কাছে পেয়ে বিপুলানন্দে জীবনের একটি স্মরণীয় মুহূর্তকে পেয়েছে সে। তবু তার নিন্দা করেছে। করতে বাধ্য হয়েছে বেদনার্ত জীবনের প্রলাপের মতো। এ ব্যক্তিগত হীনতা নয়, এ জীবনের স্বভাব। অবশ্য এমন ব্যক্তিও আছেন যাঁকে হীন না বলে উপায় নাই, কারণ তিনি হীন অভিপ্রায়ে এই দুর্বলতাকে গল্পের আকারে প্রকাশ করেছেন—তাও এমনভাবে করেছেন যে, যেন গল্পের নায়কটিকে সহজেই পাঠক চিনে নিতে পারে। আমার ভালো লাগে নি। অবশ্য গল্পের মধ্যে আমি নেই তবুও ভালো লাগে নি। বাংলার পাঠক-সমাজেরও ভালো লাগে নি। তার প্রমাণস্বরূপ পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর আগের পাঁচশোর প্রথম সংস্করণটির অর্ধেকের উপর আজ প্রকাশকের ঘরেই রয়েছে।

ঠিক এই কারণেই আজ সাহিত্য-জীবনের কথা লিখতে বসে মনে হচ্ছে এ সংকল্প করে ভালো করি নি। সাহিত্য-জীবনের প্রথম ভাগটা আমার ভাগ্যের অবহেলার কাল, অবজ্ঞার যুগ। অবহেলা অবজ্ঞার সে এক বোঝা ঘাড়ে নিয়ে পথ চলেছি। সে সব কথার যতটা প্রকাশ না করলে নয়—তাই করব কিন্তু তাও কে অবজ্ঞা করলে, তার নাম আমি প্রকাশ করব না। প্রকাশ করব কৃতজ্ঞতার সঙ্গে কার কাছে কত ভালোবাসা পেয়েছি। কে কতখানি এগিয়ে দিয়েছেন। আর প্রকাশ করব যে-কালের মধ্যে আমি সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার পেলাম সেই কালে সাহিত্যের কি কি রূপান্তর ঘটল তাই।

আমার সাহিত্য-জীবনের শুরু কোন্‌খান থেকে করব সে নিয়ে আমার মনে কোন অস্পষ্টতা নেই। এই শুরুটি জীবনে অত্যন্ত স্পষ্ট প্রত্যক্ষভাবেই ঘটেছিল।

১৯৩০ সালের ডিসেম্বর মাসে যেদিন জেলখানা থেকে বের হলাম সেই দিনই মনে মনে এ সংকল্প করেছিলাম। জেলখানাতেই তখন "চৈতালী ঘূর্ণি" এবং "পাষাণপুরী" উপন্যাস দুখানি পত্তন করেছি; এবং তখন জেলখানায় রাজনীতি-সর্বস্ব মানুষের চেহারা দেখে ভবিষ্যৎ ভাবনায় শঙ্কিত হয়েছি; চিত্ত ভারাক্রান্ত হয়ে তখন রাজনীতির দিকে সম্পূর্ণরূপে বিমুখ হয়েছে। ভারতবর্ষের মানুষ, হিন্দুসংস্কৃতির পথে জীবনযাত্রা শুরু করেছি। কোন মতেই মিথ্যাচরণের আশ্রয় নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের এই পথে অগ্রসর হতে মন রাজী হল না। আত্মাই যদি কলুষিত হয় তবে স্বাধীনতার মধ্যে কি পাব আমি? বন্ধনমুক্ত জীবনে কোন্ আত্মার বিকাশ হবে—প্রকাশ হবে? সব থেকে পীড়িত হলাম আত্মকলহের কুটিল কদর্যতা দেখে। পরস্পরকে হেয় প্রতিপন্ন করবার জন্য সে কি ষড়যন্ত্র! মোক্ষম অস্ত্র প্রতিপক্ষকে স্পাই প্রতিপন্ন করা। একের দল ভাঙিয়ে বিশ্বস্ত অনুসারকদের নিজের দলভুক্ত করে নিজের দলকে পুষ্ট করে তোলাটাই তখন মুখ্য কর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। তখনও সম্মুখে মন্ত্রিত্বের গদি ছিল না, ছিল জেলা কংগ্রেসের চৌকি। অ্যাসেম্‌ব্লির চেয়ার তখনও অনেক দূরে, শুধু প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভ্যপদ মাত্র সম্মুখে।

সেদিন যা দেখেছিলাম ভুল দেখি নি। ঠিকই দেখেছিলাম। ১৯৩২/৩৩ সালের কংগ্রেস নির্বাচনে সে কদর্য দ্বন্দ্বের মীমাংসার জন্য শ্রীযুক্ত আনে এসেছিলেন কলকাতায়। মীমাংসা হয় নি। ত্রিপুরী কংগ্রেসে সে দ্বন্দ্ব ভাঙনে পরিণত হল। তার জের আজও চলেছে, চলেইছে। ইংরেজ চলে গিয়েছে; আজ সে কদর্যতা নখর-দন্ত প্রকাশ করে যুধ্যমান। দক্ষিণ-পন্থী-বামপন্থী; দক্ষিণপন্থীর মধ্যে একশো দল; বামপন্থীর মধ্যে হাজার দল। নিত্য প্রভাতে সংবাদপত্রে প্রচারিত পরস্পরের নিন্দাজনক বিবৃতি পড়ি আর সেদিনের সংকল্পকে প্রণতি জানাই। কিন্তু দেশের মুক্তিযজ্ঞের সাধকদের মনে যজ্ঞশেষে চরুলোভ যে সিদ্ধির আত্মপ্রসাদের পরিবর্তে এমন কুৎসিত গ্রাস প্রকাশ করবে, তা ভাবি নি। অবশ্য এখানে একটি কথা না বললে আমাকে পাপ স্পর্শ করবে তাই এ প্রসঙ্গ শেষ করবার পূর্বে সেই কথা বলব। সত্যকারের মুক্তিসাধক আজও আছেন, তাঁদের অনেককে জানি—চিনি। অনেককে জানি না। তাঁদের উদ্দেশে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে বলি, অরণ্যের অন্ধকারে কুটিল-জান্তব কোলাহলের মধ্যে তোমাদের প্রশান্ত কণ্ঠের আশ্বাসই তো আজ আমাদের সবচেয়ে বড় ভরসা!

১৯৩০ সালে ডিসেম্বরে জেল থেকে বের হবার আগে রাত্রে জেলখানায় বিদায় অভিনন্দন-সভা বসল। সভাপতি ছিলেন স্বর্গীয় ডাক্তার শরৎচন্দ্র

মুখোপাধ্যায়। বিদায়-সভায় চিরাচরিতভাবে বক্তৃতা হল। বক্তারা বললেন, পুনরাগমনায় চ! শীঘ্র আবার ফিরে এস।

আমি সেই সভাতেই আমার সংকল্পের কথা ঘোষণা করেই বললাম। বলা বাহুল্য ধিক্কৃতও হলাম। ধিক্কার দিলেন না শুধু শরৎবাবু। তিনি স্মিতমুখেই বললেন, শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।

সুতরাং এইখান থেকেই আমার সত্যিকারের সাহিত্য-জীবন শুরু।

তবুও এর পূর্বের কয়েকটি ঘটনার সঙ্গে আমার সাহিত্য-জীবন এমন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এবং তার প্রভাব এমনভাবে আমার সাহিত্য-জীবনকে প্রভাবান্বিত করেছে যে, সে ঘটনাকয়টি প্রকাশ না করলে আমার সাহিত্য-জীবনের গতি-প্রকৃতি সঠিক ব্যাখ্যাত হবে না।

সাহিত্যের হাতে-খড়ি নিয়েছিলাম কবিতায়। সবাই নিয়ে থাকে। বাংলা তেরশো বত্রিশ সালে বীরভূমে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল—সে সম্মেলনে মূল অধিবেশনে স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে কবিতা পাঠ করলাম। সম্মেলনশেষে লাভপুর ফিরলাম, সঙ্গে দুজন প্রতিনিধি এলেন। তাঁদের নিয়ে গেলাম চণ্ডীদাস নান্নুর। আমদপুর থেকে কাটোয়া পর্যন্ত ছোট লাইনের উপর লাভপুর এবং কীর্ণাহার স্টেশন, কীর্ণাহার থেকে নান্নুর ছ মাইল পথ। যানবাহনের মধ্যে একমাত্র গোরুর গাড়ি পাওয়া যায়। সঙ্গীরা গোরুর গাড়ি পছন্দ করলেন না; পদব্রজেই রওনা হলাম। কিন্তু বৈশাখের রৌদ্রে কষ্ট হল খুব। অন্তত তাঁদের হয়েছিল। আমার পথ হাঁটা অভ্যাস তখন খুব। ফেরার পথে দুর্বিপাক ঘটল, ট্রেন ফেল হল,—ফলে কীর্ণাহার থেকে লাভপুর পর্যন্তও পদব্রজে ফিরতে হল। মোটমাট একুশ-বাইশ মাইল পথ। যাই হোক সঙ্গীদের ফুটবাথ দিয়ে—খাইয়ে-দাইয়ে রাত্রের ট্রেনে রওনা করে দিয়ে সেই ক্লান্ত দেহ মন নিয়েই 'নান্নুর পথে' বলে একটি কবিতা লিখেছিলাম। কবিতাটির ছন্দের মধ্যে ক্লান্ত মনের একটি সুন্দর সুর ধরা পড়েছিল।

"কতদূরে কতদূর, মধুগীতি ভরপুর
পীরিতি-সায়র-তীরে মধুর নানুর।"

এই কবিতাটি ভারতবর্ষে প্রকাশিতও হল। জলধর সেন মহাশয় লিখলেন, 'এমনি মিষ্টি ছোট কবিতা মধ্যে মধ্যে পাঠিয়ো।' কিন্তু তবুও কবিতার পথে মন যেতে চাইল না। তখন আমাদের গ্রামে নাটকের রচনার ঢেউ উঠেছে। স্বর্গীয় নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় নাট্যকার হিসাবে বাংলাদেশে খ্যাতিলাভ করেছেন। কলকাতার রঙ্গমঞ্চে কয়েকখানি নাটকও অভিনীত হয়েছে। সে-সব নাটক সর্বপ্রথম অভিনীত হত আমাদের গ্রামের রঙ্গমঞ্চে। গ্রামে মস্ত পাকা নাটমঞ্চ, সামনে টিনে ঢাকা বিস্তৃত একটি দর্শক বসবার আসর। এমন কি

বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থাও ছিল। আমাদের গ্রামের শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় নাটক লেখেন, শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় নাটক লেখেন। হরি স্বর্ণকার—নাট্য সম্প্রদায়ের দূত প্রহরীর ভূমিকায় অভিনয় করে, ঘরে সোনা-রূপার গয়না গড়ে—সেও একখানা প্রহসন লিখে বসল। "গোরু-মানুষ"। প্রচলিত গল্পকে সে প্রহসন আকারে লিখেছে। সে প্রহসনও আবার চুরি হল; চুরি করলে এক ব্রাহ্মণতনয়। উমা সরকার ওরফে সাঁওতাল সরকার সেই প্রহসন নিজের নামে চালাবার চেষ্টা করলে; হরি স্বর্ণকার সেই নিয়ে মামলা করলে স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডে। মামলা দায়ের করলে, কি করবার আয়োজন করলে ঠিক মনে নেই; তবে মামলা উঠল না, তার আগেই মিটমাট হয়ে গেল। উমা সরকার ক্ষমা প্রার্থনা করে তার দাবি প্রত্যাহার করলে। এমনই আবহাওয়ার মধ্যে আমার মনেও নাটক রচনার জন্য আকুলতা জাগল। অনেক ভেবে তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ নিয়ে একখানা নাটক লিখলাম। আঠারো টাকা খরচ করে Grant Duff-এর তিন খণ্ড মারাঠাদের ইতিহাস কিনে পড়লাম। নাটক আমাদের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হল। নাটকখানি মঞ্চে আশ্চর্য রকম জমে গেল।

অভিনয়ের পর নির্মলশিববাবু বললেন, নাটকখানিকে ভালো নকল করে আমাকে দে, আমি কলকাতায় দেখাব। আর্ট থিয়েটারে দেব।

আর্ট থিয়েটারের তখন সমারোহের যুগ। "কর্ণার্জুন" থেকে "মগের মুলুক" পর্যন্ত অপরেশবাবুর নাটক একটার-পর-একটা হৈ-হৈ করে চলেছে। কলকাতার প্রবেশমুখে শ্রীরামপুরের স্টেশনের দেওয়াল থেকে ওদিক বোধহয় রানাঘাটের দেওয়াল পর্যন্ত রঙীন প্রাচীর-বিজ্ঞাপনীর ছটায় ঝলমল করে। গোটা কলকাতায় পথের দু পাশের দেওয়াল নাট্যকারের এবং নাটকের নামের যেন নামাবলী গায়ে জড়িয়ে থাকে। অভিনয় হয়, দর্শকে করতালি দেয়, মনে হয় অভিনন্দন জানাচ্ছে নাট্যকারকে। নাটকের মতো অন্য কোন রচনা বোধ হয় রচয়িতাকে এমন নগদ বিদায় দেয় না। সুতরাং নির্মলশিববাবুর কথায় আমার চোখে সেদিন রঙীন স্বপ্ন নেমে এল। স্বপ্ন দেখলাম। অনেক স্বপ্ন। দেওয়ালে দেওয়ালে আমার নাম। রঙ্গমঞ্চের রহস্যপুরীতে প্রবেশাধিকার। অনেক—অনেক—অনেক।

মহাকবি কালিদাস নিজে বামন ছিলেন না কিন্তু বামনেরও যে চাঁদ ধরতে সাধ হয় এবং লোকে উপহাস করলেও ওটা যে মনুষ্যস্বভাবের কোন আত্মবিস্মৃত মুহূর্তের ধর্ম এটা তিনি বুঝেছিলেন তাই নিজে বামন অর্থাৎ ব্যর্থ কবির দলের বেদনার ভাগ নিয়ে তাদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে রঘুবংশের ভূমিকা রচনা করেছিলেন। স্বপ্ন দেখা স্বাভাবিক, আমিও

দেখেছিলাম। কিন্তু উপহসিত হলাম। সেটা আমি আকারে খাটো বলে নয়, সাধারণ নাটমঞ্চ কৌশলীর হাতের ক্রেনের টানে নাগালের বাইরে চলে গেল বলে। নির্মলশিববাবু তখন নাট্যকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন—তার উপর তিনি ছিলেন রসিক মানুষ, সর্বোপরি কাঞ্চন-কৌলীন্যে নিকষ কুলীন। খ্যাতি অপেক্ষাও খাতিরটা ছিল ওজনে অনেক ভারী। আর্ট থিয়েটারের অধ্যক্ষ এবং নাট্যকার তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। নির্মলশিববাবু তখন সিউড়ীতে রাজ-পুরুষদের বন্ধুত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন, নিজে আর নাটক লেখার সময় পান না, বোধ করি সেই কারণেই অধ্যক্ষ বন্ধু বলেন—কই মশাই—নাটক-টাটক কিছু এনেছেন? দিন, মশাই—এক-আধখানা নাটক দিন। নইলে আর পারছি না, একা আর কত করব? সেই আশ্বাসেই নির্মলশিববাবু কলকাতায় এসে তাঁর হাতে নাটকখানি দিয়ে বললেন—পড়ে দেখুন। নাটক ভালো হয়েছে। আমি পড়েছি, অভিনয় করেছি—খুব জমেছিল।

—আপনি পড়েছেন মানে? আপনার নাটক নয়? অধ্যক্ষ নিজের হাত দুখানি পিছনের দিকে নিয়ে মুঠি বেঁধে একটু ঘুরে দাঁড়ালেন।

—আমার সময় কোথায়। নাটকখানি ভাগ্নী জামাইয়ের লেখা। তাকে তো দেখেছেন আপনি।

—হ্যাঁ। বসুন। তামাক খান। তারপর আর সংবাদ কি বলুন?

নাটকের বাঁধানো খাতাখানি হাতে নিয়েই নির্মলশিববাবু আর আর সংবাদ বললেন। ভাবলেন—বিদায়ের সময় হাতে তুলে দেবেন।

বিদায়ের সময় অধ্যক্ষ বললেন—ও আমি নেব না মশাই। জানেন তো—নাটক চুরি নিয়ে থিয়েটারের ম্যানেজার নাট্যকারদের বদনাম আছে অনেক।

হেসে নির্মলশিববাবু বললেন—পড়ে দেখুন, ভালো লাগবে। খুব জমবে আমি জোর করে বলতে পারি।

—না মশাই। মাফ করবেন আমাকে। তা ছাড়া ডিরেক্টরদের হুকুম ছাড়া নাটক আমি নিতে পারব না।

নির্মলশিববাবু আমার প্রথম জীবনের সাহিত্যগুরু। আমার প্রতি ছিল অগাধ স্নেহ। তিনিও এতেও দমিত হলেন না। ডিরেক্টরেরাও তো তাঁর অপরিচিত নন! অনেকেই তাঁর বন্ধু। পরের দিন তিনি বইখানি শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের হাতে দিলেন। হরিদাসবাবু সঙ্গে সঙ্গেই নাট্যাধ্যক্ষের হাতে দিয়ে বললেন—দেখুন পড়ে···বাবু। নির্মলশিববাবু বলছেন ভালো নাটক। দেখুন! আপনার পছন্দ হলে আমি পড়ে দেখব।

হরিদাসবাবুর নাটকবোধ প্রশংসনীয়। রবীন্দ্র মৈত্রের "মানময়ী গার্লস স্কুল" নাটক নির্বাচনে তিনি সে পরিচয় দিয়েছেন। "শনিবারের চিঠি"তে

নাটকখানি পড়ে তিনিই সেখানিকে নির্বাচিত করেছিলেন। মঞ্চে তখন নাটকের দারুণ অভাব। এবং অধ্যক্ষ নাট্যকার রোগে শয্যাশায়ী অক্ষম। তাই তাঁকেই সেদিন নাটকের খোঁজে থাকতে হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে তিনি নিয়মতান্ত্রিকতা বজায় রাখলেন। জেলার কর্তার কাছে কোন দরখাস্ত পাঠালে সে দরখাস্ত তিনি যেমন নিয়মমাফিক তদন্ত ও মতামতের জন্য মহকুমা হাকিমের কাছে অবিলম্বে পাঠিয়ে দেন, ঠিক তেমনি ভাবেই অধ্যক্ষের হাতে দিয়ে তাঁর মতামতের প্রতীক্ষায় রইলেন। নইলে তিনিই যদি পড়তেন তবে কি হত বলতে পারি না। কারণ অনেক কাল পরে—এই কিছুদিন আগেও কোন রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষ ওই নাটকখানি মঞ্চস্থ করতে চেয়েছিলেন; তাঁদেরও পছন্দ হয়েছিল। আমিই দিই নি। থাক—সে পরের কথা। সেই ঘটনার কথাই বলি।

এবার অধ্যক্ষ মশায় নাটকখানি হাতে নিলেন। মজলিসের রসালাপের মধ্যে একসময় একান্তে নির্মলশিববাবুকে বললেন—একটু অপেক্ষা করে যাবেন।

মজলিস ভাঙল। সকলে নামলেন। অধ্যক্ষ এবং নির্মলশিববাবু রইলেন। সিঁড়ির উপরের পাদুকাধ্বনি ক্রমশঃ মোটরের স্টার্ট নেওয়ার শব্দের মধ্যে সঙ্গতের তেহাই শব্দে সঙ্গীত শেষ ঘোষণার মতোই ঘোষণা করলে—তাঁরা চলে গেছেন। অধ্যক্ষ খাতাখানি নির্মলশিববাবুর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন—অনুগ্রহ করে এখানি নিয়ে যান। নাট্যকারকে ফিরিয়ে দেবেন।

—পড়বেন না?

—না। এবার গম্ভীরভাবে অধ্যক্ষ বললেন—দেখুন নির্মলবাবু, আপনি বন্ধু লোক, আপনি আগেই নাট্যকার হিসেবে মঞ্চে পাসপোর্টও পেয়েছেন, আপনার নিজের নাটক যদি থাকে আনুন, আনন্দের সঙ্গে নেব, অভিনয়ও হবে। কিন্তু দোহাই! বন্ধু আত্মীয় এদের এনে ঢোকাবার চেষ্টা করবেন না। আজকের সূচ কাল ফাল হয়ে ভূমি বিদীর্ণ করে বের হলে আমাদের পস্তাতে হবে। আপনি বড়লোক, নাটক লেখা আপনার নেশা—আমাদের এটা পেশা। এখানে সহজে তো শরিক ঢুকতে দেব না! রঙ্গমঞ্চের চৌঘুড়ির রাশ ধরে সারথ্য করা অভ্যাস, দুর্ভাগ্যক্রমে কোন দিন ভুলের জন্য সারথ্য-কর্মচ্যুত হলে অশ্বের জন্য তৃণ কর্তন ছাড়া আর গতি থাকবে না। সে ভুলের ত্রিসীমায় পা বাড়াই না আমি।

নির্মলশিববাবু নতমস্তকেই খাতাখানি ফিরে নিয়েছিলেন।

নতমস্তকেই আমাকেও ফিরে দিয়েছিলেন। আমি কলকাতায় এসেছিলাম। কংগ্রেসের একটা কাজ ছিল—সেটাকে লক্ষ্য ঘোষণা করেই এসেছিলাম কিন্তু আসলে ওটা ছিল উপলক্ষ্য—লক্ষ্য আসলে ছিল—ওই নাটক নিয়ে ভাগ্য-

পরীক্ষা। কলকাতায় এসে উঠেও ছিলাম নির্মলশিববাবুদেরই বাসায়। দেশে মস্ত জমিদারি থাকলেও তাঁদের মূল ব্যবসা কলকাতায়—কয়লার ব্যবসায়। মস্ত আপিস—প্রকাণ্ড বাসা। উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি। অপরাহ্ণে নির্মলশিববাবু থিয়েটারের মজলিসে যান—ফেরেন সাড়ে-দশটা এগারোটা কোনদিন বা একটায়। আমি জেগেই থাকি, যদি ডাকেন তৎক্ষণাৎ গিয়ে দাঁড়াব। সুসংবাদ শুনব। সেদিন এসে থমকে দাঁড়ালেন। তারপর চলে গেলেন। তাঁর হাতে খাতাখানা আমার তীক্ষ্ণ উৎসুক চক্ষুর দৃষ্টি এড়াল না। কিন্তু উঠে গিয়ে প্রশ্ন করতে লজ্জা বোধ করলাম। কিছুক্ষণ পর তিনি আবার ফিরে এলেন। তিনিও থাকতে পারেন নি। বেদনা তিনিও পেয়েছিলেন, যথেষ্ট পেয়েছিলেন। আমায় ডাকলেন। আমি উঠে এলাম। নীরবে তিনি খাতাখানি আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

আমি খাতাখানি নিলাম, একবার অকারণে পাতাগুলির কয়েকখানা উলটে বললাম—হল না?

—না।

আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। তিনি চলে গেলেন। আমি একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেললাম। আবার তিনি ফিরে এলেন। মনে হল কিছু বলতে চাচ্ছেন—বলতে পারছেন না।

এবার আমি প্রশ্ন করলাম—কী খারাপ হয়েছে বললেন?

—ভালো-খারাপের কথাই নাই তারাশঙ্কর, বইখানা না পড়েই ফিরিয়ে দিয়েছেন।

—না-পড়েই?

—হ্যাঁ।

তিনি আবেগভরেই সমস্ত কথা আমাকে বলে গেলেন। বললেন—তবে তুই যেন ছাড়িস নে। কতকাল আটকে রাখবে?

ভেঙে গেল নাট্যকার হওয়ার স্বপ্ন।

পরদিনই কংগ্রেস-সংক্রান্ত কাজ শেষ করে সন্ধ্যার গাড়িতে চলে গেলাম। বাড়ি ফিরে খাতাখানি উনানে গুঁজে দিলাম। ভাবাবেগে বিচলিত হয়েছিলাম, নইলে মনে হওয়া উচিত ছিল যে, ঐ খাতাখানিই আমার হাস্যকর উদ্বাহু মূর্তির একমাত্র চিত্র নয়, ওই খাতারই আরও নকল আছে। দেশের মঞ্চে অভিনয় হয়েছে, সেখানে আছে, বাড়িতেও আছে, মূল খাতাখানিই আছে। সে রয়ে গেল ভাবীকালে আমার ভাগ্যে আরও একবার মসীলেপনের জন্য। থাক, সে কথা যথাস্থানে হবে।

তিন

এই ঘটনাটি আমার জীবনে সাহিত্যসাধনায় একটি ধারা-পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়ে গেল। সেদিন যদি এই ঘটনাটি না ঘটত, যদি নাটকখানি মঞ্চস্থ হত, এমন কি ওই কথাগুলি না বলে পড়ে দেবার ছল করেও দু-দশটা দোষ দেখিয়ে সহানুভূতিসূচক কথা বলে ভদ্রতার সঙ্গে 'হল না' কথাটা বলতেন তা হলে নাটক লেখা ছাড়তাম না। নাটকই লিখে যেতাম। নাট্যকার হিসেবেই হয়তো আমার পরিচয় হত। কিন্তু এই আঘাত আমার মুখ ফিরিয়ে দিলে রঙ্গমঞ্চ এবং নাটকের পথ থেকে। নাটক আর লিখব না স্থির করলাম। কী লিখব? কিছুই লিখব না। স্থির করলাম কিছুই লিখব না।

লিখলাম না কিছুই কয়েক নাস।

কংগ্রেসের কাজ রয়েছে, সমাজ সেবক সমিতির সেবাধর্ম রয়েছে, বাড়িতে অভাব-অভিযোগের মধ্যে ক্ষেতের ধান-চাল রয়েছে, এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়ানো রয়েছে—এর মধ্যে একটি ধোঁকার টাটি তৈরী করা এমন শক্ত কি?

হঠাৎ আবার ঘটল একটা ঘটনা।

নির্মলশিববাবুর বড় ছেলে সত্যনারায়ণ—সে নিজে লেখে না কিন্তু সাহিত্যে তার খুব শখ। কালটা যদি পুরাকাল হত আর সত্যনারায়ণ যদি রাজপুত্র হত তবে সে সত্যাদিত্য নামে সাহিত্যরসিক এবং সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক বলে বিখ্যাত হত এ নিশ্চয় বলতে পারি। সে হঠাৎ এল, মাসিক পত্রিকা বের করবে। এবং আমাকে হতে হবে সহকারী সম্পাদক। সম্পাদক নির্মলশিববাবু। অবশ্যই উৎসাহিত হলাম। ভুলে গেলাম লিখব না সংকল্পের কথা। রবীন্দ্রনাথ "বৈকুণ্ঠের খাতা"য় লিখেছেন সাহিত্যের কামড় কচ্ছপের কামড়। অর্থাৎ কামড় দিলে সহজে সে কামড় ছাড়ে না। সেটা অবশ্য সাহিত্যিক এবং পাঠক সম্পর্কে লিখেছেন। লেখা শোনাবার লোক পেলে সাহিত্যিক সহজে তাকে ছাড়ে না, ক্ষিদে পেলে খাইয়েও লেখা শোনায়, ঘুম পেলে খুঁচে ঘুম ভাঙিয়েও শোনায়। মশা কামড়ালে মশারি খাটিয়ে তার মধ্যে বসিয়েও লেখা শোনানো আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় আছে, আমাকেই শুনতে হয়েছে। কিন্তু আমি বলছি সাহিত্যসেবার নেশার কথা। এটিও ওই কচ্ছপের কামড়। তফাত এই যে, মধ্যে মধ্যে ব্যর্থতার ধাক্কার

মেঘগর্জনে ছেড়ে দেয়, এবং আবার কিছুদিন পরেই জলাশয়ের ধারে গেলেই সাহিত্য-কূর্ম তেড়ে এসে দ্বিগুণ জোরে কামড়ে ধরে। আমারও তাই হল। সত্যনারায়ণের খনিত সাহিত্য-সরোবরে সেদিন যেমন নেমেছি অমনি কামড় খেলাম। ধরলেন সাহিত্য-কূর্ম। শ্রোতা এ কামড়ে বেদনা অনুভব করে—কিন্তু সাহিত্যিককে সাহিত্য-কামড়ে ধরলে ঠিক তার উলটো হয়, সে বেশ পুলক অনুভব করে। বাতের ব্যথায় রক্ত মোক্ষণের মতো একটা আরাম হয় তার। ফলে এবার লিখতে লাগলাম দু হাতে। কবিতা-গল্প-সমালোচনা-সম্পাদকীয়—অনেক লিখে যাই। কাগজখানির নাম ছিল "পূর্ণিমা"। আমিই প্রায় রাহুর মতো গিলে ফেলতাম তার অর্ধেকটা, কিন্তু একটা কী যেন খচখচ করত তবু মন ভরত না। যে সব লেখা "পূর্ণিমার" কর্তৃপক্ষের ভালো লাগত সে সব আমার ভালো লাগত না।

ঠিক এই সময়ে একদিন—সিউড়ীতেই হবে, এক উকিলের বাড়িতে উঠেছি কংগ্রেসেরই কাজে। উকিলরাই তখন কংগ্রেসের পাণ্ডা। বীরভূমে শরৎবাবুই ছিলেন কংগ্রেসের প্রাণ। সভাপতি। কিন্তু প্রাণ আর মস্তিষ্ক দুটো স্বতন্ত্র বস্তু। মস্তিষ্কের বাড়িতে রাত্রে থাকতে হল। রাত্রে ঘুম আসে না। হয় গরম নয় শীত, দুটোর একটা হেতু বটে। তার উপর ছেঁড়া মশারির ফাঁক দিয়ে মশা ঢুকছে ঝাঁকে ঝাঁকে। সিউড়ীতে মশকের উপদ্রবের অবস্থাটা অন্ধের দিবারাত্রির মতো, ওর আর শীত-গ্রীষ্ম নাই। জেগে বসে বিড়ি খাই আর গুনগুন করে গান গাই। এমনই অবস্থায় হঠাৎ হাতড়ে মিলল একখানা মলাটছেঁড়া "কালিকলম" পত্রিকা।

আলোটা বাড়িয়ে দিলাম। চোখে পড়ল অদ্ভুত নামের একটা লেখা এবং লেখকের নামটা অদ্ভুত না হলেও বিচিত্র।

"পোনাঘাট পেরিয়ে", লেখক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র।

পড়ে গেলাম গল্পটি। বিচিত্র বিস্ময়পূর্ণ রসমাদকতায় মন মদির হয়ে গেল। মশকের গানে বা দংশনেও কোনো ব্যাঘাত ঘটাতে পারলে না।

ওলটালাম পাতা। আবার পেলাম একটি গল্প। গল্পটির নাম মনে নেই। লেখক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

অদ্ভুত! বীরভূমকে এমনি করে কলমের ডগায় অক্ষরে অক্ষরে সাজিয়ে রূপ দেওয়া যায়!

তার আগে "পূর্ণিমা"য় আমি একটি "স্রোতের কুটো" বলে গল্প লিখেছি। গল্পটি আমার বিচারে ভালোই হয়েছে কিন্তু "পূর্ণিমা"র বিচারে ভালো হয় নি। তবু বেরিয়েছিল; জঠর পূর্তি করতে খাদ্যেরই যেখানে অভাব সেখানে

ভালো খাদ্যের কড়াকড়ি তো খাটে না। বুনো ওল থেকে মেটে আলু— যা-হোক হলেই চলে। সেদিন রাত্রে দেখলাম ওই লেখাগুলির সঙ্গে আমার "স্রোতের কুটো"র ঢং-এর বেশ মিল আছে। তবু একটা কথা মনে হয়েছিল— মনে হয়েছিল গল্পগুলির আত্মা যেন জৈবিক বেগের প্রাবল্যে বেশী অভিভূত;—পরাভূত হয়েছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। এমন কি ঐ আবেগের সঙ্গে যে দ্বন্দ্ব তার স্বাভাবিক ধর্ম, তারও অভাব রয়েছে বলে মনে হল। জীবদেহ আশ্রয় করেই জীবনের বাস। কিন্তু সে তো তাকে অতিক্রম করার চেষ্টার মধ্যেই মানবধর্মকে খুঁজে পেয়েছে! সেইখানেই তো নিজেকে পশুর সঙ্গে পৃথক বলে জেনেছে। ইচ্ছে হল এমনি গল্প লিখব। সত্যকারের রক্তমাংসের জীবদেহে ক্ষুধা আর তৃষ্ণা—তার কামনার ধারার সঙ্গে মিশেই চলেছে। জীবন চলেছে একটি স্বতন্ত্র ধারায়। কোথাও জিতেছে কোথাও হারছে।

দিন কয়েক পরেই এলাম একটি নিবিড় পল্লীগ্রামে। আমাদেরই মহলে। যেখানে বাসা হল, তার সামনে একটি ছায়ানিবিড় আখড়া, বৈষ্ণবের কুঞ্জ। গ্রামের লোকে বলে কমলিনীর আখড়া, রসিক জনে রসান দিয়ে বলে কমলিনীর কুঞ্জ! বৈষ্ণব নাই, আছে শুধু কমলিনী বৈষ্ণবী। আমি পৌঁছুবার কিছুক্ষণ পরই ক্ষারে-ধোয়া কাপড়খানি পরিপাটি করে পরে শ্যামবর্ণ মেয়েটি হাস্যমুখে সামনে এসে দাঁড়াল। হাতে একখানি ঝকঝকে মাজা রেকাবিতে দু-খিলি পান, পাশে দুটি লবঙ্গ, টুকরো দুয়েক দারুচিনি, একটি ছোট-এলাচ, নামিয়ে দিয়ে হেঁট হয়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলে—বললে, প্রভুর জয় হোক!

উঠবার সময় মাথার কাপড় একটু সরে গেল। রাখাল-চূড়া-বাঁধা কেশপ্রসাধন চোখে পড়ল। আবার ঘোমটাটি তুলে দিয়ে সে খুঁটিয়ে আমার বাড়ির কুশলবার্তা নিলে। সে যেন পরমাত্মীয়।

কী একটা কাজে উঠে ঘরের মধ্যে গিয়েছি—কানে এল—আমাদের গোমস্তা বলছে—পানের চেয়ে বৈষ্ণবীর হাসি মিষ্ট।

মনে হল, বৈষ্ণবীর কর্ণমূল পর্যন্ত আরক্ত হয়ে উঠেছে। উঁকি মারলাম—না তো। সবিনয়ে বৈষ্ণবী আরও একটু হেসে বললে—বৈষ্ণবের ওই তো সম্বল প্রভু!

এই তো! এই তো সেই জীবনের জয়।

কথার হাওয়ায় জৈব রসের দিঘিতে ঢেউ উঠল, তাতে তো ওর জীবন ডুবল না, ডুব দিলে না, সে ঢেউয়ের উপর নাচতে লাগল পদ্ম ফুলের মতো।

এর পরই এল পাগলা বৈরাগী পুলিন দাস। লোকে বলে—ক্ষ্যাপা। সঙ্গে তার বলাই মোড়ল।

ক্ষ্যাপা ফাঁক পাবা মাত্র গিয়ে উঠল কমলিনীর আখড়ায়।

পুলিন ওখানেই প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা থাকে। সেদিন রাত্রে শুয়েই শুনলাম—কমলিনী বলছে পুলিনকে—যাও—বাড়ি যাও।

—কেন?

—রাগ করবে যে।

—কে?

—কে আবার? তোমার বষ্টুমী। বলেই সে হেসে ছড়া কেটে উঠল। পাঁচসিকের বষ্টুমী তোমার গোসা করেছে—হে গোসা করেছে।

আমার ঘুম ছুটে গেল। দোয়াত কলম খাতা নিয়ে বসে গেলাম। পেয়েছি। "রসকলি"র পত্তন করলাম।

গ্রামে ঢুকতেই ছোট নদীর ধারে একটা বটগাছ দেখেছিলাম; বিচিত্র বটগাছটা। তার শিকড়গুলোর তলায় মাটি ধুয়ে গিয়েছে; বড় অজগরের মতো এঁকেবেঁকে বেরিয়ে আছে শিকড়টা। মনে হয় একটা বড় সাপ গর্তে মুখ ঢুকিয়ে দেহটায় রোদ-বাতাস নিচ্ছে। সেটা মনে পড়ে গেল। সেখান থেকেই শুরু করলাম।

গল্প পেলাম।

আমার নায়িকা মঞ্জরী, জীবদেহের সরোবরে পদ্মের মতো জীবন নিয়ে ফুটল। শুধু আমার গল্পের নায়িকা মঞ্জরীই ফুটল না—আমার মনে হল, আমি কেমন করে আচম্বিতে পৃথিবীর মায়াপুরীতে এটা ওটা নাড়তে নাড়তে সোনার কাঠি কুড়িয়ে পেলাম। যার স্পর্শে অসাড় মানুষ ঘুম ভেঙে ফুটে ওঠে ফুলের মতো। গল্প লেখার ওইটেই একটা বড় সমস্যা। সব হয় কিন্তু বেঁচে ওঠে না—জেগে ওঠে না। জানি না, পৃথিবীর যাঁরা মহারথী তাঁদের কেউ এই বাঁচিয়ে তোলার, জাগিয়ে তোলার বিদ্যাই বলুন—আর মন্ত্রই বলুন—এটা কারুর কাছ থেকে শিখেছেন কিনা—অথবা শাস্ত্র পড়ে পেয়েছেন কিনা। তবে আমার মনে হয় ওই শক্তিটুকু একদিন অকস্মাৎ জেগে ওঠে। কেমন করে জানি না শিল্পী সাহিত্যিকের আসে একটা তন্ময়তার যোগ; তখন পাত্র-পাত্রীর জীবনের সুখ-দুঃখের মধ্যে ডুবে যায় শিল্পী; তখনই জেগে ওঠে—ফুটে ওঠে। এইটুকুর জোরেই আমি যতটুকু পেরেছি সেটুকু সম্ভবপর হয়েছে। এই কারণেই আমার পাত্র-পাত্রীর মুখে আমার ভাষার কথা আমি বলতে পারি না, তাদের নিজেদের ভাষা আমার ভাবনায় রচনায় বেরিয়ে আসে। মহান পূর্বাচার্যগণের মতো নিজস্ব একটি ভাষা আমি এই

কারণেই করতে সক্ষম হই নি। সে শক্তি বোধ হয় আমার নেই এবং সে চর্চা করার ঝোঁকও আমার জাগে নি। নইলে অনুকরণ করে একটা ভাষা তৈরী করা খুব কঠিন নয়; বেঁকিয়ে পেঁচিয়ে কথা বলার যে আধুনিক ঢংটা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে সমাদৃত হয়েছে, সেটা রবীন্দ্রনাথের অননুকরণীয় ভাষার অক্ষম অনুকরণ। ক্ষেত্র-বিশেষে ফরশা বাঙালী মেয়ের মুখের লিপস্টিক রুজ প্রসাধনের মতো ঝকঝকে হয়ে ওঠে বটে কিন্তু তাতেও তার মেকী ফিরিঙ্গীয়ানা ঢাকা পড়ে না। আমি আমার দেশের মানুষকে যতদূর জানি এবং আমি নিজেও সেই মানুষদেরই একজন বলে বেশ একটু খুঁতখুঁতে-চিত্ত। সেই কারণেই বর্ণসাঙ্কর্যকে পছন্দ করি না। আত্মাকে খর্ব করে যেখানে দেহ-পরিতোষ বা পরিচর্যা বড় হয়ে ওঠে সেখানে ভিতরটা হয় খাটো, বাহিরটাই হয় বড়। বাহার বড় হলে সে হয় বিলাসিনী, তাকে নিয়ে প্রমোদ-রসের রঙীন ফানুস উড়িয়ে উল্লাস করা চলে কিন্তু তাকে নিয়ে অন্তরের দুঃখের কথা বলা চলে না, গভীর সুখের কথাও না। রসবিলাসের তৃপ্তি-সাধন আর অন্তরের তৃষ্ণা মেটানো—দুটো সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র কথা। রবীন্দ্র-নাথের সাহিত্য তাঁর নিজের রূপ এবং আত্মার মতোই ষড়ৈশ্বর্যশালী। রসলালিত্য ও বৈচিত্র্যে সে যত ললিত এবং বিচিত্র, ভাবগভীরতায় আত্মিক ধ্যানে সে তত গভীর এবং তন্ময়। নিজের পুঁজি বুঝেই আমি তাকে অনুকরণ করি নি।

থাক ও কথা এইখানে।

আমার কথায় ফিরি। নূতন গল্পটি লিখে মনে হল, আমি, আমার মনে যে মানুষগুলি আছে তাদের বাইরে এনে জীবন্ময় করে জীবনের হাটে মুক্তি দেবার সোনার কাঠি পেয়েছি।

গল্পটি লিখে তার নাম দিলাম "রসকলি"। আমাদের "পূর্ণিমা" তখনো চলছে। কিন্তু আগের গল্প "স্রোতের কুটো" সম্পর্কে মন্তব্যের কথা স্মরণ করে এবং মন্দ কবির স্বভাবগত যশোলিপ্সার প্রেরণায় ওটিকে "পূর্ণিমা"য় না দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম বাংলাদেশের একখানি বিখ্যাত পত্রিকায়। ডাক-টিকিট অবশ্যই দিলাম। এবং উদ্বিগ্ন চিত্তে দিন গণনা করতে লাগলাম। দিন পনেরো পর একখানি রিপ্লাই কার্ড লিখলাম। পনেরো দিন পর দু-ছত্রে জবাব এল—গল্পটি সম্পাদকের বিবেচনাধীন আছে।

আবার মাসখানেক পর আর-একখানা রিপ্লাই কার্ড লিখলাম।

জবাব এল। সেই দু-ছত্রের জবাব, সম্পাদকের বিবেচনাধীন আছে।

আবার লিখলাম চিঠি। আবার সেই এক জবাব। এক সই।

বোধ হয় সাত মাস কি আট মাস চলে গেল। মোটমাট আট থেকে

দশখানি রিপ্লাই কার্ড আমি অক্লান্ত ভাবে লিখে গেলাম। তাঁরাও সেই একই জবাব দিলেন। আট মাস পর আমি আবার এলাম কলকাতায়; কাজ দু-চারটে ছোটখাটো, তার মধ্যে ওটাও একটা। এবার স্বয়ং গিয়ে আপিসে হাজির হলাম। টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলাম আমার একটা গল্প—

—দিয়ে যান—ওখানে।

—না। অনেক আগে পাঠিয়েছি।

—পাঠিয়েছেন? কি নাম আপনার? গল্পের কি নাম?

বললাম নিজের নাম, গল্পের নাম। তাঁরা একখানা খাতা খুলে দেখেশুনে বললেন—ওটা এখনও দেখা হয় নি। দেখা হয় নি? বিবেচনাধীন থাকার এই অর্থ? আমার ধারণা হয়েছিল—পড়ে দেখা হয়েছে—হয়ত কিছুটা ভালো লেগেছে—কিছুটা লাগে নি, সেইজন্য বিবেচনা করছেন—দেওয়া যায় কি না যায়। তাছাড়া গল্পটি নিছক প্রেমের গল্প; পত্রিকাটির রুচি সম্পর্কে কড়াকড়ির একটা খ্যাতিও আছে; কটন-ইস্কুলের মতো গল্পটিকে শায়েস্তা করে নেওয়ার বিবেচনাও এ-ক্ষেত্রে অসম্ভব নয়। গল্প যে প্রকাশযোগ্য সে বিশ্বাস আমার ছিলই।

আজ এই উত্তরে মনে একটা ক্ষোভ জেগে উঠল। নূতন লেখক বলে তাঁরা গল্পটা পড়েও দেখেন নি? মনে পড়ে গেল "মারাঠা তর্পণে"র লাঞ্ছনার কথা। ভাবলাম, সাহিত্যসাধনার বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়ে গঙ্গাস্নান করে বাড়ি ফিরে যাব এবং শান্ত গৃহস্থের মতো জীবনটা ধানচালের হিসাব করে কাটিয়ে দেব। আর বেঁচে থাক কংগ্রেস, ওরই মধ্য দিয়ে জেল খেটে কাটিয়ে দেব জীবন।

বললাম, দয়া করে আমার গল্পটা ফেরত দিন।

—নিয়ে যান। দেখে দিন মশাই—।

অন্য একজন দেখেশুনে লেখাটা ফেরত দিলেন। আমি লেখাটা হাতে করে মধ্য কলিকাতা থেকে দক্ষিণ কলিকাতা পর্যন্ত হেঁটে বাড়ি ফিরলাম। চোখে বার কয়েক সেদিন জল এসেছিল। ভাগ্যকে তখন মানতাম, ভাগ্যকেই সেদিন বার বার ধিক্কার দিলাম। বাড়ি চলে গেলাম সেই রাত্রেই। গঙ্গাস্নান আর করা হল না।

চার

জলাঞ্জলি দেবার সঙ্কল্পটিকে কাজে পরিণত করবার জন্য কর্মজীবনে ঝাঁপ দিয়ে পড়লাম। ধানচালের হিসাবের কাজ নয়; ওতে মনই উঠল না। কাজ, দেশসেবার কাজ। কংগ্রেসের আদর্শে খানিকটা গঠনমূলক কাজ হলেও কংগ্রেসের কাজ নয়। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট হলাম। কিছু কাজ আমার চাই। চরকা কাটি বটে কিন্তু ওতে সমস্ত দিনটা কাটে না। আমাদের ইউনিয়ন বোর্ডের অবস্থা তখন বিশৃঙ্খল। ওই কাজই ঘাড়ে তুলে নিলাম। একটা বাই-ইলেকশনে মেম্বর হয়ে সঙ্গে সঙ্গেই প্রেসিডেণ্ট হলাম। আমার মনের অবস্থা বুঝবার জন্যেই ঐ কথা এখানে উল্লেখ করছি। সকালে বাইসিক্ল নিয়ে বের হই—গ্রামে গ্রামে ঘুরি, পথ-ঘাট নালা-খাল দেখে বেড়াই। ভাঙা পথ মেরামত করাই, আঁকাবাঁকা নালাকে সোজা করে কাটাই; ওখানকার আবালবৃদ্ধবনিতার সঙ্গে পরিচয় করি। তাদের মনের খবর বিচিত্র পরিচয় নিজের মনে বহন করে ফিরে আসি। বাড়ি ফিরি দুটো আড়াইটের সময়। তারপর স্নান-আহার। বিকেলে বোর্ড আপিসে খাতাপত্র দেখা, মজুরদের মজুরি দেওয়া নিয়ে কেটে যায়। দেখতে দেখতে কাজটা বড় ভালো লাগল। ভুললাম যেন মনোবেদনা। ভাবলাম এই পথেই চালিয়ে দেব জীবন। প্রশংসা তো পেলামই—মনও কর্মের তৃপ্তিতে ভরে উঠল। একদিন ডান হাতখানাকে প্রায় ভেঙে ফেললাম উৎসাহের প্রাবল্যে।

একটি গ্রাম্য পথের খানিকটা অংশ নিয়ে ইউনিয়ন বোর্ডের এক সম্ভ্রান্ত চাষী পরিবারের সঙ্গে নয় বৎসর ধরে বিরোধ চলছিল। ওই অংশটার পাশে ছিল ওই চাষী ভদ্রলোকের পুকুর। তাতে রাস্তাটি সেখানে এমনই সঙ্কীর্ণ যে, গরুর গাড়ি কোনক্রমেই যেতে পারে না। পুকুরের ধারে একমানুষ-সমান উঁচু তালগাছের সারি দুর্ভেদ্য বেড়ার মতো খাড়া হয়ে রয়েছে। বোর্ড বলে, এনক্রোচমেণ্ট। ভদ্রলোক বলেন, কিসের এনক্রোচমেণ্ট? বোর্ড হল কবে? এ রাস্তা এ-রকমই চিরকাল। শীতে গ্রীষ্মে ক্ষেতের উপর দিয়ে গাড়ি চলে। অন্য সময় গ্রামের মধ্যে গাড়ি সৃষ্টির আদিকাল থেকে চলেই না।

এই নিয়ে প্রথম ওখানকার প্রেসিডেণ্ট জমিদার নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় চেষ্টা করেন। সফল হন না। ভীতি প্রদর্শন করেন—তাতেও না।

তারপর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আসেন—হুকুম করেন, কিন্তু তাতে চাষী ভদ্রলোক দমেন না। শেষে শেষে মামলা হয়। মামলাতে ইউনিয়ন বোর্ড হেরে যায়। বোর্ড তখন স্থির করে উপরে লিখে সরকারী জমিক্রয় বিধানে ওই অংশ কেনা হবে। কিন্তু এই সময়েই নির্মলশিববাবু হলেন পীড়িত—স্বাস্থ্যের জন্য তিনি চলে গেলেন কাশী, বোর্ডে হল বিশৃঙ্খলা, রাস্তাটা পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে রইল। আমি ওখানে মজুর লাগাবার কথা বলতেই সকলে হা-হাঁ করে উঠলেন। মজুর উঠিয়ে দেবে। বোর্ডের অপমান হবে। সকল বিবরণ বললেন তাঁরা। আমি ভাবলাম। ভেবে বললাম, মজুর ওখানেই লাগানো হোক। দায়ী রইলাম আমি। আমার জোর, আমি তো জানি এদেশের মানুষকে। যতদূর জানি তাতে এ-দেশের মানুষের কাছে প্রার্থনা করে বিফল হয়ে ফেরার তো কথা নয়! সঙ্কল্প করলাম যাচাই করে দেখব। এ-দেশের মানুষকে জানার একটা অহঙ্কার ছিল।

সাধারণতঃ সম্ভ্রান্ত লোকেরা চাষী সজ্জনদের জানেন অনুগত জন হিসেবে; বৈষয়িক ব্যবহারের মধ্যে দিয়েই সে পরিচয়টা হয়ে থাকে। ক্ষেত্র-বিশেষে চাষীরা অনুগ্রহ নেন, সম্ভ্রান্তরা অনুগ্রহ করেন। সে অনুগ্রহ এদের শোধ হয় না, শোধ করতে চেষ্টাও করে না। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে পরিচয় সে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। আমার পরিচয় এদের সঙ্গে ওই তিন ধারাতেই হয়েছিল। বৈষয়িক ব্যবহারের পরিচয়ও ছিল; দেনা-পাওনা নিয়ে বিরোধ হয়েছে, কখনও বা দু-একটা মামলাও হয়েছে। কিন্তু ওদিকে আমার বা আমার অভিভাবিকা আমার মায়ের আসক্তি খুব প্রবল ছিল না বলে অল্পেই আপোস হয়ে যেত। আমাদের জিদ ছিল না বলেই ওদের জিদ বাড়ে নি। নইলে ওদের যে জিদ সে জিদ জমিদারের চেয়ে কম নয়। মামলা চালিয়ে ওরাই সর্বস্বান্ত হয়েছে বেশী। সর্বস্বান্ত হয়ে ভগ্নহৃদয়ে যতজন হার স্বীকার করছে তাদের সংখ্যা সর্বস্বান্ত হয়েও যারা হার স্বীকার করে নি, পৈতৃক ভিটা ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছে তাদের সংখ্যার চেয়ে বেশী নয়। এ পরিচয় আমি জেনেছিলাম। এ নিয়ে আমার একটি গল্প আছে "রাজা রানী ও প্রজা"। রাধাবল্লভ বলে একটি প্রজার সঙ্গে মামলা বাধল। সে গৃহত্যাগ করে ফিরতে লাগল, তবু সে অবনত হল না। অকস্মাৎ ঘটনাচক্রে রাধাবল্লভ পেলে আমাদের বাড়িতে সস্নেহ সমাদর। সে গলে গেল। আমি যখন ঘটনাস্থলে অর্থাৎ বাড়িতে এসে পৌঁছুলাম তখন এক মুহূর্তেই সব মিটে গেল।

এ ছাড়া এদের সঙ্গে মানুষ হিসেবে পরিচয়ের একটা বড় সুযোগ আমার হয়েছিল। আমি গ্রামে গ্রামান্তরে মেলায় ঘুরেছি অনেক। এদের অতিথি

হয়েছি, পরিচর্যায় পরিতৃপ্ত হয়েছি। এমনও হয়েছে, গরমের দিন, মশার উপদ্রব, সঙ্গে মশারি নাই—তাদেরও মশারির অভাব, যা আছে তাও বের করতে লজ্জা পেয়েছে—সুতরাং বিনা মশারিতেই শুয়ে মশার কামড়ে অস্থির হয়েছি—এমন সময় পাখার হাওয়া গায়ে লেগেছে। গৃহস্বামী নিজে কখন উঠে এসে বাতাস করতে শুরু করেছেন। অথচ গ্রামের বা পার্শ্ববর্তী গ্রামের বিশিষ্ট লোকে যখন জিজ্ঞাসা করেছেন, উঠেছেন কোথায়? বা উঠেছিলেন কোথায়?—উত্তরে যখন গৃহস্বামীর নাম করেছি তখন তাঁরা বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন, উঠবার আর জায়গা পেলেন না। কারণ জিজ্ঞাসা করে উত্তর পেয়েছি যে, এতবড় কুটিল মামলাবাজ কুচক্রী আর দ্বিতীয় নাই এ অঞ্চলে। বলেছেন, যে অন্ন পেটে গিয়েছে সে হজম হলে হয়। গ্রাম্য ভদ্র-জনের সমাজে, চাষীর গ্রামে, বৈষ্ণবের আখড়ায় এমনই ভাবে তাদের জানবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। একটা বড় সুবিধা ছিল আমার। রূপ আমার ছিল না, যেটুকু লাবণ্য বা শ্রী ছিল সেটুকুও রৌদ্রে ঘুরে ঘুরে এমনই পুড়ে গিয়েছিল যে কর্কট নাগ বিষজর্জর নল রাজার সারথ্য কর্ম গ্রহণের সুযোগের মতো আমিও পেয়েছিলাম ওদের সঙ্গে সমান হয়ে মিশবার সুযোগ। ওদের কথাবার্তা আচার-ব্যবহার সব জেনেছিলাম সেদিন—ওদেরই একজনের মতো।

আর একটা সুযোগ আমার হয়েছিল।

দেশসেবার বাতিক যখন নেশা হয়ে দাঁড়ায় তখন তাতে আর কৃত্রিমতা থাকে না। বাংলা-সাহিত্যে বাউণ্ডুলে চরিত্র অনেক আছে। কাজ নেই কর্ম নেই, ঘুরে বেড়ায়, গাঁজা খায়, মদ খায় বা খায় না, মূর্খমানুষ, ঘৃণা অবজ্ঞার পাত্র; কিন্তু সকল বিপদ-আপদের ক্ষেত্রে সে আছেই। শ্মশানে আছে, অভাবে আছে, দুর্ভিক্ষে আছে, মহামারীতে আছে, অন্ধকার রাত্রে ভূতভয়গ্রস্তের পাশে অভয় দিতে ব্রহ্মদৈত্যের মতো আবির্ভূত হয়েছে; আমার চরিত্র তখন অনেকটা ঐ রকম। মদ গাঁজাটা খাই না—কিন্তু তারও চেয়ে কোন একটা তীব্রতর নেশায় মেতে থাকি, ঘুরে বেড়াই। বন্যাটা আমাদের দেশে হয় না এমন নয়, তবে কম। আগুন, ঝড় এবং কলেরা—এই তিনটাই আমাদের অঞ্চলে সব চেয়ে বড় বিপদ। এরই মধ্যে ঘুরে বেড়ানো আমার নেশা ছিল। বিশেষ করে ১৯২৪।২৫ সালে আমাদের অঞ্চলে যে ব্যাপক মহামারীর আক্রমণ হয়েছিল তাতে আমি অন্ততঃ আমাদের গ্রামের চারিপাশে ত্রিশ-চল্লিশখানি গ্রামে একাদিক্রমে ছমাস ঘুরেছি, খেটেছি। এই সেবা আমার ব্যর্থ হয় নি। পাথরের দেবমূর্তি ভেদ করে দেবতার আবির্ভাবের কথা যেমন গল্পে আছে তেমনি ভাবেই এই পাপপুণ্যের রক্তমাংসের দেহধারী

মানুষগুলির অন্তর থেকে সাক্ষাৎ দেবতাকে বেরিয়ে আসতে দেখেছি। (এর খানিকটা আভাস আমার "ধাত্রী দেবতা"-র মধ্যে আছে।)

এই জোরেই, এই জানার অহঙ্কারে সেদিন আমি বলেছিলাম, মজুর ওখানেই লাগানো হোক; দায়ী রইলাম আমি। এবং এই জোরের যাচাই করে দেখবার সাহস পেয়েছিলাম। এই জোরেই এই জানার পুঁজির মূল্য বুঝে আমি এদের কথা বাংলা সাহিত্যে বলেছি, নিজের কথা বলার মতো করেই বলেছি। "হাসুলীবাঁকের উপকথা"-র মানুষদের পর্যন্ত আমার এই ভাবে জানার সুযোগ হয়েছিল। ওই সুচাঁদ এবং আমি বসে গল্প করেছি আর বিড়ি টেনেছি। বাড়িতে যখন থাকতাম, এখনও যখন যাই লাভপুরে তখন সকাল বেলা উঠেই বাড়ি থেকে বের হই, আমার "কবি" উপন্যাসের বনিক মাতুলের চায়ের দোকানে গিয়ে বসি, চা খাই। তাদের সঙ্গে গল্প করি। যোগেশ বৈরাগী ওখানকার দুর্ধর্ষ ব্যক্তি, তার সঙ্গে আমার খুব ভাব। নিতাই বাউড়ী, সতীশ ডোম এরা এসে মাটিতে উপু হয়ে বসে গল্প করে গল্প শোনে। রাজা পয়েন্টসম্যান এসে সেলাম করে দাঁড়ায়, সেলাম হুজুর। জায়গাটা খাঁ-খাঁ করে বিপ্রপদ অর্থাৎ দ্বিজপদর জন্যে। সে নেই। পথে নসুবালার সঙ্গে দেখা হয়, সে চুল বেঁধে নাকছাবি পরে থমকে দাঁড়ায়, বলে—হেই মা গো। কখন এলা? বলি মনে পড়ল আসতে। ছেলেরা ভালো আছে? তোমার শরীর এমন কাহিল হল ক্যানে?

আমি হেসে বলি—তুই কেমন আছিস?

—আমি? ঠোঁটে পিচ কেটে সে বলে—যম ভুলেছে, কানা হয়েছে, নইলে আর আমাকে থাকতে হয়? তোমাদিগে রেখে আমি যেতে পারলেই খালাস।

সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হিসাব দেয়—কে কে চলে গেছে এর মধ্যে। তাদের জন্যে কাঁদে।

কান্নার পালা শেষ করে বলে—দেখ ক্যানে নেকনের ভোগ, পোড়া প্যাটের দায়, ওই গাঁয়ে বিয়ে ছিল, নাচতে যেয়েছিলাম। তা পুরনো কাপড় দিয়েছে দুখানা, আরও সব দিয়েছে। শ্যাষ—।

তারপরই মুখে কাপড় দিয়ে হাসতে শুরু করে। হাসতে হাসতেই বলে—শ্যাষ বলে কি—দাদা—! বলে রাঙা শাঁখা পরতে হবে। মরণ! এই বয়েসে আর শাঁখা পরতে হয়?

বিদায়ের সময় বলে—এই দেখ, এমন করে মথুরার সুখে বেজধামকে ভুলে থেক না। ভালো হবে না। মাসে একবার করে এস।

তারপর আমি চলি। মাঠে মাঠে ঘুরি। এমনি করেই ঘুরতাম চিরকাল।

রেলের লাইন ধরে নদীর ধার। সেখান থেকে সাঁওতাল পাড়া। সাঁওতাল পাড়া থেকে মাঠে মাঠে জীবের বটতলা হয়ে দু-সতীনে ঝরনা, সেখান থেকে তারা-মায়ের ডাঙা। সেখানে বসে থাকি গাছতলায়। হঠাৎ কানে এসে পেঁছায় গানের সুর। এদিক ওদিক চেয়ে দেখি, নজরে পড়ে—গাছতলায় বসে কি গাছের উপর চেপে কেউ গান ধরে দিয়েছে। এইখানেই একদিন দেখেছিলাম আমার "কবি"র নায়ককে। গাছগুলিকে মুগ্ধ রসিক শ্রোতা ধরে নিয়ে সে বাঁ হাত গালে দিয়ে—ডান হাতখানি নেড়ে নেড়ে আপন মনেই কবিগান শোনাচ্ছিল। মাঠে গান গায় চাষীরা—'চাষকে চেয়ে গোরাচাঁদ রে, মান্দেরী ভালো।' কেউ বা গায়—বিচিত্র গান—'হায় দ্যাশে কি রোগ উঠেছে ও-লা উঠা, লোক মরিছে অসম্ভব।'

বেলা বেড়ে ওঠে, বারোটা বাজে, গ্রামান্তর থেকে মাঠের পথগুলির মাথায় স্বর্ণবিন্দু শীর্ষ—কাশফুল ফুটে ওঠে। ঝকঝকে মাজা ঘটি মাথায় মেয়েরা আসে দুধ নিয়ে ঘুঁটে নিয়ে।

বসনের সঙ্গে দেখা হত, কুসুমের সঙ্গে দেখা হত, আজও বসনের মেয়ে ময়নার সঙ্গে দেখা হয়, তারা পথেই ঘটি নামিয়ে প্রণাম করে প্রশ্ন করে—কবে এলেন? বউদিদি, ছেলেরা ভালো আছে?

এদের সঙ্গে আমার পরম সৌভাগ্যের ফলে একটি আত্মার আত্মীয়তা গড়ে উঠেছে। এমনই সে আত্মীয়তা যে, প্রবাসে থাকি—প্রতিষ্ঠা খানিকটা পেয়েছি, তবু সে আত্মীয়তা এতটুকু ক্ষুন্ন হয় নি। এ পাওয়া যে কী পাওয়া সে আমি জানি। তাই আমি এদের কথা লিখি। এদের কথা লিখবার অধিকার আমার আছে। আমি ওদের জানি—ওদের আত্মীয় আমি। উপকারী নয়, কৃতজ্ঞতাভাজন নয়, ভালোবাসার জন। সেই দাবিতেই সেদিন যাচাই করে দেখতে সাহসী হয়েছিলাম, বলেছিলাম—দায়ী আমি।

পরের দিন সকালে গেলাম মজুর নিয়ে। তাঁর সীমানার একটু দূরে যেখানে কোন বিরোধ নাই সেখানে তাদের লাগিয়ে দিলাম। তারা কাটতে কাটতে এগিয়ে চলল—সেই সীমানার দিকে। এদিকে বেলা চড়ে উঠল। আমি এরপর গিয়ে হাজির হলাম বৃদ্ধের বাড়িতে।—চৌধুরীমশায়!

—কে? বৃদ্ধ তামাক টানছিলেন, হুঁকো নামিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হুঁকো রেখে উঠে দাঁড়ালেন—আসুন বাবা আসুন। এই রৌদ্রে এই সময়ে এখানে কোথা গো! ওঃ ঘামে যে ভিজে গিয়েছেন গো! বসুন। জল খান, হাত মুখ ধুয়ে ফেলুন। ওরে! ছেলেদের ডেকে হুকুম করলেন। নিজে একখানা পাখা নিয়ে বাতাস করতে লাগলেন। আমি যা অনুমান করেছিলাম তাই। একবিন্দু অমিল হল না। আমার জানায় ভুল হয় নি।

ইতিমধ্যে ছেলেরা নিয়ে এল—সরবত, কাঁকুড়, পাকা আম, গুড়, জল। একজনের হাতে আসন। বৃদ্ধ আসনখানি নিয়ে নিজে পেতে দিলেন, বললেন—বসুন বাবা। সেবা করুন।

আসনে বসে আমি বললাম—শুধু খাব না কিন্তু চৌধুরীমশায়; দক্ষিণে নেব আমি।

—দক্ষিণে? হাসলেন তিনি। ভাবলেন রসিকতা। বললেন—বেশ তো! মাথাটা চরণতলে নামিয়ে দি। নিয়ে যা হয় করুন।

আমি এবার হাত জোড় করে বললাম—আমি আপনার কাছে ভিক্ষে চাইতে এসেছি চৌধুরীমশায়!

বৃদ্ধ শশব্যস্ত হয়ে আমার হাত চেপে ধরে বললেন—কী বলছেন বাবা? আমার যে অপরাধ হবে। বলুন কী বলছেন?

আমি বললাম—রাস্তাটিকে রাস্তার মতো করতে যতটুকু জমি প্রয়োজন সেই জমিটুকু আমাকে ভিক্ষা দিতে হবে।

তিনি একবার হেসে ফেললেন, বললেন—আপনি বাবা জাত বামুন। তা, নেন, আগে জল খেয়ে নেন। তারপর চলুন, আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে পুকুরের পাড় কাটিয়ে দিয়ে দক্ষিণান্ত করে আসি।

তিনি নিজে দাঁড়িয়ে সেই মানুষ-ভোর উঁচু তালগাছ কাটিয়ে জমি রাস্তার অন্তর্ভুক্ত করে দিলেন। তারপর বললেন—ছোটবাবুকে দিই নাই, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের চোখরাঙানিকে ভয় করি নাই। মামলায় জিতেছি। কিন্তু আপনার কাছে হারলাম। তা হেরে সুখ পেলাম, মনটা ভরে গেল গো। এইবার কিন্তু আমি নোব। আপনার পায়ের ধুলো নিয়ে ফিরে যাব। ওপারে আমার জমিদারির ব্যবস্থা করে দিলেন আপনি।

বৃদ্ধ পায়ের ধুলো সেদিন নিয়েছিলেন। প্রণাম আমি নিই না বৃদ্ধজনের! সেদিন না বলতে পারি নি। বৃদ্ধ চলে গেলেন। আমি উৎসাহের প্রাবল্যে নিজেই কুড়ুল নিয়ে গাছ কাটতে গেলাম; বৃদ্ধের সীমানার এপারে একটা তেঁশিরের বেশ বড় গাছ জন্মেছিল—সেই গাছটা। গাছটা পড়ল, পড়ত মাথার উপরেই, কোন রকমে মাথাটা সরালাম কিন্তু ডান হাতের কব্জির উপর পড়ল একটা ডাল। হাড় ভাঙল না কিন্তু দেখতে দেখতে ফুলে উঠল—আর অসহ্য যন্ত্রণা।

মনে আছে এই বেদনার জন্য কয়েকদিন ঘরে বসে ছিলাম। যেমন বসে থাকা অমনি আবার মনের মধ্যে লেখার বাসনা জেগে উঠল। মাথার মধ্যে গল্পের কাঠামো খাড়া হল কিন্তু লেখা হল না। হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

কয়েকদিন পর আবার পড়লাম কাজ নিয়ে। কেটে গেল প্রায় সাত-আট মাস। হঠাৎ সাত-আট মাস পর আবার আক্রান্ত হলাম সাহিত্য-রোগে, মন্দকবির মতো উদ্বাহু হলাম। সকালে ইউনিয়ন বোর্ডে যাবার পথে একবার পোস্টাপিসে হাজরে দিয়ে যেতাম। ওটাও সাহিত্যব্যাধির জের। রিপ্লাই কার্ড লিখে ওই যে আট মাস নিত্য পোস্টাপিস যেতাম উত্তরের প্রত্যাশায় সেইটেই একরকম অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। নিজের পত্র কদাচিৎ থাকত, তবে বোর্ডের পত্র থাকতই—সেইগুলি নিয়ে important person-এর মতো বোর্ডে চলে যেতাম। সেদিন চোখে পড়ল একটি মোড়ক। মোড়কটির উপর সুন্দর একটি ছবি। সমুদ্রের বেলাভূমে নটরাজ নৃত্য করছেন—তাঁর পায়ে আছড়ে এসে পড়ছে সমুদ্র-তরঙ্গ। তুলে নিলাম মোড়কটি। "কল্লোলে"র ঠিকানা পেলাম। মোড়কটি এসেছিল নিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে। ভিতরে ছিল একটি লেখা। বুঝলাম, নিত্যনারায়ণ গল্প পাঠিয়েছিল—সেটি ফেরত এসেছে। মনে আবার জেগে উঠল বাসনা, নির্বাপিতপ্রায় বহ্নি আবার উঠল জ্বলে। "কল্লোলে"র ঠিকানাটা টুকে নিলাম। বোর্ড-আপিসে গিয়ে কয়েকটা কাজ সেরে সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ি ফিরে কলকাতা যাওয়ার সেই স্যুটকেসটা খুলে বের করলাম—"রসকলি"র পাণ্ডুলিপি। শেষ পৃষ্ঠাটি নূতন করে লিখে পৃষ্ঠাটি পালটে দিলাম। ও পৃষ্ঠায় পোস্টাপিসের ছাপ ছিল। সন্দেহ হল—ওই ছাপ দেখে অনুমান করা কঠিন হবে না যে লেখাটি কোন কাগজ থেকে ফিরে এসেছে। সেই দিনই দিলাম পাঠিয়ে।

আশ্চর্য—দিন চারেক পরেই, পোস্টাপিসে পেলাম "কল্লোলে"র গোল ছাপ দেওয়া সাদা পোস্টকার্ডে একখানি পত্র। লিখেছিলেন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। চিঠিপত্র সবই আমার হারিয়ে গেছে। নইলে এখানে পুরো চিঠিখানি তুলে দেওয়া আমার উচিত ছিল। তবে মনে আছে, পবিত্র লিখেছিলেন—"আপনার গল্পটি মনোনীত হইয়াছে। ফাল্গুন মাসেই ছাপা হইবে।" শেষের দুটি ছত্র আমার মনে অক্ষয় হয়ে আছে। পবিত্রই আমার প্রথম উৎসাহদাতা। তিনি লিখেছিলেন—আপনি এতদিন চুপ করিয়া ছিলেন কেন?

সমস্ত অন্তরে শিহরণ জাগিয়ে একটা প্রশ্ন জেগে উঠল। কী বলতে চেয়েছেন? আপনার আরও আগে আবির্ভূত হওয়া উচিত ছিল?

"রসকলি" প্রকাশিত হল। আমি "কল্লোলের"র গ্রাহক হলাম। এরপর দীনেশরঞ্জন লিখলেন—এখানে "রসকলি"র যথেষ্ট প্রশংসা হয়েছে। বৈশাখের 'কল্লোলে'র জন্য একটি গল্প পাঠাবেন।

তখন আমি জ্বরে শয্যাশায়ী এবং হাতও তখন অপটু, ফুলে রয়েছে, বেদনাও আছে। সেই অবস্থাতেই—হাতভাঙা অবস্থায়—যে গল্পটির কাঠামো

মাথায় এসেছিল—সেইটিকে কাগজে কলমে লিখে ফেললাম।—"হারানো সুর" আমার দ্বিতীয় গল্প। ১৩৩৫-এর বৈশাখের "কল্লোলে" বের হল।

এরপরই একদিন ডাকে পেলাম একখানি "কালিকলম"। তাতে সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন—"রসকলি" এবং "হারানো" সুরের মতো রসসৃষ্টি অধুনা সাহিত্যে বিরল।

"কল্লোল"—"কালিকলম"—এমনিভাবে গুণগ্রাহিতার পরিচয় না দিলে আমি চলতাম অন্যপথে। রাজনীতির পথে। সে বন্ধন, সে আকর্ষণ আমার তখনও কম দৃঢ়, কম প্রবল নয়। এই কারণেই এর পরে—মাত্র মাস ছয়েক পরেই যখন তিরিশ সালের আন্দোলনের বাজনা বেজে উঠল তখন—কলম ছেড়ে তাতেই পড়লাম ঝাঁপিয়ে।

মোহ কাটল জেলখানায়।

পাঁচ

জেলখানায় মোহ কাটল ১৯৩১ সালের সূচনায়।

"রসকলি", "হারানো সুর" প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৯ সালে, বাংলা ১৩৩৪ সালের ফাল্গুনে এবং ১৩৩৫ সালের বৈশাখে। সুতরাং মধ্যে রয়ে গেল প্রায় দুটো বছর। এই কিছু কম দুটো বছর আমার মনের অবস্থা দ্বিধাগ্রস্ত। দ্বিধার মধ্যে রাজনৈতিক জীবনাবেগটাই ছিল প্রবল। একসময় কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে রামপুরহাট অঞ্চলে আলাপ হয়েছিল বিপ্লবী বীর নলিনী বাগচীর সঙ্গে। তিনিই আমার জীবনক্ষেত্রে এই দেশপ্রেমের বহ্নিকণা আমার মনে জাগিয়েছিলেন। পরাধীন দেশকে বৈদেশিক শাসনমুক্ত করবার সঙ্কল্প ছিল তাঁর যজ্ঞাগ্নির মতো লেলিহান। সে বহ্নি ছিল পরম পবিত্র। কয়েকবারই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তারপর ১৫।১৬ সালে তিনি যখন অন্ধনিয়তিকে বন্য ঘোড়ার মতো বেঁধে তার পিঠে সওয়ার হয়ে নিরুদ্দেশ—তখন হঠাৎ আমার বোনের বিবাহ উপলক্ষ করে আমার বিয়ে হয়ে গেল। ওদিকে বাংলার বিপ্লবের ক্ষেত্রে নিদারুণ দুর্যোগ নেমে এল। দিকে দিকে ব্যর্থ হয়ে গেল বিপ্লবের উদ্যম। আমাকে কিছু দিন ধরেই পুলিসের সতর্ক দৃষ্টির সামনে কাটাতে হল। তার পর এল উনিশশো একুশ। একটা যুগান্তর ঘটল ভারতের রাজনৈতিক জীবনক্ষেত্রে। আমার জীবনক্ষেত্রেও এল। আমি দলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসবার সুযোগ পাই নি। কাজেই আমার জীবনে দলীয়

মনোভাব বা সশস্ত্র বিপ্লবের নেশা বড় ছিল না। দেশপ্রেমের আবেগটাই বড় ছিল।) কোন্ সমিধে যজ্ঞ বিধেয়—যজ্ঞডুম্বুরে অথবা অশ্বত্থকাষ্ঠে—এ নিয়ে শাস্ত্রবিধান তখন আমার বড় হয়ে উঠতে পায় নি। যজ্ঞ-বহ্নিই ছিল বড়, তাতে আত্মাহুতিই একমাত্র বিধি ছিল আমার কাছে। ১৯২১ সালে মহাত্মাজীর অহিংস অসহযোগের আদর্শগত রোমান্টিসিজম আমার কল্পনাপ্রবণ মনকে আকর্ষণ করেছিল প্রবল ভাবে। যা ঘটে নাই—সকলে যা ঘটতে পারে না বলে ভাবে—তাই ঘটবে—সেই আকাশকুসুম ফোটানোর উন্মাদনাই বড় ছিল। স্বাভাবিক ভাবেই আমার জীবনে সাহিত্যের দিক থেকে ওই আবেগ আমাকে আকর্ষণ তখন বেশী করত। আরও একটা দিক আকর্ষণ করেছিল—সেটা হল মানব জীবনের মৌলিক নীতিবাদের সঙ্গে এই অহিংস আন্দোলনের একাত্মতা। মধ্যে মধ্যে দেশের রাজনৈতিক জীবনের স্তিমিত দশায় সাহিত্য করত আকর্ষণ। ১৯২৯ সালে তখন দেশের রাজনৈতিক জীবনের ধূমায়মান অবস্থা। মনে হচ্ছে জ্বলবে, আবার জ্বলবে। ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বহ্নিমান হয়ে উঠবে। তবুও এই সাহিত্যিক সাফল্যের মূল্য সেদিন অনেক এবং আমার জীবনে অমূল্য। বুঝতে পারি নি—অদৃষ্ট বা ভাগ্যদেবতা যদি থাকেন—তবে সেইদিনই ওই মূল্যে আমার ভবিষ্যৎ জীবনের পাওনা নির্ধারণ করেছিলেন। থাক, সে পরের কথা।

"হারানো সুরে"র পর নানা নূতন পত্রিকা থেকে নিমন্ত্রণ পেলাম। "কালিকলম", "উপাসনা", "ধূপছায়া"—আরও অনেকগুলি। গল্পও পর পর কয়েকটি লিখলাম। "কল্লোলে" একটি কবিতাও লিখেছিলাম। "কালিকলমে" "শ্মশানের পথে" নাম দিয়ে একটি গল্প বের হল। গল্পটি দৃষ্টিও আকর্ষণ করেছিল অনেকের। এ গল্পটিই আমার জীবনের ভবিষ্যৎ পথের বোধ হয় প্রথম মাইল-পোস্ট।) গল্পটি পরবর্তী কালে "চৈতালী ঘূর্ণি" উপন্যাস হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এবং আমার প্রথম প্রকাশিত পুস্তক।

একটু ভুল হল।

(প্রথম প্রকাশিত পুস্তক আমার একখানি কবিতার বই। নাম "ত্রিপত্র"।)

মন্দ কবিযশঃপ্রার্থীর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কাব্য এবং কবির এমন মাঠে মারা যাওয়ার উদাহরণ বোধ করি বিরল। আমার এক শ্যালক—তিনি স্বর্গত, মহাউৎসাহী যুবক, ঝড়ের মতো প্রকৃতি—গানে, বাজনায়, অভিনয়ে, উল্লাসে, হুল্লোড়ে, আমিরিতে সে একেবারে অদ্বিতীয়। ব্যবসা করতে নেমেই প্রচণ্ড ব্যবসা এবং প্রকাণ্ড লোকসান করে বসলেন। কিন্তু তাতেও দমলেন না। আবার লাগলেন; এবার সফলও হলেন। এই ছেলেটি আমার থেকে বয়সে বছর কয়েকের ছোট ছিলেন। কিন্তু আমার স্ত্রীর জ্যেষ্ঠ সহোদর

হিসেবে এবং স্বকীয় স্বাভাবিক গুণে আমার পেট্রন হয়ে উঠলেন। এবং জোর করে আমার কবিতার খাতা নিয়ে কবিতার বই ছেপে বসলেন। লাল কালিতে ছাপা কবিতার বই। ছাপা হল কোন্ প্রেসে মনে নেই, তবে কয়লার ব্যবসায়ী মহলের লেটারহেড ছাপা হত সেখানে। এবং বইগুলি এসে উঠল শ্যালকের আপিসে। কোণে বস্তাবন্দী হয়ে পড়ে রইল। অতঃপর শ্যালক কলকাতার ব্যবসায়ের পাট উঠিয়ে গেলেন রানীগঞ্জ অঞ্চলে; বইগুলি এবার স্থানান্তরিত হল সালিখায় এক লোহার কারখানায়। এদিকে শ্যালকটি একদিন মোটর সাইকেলে চড়ে রানীগঞ্জ অঞ্চলের পাথুরে ডাঙার উপর পাথরে ধাক্কা খেয়ে পড়ে বুকে আঘাত পেলেন, তা থেকে শেষ পর্যন্ত দাঁড়াল নিউমোনিয়া এবং তাতেই তাঁর ঝঞ্ঝার মতো জীবনের অবসান হল। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে "ত্রিপত্রে"র সর্ব সন্ধান বিলুপ্ত হল। তার পরও আছে—একদা ছাপাখানা থেকে এল বিল। বিল শোধ করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললাম।

এইখানে আমার প্রথম উপন্যাসের কথাও বলে রাখি।

রাজনৈতিক জীবনের ভাঁটার সময় একখানি উপন্যাস রচনা করেছিলাম—"মারাঠা তর্পণে"র সঙ্গেই। বা কিছু আগেই। সেটি প্রকাশিত হয়েছিল শিশির বসু সম্পাদিত "একপয়সার শিশিরে"। তখন "সচিত্র শিশির" এবং "একপয়সার শিশির" বলে দুখানি কাগজ চলত। বইখানির নামও মনে নেই, তার কোন চিহ্নও নেই। শিশির বসুর কাছেও নেই। কারণ তখনও নূতন যুগের রচনা পড়ে পথ পাই নি, শরৎচন্দ্রকে অক্ষমভাবে অনুকরণ করেছিলাম।

১৩৩৫ সালের বৈশাখ মাসে আমার মেজভাইয়ের বিয়ের বাজার করতে কলকাতায় এসে একদিন পটুয়াটোলার বহুখ্যাত "কল্লোল" আপিসে গেলাম। সঙ্গে আমার ছোটভাইও ছিল। বৈশাখের বেলা তখন প্রায় চারটে। বাইরে উত্তাপ অনেক। ছোট ঘরখানায় ঢুকবার সময় একটুখানি স্নায়ুচাঞ্চল্য অনুভব করলাম। কি বলব? কি বলব? কাকে দেখব? ঢুকে আশ্বাস পেলাম, দেখলাম শৈলজানন্দকে।

শৈলজানন্দের সঙ্গে "পূর্ণিমা"র কল্যাণে তখন পরিচয় হয়েছে। "পূর্ণিমা"র লেখার জন্য সত্যাদিত্যের অর্থাৎ সত্যনারায়ণের সঙ্গে কয়েকজন সাহিত্যিকের দরবারে উঁকি মেরেছিলাম। বোলপুরে শ্রীযুক্ত জগদীশ গুপ্তের ওখানে গিয়েছিলাম। গুপ্ত কোন কারণে "পূর্ণিমা"র উপর বিরূপ ছিলেন; তাঁর সঙ্গে আদৌ জমে নি; সে প্রায় ধাক্কা খেয়ে চলে এসেছিলাম। তারপর

অবশ্য যখন বোলপুরে ছাপাখানা করেছিলাম তখন তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, কিন্তু এ কথা আমিও তুলি নি, তিনিও তোলেন নি। আর গিয়েছিলাম কালিদাস দাদার কাছে। কালীঘাটের ট্রাম ডিপোর কাছে বাসা, সন্ধ্যেবেলা দাদার ওখানে গিয়ে এক নজরেই হৃদয়বান মানুষটিকে চিনতে পেরেছিলাম। দাদার তখনও ভাই হতে পারি নি, ভাই না হলে দাদার রসের উৎসমুখ খোলে না। কিন্তু দাদার মনের দরজাটি স্ফটিকের—ভেতরটা দেখা যায়। সেদিন আনন্দে কৌতুকে মন পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। একটা বাড়ির ভেতরের অংশে থাকতেন, গলিপথে গিয়ে উঠলাম। দাদা দরজা খুলে দুটি তরুণকে দেখে প্রথমটায় বোধ হয় পরীক্ষার নম্বর জানতে এসেছে ভেবে ভুরু কুঁচকে বললেন—কি চাই ?

পরিচয় দিলেন সত্যনারায়ণ, বললেন—আমরা আসছি নাট্যকার নির্মলশিববাবুর ওখান থেকে। আমাদের "পূর্ণিমা" কাগজ বোধহয় আপনি দেখেছেন। পাঠানো হয় আপনাকে।

—ও হ্যাঁ। আসুন। দাদা দরজা ছেড়ে নিজে ভিতরে ঢুকলেন। বসুন।—বলে নিজে কিন্তু ঘুরে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েই রইলেন। মনে হল একটু যেন চঞ্চল হয়ে গেছেন। একটু কেন, বেশ। যতক্ষণ কথা বললাম, প্রয়োজনের একটু বেশীক্ষণই বলেছিলাম, কেন না, এমন একজন মোলায়েম প্রকৃতির লাজুক কবিকে পাওয়া তো সহজ নয়! কালিদাস রায়ের মতো খ্যাতনামা কবি, মেজাজ নাই, যা বলছি—উত্তর দিচ্ছেন। তবে পিছন ফিরে। মধ্যে মধ্যে সামনে ফিরছেন—কি—আমরাই ঘুরে সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি, তিনি কয়েক মিনিট মুখোমুখি কথা বলে আবার পিছন ফিরছেন। ভারী ভালো লেগেছিল।

তবে আজ মনে কখনও কখনও সন্দেহ হয়। দাদার স্বীকারোক্তির মধ্যে পাই মধ্যে মধ্যে তিনি কৌতুকে মনে মনে অট্টহাস্য করে থাকেন। কথা বলবার সময় মধ্যে মধ্যে দেখি হাসি বেরুতে বেরুতে চাপা পড়ে; বুঝি, দাদা অন্তরে অন্তরে হাসছেন। ভেতরটা হাসিতে কাঁপছে বুঝতে পারি। রোহিত মৎস্য যতই গভীর জলে চলুক—জলের উপরে একটি দাগ পড়ে; যাদের দৃষ্টি প্রখর তাদের চোখ এড়ায় না। তাই আজ ভাবি—সেদিন রসিকপ্রবর রসশেখর সাহিত্য-বিলাসের নমুনা দেখে অট্টহাস্য চাপতেই এমন ভাবে ফিরে ফিরে দাঁড়ান নি তো? তবে লেখা দিতে তিনি বিমুখ হন নি।

শৈলজানন্দ আলাপী মানুষ। তাঁর মাতামহের মৃত্যুকালে তখন তিনি তাঁর

কলকাতার বাড়িতেই। সেইখানে হৈ হৈ করে আলাপ। প্রথমটাতে সত্য-নারায়ণের সঙ্গে। বীরভূমের লোক, রানীগঞ্জে অনেক কাল কাটিয়েছেন, কয়লার ব্যবসায়েও কিছুদিন শিক্ষানবীস ছিলেন, প্রসিদ্ধ কয়লা ব্যবসায়ী লাভপুরের বন্দ্যোপাধ্যায় বংশকে ভালো করেই জানতেন। তার উপর নাট্যকার নির্মলশিব নূতন খ্যাতি বংশ সম্পদ যোগ করেছেন সোনার গহনায় জহরতের মতো। প্রাণ খুলে হাসতে পারেন শৈলজানন্দ। আরও একটি মহৎ গুণ সেদিন লক্ষ্য করেছিলাম, নূতনকে ভালোকে তিনি আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেন, স্বীকার করেন অতি সহজে। "পূর্ণিমা"য় প্রকাশিত "স্রোতের কুটো" গল্পের উল্লেখ করে বার বার বললেন—ভালো হয়েছে। বেশ গল্প। চমৎকার।

মনে মনে তাঁকে নমস্কার জানিয়েছিলাম। তখন তাঁর লেখা এবং প্রেমেন্দ্রর লেখা পড়ে "রসকলি" লিখেছি, লেখাটি তখনও বিখ্যাত কাগজে সম্পাদকের বিবেচনাধীন রয়েছে। কিন্তু সে কথা সেদিন বলা হয় নি। অবকাশও পাই নি, এ কথা বলতেও সঙ্কোচ হয়েছিল যে, আপনাদের মতোই একটি গল্প আমি লিখেছি।

শৈলজানন্দকে সেইদিন চিনে রেখেছিলাম।

"কল্লোল" আপিসে সেদিন শৈলজানন্দকে দেখে তাই আশ্বস্ত হলাম।

ছোট ঘর, একদিকের এক কোণ ঘেঁষে টেবিলের সামনে বসে আছেন স্বাস্থ্যবান এক ভদ্রলোক। তাঁর টেবিলের সামনেই তক্তপোশে গেঞ্জি গায়ে বসে আছেন শৈলজানন্দ। ওদিকে এক কোণ ঘেঁষে চেয়ার-টেবিলে বসে এক ভদ্রলোক—চোখে চশমা; তিনি তখন কাগজ-পত্র গুটিয়ে কাঁচা তামাকের পাতা মুখে পুরছেন।

শৈলজানন্দ কিছু নিয়ে এপাশের ভদ্রলোকের সঙ্গে দর-কষাকষির মতো আলাপ চালাচ্ছিলেন। সাহিত্যিকের দর-কষাকষি—তাই হাসি রসিকতার অভাব হয় নি। যখন ঢুকলাম তখন শৈলজানন্দ স্বভাবসিদ্ধ-হা-হা হাসি হেসে বলেছিলেন—আর চালাকি কোরো না, ধরা পড়ে গেছ। দাও, দিয়ে ফেল। তারপরই একটু বিনয়সহকারে কণ্ঠস্বরে গুরুত্ব আরোপ করে বললেন—সত্যি বলছি, বিশেষ দরকার আমার।

এই সময়েই আমি ঢুকলাম।

শৈলজা দেখেই সানন্দে বলে উঠলেন—আরে, তারাশঙ্করবাবু—আসুন, আসুন। দীনেশ! তারাশঙ্করবাবু। ইনি দীনেশবাবু, উনি পবিত্র।

পবিত্র তখন উঠে দাঁড়িয়েছেন। বললেন, আমি উঠছি, আপনি এলেন। তা বেশ, হবে এর পর আলাপ। কেমন?

চলে গেলেন। দীনেশবাবু বললেন, বসুন, বসুন।

বসলাম। তারপর সব চুপ। আমিও চুপ। তাঁরাও চুপ। ভাবছি কেমন করে জমানো যায়। কী বলি! কড়িকাঠের দিকে চাইলাম, মেঝের দিকে চাইলাম, হঠাৎ একটা কথা খুঁজে পেলাম, ভাবলাম বলি, আমার ভাইয়ের বিয়ে, চলুন না আমাদের দেশে। কথাটা আমাদের গ্রাম্যসমাজ অনুযায়ী চমৎকার। এই সূত্র ধরে অনেক কথা বলা যেতে পারবে। অন্ততঃ আমি বলবার সুযোগ পাব আমাদের গ্রামের অনেক কথা। মুখ তুললাম বলবার জন্য, তুলেই একটু অপ্রস্তুত হলাম, দেখলাম—দীনেশবাবু মুখ টিপে ও চতুর হাসি হেসে শৈলজানন্দের দিকে চেয়ে না-এর ইঙ্গিতে ঘাড় নাড়ছেন। মুখ আপনিই চকিতে ফিরল শৈলজার দিকে। দেখলাম—শৈলজা দীনেশবাবুর দিকে তাকিয়ে আছেন—দু হাতের দশটি আঙুল মেলে দেখাচ্ছেন। যে মুহূর্তে আমার চোখ পড়ল, সেই মুহূর্তে তিনি একটা হাত নামিয়ে পাঁচ আঙুল দেখালেন। তারপরই হাত জোড় করলেন।

দীনেশবাবুকে চতুর লোক মনে হল। চতুর বলে ধূর্ত বলছি না আমি। আমি বলছি, নাগরিক যে হিসাবে গ্রামীণের কাছে চতুর সেই হিসাবে চতুর তিনি। মুহূর্তে তিনি আমার দিকে মনোযোগী হয়ে উঠলেন, বললেন, তারপর তারাশঙ্করবাবু, আপনাদের ওখানে খুব বড় বড় মাছ আছে পুকুরে না? ছিপে ধরা যায়?

এর উত্তর আমি দেবার আগেই ঘরে প্রবেশ করলেন একজন বিচিত্র তরুণ। লম্বা চুল, চমৎকার মুখশ্রী, বগলে কোন বইয়ের ফাইল, এক হাতে দইয়ের ভাঁড়, অন্য হাতে একটা ঠোঙা এবং পাকা কলা। রবীন্দ্রনাথের কবিতা আওড়াতে আওড়াতে প্রবেশ করলেন। এবং প্রবেশ করেই আবৃত্তি বন্ধ করে বললেন, ভাই দীনেশ—

ভাই দীনেশ, কি ভাই দীনেশবাবু—ঠিক মনে নেই।

দীনেশবাবু মুহূর্তে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন—নৃপেন, ইনি তারাশঙ্করবাবু

ঘাড় বেঁকিয়ে আমায় দেখে নৃপেন বললেন, "রসকলি"।

দীনেশবাবু আমায় বললেন—আর উনি হলেন "শতাব্দীর সূর্য"—নৃপেন চট্টোপাধ্যায়।

নৃপেন এবার দইয়ের ভাঁড়, ঠোঙার চিঁড়ে, কলার ছড়া, "শতাব্দীর সূর্যে"র ফাইল নামিয়ে বললেন, ওঁর সঙ্গে আলাপের আগে একটা সকরুণ দৃশ্যের কথা বলব।

—বল।

—আজ দেখলাম, বউ বিয়ের বেনারসী শাড়ি পরে ভাত রাঁধছে। দেখে আর অন্ন আমার মুখে রোচে নি। সারা দিন পর এই দই-চিঁড়ে খাব। নৃপেন চলে গেলেন বাড়ির ভিতরের দিকে চিঁড়েতে জল দিতে। দীনেশবাবু একবার শৈলজার মুখের দিকে তাকালেন অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে, শৈলজা ভুরু দুটো উঁচু করে কপাল কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন নৃপেন্দ্র যে দরজার ভিতরে অন্তর্হিত হলেন সেই দরজার দিকে।

আমি প্রায় হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। অস্বস্তি বোধ করছিলাম। আমাকে আড়াল দিয়ে ওই ইঙ্গিত-আলাপনটা আলপিনের খোঁচার মতোই বিঁধছিল। এবং নৃপেন্দ্রের ওই বেনারসী শাড়ি পরে ভাত রান্নার কথাটির ব্যঞ্জনায় নিজেকে এমনই গ্রামীণ মনে হল যে চলে আসবার জন্য অছিলা খুঁজতে লাগলাম।

এরপর নৃপেন্দ্র প্রবেশ করে বললেন—একজোড়া শাড়ি আজ আমার না কিনলেই নয়।

এরই মধ্যে আমি বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলাম। আর "কল্লোল" আপিসে যাওয়া আমার ভাগ্যে ঘটে ওঠে নি।

ছয়

এই বারেই চাক্ষুষ পরিচয় হল মুরলীধর বসু—মুরলীদাদার সঙ্গে। মুরলীবাবুকে দাদা বলে ধন্য হয় মানুষ। এমন মানুষ—সাহিত্য এবং সাহিত্যিককে এমন প্রাণের সঙ্গে ভালোবাসা সচরাচর দেখা যায় না—পাওয়া যায় না। মুরলীদাদার প্রাণের পরিচয় সোজাপথে বেরিয়ে আসে, একেবারে খাঁটী মধুর মতো তার স্বাদ, আধুনিক যুগের আলাপের টোস্টের সঙ্গে মাখিয়ে দেবতাকেও ভোগ দেওয়া চলে। সাহিত্য-জগতে বুদ্ধির কড়াপাকে প্রাণের পরিচয় প্রায় লজেঞ্জস্ হয়ে দাঁড়িয়েছে, চিনিই মূল উপাদান—তবে কিছুটা অম্লাস্বাদদায়ক—কথা, বাকভঙ্গি এবং ব্যঞ্জনার কড়া ভিয়েনে এমন জমাট হয়ে উঠেছে যে সোজাসুজি মুখে ফেলে গলাধঃকরণ করা চলে না, দস্তুরমতো শক্ত দাঁতে কড়মড় করে ভাঙতে হয়, নয় তো চুষে চুষে শেষ করতে হয়। আবেগকে বর্জন করে কড়া বুদ্ধিবাদ এ যুগের ফ্যাশন, আমার ধাতে ওটা সয় না; আমি মোটেই ফ্যাশনেবল নই, সে আমি জানি। তাই মুরলীদাদাকে আমার এত ভালো লেগেছিল। একদণ্ডের আলাপে মনে

হল কতকালের জানাশোনা। পরদিন নিমন্ত্রণ করলেন বাড়িতে। প্রত্যাখ্যান করতে পারলাম না। গেলাম। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারেও আমি তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণীর মানুষ। খেতেও পারি না, হজম-শক্তিও দুর্বল। তা হলেও ভোজের চেয়ে প্রীতি পেলাম ভূরি পরিমাণে। সুখের কথা দুখের কথা, ঘরের কথা হলই। তারপর বললেন শৈলজার কথা। শৈলজানন্দের প্রতি ভালোবাসার পরিমাণ দেখে বিস্মিত হলাম। সে যে কী ভালোবাসা তা বলবার নয়। তারপর প্রেমেন্দ্র-অচিন্ত্যের কথা বললেন। এদের সম্ভাবনার কথা আলোচনা করলেন। প্রেমেন্দ্র-অচিন্ত্য সম্পর্কে আমার কৌতূহল ছিল অনেক। কালীঘাটে মনোহর পুকুর রোডে এক আত্মীয়-বাড়িতে একটি ছেলের কাছে এদের কথা শুনেছিলাম। শৈলজানন্দের কাছেও শুনেছিলাম। শৈলজানন্দ বলেছিলেন—প্রেমেনকে ধরা মুশকিল। আমি বরং তাকে বলব "পূর্ণিমা"য় লিখবার জন্য। তার সঙ্গে আমার খুব সম্প্রীতি আছে। অচিন্ত্যকে আপনারা ধরবেন। এম. সি. সরকারের দোকানে পাবেন। বসে থাকে। তবে সে কি কান দেবে?

আত্মীয় ছেলেটি বলেছিল—অচিন্ত্যবাবু আমাকে প্রাইভেট পড়াতেন কিছুদিন। এখন আর পড়ান না। না হলে এখানেই দেখতে পেতেন। তবে ভবানীপুরের পথে মোটা লেন্সের শেলের চশমা চোখে—সামনে ঝুঁকে শিকলিতে বাঁধা চাবির রিং ঘোরাতে ঘোরাতে যদি কোন কালো, লম্বা তরুণকে যেতে দেখেন তবে বুঝবেন সেই হল অচিন্ত্যবাবু। আর তার পাশে চৌদ্দ-পনেরো বছরের ছেলের মতো মাথায়, চুল কোঁকড়া, চশমা চোখে কাউকে দেখেন, তবে জানবেন সে হল প্রেমেন মিত্তির। বলেছিল—এক-একটি বিদ্যের জাহাজ।

ছেলেটিই অবশ্য কথার দিক দিয়ে তুবড়ি।

থাক। মুরলীদাদা এদের কথা অনেকই বললেন, প্রথম বৎসর থেকে বাঁধানো "কালিকলম" আমায় উপহার দিলেন। পরিশেষে বললেন, আসছে বৃহস্পতিবারে বারবেলার আসরে আসুন। সকলকে দেখতে পাবেন।

অচিন্ত্যবাবু এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রকে এই বারবেলার বৈঠকে দেখলাম।

বৃহস্পতিবারের অপরাহ্নে এই বৈঠক বসত—এই কারণেই এর নাম ছিল বারবেলার আসর। আসর বসত কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের উপরতলার প্রশস্ত বারান্দায়, বরদা এজেন্সির বইয়ের দোকানের সামনে; বরদা এজেন্সির ঘরেই ছিল "কালিকলমে"র আপিস। পাশেই ছিল আর্য পাবলিশিং হাউস। বরদা এজেন্সির মালিক ছিলেন শিশিরবাবু। আর্য পাবলিশিং হাউস চালাতেন শশাঙ্ক চৌধুরী। "কালিকলমে"র সম্পাদক কর্ণধার তখন একা মুরলীধর বসু। এঁরা তিন জনেই বারবেলার অতিথি-সমাগমে গৃহস্থ। শিশিরবাবু চুপচাপ

থাকতেন—একটু অভিজাত শ্রেণীর গম্ভীর লোক বলে মনে হয়েছিল, শশাঙ্ক চৌধুরী আমারই মতো শীর্ণকায়—তখনই মাথার চুলে টাক উঁকি মারতে শুরু করেছিল; শশাঙ্কবাবু সদানন্দ পুরুষ, মুখে আগে হাসি পরে কথা, দেখলেই বুঝতে পারা যায় যে, মানুষটির ভিতরের জনটি কাচের ঘরে বাস করেন। ভারী ভালো মানুষ। হৃদয় নামক যে বস্তুটি কয়লার খনিতে হীরকখণ্ডের মতো, কোথায় লুকিয়ে থাকে—খুঁজে বের করতে হয়, যে বস্তুটি বিগলিত হয়ে বড় হয়ে গেলে ডাক্তারেরা চিন্তিত হন, সেই বস্তুটি শশাঙ্কবাবুর যেন দেহের কয়লা খনি থেকে বেরিয়ে এসে ঝলমল করছে এবং উল্লাসে-উচ্ছ্বাসে বিগলিত হচ্ছে তবু শশাঙ্কবাবুর জীবন সম্পর্কে কোন চিন্তার হেতু নাই। "কালিকলম" "কল্লোলে"র যুগের এই দুটি মানুষ শ্রীযুক্ত মুরলীধর বসু এবং শ্রীযুক্ত শশাঙ্ক চৌধুরী সুদুর্লভ মানুষ। আর একজন—কবি শ্রীযুক্ত সুবোধ রায়। সুবোধবাবু এখন হৃদরোগে প্রায় অক্ষম জীবন যাপন করছেন। মধ্যে মধ্যে তাঁর পত্র যখন পাই তখন মনে হয় অমৃতের স্পর্শ পেলাম। সুবোধবাবুর জীবন-দর্শনের সঙ্গে আমার জীবন-দর্শনের কোথায় একটি সমধর্মের সূত্র আছে।

বারবেলার কথা বলি।

এই আসরটির নাম এবং ব্যবস্থায় যে তত্ত্বটি পরিস্ফুট তখনকার সাহিত্যের তত্ত্বের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। প্রচলিত বারবেলা সংস্কারকে না মানা এবং তার ভয়কে উপেক্ষা বা চ্যালেঞ্জ করা। আমার অবশ্য এই নামটা ভালো লাগে নি। বাড়াবাড়ি মনে হয়েছিল। বারবেলা তখন কেই বা মানত? ও সংস্কার তখন প্রায় উঠেই গেছে। আমাদের দেশে একবার একটা বাঘ এসেছিল; বেচারা কোন কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে গঙ্গাতীরের জঙ্গল ছেড়ে কোপাই নদীর ধার ধরে বায়ু পরিবর্তনের জন্যই হোক বা খাদ্যসংগ্রহের সুবিধার জন্যই হোক এসে পড়েছিল এই এলাকায়। এসে আর নড়তে চড়তে পারে নি; একটা ঝোপের মধ্যে শুয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলত আর লেজটা নাড়ত। সেই দীর্ঘনিশ্বাস শুনে রাখালেরা এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেলে লাঙ্গুল আন্দোলন। তারপর চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল বাঘ! দেশের বাবুরা বন্দুক নিয়ে গেলেন। গুলি ছুঁড়লেন। এমন সময় একজন সাহসী ব্যক্তি মুমূর্ষু বাঘটার উপর লাফিয়ে পড়ে দা দিয়ে কোপালেন তাকে। সে সময় বারবেলা না মানার বা মানার ভানে দুঃসাহসিকতা পথে যাত্রা ঘোষণার ইঙ্গিতটা বাড়াবাড়ি মনে হয়েছিল।

বারবেলা আমিও মানতাম না।

বোধ করি বারবেলা আসরে যোগ দেবার খুব অল্পদিন আগেই আমি

এক বৃহস্পতিবারের বারবেলায় রওনা হয়ে পথে ঠ্যাঙাড়ের হাতে পড়েছিলাম। অল্পের জন্যই বেঁচেছিলাম। বাইসিক্ল ছিল—সেই যান্ত্রিক বাহনটির গতিই আমাকে রক্ষা করেছিল; বাইসিক্লের পিছনের টায়ারে দুটি বংশখণ্ডও এসে লেগেছিল। লোকে বলেছিল—ঠ্যাঙাড়েদের দোষ তত নয়—যত দোষ আমার ওই বারবেলায় রওনা হওয়ার ধৃষ্টতার—ঔদ্ধত্যের। তবুও মানতাম না বারবেলা। এই কারণেই ভালো লাগে নি। যেমন আমার ভালো লাগে নি শনিবারের চিঠির প্রচ্ছদপটে শনিগ্রহের ছবি। মোরগ লড়াইয়ের ছবিটি ভালো।

বারবেলার আসরে সেদিন অনেককে দেখলাম। তার মধ্যে শশাঙ্কবাবু, মুরলীদা, শিশিরবাবু ছাড়া পেলাম সরোজ রায়চৌধুরীকে, সুবোধ রায়কে আর কিরণকে—কিরণকুমার রায়কে। আরও অনেকে ছিলেন। সর্বসুদ্ধ পনেরো-ষোলো জন। বোধ হয় ফণীন্দ্র পাল—যিনি এখন সিনেমা-জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট—তিনিও ছিলেন। সরোজ-সুবোধ-কিরণ পরবর্তী জীবনে ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ হয়েছেন। এঁদের মধ্যে আবার কিরণ আমার ঘনিষ্ঠতম আপনার জন হয়েছেন। আমার সাহিত্যিক জীবনে—যাঁদের কাছে শিখেছি—যাঁরা আমার সাধনার পথে উত্তরসাধকের মতো সহায়তা করেছেন, দ্বিধায় সংশয় মোচন করেছেন, হতাশায় আশা যুগিয়েছেন কিরণকুমার তাঁদেরই একজন। দুজনের একজন। অন্যজন সজনীকান্ত দাস। তাঁর সঙ্গে আলাপ অনেকদিন পর।

অল্প সময়ের মধ্যেই আসর জমে উঠল। প্রত্যাশা করেছিলাম—রচনা পাঠ হবে, আলোচনা হবে, শুনব। কিন্তু সে সব কিছু হল না। নিতান্তই আসর, এবং সে আসরে নবযুগের বক্রভাবভঙ্গিতে পরস্পরকে সকৌতুক আক্রমণ এবং আক্রমণ খণ্ডন উপভোগ্য।

প্রথম আলাপেই কিরণ আমাকে এমনি আক্রমণ করলেন। আমার একটি গল্প বের হয়েছিল—তার মধ্যে অন্ধকার গলিপথে একজন চলেছেন তাঁর হারানো প্রিয়তমার সন্ধানে; রাত্রির-পর-রাত্রি তিনি এইভাবে খোঁজেন—মধ্যে মধ্যে অন্ধকারে কোনো শব্দ শুনলে বা কোনো মানুষের অস্তিত্বের আভাস পেলে দেশলাই জেবলে দেখেন। কাঠিটা নিভে যায়—আবার জ্বালেন। এই সূত্র ধরে কিরণ প্রথমেই বললেন—আপনি তো দেশলাই কোম্পানির এজেন্ট।

অবাক হয়ে গেলাম। বললাম—না তো। কে বললে?

—তবে? ওই গল্পটায় এত দেশলাই খরচ করেছেন কেন? একটা টর্চ হাতে দিলেই তো হত।

আসরে বেশ খানিকটা হাস্যরোল উঠল।

কিছুক্ষণ পর আসরে আবির্ভূত হলেন প্রেমেন্দ্র এবং অচিন্ত্য। ওই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিনিট কয়েক বাক্যবাণ প্রয়োগে আসর-নাট্যটির সংলাপকে সমৃদ্ধ এবং উজ্জ্বল করে দিয়ে চলে গেলেন। মুরলীদা আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন।

শুধু নমস্কার বিনিময় হল। আর ছোট একাক্ষর একটি বাক্য—ও!

চলে গেলেন দুজনে। পাড়াগেঁয়ে মানুষ—জাত-বাঙালী—প্রথম আলাপেই নাম ধাম ঠাকুরের নাম (বাবার নাম)—গাই-গোত্র—কোন্ বেদ—কোন্ শাক এ সবের খোঁজ নিই; কি করেন—কত টাকা মাইনে জিজ্ঞাসা তখন সভ্যতা-বিরুদ্ধ বলে জিজ্ঞাসা করি না বটে তবে মনের মধ্যে ঔৎসুক্য অনুভব করি। এ আসরে একটু দমে গেলাম বই কি! রাঢ় দেশের পুকুরের মাছ কলকাতার জোয়ার-ভাঁটা-খেলা গাঙে এসে পড়লে যা হয় সেই অবস্থা।

এই সময় হঠাৎ একজন এলেন, একজন নয়—তাঁর সঙ্গে আরও দুজন ছিলেন—কিন্তু একটা নামই সমস্বরে উচ্চারিত হল বলেই একজন বলছি।

সমস্বরে উচ্চারিত হল—সুধাদা!

সুধাদার পুরো নাম জানি না—জানবার দরকারও নাই; লোকটি আজও কলকাতা শহরে রঙ্গমঞ্চে, রঙ্গরসিক মহলে, সাহিত্যিক মহলে সর্বজনবিদিত ব্যক্তি। রসিক ব্যক্তিটি দুর্ভাগ্যক্রমে জন্ম নিয়েছিলেন ধনী কয়লা ব্যবসায়ীর ঘরে। তাই নাট্যপ্রিয়তার জন্য রসিক মানুষটি ব্যবসায় ব্যর্থ হয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে দুঃখ পেয়েছেন জীবনে। আবার নাট্যমন্দিরেও পুরো নামতে পারেন নি।

সংসারটাই রঙ্গমঞ্চ—আমরা সবাই অভিনেতা—এটা অবশ্য একটা দর্শনতত্ত্ব বটে। কিন্তু অভিনয়ের মেক-আপ আর বাকভঙ্গি এ দুটো যেখানে বড় হয়ে ওঠে সেখানেই অভিনয়টা মেকী হয়ে যায়—অভিনয় বলে ধরা পড়ে। কিন্তু ও দুটোর সঙ্গে যখন প্রাণ সাড়া দেয়, যোগ দেয় সমানে তখন অভিনয়কে আর অভিনয় বলে ধরা যায় না। সেইখানেই মহানাটক হয় সার্থক। এমনকি প্রাণ যখন মেক-আপ ভাবভঙ্গিকে ছাপিয়ে যায় তখনই দর্শকেরা কাঁদে—হাসে। সুধাদা তেমনি প্রাণবান অভিনেতা। তাঁর প্রাণের সাড়ায় ওই বৈঠকী অভিনয় প্রাণ পেলে। সকলে মেক-আপ খসিয়ে সোজা কথায় কথা বলতে শুরু করলেন। তিনি সেদিন সঙ্গে এনেছিলেন নাট্যকার মন্মথ রায়কে। তাঁর কতকগুলি একাঙ্কিকা তখন প্রকাশিত হয়েছে। নাটকও বোধ হয় অভিনীত হচ্ছে আর্ট থিয়েটারে কি কোথাও।

মন্মথ রায় লাজুক মানুষ—আমারই মতো চুপ করে রইলেন।

সুধাদা আলোচনা শুরু করে দিলেন। আসর পালটে গেল। সে দিন যা পেলাম, তা ওই সুধাদার কল্যাণেই এবং তাঁর কাছ থেকেই বেশী।

আসর ভাঙল। বাসায় ফিরলাম। যাবার বেলা অচিন্ত্য সেনগুপ্তের বাড়ির ঠিকানা যোগাড় করতে ভুললাম না। তিরিশ-গিরীশ। ভবানীপুরে গিরীশ মুখার্জী লেনের কাছাকাছি প্রিয়নাথ মল্লিক রোডে আত্মীয়ের বাসাতে উঠেছিলাম।

পরদিন গেলাম তাঁর বাসায়। ঢুকেই বোধ হয় বাঁদিকের ঘরে অচিন্ত্যবাবুর লেখাপড়ার ঘর। অনেক বই। তার মধ্যে বসে আছেন। ডেকে বসালেন। কিছু কিছু আলাপ হল। উৎসাহ দিলেন। আমি অনেক চেষ্টা করলাম স্বচ্ছন্দ হতে। কিন্তু স্বভাবদোষে পারলাম না। পরিশেষে—তাঁর কাছে পড়বার জন্য তাঁর "বেদে" বইখানি চাইলাম। পড়ে কাল ফেরত দিয়ে যাব।

অচিন্ত্যবাবু একখানি নতুন বই বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন—নিয়ে যান। ফেরত দিতে হবে না।

আমি একটু লজ্জিত হয়েছিলাম। সত্যসত্যই বইখানি আমি পড়বার জন্যই চেয়েছিলাম। আমার নিজের দাবি কতখানি সে সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলাম। সাহিত্যক্ষেত্রে সদ্য আগত আমি, অচিন্ত্যকুমার নিজের শক্তিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। তাঁর বই উপহার পেতে যে যোগ্যতার প্রয়োজন ছিল সে তো আমার ছিল না। যে অন্তরঙ্গতার দাবিতে সাহিত্যিক না হয়েও সাহিত্যিক বন্ধুর কাছ থেকে বই উপহার পায় তাই বা কোথায় তখন? এবং আমাদের লাভপুরের সাহিত্যিক জীবনে এবিষয়ে আমার যে শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা সে-ও এর বিপরীত। আমাদের ওখানে তখন আমার অগ্রজতুল্য তিন জন সাহিত্যিক রয়েছেন, তাঁদের নাটক গল্পের বই তাঁরা নিজেরাই প্রকাশ করেছেন। স্বর্গীয় নির্মলশিব, শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়; এঁরা আমাকে কোন বই দেন নি। সে নিয়ে মনে বেদনা বা ক্ষোভ হয়ত প্রথম প্রথম হয়েছিল কিন্তু পরে ওইটেই হয়ে গিয়েছিল সহজ অবস্থা। অচিন্ত্যকুমারের কাছে "বেদে" বইখানি পেয়ে তাই আনন্দের পরিবর্তে লজ্জাই বেশী অনুভব করলাম। কি বলব কয়েক মিনিট বসে ভাবলাম। বলব, না না, আমি ফেরত দিয়ে যাব। কিন্তু অচিন্ত্যবাবু তার পূর্বেই আবার বললেন, আপনাকে দিলাম।

উঠলাম, উঠেও দু মিনিট দাঁড়িয়ে রইলাম। ইচ্ছে ছিল অচিন্ত্যবাবু বইখানায় প্রথামত লিখে দেন। কিন্তু বলতে পারলাম না। প্রীতি যদি নাই পেয়ে থাকি, তবে প্রীতিভাজনেষু বা সুহৃদ্বরেষু লিখে মিথ্যাচরণ করবেন কেন? কিন্তু অকপট ভাবেই বলব কিছুক্ষণের মধ্যেই সকল গ্লানি আমার

কেটে গেল। অক্ষয় হয়ে রইল আমার মনে এই কথাটি যে, সাহিত্যিক হিসাবেই গণনা করে অচিন্ত্যবাবুই তাঁর বই উপহার দিয়ে আমাকে প্রথম সম্মানিত করলেন।

আমার সম্পর্কে কিছু লিখতে গিয়ে ['কথাসাহিত্য'—শ্রাবণ, ১৩৫৭] অচিন্ত্যকুমার এই কথাটিই লিখেছেন। এবং এই লিখে না দেওয়ার কথাটি স্মরণ করেই লিখেছেন, 'আমার প্রথম বই "বেদে" সদ্য সদ্য বেরিয়েছে, কি দিয়ে অভ্যর্থনা করব অতিথিকে, একখানা বেদে তাকে উপহার দিলাম।'

"সেইটের মধ্যে যেন নিরবচ্ছিন্ন প্রীতি ছিল না, ছিল বা প্রচ্ছন্ন স্পর্ধা। ভাবখানা এমনি, একটা প্রকাণ্ড কর্ম করেছি, তুমি দেখ, তুমি সাক্ষী হও। তাই সে কথাটি পরবর্তীকালে আমার আর মনেই ছিল না। যে ভাবটি প্রীতির রসে সঞ্চিত থাকে না, তা স্বল্পজীবী।"

আমিই তাঁকে একদিন এই কথাটি পত্রালাপের মধ্যে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলাম। তাতে অচিন্ত্যবাবু একটু আত্মগ্লানি অনুভব করেছিলেন। কিন্তু অনুভব করা তো উচিত ছিল না। প্রথম যৌবনে একদিনের আলাপে বই দিয়ে যদি না লিখেই দিয়ে থাকেন, যদি প্রীতি দিতে নাই পেরে থাকেন, তবু তো স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। স্পর্ধা খানিকটা থাকেই। যেখানে নেই সেখানে সে স্তিমিত। আজ অচিন্ত্যবাবু প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হয়েছেন—স্পর্ধা শক্তি সব পরিণত হয়েছে মহৎ মাধুর্যে। তাই তিনি বিষণ্ণতা অনুভব করেছেন। আমার জীবনে কিন্তু এইটুকুই প্রথম স্বীকৃতির সম্পদ। এমনভাবে কেউ আমাকে সম্মানিত করেন নি। বই পরবর্তীকালে অনেকের কাছেই পেয়েছি কিন্তু এমন প্রথম আলাপেই কেউ দেয় নি। তাই পরম প্রীতিভরে যদি নাও হয়, পরম শ্রদ্ধাভরে এ কথাটি স্মরণ করি। সময়ে সময়ে মনে হয় হয়তো বা আমার চিঠিতেই অভিযোগ ছিল। তা যদি থেকে থাকে তবে সে আমারই অপরাধ। অহং-কে গড়ে তোলে মানুষ; মানুষ তা থেকে আত্মাকে পাবার জন্য। অহং হল প্রতিমা, তার মধ্যেই দেবতার মতো আত্মা যখন আবির্ভূত হন তখন প্রতিমা মাটিত্ব থেকে মুক্তি পায়। তার রং এবং রাংতার গৌরব ধুলোয় মেশে। অচিন্ত্যবাবু আত্মাকে অনুভব করেছেন।

তিনি ১৩৩৬ সালে "কল্লোলে"র ভার নিয়েছিলেন। দীনেশবাবু ছায়াছবির জগতে চলে গেলেন। অচিন্ত্যবাবু আমাকে গল্পের জন্য লিখলেন। আমি "স্বৈরিণী" নাম দিয়ে একটি গল্প লিখে পাঠালাম। অচিন্ত্যবাবু গল্পটি জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'কল্লোলে' ছাপতে দিয়ে লিখলেন, "স্বৈরিণী" নামটি বদলে দিলাম। নামকরণ করলাম "রাইকমল"। নায়িকা রাইকমল।

(আমার ইচ্ছা ছিল আমার প্রথম বই উৎসর্গ করব অচিন্ত্যবাবুকে। "বেদে" পেয়ে এতখানি অভিভূত হয়েছিলাম আমি। কিন্তু তা হয় নি। রাজনীতির নেশা আমাকে তখন আরও বেশী আচ্ছন্ন করেছিল। তা ছাড়া আকস্মিকভাবে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সংস্পর্শে এসে তাঁর মহৎ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ও মাধুর্যে অভিভূত হয়ে সে বই তাঁকেই উৎসর্গ করেছিলাম।)

সাত

আমার প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস "চৈতালী ঘূর্ণি"।

"রাইকমলে"র আগে ১৩৩৫ সালের "কালিকলমে" "শ্মশানের পথে" নামে একটি গল্প বেরিয়েছিল। এই গল্পটির মধ্যেই আমার ভাবী সাহিত্যিক জীবনের সুর নিহিত ছিল। পল্লী-জীবন, পল্লী-সমাজ জীর্ণ হয়েছে, ভেঙে পড়তে গিয়ে কোন ক্রমে সেই ভাঙা কাঠে বাঁশে ঠেকা খেয়ে ঝুঁকে পড়ে টিকে রয়েছে কায়ক্লেশে—শ্মশান আসছে এগিয়ে। জমিদার মহাজন কাবুলিওয়ালার শোষণ তাড়না; ম্যালেরিয়ার আক্রমণ; ঈশ্বরের নীরবতা—গ্রামের চাষীকে টেনে নিয়ে চলেছে অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের পথে, মৃত্যুর পথে।

এক অভিজ্ঞতা আমার প্রত্যক্ষ। (ছোট জমিদার বংশে আমার জন্ম—আবার কংগ্রেসকর্মী এবং আমার মা দিয়েছিলেন এক বিচিত্র ন্যায়-অন্যায় বোধের ধারণা; তাই গ্রামে গ্রামে কখনও খাজনা আদায় উপলক্ষে কখনও সেবাধর্ম উপলক্ষে ঘুরবার সময় গ্রামের অবস্থা আমার চোখে বিচিত্র রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছিল। এর আগে শরৎচন্দ্রের পল্লী-জীবন নিয়ে লেখা উপন্যাসগুলির মধ্যে রমা, অন্নদাদিদি, রাজলক্ষ্মী, সাবিত্রীর জীবনের ব্যর্থতায় বেদনাহত হয়েছি, এবং দেখেছি সমাজ সর্বত্র দাঁড়িয়ে আছে ত্রিভুজের এক কোণে, বিপুল তার শক্তি, কঠিন তার আক্রোশ। আমার বিচিত্র অভিজ্ঞতায় আমি দেখলাম তার শক্তি নাই, সে মুমূর্ষু—শক্তি তার নাই, সে সক্রিয় নয়, শুধু আয়তন এবং ভারটা একদা বিপুল ছিল বলেই ঘটোৎকচের দেহের মতো সে জীবনের গতির পথ রোধ করে পড়ে আছে। ওর দেহে চাবুকের আঘাতে স্পন্দন জাগবে না, ওকে ভারি ধারালো অস্ত্রাঘাতে খণ্ড খণ্ড করে সরিয়ে সংকার করতে হবে। চিতা জ্বালাতে হবে। শবদেহটা আগলে আছে বৈদেশিক রাজশক্তি। একটাকে সরিয়ে আর একটাকে রাখলে চলবে না। দুটোকে একসঙ্গে সরাতে হবে। এক চিতায় দুটো যাবে।

প্রজার কাছে খাজনা আদায় করেছি—সুদ নিয়েছি খাজনা বৃদ্ধি করেছি ; কাছারিতে মহাজনকে বসিয়ে রেখেছি. যে প্রজা খাজনা দিতে পারছে না তাকে মহাজনের কাছে ঋণ নিতে বাধ্য করেছি—সেই টাকা খাজনা হিসেবে জমা করেছি। আমার তখন বয়স অল্প, আমাদের প্রবীণ নায়েব করেছেন—আমি অবাক হয়ে দেখেছি। শরিকী জমিদারের কাছারিতে গিয়েছি—সেখানেও দেখেছি তাই। আরও বেশী দেখেছি—দেখেছি সেখানে তাঁরা নিজেরাই মহাজনী করেন, ধান টাকা সুদে ধার দেন। দেখেছি এক ভাই নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেল, অবীরা বিধবাটির হিতার্থী সেজে তার হাতে একশো টাকা দিয়ে হাজার টাকার মূল্যের সম্পত্তি লিখে নিলেন। কথা থাকল সম্পত্তি দখল পেলে তাকে আরও টাকা দেবেন, কিছু জমিও দেবেন। জমিদারের সম্পত্তি দখল করতে কতক্ষণ লাগে সে আমলে ? দখল হল। বিধবা এল। রিক্তহস্তে ফিরে গেল।

এর সঙ্গে মানুষের জীবন-বেদনা এমনি ভাবে জড়িয়ে গেছে, এমনি ভাবে মানুষের ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করছে যে একে বাদ দিয়ে মানুষের জীবনরূপ অসম্পূর্ণ, খণ্ডিত। নিয়তি—ভাগ্যফল—অদৃষ্টবাদের পটভূমির রং মুছে গেল আমার চোখের সামনে থেকে।

জেলখানায় বসে এই ভাবনাকে প্রসারিত করবার সুযোগ পেয়েছিলাম।

আরও অভিজ্ঞতা এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। সে অভিজ্ঞতা কলিয়ারির। শ্বশুর-কুল আমার কলিয়ারির মালিক। তাঁরা পড়ো জমিদার-ঘরের অর্ধ-শিক্ষিত জামাইটিকে নিয়ে বিব্রত হয়েছিলেন যথেষ্ট। কখনও কলকাতার আপিসে কখনও কয়লা-কুঠিতে পাঠিয়ে কাজের লোক করে তুলতে চেয়েছিলেন। প্রতিবারই মাস ছয়েকের বেশী লেগে থাকতে পারি নি। পালিয়ে এসেছি। কাজের লোক হই নি—তবে সেখানকার অভিজ্ঞতা আমার জীবনের পাথেয় হয়েছে।

দুই অভিজ্ঞতাকে জুড়ে "চৈতালী ঘূর্ণী"র সৃষ্টি।

জেলখানা থেকে বেরিয়ে এলাম। "উপাসনা"র সম্পাদক কবি সাবিত্রী-প্রসন্নের সঙ্গে আলাপ আগেই হয়েছিল, এবার তিনি অন্তরঙ্গ বন্ধু হলেন। তাঁর "উপাসনা"তেই "চৈতালী ঘূর্ণী" বের হল। "কল্লোল", "কালিকলম" তখন নাই।

বইয়ের আকারে "চৈতালী ঘূর্ণী" ছাপা হল "উপাসনা" প্রেসেই। বইখানি উৎসর্গ করলাম নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নামে। বাংলার যৌবনশক্তির তিনি প্রতীক। নবযুগের অগ্রদূত। শুধু তাই নয়, আগেই বলেছি এই সময় তাঁর ব্যক্তিগত সংস্পর্শে এসে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম।

সে কথাটি এখানেই বলব।

জেলখানা থেকে বেরিয়ে এলাম, তারপর সরকারের সঙ্গে আপোস-কথাবার্তার সূত্রপাত হল। এদিকে বাংলা দেশে লাগল কংগ্রেস নিয়ে বিরোধ। একদিকে সুভাষচন্দ্র অন্যদিকে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। দুজনকে কেন্দ্র করে প্রাদেশিক কংগ্রেস নির্বাচনে জটিল দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হল। আমি তখন কংগ্রেসের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংস্রব ত্যাগ করলেও কংগ্রেসের সভ্য। জমিদারির সঙ্গে সংস্রব কাটাবার অভিপ্রায়ে বোলপুরে একটি প্রেস করেছি। কলকাতা যাই আসি। বীরভূমেও এই বিরোধ বাধল। সেখানে সুভাষচন্দ্রের পক্ষে নরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং যতীন্দ্রমোহনের পক্ষে সিউড়ীর গোপিকাবিলাস সেনগুপ্ত, সুরেন সরকার প্রভৃতি। স্বর্গীয় ডাক্তার শরৎ মুখোপাধ্যায় মশায় নিরপেক্ষ থাকতে চেষ্টা করেছেন। নরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিদেশী। তিনি লাভপুরে ডেটিনু হিসেবে কিছুদিন ছিলেন, তারপর আমার বাগানেই খানিকটা জায়গা নিয়ে বাড়ি করেছিলেন একখানি। চতুর ব্যক্তি। তাঁর ধারণা ছিল তিনিই আমাকে মানুষ করছেন এবং আমি তাঁরই একান্ত অনুগত। এই বিরোধে সবচেয়ে বেশী অনিয়ম এবং অনাচার করেছিলেন তিনি। এবং আমার অজ্ঞাতসারে আমার বিশ্বস্ত আনুগত্য অনুমান করে সব অনিয়মেই আমাকে জড়িয়ে রেখেছিলেন। যে সভা হয় নি সে সভা কাগজে কলমে খাড়া করে আমাকেই তার সভাপতি হিসেবে জড়িয়েছিলেন। কালে মহারাষ্ট্র ভবনে আনে মহোদয়ের আদালতে যখন বিচার শুরু হল তখন বীরভূমের মূল সাক্ষী হলাম আমি। আমি রাজনীতি ছাড়তে চাইলেও রাজনীতির কম্বলরূপী ভালুক আমায় ছাড়লে না।

ওয়েলিংটন লেনে সাবিত্রীপ্রসন্নের প্রেস, কাগজের আপিস এবং বাসা। আমি ওখানেই তখন অতিথি হিসেবে রয়েছি। কিরণ রায়ের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা জমে উঠছে। এমনি সময় একদিন ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কোণের বি-পি-সি-সি থেকে স্বর্গীয় কিরণশঙ্কর সাবিত্রীপ্রসন্নকে অনুরোধ জানালেন যেন তারাশঙ্করকে নিয়ে একবার তিনি আসেন।

আমি বললাম, না। তিনি যা বলবেন সে আমি পারব না। মিথ্যা বলব না।

কয়েকদিন পর আবার অনুরোধ এল। বললাম, না।

বার বার তিনবার।

এর পর একদিন সাবিত্রীপ্রসন্ন বললেন, চল, এক জায়গায় বেড়িয়ে আসি।

—কোথায়?

—চল না। বললে চিনবে না হয়তো।

তিনজনে বের হলাম। আমি, সাবিত্রীপ্রসন্ন, কিরণ রায়। ভবানীপুরে এলগিন রোডের মোড়ে নেমে সাবিত্রীপ্রসন্ন আমাকে এনে তুললেন স্বর্গীয় শরৎবাবুর বাড়িতে। সামনের ঘরে আট-দশ জন দর্শনার্থী। ভিতরে বোধ হয় দশ-পনেরোটা কি তার বেশী টাইপরাইটার খটখট শব্দে অবিরাম চলেছে। ডানদিকের ঘরে সুভাষচন্দ্র আলোচনা করছেন সহকর্মীদের সঙ্গে। একটি অগ্নিশিখার মতো দীপ্তিমান কিশোর ব্যস্ত হয়ে ঘুরছেন। সুভাষচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র। কে ঠিক বলতে পারি না। সাবিত্রীপ্রসন্ন সংবাদ পাঠালেন। সুভাষচন্দ্র মিনিট কয়েক পরেই বেরিয়ে এলেন। আলাপ করলেন কয়েকটি কথায় কিন্তু তাতেই পেলাম প্রাণের স্পর্শ।

আপনিই তারাশঙ্করবাবু! আপনার সঙ্গে কথা বলা আমার যে কি প্রয়োজন! আমি আসছি। পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করুন।

ভাইপোকে ডেকে বললেন, চা দাও।

এই সময় একটি ঘটনা ঘটল। একজন কংগ্রেসকর্মী—মাথায় চুল, মুখে দাড়ি-গোঁফ, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা—একটু যেন ব্যঙ্গ করেই বলে উঠলেন, ওই! হল—। সাহিত্যিক নিয়ে এইবার জল-খাওয়ানো মজলিস—।

বাকি কথা মুখেই রইল তাঁর। সুভাষচন্দ্র চলে যাচ্ছিলেন, ঘুরে দাঁড়ালেন বাঘের মতো এবং বাঘের মতোই গর্জন করে উঠলেন, হোয়াট!

এক বিন্দু অতিরঞ্জন করি নি, বক্তা ভদ্রলোক মুহূর্তে ধপ করে বসে গেলেন চেয়ারে।—আমার অতিথি! বলে সুভাষচন্দ্র ভিতরে ঢুকে গেলেন।

আমি ভীত হয়েছিলাম খানিকটা। শক্ত করে মনকে বাঁধলাম। সাবিত্রীকে শুধু বললাম, তুমি অন্যায় করেছ। আমাকে এমনভাবে এখানে আনা তোমার উচিত হয় নি।

বেরিয়ে এলেন সুভাষবাবু।

সঙ্গে সঙ্গে নরেন বন্দ্যোপাধ্যায়। সুভাষবাবু তাঁকে বললেন, না আপনি যান। তিনি চলে গেলেন।

সুভাষবাবুই প্রথমে কথা আরম্ভ করলেন, আপনি কেন সাক্ষী দেবেন?

আমি খুব সংযত করলাম নিজেকে। বললাম, আমি তো মিথ্যা বলব না! একটা কথা—। বলেই তাঁর মুখের দিকে তাকালাম আমি।

তিনি প্রসন্ন মুখেই বললেন, বলুন।

বললাম, দেখুন, আমরা যারা কংগ্রেসের কর্মী হয়ে কাজ করি, তারা দেশের সেবা করতেই আসে, তারা তো সুভাষচন্দ্র বা জে. এম. সেনগুপ্তের

সেবা করতে আসে না। আমি দেশের সেবা করতে চেয়েছি—চাই—সত্য বলতে সাক্ষী দেব আমি।

মুহূর্তে দুই পাশ থেকে দুটি আঙুলের টিপুনি খেলাম। একদিক থেকে কিরণ অন্যদিক থেকে সাবিত্রী আমাকে টিপলেন। আমি এর অর্থ ঠিক বুঝলাম না। বুঝতে চাইলামও না। আমি তখন কঠোর সত্য বলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সাবিত্রী, কিরণ আশঙ্কা করেছিলেন, সুভাষচন্দ্র উষ্ণ হয়ে উঠবেন। আবার হয়তো গর্জন করবেন।

আমি সুভাষবাবুর মুখের দিকেই তাকিয়ে ছিলাম। তাঁর সুন্দর মুখখানা কঠিন হয়ে উঠল মুহূর্তের জন্য, টকটকে রং লাল হয়ে উঠল। কিন্তু পর মুহূর্তেই তিনি হাসলেন, প্রসন্ন হাসি। বললেন, নিশ্চয়। মানুষকে দেবতা হিসাবে সেবা করলে সাধনাই পণ্ড হয়ে যাবে। কিন্তু আমি সত্য কথাটাই জানতে চাই। বলুন আপনি। সত্য কি ঘটেছিল?

পিছনে ঘরের ভিতরের দিকে তাকালেন তিনি, একান্তে আলাপের স্থান খুঁজলেন। দেখলেন স্থান নাই। বললেন, চলুন, লনে বেড়াতে বেড়াতে কথা বলি।

চারজনেই লনে বেড়াতে বেড়াতে কথা বললাম। আমি বিবরণ বলে গেলাম, তিনি মধ্যে মধ্যে দু-একটি প্রশ্ন করলেন। শেষে বললেন, আপনার কথা আমি অকপটে বিশ্বাস করলাম! আপনি সত্য বলেছেন। আমি দুঃখিত, লজ্জিত—নরেনবাবু এই সব করেছেন—আমাকে ছোট করেছেন, কলঙ্কভাগী করেছেন। আপনি বিশ্বাস করুন, এ আমি চাই নি। এ আমি চাই না।

আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। হারিয়ে ফেলেছিলাম নিজেকে।

তিনি আমাকে বলেছিলেন, আপনি শরৎবাবুকে (বীরভূমের) নিয়ে বিরোধ মিটিয়ে দিন।

আমি পারি নি। শরৎবাবুরা রাজী হন নি।

আমি তখন এই মানুষটির কাছে প্রায় আত্মসমর্পণ করেছি মনে-মনে।

"চৈতালী ঘূর্ণী" তাঁকেই উৎসর্গ করেছিলাম।

আট

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে আর-একবার আমার দেখা হয়েছিল। কালানুক্রমেও এই ঘটনার খুব অল্পদিন পর। এবং আমার সাহিত্য জীবনের উপক্রমণিকা পর্বে এর কিছুদিন পর নেমে এল নাটকের যবনিকার মতো

একটি সংঘাতময় ছেদ। তিনিই আমাকে পথ নির্বাচনে কিছুটা সাহায্য করলেন—এই সাক্ষাতে।

তার আগে আমার তখনকার জীবন সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলব। জেল থেকে বেরিয়ে এসে—জেলখানার সঙ্কল্প মনে রেখে—বৈষয়িক জীবন থেকে মুক্তি নেবার জন্য ছোটভাইকে সব ভার অর্পণ করে বোলপুরে একটি ছাপাখানা করলাম। মনে মনে আকাঙ্ক্ষা ছিল একখানা কাগজ বের করব। সাপ্তাহিক কাগজ, নিলাম-ইস্তাহার-সর্বস্ব নয়, রীতিমতো দেশপ্রেম-প্রচার-পত্রিকা। আমার মেজভাই তখন বেকার এবং বিপত্নীক হয়ে আধা-সন্ন্যাসী। গজভুক্ত কপিত্থের মতো অর্থনৈতিক অবস্থা! যাঁদের কাছে অর্থ পাই তাঁরা দেন না, উপরন্তু চেষ্টা করেন যে সম্পত্তি আছে সেসব যাতে নিলাম হয়, তা হলে তাঁরা তা কেনেন! এ গ্রাস আত্মীয়ের। থাক সে সব কথা। বিষয়বন্ধন থেকে মুক্তি দিতে যাঁরা সাহায্য করেছেন তাঁদের চরণে ক্ষোভহীন অন্তরে প্রণাম নিবেদনই করব।

বাড়ির বধূদের কিছু অলঙ্কার বিক্রি করা হল। মেজভাইয়ের স্ত্রী মারা গেছেন, তিনি আর বিবাহ করবেন না সঙ্কল্প করেছেন, সুতরাং বড়-বউ, ছোট-বউয়ের দু-একখানা নিয়ে বাকিটা মেজ-বউয়ের অলঙ্কার থেকে সংগ্রহ করা হল। তখন সাবিত্রীপ্রসন্নের "উপাসনা"য় আমার ভাঙা নৌকার বন্দর। সাবিত্রীপ্রসন্ন আমাকে প্রেস ও সরঞ্জামপাতি কিনে দিলেন। ওই ওয়েলিংটন লেনেই বাসা নিয়েছি। এই সময় "শনিবারের চিঠি"র কথা ওঠে। গালাগালির অন্ত থাকে না; যাঁরা গাল খেয়েছেন তাঁরা জ্বলেন, যাঁরা খান নি, তাঁরা নিজেদের দুর্ভাগা মনে করেন। আমি অবশ্য একবার গাল তখন খেয়েছি। কিন্তু তবুও দুর্ভাগার দলেই আছি। একদা ইচ্ছা হল "শনিবারের চিঠি"র দুর্দান্ত সজনীকান্তকে দেখে আসি। কেমন সে লোকটা! রাজেন্দ্রলালা স্ট্রীটে "শনিবারের চিঠি"র আপিস। সাবিত্রী এবং কিরণকে কিছু না বলেই একদিন বেরিয়ে গেলাম। মানিকতলা খালের কাছাকাছি রাজেন্দ্রলালা স্ট্রীটে সভয়ে প্রবেশ করে দাঁড়ালাম। চকমিলানো বাড়ি, উঠানের চারি পাশে ঢাকা রোয়াক বা বারান্দা। সেই বারান্দায় বেশ জবরদস্ত কাঠামো—মোটা নাক, বড় উগ্র-দৃষ্টি চোখ, ফরসা রং, চেয়ারে বসে গড়গড়ায় রবারের নল লাগিয়ে তামাক টানছে। মনে হল এই সজনীকান্ত, "শনিবারের চিঠি"র সম্পাদকের মতো জবরদস্ত চেহারাটা বেশ মিলে যাচ্ছে। তবে রবারের নলে গড়গড়া টানতে দেখে অশ্রদ্ধা হল! এ কি গুরুচণ্ডালী ব্যাপার! যাক গে! আমাকে দেখেই চোখ দুটো আরো খানিকটা বড় করে ভরাটগলায় প্রশ্ন করলেন—কি চাই?

পাতলা রোগা মানুষ—সদ্য জেল থেকে ফিরেছি—আরও রোগা হয়ে। ওজন তখন ১০২ পাউণ্ডে নেমেছে। সর্বাঙ্গে একটা কালো ছোপ পড়েছে। মনে হল লোকটি আমার থেকে বয়সে অনেক বড়। সভয়ে উত্তর দিলাম—আমি শ্রীযুক্ত সজনীকান্তবাবুকে খুঁজছি।

নাকের ডগাটা ফুলে উঠল—বললেন—আমিই সজনীকান্তবাবু! কি দরকার আপনার?

লেখক বলে পরিচয় দেবার মতো যোগ্যতা ছিল না, ভরসা পেলাম না; চট করে বললাম—আমার বাড়ি বীরভূম, আপনার দেশের লোক—একটু সাহায্যের জন্য এসেছি।

—কি সাহায্য—?

—আমি একটি প্রেস কিনব। ছোটখাটো—মফস্বলে কাজ করবার মতো প্রেস; আপনি নিজে প্রেস করেছেন, যদি এই কেনার ব্যাপারে একটু সাহায্য করেন।

আরও কয়েকটা কথা বলে আমি চলে এলাম। "দেখে এলাম সজনীকান্তকে। সেদিন যদি আমি সাহিত্যের কথার অবতারণা করতাম তবে নিশ্চয় সজনীকান্ত উত্তরে সেদিন বীরভূমের ধান-চালের প্রসঙ্গ উত্থাপন করতেন বলেই আমার ধারণা।

সজনীকান্তকে দেখে—প্রেস কিনে বোলপুরে প্রেস করলাম। বোলপুর কোর্টের পাশেই ছাপাখানা। চেক, রসিদ, আদালতের ফর্ম, ক্যাশ-মেমো, প্রীতি-উপহার ছাপি, একসারসাইজ বুকে কপিং-পেন্সিলে গল্প লিখি। "উপাসনা"য় পাঠাই। ওদিকে সরোজ রায়চৌধুরী জেল থেকে ফিরে "নবশক্তি"র সম্পাদক পদ না পেয়ে, "অভ্যুদয়" নামে সাপ্তাহিক পত্র বের করলেন, তাতে আমি আরম্ভ করলাম আমার দ্বিতীয় উপন্যাস—"পাষাণপুরী"। বোলপুরের ছাপাখানায় গল্পলেখক শ্রীযুক্ত জগদীশ গুপ্ত আসতেন মধ্যে মধ্যে।

হঠাৎ বিপত্তি উপস্থিত হল ছাপাখানা নিয়ে।

বীরভূমের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তখন স্বনামধন্য গুরুসদয় দত্ত। রায়বেঁশে নিয়ে বীরভূমকে মাতিয়ে তুলেছেন। তিনি স্বর্গীয়—তাঁর সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা না করাই ভালো। রায়বেঁশে নৃত্য, ব্রতচারী দল বাংলার সংস্কৃতিকে যেটুকু সমৃদ্ধ করেছে তা স্বীকার করেও বলব যে সেদিন এই মাতনটি যাঁরা দেশকর্মী তাঁদের চোখে ভালো ঠেকে নি। এই মাতনটি সেদিন দেশের মানুষের দৃষ্টিকে কংগ্রেস আন্দোলন থেকে ফিরিয়ে অন্য দিকে নিবদ্ধ করবার জন্য সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হয়েছিল। এবং এই রায়বেঁশে বা

ব্রতচারী আন্দোলন প্রচার করতে তিনি যে শাসকের প্রতাপ প্রয়োগ করেছিলেন তাতেই এ আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে গেছে। হয়তো কোন একটি বা দুটি গ্রামে সংগৃহীত তহবিলের জোরে আজ কাজ চলছে—তবু মোটামুটি যে ব্যর্থ হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। দেশের মানুষের হৃদয় হরণ করার মতো বস্তুরও অভাব ছিল। দত্তসাহেব বলেই তিনি খ্যাত ছিলেন, তাঁর প্রতাপে ইস্কুলে-ইস্কুলে, গ্রামে-গ্রামে তখন রায়বেঁশে নৃত্যের ঢোল বাজতে লেগেছে—উকিল নাচছে, মোক্তার নাচছে, ডেপুটি নাচছে, সাবডেপুটি নাচছে, দারোগা নাচছে, চৌকিদার নাচছে, হাকিম নাচছে, আসামী নাচছে, রায়বাহাদুর নাচছে, রায়সাহেব নাচছে, জমিদার নাচছে, ধনী নাচছে, হেডমাস্টার নাচছে, সেকেণ্ডমাস্টার নাচছে, ছাত্র নাচছে—সে এক অত্যদ্ভুত কাণ্ড। না নেচে পরিত্রাণ নাই। হাত ধরে টেনে এনে বলেন—নাচুন রায়বাহাদুর! তেমনি ছিল তাঁর অসহিষ্ণুতা। আই-সি-এস-সুলভ অসহিষ্ণুতা কি বস্তু যাঁরা জানেন তাঁরাই বুঝবেন সে কথা।

রায়পুরের কংগ্রেসকর্মী ব্যোমকেশ চক্রবর্তী বা চট্টোপাধ্যায় দত্তসাহেবের একটি আচরণে খুব ক্ষুব্ধ হয়েছিল। দত্তসাহেব বীরভূমে যেখানে যত প্রাচীন মূর্তি পেয়েছিলেন সব সংগ্রহ করে এনেছিলেন। মূর্তি, পট, দারুশিল্প; সে বোধ হয় ওয়াগন-ভর্তি জিনিস। রায়পুরে ছিল প্রাচীন ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ একটি মূর্তি, তিনি সেটিও সংগ্রহ করে আনেন। গ্রামের লোকে ক্ষুব্ধ হলেও প্রতিবাদ করতে সাহসী হয় নি। ব্যোমকেশ "আনন্দবাজারে" এই সম্পর্কে একটি নামহীন পত্র লেখে, পত্রখানি প্রকাশিত হয়। তাতে দত্তসাহেব ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। প্রথম সন্দেহ করেন পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্নকে। তাঁকে বোধ হয় কিঞ্চিৎ শাসনও করেছিলেন। এবং নিজের প্রতাপে গ্রামে প্রসাদভিক্ষুকদের দিয়ে এই প্রতিবাদের প্রতিবাদপত্র "আনন্দবাজারে" প্রকাশিত করালেন। ব্যোমকেশ আরও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল এবং রায়বেঁশে নিয়ে এক ব্যঙ্গ কবিতা লিখে আমাদের প্রেস থেকে ছাপিয়ে নিলে। তখন আমরা অর্থাৎ আমি বা আমার মেজভাই কেউই বোলপুরে ছিলাম না। কম্পোজিটরদের দিয়ে ব্যোমকেশ ছাপিয়ে নিয়ে জেলাময় দিলে ছড়িয়ে। কবিতাটির প্রথম দু লাইন ছিল আমাদের জিলায় প্রচলিত একটি ছড়া—

আমার বিয়েয় যেমন তেমন
দাদার বিয়েয় রায়বেঁশে
আয় ঢকাঢক মদ খে সে।

ব্যোমকেশ একটু বুদ্ধিহীনের কাজ করেছিল। আমার অনুপস্থিতিতে ছাপানো তার অন্যায়ও হয়েছিল এবং নির্বুদ্ধিতার কাজও হয়েছিল। আমি থাকলে

ছেপে দিতাম, দাম নিতাম না এবং সঙ্গে সঙ্গে কাগজখানিতে ছাপাখানার নামও দিতাম না। কম্পোজিটর কোন সন্দেহ করে নি ; ছেপে প্রেসের নাম দিয়েছিল এবং ফাইলে তার কপিও রেখেছিল। ওদিকে দত্তসাহেবের হাতে কাগজখানা পড়তে দেরি হল না। দত্তসাহেব জ্বলে উঠলেন। বিশেষ পুলিস-কর্মচারী এল বোলপুর, প্রেস খানাতল্লাস হল, কাগজখানাও বের হল। কম্পোজিটরসমেত থানায় গেলাম। বললাম এ কবিতা সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। কম্পোজিটর বেচারী বিনা ধমকেই বলে দিলে রায়পুরের ব্যোমকেশবাবু ছেপে· নিয়ে গিয়েছেন, বিয়ের প্রীতি-উপহার বলে। এখন ওই কাগজখানার বলে কিন্তু কোন রাজদ্রোহের অভিযোগে মামলা দায়ের করা যায় না। এবং আমাদেরও গ্রেপ্তার করা যায় না। থানা থেকে ফিরে এলাম। বিশেষ পুলিস-কর্মচারীটি চলে গেলেন দত্তসাহেবকে বিবরণ নিবেদন করতে। কয়েকদিন পরেই এল নোটিশ। আমাদের উপর নোটিশ এল দু'হাজার টাকা জামানত দিতে হবে। এবং ব্যোমকেশের উপর নোটিশ এল ১৪৪ ধারার। কোন সভায় সমিতিতে বক্তৃতা দিতে পারবে না, একসঙ্গে চারজনের বেশী পাঁচজনের অর্থাৎ পঞ্চায়েত বৈঠকে যোগদান করতে পারবে না—কারণ তাতে দেশের নিরাপত্তা বিপন্ন হবে। এর ফল, আগে ব্যোমকেশের কথা বলব যদিও ব্যোমকেশের ঘটনাটা আমাদের পরিণতির অনেক পরে ঘটেছিল। ব্যোমকেশ সতর্ক হল। ঘরের ভিতর সে আশ্রয় নিলে। এই কারণে সে জেলে যেতে চায় না। এমন সতর্ক হল যে দারোগা কোনক্রমে ব্যোমকেশের নাগাল পায় না। ওদিকে দত্তসাহেবের হুমকি আসে, কি হল? কোথায় ব্যোমকেশ?

দারোগা বলে, হুজুর তাকে কোন রকমেই পাচ্ছি না।

দত্তসাহেব বলেন, তাকে আমার চাই-ই!

দারোগা ব্যোমকেশকে বুঝিয়ে বলে, একবার চলুন, কোন রকমে মার্জনা ভিক্ষা করে আমায় বাঁচান, আপনিও বাঁচুন।

ব্যোমকেশ আগে জেল খেটে এসেছে, সে পাকা কাঠের মতো শক্ত। স্বল্পভাষী, মৃদু হাস্যময়, ব্যোমকেশ কথা বলে না, শুধু হাসে। চাপাচাপি করলে শুধু হাত জোড় করে। শেষ পর্যন্ত বললে, আপনি বাঁচুন কোন রকমে। যে রকমে পারেন। এতে আমার ফাঁসি হবে না, সুতরাং আমি মরব না। জেলখাটা আমার অভ্যাস আছে।

তাই হল। পুরানো অভ্যাসটা শেষ পর্যন্ত ঝালিয়ে নিতেই হল ব্যোমকেশকে। দত্তসাহেবের চাপে দারোগা শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে একদিন পাঁচ-সাত জন লোক আড়ালে-আবডালে রেখে একজনকে পাঠালেন তাকে ডাকতে। সে বাড়ির দোরে দাঁড়িয়ে ডাকলে—ব্যোমকেশ, ব্যোমকেশ!

—কে ?

—শোন হে একবার।

সাবধানী ব্যোমকেশও এতখানি সন্দেহ করে নি। সে উঁকি মেরে দেখল, একজনই রয়েছে রাস্তায় এবং সে লোকটি বিশেষ পরিচিত। কোন সন্দেহ না করেই সে পথে নেমে এল। সঙ্গে সঙ্গে অলিগলি থেকে বেরিয়ে এল আট-দশ জন। ঘিরে ফেললে তাকে। পুলিসও এল সঙ্গে সঙ্গে। আর কি? আইনের ধারায় আছে জনতা চারজনের বেশী হলেই অপরাধী হবে ব্যোমকেশ। অপরাধী ব্যোমকেশ চালান গেল। ছ'মাস জেল হয়ে গেল। তবু তো দত্তসাহেব তাকে "আনন্দবাজারে"র পত্রলেখক বলে জানতেন না। জানলে কি হত বলতে পারি না।

আমাদের ব্যাপারটা আগেই ঘটেছিল।

মামলা কিছু হয় নি। তলব হল। তিরস্কৃত হলাম। কিন্তু জামিন বা বণ্ড কি দেব স্থির করতে পারলাম না। সময় নিলাম।

ঠিক এই সময় একদিন শুনলাম, নেতাজী সুভাষচন্দ্র এসেছেন শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কোন প্রয়োজনে সাক্ষাৎ করতে। যতদূর মনে পড়ছে, সঙ্কটত্রাণ সমিতি নাম নিয়ে যে একটা অপ্রিয় আলোচনা হয়েছিল, সেই নিয়েই তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে এসেছিলেন। বেলা তিনটেয় তখন বোলপুর স্টেশনে আপ-ডাউন দুখানি ট্রেনের ক্রসিং হয়। তিনটেয় বোলপুরে চাপলে সাড়ে-সাতটা আটটায় হাওড়া পেঁাছানো যায়। আমাদের বাড়ি লাভপুরে যেতেও আপ ট্রেনখানি সবচেয়ে সুবিধের। আমি বোলপুর থেকে বাড়ি ফিরছি। আপ প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ চোখে পড়ল একখানি গাড়ি এসে থামল স্টেশনের বাইরে। সুভাষচন্দ্র দীপ্তিমান তারুণ্যের জীবন্ত মূর্তি—চারিদিক যেন উদ্ভাসিত করে নেমেই ওভারব্রিজ পার হয়ে ডাউন প্ল্যাটফর্মে গিয়ে দাঁড়ালেন। আমার ইচ্ছা হল, দেখা করি। কিন্তু সন্দেহ হল, চিনতে পারবেন কি? কি বলব? কি পরিচয় দেব?

হঠাৎ চোখে পড়ল, সুভাষচন্দ্র স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রয়েছেন। চোখ দেখেই বুঝলাম, চিনেছেন,—স্মৃতিসমুদ্র মন্থন করছেন। আমি অবাক হয়ে গেলাম। হাজার হাজার মানুষের ভিড়ের মধ্যে যে মানুষ বিচরণ করেন, সমগ্র দেশ যাঁর চিন্তার ক্ষেত্র, অতীত থেকে ভবিষ্যৎ পর্যন্ত যাঁর দৃষ্টি প্রসারিত, স্বপ্নে যিনি বিরাট দেশের ভবিষ্যৎ রচনা করেন, তার পক্ষে আমার মতো অতি সাধারণ চেহারার একজনকে একবার পনেরো-বিশ মিনিট দেখেই কি মনে রাখা—চেনা সম্ভবপর? দেখলাম, সম্ভবপর। প্রতিভা—অতিমানবের শক্তিতে যাঁরা শক্তিমান তাঁরা তা পারেন। এই শক্তি দেখেছি

রবীন্দ্রনাথের। সে কথা যথাস্থানে বলব। আর আমি বিলম্ব করলাম না। ডাউন প্ল্যাটফর্মে গেলাম, নমস্কার করে দাঁড়ালাম।

তিনি তখন স্মৃতি মন্থন করে আমার নাম ঠিক ধরেছেন। বললেন, আপনি তারাশঙ্করবাবু!

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—এখানে? কি করেন এখানে?

বললাম সংক্ষেপে—প্রেস করেছি এখানে।

তিনি বললেন, ভালো। প্রেস চলছে কেমন?

এবার বললাম, চলছিল কোন রকমে। কিন্তু বুঝতে পারছি না, বন্ধ করব কি চালাব।

—কেন?

বিবরণ বললাম। তাঁর আশ্চর্য শুভ্র চোখ দুটি দপ করে যেন জ্বলে উঠল। সে সত্যিই জ্বলে ওঠা। এমন ভাবে চোখ জ্বলে ওঠা আমি আর কারও দেখি নি। তার ছটা আমার চোখে লাগল। উত্তাপ আমি অনুভব করলাম। বললেন, না। বন্ধ করে দিন। বণ্ডও দেবেন না, জামিনও দেবেন না।

স্থির হয়ে গেল পথ।

প্রেস বন্ধ হল। গোরুর গাড়ি করে লাভপুরে এনে ফেললাম।

এদিকে হঠাৎ আমার প্রিয়তমা কন্যা বুলু মারা গেল। আমার জীবনে নেমে এল প্রথম অঙ্কের যবনিকা।

নয়

হঠাৎ আমার ছ-বছর বয়সের কন্যা বুলু মারা গেল।

আমার সমগ্র জীবনে এই আঘাত একটা পরিবর্তন এনে দিলে। জীবনপ্রবাহের মোড় ফিরে গেল। আমার জীবনে চলার পথে যে দু-নৌকায় দু-পা রেখে চলা তাতে ছেদ পড়ল। একখানা নৌকাকেই আশ্রয় করে হাল ধরলাম। এই মর্মান্তিক আঘাত না এলে বোধ হয় তা হত না। এবং জীবনে এই বেদনার সুগভীর সমুদ্রে যদি না পড়তাম, তবে বেদনা-রসকে উপলব্ধি করতে পারতাম না।

আমার গল্প-উপন্যাসের কয়েক ক্ষেত্রেই বুলুকে হারানোর বেদনার কথা

আছে। "বেদেনী" গল্প-সংগ্রহে "বাণী মা" গল্পের মধ্যে স্পষ্ট করেই বলেছি। "বাণীর আগে একটি মেয়ে ছিল। কালো মেয়ে, একটি চোখ ট্যারা, তার নাম দিয়েছিলাম বুলবুল। বুলবুল সংক্ষিপ্ত হইয়া শেষে বুলুতে পরিণত হইয়াছিল। সেই বুলু অকস্মাৎ একদিন চলিয়া গেল। প্রথমটা সে আঘাতে পাগল হইয়া গিয়াছিলাম। এখন মধ্যে মধ্যে ভাবি, অদ্ভুত অপূর্ব সে আঘাত। মানুষ যে কতখানি ভালোবাসিতে পারে, শোকের নির্মম আঘাত না পাইলে সে উপলব্ধি মানুষ করিতে পারে না। নারিকেলের ছোবড়া ও খোলার মতো হৃদয়ের আবরণটা না ভাঙিলে অন্তঃস্থলের শস্য-পানীয়ের অমৃত স্বাদের সন্ধান পাওয়া যায় না।

"কিন্তু শোক চিরদিন থাকে না। চিরদিন কেন, বোধ করি, যে সুখকে মানুষ ক্ষণস্থায়ী বলিয়া আক্ষেপ করে, তার চেয়েও স্বল্পক্ষণস্থায়ী। শোক আস্বাদে অতি তীব্র অপূর্ব, তার প্রভাব অতি-অতি পবিত্র। শোক মানুষকে উদার করে, পঙ্কিল হীনতার ঊর্ধ্বলোকে লইয়া যায়, তাই শোক অল্পক্ষণস্থায়ী।"

এ গল্প বুলুর মৃত্যুর ছ-সাত-মাস পরের লেখা। বুলুর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে আমার সত্যকার সাহিত্য-জীবনের শুরু যে গল্পে সেটির নাম "শ্মশান ঘাট"। বিষয়বস্তুতে ভাবরসে এই বেদনা এই কথাই মাখামাখি হয়ে গল্পটি গড়ে উঠেছে। তার মধ্যে কন্যাহারা উদাসী নায়কের যে অন্তর-বেদনা ফুটে উঠেছে সে আমারই বেদনা। সংসারের সঙ্গে সকল বন্ধন আমার কেটে গেল ছিঁড়ে গেল—এই আঘাতে।

"শ্মশান ঘাট" গল্পটির সূচনা কিন্তু বুলুর মৃত্যুর আগেই হয়েছিল। তখন আমি পিঠে বোঁচকা বেঁধে গ্রামে-গ্রামে ঘুরি। কংগ্রেস ছেড়েছি, দেশোদ্ধার নয়, তবু ঘুরে বেড়াই! মেলা দেখি, গ্রাম দেখি, ঘুরি। পূর্ব-জীবনের অভ্যাসটা নেশায় দাঁড়িয়ে গেছে। এই নেশাতেই বুলুর মৃত্যুর দিন পনেরো আগে গিয়েছিলাম উদ্ধারণপুর।

সেখানেই সেই বিচিত্র পরিবেশ দেখে ওই পটভূমিতে গল্প শুরু করেছিলাম। শুধু শুরুই অবশ্য। উদ্ধারণপুর বাজারের কুম্ভকার পাল কর্তা, মাদুর-বুনিয়ে শ্রীমতী মেয়ে কুসুম; তাদের সন্ধ্যার রূপকথার আসরে কুকুরছানাটির আবির্ভাব, কেনারাম নামক উদাসী ব্যক্তিটির বক্তৃতা, ওই কুকুরছানা দিতে যাওয়া, দ্বিজদাসের কানা টাকা পাওয়া, শ্মশান ঘাটের পৈরু—তার ছোটমেয়ে, চিতায় সেই ছোটমেয়েটির শবদাহ, সবই সত্য। প্রথম অংশটি সেখানেই লিখেছিলাম। এই পটভূমিতে কোন গল্প গড়ে উঠবে, কল্পনা দানা বাঁধে নি। বুলু চলে যাওয়ার আঘাত না পেলে অন্য রকম কিছু

হত। পথে অনেক ঘটনা ঘটেছিল। রামজীবনপুরে একখানি গোয়ালঘরের কোঠায় আশ্রয় পেয়েছিলাম, সমস্ত রাত্রি মশার কামড়ে সর্বাঙ্গ ফুলে উঠেছিল; সেখানে এক বাবাজী সমস্ত রাত্রি গান শুনিয়েছিল, পথে দুটো মহিষের প্রচণ্ড যুদ্ধে আটক পড়েছিলাম, ছুটে পালাতে গিয়ে এক পাটি জুতো হারিয়েছিল; উদ্ধারণপুরেই জেলে ডিঙিতে জেলেদের সঙ্গে গল্প করেছিলাম; তারা নিজেদের মধ্যেই মাছ চুরি করে ঝগড়া করেছিল। স্নানঘাটে এক পিতৃহারা শৌখিনবাবু পুত্র দেখেছিলাম, তার সে কি অপূর্ব কান্না দেখেছিলাম; পিতার শেষ কৃত্য করে গঙ্গার ঘাটে এসে প্রচুর মদ্য পান করে কাঁদছে, আর খেদ করছে, এমন বাবা আর হয় না। আমার জন্যে জমি জমিদারি পুকুর বাগান টাকা তেজারতি রেখে আমাকে অনাথ করে চলে গেল। এমন বাবা কারোও হয়? না হয়েছে? না হবে? টেরি না কাটলে আমার খাওয়া রোচে না, ঘুম আসে না, সেই জন্যে বাবা আমার শেষ সময়ে অনুমতি করে গেল—বাবা তুই যেন মাথা কামাস নে! মাথা কামালে স্বর্গে গিয়েও আমার চোখে জল আসবে। এমনকি পুরুতকে ডেকে বলে গিয়েছেন সে কথা!

এরপরই গঙ্গার ঘাটে শুয়ে বাবাগো বলে আকাশ ফাটিয়ে কান্না। ঘণ্টা-খানেক পরে দেখা যায় অচেতন হয়ে পড়ে আছে মুদীর দোকানের পাশে ভাঁড়ারঘরের দাওয়ায়। হয়তো এই সমস্ত কিছুর একটা নিয়ে গল্প শেষ হত, তখনকার দিনের সাহিত্যের প্রচলিত ভাবধারায় সমাজ ও মানুষের বিকৃত রূপকে ফুটিয়ে তুলে তার উপর কশাঘাত বা খড়্গাঘাত যে কোন আঘাত দিয়েই গল্পটি শেষ হত। কিন্তু আমার হৃদয়ের সেদিন অবস্থা অন্যরূপ; বেদনায় ক্ষতবিক্ষত। তাই বেদনাই উঠল বড় হয়ে। এবং সেই সময়েই একটা উপলব্ধি আমার হয়েছিল। বিকৃত মানুষ বিকৃত সমাজ ওই বিকৃতির পীড়ায় কি নিষ্ঠুর যন্ত্রণা ভোগ করে। বাল্যকালে পাটনার পাগলখানায় এক বালক উন্মাদকে দেখেছিলাম, সে নর্দমার পাঁক গায়ে মাখত এবং সেই জল সে আঁজলা ভরে ভরে পান করত; কিন্তু ওই জল পান করবার সময় তার সে কি মুখবিকৃতি; কত কষ্টে সে যে সেই জল খেত তা দেখলেই বুঝতে পারা যেত। এই বেদনায় হৃদয় ভরে উঠেছিল বলেই কবি বলতে পেরেছেন—

"কার নিন্দা কর তুমি? এ তোমার এ আমার পাপ!"

বুলু মারা গেল ৭ই অগ্রহায়ণ, রাত্রে। রাত্রি দশটায়।

শেষ সময়টা এল অতি আকস্মিকভাবে। ডাক্তার সকালবেলা বলে গেলেন কাল অন্নপথ্য দেব। বিকেলবেলা সাড়ে-চারটের সময় ডাক্তার আমাদের পাড়ায়

এসেছিলেন, পথে তাঁর সঙ্গে দেখা হল। তাঁকে আমি বললাম, যখন পাড়ায় এসেছেন একবার দেখে যান। তিনি হেসে বললেন, না। দরকার নেই। অকারণ দুটো টাকা দণ্ড করাব না আপনার।

তখন আর্থিক অবস্থা আমার অত্যন্ত অসচ্ছল। ১লা অগ্রহায়ণ অষ্টম পর্ব গেছে। জমিদারির সঙ্গে কিছু পত্তনি সম্পত্তি ছিল, তার দরুন খাজনা জমা দিতে হয়েছে। কার্তিক মাসে খাজনা আদায় হয় না। সুতরাং দিয়ে থুয়ে হাত রিক্ত। ডাক্তার এসব বুঝতেন। আমাদের অবস্থাও জানতেন। বললেন, কাল ভাত দেব। ভালো আছে। এই কথা বলতে বলতেই ডাক্তারের সঙ্গে অনেকটা এগিয়ে গেলাম। তারপর বাড়ি ফিরলাম; ভাবলাম, কয়েকদিন বাড়ি থেকে বের হই নি, বেড়ানো হয় নি, আজ একবার বেড়াতে যাব। গায়ে জামা দিয়ে বের হব, হঠাৎ ইচ্ছে হল, বুলুকে একটু আদর করে যাই। পাশে বসে কপালে হাত দিয়েই কেমন মনে হল। যেন বড্ড ঠাণ্ডা মনে হল; এবং অত্যন্ত স্তিমিত মনে হল; হাতখানা ধরে চমকে উঠলাম। আঙুলগুলি অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা। নাড়ী ক্ষণে ক্ষণে যেন কেটে যাচ্ছে। অস্থির চঞ্চল—যেন ইতস্ততঃ ধাবমান। কাউকে কিছু না বলে ছুটে বেরিয়ে গেলাম ডাক্তারের কাছে। তারপর মৃত্যুতে মানুষে টানাটানি। মানুষ বলে যেতে নাহি দিব। কিন্তু "তবু হায়, যেতে দিতে হয়!"

চলে গেল বুলু।

শেষ মুহূর্তের কিছু আগে টাকার প্রয়োজন অনুভব করলাম। কোন অতি নিকট আত্মীয়ের কাছে পাওনা টাকা চেয়ে পাঠালাম। কিন্তু সে তিনি দিলেন না।

সে কি রাত্রি! সে কি অন্ধকার!

মনে হয়েছিল এ রাত্রি কোনকালে শেষ হবে না। অনন্ত এক রাত্রির অস্তিত্ব যেন অনুভব করেছিলাম। আকাশের দিকে চেয়ে বসেছিলাম, সীমাহীন অনন্ত আকাশ যেন রাত্রির সঙ্গে নেমে এসেছিল আমার চারিদিকে। মনে হয়েছিল, এ পৃথিবীতে এক শোকাহত আমি ছাড়া আর কেউ কোথাও নাই; অসীম অনন্ত অন্ধকার অকূলের মধ্যে আমি হারিয়ে গিয়েছি। শুধু ঘরের মধ্যে থেকে মধ্যে মধ্যে সাড়া পাচ্ছিলাম একটি আর্ত নারীকণ্ঠের। তখন মনে হচ্ছিল আর একজন আছে। এর মধ্যে সে আর আমি।

পরের দিন সূর্য উঠল। আলো হল। কিন্তু আমার তখন অধীর অস্থির অবস্থা। মনে হচ্ছে পালিয়ে যাই! কোথায় যাই! বাল্যকালে

আট বছর বয়সে পিতৃবিয়োগ হয়েছিল। তখন কি আঘাত পেয়েছিলাম সে আঘাত অনুভব করার মতো স্পর্শশক্তি হয় নি আমার মনের। তারপর এই প্রথম আঘাত, মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়ানো। অসহ্য তীব্র বেদনায় ছুটে পালাতে ইচ্ছে হচ্ছে। দ্বিতীয় দিন সকালে উঠেই কাজ আছে বলে কলকাতা চলে এলাম। হাওড়ায় যখন পেঁছুলাম তখন যেন জ্বর আসছে মনে হল। স্টেশন থেকে এসে উঠলাম "উপাসনা" আপিসে, ধর্মতলা স্ট্রীটে। এসে দেখি অভাবনীয় ব্যাপার। "উপাসনা" উঠে যাচ্ছে। সাবিত্রীপ্রসন্ন বিদায় নিচ্ছেন। "উপাসনা"র স্থানে "বঙ্গশ্রী"র প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। সজনীকান্ত দাস আসর জাঁকিয়ে বসেছেন। চারিপাশে অনেক লোকের ভিড়। কিরণ রায় পুরাতন এবং নতুনের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনিই আমাকে নিয়ে গেলেন সজনীকান্তের কাছে। স্বল্প দুটি কথা বলেই সজনীকান্ত ভিড়েব মধ্যে মধ্যমণির মতো জেঁকে বসলেন। আমি পাশের ঘরে সাবিত্রীপ্রসন্নের কাছে গিয়ে বসলাম। তারপর ওখান থেকে বিদায় নিয়ে বের হলাম, যাব বালীগঞ্জে, আত্মীয়ের বাড়ি। ট্রামে বা বাসে ছোট বিছানা এবং টিনের সুটকেস নিয়ে উঠে বসলাম। এর পর কি মনে করে কখন কি করেছি খেয়াল নেই; যখন খেয়াল হল তখন আবার আমি ট্রেনে। লাভপুর ফিরছি। সেদিন কলকাতা থেকে পালিয়েছিলাম নিজের অজ্ঞাতসারেই; সংসারের প্রতি স্নেহ-মমতার থেকেই মানুষ সন্ধান করে সান্ত্বনার। প্রীতির মানুষ, স্নেহের মানুষ, মমতার মানুষ দুঃখের ভাগ নিলে মনে হয় একজনের অতীতেই দেউলে হয়ে যাই নি, ফকির হয়ে যাই নি! সেদিন "বঙ্গশ্রী"র আসরে তরুণ নবীনদের উল্লাস সমারোহের মধ্যে সে তো আমার পাবার কথা নয়! তখন আমি তাঁদের অধিকাংশের কাছেই অ-পরিচিত; এবং সাহিত্যসেবী হিসেবেও অখ্যাত। একমাত্র সাবিত্রীপ্রসন্ন সান্ত্বনা দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনিও ছিলেন সেদিন মুহ্যমান। তাঁর রক্ত দিয়ে প্রাণ দিয়ে গড়া "উপাসনা" উঠে যাচ্ছে। গোটা প্রতিষ্ঠানটা থেকেই তাঁকে পরের মতো সরে যেতে হচ্ছে। সেদিন দেশে ফিরে যে বৈরাগ্য অনুভব করেছিলাম তাতে সাহিত্য-সাধনার সংকল্পও কাটা-ঘুড়ির মতো যেন ভেসে যেতে চেয়েছিল।

ঠিক এর কয়েকদিন পরেই আমার ভাগ্যে ঘটল কবি-সন্দর্শন।

শান্তিনিকেতনে, শ্রীনিকেতনের উদ্যোগে হল পল্লী-কর্মী সম্মেলন। স্বর্গীয় কালীমোহন্ ঘোষ ছিলেন এ সম্মেলনের প্রধান উদ্যোগী। জীবনের প্রথম থেকেই স্বর্গীয় ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে আমার একটি যোগসূত্র ছিল। কলেরায় সেবাকর্মের কারণেই এ যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। আমাদের সেবা-সঙ্ঘের কাজ তিনি অনেকবার দেখে গেছেন। খুশী হয়েছেন। তিনি আমাকে

ভালোবাসতেন। তিনি বিশেষ করে লিখলেন আমি যেন আসি। সে সস্নেহ আহ্বান ঠেলতে পারলাম না। শোকের তীব্রতা তখন কমেছে, সে তখন গভীর এবং সুপ্রসারিত প্রসারে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। বেদনাহত মন নিয়েই গেলাম শান্তিনিকেতনে। সেখানে সম্মেলনশেষে শুনলাম, কবি আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন।

সন্ধ্যার সময়; উদয়নের একটি ঘরে মেঝের উপর বিছানো শতরঞ্জির উপর আমরা বসলাম, বসেছিলাম পূর্বমুখী হয়ে; সামনেই ছোট চৌকির উপর কবির আসন। বড় বড় দুটি দীপদানে আলো জ্বলছিল। আমাদের দলের সকলে আমাকেই দিলেন সামনে; কথা বলবার ভার আমার উপরেই পড়ল। স্পন্দিত বক্ষে বসে রইলাম। কবি তখন একটি কোন বক্তৃতা রচনা করছিলেন। বোধ হয় "কমলা লেকচার।" যাই হোক, কবি এলেন, এসে আসন গ্রহণ করলেন।

কালীমোহনবাবু পরিচয় দিলেন আমার। প্রসঙ্গক্রমে বললেন, সাহিত্যিকও বটেন।

কবি স্মিতহাস্যে বললেন, হ্যাঁ, লাভপুরে সাহিত্যের চর্চা আছে। ভালো অভিনয়ও হয় সেখানে।

এরপর আমি অপর সকলের পরিচয় দিলাম।

কবি আমাদের আশীর্বাদ করলেন, পল্লীর পুনর্গঠনের গুরুত্ব বুঝিয়ে বলে বললেন, গ্রামকে গড়ে তোল। নইলে ভারতবর্ষ বাঁচবে না।

দশ

মহাকবির উপদেশ কালে পরিণত করব বলেই ঠিক করেছিলাম সেদিন; রাজনীতির পথে নয়, সেবার পথে। কিন্তু তাও পারলাম না। তখন যেন আমার জীবন কোন কিছুতেই বাঁধা পড়তে চাইছিল না। বুলুর মৃত্যুর আঘাত জীবনে যেন সমস্ত বর্তমানের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন করে দিয়েছিল। নোঙর-ছেঁড়া নৌকার মতো আমার জীবন ছুটে চলতে চাইছিল। লাভপুর থেকে পালিয়ে এলাম কলকাতায়—আবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘণ্টা দুয়েক পরে ট্রেনে চেপে বসলাম; সেদিন আমার জ্বর ছিল, জ্বরের ঘোরের মধ্যেও এই বাঁধন-ছেঁড়া মনের গতিটি স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ বটে কিন্তু জ্বরজর্জর মনের অবস্থাটি অস্পষ্ট;—ঠিক মনে পড়ছে না। তবে অনুমান করতে পারি যে,

আমার তেত্রিশ-চৌত্রিশ বৎসরের জীবনে যে পথের সন্ধান আমি করেছি সেই পথের জন্য মন আমার সেদিন হাহাকার করে উঠেছিল, যেটা চাপা ছিল, বাঁধা ছিল সংসারের প্রতি কর্তব্যবোধের পাথরে মায়া-মমতার দড়িতে, সন্তান-শোকের ঝড়ে-তুফানে সে সব ছিঁড়ে গিয়েছিল।

আজ পরিণত বয়সে হিসাব-নিকাশ করতে বসে এর মূল্য এবং স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়েও গোল বাধে। প্রশ্ন জাগে—সত্য করে কি চেয়েছিলাম! এর উত্তর সম্পর্কে আমার কোন সংশয় নেই; এখানে আমি চিরকালের উত্তরকে মানি;—চেয়েছিলাম যা আদিকাল থেকে যে কাল থেকে মানুষ জন্তুজীবনের গণ্ডীকে অতিক্রম করে মন পেয়েছে—সেই মনে মনে যা চেয়ে এসেছে মানুষ তাই চেয়েছিলাম; এবং সে হল পরম তৃপ্তি, যার অপর নাম শান্তি। কিন্তু তার পরেই প্রশ্ন আসে—তা হলে শান্তি কি—প্রতিষ্ঠা, যশ খ্যাতি? আমার সেই তেত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত রাজনীতির পথে, সাহিত্যের পথে, সেবার পথে, খেলার পথে, অভিনয়ের পথে, ধনসম্পদের পথে ওই প্রতিষ্ঠাকেই কি কামনা করি নি! সুখ—যে সুখ অর্থমূল্যে পাওয়া যায় সংসারে, ভোগ্য বস্তু যা এনে দেয় তা আমি চাই নি। এ বিষয়ে আমার মন পরিচ্ছন্ন, সংশয়হীন—কারণ তখনও পর্যন্ত লিখে পারিশ্রমিক একটি কপর্দকও পাই নি। এবং অশ্বিনী দত্ত রোডের উপর শরৎচন্দ্রের বাড়ি তখনও হয় নি। শরৎচন্দ্রের মতো প্রতিষ্ঠাবান হয়ে উঠব এমন কল্পনাও কোন দিন মনে উঁকি মারে নি এ কথা শপথ করেই বলতে পারি। এ ছাড়াও একটা জোরালো, প্রায় অকাট্য প্রমাণ আছে এ বিষয়ে। আমাদের গ্রামের স্বর্গীয় যাদবলালবাবু সম্পদ অর্জনের একটা রাজপথ তৈরি করে গিয়েছিলেন; কয়লার ব্যবসার পথ। এ পথে যাত্রা শুরু করলে অর্থাগম ছিল সুনিশ্চিত। আমাদের গ্রামের এবং আশেপাশের বহুজনই এ পথের পথিক হয়ে মহাজনত্ব অর্জন করে গেছেন। যে সময়ের কথা বলছি সে সময়ে যতীন দাস রোডে আমাদের ও অঞ্চলের কৃতী কয়লা-ব্যবসায়ীদের তিনতলা বাড়ি উঠছে এবং উঠেছে সারি সারি। আমার প্রথম জীবন থেকে আমার শ্বশুরদের আমাকে এই পথে টানাটানির বিরাম ছিল না। কিন্তু কিছুতেই এ পথে চলতে আমি কোনো আকর্ষণ বোধ করি নি, কোন তৃপ্তি পাই নি, বার বার পালিয়ে গিয়েছি।

অর্থ, ভোগ, সম্পদ কামনা করি নি—এ পথে। আমি কেন—বাংলা সাহিত্যে যাঁরা প্রতিষ্ঠা অর্জনের চেষ্টায় যাত্রা শুরু করেছিলেন তাঁরা কেউই করেন নি—এ কথা সুনিশ্চিত। যাঁরা বেঁচে থাকবার মতো উপকরণ সংগ্রহের জন্য মাসিক যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চন মূল্য দাবি মনে মনে পোষণ করতেন

তাঁদের সম্পদলোভী যে বলবে সে নিতান্তই নিন্দুক, ইতর। সম্পদের কথা ওঠেই না। কিন্তু খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা কামনাকে তো অস্বীকার করা যায় না। শান্তি কি তার মধ্যেই আছে? এত কালের জীবনে শান্তি পাই নি —তবে আভাসে অনুভব করেছি—আছে। রচনাকালে তন্ময়তার মধ্যে তাকে বোধ করি সকল লেখকই পান। তন্ময়তা ভঙ্গ হলেই চকিতে গাঢ়তম অন্ধকার গুহায় আলোর আবির্ভাবে বহির্জগতের আবির্ভাবের মতো দ্বন্দ্বময় জগৎ প্রকট হয়ে ওঠে। রচনাকাল ছাড়াও এক-এক সময়ে তাকে পাওয়া যায়। কেউ পান নির্জন প্রকৃতির বিচিত্র আয়োজনময় পরিবেশের মধ্যে। আমি অনেক সময় পেয়েছি মানুষের বহু সমাবেশের মধ্যে। কি ভাবে কেমন করে এ উপলব্ধিতে উপনীত হয়েছি জানি না—তবে এ কথা সত্য যে, বিপুল জনসমাবেশের মধ্যে একা দাঁড়িয়ে মনে হয়েছে আমি মহা অরণ্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছি; সবল পুরুষকে মনে হয়েছে আকাশ-অভিসারী বনস্পতি, প্রত্যেকে প্রত্যেকের মাথা ছাড়িয়ে ঊর্ধ্ব থেকে ঊর্ধ্বতর লোকে বেড়ে উঠবার চেষ্টা করছে; নারীকে মনে হয়েছে পুষ্পিতা লতা। উদ্ভিদ-লোক থেকে মানবজন্মে জীবনের অভিসারের কথা ভাবি, ভাবি বলেই মনে হয় উদ্ভিদময় জগৎ থেকেও মানুষের সমাবেশের মধ্যে সুন্দরের অধিষ্ঠান অধিকতর স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ।

মানুষের জীবনে চরম কাম্য শান্তি—সে শান্তি মেলে বোধ করি এই বনস্পতির আলোকাভিসারে—ঊর্ধ্বলোকে মাথা তোলার পথের মতো বেড়ে ওঠার পথেই। অকস্মাৎ একদিন আসে যে দিনকার বেড়ে ওঠার কামনা তৃপ্ত হয়ে যায়—শান্ত হয়ে যায়; সে দিন সে ফুল ফোটানো পর্যন্ত শেষ করে দিয়ে আলোকস্নান করে যায় পরমানন্দে। এই ঊর্ধ্বলোকে মাথা তোলাটাই বনস্পতির যেমন পরিপূর্ণ আত্মপ্রকাশ, মানুষেরও তেমনি প্রতিষ্ঠার পথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বেড়ে ওঠাই পূর্ণ আত্মবিকাশ। সেদিন এই সাহিত্যের ক্ষেত্রে নিজের মূলকে প্রসারিত করে দিয়ে এই ক্ষেত্রের যে সামান্য রসটুকু আহরণ করতে পেরেছিলাম স্বাদে তাকেই মনে হয়েছিল অমৃত—পুষ্টিশক্তিতে তাকেই অনুভব করেছিলাম প্রাণদা।

বুলুর মৃত্যু ছাড়া আরও একটি ঘটনা ঘটেছিল যার ফলে লাভপুরের সমাজজীবন আঘাতে আঘাতে আমাকে জর্জর করে তুলেছিল; প্রত্যক্ষভাবে আমার সঙ্গে বিরোধ বেধে উঠল ওখানকার ধনসম্পদে-রাজসম্মানে শ্রেষ্ঠ প্রতিপত্তিশালী বাড়ির সঙ্গে। তাঁরা আবার আমার নিকট সম্পর্কে আত্মীয়, আমার মামাশ্বশুর। যাঁরা আমার প্রথম জীবনের স্মৃতিকথা—"আমার কালের কথা" পড়েছেন তাঁরা এই ঘটনাটির মধ্যে অনেক-কিছু খুঁজে পাবেন। আমাদের

গ্রামের কালীকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় জীবনে কৃতী ব্যক্তি। ওই শ্রেষ্ঠ প্রতিপত্তিশালী বাড়ির নিকট জ্ঞাতি-বাড়ির ভাগিনেয় এবং উত্তরাধিকারী। সেই হিসাবে তাঁদের আত্মীয়ও বটেন। অন্যদিকে ওই বাড়ির কর্তাদের মাসতুত ভাই স্বর্গীয় রায়বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জামাইও বটেন কালীকিঙ্করবাবু। সে হিসাবেও নিকট আত্মীয়। কিন্তু আশ্চর্যের কথা জীবনের প্রথম থেকেই একটি যেন বিষম সম্পর্কের সূত্র ছিল উপরের পুষ্পশোভার মর্মস্থলে। ক্রমে ক্রমে জীবনের অগ্রগতির সঙ্গে মালার ফুল বাসী হয়ে যত শুকিয়ে এল ততই প্রকট হল এই প্রচ্ছন্ন বিষম সূত্র। নানা ছুতায় এই সূত্রটি জীর্ণ হওয়ার পরিবর্তে হল দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর। বাদে-প্রতিবাদে বিশেষ করে সামাজিক জীবনে, রাষ্ট্রীয় অধিকারের ক্ষেত্রে সমালোচনায় নিন্দায় প্রতিবাদে, সরকারীভাবে প্রতিবাদমূলক দরখাস্তের পথ ধরে বেড়েই চলেছিল। হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটল। কালীকিঙ্করবাবু মেয়ের বিয়ে দিলেন এক বিলেতফেরত ছেলের সঙ্গে। বিবাহটি হল কলকাতায়। লাভপুরে ঘটলে ওই বিবাহের দিনেই যে কি ঘটত জানি না।

কলকাতায় বিবাহ হল। লাভপুরে তার প্রতিক্রিয়া হল। আমি নিজে লাভপুর সম্পর্কে যতটা জানি তাতে এই ঘটনায় লাভপুরে কোন আবর্ত সৃষ্টি হওয়ার কথা নয়। লাভপুরের সমাজ সে কাল পার হয়ে গিয়েছিল তখন। ওই প্রতিপত্তিশালী বাড়িতে তো কোন প্রতিবাদ ওঠার কথাই নয়। জাতিতে ইংরেজ থেকে শুরু করে বিলেতফেরত রাজপুরুষদের সঙ্গে তাঁদের নিত্য মেলামেশা, এক টেবিলে এক আহার্য খাওয়া, হিন্দু সমাজের আচার-আচরণ সম্পর্কে কঠিন থেকে ব্যঙ্গাত্মক সমালোচনা করা তাঁদের নিত্যকর্ম-পদ্ধতির পর্যায়ভুক্ত। সভায় সমিতিতে সকল প্রকার রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে তাঁরা অভিযান চালিয়ে চলেছেন। কিন্তু এই ব্যাপারে তাঁরা বেঁকে বসলেন। সুর উঠল প্রথম অন্তঃপুরে। সেই সুরে ভাষা যখন ফুটল তখন শুনলাম বিলাতফেরতের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেওয়া সমাজবিরোধী কর্ম। এই বিবাহ দেওয়ার দরুন সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয় হয়েছেন তিনি।

আমি আশ্চর্যভাবে প্রথম থেকেই এতে জড়িয়ে গেলাম। নাটকীয়ভাবে ঘটল ঘটনাটি। একদিন বিকেলবেলা বাড়ি থেকে আমাদের বাড়ির সংলগ্ন আমাদেরই চণ্ডীমণ্ডপ পার হয়ে যাচ্ছি। দেখলাম এক বিচার-সভা বসেছে। বিচারকেরা সকলেই মাতৃস্থানীয়া, তাঁদের মধ্যে প্রধানা ওই প্রতিপত্তিশালী প্রগতিশীল বাড়ির একজন। যিনি অভিযুক্ত তিনি আমাদের অতি নিরীহ পুরোহিত। তিনি নতমস্তকে নীরবে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি অবশ্য প্রথমটা ওদিকে লক্ষ্য না করেই চলে যাচ্ছিলাম। ভেবেছিলাম তিথি-নির্ণয় বা পূজা-

পার্বণ সম্পর্কীয় কোন আলোচনা চলছে পুরোহিতের সঙ্গে। হঠাৎ প্রধানা আমাকে ডাকলেন। বললেন, তারাশঙ্কর, তোমাদের পুরোহিত যে ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম করলেন তার প্রতিবিধান কর। পুরোহিতই যদি ধর্মহীন হন তবে সমাজে ধর্ম থাকে কি করে?

বিস্মিত হলাম। আমাদের এই পুরোহিতটি সত্য সত্যই ভালো মানুষ ছিলেন। এবং মূর্খ ছিলেন না; আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করতাম। তিনি কি করলেন?

বললেন—বিলাতফেরতের সঙ্গে বিবাহে কন্যাদানে পৌরোহিত্যের কথা তুমি শোন নি? ওঁকে প্রায়শ্চিত্ত করতে বল, নইলে ওঁকে পরিত্যাগ কর।

কথা শুনে আমার আর বিস্ময়ের সীমা রইল না। আমি কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইলাম।

পুরোহিত বেচারী এতগুলি সম্পন্ন অবস্থার যজমান চলে যাওয়ার ভয়ে বিকৃত হয়ে নির্বাক আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন—আপনারা যদি বিলাত যান, বিলাতফেরতের সঙ্গে করণ-কারণ করেন তবে আমরা ক্রিয়াকর্ম আপনাদের ছাড়ব কি করে? আপনাদের নিয়েই আমরা। যদি সকলে বলেন তবে করব প্রায়শ্চিত্ত। আপনাদের তো ছাড়তে পারব না।

এবার আমি বললাম—ভটচাজ মশায়, আপনি যদি প্রায়শ্চিত্ত করেন তবে আমি আপনাকে পুরোহিত হিসাবে ত্যাগ করব। পতিত করার কথা আমি ভাবতেই পারি না, কিন্তু পুরোহিত হবার মতো দৃঢ়তা আপনার নেই বলে পুরোহিত হিসাবে আপনাকে আর নেব না।

সকলে চমকে উঠলেন। একজন দেশসেবক সদ্য জেলফেরত ব্যক্তির মুখে এ কি কথা!

আমি বললাম—বিলাত যাওয়ায় পাতিত্য ঘটে জাতিচ্যুতি ঘটে এ সংস্কারকে আমি মানি না। সুতরাং পুরোহিত মশায় কোন অন্যায় কাজ করেছেন বলে আমি মনে করি না। অন্যায় না করে যিনি প্রায়শ্চিত্ত করেন তিনি দুর্বল। তাঁর দ্বারা পৌরোহিত্য হয় না। এই শুরু হল।

সমাজের মধ্যে সম্পদশালী যাঁরা, রাজশক্তি যাঁদের পৃষ্ঠপোষক, তাঁরা কি সহজে দমিত হন? তাঁদের বাসনা কি এক কথায় সংযত হয়? এরপর সত্যকারের কাজ শুরু করলেন এই দিকে। ওঁদেরই বাড়ির কর্মচারী এবং সম্পন্ন একজন প্রবীণ ভদ্রলোকের পৌত্র এবং দৌহিত্রের উপনয়ন উপলক্ষে দুইপক্ষে পরামর্শ করে স্থির করলেন এই ক্রিয়ায় পুরোহিতকে বর্জন করবেন এবং কালীকিঙ্করবাবুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ বাদ দেবেন।

পুরোহিত এসে আমাকে সংবাদ দিলেন। কালীকিঙ্করবাবু কলকাতায়

থাকেন, বাড়িতে থাকত তাঁর ভাগিনের। সে কিন্তু এল না, আসতে তার দ্বিধা হল। এ সময় পর্যন্ত কালীকিঙ্করবাবুর সঙ্গে আমার সম্পর্কটুকু নিতান্তই সামাজিক ; তাঁর সঙ্গে অন্তরের কোন যোগ ছিল না বললেই সত্য বলা হবে। আমার কাছে আদর্শবাদই বড়। কালীকিঙ্করবাবু গৌণ। সুতরাং কালীকিঙ্করবাবুর ভাগিনেয় আমার কাছে না আসা আমার চোখেই পড়ল না। আমি প্রবীণ ভদ্রলোকটির কাছে গেলাম। পাত্রবিধি আলোচনা করলাম না, তর্ক করলাম না, সোজা বললাম পুরোহিত এবং কালীকিঙ্করবাবুদের বর্জন করলে আমি আপনার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করব না, বর্জন করব এবং আমার যাঁরা অনুগামী তাঁদেরও বলব আপনার বাড়ির নিমন্ত্রণ বর্জন করতে।

ভদ্রলোক ভড়কে গেলেন। ১৯৩২-৩৩ সালে আমার অনুগামী অনেক। তিনি স্বীকার করলেন, তিনি মনে মনে বিলাতফেরতের সঙ্গে করণ-কারণ অনুমোদন না করলেও কালের গতিকে বড় বলে মেনে এ নিয়ে কোন বাদ-প্রতিবাদ তুলতেন না। কিন্তু—।

এবার সংবাদ পেলাম ওই শ্রেষ্ঠ প্রতিপত্তিশালী ঘরের সঙ্গে এই ব্যাপার নিয়ে ওই শ্রেষ্ঠ বাড়িটির চিরকালের বিরোধী বাড়িটিও নাকি হাত মিলিয়েছেন। তাঁদের পরামর্শেই এবং সাহসে এটি তিনি করতে উদ্যত হয়েছেন।

একটু ভেবে তিনি বললেন, আমি একটু ভেবে দেখি।

ভেবে দেখে অপরাহ্নে আমাকে বললেন, আমি ও সঙ্কল্প ত্যাগ করলাম। তারাশঙ্কর। আমাকে ধন্যবাদও দিলেন, আশীর্বাদ করলেন।

এবার কালীকিঙ্করবাবুর ভাগিনেয় এল। সে ছিল আমার সমবয়সী, বন্ধু ; আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে গেল।

এতেও কিন্তু মিটল না। এবার এল শেষ এবং কঠিন পরীক্ষা। ওই প্রতিপত্তিশালী বাড়ির গৃহিণী—যিনি প্রথম সুর তুলেছেন তিনি তুলাট ব্রত করবেন। অর্থাৎ যজ্ঞ করে যজ্ঞশেষে নিজের সঙ্গে ওজন করে স্বর্ণ রৌপ্য থেকে ধাতুতে, বস্ত্রে, নানা পার্থিব সামগ্রী দান করবেন। নানাস্থান থেকে পণ্ডিত আসছেন, কাশী থেকে আসছেন পণ্ডিত শ্রীশঙ্কর এবং প্রমথনাথ তর্কভূষণ। বিরাট আয়োজন নবগ্রামের ব্রাহ্মণ ভোজন। তিনি এই যজ্ঞে পুরোহিত এবং ওই কালীকিঙ্করবাবুর বাড়িকে পাতিত্য দোষে বর্জন করতে কৃতসঙ্কল্প হলেন। আমার কাছে তাঁদের দূত এল।

আমাদের গ্রামের অবিনাশ মুখোপাধ্যায় ("আমার কালের কথা"র 'অবিনাশ দাদা') তাঁদের কর্মচারী, কালীকিঙ্করবাবুর বন্ধু, আমার সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ আছে, তিনি এলেন আমার কাছে। আমাকে এবার সোজা বললেন, দেখ, তুমি কেন এতে বিরোধিতা করছ ? সম্পর্ক বিচারে, প্রীতি অন্তরঙ্গতা

বিচারে, কালীকিঙ্কর কি এ'দের চেয়ে তোমার আপন? তুমি সরে দাঁড়াও।

আমি বললাম, একটু ভুল করছ। আমি কোন ব্যক্তির জন্য কোন ব্যক্তির বিরোধিতা করছি না। কালীকিঙ্করবাবুর সঙ্গে আমার সম্পর্ক বিচার আমি করেছি। ওদের সঙ্গেও করেছি। আমি জানি কালীকিঙ্করবাবুর সঙ্গে এই দিক দিয়ে ওদের যে বিরোধিতা আজ মাথা ঠেলে উঠেছে সে বিরোধিতা অগস্ত্যের আবির্ভাবে বিন্ধ্যের মতো প্রণত হয়ে মিলিয়ে যাবে। সে অগস্ত্য হলেন রায়বাহাদুর অবিনাশবাবু। যে বিলাতফেরত ছেলেটির হাতে কন্যা সমর্পণের জন্য এত বিরোধ, রায়বাহাদুর সেই নাতজামাইকে সঙ্গে নিয়ে এখানে আসবেন এমনি তুলাট ধরনের আর-এক আয়োজনে। সে আয়োজনে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বদলে আসবেন সাহেবসুবার দল। জজ ম্যাজিস্ট্রেট পুলিস সাহেব ডেপুটি প্রভৃতি নবীন যুগের মহামহোপাধ্যায়ের দল। তাঁদের মধ্যে এই নবীন বিলাত-প্রত্যাগত জামাতাটি নবগ্রহের সভায় কিশোর-গ্রহ বুধের মতো বসে ও'দের কাছ থেকেই প্রশংসাবাক্যে তুষ্ট হবেন। হয়তো এই ঝগড়াটা সেইখানেই মিটবে। সে সভায় এ'দের বাড়ির অকৃতী এই জামাতাটির কোন স্থান হবে না। এ সবই আমি জানি। কিন্তু তবু আমি সরে দাঁড়াতে পারব না। প্রথমেই বলেছি এ দাঁড়ানো আমার কোনো ব্যক্তির জন্য কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়। আমি দাঁড়িয়েছি আমার আদর্শের জন্য। আমি কোনমতেই সরে দাঁড়াব না।

অবিনাশ মুখোপাধ্যায় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালেন, ভুল করলে তারাশঙ্কর। কাশী থেকে পণ্ডিত শ্রীশঙ্কর আসছেন, প্রমথনাথ তর্কভূষণ আসছেন—তাঁরা যখন এই কথা বলবেন তখন?

বললাম, সে কথাও মানব না।

—কিন্তু সমাজ মানবে।

—মানে আমি পতিত হয়ে থাকব।

এবার তিনি আর দাঁড়ালেন না, চলে গেলেন। ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই আর এক দরজা দিয়ে ঢুকলেন কালীকিঙ্করবাবুর ভাগিনেয় এবং তাঁর এক আত্মীয়। বুঝতে আমার বাকি রইল না যে তাঁরা অবিনাশ মুখোপাধ্যায়ের পিছনে পিছনেই এসেছেন এবং সকল কথাই শুনেছেন অন্তরালে দাঁড়িয়ে।

বংশী সজল চোখে আমার হাত চেপে ধরলেন। তাঁর আত্মীয় আমাকে ধন্যবাদ জানালেন। বললেন সকল কথাই লিখবেন তারা কালীকিঙ্করবাবুকে।

আমি হাসলাম। এবং আমার এই দাঁড়াবার কারণ আবারও একবার তাঁদের বুঝিয়ে বললাম। কিন্তু তাঁরা মানবেন কেন? তাঁদের কৃতজ্ঞতা যাবে কোথায়?

থাক ও কথা। এখন তারপর যা ঘটল তাই বলি।

পণ্ডিত শ্রীশঙ্কর এবং প্রমথনাথ তর্কভূষণ সমস্ত শুনে এক কথায় সমর্থন করলেন আমাকে। তাঁদের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে বললেন, কাল পরিবর্তন হয়েছে, কর্মব্রতের কাল আর নেই। কালভেদে উপলব্ধির পরিবর্তন হয়। হিন্দু সমাজেরও হয়েছে। ও বিধান আজ অচল। শুধু তাই নয়, সেই রাত্রেই আমাদের পুরোহিতকে ডেকে ঐ যজ্ঞের শাস্ত্রপাঠ কর্মের জন্য বরণ করালেন।

লাভপুরের সমাজে সেই রাত্রে সাধারণের চক্ষুর অন্তরালে নববিধান প্রবর্তিত হল। যজ্ঞ মিটে গেল। পণ্ডিতেরা চলে গেলেন, আমি রইলাম, কয়েকদিনের মধ্যেই অনুভব করলাম এর প্রতিক্রিয়ায় আর-এক বিরোধের সম্মুখীন হতে হবে আমাকে।

এই বিরোধ আমাকে পীড়িত করে তুলেছিল। বিরোধে ভয় আমি পাই নি। কোনদিন পাই নি। কিন্তু এই অশান্তি, বিশেষ করে বৈষয়িক পথ ধরে বিরোধ এসে যখন অশান্তির সৃষ্টি করে তখনই এইটে আমার অসহ্য হয়ে উঠে।

একট দৃষ্টান্ত দেব।

তাঁদের সঙ্গে আমাদের একটি এজমালি সম্পত্তি। তাঁরা সেই সম্পত্তির সরকারী রাজস্ব দাখিল করলেন না। এর ফলে সম্পত্তি উঠল নিলামে। এর প্রতিকার করতে হলে, নিলামের মুখে তাঁদের দেয় টাকা আমাকে দাখিল করতে হবে এবং পরে তাঁদের উপর মকর্দমা করে সেই টাকা আদায় করতে হবে। অথবা নিলামে ওই সম্পত্তি ডাকতে হবে। কোনটার সামর্থ্য আমার নেই। আমি নিলামের পূর্বে আর-একজন সম্পদশালীকে সম্পত্তিতে আমার অংশটুকু বিক্রি করে দিয়ে নিষ্কৃতি নিলাম। শুধু এইটুকু প্রতিহিংসা আমার চরিতার্থ হল যে, সম্পত্তিটা তাঁদের ষোল আনা হল না।

আরও একটি ঘটনা ঘটেছিল। যা নিয়ে ঘটনাচক্র আমাকে আবার গ্রামের প্রভাবশালী সম্প্রদায়ের বিপক্ষে দাঁড় করিয়ে দিলে। এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে নিয়ে বিরোধ। সে কথা এখানে থাক। শুধু এইটুকু বলি যে এই সন্ন্যাসীর সংস্পর্শে আসার ফলটুকু আমার জীবনের অক্ষয় সম্পদ। তাঁর কথা আমার "বিচিত্র" বইয়ে বলেছি।

আমার সাহিত্যিক-জীবনের ভূমিকা-পর্ব শেষ হল। বলতে গেলে এইখানে যাত্রা শুরু হল "বঙ্গশ্রী"তে। তার আগে কেমন করে আবার সাহিত্য-সাধনায় মন ফিরল সেই কথাই বলব।

"উপাসনা" উঠে গেল। সাবিত্রীপ্রসন্ন চলে গেলেন, এলেন সজনীকান্ত

দাস। তিনিই এই প্রতিষ্ঠানের নূতন মাসিক পত্রিকা "বঙ্গশ্রী" শুরু করলেন। নাম কার দেওয়া সঠিক জানি না, তবে তিনিই সম্পাদনা শুরু করলেন সমারোহের সঙ্গে। ওই পর্বের সঙ্গে আমারও নূতন পর্ব আরম্ভ হল।

"উপাসনা"য় তখন "যোগ-বিয়োগ" নামে একখানি উপন্যাস ক্রমশঃ প্রকাশিত হচ্ছিল। এবং "সর্বনাশী-এলোকেশী" নামে একটি গল্পও দেওয়া ছিল "উপাসনা"র দপ্তরে। "উপাসনা"র শেষ সংখ্যায় আকণ্ঠ ঠেসে সাবিত্রী-প্রসন্ন সব শেষ করেছিলেন। এবং "উপাসনা"র হিসাব-নিকাশ চুকিয়ে দেবার সময় উপন্যাস ও গল্পের জন্য পারিশ্রমিক আদায় করে দিয়েছিলেন ষাট এবং দশ। উপন্যাসের দরুন বারো মাসে পাঁচ টাকা হিসেবে ষাট টাকার। এই আমার সাহিত্যিক-জীবনের প্রথম উপার্জন। এই কারণেই "উপাসনা" "বঙ্গশ্রী"র কথার পুনরাবৃত্তি। টাকাটা বোধ করি বুলুর মৃত্যুর পরেই উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় কলকাতায় গিয়ে "উপাসনা" আপিস থেকেই আবার যে রাত্রেই জ্বর নিয়ে বাড়ি ফিরলাম, সেই দিন পেয়েছিলাম। বাড়িতে দিন কয়েক জ্বরে ভুগে আবার এলাম কলকাতায়। এবার সপরিবারে স্ত্রী-পুত্রকন্যাদের নিয়ে এলাম আমার স্ত্রীর মাসিমার বাড়ি। তিনি ছিলেন আমার স্ত্রীর মায়ের মতো। উমার (আমার স্ত্রীর) বাল্যকালে মাতৃবিয়োগ হয়েছিল, তিনিই তাকে মাতৃস্নেহে কোলে টেনে নিয়েছিলেন। তাঁরই আহ্বানে এলাম কলকাতায়; বালীগঞ্জ যতীন দাস রোডে। কাছাকাছি সাবিত্রীপ্রসন্ন এবং কিরণ রায়ও থাকেন। ওদিকে ধর্মতলা স্ট্রীটে "বঙ্গশ্রী" আপিস জমে উঠেছে। "শনিবারের চিঠি"র সজনীকান্তকে ঘিরে নতুন কালের সাহিত্যরথীর সমাবেশ হয় নিত্য-নিয়মিত। গল্পে-গুজবে, হাস্যে-কৌতুকে, আলাপে-আলোচনায়, চায়ে-পানে, সিগারেটে-বিড়িতে, মধ্যে মধ্যে মুড়ি-বোঁদেতে, ভাজা চীনেবাদাম-ছোলাতে মিশিয়ে সরগরম মজলিস। অধ্যাপক সুকুমার সেন, শ্রীযুক্ত অমূল্য সেন, শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ, স্বর্গীয় রবীন্দ্র মৈত্র, শ্রীযুক্ত সরোজ রায়চৌধুরী, শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী, চিত্রকর শ্রীযুক্ত চৈতন্য চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী, কবি সুবল মুখোপাধ্যায়, চিত্রশিল্পী অরবিন্দ দত্ত, স্বর্গীয় বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যিক উকিল দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যরসিক উকিল জ্ঞান রায়—এঁরা প্রায় এ আসরের নিত্যকার যাত্রী ছিলেন। মধ্যে মধ্যে আসতেন শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, কবি অজিত দত্ত, বিখ্যাত চিকিৎসক উদার আত্মভোলা শ্রীরাম অধিকারী; কখনও কখনও আসতেন শিল্পী শ্রীযুক্ত যামিনী রায়, শিল্পী শ্রীঅতুল বসু, শ্রীব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায় মধ্য মধ্যে আসতেন এবং আসর জমিয়ে তুলতেন কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই। মধ্যে মধ্যে খাওয়াতেন। সে যাকে বলে সমারোহের কাণ্ড তাই। আড্ডার

সভ্যেরা তিনি এলেই ধরতেন কিছু খাওয়ান খুদুদা (অশোকবাবুর সমাদরের নাম)। তিনি পকেট থেকে হাত বের করলেন, হাতে উঠল হয়তো একশো টাকার নোট। সেটি টেবিলের উপর রেখে বলতেন, খুচরো তো নেই। যা আছে এই।

সভ্যেরা চুপ করে যেত। একশো টাকার নোটখানাকে খুচরো করে নিয়ে খাবার আবদার জানাতে তাদের দ্বিধা হত ; খুদুদা তখন বলতেন, তাহলে ওখানা নিয়েই যা হয় কর। এরপর উঠত খুদুদার জয়ধ্বনি। এই মানুষটির মতো দরাজ-মন আমীর মানুষ সত্যিই দেখি নি। একটু ভুল হল ; পরে অবশ্য দেখেছি, শিল্পী দেবীপ্রসাদকে দেখেছি। তিনি যাঁদের ভালোবাসেন তাঁদের বিন্দুপ্রমাণ অভাবের কথা জানতে পারলে তৎক্ষণাৎ মাদ্রাজ থেকে একটি T. M. O. পাঠাতেন তিনি। দেবীপ্রসাদ এবং অশোক চট্টোপাধ্যায় পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। দুজনেই শালপ্রাংশু পালোয়ান বক্সার এবং জুজুৎসুবিদ্। এঁরা দুজনে মুখোমুখি হলে যা ঘটে সে দেখার মতো দৃশ্য। বিশেষ করে যখন দুজনের পাঞ্জা ধরে শক্তির পরীক্ষা করেন।

যাক ; ও কথা এখন থাক। "বঙ্গশ্রী"র আসরের কথা বলি। এই আসরে আর একজন আসতেন। সজনীকান্তের বন্ধু, স্ট্যাণ্ডার্ড লিটারেচার কোম্পানির এজেণ্ট নিখিল দাস। হাসাতে জানেন না, হাসতে জানেন এবং হাসির বেগ সম্বরণ করতে অপরকে মেরে ধরে কামড়ে আঁচড়ে কাঁদাতে জানেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখেও জল পড়ে !

এই আসরের আকর্ষণে ধর্মতলা স্ট্রীটে নিত্য বিকেলবেলা আসি। দূরে একান্তে বসে শুনি, দেখি, উপভোগ করি। এর আগেই বোধ হয় বলেছি যে, "বঙ্গশ্রী"র আসরে সজনীকান্তের মহল ছিল তিনটে। প্রথম মহলে থাকতেন কিরণ রায়, তিনি আপ্যায়িত করতেন নূতন আগন্তুকদের ; তার পরের মহল ছিল সজনীকান্তের সম্পাদকীয় দপ্তর ; এখানেই বসত এই বিখ্যাত মজলিস। এর পর পর ছিল তাঁর খাস-মহল, এখানে চারিদিকে ঠাসা ছিল হাজার পাঁচেক বই, এরই মধ্যে তিনি লেখাপড়ার কাজ করতেন এবং গভীর অন্তরঙ্গদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন।

কিরণ রায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় অনেক দিনের হলেও সজনীকান্তের আসরে এবং অপর সকলের কাছেই আমি ছিলাম নূতন আগন্তক। আমার সীমানা আমি নিজেই নির্ধারণ করে নিয়েছিলাম। আমি এসে বসতাম ওই কিরণ রায়ের মহলে। ভিতরে যখন মজলিস পুরোদস্তুর জমে উঠত তখন কিরণই নিয়ে যেত, এক পাশে চেয়ারে বসে শুনতাম। আড্ডা শেষ হলে সন্ধ্যার সময় ফিরে যেতাম বালীগঞ্জে। সেখানে যখন পৌঁছুই তখন এ

আড্ডার আনন্দের রেশ আর থাকত না, মনে জেগে উঠত বন্ধুর স্মৃতি। মনে মনে সংশয় জাগত এ কেমন আনন্দ, এ কোন্ আনন্দ যা আকণ্ঠ পান করে এসেও বেদনায় তৃষ্ণা শোকের শুষ্কতা এক বিন্দু অপনোদিত হল না?

শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "কল্লোল যুগে" লিখেছেন— "তারাশঙ্কর যে মিশতে পারে নি ("কল্লোল" দলের সঙ্গে) তার কারণ আহ্বানের আন্তরিকতা নয়, তারই নিজের বহির্মুখিতা। আসলে সে বিদ্রোহের নয়, সে স্বীকৃতির সে স্থৈর্যের। উত্তাল ঊর্মিলতার নয়, সমতল তটভূমির কিংবা বলি, তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গের।" কথাগুলির মধ্যে অস্পষ্টতা আছে। তবুও বিদ্রোহ কথাটি স্পষ্ট। বিদ্রোহ এবং বিপ্লবে প্রভেদ আছে। আমি বিদ্রোহের ছিলাম না। বর্তমানকে ভেঙেচুরে তাকে অগ্রাহ্য করে শূন্যবাদের মধ্যে জীবনকে শেষ করার কল্পনায় আমার মনের পরিতৃপ্তি কোনোদিন হয়নি। আমার রচনার সমাপ্তি পদ্ধতি বিশ্লেষণ করলেই এটা বোধ হয় স্পষ্ট ধরা পড়ে। আমার মনে ভেঙে গড়ার গভীর স্বপ্ন ছিল। উত্তাল ঊর্মিলতার মধ্যে তটভূমিতে আছড়ে পড়ে ফিরে গিয়ে তটভূমি ভেঙে এবং আবর্তসৃষ্টি করেই তৃপ্তি পাবার মতো মনের গঠন আমার ছিল না। ওই ঊর্মিলতার নিচে যে স্রোতোধারা প্রবাহিত হয়, যে স্রোত অহরহ সমুদ্রের বুকের ভিতর প্রবাহিত হয় আপনার বেগে আপনার পথে, আমার মনের গতি অনেকটা সেই ধরনের। ঠিক এই কারণেই "বঙ্গশ্রী"র আসরেও প্রথম যখন এই ঊর্মিলতা এবং কল-কল্লোলের সমারোহ দেখলাম তখন একটু দূরে ওখানকার তটভূমিতেই আশ্রয় নিয়ে নিতান্ত দর্শকের মতোই বসে রইলাম। ঢেউগুলিকে গুনেই গেলাম, শৌখিন সমুদ্র-স্নানার্থীর মতো কোমর বেঁধে নেমে পড়লাম না। বন্ধু কিরণ রায় মধ্যে মাঝে সমুদ্রতটের ব্যবসায়ী নুলিয়ার মতো হাত ধরে টানাটানি করতেন; বলতেন, আরে নেমেই দেখো না কেন। দু-চারটে ঢেউ নিলে, দু-চারদিন এই তরঙ্গস্নান করলে তোর স্নায়বিক দুর্বলতা কেটে যাবে। কিন্তু তাতেও আমি নড়ি নি। প্রাণ সাড়া দিত না। বহুর মধ্যে এই ভাবে এই ভঙ্গিতে ছড়িয়ে দেওয়াটা আসল ছড়িয়ে দেওয়া নয়। এটা যেন আমি অনুভব করি গোড়া থেকেই। অচিন্ত্যবাবু একে বহির্মুখিতা বলেছেন। কিন্তু আমার ধারণা এটা ঠিক তার বিপরীত। অন্তর্মুখিতা। অন্তরের আত্মাকে অনুভব করে তারই সহধর্মী অন্তরঙ্গ জনটিকে খুঁজেছি। খুঁজতাম তটভূমিতে বসে। তটভূমিতে বসে দেখতে পেতাম তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মধ্যে শুধু সমুদ্রের জলই আসছে না, বালির রাশিও উঠে আসছে; আবার বিচিত্রগঠন বিচিত্রবর্ণ ঝিনুক আসছে তারই সঙ্গে। অনেক অনেক কিছু শিখেছি এই আসরে। আবার অনেক

বেদনাও পেয়েছি। পরনিন্দা পরচর্চা মুখরোচক সামগ্রী; কিন্ত গুণীজনের আসরে চলার বস্তু নয়। রসিকজনের ভিয়েনের গুণে সে সামগ্রী যখন খোলস পালটে রসবস্তুতে পরিণত হয় তখন আসল খাদ্যগুণের বিচার খাটো হয়ে রসের বিচারে অবাধে চলে যায় বড় বড় আসরে। এটাও সহ্য করা যায়। কিন্তু যখন আত্মকলুষকে রসিকতার রাংতায় মুড়ে মাদক-মেশানো পানের খিলির মতো আসরে বিলি করে তখন সেটা অসহ্য হয়ে ওঠে। এই ধরনের সরস আত্মকলুষ বর্ণনা করে বাহাদুরি অর্জন করতেও দেখছি এই আসরে। এবং অল্পবিস্তর সাহিত্যিক ঢংও আমার কাছে অসহনীয় মনে হত। প্রাণের মহল বন্ধ রেখে বুদ্ধির মহলের পোশাকী চলাফেরা কথা-বার্তাটাই সব চেয়ে বড় হয়ে উঠত অধিকাংশ আসরে। দু-চারদিন সাহিত্য প্রসঙ্গ নিয়ে তত্ত্বের পথে জ্ঞানের তোশাখানার দরজা খুলে যেত।

"শ্মশান ঘাট" গল্পটির মধ্যে এমন একটি শোকার্ত হৃদয়ের অনুচ্ছ্বসিত অথচ গাঢ় প্রকাশ আছে যে সেদিন "বঙ্গশ্রী"র সেই পরিহাস-রস-রসিকতা-মুখর মজলিসটি তার প্রভাবে কয়েক মিনিটের জন্য সকরুণ মৌনতায় আচ্ছন্ন হয়ে রইল। স্মৃতিটুকু মনের মধ্যে অম্লান হয়ে আছে। বোধ করি আমরণ থাকবে। থাকারই কথা। ওই শান্ত মৌনতার মধ্যেই আমি বোধ করি সার্থকতার প্রসাদ আস্বাদন করেছিলাম। সাধনায় সিদ্ধিলাভের মধ্যে থাকে যে অমৃত এমন আস্বাদনের মধ্যে থাকে তারই আভাস। অন্ন গ্রহণের পূর্বে জলগণ্ডূষ গ্রহণের মতো। মনে করিয়ে দেয়—প্রাণ মন দেহকে প্রস্তুত করে তোলে অন্নাস্বাদনের জন্য।

আরও একটা বিচার আছে। লৌকিক হিসাবে বিচার। অর্থাৎ যেটা নাকি মনোবিজ্ঞানের অঙ্কসম্মত। এতবড় মজলিসে এতগুলি গুণীজন-সমক্ষে রচনা পাঠের সৌভাগ্য আমার সেই প্রথম। পড়বার আগে ভয় ছিল, পড়ার সময়েই ফিসফাস এবং একান্তে আলোচনা শুরু হবে; পড়ার শেষে দুহাত উপরে তুলে আড়ামোড়া ছেড়ে হাই তুলে কয়েকজন উঠে পড়ে বলবেন, উঠলাম তাহলে। যাঁরা থাকবেন তাঁরা বলে উঠবেন, এবার চা আনতে বল। অথবা কোন একটা তুচ্ছ পরিহাস উপলক্ষ করে মুখরিত হয়ে উঠবে সভাগৃহ। সেই আশঙ্কা মিথ্যা হয়ে গেল। একজন বললেন, শেষটা—শ্মশানে ছোট মেয়েটির শবদাহের জায়গাটা আর একবার পড়ুন তো।

কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর সজনীকান্ত বলে উঠলেন, অপূর্ব! অদ্ভুত হয়েছে! এই শব্দ দুটি সজনীকান্তের জিহ্বাগ্রে অবস্থান করে। ভালো লাগলেই বেরিয়ে আসবে। উনিশ-বিশ দূরের কথা, দশ-বিশ এমনকি পাঁচ-বিশেও ওই দক্ষিণা দানের এক ব্যবস্থা, কাঞ্চন মূল্য। তফাত থাকে কণ্ঠ-

স্বরে। তাকে মারপ্যাঁচ বলব না, কারণ প্যাঁচের মারটা স্বেচ্ছাকৃত নয়; স্বাভাবিকভাবেই ভালোত্বের পরিমাণ ভেদে কণ্ঠস্বরের গাঢ়তার তারতম্য ঘটে। সে বুঝতে কিছু সময় লাগে। এদিক দিয়ে সজনীকান্ত একেবারে পাকা সম্পাদক। সব লেখককেই সমান তুষ্ট রাখতে পারেন। এক হাতে রাম অন্য হাতে রাবণ নিয়ে কারবার করতে পারেন। আর-এক দিক দিয়ে সজনীকান্ত সাধকের চেয়েও শক্তিশালী উত্তরসাধক। তন্ত্রমতে সাধক যখন শ্মশানে শবসাধনায় বা এমনি কোনো পদ্ধতির সাদনায় আসন গ্রহণ করেন তখন সর্বাগ্রে প্রয়োজন হয় একজন উত্তরসাধকের। উত্তর সাধক বিনিদ্র চোখে সাধনস্থানের অনতিদূরে দাঁড়িয়ে থাকেন সদাজাগ্রত নন্দীকেশ্বরের মতো। এবং অহরহ উচ্চারণ করেন মা-ভৈ বাণী। সেই মা-ভৈ বাণী ভয়ঙ্কর শ্মশানেও সৃষ্টি করে এক অভয় পরিমণ্ডলের। সেই পরিমণ্ডলের মধ্যে প্রশান্ত অনুদ্বিগ্ন সাধক সাধনা করে যান। সাহিত্যের সাধনক্ষেত্রে এই যুগে সজনীকান্তের মতো এতবড় উত্তরসাধক আমি আর দেখি নি। বর্তমান কালের যাঁরা সাহিত্যিক দিকপাল তাঁদের মধ্যে যিনি তাঁর কাছে এসেছেন প্রত্যেকেই এই উত্তরসাধকের বলে বলীয়ান হয়েছেন। বনফুল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সম্বুদ্ধ প্রভৃতি রথীরা আমার কথা অকপটে স্বীকার করবেন বলেই আমার বিশ্বাস। এযুগে সজনীকান্তের এই গুণ একজন পেয়েছেন। তিনি অধ্যাপক শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য। কোন সাময়িক পত্রিকার সম্পাদকের পদে তিনি যদি অধিষ্ঠিত থাকতেন তবে তিনি এদিক দিয়ে সার্থক হতে পারতেন।

গল্পটি সজনীকান্ত সঙ্গে সঙ্গে প্রেসে দিলেন। প্রথম সংখ্যাতেই যাবে। কথা ছিল শ্রীযুক্ত সরোজকুমার রায়চৌধুরী ও স্বর্গীয় রবীন্দ্র মৈত্রের গল্প প্রকাশিত হবে। সে ব্যবস্থা আংশিক বদল হয়ে স্থির হল, ৺রবীন্দ্র মৈত্রের গল্প যাবে দ্বিতীয় সংখ্যায়। ৺মৈত্র নিজে খুশী হয়েই মত দিয়েছিলেন। তিনি তখন প্রভাতের কুয়াশামুক্ত সূর্যের মতো স্বকীয় দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পেয়েছেন জীবনক্ষেত্রে। "শনিবারের চিঠি"তে তাঁর "মানময়ী গার্লস স্কুল" নাটক প্রকাশিত হচ্ছিল। তখনকার দিনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যপ্রতিষ্ঠান আর্ট থিয়েটারের 'স্টার' রঙ্গমঞ্চে সেই নাটক অভিনীত হচ্ছে। ৺অপরেশচন্দ্রের নাটক ছাড়া অন্য কারও নাটক বড় একটা স্থান পেত না। পেলেও খুব সার্থক হত না! এই সময়ে ৺অপরেশচন্দ্র ছিলেন বাতে শয্যাশায়ী। প্রায় পঙ্গু অবস্থা। এদিকে সামনে এসেছে বড়দিন। সেকালে কলকাতায় বড়দিনের একটা বাজার ছিল। বোধ করি কলকাতার সারা বছরের সেরা বাজার। চৌরিঙ্গীর হল্ এণ্ডারসন, হোইটওয়ে লেড্‌ল থেকে

হাতিবাগানের ফুটপাতের ফেরিওয়ালাদের দোকান পর্যন্ত পণ্যসম্ভারে ঝলমল করত। হগ মার্কেট থেকে টালার চুনীবাবুর বাজার পর্যন্ত কপি, কড়াইশুঁটি, গলদা চিংড়ি, ভেটকি, তপসে, মাটনমুর্গীতে বোঝাই হয়ে যেত। চিড়িয়াখানা থেকে থিয়েটার, সিনেমা, ময়দানে সার্কাসের তাঁবু পর্যন্ত লোকের সারি লাগত। বড়দিনে থিয়েটার সিনেমায় নতুন বই না হলে সেকালে চলত না। বড়দিনে নতুন নাটক চাইই। এবং বড়দিনে লঘুরসের মধুর নাটকেরই চলতি ছিল বেশী। আর্ট থিয়েটারে নাটক চাই, অপরেশচন্দ্র বাতে শয্যাশায়ী। আর্ট থিয়েটারের অন্যতম ডিরেক্টর স্বনামধন্য পুস্তকব্যবসায়ী সাহিত্যরসিক শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ই বোধ হয় "শনিবারের চিঠি"তে প্রকাশিত এই নাটকখানি পছন্দ করে স্বর্গীয় মৈত্রকে ডেকে বইখানি নিয়ে মঞ্চস্থ করেছিলেন। এ সৌভাগ্য সেকালে খুব একটা বড় সৌভাগ্য এবং সম্মান। সম্পাদকের দরজা কাঠের হলে নাট্যমঞ্চের দরজাগুলি ছিল লৌহদ্বার। মাথা ঠুকলে মাথাই ভাঙত, দরজা খুলত না। স্বর্গীয় নাট্যকার নির্মলশিববাবুর কাছে শুনেছি—তিনি যখন প্রথম নাট্যকার হিসেবে "মিনার্ভা"য় প্রবেশাধিকার পান তখনকার কথা। সে কি দুর্ভোগ। তিনি সম্পদশালী পিতার সন্তান। সে হিসেবে অভিনেতা-অভিনেত্রীবৃন্দ একটু সম্ভ্রমের চোখেই দেখত। তবুও অনেক দুর্ভোগ তাঁকে ভুগতে হয়েছিল। একদিন একজন প্রায় গন্ডমূর্খ অভিনেতা তাঁর রচনায় ভুল ধরেছিল—বলেছিল, মশায় এ আপনি কি লিখেছেন। Sequence of tense জানেন না আপনি? এইখানটা বুঝিয়ে দিন আমাকে।

নির্মলশিববাবু অমর্যাদার ক্ষোভে এবং মূর্খকে বুঝাতে না পারার দুর্ভোগে যখন ঘেমে প্রায় নেয়ে উঠেছেন তখন ভাগ্যক্রমে স্বর্গীয় অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় এসে পড়ে তাঁকে বাঁচিয়েছিলেন। মূর্খ অভিনেতাটিকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন, যাও যাও, ওতে যা আছে তাই মুখস্থ করগে যাও। ছিকোয়েন্স বিচের করতে হবে না। যিনি নাটক লিখেছেন তিনি সিকোয়েন্স অব টেন্স জানেন।

নাট্যক্ষেত্রে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শিশিরকুমারের আবির্ভাবের পর এই ধারণার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে তখন; ওই কিছুটা বাদে বেশ কিছুটা তখন বর্তমানও; এই অবস্থায় সসম্মানে আহ্বান করে দক্ষিণা দিয়ে নাটক নেওয়ার মধ্যে স্বর্গীয় রবীন্দ্র মৈত্র যে সম্মান পেয়েছিলেন তার দাম অনেক। নাট্যক্ষেত্রে আর্ট থিয়েটারে আমার দুর্ভোগের কথা এর আগেই আমি লিখেছি। এই আর্ট থিয়েটারে অপরেশবাবুর হাতেই সেটা ঘটেছিল।

স্বর্গীয় রবীন্দ্র মৈত্র সাহিত্যক্ষেত্রে তখনই খ্যাতিমান ছিলেন। "প্রবাসী"তে তাঁর গল্প প্রকাশিত হত স্বনামে। "শনিবারের চিঠি"তে দিবাকর শর্মা নামে

হাস্য ও ব্যঙ্গরসাত্মক গল্প লিখতেন। "আনন্দবাজারে" লিখতেন "দধিকর্দম"। তাঁর তিরোধানের সঙ্গেই "আনন্দবাজার পত্রিকা" "দধিকর্দম" শিরোনামা তুলে দিয়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার পরিচয় দিয়েছেন। "দধিকর্দম" নামটিও ছিল স্বর্গীয় মৈত্রের দেওয়া। সজনীকান্ত "বঙ্গশ্রী"র সম্পাদক পদ গ্রহণ করায় তিনি "শনিবারের চিঠি"র সম্পাদকের পদও তখন গ্রহণ করেছেন। তিনি তখন ফল-ভার-অবনত বৃক্ষের মতো পরিপূর্ণচিত্ত। এবং চিত্তের দিক থেকে তিনি ছিলেন মহানুভব। জীবনে দয়া, মানুষের প্রতি প্রেম প্রভৃতি আদর্শের প্রতি অনুরাগে বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর তুলনা বিরল। আমার গল্পটি শুনে প্রসন্নচিত্তে বললেন—আমার গল্প থাক। এই গল্পই যাক প্রথম সংখ্যায়।

শুধু তাই নয়, "মানময়ী গার্লস স্কুল" উদ্বোধনের দিন তিনি তাঁর সাহিত্যিক বন্ধুদের মধ্যে আমাকেও বন্ধুরূপে গণনা করে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। বাংলা ১৩৩৯ সালের ১৫ই পৌষ "মানময়ী গার্লস স্কুলে"র উদ্বোধন হয়েছিল। "বঙ্গশ্রী"র মজলিসের প্রায় সকলেই ছিলাম। হাস্যরস-প্লাবিত করতালি-মুখরিত প্রেক্ষাগৃহে আমাদের গোটা দলটি সেদিন যে বিজয়োল্লাস অনুভব করেছিল তা যখন আজ স্মরণ করি তখন আনন্দে মন ভরে উঠে। মনে মনে বুঝতে পারি সেই দিনই প্রথম আমি "বঙ্গশ্রী"র গোষ্ঠীর সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছিলাম। গোটা "বঙ্গশ্রী"র দল সেদিন স্বর্গীয় রবির বিজয়ে দিগ্বিজয়ের উল্লাস অনুভব করেছিল। অনুভব করবারই কথা। "মানময়ী গার্লস স্কুলে"র অভিনয়ের সে সফলতা মহৎ। আয়োজনে সমারোহ ছিল না। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে তখনকার দিনের দিকপালেরা কেউ ছিলেন না, এখনকার অন্যতম দিকপাল শ্রীযুক্ত জহর গাঙ্গুলী তখন নিতান্তই নবীন ও তরুণ; শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর "পোষ্যপুত্রে" ফটিকচাঁদের ভূমিকায় অভিনয় করে সবে পরিচিত হয়েছেন। বয়েসে নবীন প্রিয়দর্শন তরুণ—মেদ এবং ভুঁড়ির কোন চিহ্ন ছিল না। মানসের ভূমিকায় অভিনয় করে প্রথম রজনীতে তিনি খ্যাতিমান হয়ে গেলেন; দর্শক-মানসের সঙ্গে প্রিয়জন-সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেল। নায়িকা নীহারিকার ভূমিকায় পদ্মাবতীও খ্যাতিলাভ করলেন। স্বর্গীয় রবীন্দ্র মৈত্র খ্যাতির উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হলেন এক রাত্রে। বিখ্যাত হয়ে গেলেন তিনি। সাহিত্যিক বিচারেও এ খ্যাতির মধ্যে খাদ ছিল না। রবীন্দ্রনাথের "চিরকুমার সভা"র পর এমন সুমধুর হাস্যরসের মিলনাত্মক নাটক তখন পর্যন্ত আর অভিনীত হয় নাই। আজ স্মৃতি-কথা লিখবার সময় মনে মনে বিচার করে লিখছি—আজও পর্যন্ত আর হল না।

স্বর্গীয় রবীন্দ্র মৈত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতার আমার সুযোগ হয় নি। অল্প কয়েকদিনই আমি তাঁকে দেখেছিলাম। তবে কয়েক দিনেই তিনি যে

সাহিত্যিকদের সকল জন থেকে পৃথক তা বুঝেছিলাম। তাঁর পদক্ষেপ থেকে আরম্ভ করে আলাপ-আলোচনার ধারা কিছুর সঙ্গেই অন্য কারুর মিল ছিল না, সবেই ছিলেন তিনি পৃথক। সহজ স্পষ্ট সোজা এবং আশ্চর্য রকমের শক্ত। মনের কথা উচ্চকণ্ঠে বলতেন, কোন সঙ্কোচ করতেন না। দৃঢ়তার সঙ্গে নিজের প্রত্যয়কে প্রচার করতে দ্বিধা ছিল না। যা অন্যায় মনে হত তার প্রতিবাদ করতে ইতস্ততঃ করতেন না। অপরে কে কি ভাবতে পারে সে ভাবনা তাঁর ছিল না। তিনি নিজের ভাবনাকে প্রকাশ করতেন অসঙ্কোচে এবং সে ভাবনায় কোনোদিন কারুর অনিষ্ট কামনা থাকত না। নিজের কথা—সে যে কথাই হোক, প্রশংসার বা নিন্দার সব কথাতেই তিনি ছিলেন মুক্তকণ্ঠ।

একদিনের কথা মনে পড়ছে। "বঙ্গশ্রী" আপিসের প্রথম মহলে আমি একা বসে আছি। কিরণ নেই, সজনীকান্তও অনুপস্থিত। দুজনেই বোধ হয় "বঙ্গশ্রী"র মালিকের কাছে গেছেন। ভিতরের আড্ডা শূন্য। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের দক্ষিণ দিকে "বঙ্গশ্রী" আপিসের কাঠের সিঁড়িতে পদশব্দ উঠল। রবি মৈত্রের পদধ্বনি চিনতেও ভুল হত না। উপরে উঠতে উঠতেই তাঁর কথা শুরু হয়ে যেত। কথাও শুনতে পেলাম। উপরে উঠে আমাকে দেখে আমার কাছে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন, কিরণ কই? সঙ্গে সঙ্গে ঘরে উঁকি মেরে বললেন, এত চুপচাপ সব?

বললাম—কেউ নেই। এরা দুজন গেছে হেড অফিসে।

বললেন—যাক গে। এখন শুনুন, এরা মশায় অদ্ভুত। অদ্ভুত লোক। আশ্চর্য ভালো লোক।

কারা বুঝতে না পেরে আমি মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

বললেন—থিয়েটারের অভিনেতারা দু-তিনজন আমার বাড়ি গিয়েছিল। চমৎকার মানুষ। বলে, এমন ভালো বই আমরা আর অভিনয় করি নি। বলে, এবার যে বই লিখবেন তাতে যেন আমার উপযুক্ত একটা ভালো পার্ট থাকে। সুন্দর মানুষ এরা। কিন্ত অনেকের খুব কষ্ট।

বলেই যেতে লাগলেন "মানময়ী গার্লস স্কুলে"র সার্থকতার কথা। বলতে বলতে হঠাৎ বোধ করি মনে হল যে নিজের অতটা কথা বলার পর আমার সম্পর্কে কিছু বলা উচিত। বললেন, আপনার খবর বলুন। আর কি লিখছেন? আপনার গল্পটি কিন্তু খুব ভালো লেগেছে আমার।

কয়েক মিনিট পরেই বললেন, শুনছি কয়েকজন বিশেষরূপে দগ্ধ অর্থাৎ বিদগ্ধ অর্থাৎ মুখপোড়া বলেছে—মানময়ী খুব সস্তা লেখা—জায়গায় জায়গায় ভালগার। নীলচে চোখ তাঁর জ্বলে উঠল। বললেন, ও সব নরকাসুরদের আমি গ্রাহ্য করি না।

তিনিই ব্যাখ্যা করলেন নরকাসুর অর্থে বরাহরূপী ভগবানের ঔরসে পৃথিবীর গর্ভজাত পুত্র। ভগবানের পুত্র হলেও বরাহ-স্বভাবসম্পন্ন সন্তান অসুর-প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়েছিল। ইংরিজি সভ্যতার ও শিক্ষার দৃপ্ততায় দাম্ভিকতায় যাদের মন বিকৃত হয় তারাই ঘৃণা করে দেশের আচার-বিচার সব কিছুকে। দাঁত দিয়ে মায়ের বুক চিরে-ফেড়েই ওদের আনন্দ। ফরাসী ধরনে তাদের হাসতে লজ্জা হয় না, ইংরিজি ধরনে কাশতে লজ্জা হয় না; শুধু লজ্জা হয় এ দেশের সব কিছুতে। এমন কি এ দেশের সন্তানহারা মা ছেলেকে বুকে জড়িয়ে—ওরে গোপাল রে বলে কাঁদলে গোপাল শব্দের জন্য এই শোক-বিলাপ তাদের কাছে ভালগার হয়ে দাঁড়ায়। ইংরিজি সভ্যতার আমদানির প্রথম আমল থেকে এ আমল পর্যন্ত এরা কালে কালে পোশাক পালটে আসছে। ধুয়ো পালটে আসছে। বিলিতি ড্রাম বাজলে এরা তালে তালে পা ফেলে কিন্তু ঢাক বাজলে বলে—থামলে বাঁচি। আমি গ্রাহ্য করি না ওদের। এই ধরনের অনেক কথাই তিনি সেদিন বলেছিলেন। সে কথা মিথ্যে নয়।

১লা "বঙ্গশ্রী" বের হল। তখন বেলা চারটে। মাত্র পঞ্চাশ কপি বই এল, প্রচ্ছদপটে দুটি হাঁসের ছবি ছিল। পল্লীর জলায় হাঁস দুটি সত্য সত্যই শ্রীর দ্যোতনার সৃষ্টি করেছিল। "বঙ্গশ্রী"র প্রবন্ধগৌরব বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছে। শুধু প্রথম সংখ্যাই নয়, দু বৎসর "বঙ্গশ্রী" সজনীকান্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল—দু বছরের কাগজই রচনাগৌরবে স্মরণীয়।

কিরণ গাড়ি নিয়ে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে কাগজ দিতে বের হল। সঙ্গে আমিও গেলাম।

বাড়ি ফিরলাম। ফিরে আবার বসলাম কাগজ কলম নিয়ে। লিখলাম "ডাইনীর বাঁশী" বলে একটি গল্প। এ গল্পটি সত্যকার একটি ভালো গল্প। আমাদের গ্রামে ছিল গন্ধবণিকদের মেয়ে—নিঃসন্তান বিধবা—স্বর্ণ; লোকে বলত সে ডাইনী। সনা ডাইনী! আমাদেরই বৈঠকখানা বাড়ির সংলগ্ন শালপুকুরের উত্তর-পূর্ব কোণে একটি অশ্বত্থতলায় ছিল তার বাড়ি। গল্প শেষ করে কিরণকে শোনালাম। কিরণ লাফ দিয়ে উঠল। নিয়ে গেল "বঙ্গশ্রী" আপিসে। সজনীকান্তকে শোনালে। সজনীকান্ত কিন্তু গল্পটি নিলেন না। বললেন, ও'র লেখা মাঘ মাসে বের হয়েছে, এখন অন্ততঃ পাঁচ মাস আগে ও'র লেখা যাবে না।

এগারো

সাবিত্রীপ্রসন্ন গল্পটি নিয়ে "ভারতবর্ষে" শ্রীযুক্ত হরিদাসবাবুর হাতে দিয়ে এলেন। এরই বোধ হয় দু-তিন দিন পর অকস্মাৎ সংবাদ এল রবীন্দ্র মৈত্র দেহত্যাগ করেছেন। গিয়েছিলেন তিনি রংপুর। রংপুরেই ছিল তাঁদের বাস। সেখানে গিয়ে ম্যালিগ্‌ন্যাণ্ট ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে তিন-চার দিনের অসুখেই তিনি মারা গেছেন। সংবাদটা "বঙ্গশ্রী"র আসরে বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতোই এসে পড়ল। রবীন্দ্র মৈত্র পনেরো কুড়ি দিন আগে অকস্মাৎ বিখ্যাত হয়েছেন। লাল কাঞ্চনের গাছের পুষ্পশোভার মতো সে খ্যাতি। বসন্তারম্ভে গাছটি হয় পত্ররিক্ত, সেই রিক্তগাছটি অকস্মাৎ একদা রক্তাভ কোমল পুষ্পশোভায় ঝলমল করে ওঠে। সপ্তাহ দুয়েক পর গাছ ভরে যায় নব পত্রপল্লবের শ্যামশোভায়; পুষ্পশোভা হয় অন্তর্হিত।

রবীন্দ্র মৈত্র সপ্তাহ তিনেকের জন্য তাঁর সেই বিপুল খ্যাতিকে ভোগ করে চলে গেলেন পরলোকে। যেন একরাত্রির বাদশাগিরি এ সব, এইটেই প্রমাণ করে গেলেন তিনি।

এর কয়েকদিন পর আমি ছেলেমেয়েদের নিয়ে দেশে ফিরলাম। সামনে মাঘ মাসের তৃতীয় বা শেষ সপ্তাহে আমার বড় ছেলে সনতের উপনয়ন। যাবার আগে কিরণ এবং সাবিত্রীপ্রসন্ন বললেন, "চৈতালী ঘূর্ণী"র হিসেব নিয়েছ প্রকাশকের কাছে?

নিই নি। ভয়ে সেদিকে যাই নি। মনে হয়েছে যদি তাঁরা বলেন, একখানার বেশী বই বিক্রি হয় নি। নিয়ে যান বই। গুদামের ভাড়া দিয়ে যান। একখানা বই কিছুদিন আগে আমি নিজেই খরিদ্দার সেজে কিনেছিলাম। কাজেই একখানা বই বিক্রি সম্পর্কে নিঃসন্দেহ ছিলাম।

সাবিত্রী এবং কিরণের তাগিদে যেতে হল। ও'রা দুজনে নিত্যই জিজ্ঞাসা করতেন, গিয়েছিলে? কত বিক্রি হয়েছে?

বলতাম, যাই নি। আজ যাব।

অবশেষে একদিন গেলাম প্রকাশকের দোকানে। বই জমা দেওয়ার রসিদ দেখালাম, পরিচয় দিলাম, সবিনয়ে হিসেব চাইলাম।

দোকানের মালিক ভদ্র মানুষ, বাংলা দেশে সুপরিচিত ব্যক্তি। তিনি বসতে বললেন; একজন কর্মচারীকে বললেন—দেখ তো "চৈতালী ঘূর্ণী" কতগুলি আছে?

কর্মচারীটি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনার বই ?

ঘাড় নেড়ে জানালাম, হ্যাঁ। গলা আমার তখন শুকিয়ে গিয়েছে।

কর্মচারীটি বললেন, বইগুলো নিয়ে যান আপনি। ঝাঁকামুটে ডেকে আনুন। বিক্রি হয় না। ও দিয়ে জায়গা জুড়ে রাখতে পারব না আমরা।

মালিক অন্য কারও সঙ্গে কথা বলছিলেন প্রথমটা বোধ হয় খেয়াল করেন নি। শেষটা তাঁর কানে গিয়েছিল। তিনি ধমক দিয়ে উঠলেন।—তোমাকে যা বললাম তাই কর। যাও !

তিনি লজ্জিত হলেন আমার কাছে।

কর্মচারী হিসেব নিয়ে এলেন কয়েক মিনিট পরে। সংখ্যাটা ঠিক মনে নেই, তবে দেড় বছরে পঞ্চাশ থেকে ষাটখানির মধ্যে বই বিক্রি হয়েছে। তাঁদের কমিশন বাদে আমার পাওনা হয়েছে চল্লিশ টাকা কয়েক আনা। আসবার সময় কর্মচারীটি আবার স্মরণ করিয়ে দিলেন, এবার ভদ্রভাবেই বললেন, বইগুলি নিয়ে যান।

আমি বললাম—কাল বা পরশু এসে নিয়ে যাব।

টাকাটা নিয়ে বাড়ি এলাম। দু দিন কি তিন দিন পর বাড়ি চলে গেলাম। এর মধ্যে কলেজ স্ট্রীট দিয়ে হাঁটি নি। কি জানি—সেই লোকটি দেখে যদি হাঁকে বা পিছনে এসে জামা চেপে বলে, বই নিয়ে যান মশায়।

মাঝখানে একখানি বইয়ের কথা বলতে ভুলেছি। "পাষাণপুরী"র কথা। জেলখানার মধ্যে বইখানির পত্তন করেছিলাম। জেল থেকে বেরিয়ে "চৈতালী ঘূর্ণী" যখন "উপসনা"য় বের হয়, সেই সময় জেলখানার পটভূমিকায় "পাষাণপুরী" আরম্ভ করি। "পাষাণপুরী"র অন্যতম নায়ক কালী কর্মকার আমার চোখে দেখা মানুষ। আমি সেদিন সিউড়ী আদালতে সমন অনুযায়ী আত্মসমর্পণ করতে যাই, সেইদিনই হত্যাপরাধে কালী কর্মকারকে গ্রেপ্তার করে পুলিস নিয়ে যাচ্ছিল। আঘাতে প্রহারে জর্জরিত ধূলি-ধূসর দেহ, চোখে অসুস্থ অস্থির দৃষ্টি, পরনে ছিন্নবিচ্ছিন্ন একখানা কাপড়, কপালে দগদগে একটা ক্ষতচিহ্ন, কোমরে দাড়ি-বাঁধা অবস্থায় আমাদপুরে বসে ছিল। লোকটির দেহবর্ণ গৌর, চুলগুলি পিঙ্গলাভ, চোখের তারা দুটিও পিঙ্গল, বিড়ালের চোখের তারার মতো। সেইখানেই শুনলাম কালীর কাহিনী। নিজের বন্ধুর মাথা হাতুড়ি মেরে ডিমের খোলার মতো ভেঙে দিয়েছে। গোটা গাঁ আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। কালী অস্থির দৃষ্টিতে চারিদিক চেয়ে দেখছিল এবং তারই মধ্যে শুনছিল তার কাহিনী বর্ণনা। মধ্যে মধ্যে সে প্রশ্ন করে উঠছিল।

—বাসিনীকে বেটা বামনা দিনরাত জ্বালাত কেন?

—আমাকে পতিত করতে গেল কেন?

—আমার ঘর আগে পুড়িয়ে দিলে কেন? কখনোও বা ভুল সংশোধন করে দিচ্ছিল।—

—না, না, গাঁ পুড়িয়ে দিতে চাই নি আমি। ওই বেটা কৃপণ বামুনের ঘরে আগুন দিয়ে ওকেই পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিলাম। কিন্তু কি করব। আগুন ছড়িয়ে পড়ল। কি করব?

কালীর কাহিনী, কালীর মূর্তি আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। এরপর জেলখানায় কালীকে তার বিচার ও দণ্ডকাল পর্যন্ত প্রায় নিত্যই দেখেছি। মস্তিষ্ক তার বিকৃত হয়ে গিয়েছিল, তবে উন্মাদ পাগল নয়। তাকে কিছুদিন রাখা হয়েছিল হাসপাতালে, তারপর কিছুদিন সেলে। নিত্যই তার কাছে যেতাম, কথা বলতাম। জেল হাসপাতালে চিকিৎসায় এবং সেবায় অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছিল সে। সুস্থ হয়ে সাধারণ বিচারাধীন কয়েদীর ওয়ার্ডে সকলের সঙ্গেও কিছুদিন ছিল। তবে রাত্রে ওই ওয়ার্ডের মধ্যেই একটা শিকে-ঘেরা খাঁচার মধ্যে তাকে রাখা হত। কালীর সঙ্গে আলাপ জমাতে গিয়েই সাধারণ কয়েদীর অনেকের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। বিচিত্র এই কয়েদীজীবনের যে পরিচয় পেলাম তাতে আর বিস্ময়ের অবধি রইল না। ক্রমে দেখতে পেলাম কয়েদখানায় অবরুদ্ধ মানুষগুলির নিরুদ্ধ কামনায় বিচিত্র কুটিল এবং অসহায় প্রকাশ! জেলখানাতেই আরম্ভ করেছিলাম "পাষাণপুরী"। মুক্তির পর নূতন করে যখন সাহিত্য-জীবন আরম্ভ করবার অভিপ্রায়ে আত্মনিয়োগ করলাম তখন প্রথম লিখলাম "চৈতালী ঘূর্ণী", তারপর লিখলাম "পাষাণপুরী"। "চৈতালী ঘূর্ণী" প্রকাশিত হল "উপাসনা"য়। ইচ্ছা ছিল "চৈতালী ঘূর্ণী" শেষ হলেই সাবিত্রীপ্রসন্নের হাতে "পাষাণপুরী" দেব। "উপাসনা" ছাড়া নবীন লেখকদের অন্য কাগজগুলি তখন উঠে গিয়েছে। কিন্তু হঠাৎ একটা যোগাযোগ ঘটে গেল। এ যুগের অন্যতম ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত সরোজকুমার রায়চৌধুরী পত্রিকা বের করলেন, নাম "অভ্যুদয়" সরোজকুমার জেলে যাবার পূর্বে ছিলেন "নবশক্তি"র সম্পাদক। "নবশক্তি"তে প্রকাশিত কোন রাজদ্রোহমূলক রচনার জন্যই তিনি সম্পাদক হিসাবে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। অথচ দণ্ডভোগান্তে মুক্তি পেলেন যখন তখন "নবশক্তি"র সম্পাদক পদে তাঁকে আর নিযুক্ত করা হল না। বোধ করি দৈনিক কাগজে সহকারী সম্পাদকের পদ দিতে চেয়েছিলেন কর্তৃপক্ষ। সরোজকুমার নিজের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে সসম্ভ্রমেই সে পদ গ্রহণ করেন নি। এবং স্বাধীনভাবে "অভ্যুদয়" বের করলেন। যতদূর জানি স্বর্গীয় কিরণশঙ্করবাবু

এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্র এই স্বাধীন চেষ্টায় তাঁকে যথেষ্ট উৎসাহিত করেছিলেন, নানাভাবে সাহায্যও করেছিলেন। এই "অভ্যুদয়ে" প্রকাশের জন্য সরোজকুমার আমার "পাষাণপুরী" সাদরে গ্রহণ করলেন।

কয়েক সংখ্যা পরেই কিন্তু "অভ্যুদয়" বন্ধ হয়ে গেল অর্থাভাবে। "পাষাণপুরী" উচ্ছিষ্ট হয়ে পড়ে রইল। সেকালে নূতন লেখকদের বই কেউ প্রকাশ করতে চাইতেন না। দোষ দিতে পারি না। সেকালে প্রকাশিত বইয়ের সংস্করণ হত কদাচিৎ এবং তাও বারো-চৌদ্দ বছরের আগে নয়। তবে মাসিকপত্রে প্রকাশিত উপন্যাসের তবু একটা কদর ছিল। মাসিকপত্রে যখন বেরিয়েছে তখন অবশ্যই একটা সাহিত্যিক মূল্য আছে এবং মাসে মাসে বের হয়েছে যখন তখন একটি ধারাবাহিক বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞাপিতও হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে প্রকাশকেরা অন্ততঃ বলতেন, আচ্ছা রেখে যান, দেখি ভেবে। "অভ্যুদয়ে"র অকালমৃত্যুতে "পাষাণপুরী"র ভবিষ্যৎ হল অন্ধকার। বেশ একটু দুঃখ পেলাম। কিন্তু সরোজকুমার আবার অধিষ্ঠিত হলেন "নবশক্তি"র সম্পাদকের আসনে এবং আমার উচ্ছিষ্ট "পাষাণপুরী"কে নূতনের মর্যাদা দিয়ে প্রকাশিত করলেন "নবশক্তি"তে। বইখানি শেষ না হতেই বর্মণ পাবলিশিং হাউস আমার ঠিকানা সন্ধান করে বইখানি প্রকাশ করবার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। একখানা চুক্তিপত্রও হয়ে গেল। টাকা দেবেন কিস্তিবন্দীতে। প্রথম কুড়ি টাকা নগদ এবং বর্মণ পাবলিশিং হাউসের মধ্যে পছন্দমত তিরিশ টাকার বই। দ্বিতীয় কিস্তি আর আদায় হয় নি। বই প্রকাশিত হল, কাগজে কাগজে সমালোচনা হল। "বঙ্গশ্রী"তেও সমালোচনা বের হল। তার শেষ লাইনটি আমার মনে আছে। "বই শেষ করিয়া মনে হয়—হায় কালীর ফাঁসি হইয়া গেল?" সত্য বলতে, সমালোচনা পড়ে পড়ে ক্ষুণ্ণ হয়েছিলাম। বুঝতে আমি ভুল করি নি বইখানি সমালোচকের ভালো লাগে নি। ও ছত্রটি নিতান্তই স্কুলের নিরীহ ছাত্রদের জন্য কনসোলেশন প্রাইজের মতো। অথচ পরবর্তীকালে অনেকেই বইখানির প্রশংসা করেছেন। "প্রবাসী"তে "চৈতালী ঘূর্ণী"র এক সমালোচনা করেছিলেন অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন; লিখেছিলেন—কলের শ্রমিক-ধর্মঘটে বইখানি শেষ হইয়াছে, নায়ক গোষ্ঠ পুলিসের গুলি খাইয়া মরিয়াছে। লেখক এই ঘটনাকে "চৈতালী ঘূর্ণী"র সহিত তুলনা করিয়া আশা করিয়াছেন কালবৈশাখী আসিবে! চৈতালীর ক্ষীণ ঘূর্ণী অগ্রদূত কালবৈশাখীর। অপেক্ষা করিয়া দেখা যাউক কি হয়? কালবৈশাখী আসে কি না?

সে আজ কুড়ি বছর হয়ে গেল। সেদিক দিয়ে "চৈতালী ঘূর্ণী"র ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়েছে বলেই মনে হয়। এ নিয়ে অনেকে আমাকে

মার্কসবাদে প্রভাবান্বিত বলে ঠাউরেছেন। কিন্তু মার্কসের ক্যাপিট্যাল বা তাঁর লেখা কোনো বই আমি পড়ি নি। এদেশে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত মার্কসবাদের উপর লেখা প্রবন্ধ কিছু কিছু পড়েছি মাত্র। আমার সম্বল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা; তা থেকেই আমি আমার উপলব্ধিসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম। কারণ ও কর্মে এবং সেই কর্ম ও কারণে ঘটনা থেকে ঘটনান্তরের মধ্য দিয়ে সৃষ্টির প্রবাহ চলেছে; রামায়ণ ও মহাভারতের মধ্যেই পেয়েছিলাম এই তত্ত্বের সন্ধান। শিখেছিলাম লক্ষ কোটি বৎসর পূর্বে একটি সংঘটনের প্রতিঘাতে ঘটল এক ঘটনা, এবং সে ঘটনার শেষ সেইখানেই হল না; তার জের চলল আর-এক যুগান্তরে। রামায়ণ মহাভারতের মহাবিস্ময়কর রচনা-সার্থকতার মূল তত্ত্বই যেন এইটি। এই মহাসত্যের অমোঘ গতিপথে স্বয়ং ভগবান এসে দাঁড়িয়েও তাকে রোধ করতে পারেন নি; এমন কি ভগবান বলে তাঁকে পাশ কাটিয়ে এতটুকু বাঁকা পথে যায় নি সে সংঘাত-সমুদ্ভূত শক্তি; সে চলেছে সোজা পথে। নরসিংহ অবতারে শাপগ্রস্ত ভগবান—যুগান্তর ত্রেতায় করেছেন সেই শাপের ফলভোগ; ত্রেতায় যে অন্যায় করলেন তিনি তারই প্রতিঘাতে দ্বাপরে তিনি ব্যাধের শরাঘাতে হলেন নিহত। এই সত্যের অমোঘ নির্দেশে—বন্যপশু বানরকে অন্যায় গুপ্তহত্যার প্রায়শ্চিত্তে তাঁকেও পশুর মতোই হত হতে হল। সেই গাছের আড়ালে জরা-ব্যাধ আত্মগোপন করে মৃগভ্রমে তাঁর প্রতি শর নিক্ষেপ করেছিল। এই থেকেই আমার এ উপলব্ধি হয়েছে। কৃষ্ণাবতারে কুরুক্ষেত্রের প্রায়শ্চিত্ত জীবনকালেই হয়েছে গৃহযুদ্ধে যদুবংশ ধ্বংসে; তাই এর আবির্ভাবে দেখতে পাই এক অভিনব রূপান্তর। দেনাপাওনা শোধ যেখানে হয় সেখানেই মানবসাধনায় উত্তরকালে বা জন্মান্তরে কালান্তরে এক উত্তরণ ঘটে। বুদ্ধাবতারে ঘটেছে তাই। হিংসা থেকে অহিংসা। জ্ঞানযোগ থেকে বোধিতে।

হাজার হাজার বৎসর ধরে মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্তের কাল একদিন আসবেই। এই আমি বুঝছিলাম। উনিশশো ষোলো-সতেরো সাল থেকে উনিশশো ত্রিশ-একত্রিশ সাল পর্যন্ত গ্রামে গ্রামে মানুষদের মধ্যে ঘুরে এইটুকু বুঝেছিলাম যে, সে দিন আসতে আর দেরি হবে না। রুশবিপ্লব সেই দিনের উষাকাল তাতে সন্দেহ নাই। বাতাসটা উঠেছিল সেইখানেই প্রথম; সেখান থেকেই বাতাস উঠে এখানকার গুমোটের মধ্যে চাঞ্চল্য তুলেছে। এর জন্য মার্কসবাদ পড়তে হয় নি আমাকে। তবে মার্কবাদের একটি তত্ত্ব অভিনব। এদেশে প্রকাশিত নানা প্রবন্ধের মধ্যে এইটুকু জেনেছি। এদেশে প্রকাশিত নানা প্রবন্ধের মধ্যে একটি সত্যের সন্ধান

পেয়েছি, যেটি ভারতীয় সত্যের সঙ্গে সমন্বিত হবার অলঙ্ঘনীয় দাবি নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। সে হল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি। শক্তি যে কেমনভাবে ঠেলে নিয়ে চলেছে মানুষের সমাজকে, মানুষকে, সেই সত্যকে প্রবন্ধ মারফৎ জেনেছিলাম প্রথম—তারপর গ্রামে গ্রামে ঘুরে সেখানকার সামাজিক উত্থান-পতনের ইতিহাস সংগ্রহ করে মিলিয়ে দেখে উপলব্ধি করেছিলাম এই তত্ত্বকে। কিন্তু তার বস্তুবাদ-সর্বস্বতাকে মানতে পারি নি। পথ এবং লক্ষ্যের বৈষম্যকেও আমি ভ্রান্তি এবং অপরাধ বলে মনে করি। মনে করি এতেই নিহিত আছে তার ভবিষ্যৎ বিপদ। যদুবংশের বিপদের মতো।

সে কথা থাক। এখন এই দুটি সত্যকে মেনে—দুটিকে মিলিয়ে একটি করে নিয়ে সেদিন যাত্রা শুরুর প্রথম পদে লিখেছিলাম "চৈতালী ঘূর্ণী"। "চৈতালী ঘূর্ণী" বৈশাখের অগ্রদূত এবং আমাদের জীবনেই সেদিন চৈত্র দ্বিপ্রহরে ছোট স্বল্পায়ু ঘূর্ণীগুলি অদূরবর্তী কালবৈশাখীরই ইঙ্গিত দিচ্ছে—এটুকু আমার থিসিস ছিল না—ছিল জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধি; সে উপলব্ধি ভ্রান্তিতে পর্যবসিত হয় নাই। সেই সঙ্গে এটাও যেন উপলব্ধি করি যে আরও আছে—মানুষের বিশেষ করে এই দেশের মানুষের যাদের আমি জানতে চিনতে চেষ্টা করেছি—আমি নিজেই যাদের একজন, তাদের আত্মার তৃষ্ণা থেকে রুচি থেকে বুঝতে পেরেছি সামাজিক সাম্যই সব নয়—এর পরও আছে পরম কাম্য; সেই পরম কাম্য অর্থনৈতিক সাম্য হলেই পাওয়া যাবে না। অন্তরের পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতা, পরিশুদ্ধতার মধ্যেই আছে সেই পরম কাম্য সুখ ও শান্তি। ঈর্ষা বিদ্বেষ থেকে অহিংসায় উপনীত হওয়ার মধ্যেই আছে পূর্ণ মানবত্ব, সত্যকামের সাম্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সেই অবস্থায় উত্তরায়ণে, পূর্ণ মানবত্ব অর্জনের ভিত্তির উপর। সমাজকে যন্ত্রের মতো ব্যবহার করে ছাঁচে ফেলা মানুষ তৈরী করে সে অবস্থায় উপনীত হওয়া যায় না। 'মনুষ্যত্ব' কোনও মেড-ইজি উপায়ে পাবার নয়। সমাজতান্ত্রিক বায়োলজি বিজ্ঞানের কথা শুনেছি। আমি বৈজ্ঞানিক নই; অভ্যাসে অভ্যাসে প্রকৃতির পরিবর্তন হয় কি না হয় সে তর্কে না গিয়েও বলব, মানুষ গিনিপিগ নয়; সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে প্রকৃতিতে সে প্রচণ্ডতম শক্তিশালী। মানুষকে অ্যাটম বোমার ঘায়ে মেরে ফেলা যায়; তাকে ভীত করে সাময়িকভাবে হারমানানোও যায় কিন্তু সত্যকথা জয় করা যায় না। হিরোসিমা, নাগাসিকির মানুষদের প্রকৃতি কি পরাজয় মেনে নিয়েছে? তারা কি কখনোও ভুলতে পারবে এ কথা? অ্যামেরিকা যেদিন অ্যাটম বোমের আঘাত হেনেছিল তাদের উপর সেদিন যারাই ছিল তাদের দলে—রাশিয়া

ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি—সবার উপরেই তাদের বিরাগ. মহাভারতের অপমানিতা অম্বার মতোই তপস্যামগ্ন হয়ে রয়েছে। বিড়ম্বিত জীবনের দুর্ভোগ ও পীড়ন থেকে মুক্তিই শুধু তার কাম্য নয়—সে জন্মান্তরেও এর প্রতিহিংসা চাইবে। যে আজ যত দান নিয়ে আসুক, যত সাহায্যই করুক, তবু সে ভুলবে না। যাতে ভুলানো যায়, যাতে হিংসা-জর্জর প্রকৃতিকে প্রসন্ন করা যায় সে হল প্রেম, সে হল অহিংসার সাধনা। প্রাণহীন বিকৃত ধর্মগত মন্ত্র জপের অহিংসা নয়। সে অহিংসার সাধনা আমার চোখের উপর দেখেছি। সুতরাং ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই।

/ বারো

ও সব কথা যাক। এখন যা ঘটেছিল তাই বলি।

"বঙ্গশ্রী"র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার অল্প কিছুদিন পরেই রবীন্দ্র মৈত্র মারা গেলেন। তারপরই আমি ছেলেমেয়েদের নিয়ে দেশে ফিরলাম। হয়তো শ্বশুরবাড়িতে আরও কিছুদিন থাকা চলত কিন্তু আমার বড়ছেলের উপনয়নের দিন কাছে এসে পড়ায় ফিরতে হল।

দেশে এসে কয়েকদিনের মধ্যেই মনের মধ্যে জেগে উঠল সেই অশান্ত। যে জাগলে মানুষের আর নিষ্কৃতি নেই। মানুষ ঘুরে বেড়ায় স্থান হতে স্থানান্তরে, খুঁজে বেড়ায় এমন কাউকে বা এমন কিছুকে যাকে সে জানে না, চেনে না, বোঝে না।

দেশের অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়ানো অসম্ভব হয়ে উঠেছে তখন। পরিচিত রাজনীতি-ক্ষেত্র তখন দলাদলির বিদ্বেষে জর্জর। গ্রামের সমাজে চিরকালের বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে প্রকৃতিতে মেলে না, সেখানেও আমি নিঃসঙ্গ।

এই অবস্থায় মনে পড়ল বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত যামিনী রায়ের কথা। তাঁর সঙ্গে একদিন দেখা হয়েছিল। প্রথম পরিচয়েই তিনি আমাকে বলেছিলেন, দেশে কেন? চলে আসুন এখানে! কলকাতায়। শ্মশান না হলে শব-সাধনা হয় না। প্রত্যেক সাধনায় সাধনপীঠের প্রয়োজন হয়। এ যুগে কলকাতাই হল বাংলার সাহিত্যের শিল্পের সাধনপীঠ। এখানে আসুন, কষ্ট করুন, একবেলা খেয়ে থাকুন—তবে পাবেন।

সেদিন কথাটা আদৌ মনঃপূত হয় নি। ভেবেছিলাম—কেন? দেশে

এসে মনের এই অশান্ত অবস্থায় সেই কথাটা মনে পড়ে গেল। কিন্তু তাই বা যাব কোন্ ভরসায়? আত্মীয়ের বাড়িতে থাকার লজ্জা যে কত তা বোধ করি আমার থেকে কেউ বেশী বুঝবে না। সেই লজ্জার পীড়নেই কলকাতায় থাকতে পারি না। স্বাধীনভাবে থাকতে যে অর্থের প্রয়োজন সে অর্থ উপার্জন তখন আমার সাধ্যাতীত। অন্ততঃ সাহিত্য-সেবা করে হত না। কুড়ি-পঁচিশ টাকা না হলে চলে না। কিন্তু মাসে কুড়ি টাকা উপার্জন কি করে হবে? "বঙ্গশ্রী"তে গল্প প্রকাশিত হলে পনের টাকা পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু "বঙ্গশ্রী"তে তো ছ মাস অন্তর গল্প প্রকাশিত হবে। সম্পাদক সে কথা স্পষ্টাক্ষরে জানিয়ে দিয়েছেন।

হতাশার মধ্যে স্থির করলাম থাক এইখানে সাহিত্যসাধনা। কিন্তু তাতেও অশান্ত শান্ত হল না। অবশেষে কাঁধে বোঁচকা বেঁধে একদা বেরিয়ে পড়লাম। মাঘ মাস শ্রীপঞ্চমীর পরদিন শীতলা ষষ্ঠীতে আমাদের ওখান থেকে পনেরো মাইল দূরে দৈধা বৈরাগীতলায় বৈষ্ণব সাধক গোপালদাস বাবাজীর আবির্ভাব-তিথিতে মেলা। সেই মেলায় চলে গেলাম। দুরন্ত শীত তখন। আশ্রয় নিলাম এক গাছতলায়। সেইখানেই ইট দিয়ে উনোন তৈরি করে একবেলা খিচুড়ি রান্না করে দুবেলা খেয়ে কাটিয়ে দিলাম তিন দিন।

বিরাট মেলা। দৈনিক লক্ষ লোকের সমাগম। চারিদিকে অন্নসত্র। দশ-বিশ মাইল দূর-দূরান্তর থেকে ভক্তেরা চাল দাল কাঠ বয়ে এনে এখানে খোলে অন্নসত্র। দৈনিক তিন হাজার মণ চাল রান্না হয়। অবিরাম হরিধ্বনি ওঠে। দৈনিক লক্ষ লক্ষ টাকার কেনা-বেচা।

পল্লীজীবনের যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস আসে ভারে ভারে। দুমকা থেকে আসে কাঠের কারবারীরা; বিস্তীর্ণ আমবাগানে কারখানা খুলে বসে, দরজা, জানলা, তক্তপোশ, পিলসুজ, চৌকি, জলচৌকি, গাড়ির চাকা, চাষের সরঞ্জাম সব তৈরি করে বিক্রি করে। ওদিকে বাবলা কাঠ ঢেলে রেখেছে স্তূপীকৃত করে; লাঙ্গলের মাথা তৈরী হবে। এরা এসেছে গঙ্গাতীর থেকে। বাবুই সাবুই বিক্রি হচ্ছে, শন পাট বিক্রি হচ্ছে। লোহার সামগ্রী তৈরি করছে কর্মকার, বিক্রি হচ্ছে। এর মধ্যে আছে মনিহারী, মিষ্টি। মধ্যে মধ্যে হঠাৎ দুটো দোকানের ফাঁক থেকে কেউ হেঁকে ওঠে—ও দাদা! একটি পাথর বসানো গিলটির আংটি নিয়ে যান। শুনছেন? ও দাদা!

সন্ধ্যার সময় থেকে মেলার আর-এক রূপ।

হরিধ্বনি থেমে যায়। অন্নসত্রগুলি স্তব্ধ। সেখানে জ্বলে শুধু টিমটিমে কেরোসিনের ডিবে। কিন্তু দোকানে দোকানে জ্বলে ওঠে আড়াইশো বাতির স্টোভ ল্যাম্প, অ্যাসেটিলেন গ্যাস-বাতি, সারি সারি সুদৃশ্য

চাঁদোয়ার তলায় তক্তপোশের উপর পড়ে জুয়ার আসর। পাঞ্জাবী, পাঠান, বাঙালী জুয়াড়ীরা আসে দেশদেশান্তর থেকে।

তার পাশেই তাঁবুতে তাঁবুতে বাজি, ম্যাজিক, গোলকধাম, সার্কাসের খেলা শুরু হয়। বাজনা বাজে।

একেবারে একপ্রান্তে বেশ্যাপল্লী; সেখানে জ্বলে ওঠে আলো। রাত্রি বাড়ে, তাণ্ডব শুরু হয়।

দেখে শুনে ওই গাছতলায় বসেই আকাঙ্ক্ষা হল এই মেলার রূপটি ধরব। সেখানেই বসলাম লিখতে। লেখা হোক, তারপর যা হয় হবে। ফেলেই দেব বা আগুনে দিয়ে দেব।

মাঘ মাসের শীতের মধ্যে দৈধার মেলার গাছতলায় বসে "মেলা" গল্পটি রচনা করেছিলাম। রাত্রি তিনটে অবধি মেলার পথে ঘুরেছি, জুয়ার আসরের পাশে দাঁড়িয়ে জুয়াড়ীদের—জুয়ায়-উন্মত্ত মানুষদের লক্ষ্য করেছি; পাপপঙ্কিল প্রকাশ্য বেশ্যা-বাজারের মধ্যে দাঁড়িয়ে মানুষের পাশব উন্মত্ততা লক্ষ্য করেছি; ক্লান্ত হলে ফিরে এসে গাছতলায় খড়ের বিছানার উপর বসে লণ্ঠনের শিখা বাড়িয়ে দিয়ে খাতা-পেন্সিল নিয়ে লিখতে বসেছি। মেলায় ছিলাম দু দিন। দু দিনের পর দৈধার মেলায় আর থাকা অসম্ভব। পুকুরের জল কাদা হয়ে ওঠে, মাঠ-ঘাট-আশপাশ পঙ্কিল হয়ে পড়ে। বাতাস ভারী হয়ে যায়। তবুও এই মেলা থাকে এক মাস। আমি আরও দু-চার দিন থাকতাম কিন্তু উপায় ছিল না। দু-তিন দিন পরেই আমার বড়ছেলের উপনয়নের দিন; সেই কারণেই ফিরতে হল।

"মেলা" গল্পের প্রথম পাণ্ডুলিপি বোধ করি আজও আছে। তখন লিখতাম একসারসাইজ বুকে, কপিইং পেন্সিলে। একসারসাইজ বইয়ের ৫৬ কি ৬০ পৃষ্ঠা হয়েছিল প্রথম খসড়াটি। বাড়ি ফিরে এলাম। ছেলের পৈতে হয়ে গেল। তারপর খাতাটা নিয়ে আবার বসলাম। এবার হল ৪০ পৃষ্ঠা। সে আমলে আমি প্রতিটি গল্পই অন্ততঃ দুবার করে লিখেছি, প্রয়োজন হলে তিনবার চারবারও লিখেছি। শুধু যে রচনা উন্নত করবার জন্যই লিখেছি তা নয়, কোন পাণ্ডুলিপিতে হাতের লেখা খারাপ হলেও বদলেছি, কাটাকুটি হলেও বদলেছি। শৈলজানন্দের হাতের মুক্তার মতো হস্তাক্ষরে সুন্দর সাজানো পাণ্ডুলিপি, অচিন্ত্যকুমারের চোখ-জুড়ানো পাণ্ডুলিপি দেখে এমনি সুন্দর পাণ্ডুলিপি রচনার উপর খুব একটা ঝোঁক ছিল আমার। পেন্সিলে লেখা খাতা থেকে আমার বাল্যকালের সেই পুরানো নিব লাগানো কলমে লিখতাম। রেডইঙ্ক নিব ছিল আমার প্রিয় নিব। কলমটি আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়া কলম। কলমটি ফেটে গেল শেষটায়;

তাতেও তাকে ছাড়ি নি। এক টুকরো রুপোর পাতের বাঁধন দিয়ে ব্যবহার করেছি। সেটি আজও আছে। প্রথম ফাউণ্টেন পেন কিনেছিলাম ১৩৩৮ সালে।

'মেলা' গল্প লেখা হল, পড়ে থাকল! কোথায় পাঠাব? "ভারতবর্ষে" "ডাইনীর বাঁশী" রয়েছে। "বঙ্গশ্রী"-সম্পাদক ছ মাসের আগে লেখা ছাপবেন না। "কল্লোল" "কালিকলম" উঠে গেছে। "প্রবাসী"তে পাঠাতে ভরসা নেই, সেখানে লেখা দেড় বছর ধরে সম্পাদকের বিবেচনাধীন থাকে। তার উপর এই গল্পটিতে মেলার পটভূমিতে উল্লাস ও উচ্ছৃঙ্খলতায় উন্মত্ত মানুষের অবদমিত প্রবৃত্তি যে নগ্ন মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছে তাতে "প্রবাসী"র পৃষ্ঠায় এ গল্পের স্থান হতেই পারে না। এর মধ্যে হঠাৎ কাজের ঢেউ এসে টান দিলে। কাছাকাছি কয়েকখানি গ্রামে লাগল মহামারী। গলায় জলের বোতল ওষুধের ঝোলা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ফাল্গুন গেল, চৈত্রেরও কয়েকদিন কেটে গেল এরই মধ্যে। তারপর আবার বেকার। আমাদের সম্পত্তিটুকু দেখাশুনার ভার তখন ছোটভাইয়ের উপর দিয়েছি। মেজভাই বাড়িতেই প্রেসটা নিয়ে গোছগাছ করছে। আমি নিতান্তই বেকার। মাঠে মাঠে দিনে দুপুরে বেরিয়ে পড়ি, বেকারত্ব অসহ্য হয়ে উঠলে। তখন আরও একটা প্রবল আকর্ষণ আমায় টানছিল। আমার মেয়ে বুলুর স্মৃতি আমাকে পরলোক রহস্যের প্রতি আকৃষ্ট করে তুলছিল। শ্মশানে গিয়ে বসে থাকতাম। রাত্রে বিছানা ছেড়ে উঠে বুলুর খেলার স্থানগুলির অদূরে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকতাম। ব্যর্থ প্রতীক্ষায় শেষ রাত্রি পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থেকে আবার নিঃশব্দে এসে বিছানায় দেহ এলিয়ে দিতাম।

এরই মধ্যে একদা "বঙ্গশ্রী" আপিস থেকে কিরণের চিঠি এল, কয়েকটা মামুলী কথার পরই সে লিখেছে, 'কই, "ভারতবর্ষে" তোমার "ডাইনীর বাঁশী" বের হল কই? এত দেরি করছে কেন? তার চেয়ে যদি হুকুম কর, তবে "ভারতবর্ষ" আপিস থেকে ওটা ফিরে এনে "বঙ্গশ্রী"তে বৈশাখেই বের করে দি। সজনীবাবু উৎসুক হয়ে আছেন।'

সেদিন আরও একখানি পত্র ছিল। রিপ্লাই কার্ডে "ভারতবর্ষে" পত্র লিখেছিলাম, সেই রিপ্লাই কার্ড স্বর্গীয় জলধর দাদার সংবাদ বহন করে এনেছে—'ভায়া' তোমার গল্প বৈশাখেই বের হচ্ছে।'

কিরণকে পত্র লিখে দিলাম—"ডাইনীর বাঁশী" বৈশাখে "ভারতবর্ষে" বের হচ্ছে। তোমাদের জন্য নতুন গল্প দিতে পারি।' সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পেলাম—'আজই ডাকে দাও।' ডাকে না দিয়ে নিজেই রওনা হলাম কলকাতা।

কলকাতায় পেঁছে তৃতীয়বার গল্পটি লিখলাম। "বঙ্গশ্রী" আপিসে যেতেই কিরণ হাত পাতলে—আনছুস? দে।

কিরণ নানা জেলার ভাষা জানত।

লেখা দিলাম। কিরণ পড়লে, পড়ে মুখ ভার করে বললে—এ যে ভয়ানক কাণ্ড করেছিস। তোর সাহস তো খুব। "শনিবারের চিঠি"র সম্পাদক সজনী দাসের হাতে এই লেখা দিবি?

সম্পাদক নিজেই দেখা দিলেন। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে দেখেই মোটা নাকটা ফুলিয়ে বললেন—কই লেখা? এইটে নাকি? বলেই তুলে নিয়ে চলে গেলেন ঘরের মধ্যে। আমি পলায়ন করলাম। সন্ধ্যার পর মাস-শ্বশুরের বাড়িতে ফিরেই শুনলাম টেলিফোনে কেউ আমাকে ডেকেছিল। কে তা অবশ্য তাঁরা নাম জিজ্ঞাসা করেন নি। তবে সংবাদ আছে, আমি যেন সন্ধ্যার পর থাকি।

সন্ধ্যার পর কিরণ এল। উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে—সজনীকান্ত বললে কি জানিস?

উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রশ্ন করলাম—আগে বল গল্প ফেরত দিলে কি না।

—ছাপা হচ্ছে। প্রেসে চলে গেছে। কিন্তু এইটে আর কি কথা। আসল কথা শোন। সজনী দাস বললে—এই লোকটি বাংলা সাহিত্যে অনেক কথা—এ যুগের লেখকদের সকলের চেয়ে বেশী কথা—বলতে এসেছে। এঁর পুঁজি অনেক। এনেছে অনেক।

"মেলা" গল্পের শেষ একটি প্যারা সজনীকান্ত বাদ দিলেন। প্রথমটা মন খুঁতখুঁত করেছিল। কিন্তু ছাপা হওয়ার পর পড়ে সজনীকান্তের শিল্পবোধের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। বৈশাখেই (১৩৩৮) "ভারতবর্ষে" এবং "বঙ্গশ্রী"তে "ডাইনীর বাঁশী" এবং "মেলা" একসঙ্গে প্রকাশিত হল। "মেলা" গল্পের বাস্তব পটভূমির চিত্র সম্পর্কে অনেকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন।

এর পরই লিখে ফেললাম আর-একটি গল্প। "রাজা, রাণী ও প্রজা"। গল্পটি একটি মিষ্টি গল্প। সুখপাঠ্যও বটে। কিন্তু "মেলা" বা "ডাইনীর বাঁশী"র মতো নয়। সজনীকান্ত শুনলেন, প্রশংসা করলেন, কিন্তু বললেন—এখন আর "বঙ্গশ্রী"তে পুজোর আগে লেখা নিতে পারব না। দমে গেলাম। তবে আর ভালো লিখেই বা ফল কি? এই সময়কার একটি ঘটনা মনে পড়ছে। গল্পটি পকেটে নিয়ে গেলাম শৈলজানন্দের বাড়ি। অপরাহ্ন বেলা, শৈলজানন্দ বের হচ্ছেন। আমাকে দেখেই বললেন—একটু কাজে যাচ্ছি ভাই। সেখান থেকে বেরিয়ে পথে পথে ঘুরছি—হঠাৎ দেখা

হল পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে। পবিত্রকে গল্পটি শোনবার জন্যে ধরলাম। পবিত্র বললেন—এখন তো একটি সভায় যাচ্ছি ভাই। বাগবাজারে কর্মযোগী রায়ের বাড়িতে সাহিত্যসেবক সমিতির বৈঠক। সেখান থেকে ফিরে শুনব। চলুন না সেখান সেরে একসঙ্গে ফিরব।

অনিমন্ত্রিত হয়ে যাব? মনটা খুঁতখুঁত করে উঠল। পরমুহূর্তেই সে খুঁতখুঁতুনি ঝেড়ে ফেলে চলে গেলাম। অনেক সাহিত্যিকদের দেখতে পাব এ সৌভাগ্যের কাছে অনিমন্ত্রণের লজ্জা ছোট হয়ে গেল। কোন পার্থিব বস্তু পাবার লোভে যাচ্ছি না; যেখানে প্রাপ্তি অপার্থিব—পুণ্যময়, সেখানে নিমন্ত্রণের প্রতীক্ষা কেন? ওতে নিমন্ত্রণ লাগে না, কোথাও নাম-গান হওয়ার সংবাদ পেলেই ভক্তকে যেতে হবে। না যাওয়াটাই পাপ। চলে গেলাম।

অনেককেই দেখেছিলাম। সকলের নাম মনে নেই। মনে আছে অগ্রজতুল্য শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে, স্বর্গীয় প্যারীমোহন সেনগুপ্তকে এবং স্বর্গীয় কর্মযোগী রায়কে। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ই সেদিন সভাপতি। বৈঠকে গল্প পড়বেন স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন। একান্তে পবিত্রের অন্তরালে বসে রইলাম। পবিত্র দু-চার জনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন কিন্তু তাঁরাও উৎসাহিত হলেন না, আমিও না। সময়টা গরমের সময়। আমি ঘামতে শুরু করলাম। হঠাৎ সভায় অঘটন ঘটল। শ্রীযুক্ত রমেশবাবু এসে পৌঁছুলেন না। শেষে কয়েকজন কবিতা পড়ে আসর শুরু করলেন। এমন সময় রমেশবাবু ব্যস্ত হয়ে এসে সভাপতিকে মৃদুস্বরে কয়েকটি কথা বলেই আবার চলে গেলেন। শ্রীযুক্ত উপেনদা বললেন—কবিরাজ-সাহিত্যিক বিপন্ন, তাঁর একটি রোগীর অবস্থা অকস্মাৎ মন্দ হয়ে পড়েছে। এক্ষেত্রে আমাদের দাবি তিনি রাখতে পারছেন না। রসায়নের দাবি রসের দাবিকে আজ ছাড়িয়ে গেছে। সুতরাং—

সভাভঙ্গের কথাই তিনি বলতে চাইলেন; কিন্তু মুখ ফুটে না বলে ইঙ্গিতেই জানিয়ে দিলেন। সকলেই বেশ একটু ক্ষুণ্ণ হল। তাই তো!

পবিত্র সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন—আমি কিন্তু আপনাদের অনুমতি হলে রসের দাবি মেটাতে পারি। আমার সঙ্গে তারাশঙ্কর রয়েছে, সে আমাকে তার নতুন লেখা গল্প শোনাতে এসেছিল। বৈঠকের সময় হওয়ায় শোনা হয় নি। সঙ্গে ধরে এনেছি, বৈঠকের শেষে বাড়ি ফিরে শুনব। গল্প ওর পটেটেই আছে।

সভার অবস্থা তখন অকস্মাৎ জাহাজডুবিতে খাদ্যসম্ভার জলমগ্ন হওয়ায় রেশনিং ফেল করা ফুড ডিপার্টমেণ্টের মতো! এক্ষেত্রে চাল গমের স্থলে

রাঙা আলু কি মানকচুই সই। রেশনিং চালু রাখা নিয়ে কথা। সুতরাং কর্তৃপক্ষ উৎসাহিত হয়ে অভয় দিয়ে বললেন—বের করুন গল্প। ৺কর্মযোগী রায়ের বাড়িতে বৈঠক, তিনি এসে আমার পাশে বসে সরাসরি পকেটে হাত পুরে দিলেন। আমি কিন্তু খুব লজ্জিত হয়েছিলাম। মনে হয়েছিল আমার সাহিত্যিক হ্যাংলামিটা যেন সকরুণভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে, শৈলজানন্দের (বোধ হয় শৈলজানন্দেরই) গল্পের নায়কের হ্যাংলামির মতো। "এক দরিদ্র কেরানী কোন নিমন্ত্রণে গিয়েছিল। সেখানে কারও কিছু মূল্যবান বস্তু হারানোর জন্যে সকলের পকেট তল্লাশ করতে গিয়ে কেরানীর পকেটে পেলেন অনেকগুলি মিষ্টান্ন। দরিদ্র কেরানী গোপনে ছেলেদের জন্যে নিয়ে যাচ্ছিল।"

যাই হোক, আসরে পড়তে হল গল্পটি। পড়া শেষ হলে সমালোচনা আরম্ভ হল। একজন কঠোর সমালোচনা করলেন। একটি চরিত্রের পরিণতি নিয়ে সমালোচনা। তিনি প্রমাণ করলেন—এই চরিত্রের পরিণতি এই হতেই পারে না। সুতরাং গল্পটি একান্তভাবে ব্যর্থ। এই সমালোচনার পর আর কেউ সমালোচনা করতে চাইলেন না। অর্থাৎ অস্ত্রাঘাত করবার আর স্থান ছিল না। আমি চুপ করেই বসে রইলাম। ভাবছিলাম বাস্তবে এবং সাহিত্যে এত পার্থক্য কেন? যে চরিত্র নিয়ে এত কথা সে চরিত্র বাস্তব। "রাজা, রানী ও প্রজা" গল্পের রাজা আমি, রানী আমার গৃহিণী, প্রজা যে সে রাধাবল্লভ, সেও আমার মতো বাস্তব সত্য; ঘটনাটিও পনেরো আনা সত্য। সমালোচক বললেন—গল্পটিকে মিষ্টি মধুর সুখপাঠ্য করে তোলবার জন্যই চরিত্রটিকে নষ্ট করা হয়েছে। সুতরাং গল্পটি মিষ্টি হয়েছে সুখপাঠ্যও হয়েছে। তবে সাহিত্যে অচল।

এইবার সভাপতি শ্রদ্ধেয় উপেনদা তাঁর ভাষণ শুরু করলেন। আমার মাথা তখন মাটিতে নুয়ে পড়েছে, বার বার নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছি, কেন এলাম? লোককে লেখা শোনাবার জন্য কেন আমার এই ব্যাকুলতা? ঠিক এই মুহূর্তে কানে ঢুকল—'আমার কিন্তু গল্পটি বড় ভালো লেগেছে। গল্পটির সবচেয়ে বড় গুণ, পড়ে বা শুনে সারা অন্তর একটি পবিত্র মাধুর্যে ভরে ওঠে। আর চরিত্রের কথা? মানব চরিত্র আঙ্কিক নিয়মে পরিণতি লাভ করে না। দুই আর দুই চার সব ক্ষেত্রে হয় না। মানুষের চরিত্রে ও যোগফল তিনও হয় পাঁচও হয়। ওতে বিস্ময়ের কথা কিছু নাই। লেখক নূতন কিন্তু তাঁর ভবিষ্যৎ আছে। উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বলেই আমার মনে হচ্ছে।'

তিনি আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যেই বলেন নি। সভার শেষে আলাপ

করে আশীর্বাদ করেছিলেন। সেদিন সভান্তে নির্বাক হয়ে বাড়ি ফিরলাম। পরিপূর্ণ মন নিয়ে। পরের দিন গল্পটি দিয়ে এলাম "ভারতবর্ষে"। "ডাইনীর বাঁশী" ও "মেলা"র জন্যে পারিশ্রমিক দশ এবং পনেরো—পঁচিশ টাকা পেলাম। এবং শৈলজানন্দের সাহায্যে "উপাসনা"য় প্রকাশিত "যোগবিয়োগ" উপন্যাসখানির সর্বস্বত্ব গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্সকে একশো টাকায় বিক্রি করে অনেক আশায় আশান্বিত হয়ে বাড়ি ফিরলাম। মা এবং পিসিমাকে সেই টাকাগুলি দিলাম, বললাম—রথযাত্রায় জগন্নাথ দর্শনে যাবার ইচ্ছার কথা শুনেছিলাম। এই টাকায় তোমরা পুরী যাও। রথের দড়ি টেনে কামনা কর যেন আমার যাত্রা কোনদিন না থামে। ওই টাকার সঙ্গে আমার জীবনের দড়ি জড়িয়ে দিয়ে এস।

সঙ্গে সঙ্গে স্থির করলাম, এইবার যেখানে হোক—মহানগরীর দীন দরিদ্রেরা যেখানে বাস করে সেইখানেই না হয় গিয়ে বাসা নেব। খাওয়ার ভাবনা করি না, তখন পাইস হোটেলের ছড়াছড়ি। দু আনায় রাজভোগ না হলেও কাছাকাছি রাজভোগ। স্থির করে আবার বসলাম লিখতে। লিখলাম 'খড়্গ'। গল্পটি শুরু করে চলে গেলাম রাজনগর, ওখানেই শেষ করব গল্পটি।

আমাদের জেলার প্রাচীন আমলের রাজধানী রাজনগরের ধ্বংসস্তূপের পটভূমিকাটির প্রয়োজন ছিল। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দোতলার একটি অংশ কোন মতে দাঁড়িয়ে আছে। সন্ধ্যাবেলা একটি হ্যারিকেন নিয়ে ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে কোন মতে গিয়ে বসলাম সেই ভাঙা দোতলার ছাদে। অন্ধকার রাত্রে চারিপাশে জমাট-বাধা অন্ধকারের মতো ভগ্নস্তূপ এবং অরণ্যের মতো ঘন জঙ্গল। মধ্যে বিরাট কালীদহ দিঘি। সেইখানে বসে লিখে চলেছি, হঠাৎ আলোটা গেল উলটে, সেটাকে তুলতে গিয়েই অনুভব করলাম ভাঙা বাড়িটা দুলছে, চারিদিকে শাঁক বেজে উঠল। ছাদের উত্তর প্রান্তে খানিকটা ভাঙন ভাঙল। বুঝলাম ভূমিকম্প হচ্ছে। কি করব? স্থির হয়েই বসে রইলাম। কয়েক মুহূর্ত পরে বুঝলাম ভূমিকম্প থেমে গেছে। এবার দেশলাই জেলে আলোটা জ্বাললাম। ওদিকে নিচে তখন ডাকছেন আমার বন্ধু, যাঁর বাড়িতে রাজনগরে অতিথি হয়েছি। তিনি বললেন, নেমে আসুন মশায়! আলো খাতা তুলে নিয়ে উঠলাম। ভাঙা সিঁড়ি, সন্তর্পণেই নামছিলাম, হঠাৎ একটা সিঁড়ির উপর দেখি এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত জুড়ে শুয়ে আছে এক বিষধর। রং দেখে বুঝলাম গোখুরা। স্থির হয়ে শুয়ে আছে, গাঢ় ঘুমে যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু আমি ওকে পার হয়ে যাই কি করে? ভূমিকম্পে ভাঙা দোতলাটাকে খাড়া রেখে ধ্বংসস্তূপে সমাহিত না

করে নিয়তি কি এই একেই পাঠিয়ে দিল শেষে? সর্পদংশনে মৃত্যু অনেক দেখেছি আমি। এক সময় চিকিৎসকের কাজ করেছি। মন্ত্র-তন্ত্র ঝাড়ফুঁক বিদ্যায় নয়। মিহিজামের পি. ব্যানার্জীর লেকিসন ওষুধ রাখতাম। এটি ছিল আমার আর-এক বেকারত্ব বিনাশনের নিমিত্ত বেগার খাটার পথ। সর্পদংশনে বড় যন্ত্রণায় মৃত্যু হয়। কিন্তু কি করব? আলোটা বাড়িয়ে সামনে ধরে রইলাম। আলোকে অর্থাৎ অগ্নিকে ভয় করে সাপ। আলোটা থাকতে ফণা তুলে আক্রমণ করতে পারবে না। পিছন ফিরে ছাদে ওঠাও অসম্ভব। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। নিচে থেকে তাগিদ এল—কি করছেন মশাই?

চীৎকার করে জবাব দিতে সাহস হল না। স্থির হয়েই দাঁড়িয়ে রইলাম। অকস্মাৎ আমার মুখে অদ্ভুত বিচিত্র হাসি ফুটে উঠেছিল। সাপটা জীবন্ত নয়, মৃত। মুখের দিকটা একটা ফাটলের মধ্যে যখন ঢুকেছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে কেঁপেছিল ধরিত্রী; ভূমিকম্পের নাড়ায় ফাটলটা কমে এসে সাপটার মুণ্ডটাকে নিষ্ঠুর পেষণে পিষে চেপে ধরেছে। তাতেই মরে গেছে সাপটা।

এই বিস্ময়কর পরিত্রাণের মধ্যে আমি যেন রহস্যময়ী নিয়তিকে চকিতে কৌতুকপরায়ণার মতোই মিলিয়ে যেতে দেখলাম—তাকে দেখলাম না, তার আঁচলের খানিকটা যেন দুলে উঠে মিলিয়ে গেল। অনুমান করলাম, তার অধরে বিচিত্র মধুর পরিহাসের হাসি।

নেমে এলাম।

উৎকণ্ঠিত বন্ধু বললেন—আচ্ছা বাতিক, কি করছিলেন এতক্ষণ? সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ভাবছিলেন কি?

হেসে সব ঘটনা বললাম। তিনি শিউরে উঠে বললেন—আমারই ভুল, আমারই ভুল, ওখানে ভয়ঙ্কর সাপ। আপনাকে যেতে দেওয়া উচিত হয় নি।

আমি আবারও হাসলাম।

বন্ধু বললেন—ও যা হবার তো হয়েছে। ওদিকে দারোগা এসে বসে আছে বাসায়। খোঁজ করতে এসেছে এখানে আপনি এসেছেন কি জন্যে?

দারোগাটি পূর্বপরিচিত এবং লোকটি ভালো। তিনি বললেন—কালই আপনি এখান থেকে চলে যান। আপনি এসেছেন বিকেলে, রাত্রি আটটায় সাইকেলে আই-বি-র এ-এস-আই এসেছে আপনার পিছনে। দোহা অর্থাৎ সামসুদ্দোহার ভয়ানক নজর আপনার উপর। পারেন তো জেলা ছাড়ুন। নইলে ও আপনাকে রেহাই দেবে না।

দারোগা চলে গেল।

মনে হল এটাও যেন একটা ইঙ্গিত। ওই কাপড়ের আঁচলের খানিকটা যেন এবারও দুলে গেল।

বাড়ি ফিরেই বিছানা-বাক্স বেঁধে রওনা হলাম। একখানি টিন-ছাওয়া কুঠুরি ভাড়া করলাম, অশ্বিনী দত্ত রোড-মহানির্বাণ রোড-মনোহরপুকুর রোডের সঙ্গমস্থলের কাছাকাছি। এসে উঠলাম সেখানে।

জগন্নাথের রথের চাকায় বাঁধা জীবন চলতে শুরু হল। পাকা হয়ে শুরু করলাম সাহিত্যিক-জীবন। ভূমিকা শেষ হয়ে গেল। শেষ হয়ে গেল লাভপুরের জীবন। তখন হিসেব করে মনে হয়েছে—এর পরিণতি ব্যর্থতায়, এর পরিণতি অর্ধাহারে, হয়তো অনশনে, হয়তো বা ক্ষয়রোগাক্রান্ততায় এবং শেষে মানুষের পরিহাসে ও ব্যঙ্গে। কিন্তু তবু আমি থামতে পারি নি। মনে মনে শুধু এই বলেছি, ধন নয় মান নয়—শুধু এইটুকু, যেন মৃত্যুর পর মানুষ একবার স্মরণ করে। আর-একটি কামনা জানিয়েছিলাম। যেন হীন প্রবৃত্তি আমার না হয়। চরমতম অভাবেও যেন প্রতারণা না করি, চুরি না করি। ভিক্ষা না করি! এ কামনার সময় স্মরণ করেছি ভগবানকে।

সাহিত্যিক-জীবনের প্রথম পর্ব সমাপ্ত হয়ে গেল। দ্বিতীয় পর্ব আরম্ভ হল ওই টিনের ঘরে।

তেরো

যে পথে মানুষ অন্তরের প্রেরণায় চলতে চায়, সে পথে চলার মুখে এসে দাঁড়ায় সহস্র বাধা। নিজের কর্মফল—ঘর, সংসার ও সমাজের সহস্র মানুষের আকর্ষণ-বিকর্ষণ, নিজের অতীত কর্মের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অনিবার্যভাবে ওই সহস্র মানুষের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধন করে টেনে নিয়ে যায় তাদেরই সঙ্গে সঙ্গে। সে বন্ধন ছিঁড়ে, সেই শক্তির আকর্ষণ কাটিয়ে যে সরে দাঁড়ায়, চলতে চায় নিজের মনের পথে, জীবনে তাকে সহ্য করতে হয় অনেক! আমাকেও সহ্য করতে হয়েছিল। সে নিয়ে বড়াই কিছু নেই। শুধু চলার পথে এই বাধা-বিঘ্নের ঘাত-প্রতিঘাতে মনের উপর যে প্রভাব পড়েছিল, যার চিহ্ন অবশ্যই আছে আমার রচনার মধ্যে, তাই নির্ণয়ের জন্যই সে কথা বলতে হচ্ছে। এবং আজ পিছনের দিকে তাকিয়ে আমার পায়ের ছাপ আঁকা যে পথ-রেখাটি

দেখতে পাচ্ছি, তার বাঁকগুলিও এই ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত, সে জন্যও বলতে হচ্ছে।

আজ যখন খতিয়ে দেখি তখন দেখি, সে-দিন আত্মীয়-স্বজন, বিশেষ করে শ্বশুরবাড়ির দিক থেকে গঞ্জনা-বাক্যই আমাকে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিল এই বাঁকের ওপারে। নিজের সংসারে গঞ্জনা না থাকলেও নীরব হতাশা ছিল। সে দিয়েছিল খানিকটা ঠেলা। দোষ আজ কাউকেই দিতে পারি না। সত্যই তো, যার হাতে মানুষ কন্যা সমর্পণ করে, যে সন্তানকে অনেক দুঃখ-কষ্টের মধ্যে পালন করে বড় করে তোলে, তার সাংসারিক প্রতিষ্ঠা (যে প্রতিষ্ঠার অন্তত বারো আনা হল আর্থিক এবং বৈষয়িক প্রতিষ্ঠা) দেখতে চায় বইকি মানুষ। সামাজিক প্রতিষ্ঠাও নির্ভর করে এরই উপর। সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠাকামী আমার সম্পর্কে তাদের মনোভঙ্গ তো ভিত্তিহীন ছিল না। যাক ও কথা। সেদিন কিন্তু এ কথা ভেবে দেখবার মতো মন আমার ছিল না—আমি দুঃখ পেয়েছিলাম, বেদনা পেয়েছিলাম, অভিমান করেছিলাম। সে দুরন্ত অভিমান। আজও মনে পড়ে, অভিমানবশে রাত্রে টিনের ঘরের গরমে বিনিদ্র রাত্রে কল্পনা করতাম—লিখে যাব, এমন কিছু লিখে যাব, যার সমাদর আমার জীবনকালে হবে না; অপরিমেয় দুঃখের মধ্যে একদা অকালে জীবন শেষ হয়ে যাবে, অবজ্ঞাত অখ্যাত চলে যাব; তারপর একদা দেশের দৃষ্টি পড়বে আমার লেখার ওপর। সচকিত হয়ে লোকে সন্ধান করবে, জানবে আমার জীবনের ব্যর্থ ইতিহাস; মুখর হয়ে উঠবে। সেই দিন আত্মীয়স্বজন সচকিত হয়ে অশ্রু বিসর্জন করবে। যাকে বলে নিতান্ত অপরিণত বয়সের রোমাণ্টিক কল্পনা, তাই। অভিমান এবং বেদনার আতিশয্যই বোধ করি আমাকে এমনি করে তুলেছিল।

এর সঙ্গে আর-এক কঠিন ধাক্কা আমাকে এই মোড় ফেরায় গতিবেগ যুগিয়েছিল। সেও আমারই কর্মফলের প্রতিক্রিয়ার ধাক্কা। উনিশশো তেত্রিশ সাল বীরভূমের রাজনৈতিক কর্মীদের জীবনে দুর্যোগের কাল; ওখানে তখন পুলিস সাহেব হয়ে এসেছেন মহাধুরন্ধর সামসুদ্দোহা।

সামসুদ্দোহার পরিচয় বঙ্গবিখ্যাত। সুতরাং পরিচয় দেবার প্রয়োজন নেই। মেদিনীপুরে কঠোর দমননীতি চালিয়ে বীরভূমে এসে ফাঁক খুঁজছিলেন। হঠাৎ মিলে গেল ফাঁক। এই সময়ে বীরভূমে নরেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একদল ছেলে গুপ্তসমিতির পত্তন করে কাজ শুরু করেছিল। এর সংবাদ সযত্নে আমার কাছ থেকেও তাঁরা গোপন করে রেখেছিলেন! হঠাৎ লাভপুর ইস্কুলের একটি ছেলের নামে এল একটি প্যাকেট! ঠিক তার দুদিন পরেই তার বাড়ি খানাতল্লাশ হয়ে গেল। বের হল রাজদ্রোহমূলক ইস্তাহার।

ঠিক এই সময়ে লাভপুর থেকে মাইল ছয়েক দূরে হল একটি ছোটখাটো ডাকাতি। ডাকাতদল ফেলে গেল একটি হাণ্টার। কলকাতার আই-বি সে হাণ্টার সনাক্ত করলে শ্রদ্ধাভাজন বিপ্লবী শ্রীযুক্ত বিপিন গাঙ্গুলীর হাণ্টার বলে। ভুল সনাক্ত করে নি তারা। হাণ্টারটি শ্রীযুক্ত বিপিনদা স্নেহোপহার দিয়েছিলেন জগদীশ বলে একটি ছেলেকে। জগদীশ সেই হাণ্টার অন্য কাউকে দিয়েছিল। এদিকে যে ছেলেটির বাড়িতে ইস্তাহার বের হল, সে নির্মম অত্যাচারে অভিভূত হয়ে স্বীকারোক্তি করলে।

আর যায় কোথা! দোহা সাহেব এক বিরাট কনস্‌পিরেসি কেস ফেঁদে বসলেন। যে সব পুলিস কর্মচারীর বিবেকে বাধল, মৃদু আপত্তি যাঁরা তুললেন, তাঁদের সোজা বলে দিলেন সরে পড়তে হবে এই জেলা থেকে; এবং যাঁরা অস্থায়ীভাবে পদোন্নতি পেয়েছেন তাঁদের নিচে নামতে হবে।

যে যেখানে কর্মী ছিল, তাদের জালে ফেলে গুটিয়ে তুলতে বদ্ধপরিকর হলেন দোহা সাহেব। এবং দোহা সাহেবের কিছু নেকনজর আমার ওপর ছিল। আমার পেছনে স্পাই লাগল। হঠাৎ একজনের বাড়িতে একখানা বাজেয়াপ্ত বই পেলেন, তাতে নাম লেখা ছিল T. C. Banerjee অর্থাৎ তিনকড়ি ব্যানার্জি। দোহা সাহেব C-টাকে উড়িয়ে নিয়ে S বলে চালাতে চাইলেন। কিন্তু যার বাড়ি থেকে বের হল, সে C-কে S বলে চালাতে দিলে না। এর পরই ঘটল এক সাংঘাতিক ঘটনা। আমাদেরই গ্রামে আমাদেরই পাড়াতে ঠিক সন্ধ্যার সময় উঠল আর্ত চিৎকার, ডাকাত! ড্যাকাত! নারী-কণ্ঠের আর্তনাদ। সকলেই তখন জেগে ছিল, বেরিয়ে পড়ল, ছুটে গেল, আমি গেলাম সকলের আগে। পাড়ার প্রান্তে এক ভদ্রমহিলা চীকার করেছিলেন। তিনি সম্পর্কে ছিলেন আমার শাশুড়ী। তাঁর মস্তিষ্ক ছিল খুব অসুস্থ। প্রায়ই তিনি চোর-ডাকাত দেখতে পেতেন। চিৎকারও করতেন। আমি জানতাম এঁর একটা মানসিক জটিলতা ছিল, নিজেকে তিনি অনেক টাকার মানুষ বলে মনে করতেন এবং সর্বদাই সেটা প্রচার করে বেড়াতেন। লোকে মুখ টিপে হাসত। রাত্রে ডাকাত দেখা এবং চোর দেখাটা তারই প্রতিবাদ। বাড়িটাকে তিনি শিক দিয়ে খাঁচার মতো করে তুলেছিলেন।

সে দিন কিন্তু গিয়ে দেখলাম ব্যাপার বেশ একটু গুরুতর। ডাকাতে নিতে কিছু পারে নি, তাঁর চিৎকারের ভয়ে পালিয়েছে, কিন্তু তাঁর কপালে দুটি আঘাতচিহ্ন রেখে গেছে। চার আঙুল দূরে দুটি লম্বা ধরনের স্ফীতি। বললেন, ডাকাতটা এসেই বললে—টাকা দে। ভদ্রলোকের ছেলের মতো পোশাক। হাফপ্যাণ্টপরা, মুখে রুমাল বাঁধা।

তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন।

ডাকাতটা বললে—চুপ।

তিনি তবু চুপ করলেন না।

তখন ডাকাতটা একখানা পিঁড়ি তুলে নিয়ে তাঁর কপালে মারলে এবং ছুটে পালিয়ে গেল। ডাকাত একটাই ভিতরে এসেছিল; ত্রিশ-চল্লিশজন ছিল বাইরে।

আমি কিন্তু মুহূর্তে দেখলাম, তিনি মানসিক ব্যাধিতে কল্পনার ডাকাতদের দেখে ভয়ে নিজেই মাথা ঠুকেছেন ওই শিকের ঘেরার গায়ে।

আমি নিজে ওই শিকের ফাঁকাও মেপে দেখলাম। মিলেও গেল। তখন আমাদের থানায় সাব-ইন্‌স্‌পেক্টর ছিলেন এক মান্না উপাধিধারী ভদ্রলোক। এমন শক্ত, সৎ, সাহসী লোক পুলিস বিভাগে কমই দেখা যায়। আমি দাগী রাজনৈতিক কর্মী হলেও তাঁকে অকৃত্রিম বন্ধু মনে করতে দ্বিধা অনুভব করতাম না। মান্না খবর পেয়ে তদন্তে এলেন, তাঁর চোখেও সমস্তটাই কেমন যেন ঠেকল। প্রসঙ্গক্রমে আমাকে তিনি সে কথা বললেন। তখন আমি বললাম, আমার ধারণার কথা। খানিকটা ভেবে দেখলেন তিনি, তারপর আঘাত দুটির ব্যবধান ও শিকের ব্যবধান মেপে মিলিয়ে দেখলেন। এবং আমাকে বললেন, ঠিক ধরেছেন আপনি।

ওদিকে দোহা সাহেব খবর পেয়ে এলেন ছুটে।

মান্নার রিপোর্ট পড়ে চটে উঠে তাঁকে ধমকালেন। বললেন, এটুকু আক্কেল নেই তোমার! এ ডাকাত নিজেই ওই তারাশঙ্কর। সে তোমাকে ইচ্ছে করে ভুল পথে নিয়ে গিয়েছে। এবার ওকে আমি পেয়েছি।

ভদ্রমহিলাটিকে ডেকে তাঁকে বোঝালেন, এ কাজ তারাশঙ্করের। এবং সাড়ম্বরে তাঁকে শুনিয়ে দিলেন, তাঁকে কেমন ভাবে আমি মিথ্যাবাদিনী প্রমাণ করেছি। পরিশেষে খোলাখুলি বললেন, আপনি বলুন, তারাশঙ্করকে সন্দেহ হয় আমার। তারপর দেখুন, আমরা ঠিক বের করে দিচ্ছি।

ভদ্রমহিলাটি ছিলেন বিচিত্র মানুষ। 'আমি অনেক টাকার মানুষ' এই ধারণার জটিলতা বাদ দিয়ে তিনি ছিলেন আশ্চর্য রকমের সত্যবাদিনী এবং দৃঢ় চরিত্রের মানুষ। তিনি শুনে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। বললেন, এত বড় মিথ্যে কথা বলব আমি? বললে যে আমার মুখ খসে যাবে। নরকেও আমার ঠাঁই হবে না। যে-মানুষ গ্রামে পাড়ায় বিপদে-আপদে ভরসা, তার নামে এই কথা বলব আমি? এই মাস পাঁচেক আগে রাত্রি দুটোর সময় আমার নাতনীর প্রসব-বেদনা উঠেছে—প্রথম প্রসব। আমার বাড়িতে কেউ পুরুষ নেই। শীতকাল, কেউ সাড়া দেয় না, আমি কাঁদছি, আমার

কান্নার শব্দ পেয়ে উঠে এল, নিজে গিয়ে ডাক্তার ডেকে আনলে, দাই ডেকে আনলে। সেই মানুষ এই কাজ করেছে—এই কথা আমার মুখ দিয়ে বের হবে? কখনোও না।

এ সত্ত্বেও দোহা আমাকে ছাড়তেন না। কিন্তু সে দিক দিয়ে মান্নার দৃঢ়তা আমাকে বাঁচিয়েছিল। রিপোর্ট বদলাতে বা হুকুমে নিজের ধারণাকে পরিবর্তন করতে মান্না রাজী হন নি।

সব কথাই কানে এল।

মান্না ইঙ্গিতে বলেও দিলেন, বীরভূম থেকে সরে যান আপনি।

কলকাতায় যেখানেই থাকি, বাড়ির দরজায় লোক বসে থাকে। সুতরাং আত্মীয়ের বাড়ি ছেড়ে স্বতন্ত্রভাবে বাসা নিয়ে স্থায়ীভাবে কলকাতায় বসলাম।

ঘর ভাড়া পাঁচ টাকা। লাইট-চার্জ এক টাকা। চা জলখাবার সাত-আট টাকা। খাবার খরচ আট টাকা—এ-বেলা দু আনা, ও-বেলা দু আনা। ট্রাম বাস অন্য খরচ আট টাকা। মাসে তিরিশ টাকা।

মাসখানেক পরেই খবর পেলাম, দোহা সাহেব তদন্ত করছেন আমার গ্রামে, কোন্ আয়ে আমি কলকাতা থাকি। কি আমার জীবিকা?

শঙ্কিত হলাম। গল্প লিখে মাসে ত্রিশ টাকা উপার্জন করি—এ প্রমাণ করা সহজ ব্যাপার নয় বলেই মনে হল। অনেক ভেবে অবশেষে ছুটে গেলাম সজনীকান্তের কাছে। পরিমল গোস্বামী "শনিবারের চিঠি"র সম্পাদক। ওর নিচে সহ-সম্পাদক হিসেবে আমার নামটা দিতে হবে। এবং "শনিবারের চিঠি"র মাইনের খাতায় আমার নাম তুলে তিরিশ টাকা হিসেবে খরচ লিখতে হবে। মাইনে অবশ্য আমি নেব না; এবং কুড়ি টাকার অধিক বলে খরচ দেখানোর বিশুদ্ধ নিয়ম অনুযায়ী যে এক আনার টিকিট লাগে সেটাও আমি দেব। সজনীকান্ত হেসে বললেন, তাই হবে।

এইভাবে আমি "শনিবারের চিঠি"র সহকারী সম্পাদক হলাম।

উনিশ শো তেত্রিশ সালে ওই মনোহরপুকুর সেকেণ্ড লেনে একখানি পাকা-দেওয়াল টিনের ছাউনি ঘর ভাড়া করলাম। সাহিত্যিক-জীবনের ভূমিকা-পর্ব শেষ করে পুরোদস্তুর সাহিত্যিক জীবন শুরু হল। কল-চৌবাচ্চা ছিল না, একটা টিনের গোল জালা কিনলাম, ভোরবেলা কলে জল এলেই বালতি করে রাস্তার কল থেকে জল এনে জালাটা ভর্তি করে রাখতাম। তার আগেই ঘর পরিষ্কার, জল দিয়ে মোছা শেষ হত। আসবাব কিছু ছিল না, একটা দেওয়ালের তাকে সামান্য জিনিস থাকত; মেঝের উপর শতরঞ্চি পেতে, সুটকেস টেনে সেইটিকেই রাইটিং ডেস্ক হিসেবে ব্যবহার করতাম। কিছুদিন পর আলিপুরের আদালতের কাছে পুরানো আসবাবের দোকান থেকে একটা

কুশনমোড়া আধ-সোফা এবং একটা ফোল্ডিং চেয়ার কিনেছিলাম। বিকেলবেলা ফোল্ডিং চেয়ারটা বের করে বাইরে গলি-রাস্তায় পেতে বসে আরাম করতাম। বিড়ি টানতাম। খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা ছিল আরও বিচিত্র। ওখান থেকে রাসবিহারী অ্যাভেনিউয়ের মোড়ে যেতাম চা খেতে। তা সে যতবারই ইচ্ছে হোক না কেন। দুপুর এবং রাত্রির আহারের ব্যবস্থা প্রথম মাসটা করেছিলাম আমাদেরই দেশের কয়েকটি ছেলের সঙ্গে। মনোরঞ্জন সরকার, বাদল, সুধীর আরও দু-তিনজন ভাগ্যান্বেষণে ওইখানেই মহানির্বাণ রোড, অশ্বিনী দত্ত রোড এবং মনোহরপুকুর সেকেন্ড লেনের সংযোগস্থলে কয়লার ডিপো খুলেছিল, তার সঙ্গে ছিল ব্যবসা, মুদিখানা। ওদেরই সঙ্গে মাস-খানেক খাওয়াদাওয়া করেছিলাম, তারপর পাইস হোটেলে।

সকালবেলা গৃহকর্ম সেরে লিখতে বসতাম, বেলা বারোটা নাগাদ স্নান সেরে লেখা বগলে বেরিয়ে যে-কোন পাইস হোটেলে খেয়ে নিয়ে কাগজের আপিসে হাজির হতাম। বেলা আড়াইটে তিনটে নাগাদ প্রথম দিকে "বঙ্গশ্রী" আপিসে এবং সজনীকান্তের "বঙ্গশ্রী"র সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের পর "শনিবারের চিঠি"র আপিসে এসে খান দুই-তিন চেয়ার জুড়ে তারই উপর আধ ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট ঘুমিয়ে নিতাম। বেলা পাঁচটা ছটা পর্যন্ত আড্ডা দিয়ে বাসায় ফিরতাম। যেদিন ফিরতে রাত্রি হত, সেদিন পথেই খাওয়া সেরে ফিরতাম।

এই ঘরখানিতেই কাটিয়েছিলাম প্রায় দেড় বছর। এর মধ্যে অনেকগুলি ভালো গল্প এবং একখানা উপন্যাস লিখেছিলাম। "শ্মশানবৈরাগ্য", "ছলনাময়ী", "মধুমাস্টার"' "ঘাসের ফুল", "ব্যাধি", "রঙীন চশমা", "জলসাঘর", "রায়বাড়ি", "টহলদার", "আখড়াইয়ের দীঘি", "ট্যারা", "তারিণী মাঝি", "প্রতীক্ষা"—আরও দু-চারটি গল্প এখানেই লিখেছিলাম। এই সময় আরও একটি গল্প লিখেছিলাম, "নুটুমোক্তারের সওয়াল"—"দুই পুরুষের" বীজ। আরেকটি গল্প লাভপুরে লিখেছিলাম—"নারী ও নাগিনী", পুজাসংখ্যা "দেশে" প্রকাশিত হয়েছিল। "আগুন" উপন্যাসও এই ঘরে লেখা। তবে "আগুনে"র খসড়া তৈরী করেছিলাম বেহার প্রদেশের মগমা নামক স্থানে; বেহার ফায়ার ব্রিক্‌স্ কারখানায়—আমার পিসতুতো ভাইয়ের বাসায়।

এই সময়টুকুর স্মৃতি আমার পরম রমণীয়। আজ মনে করতে পারি, সে দিন কোন দুঃখই আমাকে স্পর্শ করতে পারত না। এবং দুঃখ আমার আশ্চর্য করুণায় ঘুচিয়ে দিয়েছেন ভগবান। কি বলব? ভগবান ছাড়া কি বলব? একদিনের কথা বলি। সকালে সেদিন জল ধরা হয় নি। স্নান করে এলাম কালীঘাটের গঙ্গায়। সেখানে ঘাটে দেখা হল আমাদের ওখানকার

ষষ্ঠী দাসের সঙ্গে। সেও গেছে গঙ্গাস্নানে, মনিব বাড়ির জন্য গঙ্গাজল নিয়ে যাবে। সে আমায় গঙ্গাস্নান করতে দেখে বিস্মিত হল। ষষ্ঠী চাকরের কাজ করত কালীকিঙ্করবাবুর বাড়িতে। সেখানে যখন দু মাস এক মাস অন্তর এসে দশ-পনেরো দিন কালীকিঙ্করবাবুর বাসায় থাকতাম, তখন সে আমায় দেখেছে। গঙ্গাস্নানে পুণ্যসঞ্চয়ের প্রবৃত্তি আমার নেই সে তা জানত। তাই আমাকে সেই দুপুররোদে গঙ্গাস্নানে আসতে দেখে তার আর বিস্ময়ের অবধি ছিল না। সবিস্ময়েই সে প্রশ্ন করেছিল, আজ আপনি গঙ্গাস্নানে?

আমি হেসে কারণ বললাম।

অপরাহ্নেই ষষ্ঠীচরণ এল আমার ওখানে। সে বললে, আমি দিনান্তে একবার যখন হোক এসে আপনার কাজ করে দিয়ে যাব। মাও আমাকে বার বার বলে দিয়েছেন—ষষ্ঠী, তুই যাস, কদাচ ভুলিস নে।

মা অর্থাৎ কালীকিঙ্করবাবুর স্ত্রী। সত্যকারের মায়ের মতোই সহোদরার মতোই স্নেহে প্রীতিতে তিনি আমাকে ধন্য করেছেন।

ষষ্ঠী এক বেলা নয়, দু বেলাই আসত। কারণ বিকেলবেলা এসে দেখত ঘরদোর পরিষ্কার হয়েই আছে। সে আমি ফেলে রাখতাম না। কখনও কখনও তিন বেলা অর্থাৎ রাত্রি নটার পরও এসে হাজির হত। বসে সুখদুঃখের গল্প বলত, আমি শুয়ে থাকলে কাছে বসেই হাত একখানি বা পা একখানি টেনে তুলে নিত কোলের ওপর। আমার ক্লান্ত অবসন্ন দেহকে সুস্থ করে দিয়ে যেত।

ষষ্ঠীর এই স্নেহ, কালীকিঙ্করবাবুর স্ত্রীর এই স্নেহ আমার অন্তরে ভগবানের প্রত্যক্ষ স্পর্শ দিয়ে গেছে। ও'দের অন্তরের মধ্যে আমি তাঁকে প্রত্যক্ষ করেছি।

এই মনোহরপুকুর সেকেণ্ড লেনে ছিলাম প্রায় বছর দেড়েক। এই বছর দেড়েকেই ষষ্ঠীচরণ আমার যে সস্নেহ সেবা করেছে, সে আমার মনে অক্ষয় হয়ে আছে। ষষ্ঠীর একটি গুণ ছিল, অবশ্য তার ব্যক্তিগত গুণ, সে বসেই দিব্যি আরামে ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা ঘুমোতে পারত বা পারে। ষষ্ঠী ঘরে ঢুকে ঝাড়ু হাতে বসল আমার লেখবার জায়গার পাশে, বার দুই-তিন গলা ছেড়ে সাড়া দিয়ে জানিয়ে দিলে, আমাকে উঠতে হবে। আমি সঙ্গে সঙ্গেই উঠলাম, সে অন্যের বাড়ি চাকরি করে, সুতরাং তার সময়ের মূল্য আমাকে আগে দিতে হবে। উঠে বেরিয়ে যেতাম রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর উপর দাদার দোকানে, নয়তো মনোরঞ্জনদের কয়লার ডিপোতে। আধ ঘণ্টা বা প'য়তাল্লিশ মিনিট পর ফিরে আসতাম, এসে দেখতাম ঘরখানার কিছু অংশ পরিষ্কার করে ষষ্ঠীচরণ এক জায়গায় স্থিরভাবে উবু হয়ে বসে আছে—এক হাতে ঝাড়ু, অন্য হাতখানার

কনুই হাঁটুর উপর, এবং হাতের তালুর উপর মাথাটি ধরে রেখেছে, চোখ দুটি বন্ধ ; কখনও কখনও নাক ডাকতেও শুনেছি। আমি ডাকলে তবে তার ঘুম ভাঙত। এতে সে অপ্রস্তুত হত না। সজাগ হয়ে চটপট কাজ সেরে সে চলে যেত।

মধ্যে মধ্যে সে দুঃখ করে বলত, এ আপনি কি করছেন বাবু ? চাকরি-বাকরি কি ব্যবসা-বাণিজ্য কিছু যদি করতেন, তা হলে—

আমি এসব ক্ষেত্রে কখনও তার সঙ্গে উপহাস করে কথা বলি নি, বা রসিকতা করেও প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ করি নি। সে আমার অকৃত্রিম হিতৈষী। তবে অকপটেই বলতাম, এ ছাড়া অন্য কাজ আমার ভালো লাগে না ষষ্ঠী, মন লাগাতে পারি না।

ষষ্ঠী মধ্যে মধ্যে বলত, আচ্ছা, কি লেখেন আপনি ? মা খুব প্রশংসা করে। বাবুও মধ্যে মধ্যে প্রশংসা করে। শোনান দেখি খানিক আমাকে।

আমি শুনিয়েছি তাকে আমার লেখা। "ছলনাময়ী", "মধুমাস্টার", "রায়বাড়ি", "আখড়াইয়ের দিঘি", "ট্যারা", "তারিণী মাঝি" গল্পগুলি তার ভালো লেগেছিল। এই থেকেই আমি বুঝেছিলাম, বাংলার অতি সাধারণ মানুষদের আমরা আধুনিক লেখক-শ্রেণী যে নির্বোধ বা রসবোধহীন মনে করি, এর চেয়ে ভুল আর কিছু হয় না। যারা রামায়ণ মহাভারত বুঝতে পারে— কৃত্তিবাসী কাশীরামদাসীই শুধু নয়, গদ্য-অনুবাদ—যেগুলির ভাষায় ছাঁকা সংস্কৃত শব্দের প্রাধান্য এবং ভাগবতের কথকতা যারা বুঝতে পারে, তারা একালের লেখাগুলি বুঝতে পারবে না কেন ? দেশের ভাষায় লেখা বিষয় যদি দেশের মানুষই বুঝতে না পারে, তবে সে কেমন লেখা ? প্রবন্ধ নিবন্ধ বুঝতে না পারে, এ কালের বুদ্ধিবাদী হিসাবে লেখায় যে অংশগুলিকে সূক্ষ্ম ও উজ্জ্বল বলে মনে মনে অহঙ্কার বা আত্মপ্রসাদ অনুভব করি, যাকে বলি ফাইন টাচেস্, সেগুলিও তারা হয়তো বুঝবে না ; কিন্তু যে অংশটুকু গল্প, যার আরম্ভ আছে, গতি আছে, এক অনিবার্য পরিণতি আছে, সে তারা অবশ্যই বুঝতে পারবে এবং তার প্রভাবও তাদের উপর পড়বে। আমি দেখছি তাতে তারা অভিভূত হয়, গল্পের পাত্রপাত্রীর সুখে-দুঃখে তারা হাসে, তারা কাঁদে। বুদ্ধিবাদী সমঝদারেরা হলেন চাখিয়ে রসিক ; তাঁরা চেখে চেখে পরখ করেন রসবস্তুর পাকটি ঘন কি ফিকে ; তাঁদের তারিফের দাম অনেক—রসবস্তুর ভিয়েনের কারিগরের পক্ষে। কিন্তু তাঁদের নিজেদের জন্য এ বস্তুর দরকার যৎসামান্য। এঁরা মনের গঠনের দিক থেকে সম্পূর্ণ কাটছাঁট-করা পালিশ-করা কঠিন কষ্টিপাথরের চাকতি, সোনা-রূপার দাগ যাচাই করে মূল্য নির্ণয় করেন, সোনা-রূপার অলঙ্কারে

এঁদের দরকার নেই। সাধারণ মানুষ হল নরম কষ্টিপাথর, সে থেকে বিগ্রহ গঠিত হয়, তাহার পরে এই সোনা-রূপার অলঙ্কার।

এই সাধারণ মানুষের মধ্যেই রসপিপাসা সত্যকারের তৃষ্ণা। রসিক জনের তৃষ্ণা নিজের চিন্তার মধ্যেই খোঁজে পরিতৃপ্তির পানীয়। এদেশের বড় লেখকেরা অন্যের বই কদাচিৎ পড়েন। সাধারণ মানুষেরাই সাহিত্যের সত্যকারের পাঠক।

বাংলা দেশে এই পাঠকদের সঙ্গে লেখকদের মধ্যে একটা দুস্তর ব্যবধান রচিত হয়েছে ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে। আমাদের লেখকেরা ইংরাজিতে ভেবেছেন, তার পর বাংলায় তর্জমা করেছেন। এবং আমরা যখন লিখেছি তখন ইংরাজি-জানা শিক্ষিত জনসাধারণের কথাই ভেবেছি। এদেশের মাটির সঙ্গে প্রাচীন কাল থেকে এ কাল পর্যন্ত সাধারণ মানুষের চিন্তাধারা যে ভাবে যে ভঙ্গীতে মাটির বুক চিরে বয়ে এসেছে, সেই ধারা বা ভঙ্গীতে ভাবি নি। ইংরাজি বা ইউরোপীয় সংস্কৃতির স্রোতোধারা থেকে ড্যাম বেঁধে, সোজা লাইন টেনে ক্যানেল কেটে সেই জল ঢেলে দিতে চেয়েছি এ দেশের মাটির উপর। সমতল শহরের বুকে সে জলের ধারা এসেছে, কিন্তু অসমতল ভূ-প্রকৃতি পল্লীবাংলার মধ্যে তাকে নিয়ে যেতে পারি নি। প্রয়োজনও মনে করি নি।

এ সব মানুষ সর্বাগ্রে চায় গল্প। আমরা সর্বাপেক্ষা প্রকট করতে চেয়েছি তথ্য। গল্প বা, তার মধ্যে একটি স্বাভাবিক পরিণতির ছেদ আছে। সেই স্বাভাবিক পরিণতির আগেই অসমাপ্তির মধ্যে ইঙ্গিত টেনে ছেড়ে দেওয়াটাই আমাদের আধুনিক আর্টের বিশিষ্ট লক্ষণ। সঙ্গীত-শিল্পেও গায়ক গান শেষ যেখানে করেন, সেখানটা কলির শেষ শব্দ নয়; মধ্যস্থলেই বিরতির ছেদটিতে ছেড়ে দেন। কিন্তু সম্পূর্ণ গানটি তার পূর্বেই গাওয়া হয়ে যায়। আমার জীবনে যা উপলব্ধি তাতে গল্পের মধ্যেও গল্পটি এমনি সম্পূর্ণভাবে বলার আগেই ইঙ্গিত দিয়ে গল্পকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য সাধারণ মানুষ তৃপ্তি পায় না। অসাধারণ মানুষ যাঁরা তাঁরা আমার নমস্য তাঁদের কথা বাদ দিয়েই বলেছি। তবে একজন অনন্যসাধারণ ব্যক্তি আমাকে যা লিখেছিলেন বা দেখা হলে বলেছিলেন, তাতে আমায় ধারণা জোর পেয়েছিল, বেগ পেয়েছিল। সেই কথাই বলছি।

এর কিছুদিন পরই আমার দুখানি বই প্রকাশিত হল। "রাইকমল" এবং গল্পসংগ্রহ "ছলনাময়ী"। "রাইকমল" প্রকাশিত হল রঞ্জন প্রকাশালয় থেকে, অর্থাৎ সজনীকান্তের প্রকাশভবন থেকে। একটি বিচিত্র ঘটনার মধ্যে সজনী-কান্তের সঙ্গে লেখক-প্রকাশক সম্পর্ক স্থাপিত হল। "বঙ্গশ্রী" আপিসে

আমার খোঁজে একদিন হঠাৎ এল এক দপ্তরী ; পরিচয় দিলে, 'আমি "চৈতালী ঘূর্ণি"র দপ্তরী। সাবিত্রীবাবুর "উপাসনা"র কাজ করতাম। আমি "চৈতালী ঘূর্ণি"র ফর্মা আর রাখতে পারব না। একশো বই বেঁধে দিয়েছি দেড় বছর দু বছর আগে। তার কিছু টাকা আমি পাব। আর বাকি ফর্মাগুলি মলাট না দিয়ে বেঁধে রেখেছি, তার টাকা পাব। আপনি আমার টাকা মিটিয়ে বইগুলো নিয়ে নিন। গুদামে আমার জায়গা নেই। এ বই আমি রাখব না। না নিলে পুরনো কাগজের দরে বেচে দেব ফুটপাথের হকারদের।'

আমার পায়ের তলায় কাঠের মেঝে। ধর্মতলা স্ট্রীটে পুরানো আমলের বাড়ির সিঁড়ি এবং সিঁড়ির পর দরদালানের মতো অংশটির মেঝেটিও কাঠের, সেই কাঠের উপর দাঁড়িয়ে ছিলাম, সে কথা মনে রইল না। মনে মনে বললাম মা ধরণী, দ্বিধা হও, আমি তোমার বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে এ লজ্জা থেকে নিষ্কৃতি পাই। মন্দকবি যশপ্রার্থীর সমাধি হয়ে যাক!

'বাবু! কি বলছেন বলুন?'—কণ্ঠস্বর সেই দপ্তরীর।

আমি কি উত্তর দেব খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আমার কাছে গোটা আট-দশ টাকা সম্বল। কে আমাকে এখানে টাকা ধার দেবে? পৃথিবীটা কালো হয়ে গেল চোখের উপর।

এমন সময় হঠাৎ শুনলাম, ভারী পায়ের জুতোর শব্দ। আরও লজ্জায় মাথা নুয়ে গেল। সজনীকান্তের পায়ের শব্দ অনুমান করতে ভুল হয়নি। সঙ্গে সঙ্গে অনুমান করলাম, এ ঘটনা জেনে "শনিবারের চিঠি"র সম্পাদক সজনীকান্তের অধরপ্রান্তে ঈষৎ ব্যঙ্গ হাস্য খেলে যাবে। তিনি সেই হাসি হেসে একবার বক্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে চলে যাবেন। সজনীকান্ত দাঁড়ালেন থমকে, জিজ্ঞাসাও করলেন, 'কি হয়েছে? কি?'

এমন প্রশ্ন করবার জন্য সজনীকান্তের একটি রূঢ় কন্ঠস্বর আছে। এর উত্তরে আমি কিছু বলতে পারি নি; বলেছিল ওই দপ্তরী। সমুদয় কথা বলে সে সজনীবাবুকেই সালিশ মেনেছিল—'আপনিই বলুন বাবু, এই বই রেখে কি করব আমি? দেড় বছরে—'

তাকে কথা শেষ করতে দেন না সজনীবাবু, ওই রূঢ় কন্ঠস্বরে প্রশ্ন করেছিলেন, 'কত? কত টাকা পাবে তুমি?'

'বোধ করি ছাপ্পান্ন টাকা কয়েক আনা'—দাবি জানিয়েছিল দপ্তরী।

সঙ্গে সঙ্গে সজনীকান্ত বুক-পকেট থেকে ব্যাগ বের করে তার হাতে ছখানি দশ টাকার নোট দিয়ে বললেন, 'এই নাও তোমার টাকা। বই সমস্ত আমার "শনিবারের চিঠি"র ঠিকানায় তুলে দাও। বাকিটা মুটে ভাড়া রইল। বেশি লাগলে দেব।' বলেই আর দাঁড়ালেন না, ভারী পায়ে শব্দ তুলে কাঠের

সিঁড়ি ভেঙে নেমে গেলেন। আমি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। তার কিছুক্ষণ পর চোখে জল এল। বিস্ময়েরও অবধি রইল না। সজনীকান্তের মুখের চেহারায়, নাকের গড়নে, বড় চোখের দৃষ্টিতে এমন একটা কিছু আছে যাতে তাঁকে অত্যন্ত রূঢ় নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ বলে মনে হত। তার উপর "শনিবারের চিঠি"তে তাঁর কলমের মুখে যে নিষ্ঠুর যন্ত্রণাদায়ক সমালোচনা বের হয়, তাতে তাঁর প্রকৃতি-নির্ণয়ে মানুষ প্রায় নিঃসন্দেহেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। বিস্ময় এই কারণেই। যে মানুষকে ভাবলাম পাথর, তার মধ্যে কোথায় ছিল এই উদারতার নির্ঝর! উদারতাই বলব। প্রীতি বলব না। সেদিন তিনি আমার প্রতি ব্যক্তিগত প্রীতিবসে এই কাজ করেন নি। ব্যক্তিগত হিসাবে হয়তো অনুগ্রহবশতই করেছিলেন। কিন্তু সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের মর্যাদা রাখবার জন্য এর মধ্যে একটি সুনিশ্চত সসম্ভ্রম উদারতা ছিল, এ কথা আমি শপথ করে বলতে পারি। একা আমি নই; আমাদের সময়ের আরও অনেকে এইভাবে তাঁর উদারতায় উপকৃত হয়েছেন। তার দলিল দেখেছি আমি, থাক এ কথা এইখানেই। সজনীকান্ত এই ভাবেই হয়েছিলেন আমার প্রকাশক।

কিছুদিন পর "রাইকমল" আমি নিজেই টাকা খরচ করে ছাপলাম। সজনীকান্তই হলেন আমার প্রকাশক। প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদপটে নামটি লিখে দিয়েছিলেন শিল্পী অরবিন্দ দত্ত। এর কিছুদিন পর বরেন্দ্র লাইব্রেরির বরেন্দ্র ঘোষ মশায় আমার প্রথম গল্পসংকলন প্রকাশ করলেন—"ছলনাময়ী", "মেলা", "সন্ধ্যামণি" এমনি করে দশটি গল্পের সংকলন। পাঁচশোর সংস্করণ। এমনিই দিতে হল। গল্পের বই, তাও আমার মতো নতুন লেখকের গল্পের বই টাকা দিয়ে কিনে ছাপাবার মতো বইয়ের বাজার তখন ছিল না। যাই হোক, বই দুখানি সমালোচনার জন্য পাঠানো হল কাগজে কাগজে। দু-একটিতে বের হল, অধিকাংশ কাগজে বেরই হল না। চার-পাঁচ লাইনের সমালোচনা—লেখকের সম্ভাবনা আছে, আশা আছে।

কিছু দিন পর হঠাৎ—হঠাৎ নয়, মনে মনে আকাঙ্খা ছিল কিন্তু সাহস হত না; আকাঙ্খা হত কবিগুরুর কাছে বই পাঠাই। তিনি কি বলেন, দেখি। কিন্তু সাহস হত না। ইতিমধ্যেই তখন চারিদিকে আধুনিক লেখকমহলে আমার সম্পর্কে আলোচনা হতে শুরু হয়েছে, অবহেলা করবার উপায় ছিল না, কারণ বড় কাগজে তখন আমার গল্প স্থান পাচ্ছে নিয়মিত। কিন্তু আলোচনা আপনাআপনি স্বাভাবিকভাবেই আরম্ভ হয়েছে। তাতে এই কথাই উঠেছে যে গল্প লেখে বটে, জমাটও বটে, কিন্তু বড় লাউড, অর্থাৎ স্থূল। সূক্ষ্মতার অভাব আছে। এই সমালোচনা শুনে রবীন্দ্রনাথের দরবারে বই পাঠাতে

গিয়েও পিছিয়ে আসতাম। হঠাৎ একদিন এই দুর্বলতা জয় করে ফেললাম। দুখানি বই রেজেস্ট্রী করে পাঠিয়ে দিলাম তাঁর কাছে। আর পাঠালাম শরৎচন্দ্রের কাছে। বোধ করি এক সপ্তাহ পরেই একদিন একখানি বিচিত্র খামের চিঠি পেলাম। সাদা খামের এক কোণে 'র' অক্ষর লাল কালিতে ছাপা। ঠিকানায় লেখাও রবীন্দ্রনাথের হাতের ; বুকটা ধড়াস করে উঠল, হাত কাঁপতে লাগল। গলা শুকিয়ে গেল। তখন আমি লাভপুরে রয়েছি। লাভপুর পোস্টাপিসের পূর্বদিকে কল্কে ফুলের সারিবন্দী গাছ বেশ কুঞ্জবনের মতো ঘন এবং নিরালা। সে নিরালায় গিয়ে চিঠিখানি খুললাম। পড়লাম, সেই বহু-আকাঙ্খিত হাতে লেখা—

"কল্যাণীয়েষু,

আমার পরিচরবর্গ আমার আশেপাশে উপস্থিত না থাকায় তোমার বই দুখানি আমার হাতেই এসে পৌঁচেছে কিন্তু তাতে পরিতাপের কোন কারণ ঘটে নি। তোমার "রাইকমল" আমার মনোহরণ করেছে।"

বুকখানা আবার ধড়াস করে উঠল।

"রাইকমল" মনোহরণ করেছে! আনন্দে উল্লাসে আমার চিত্ত যেন আকাশলোকে সঞ্চরণ করে বেড়িয়েছিল সেদিন। একটি কথাও ছিল না, যা নাকি নিন্দার ইঙ্গিত বহন করে। পরিশেষে লিখেছিলেন, "তোমার অপর বইখানি সময়মতো পড়ব।" কবি তখন কোনও বিশেষ কাজে কলকাতা যাচ্ছেন। বোধ হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন-উৎসবে অতিথি হয়ে যাচ্ছেন। আমিও এলাম কলকাতায়। কয়েকদিন পরই এলাম। ঠিক মনে পড়ছে না কার কাছে, তবে কারও কাছে শুনলাম, তিনি বিচিত্রা ভবনের আসরে এক নতুন গল্পলেখকের বিশেষ প্রশংসা করেছেন। বলেছেন নাকি, এর সম্বন্ধে প্রত্যাশা পোষণ করেন তিনি। আমি চঞ্চল হলাম। কিন্তু কারও কাছেই সে কথা প্রকাশ করলাম না। কে জানে, কার কথা বলেছেন।

দিন দশেক পর বাড়ি এলাম, ব্যগ্রভাবে খোঁজ করলাম—চিঠি? আমার চিঠিপত্র আসে নি?

এসেছে কয়েকখানি। কিন্তু তার মধ্যে ঈপ্সিত পত্রখানি ছিল না। এবার পত্র লিখলাম। সেই পত্রের মধ্যে লিখলাম, "রাইকমল সম্পর্কে আপনি আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছেন কিনা জানি না। কারণ আমার সমসাময়িকেরা আমার লেখাকে বলেন—স্থূল।"

ঠিক চারদিন পরই কবির চিঠি পেলাম। এবার পত্রখানি বড়। তার আরম্ভটাই হল—"তোমার কলমের স্থূলতার অপবাদ কে বা কারা দিয়েছেন জানি না, তবে গল্প লিখতে বসে যারা গল্প না লেখার ভান

করে, তুমি যে তাদের দলে নাম লেখাও নি, এতেই আমি খুশী হয়েছি।"

এরপর "ছলনাময়ী" সম্পর্কে কথা। গল্পগুলির প্রসংসা করেছেন মুক্তকণ্ঠে।

এর কিছুদিন পরই তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়। সেই কথা এখানে বলব। এরপরই তাঁর কাছ থেকে আহ্বান এল।—দেখা কর।

মাসটা চৈত্র মাস, সে আমার মনে রয়েছে। 'প্রবাসী'তে "অগ্রদানী" গল্প প্রকাশিত হয়েছে।

আমি গেলাম কিন্তু গেঁয়োর মতোই। তাঁকে কোনো কথা জানিয়ে গেলাম না। একদা বিকেল পাঁচটায় শান্তিনিকেতনে হাজির হলাম। কোথায় যাব? সরাসরি রবীন্দ্রনাথের বাসভবনের উঠানে গিয়ে হাজির হব তীর্থযাত্রীর মতো? তাও ভরসা পেলাম না। স্বর্গত কালীমোহনবাবু আমাকে স্নেহ করতেন কিন্তু তিনি শ্রীনিকেতনে থাকেন ধারণায় সে অভিপ্রায় ছেড়ে গেস্ট হাউসে গিয়ে হাজির হলাম। নূতন তারাশঙ্করের আবির্ভাবে তখনও নামের আগে শ্রী ছাড়ি নাই বটে তবে দেহশ্রী আমাকে জেলের মধ্যেই ছেড়ে পরবর্তীকালের শ্রীহীন নামের ভূমিকা রচনা করে রেখেছে তখন থেকেই। পরিচ্ছদেও মূল্যগৌরব ছিল না। গেস্ট হাউসে থাকবার অভিপ্রায় অধ্যক্ষকে জানাবামাত্র আমাকে প্রশ্ন করলেন—কি অভিপ্রায়ে এসেছি।

বললাম—কবির দর্শনপ্রার্থী হয়ে এসেছি। তাঁর সঙ্গে দেখা করব। ভ্রূ কুঞ্চিত করে ওখানকার অধ্যক্ষ বললেন—তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—দেখা তো হবে না।

বললাম—সে ব্যবস্থা আমি করে নেব।

—কিন্তু গেস্ট হাউসে তো জায়গা হবে না। রাত্রে কলকাতা থেকে বিশিষ্ট লোকেরা আসবেন।

—তা হলে? প্রশ্নটা করেই ভাবলাম—যাই তা হলে শ্রীনিকেতন অথবা বোলপুর।

এর উত্তরে অধ্যক্ষ আমার প্রতি সহানুভূতিপরবশ হয়েই বললেন—তা হলে এক কাজ করতে পারেন। এ বাড়ির ওপাশে পান্থনিবাস নামে একটি থাকবার জায়গা আছে সেখানে থাকতে পারেন।

সেই পান্থনিবাসেই আস্তানা পাতলাম। তখন সন্ধ্যে হয়-হয়। তিনখানা ছোট ঘর নিয়ে পান্থনিবাস। মাঝের ঘরখানা ওরই মধ্যে বড়। বাকি দুখানায় দুজনা খুব জোর তিনজনের ঠাঁই হয়। আমি একখানা ছোট ঘরেই বিছানা রেখে চায়ের দোকানের খোঁজে বের হলাম। দেখা করব কাল

সকালে। খানিকটা মুশকিলেও পড়েছি। খবর দিয়ে আসি নি এবং দেখা করবার হুকুমনামাও আনতে ভুলেছি। ভাবছি কি করে খবর পাঠাই। চা খেয়ে ফিরে এসে দেখি পান্থনিবাস গুলজার। বহরমপুর থেকে বরাবর বাইসিক্লে চারটি দুঃসাহসী ছেলে এসে হাজির হয়েছে। বাসা পেয়েছে বড় ঘরটায়। তারা হৈ চৈ জুড়ে দিয়েছে। আমার সঙ্গে আলাপ করলে। বড় ভালো লাগল ছেলে কটিকে। বললে, কবির সঙ্গে দেখা করবে। সে যে করেই হোক! চেঁচামেচি করবে, না খেয়ে পড়ে থাকবে; পরিশেষে বললে পরিশেষে গাছের ডালে উঠে ঝাঁপ খেয়ে পড়বার ভয় দেখাবে। সন্ধ্যে বেলা থেকে সুরে বেসুরে তালে বেতালে গান করে তারা এমন জমিয়ে ফেললে যে আমিও তাদের ছেড়ে বের হতে পারলাম না। খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে পড়বার সময় কিন্তু চিন্তিত হলাম তাদের জন্যে। বিছানার মধ্যে বেচারাদের চারটি ছোট বালিশ মাত্র সম্বল আর চাদর একখানা করে গায়েই আছে। প্রশ্ন করলাম—রাত কাটবে কি করে? মশারি আনেন নি। তারা হেসেই সারা। বহরমপুরের ছেলেদের মশার ভয়?

মশা? মশাই, সারাদিন বাইসিক্ল ঠেঙিয়েছি। পড়ব আর ঘুমোব।

একজন বলল—নাসিকাগর্জনের শব্দে বেটারা বিশকোশ দূরে পালাবে।

অগত্যা আমি গিয়ে শুলাম। শুয়েও ঘুম এল না। গরম তো বটেই, তবে মনের উত্তেজনাই প্রধান কারণ, মনে মনে কবির সঙ্গে দেখা করে কি করব কি বলব তারই মক্‌শ করছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই মনে হল ছেলেরা ও ঘরে মারপিট শুরু করেছে। চটপট চড়-চাপড়ের শব্দ উঠছে। কিন্তু কই, বাদানুবাদ কই? কয়েক মুহূর্ত পরেই শুনলাম—উঃ! উঃ! এই মেরেছি!

বুঝলাম মশা।

আধঘণ্টা পরেই শুনলাম—একজন প্রস্তাব করলে—চল বাইরে যাই।

হুড়মুড় করে বেচারারা বাইরে চলে গেল।

আবার কিছুক্ষণ পর ফিরল। আবার সেই চড়-চাপড়।

আর থাকা গেল না। ডেকে বললাম—আসুন আমার মশারির মধ্যে, কোন রকমে পাঁচজনের বসে রাত কাটানো তো চলবে!

বেচারীরা বাঁচল। মুখেও তাই বললে—বাঁচালেন।

তারপর বলে—গল্প বলুন মশায়।

বললাম—দোহাই। সহ্য হবে না। গল্প জানিও না, আর আমি মশায় গল্পের উপর হাড়চটা। রাত বারোটা বেজে গেছে, এখন চুপচাপ বসে ঢুলতে ঢুলতে যতটা পারেন ঘুমিয়ে নিন।

রাত্রি চারটে বাজতেই ওরা বললে—আর না। এইবার আমরা বাইরে বেরিয়ে পড়ব। অনেক জ্বালিয়েছি আপনাকে। তাই বেরিয়ে পড়ল। কোন বাধা নিষেধ শুনলে না।

সকালে কালীমোহনবাবুর খোঁজে বের হলাম। কবির কাছে সংবাদটা পাঠাব। হঠাৎ দেখা হল আমাদের জেলার সুধীন ঘোষের সঙ্গে। তিনি তখন কবির খাসমহলের কলমনবীশ।

তিনি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন—আপনি কখন?

বললাম বিবরণ। তিনি তিরস্কার করে বললেন—দেখুন তো কাণ্ড। গুরুদেব শুনলে ভয়ানক রাগ করবেন। আমাদের তো বাকি থাকবেই না আপনিও বাদ যাবেন না।

আমি বললাম—কালকের কালটা যখন ভূতকালে পরিণত হয়েছে তখন কাজ কি আজ তার জের টেনে? কালকের কথাকে গয়াধামে পিণ্ড দান করে আজ থেকেই পালা শুরু হোক না। এখন দেখা করবার ব্যবস্থা করে দিন।

বললেন—আমি এখনই চললাম। আপনি যেন পান্থনিবাসেই থাকেন।

তিনি চলে গেলেন। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। হঠাৎ এই সময় দেখা হল অধ্যাপক কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তিনি সব শুনে বললেন—দেখুন তো মশায়! আমি যে পাশেই রয়েছি। আসুন চা খাবেন আসুন।

আমি বললাম—স্থানত্যাগে নিষেধ আছে।

তিনি বললেন—সে ব্যবস্থা আমি করছি। পান্থনিবাসে কি বলে এলেন তিনি।

অতঃপর তাঁর সঙ্গে না-গিয়ে উপায় রইল না। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে শুনলাম—সুধীনবাবু আমার খোঁজে এসে ফিরে গেছেন। আমি আবার বেকুব বনে গেলাম।

উত্তরায়ণ পল্লীর ফটকের কাছে দাঁড়ালাম। দেখলাম—শান্তিদেব প্রমুখ ছাত্র-ছাত্রীরা সঙ্গীতযন্ত্র হাতে ঢুকছেন। শুনলাম কিসের যেন রিহারশ্যাল হবে। ছায়াঘন কালো কাঁকরের পথ বেয়ে তাঁরা চলে গেলেন। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। কালীমোহনবাবুর সঙ্গে পরিচয় থাকলেও তাঁর ছেলে শান্তিদেবের সঙ্গে তখন পরিচয় ছিল না। তবে তাঁকে আমি চিনতাম।

হঠাৎ দেখা হল কালীমোহনবাবুর সঙ্গে। তিনি বললেন—আরে আপনি?

নিবেদন করলাম সব। তিনি সস্নেহে তিরস্কার করে বললেন—আমি

শ্রীনিকেতনে বাস করি কে বলল আপনাকে? আসুন এখন। এখন এখানে গানের পালা বসছে। এখন দেখা হবার সময় নয়।

ও'র বাড়িতে ঘণ্টা দেড়েক কাটিয়ে পান্থনিবাসে ফিরলাম। শুনলাম সুধীনবাবু আরও দুবার খুঁজে গেছেন। আমার আর আপসোসের বাকি রইল না। চুপ করে বসে আছি। আবার এলেন সুধীনবাবু। বললেন—কি লোক আপনি মশায়? গুরুদেব তিনবার পাঠালেন আমাকে। বললেন—সে গেল কোথায়? উঠেছে কোথায়? আমি বলেছি গেস্ট হাউসে উঠেছেন। গেলেন কোথায় কি করে বলি? বললেন—খোঁজ কর। দেখ কোথায় আটকে গেল। বলে দিলেন দুপুর বেলা ওকে নিয়ে এস। আর যেন কোথাও না যায়।

সেই চৈত্রের দুপুর! বীরভূমের উত্তাপ! আমি পান্থনিবাসের উত্তর-দিকের ঘরের জানলার ভিতর দিয়ে পথের পানে চেয়ে রয়েছি। দেখলাম একখানা গামছা মাথায় দিয়ে সুধীনবাবু আসছেন। কবি তখন "পুনশ্চ" নাম্নী বাড়িখানিতে থাকতেন।

ঘরের দরজায় এসেই বুক গুরগুর করে উঠল। থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। সুধীনবাবু ভিতরে ঢুকেই আবার পর্দা সরিয়ে ইশারা করলেন—আসুন।

ঢুকলাম। একটা মোড় ফিরেই একখানা ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াতেই দেখলাম—প্রশান্ত সৌম্য স্বর্ণকান্তি দীর্ঘকায় কবির উজ্জ্বল দৃষ্টির সম্মুখে আমি। কবির সামনে টেবিলের উপর লেখা কাগজ, হাতে কলম, কাগজের ওপাশে একটি পাথরের পাত্রে পূর্ণপাত্র গোলাপ ফুল, ওপাশে খোলা জানলার ওধারে বিস্তীর্ণ মুক্ত লালমাটির প্রান্তর দুপুরের রোদে ঝলসে যাচ্ছে; পাতা উড়ছে চৈতালী হাওয়ায়, কয়েকটা গাছে নতুন পাতার সমারোহ। উত্তপ্ত বাতাসে ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে। আমি তাঁকে ভালো করে দেখবার অবকাশ পেলাম না। চকিত হয়ে উঠলাম তাঁর প্রশ্নে।

দৃষ্টিতে তাঁর প্রশ্ন ফুটে উঠেছে। বললেন—এ কি? তোমার মুখ তো আমার চেনা মুখ। কোথায় দেখেছি তোমাকে?

আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম।

তিনি আবার প্রশ্ন করলেন—কোথায় দেখেছি তোমাকে?

এবার আমি নিজেকে সংযত করে বললাম—আমার বাড়ি তো এ দেশেই। হয়তো বোলপুরে দেখে থাকবেন। বোলপুরে কয়েকবার আপনাকে দেখেছি প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে।

তিনি তখনও স্থিরদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে।

বোলপুর স্টেশনে ঠিক এমনি দৃষ্টি দেখেছিলাম নেতাজী সুভাষচন্দ্রের চোখে। এমনি স্মৃতিমন্থন-করা প্রশ্নভরা সন্ধানী দৃষ্টি।

আমার কথায় তিনি ঘাড় নেড়ে বললেন—না—না। তোমাকে যে আমি আমার সামনে বসে কথা বলতে দেখেছি মনে হচ্ছে।

মুহূর্তে একটা কথা আমার মনে পড়ে গেল। বৎসর পাঁচেক আগে ১৯৩৩ সালে সমাজ-সেবক কর্মীদের এক সম্মেলন হয়েছিল, তখন কবি কর্মীদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। আমি ছিলাম কর্মীদের মুখপাত্র। আমিই কথা বলেছিলাম। কবি কি সেই কথা বলছেন? সেই অল্পক্ষণের স্মৃতি তাঁর মনে আছে?

আমি সসঙ্কোচে সেই কথা নিবেদন করলাম।

তিনি বার কয়েক ঘাড় নাড়লেন। তারপর বললেন—হ্যাঁ। মনে পড়েছে, তুমিই ছিলে কর্মীদের মুখপাত্র। ঠিক আমার সামনে বসেছিলে তুমি। বস তুমি বস।

একটা মোড়ায় বসলাম।

আরম্ভ হল কথা। আমার সকল প্রশ্ন মূক হয়ে গিয়েছিল। তিনিই প্রশ্ন শুরু করলেন।

—কি কর?

বললাম—করার মতো কিছুতেই মন লাগে নি। চাকরিতেও না, বিষয়-কাজেও না; কিছুদিন দেশের কাজ করেছি—

—অর্থাৎ জেল খেটেছ?

—হ্যাঁ।

—ও পাক থেকে ছাড়ান পেয়েছ?

—জানি না। তবে এখন ভাবি পেয়েছি।

—সেইটে সত্যি হোক। তা হলে তোমার হবে। তুমি দেখেছ অনেক। এত দেখলে কি করে?

—কিছুদিন সমাজ-সেবার কাজ করেছি। আর কিছুদিন বিষয়-কর্ম করেছি। সামান্য কিছু জমিদারি আছে। ওই দুই উপলক্ষে গাঁয়ে গাঁয়ে অনেক ঘুরেছি, লোকের সঙ্গে অনেক মিশেছি, কারবারও করেছি।

—সেটা সত্য হয়েছে তোমার। তুমি গাঁয়ের কথা লিখেছ। খুব ঠিক ঠিক লিখেছ। আর বড় কথা, গল্প হয়েছে। তোমার মতো গাঁয়ের মানুষের কথা আগে পড়ি নি।

তারপরই হেসে বললেন—তবে এ কথার শুরু প্রথম আমিই করেছি। আমি যখন বাংলাদেশের গাঁয়ের ঘাটের কথা লিখি তখন বাংলা সাহিত্যে রাজপুতানার রাজত্ব চলেছে।

আবার বললেন—তুমি দেখেছ। আমি তো দেখবার সুযোগ পাই নি। তোমরা দেখতে দাও নি। আমাদের তো পতিত করে রেখেছিলে তোমরা।

আমি মাথা হেঁট করে রইলাম।

আবার বললেন—দেখবে—দুচোখ ভরে দেখবে। দূরে দাঁড়িয়ে নয়। কাছে গিয়ে পাশে বসে তাদের একজন হয়ে যাবে। সে শক্তি এবং শিক্ষা তোমার আছে।

এবার আমি বললাম—পোস্টমাস্টারের পোস্টমাস্টার, রতন, ছুটির ফটিক, ছিদাম রুই দুখীরাম রুই এদের কথা—

ওদের দেখেছি। পোস্টমাস্টারটি আমার বজরায় এসে বসে থাকত। ফটিককে দেখেছি পদ্মার ঘাটে। ছিদামদের দেখেছি আমাদের কাছারিতে। ওই যারা কাছে এসেছে, তাদের কতকটা দেখেছি কতকটা বানিয়ে নিয়েছি।

সেখান থেকে কেমন করে কি জানি কথাটার মোড় ঘুরে গেল—সাহিত্য-সমালোচনার প্রসঙ্গের দিকে। ওই, আমার কলমের স্থূলতার অপবাদের কথা উঠল। হঠাৎ যেন রক্তোচ্ছ্বাসে মুখখানি ভরে উঠল। বললেন—ও-দুঃখ পাবে। পেতে হবে। যত উঠবে তত তোমাকে ক্ষত-বিক্ষত করবে। এ দেশে জন্মানোর ওই এক কঠিন ভাগ্য। আমি নিষ্ঠুর দুঃখ পেয়েছি।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে উঠলেন—মধ্যে মধ্যে ভগবানকে বলি কি জান তারাশঙ্কর? বলি, ভগবান, পুনর্জন্ম যদি হবেই তবে এ দেশে যেন না জন্মাই।

আমি বিহ্বল হয়ে গেলাম। বিবেচনা করলাম না কাকে বলছি, কি বলছি, বলে উঠলাম—না-না এ কথা আপনি বলবেন না। না-না।

হাসলেন তিনি এবার। আবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—তোমার এইটুকু যেন চিরকাল বেঁচে থাকে; বাঁচিয়ে রাখতে পার যেন।

আর কথা হল—তখনকার লীগ রাজত্বে বাংলা ভাষাকে যে আরবী ফারসী শব্দবহুল করবার চেষ্টা হচ্ছিল তাই নিয়ে। বললেন,—তাই তো ভাবি, যা করে গেলাম তা কি এরপর শিলালিপির ভাষার মতো গবেষণার সামগ্রী হয়ে তাকে তোলা থাকবে! অনেকক্ষণ উদাস দৃষ্টিতে উত্তরদিকের রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তরের পানে চেয়ে রইলেন।

কোথায় যেন ডাকছিল একটা চিল।

হঠাৎ আমার দিকে ফিরে চেয়ে বললেন, তোমার "ডাইনীর বাঁশী"র চিলটার কথা মনে পড়ছে। গল্পটি খুব ভালো লেগেছে আমার।

আমি যেন আর সইতে পারছিলাম না এমন সস্নেহ সমাদরের ভার।

কথার জের টেনে তিনি বললেন—কলকাতার একজন বড় পণ্ডিত সাহিত্যিক

এই গল্পটির কথা শুনে কি বললেন জান? আমি দৃষ্টিতে প্রশ্ন তুলে নীরবে চেয়ে রইলাম। কবি বললেন—তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন শুনে। বললেন উইচক্র্যাফ্‌ট নিয়ে বাংলা গল্প। এ নিশ্চয় ইউরোপের গল্প। ওদের দেশের গল্প পড়ে লিখেছে।

অর্থাৎ চুরি করেছি আমি।

আমি একেবারে গ্রাম্যলোকের মতোই বলে উঠলাম, না-না। স্বর্ণ ডাইনী যে আমাদের পাড়ায় থাকে। এখনও আছে। আমাদেরই কাছারি বাড়ির সামনের পুকুরের ঈশানকোণে তার বাড়ি। আর—

এতক্ষণে একটু সংযত হয়ে সবিনয়ে বললাম—আমি তো ইংরিজিও ভালো জানি না। যেটুকুও জানি তার উপযুক্ত পড়বার বইও পাই না আমার দেশে। কোথায় পাব? ওদের দেশের গল্প তো আমি বেশি পড়ি নি।

কবি হেসে বললেন—আমি জানি, আমি বুঝতে পারি। তোমাকে আমি বুঝেছি। দেখবার আগেই বুঝেছি। ও কথাটা তোমাকে বললাম কেন জান? বললাম আমাদের দেশের সাহিত্যিকদের দেশের সঙ্গে পরিচয় কত সঙ্কীর্ণ তাই বোঝাবার জন্য। ডাইনী মানে ওঁদের কাছে উইচক্র্যাফ্‌ট হলেই সে ইউরোপ ছাড়া এদেশে কি করে হবে। আমাদের দেশের ডাইনী এঁরা দেখেন নি, জানেন না, বিশ্বাস করেন না। আমি তাই তাঁদের বললুম; বললুম—উহুঃ উঁহু! এ তারাশঙ্করের চোখে দেখা। আমি যে নিজে দেখতে পাচ্ছি গ্রীষ্মকালের দুপুরে তালগাছের মাথায় বসে চিলটা লম্বা ডাক ডাকছে, গলাটা তার ধুক্‌ ধুক্‌ করছে। আর নিজের ঘরের দাওয়ার বাঁশের খুঁটিতে ঠেস দিয়ে স্বর্ণ ডাইনী বসে আছে আচ্ছন্নের মতো। আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি। তাই তো চিলের ডাক শুনে ছবিটা চোখে ভেসে উঠল; গল্পটা মনে পড়ে গেল।

ওদিকে অপরাহ্ণের আভাস ফুটে উঠল প্রান্তরের রৌদ্রাকীর্ণতার মধ্যে।

সেই দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি।

বললেন, এখানে এস। যখন ক্লান্তি হবে এখানে চলে এস। দরজা খোলা রইল। আমি ইঙ্গিত বুঝলাম। প্রণাম করলাম। সুধীনবাবু এসে দাঁড়ালেন। বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। সুধীনবাবু আমাকে পেঁছে দিয়ে গেলেন পান্থনিবাসে।

আমি আর একমুহূর্ত দেরী করলাম না। আমার আর ঠাঁই নাই। সব পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। চলে এলাম লাভপুর।

চিঠি পেলাম এমন করে চলে এলাম কেন?

ওই কথাই লিখলাম—আর আমার নেবার জায়গা ছিল না ; আমি যেন অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। তারই মধ্যেই চলে এসেছি।—কবির সঙ্গে এই আমার প্রথম সাক্ষাৎ। এরপর যে কথা বলছিলাম, সেইকথা বলি। প্রায় মাস কয়েক পর হঠাৎ ট্রেনে দেখা হয়েছিল স্বর্গীয় সুকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং স্বর্গীয় কালীমোহন ঘোষ মহাশয়দের সঙ্গে। তাঁরা ইণ্টার ক্লাসে, আমি থার্ড ক্লাসের যাত্রী। বর্ধমান স্টেশনে প্ল্যাটফর্মে তাঁরা নেমেছেন, আমিও নেমেছি। আমাকে দেখে কালীমোহনবাবু উচ্ছ্বসিত হয়ে আমায় ডাকলেন, শুনুন, শুনুন।

টেনে তুলে নিলেন নিজেদের গাড়িতে। বললেন, ভাড়া লাগে দেওয়া যাবে।

স্বর্গীয় সুকুমারবাবুও আমার পরিচিত ব্যক্তি। রামানন্দবাবুর ভাইপো এবং দীর্ঘকাল বীরভূমে ছিলেন এস. ডি. ও.। শুধু তাই নয়, এতবড় সমাজকর্মী সচরাচর দেখা যায় না। অবসর নিয়ে কবিগুরুর কাজে লেগেছেন—শ্রীনিকেতনে, কালীমোহনবাবুর সঙ্গে। কালীমোহনবাবু আমার সঙ্গে সুকুমার-বাবুর পরিচয় করিয়ে দিলেন।

সুকুমারবাবু বললেন, গুরুদেবের আদেশে আপনার গল্প আমরা সেখানকার বুড়োদের আসরে পড়ে শোনাই। বয়স্কদের আসরে এ কালের কি লেখা পড়ে শোনাব, আমরা ভেবে পাচ্ছিলাম না। গুরুদেব বললেন, তারাশঙ্করের গল্প পড়ে শোনাও তো, আমার মনে হয় বুঝতে পারবে ওরা। এইটে ও পেরেছে বলে মনে হয় আমার! দেখ তো পরীক্ষা করে।

তা, পারছে বুঝতে।—বললেন সুকুমারবাবু! কবি বলেছিলেন—মাটিকে এবং মাটির মানুষকে ও জানে, এর সঙ্গে ওর যোগ আছে।

এই সঙ্গে "রাইকমল" প্রসঙ্গে একটি কৌতুককর কথা বলব এবার। একখানি বড় কাগজে বইখানির সমালোচনা দীর্ঘকাল ধরে হয় নি! একদিন ঐ কাগজের একজন বন্ধুস্থানীয়কে তাগাদা দিতে গিয়ে তাঁকে একটু আঘাত দিয়ে ফেললাম। এর পরই সমালোচনা বের হল "রাইকমলে"র নিন্দা করে। তবে "রাইকমল"কে নিন্দা করতে গিয়ে তিনি, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ—এঁদের বৈষ্ণবী চরিত্রেরও নিন্দা করলেন। লিখলেন, বৈষ্ণবী চরিত্রের যা সত্যকারের পরিচয়—তাতে তারা সমাজের কলঙ্ক ; অনেক ঘষে-মেজে রাঙিয়ে নিয়েও এঁদের সৃষ্ট কোন বৈষ্ণবী চরিত্র নিয়েই বাংলা-সাহিত্য গৌরবান্বিত হয় নি।

রবীন্দ্রনাথ যে উৎসাহ দিলেন, সেই উৎসাহ আমাকে সেই শক্তি দিয়েছিল, যে শক্তিতে ডাক শুনে কেউ সাড়া না দিলেও অন্ধকার দুর্যোগের রাত্রে

মানুষ একলা পথ চলতে পারে। এবং এই সময়ে মহাকবির মনের গতিরও আভাস পাওয়া যাবে এই থেকে। সাহিত্যেব সঙ্গে দেশের মানুষের যোগ স্থাপন করতে তিনি ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন।

মানুষের জীবনে উৎসাহের প্রয়োজন আছে।

তন্ত্রসাধনায় শুনেছি, সাধককে 'ভয় নাই'—'মাভৈঃ' এই কথা শোনাবার জন্য আর একজন সিদ্ধ সাধকের প্রয়োজন হয়। শবাসনে বসে সাধক যে মুহূর্তে ভয় পায়, চিত্ত যে মুহূর্তে দুর্বল হয়, সেই মুহূর্তেই সে শুনতে পায় ওই সিদ্ধ সাধকের ওই অভয়বাণী। সাধনায় রত সাধকের সঙ্গে সঙ্গে ভয় দূর হয়, নববলে বলীয়ান হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের উৎসাহবাণী আমার কাছে সেই অভয়বাণী।

আমি এ দিক দিয়ে সৌভাগ্যবান। প্রথম জীবনে আমার সমসাময়িকদের সঙ্গে তাঁদের ও আমার রচনার সুরের অমিলের জন্য যতই নিঃসঙ্গতা অনুভব করে থাকি, যতই বিরূপ সমালোচনায় সমালোচিত হয়ে থাকি,—পূর্বাচার্যগণ, সাহিত্য সাধনায় যাঁরা সিদ্ধিলাভ করেছিলেন সে সময়, তাঁদের কয়েকজনের অভয় এবং উৎসাহ আমি পেয়েছিলাম! এঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের পরই যাঁর নাম করতে হয়, তিনি হলেন আচার্য মোহিতলাল। রবীন্দ্রনাথ বেঁচে ছিলেন আমার "ধাত্রী দেবতা"র প্রকাশকাল পর্যন্ত। এবং তাঁর কাছে যে কোন সংশয়ে ছুটে যাওয়ার মতো দুঃসাহস আমার ছিল না। তাঁকে খানিকটা ভয়ও করতাম আমি। এ ছাড়াও শান্তিনিকেতনের আবহাওয়া তাঁর কাছে না-যেতে পারার একটা প্রধান কারণ। আমি গ্রামের মানুষ, ওখানে গিয়ে শহরের এবং বাংলা দেশের ও ভারতবর্ষের সর্বস্থানের বিদগ্ধ মানুষদের গ্রাম্য বেশ দেখে ভয় পেতাম, সঙ্কুচিত হতাম। গ্রাম্য মানুষ শহুরে সাজলে হাস্য-কৌতুকের সামগ্রী হয়ে দাঁড়ায় শহুরে মানুষের কাছে। কিন্তু শহুরে মানুষ গ্রাম্য মানুষ সাজলে গ্রাম্য মানুষেরা শঙ্কিত হয়, ভীত হয়। তাঁদের আচারে-আচরণে-বিনয়ে সব জায়গাতেই আসল মানুষটা আড়ালে থাকে, অভিনেতার আসল ব্যক্তিত্বের মতো। রবীন্দ্রনাথে যে আচার-আচরণ তাঁর সাধনা-লব্ধ দিব্যভাবের মতো স্বাভাবিক ও সহজ, অন্য লোকের পক্ষে সে আচার-আচরণ সহজেই কৃত্রিম বলে ধরা পড়ে। এমন ক্ষেত্রে গ্রামের মানুষের সন্দেহের সৃষ্টি করবেই। শান্তিনিকেতন আমার দেশের দশ-মাইল দূরের ভুবনডাঙা। সেখানকার সঙ্গে পরিচয় আমার অনেক দিনের। ওখানে আগে আগে গ্রাম্য পোশাকী দু-একজন অতি বিদগ্ধ তরুণদের হাতে আমি কঠিন ধাক্কা খেয়েছিলাম। চমৎকার মিষ্ট ভাষায় সবিনয়ে অবলীলাক্রমে মর্মভেদী রহস্য করে আঘাত করেছিলেন। এবং এমন সন্দেহও করেছিলেন যে, আমার নির্বুদ্ধিতার গণ্ডারের

চামড়ায় খোঁচা মেরে যে কৌতুক তাঁরা অনুভব করলেন সেটা নেহাতই এক-তরফা। আমাকে আঘাত লাগে নি। লাগলেও বুঝতে পারি নি। অবশ্য গ্রামের লোকে রসিকতা জানে না, তা নয়। জানে অনেক ক্ষেত্রে এই সব শহুরে মানুষদের, শরৎচন্দ্রের দাঁজপাড়ার দাদার মতো শ্রীকান্তের ময়লা দুর্গন্ধ-যুক্ত গায়ের কাপড়টা গায়ে দিতে হয়; সে অবশ্য নিজের দোষে। গ্রামের লোকে রসিকতা জানলেও অতিথির উপর তা প্রয়োগ করে না, আগন্তুকের উপরেও না। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের কাছে ঘন ঘন যাওয়া-আসা করতে আমার দ্বিধা ছিল। তিনি কিন্তু এই যাওয়া-আসা চেয়েছিলেন। এমন কি "শান্তিনিকেতনের একটা কোণ দখল করে বসলে" তিনি খুশী হতেন—এমন কথাও আমাকে লিখেছিলেন তিনি। কিন্তু সে আমি পারি নি। মুখেও রবীন্দ্রনাথ আমাকে এ কথা বলেছিলেন। সেই বোধ হয় তাঁর সঙ্গে আমার শেষবার সাক্ষাৎ। এর আগে আরও কয়েকবারই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে। কলকাতায়, শান্তি-নিকেতনে, মেদিনীপুরে। চিঠিও পেয়েছি তাঁর। সে সব কথা পরে বলব। শেষবারের কথাটা সে সবের আগে বলতে চাই এই কারণে যে এইবারে তিনি শান্তিনিকেতন এবং দেশের সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে বীরভূমের সম্পর্ক সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলেছিলেন। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের এক বিচিত্র রূপ আমার দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল, সেই কথা এইখানে বলার লোভ সংবরণ করতে পারছি না।

লাভপুর থেকে শান্তিনিকেতন গেলাম। উত্তরায়ণে গিয়ে শুনলাম, কবি চীনাভবনে গেছেন,—একটি নূতন ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠান আছে। আমি ফিরে একটু চায়ের সন্ধানে পুরানো গেস্ট-হাউসের এলাকার মধ্যে কাচ-বাংলার পাশে কাঁকর-বিছানো পথের উপর পৌঁচেছি, এমন সময় কবির গাড়ি ওদিক থেকে এসে পৌঁছল। আমার কাছাকাছি একজন ভিন্নপ্রদেশবাসীও দাঁড়িয়ে ছিলেন। গাড়িতে ছিলেন কবি এবং সুধাকান্ত দা। গাড়িটা থেমে গেল। সুধাকান্তদা নামলেন এবং আমার হাত ধরলেন। ইতিমধ্যে ওই ভদ্রলোকটি কবির কাছে গিয়ে কথাবার্তা বলতে লাগলেন। সুধাকান্ত ছুটে গেলেন আবার। কবি কি বললেন এবং লোকটিকে গাড়িতে তুলে নিয়ে চলে গেলেন। সুধাদা আমার কাছে ফিরে এসে বললেন, চলুন, আপনাকে ধরে নিয়ে যাবার ভার আমার ওপর দিয়ে গেলেন। বললেন, তারাশঙ্করকে নিয়ে এস। এঁর কি কথা আছে বলছেন, আমি কথাটা শেষ করে ফেলি এর মধ্যে। আমরা কথা বলতে বলতেই উত্তরায়ণের সামনে বেদীর ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম। তখন বারান্দায় বসে কবি লোকটির সঙ্গে কথা বলছেন, কণ্ঠস্বর ঈষৎ উচ্চ এবং তীক্ষ্ণ।

সুধাকান্ত বললেন, কি হল ? গলা চড়ছে কেন ?

আমিও মুখ ফিরিয়ে দেখলাম, কবি পিছনে ঠেস দেবার জায়গা থেকে সরে সোজা হয়ে বসেছেন।

হঠাৎ কবি উচ্চকণ্ঠে ডাকলেন, বনমালী ! আবার ডাকলেন, বনমালী ! বনমালী ! তারপর ডাকলেন, মহাদেব ! মহাদেব !

কণ্ঠস্বর পর্দায় পর্দায় চড়ছে। এরপরই ডাকলেন, সুধাকান্ত ! সুধাকান্ত ! এরা কি ভেবেছে বাড়ির মালিক মরে গেছে ? তখনকার কবির মূর্তি বিস্ময়কর-রূপে প্রদীপ্ত। যেন প্রখর রৌদ্রে কাঞ্চনজঙ্ঘা চোখ-ঝলসানো দীপ্তিতে প্রখর হয়ে উঠেছে। সমস্ত উত্তরায়ণ সে কণ্ঠস্বরে যেন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল ! এ-পাশের বাড়ি থেকে দুজন-একজন উঁকি মারলেন। তাঁদের মুখে শঙ্কার চিহ্ন। দু-একজন উত্তরায়ণের প্রবেশ-পথে যাচ্ছিলেন বা আসছিলেন, তাঁরা থমকে দাঁড়ালেন। আমার মনে হল, গাছপালাগুলিও স্তব্ধ হয়ে গেছে। সুধাকান্ত ছুটে গেলেন কবির কাছে এবং প্রথমেই সেই ভদ্রলোককে উঠতে অনুরোধ করলেন। তিনি উঠে চলে গেলেন। কবি সোজা হয়েই বসে সুধাকান্তের সঙ্গে কথা বললেন। আমি ভাবছিলাম, ফিরে যাই। কবির এমন ক্রোধ ক্ষোভ আমি দেখি নি। এই অবস্থায় কি তাঁর সঙ্গে দেখা করা সঙ্গত হবে ? সেই মুহূর্তেই সুধাকান্তদা নেমে এলেন। বললেন, চল, তোমার তলব পড়েছে।

চুপি চুপি প্রশ্ন করলাম, কিন্তু ব্যাপারটা কি ?

সুধাদাও চুপি চুপি বললেন, লোকটি বড় উদ্ধত, শান্তিনিকেতনের কর্তৃপক্ষকে অশিষ্ট ভাষায় অপমান করবার চেষ্টা করেছে। উনি রেগেছেন, কিন্তু লোকটি অতিথি আগন্তুক, ওকে তো রেগে কিছু বলতে পারেন না। অথচ নিদারুণ ক্ষোভ ! সেটা ওই বনমালী, মহাদেব এবং পরিশেষে এই সুধাকান্তকে হাঁক দিয়ে বের করে দিলেন।

কথা বলতে বলতেই বারান্দায় উঠলাম এবং প্রণাম করলাম। কবি তখনও সোজা হয়ে বসে। আমার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করে বললেন, শান্তিনিকেতন জায়গাটি তো আমার খারাপ বলে মনে হয় না। যাঁরা আসেন, তাঁদেরও ভালো লাগে। তোমার কেমন লাগে ?

কণ্ঠস্বর শুনে এবং প্রশ্নের ভঙ্গী দেখে ভীত হলাম। ত্রস্তভাবেই বললাম, আমারও ভালো লাগে।

গম্ভীরকণ্ঠে এবার বললেন, তাহলে তুমি শান্তিনিকেতনের নিন্দা করে বেড়াও কেন ?

আমি একেবারে ভয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। তবুও বলবার চেষ্টা

করলাম, কই না তো। আমি তো কখনও কারও কাছে শান্তিনিকেতনের বিরুদ্ধে কিছু বলি নি।

তবে? তবে তুমি শান্তিনিকেতনে আস না কেন? তোমার বাড়ি তো এই কাছেই, নিত্য আসা-যাওয়া করা চলে। এবার কণ্ঠস্বর প্রসন্ন হয়ে উঠল, আমার সন্ত্রস্ত ভাব দেখে মিষ্ট হাসিতে ভরে উঠল তাঁর মুখ। বললেন, বস।

বসলাম। তিনি বললেন, আমি আশা করেছিলাম, এখানকার একটা কোণ আগলে তুমি বসবে। কিন্তু সে তুমি এলে না। এখানে আসাও তোমার দীর্ঘকাল পরে পরে। কেন বল তো?

আমি মৃদুস্বরে বললাম, এমনই বিব্রত থাকি কাজে যে, সময় করতে পারি না। মিথ্যা কথাই বলেছিলাম।

তিনি সামনের দিকে চেয়ে একটু বিষণ্ণভাবেই বলেছিলেন, কি এত কাজ? কাজ করতে হলে তো বোলপুরে আসতে হয় গো তোমাকে। তোমাদের মুনসেফী কোর্ট। বিষয়কাজ করবে আর কোর্টে আসতে হবে না—এ তো হয় না। তোমাকে যে টেনে আনবে। তুমি তো নিশ্চয় বোলপুরে আস।

না। ও-পথ আমি মাড়াই না।

বল কি? তবে বিষয়কর্ম চলে কি করে? যন্ত্র বেগড়ালে কারখানায় পাঠাতেই হবে। বিষয় থাকলে গণ্ডগোল বাধবেই, সে গণ্ডগোলের মীমাংসার জন্যে আদালতে হাঁটতেই হবে।

আমি এবার স্বীকার করলাম, বিষয়কর্ম আমি দেখি নি। ওর সঙ্গে আমার সম্পর্কই রাখি নি। ও যা করবার করে আমার ছোট ভাই। আমি কিছু গ্রামের কাজ করি। কালীমোহনবাবু জানেন।

তবে শ্রীনিকেতনে আসছ না কেন?

আমি একটু চুপ করে রইলাম, তার পর বললাম, আছে একটু যোগাযোগ। তবে গ্রামে না থাকলে তো গ্রামের কাজ হয় না।

কবি নীরব হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন, তা হলে তোমায় টানা অন্যায় হবে। তোমার ইচ্ছা নেই। একটু মৃদু হাসলেন। তার পর বললেন, এ জেলার লোকের কাছে এ জায়গাটা বিদেশ হয়েই রইল। কোথায় যে রয়েছে মাঝখানের খাতটা!

কণ্ঠস্বর করুণ হয়ে উঠেছিল তাঁর। সে আমার আজও কানে বাজছে!

মোহিতলালের সঙ্গে আমার যোগাযোগে এই ধরনের কোন বাধা ছিল না। শহরেরই মানুষ মোহিতলাল, কিন্তু বাংলা দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড় ছিল তাঁর পরিচয়, এবং প্রগাঢ় ভালোবাসা ছিল এই সংস্কৃতির প্রতি। সে

পরিচয় আধ্যাত্মিক, এবং ভালোবাসা নিখাদ আত্মিক। এই ভালোবাসা দিয়ে তিনি গ্রামপ্রধান বাংলা দেশকে গ্রহণ করেছিলেন। এবং তাঁর আশেপাশে ভক্তদলের মধ্যে ওই ধরনের গ্রাম্য-পোশাকী শহুরে আলপিন-গোঁজা-লাঠিধারী কেউ ছিল না। শান্তিনিকেতনের এঁদের সংখ্যা সেকালে দু-একজন হলেও তাঁরা ছিলেন একাই একশো।

মোহিতলালের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটেছিল "বঙ্গশ্রী"র কল্যাণে। সজনীকান্তেরও গুরুস্থানীয় ছিলেন তিনি। তাই "বঙ্গশ্রী"র প্রথম সংখ্যা থেকেই তাঁর উপদেশ এবং লেখা সম্পর্কে মতামত ছিল অপরিহার্য। প্রতি সপ্তাহেই তাঁর পত্র আসত। প্রতি মাসের কাগজ বের হলেই তার লেখাগুলি পড়ে সে সম্পর্কে আলোচনা করে পাঠাতেন।

বোধ করি আমার প্রথম লেখা "শ্মশানঘাট"ই তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। দ্বিতীয় গল্প "মেলা" পড়ে পরিচয় জানতে চেয়েছিলেন। সেই বৎসরই পুজোর সময় "বঙ্গশ্রী"তে প্রকাশিত হয়েছিল "শ্মশানবৈরাগ্য" এবং "প্রবাসী"তে বেরিয়েছিল "ঘাসের ফুল"। "ঘাসের ফুল" গল্প পড়ে তিনি উল্লসিত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর বিচারে এমন গল্প আমি দুটি-চারটির বেশি লিখি নি।

মোহিতলালের বিশেষত্ব ছিল এই যে, ভালো লাগলে অকুণ্ঠভাবে তা তিনি ঘোষণা করে বলতেন, ভালো না লাগলে সেও তিনি বলতেন প্রচণ্ড ক্ষোভের সঙ্গে। নিন্দায় প্রশংসায় তাঁর খাদ ছিল না।

প্রথম তাঁকে দেখলাম "বঙ্গশ্রী"-আপিসে। দেখে ভীত হয়েছিলাম। তাঁর দৃষ্টি, তাঁর বাচনভঙ্গী, কণ্ঠস্বর শুধু বলিষ্ঠই নয়, কিছু পরিমাণে উগ্র। মতবিরোধে আপোস নেই। মীমাংসা একমাত্র যুদ্ধেই সম্ভব। আত্মপ্রত্যয় পাহাড়ের মতো দৃঢ়। তাঁকে নড়ানো যায় না। নিজের উপলব্ধি ছাড়া কারও কথা তিনি মেনে নেন না। তাঁর মতে যা মিথ্যা, যা অসুন্দর, তার বিরুদ্ধে তিনি খড়্গধারী। জীবনে ভালোবাসেন শুধু সাহিত্য। আহার নেই, নিদ্রা নেই, মানুষটি ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা সাহিত্য-আলোচনা ও পাঠ নিয়ে বসে আছেন। আমাকে সেদিন আমার জীবন সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করে জানার মতো জেনে নিয়েছিলেন সব।

তন্ত্রসাধনা সম্পর্কে তাঁর গভীর আকর্ষণ ছিল। ইংরেজি অনুবাদে তন্ত্রশাস্ত্র তিনি পড়েছিলেন অনেক। তাই যখন শুনলেন যে, আমরা পুরুষানুক্রমে শক্তিতন্ত্রের উপাসক তখন আমার দিকে সবিস্ময়ে চেয়ে বলেছিলেন, আপনি নিজে তন্ত্রসাধনা করেছেন?

বলেছিলাম, দীক্ষা হয় নি। তবে গুরুর তল্পি বয়ে বেড়িয়েছি।

তারপর যখন শুনলেন যে, আমি জেল-খাটা স্বদেশীওয়ালা, এবং এক সময় কিছুদিনের জন্য ঘরেও পুলিসের নজরের উপর নজরবন্দী ছিলাম, তখন তাঁর মুখ গম্ভীর হল—অপ্রসন্নতাই বলব তাকে। বললেন, এ পথে চলতে হলে ও-সংস্রব চলবে না। ধর্ম নইলে মানুষ বাঁচে না, প্রতিটি মানুষেরই একটা-না-একটা ধর্ম আছে, কিন্তু যারা ধর্মপ্রচারক হয় তারা নিজেরাই হয় ধর্ম থেকে ভ্রষ্ট ; ধর্মকে প্রতিষ্ঠা দিতে হয়,—নিজের অন্তরে দাও। অন্যের অন্তরে তাকে প্রতিষ্ঠা দেবার চেষ্টা যখনই করবে তখনই হবে অধর্ম! তা ছাড়া, রাজনীতি হল সাময়িক—কালে কালে পালটায় ; কিন্তু সাহিত্যধর্ম শাশ্বত।—দীর্ঘ উপদেশ দিয়েছিলেন।

ঢাকা গিয়ে নিজেই পত্র লিখেছিলেন—আপনার উপর প্রত্যাশা রাখি, তাই চিন্তাও হয়। এবং যে সর্বনাশা ছোঁয়াচ একবার আপনার লাগিয়াছিল তাহা সহজে মানুষকে রেহাই দেয় না। বার বার সাবধানবাণী উচ্চারণ করিতেছি সেই কারণে।

এর পর দীর্ঘকাল পত্রালাপ চলেছিল—আমার সঙ্গে। সে পত্রের প্রত্যেকটিই এক-একটি মূল্যবান প্রবন্ধ।

একবার প্রশ্ন করলেন, কারণ করেছেন কখনও? শুধু তান্ত্রিকবংশের সন্তান হলে প্রশ্নই করতাম না। কিন্তু আপনি আবার কংগ্রেসী যে!

সত্য কথাই বলেছিলাম। বলেছিলাম, তন্ত্রমতে কারণ করার অধিকারও হয় নি, করিও নি। এবং তিরিশ সাল পর্যন্ত অন্য ভাবেও না। তার পর বার দুয়েক কি তিনেক চোখে দেখেছি। বেশি খেতে ভরসা হয় নি। পাটনাতে প্রভাতী-সঙ্ঘের নিমন্ত্রণে গিয়ে এক বিখ্যাত বৃদ্ধ উকিল সম্বর্ধনা করেছিলেন এক পেগ হুইস্কি দিয়ে। সঙ্গে আরও সাহিত্যিক বন্ধু ছিলেন। বৃদ্ধ উকিল খাঁটি মধ্যযুগের অভিজাত। সেই প্রথম। তার পরে এই রকমই বার দুয়েক।

উঁহু, তান্ত্রিক-চক্রের কথা জানতে চাচ্ছি। ও তো মদ খাওয়া। আমি কারণ করার কথা বলছি।

না। সে করি নি। আমাদের কুলগুরু আমার মানসিক গতি দেখে নিষেধ করেছিলেন। বলেছিলেন, সে মন তোমার নয়। মনের গতির পরিবর্তন না হলে এ পথে পা দিয়ো না। তবে চক্রের পাশে বসে চক্রের উপকরণ যুগিয়েছি! চক্র দেখেছি।

বলুন। ব্যাপারটা শুনি!

বলেছিলাম—সেই সব গল্প। বিশেষ করে বামা ক্ষ্যাপার তারাপীঠে সাধকদের চক্রের কথা শুনে বার বার বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। বলেছিলেন, অদ্ভুত ব্যাপার!

তার পর বলেছিলেন, আপনার উপর প্রত্যাশা আমার দৃঢ় হল। আপনি মনের দিক দিয়ে ও-পথের পথিক না হলেও ও-পথের উপর শ্রদ্ধা হারান নি।

প্রতি পত্রে লিখতেন—হবে, আপনার হবে। নিজেকে দৃঢ় রাখুন।

"রসকলি" গল্প-সংগ্রহ বের হল, বইখানি রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেছিলাম। কবিকে বই পাঠালাম, মোহিতলালকেও পাঠালাম। কবির কথা পরে বলব। কারণ এর কিছুদিন আগে "জলসাঘর" গল্প-সংগ্রহ সম্পর্কে কবির কথা বলবার আছে। মোহিতলাল বই পেয়েও কিছু লিখলেন না। আমি আবার লিখলাম। লিখলেন—এ সম্পর্কে আমার মতামত আমি ঘোষণা করিয়া বলিব স্থির করিয়াছি। তাহার সময় আসিয়াছে। কাগজে লিখিব। তাহা হইতেই জানিতে পারিবেন। এবং গল্পগুলি সম্পর্কে মতামত তো প্রতিটি গল্প-প্রকাশের সময়ই জানাইয়াছি। সুতরাং এত ব্যগ্রতা কেন?

"রসকলি" প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৪৫ সালের প্রথম দিকে। গোটা পঁয়তাল্লিশ সাল চলে গেল, কোথাও কোনও সমালোচনা (মোহিতলালের) প্রকাশিত হল না।

১৩৪৬ সালের ১লা বৈশাখ। সে দিন বেলা আড়াইটার সময় এক আকস্মিক আঘাতে নিষ্ঠুর বেদনায় ও ক্ষোভে ব্যথাতুর ক্ষুব্ধ মন নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। ঠিক এই ধরনের আঘাত এক ভিক্ষুক ছাড়া কেউ কখনও পায় না। এই রাজনৈতিক ব্যাপারেই পেয়েছিলাম আঘাত। বীরভূমের ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ড ইলেক্‌শনে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল। কংগ্রেস প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছিল। লাভপুরে কংগ্রেসপ্রার্থী ছিলেন কালীকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়। প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন আমাদের গ্রামের সর্বপ্রধান ব্যক্তি। প্রার্থীরা দুজনেই আত্মীয়। এ ছাড়াও এই সর্বপ্রধানের ছেলে নেমেছিলেন কংগ্রেসের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আসরে। সেবার সেই প্রধান ব্যক্তিটি ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের চেয়ারম্যান হবেনই। কাজেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘোরালো এবং জোরালো। লাভপুরে কালীকিঙ্করবাবুর নির্বাচনের ভার প্রায় পুরোপুরি আমার মাথায়। হঠাৎ একদিন কালীকিঙ্করবাবু ডেকে খবর দিলেন যে, তাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বী আত্মীয় প্রধানজনের মিটমাট হয়ে গেল। তিনি স্নেহাস্পদ কালীকিঙ্করবাবুর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান না, নাম প্রত্যাহার করবেন—আসবেন সরকার মনোনীত সভ্য হিসাবে। নাম প্রত্যাহারের নির্দিষ্ট দিন ঠিক পরের দিন, ১লা বৈশাখ ১৩৪৬।

বৈশাখ মাসে মফস্বলে মর্নিং কোর্ট। ভোরবেলা আত্মীয় প্রধানের মনোনয়ন প্রত্যাহারপত্র নিয়ে কালীকিঙ্করবাবু আমাকে টেনে নিয়ে গেলেন সিউড়ি! কোর্টের বটতলায় কাজ শেষ হতে বারোটা বেজে গেল। এর পর কালীকিঙ্করবাবু নিয়ে গেলেন এই প্রধান ব্যক্তিটির সিউড়ির বাড়িতে। সেখানে তখন এই

প্রধানের ছেলে রয়েছেন। ওখানেই তাঁর প্রধান আড্ডা। ওখান থেকেই তিনি নির্বাচনের কাজ চালাচ্ছেন। নির্বাচনের কাজ তাঁর জেলাব্যাপী। কারণ এই প্রধানজন সেবার ভাবী চেয়ারম্যান হিসাবে কংগ্রেসদলের প্রতিদ্বন্দ্বী দলের নেতা। সেখানে দৈনিক একটা করে যজ্ঞের আয়োজন। পঞ্চাশ থেকে একশো জনের আহার বিশ্রাম চলছে। মিটমাট হয়ে গেছে। কালীকিঙ্করবাবুকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে ও'রাই নিয়ে গেছেন। আমিও গিয়েছি। নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সামাজিক বিরোধ নয়, তা ছাড়া আমার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ও'দের। তবুও সত্য বলতে মনটা খুঁতখুঁত করছিল। এই ধরনের দ্বিধাবোধকে আমি দুর্বলতা বলে মনে করি, একে প্রশ্রয় দিই না কোন কালেই। একে জয় করবার জন্যই গেলাম। ভাবলাম, একে আজ প্রশ্রয় দিলে বিরোধ ব্যক্তিগত হয়ে পড়বে, ওখানে গিয়ে হাস্যপরিহাসের মধ্যে অনেকটা সহজও হয়ে এলাম। এমন সময় ডাক এল, পাতা দেওয়া হয়েছে।

আমার মনটা খুঁতখুঁত করে উঠল। ঘড়ি দেখলাম, দেখলাম বেলা একটা। কালীকিঙ্করবাবু আমার হাত ধরলেন। আমার ঘড়ি-দেখা দেখেছিলেন তিনি, বুদ্ধিমান ব্যক্তিটি মনের ভাবও বুঝেছিলেন। বললেন, এস এস। বাড়ি গিয়ে খেতে অনেক বেলা হবে। এরাও কিছু ভাববে। শেষটা একটু আস্তেই বললেন। যে কারণে দ্বিধা সত্ত্বেও গিয়েছিলাম, সেই কারণেই এতেও 'না' বললাম না। বসলাম কুশাসনের ওপর। পাতায় ভাত তরকারি দিয়ে গেছে। গ্লাসের জল হাতে ঢেলে হাত ধুয়ে ভাতে হাত দিয়ে গ্রাস তুলেছি। সামনে, ঘরের দরজার চৌকাঠের উপর দাঁড়িয়ে প্রধান ব্যক্তিটির পুত্র মাথায় জবাকুসুম তেল ঘষছেন এবং মৃদু মৃদু হাসছেন। আমাদের খাওয়াও দেখছেন। গ্রাসটা আমার মুখের কাছে পৌঁচেছে, এমন সময় তিনি হেসে বলে উঠলেন—ঠিক কথাগুলি মনে নেই, তবে তার অর্থ হল, আমাদের বিরোধিতা করে আমাদের বাড়িতেই খেতে তুমি লজ্জা পাচ্ছ না? অবশ্য আর-একজনের নাম যোগ করে সুকৌশলে নিজে বলার দায়িত্ব লাঘব করবার চেষ্টা করেই। বললেন, জান, অমুক কি বলছিল? বলছিল, তোমাদের সঙ্গে ইলেকশনে বিরোধিতা করে তোমাদের বাড়িতেই খেতে এল? লজ্জা হল না? এবং ব্যাপারটাকে পরিহাসের সামিল করবার সঙ্গে সঙ্গেই হা হা করে হেসে উঠলেন। আমার মনে হল, আমাকে যেন ডাণ্ডা দিয়ে আঘাত করলে কেউ। করলে মাথার উপর। ব্রহ্মরন্ধ্র যেন ফেটে যাবে মনে হল। তবুও প্রাণপণে আত্মসম্বরণ করে ধীরভাবেই হাতের গ্রাসটা মুখের কোল থেকে পাতার ওপর নামিয়ে দিলাম। খাবার জন্য পাতার ওপর ঝুঁকে পড়েছিলাম, সোজা হয়ে বসলাম। দেখলাম, প্রতিটি মানুষই হাতে গ্রাস নিয়ে মাটির পুতুলের মতো

অসাড় হয়ে গেছে যেন। আমি আশ্বস্ত হলাম। আমার নিজের মনের ত্রুটি নয়, কথাটা সকলের মনেই প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে। আমি ভাতের গ্রাসটি নামিয়ে হেসে তাঁকে বললাম, তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। লজ্জাহীনতার যে কাজ করতে উদ্যত হয়েছিলাম, তা থেকে তুমি আমাকে নিবৃত্ত করেছ। আমাকে তুমি রক্ষা করেছ। যথাসময়ে কথাটা উচ্চারণ করেছ। এখনও অন্নের গ্রাস মুখে তুলি নি, উদরস্থ হওয়া দূরের কথা। এক মিনিট পরে হলে এর আর প্রতিকার ছিল না। বলেই আমি উঠে পড়লাম। উচ্ছিষ্ট হাত ধুয়ে দাঁড়ালাম। অবশ্য এর পর ওই প্রধান ব্যক্তির ছেলেটি যথেষ্ট অনুতাপ প্রকাশ করেছিলেন। খেতেও অনেক অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু অন্ন আমি আর গ্রহণ করি নি। ভদ্রতা রাখতে জল খেয়েছিলাম।

সেই ক্ষুব্ধ ক্ষতবিক্ষত মন নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। ১লা বৈশাখের বেলা দেড়টা। কালীকিঙ্করবাবুর মোটরে ফিরছি, বায়ুস্তরে বহ্ন্যুত্তাপ হু-হু করে বয়ে যাচ্ছে। আমার মনে হল, আমার অন্তর্দাহের সঙ্গে তার কোন প্রভেদ নেই। আমার বুকের ভিতর এমনি জ্বালা, এমনি উত্তাপ। তবুও আমি পৃথিবীর মতো শান্ত। ভাগ্যিস আমি অন্নগ্রাসটা মুখে তুলি নি। আমার ভগবানকে আমি প্রণাম জানালাম বার বার। রক্ষা করেছ তুমি আমাকে, রক্ষা করেছ চরম বহ্নিদাহের জ্বালা থেকে। ওই অন্ন গ্রহণ করলে আমার অন্তর্দাহের আর সীমা থাকত না। হয়ত বা আজীবন দগ্ধ হতাম। পরলোক থাকলে পিতৃপুরুষ নরকস্থ হতেন হয়তো। তোমাকে প্রণাম, তোমাকে প্রণাম, তোমাকে কোটি কোটি প্রণাম। নতুন বৎসরের প্রথম দিনে ভাগ্যে যা জুটল, ভগবান, তাই যদি এ বৎসর ধরে আমার দৈনিক প্রাপ্য হয়, তবে তুমি যেন এইভাবে অন্তরে জাগ্রত থেকে আমাকে রক্ষা করো। বাড়ি এসে পৌঁছুলাম, বেলা তখন আড়াইটে।

বাড়ির সকলেই ঘুমুচ্ছেন। স্তব্ধ। ঝাঁ-ঝাঁ করছে দুপুর। মনে আছে একটা কাক এই সময় দ্বিপ্রহর-অবসান ঘোষণা করে বারান্দার রেলিঙের উপর বসে কা-কা শব্দে ডেকে উঠল।

আমি দেখলাম, বারান্দায় পড়ে রয়েছে—১৩৪৬ সাল বৈশাখের "প্রবাসী"। সেই দিনই এসেছে। উলটে দেখতে গিয়ে চোখে পড়ল "রসকলি"র সমালোচনা। নিচে সমালোচকের নাম মোহিতলাল মজুমদার। রুদ্ধনিশ্বাসে পড়ে গেলাম—

"শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোট গল্প বাংলার পাঠকসমাজে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিয়াছে এবং সাহিত্যরসজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাঁহার শক্তি ও প্রতিভা স্বীকার করিতেছেন।···বর্তমানে কাব্যের ক্ষেত্র আগাছায় ভরিয়া গিয়াছে, বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের পরে সাহিত্য-সম্রাটের পদ কোন কবির প্রাপ্য

হয় নাই। গল্পলেখকগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিমান কে, এই প্রশ্ন উত্থাপন ও তাহার সমাধান করিতে হইলে তারাশঙ্করের কৃতিত্ব যেরূপ উত্তরোত্তর স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে শেষ পর্যন্ত তাঁহার দাবিই গ্রাহ্য হইতে পারে এমন ভবিষ্যদ্বাণী করিবার দুঃসাহস আমি করিতেছি।..."

এক মুহূর্তে আমার অবস্থা সে যে কি হয়ে গিয়েছিল, সে আজ বর্ণনা করতে পারব না। দীর্ঘদিন পরে সে বর্ণনা করা যায় না। তবে মনে আছে, এতক্ষণ ধরে যে মর্মান্তিক বেদনাকে সহ্য করে দৃষ্টিকে শুষ্ক রেখেছিলাম, সে আর শুষ্ক থাকে নি। চোখের জলে দৃষ্টি ঝাপশা হয়ে এসেছিল। বৈশাখের উত্তপ্ত বারান্দায় বুকে টপটপ করে চোখের জল ঝরে অভিষিক্ত করে দিয়েছিল খানিকটা স্থান।

দীর্ঘ সমালোচনা। প্রতি ছত্রেই এই অকুণ্ঠিত প্রশংসার ঘোষণা। কোন রকমে পড়ে গেলাম—তারাশঙ্করের গল্পগুলিতে জীবনকে দেখিবার যে দৃষ্টিভঙ্গী তাহাই উৎকৃষ্ট কবিদৃষ্টি—বস্তুর বাস্তবতাকেই গ্রাহ্য করিয়া তাহার রসরূপ আবিষ্কার করায় যে কবি-মনোভাব, তাহার একটি অভিনব মৌলিক ভঙ্গী তাঁহার গল্পগুলির মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহা কবি-মানসের সেই সবল ও সুস্থ অপক্ষপাত যাহা জীবনের বিচিত্রতম অভিব্যক্তিকে একটি কেন্দ্রস্থির রস-কল্পনার অধীন করিতে পারে; পশু ও মানুষ, বন্য ও সভ্য, সুরূপ ও কুরূপ, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত এবং রুক্ষ ও কোমল, মেধ্য ও অমেধ্য, আদিম দুর্নীতি ও শিক্ষিত সুনীতি এই সকলের মধ্যেই তিনি জীবনের সেই একই রস-রহস্যের সন্ধান পাইয়া থাকেন।...তাঁহার কবিশক্তির আর-একটি উৎকৃষ্ট লক্ষণ এই যে, জীবনের যে রঙ্গভূমিতে এই সকল নটনটী অভিনয় করিতেছে তাহার দৃশ্যপটও কোথাও অবান্তর নহে—বাহ্য প্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতি একই সুরে বাঁধা। ছোটগল্পের স্বল্পপরিসরে মানবজীবনকাব্যের এমন রসঘন চিত্র যিনি অঙ্কিত করিতে পারেন ("রসকলি"র প্রথম ও শেষ গল্পটি বিশেষ করিয়া স্মরণ করিতেছি) তাঁহার প্রতিভার নিকট বাংলা-সাহিত্য আজিকার এই দুর্দিনে অনেক কিছু আশা করিয়া থাকিবে।

আমি সেদিন ওই বারান্দায় শুয়ে ওই কাগজখানির উপর-মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তারপর। গাঢ় সে ঘুম। এমন ভাবে একটি মর্মান্তিক বেদনা ও ক্ষোভ কয়েক মিনিটের মধ্যে মুছে যেতে পারে—এ জানতাম না সে দিনের আগে।

তাই বলছিলাম, অভয়দাতার প্রয়োজন হয়।

ওই ক্ষোভে এর পর আমার ওই নির্বাচনে উল্কার মতো সারা জেলাটা ঘুরে বেড়াবার কথা। কাগজ-কলম কুলুঙ্গিতে তোলা থাকবারই কথা।

কিন্তু মোহিতলালের এই প্রেরণা ক্ষোভ ভুলিয়ে দিয়ে যেন বলে দিয়েছিল, কিসের ক্ষোভ! কিসের বেদনা! অমৃতের সাধনা কর তুমি।

মোহিতলালকে পত্র লিখেছিলাম। প্রশংসা সম্পর্কে সংকুচিত হয়েই কিছু লিখেছিলাম। তার নকল আমার কাছে নেই। এবং সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে সমস্ত ঘটনা লিখে লিখেছিলাম, এমন ভাবে নিষ্ঠুর আঘাতে আহতকে সঞ্জীবিত যিনি করতে পারেন, তিনিই গুরু। আপনি আমার শত সহস্র প্রণাম গ্রহণ করুন।

পত্রোত্তর পেলাম—আমার সমালোচনার মধ্যে আপনার যে প্রশংসা আমি করিয়াছি তাহাতে আপনি বেশ সঙ্কোচ অনুভব করিয়াছেন। আমার কোন সঙ্কোচের কারণ নাই। সত্যকে আমি চিরদিনই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া থাকি। এ ক্ষেত্রেও তাহাই করিয়াছি। না বলিলেই অন্যায় করিতাম। ইহাতে আপনার সংকুচিত হইবার কোন কারণ থাকিতে পারে না, আবার ইহাতে স্ফীত হইয়া আত্মবিস্মৃত হইলেও মহাভ্রম করিবেন। সাধনা করিয়া চলুন।···

পরিশেষে ওই ঘটনা সম্পর্কে লিখেছেন—আঘাত পাইয়াছেন, ভালোই হইয়াছে। ইহাতে আপনার সৃষ্টিশক্তি জাগ্রত হইবার কথা। নিষ্ঠার সহিত এই সময় শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া সৃষ্টির কাজে লাগিয়া যান দেখি। আমার সৃষ্টির কাজ তখন আরম্ভ হয়েছে। "শনিবারের চিঠি"তে "ধাত্রী দেবতা" শেষ হয়ে আসছে এবং "প্রবাসী"তে এই বৈশাখ সংখ্যাতেই আরম্ভ হয়েছে "কালিন্দী"।

মোহিতলালের কথা অনেক। তিনি আমার গুরুদের অন্যতম। আমার জীবন-সাধনায় তাঁর কাছ থেকে অহরহ অভয়বাণী পেয়েছি।

মোহিতলাল আমার জীবনে একদা সত্য সত্যই আচার্যের কাজ করেছেন। জীবনের বিচলিত মুহূর্তে তাঁর অভয় এবং উৎসাহ পেয়েছি তপস্যাসিদ্ধ উত্তরসারকের অভয়ের মতো। তাঁর চরিত্র, তার সাধনার নিষ্ঠা, জীবন ও জগৎ-রহস্য উদঘাটন করে তার লীলা প্রত্যক্ষ করার বিচিত্র দৃষ্টি আমার উপর এমনই প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, তাঁকে একদা লিখেছিলাম—আমি দীক্ষা গ্রহণের জন্য গুরু অনুসন্ধান করিতেছি। আপনি কি আমাকে দীক্ষা দিতে পারেন?

এ একেবারে প্রথম দিকের কথা। অর্থাৎ "প্রবাসী"তে "রসকলি"র সমালোচনা প্রকাশের অনেক আগের কথা। যে সময় আমার কন্যাশোকের কথা পূর্বে লিখেছি সেই সময়ের কথা। "বঙ্গশ্রী" প্রকাশিত হবার কিছুকাল, বোধ করি ছ-সাত মাস, পরের কথা। তখন আমাদের কুলগুরুর শেষপুরুষ দেহরক্ষা করেছেন। এরও বৎসর তিনেক পূর্বে, একসময় তাঁর তল্পীবহনের

চেষ্টা করেছি, তখন কুলগুরু বলেছিলেন, এ পথে তো তোমার তৃপ্তি হবে না বাবা। তোমার মন ছুটেছে আলাদা সড়ক ধরে। তার দু ধারে বাড়ি, কাতারে কাতারে লোক। এ পথ যে জনমানবহীন পথ। আর দশজন যেমন, তোমার ধাত তেমন হলে আমি 'না' করতাম না। দিতাম কানে তিন ফুঁ। ব্যবসা, তেজারতি, চাষ, মামলা—দেওয়ানী ফৌজদারী করে ঘরে ফিরে কাপড় ছেড়ে আসনে বসে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে বীজমন্ত্রটি স্মরণে এনে জপে বসে যেতে; কারণের বোতল পেলেই 'কালী কালী বল মন, জয় তারা' বলে অকারণে চক্রের নামে কুচক্রে বসে যেতে। বাবা, আমরা তান্ত্রিক বামুন পণ্ডিত লোক, ইংরিজি মত বুঝি না, মনে করি—ওতে ইহলোকের খুব ভালো মন্ত্র আছে। একশোটা ধনদা-কবচ ধারণ করলে যা না হবে, ওই মতে দীক্ষা নিলে তাই হবে। তবে ও মন্ত্রে তারপর এগিয়ে যাওয়া বড় কঠিন। যারা চেষ্টা করে, তারা প্রায় দেখি নাস্তিক হয়ে যায়। তুমি বাবা সেই পথ ধরেছ। খানিকটা না এগুলে তোমার যে কি মতি হবে, তা তো বুঝতে পারছি না। যারা এক পা এপথে, এক পা ওপথে ফেলে চলে, ইহকালের জন্যে ইংরিজি মত আর পরকালের জন্যে দেশী মত ধরে, তাদের ধরনের মানুষ তুমি নও। কাজেই মন্ত্রদীক্ষা এখন তোমার নেওয়াও উচিত নয়; আমার দেওয়াও উচিত নয়। আগে তোমার মন স্থির হোক।

এ কথা আমার কন্যা-বিয়োগেরও পূর্বের কথা। ১৯৩০ সালের আন্দোলনেরও দু-এক বৎসর আগের কথা। কথাটি তখন আমার মনে রেখাপাত করেছিল। এবং আন্দোলন জেল ইত্যাদির প্রতিক্রিয়ায় ও জেলের মধ্যে ইউরোপীয় বিপ্লবীদের ইতিহাস ও দর্শন কিছু পড়াশুনা ও আলোচনার ফলে মনের গতি এমনই পশ্চিমাভিমুখী হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, ওই গুরুটিকে অজস্র ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম এই উপদেশের জন্য। তিনি অবশ্য তখন দেহরক্ষা করেছেন; জীবিত থাকলে ধন্যবাদের উত্তরে কি বলতেন জানি না।

যাই হোক, ১৯৩২ সালে কন্যা-বিয়োগের ফলে যে নিদারুণ আঘাত পেয়েছিলাম, তাতে মনের গতির কাঁটা উদ্‌ভ্রান্তের মতো পাক খাচ্ছিল। এই সময় মনে দারুণ তৃষ্ণা জেগেছিল পরলোকতত্ত্ব জানবার। তখন লাভপুরে থাকলে নিত্যই গিয়ে শ্মশানে বসে থাকতাম। এ সেই সময়ের কথা। কিন্তু দীক্ষা নেব কার কাছে? কি মন্ত্রে দীক্ষা নেব?

মোহিতলালের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর অকস্মাৎ একদিন মনে হল, এঁর কাছে দীক্ষা নিলে হয় না?

এ কথায় অনেকের মনে সংশয় জাগতে পারে। সেই কারণে এখানে এই প্রসঙ্গটি পরিষ্কার করা প্রয়োজন। নূতন কালের মানুষ যাঁরা, যাঁরা

পুরাতন কালকে দেখেন নি, তাঁদের কাছে হয়তো দীক্ষার কথাই সমগ্রভাবে প্রকাণ্ড একটা ভ্রান্তি এবং ব্যক্তিবিশেষের কাছে হাস্যকরও। কিন্তু আমি যে হিসাবে দীক্ষার কথা বলছি, সেটা ঠিক হাসির কথা নয়। দীক্ষা তাঁদেরও একটা করে আছে। জীবনে বিশেষ একটি মতবাদে পূর্ণ আস্থা স্থাপন করে সেই মতবাদসম্মত একটি দৃষ্টিভঙ্গিতে জীবন ও জগৎকে দেখা ও বুঝতে চেষ্টা করার কথাই আমি বলছি; মতবাদে বিশ্বাস স্থাপন করাটাই দীক্ষাগ্রহণ এবং সেই মতবাদসম্মত দৃষ্টিভঙ্গিতে জীবন ও জগৎকে দেখা, বুঝতে পারা এবং সেই মতবাদ-অনুমোদিত পন্থায় নিজের জীবনযাত্রা নির্বাহ করাই হল সেই সাধনা।

যাঁরা সেকাল দেখেছেন, তাঁদের মনে সংশয় জাগবে, আমি ব্রাহ্মণসন্তান হয়ে বৈদ্যসন্তান মোহিতলালের কাছে দীক্ষা চাইলাম কি করে? আয়ুর্বেদও অবশ্য পঞ্চম বেদ বলে স্বীকৃত। তবুও প্রচলিত সমাজবিধানে চতুর্বেদ-অন্তর্গত ব্রাহ্মণ ছাড়া এই গুরুর কাজে অধিকার অন্যের ছিল না। অন্তত গৃহীর ছিল না। তবে সন্ন্যাসীর এ বাধা নেই কারণ সন্ন্যাসীর জাতি নেই, বর্ণ নেই, ইহলোক পরলোক কিছুই নেই—আছে শুধু তপ এবং সাধনা। সেই তপ এবং সাধনা তাঁর কাছে সকলেই গ্রহণ করতে পারে, তিনিও বিতরণ করতে পারেন।

মোহিতলালকে আমার সন্ন্যাসী বলেই মনে হয়েছিল সেদিন। এবং অন্য দিক দিয়ে বিকৃত বর্ণাশ্রম ধর্মের গণ্ডীকে লঙ্ঘন করে যাওয়ার মতো সাহস ও প্রবৃত্তি দুইই তখন আমি পেয়েছি। জ্ঞানযোগে তাঁর দৃষ্টির গভীরতা, ধ্যান-যোগের মতো সাহিত্যতন্ময়তা, নিজের মতের দৃঢ়তা, জগৎ ও জীবন-ব্যাখ্যায় শুচিতা ও অশুচিতার ঊর্ধ্বস্তরের অনুভূতি অথচ তার প্রকাশে জ্যোতির্ময় পবিত্রতার ধারণা, সাধনফল সম্পর্কে নির্লোভ অনাসক্তি দেখে আমি তাঁকে সন্ন্যাসী ভাবতে দ্বিধা করি নি। দু-একবার ঢাকা গিয়ে সংসারের মধ্যেও মোহিতলালের সন্ন্যাসের আসন আমি দেখে এসেছি। এই দেখেই আমি গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁকে লিখেছিলাম, আপনি আমাকে দীক্ষা দিতে পারেন?

কি দীক্ষা নেব, সে সম্পর্কেও আমার ধারণা একটা ছিল।

আমাদের কুলগুরু আমাকে বলেছিলেন, শক্তিতন্ত্রে তোমাকে দীক্ষা নিতে হলে 'তারা'-মন্ত্রে নিতে হবে। শক্তিতন্ত্রে তারাই হলেন সরস্বতী। তারার অপর নামই হল—নীল সরস্বতী। কালী হলেন মহালক্ষ্মী।

কথাটা আমার মন মেনে নিয়েছিল। শক্তিতন্ত্রমতে দীক্ষাই যদি নিই, তবে এই মন্ত্র ছাড়া আর কোন্ মন্ত্র আমি নিতে পারি?

মোহিতলালকে যখন পত্র লিখলাম, তখন শক্তিতন্ত্রমতে দীক্ষা আমি নিতে চাই নি। আমি চেয়েছিলাম সারস্বত তন্ত্রমতে দীক্ষা। এমন কোন তন্ত্র বর্তমানে আমাদের দেশে প্রচলিত নেই, কিন্তু অতীত কালে তো ছিল। ভারতবর্ষে মহাকবি বাল্মীকি এবং মহর্ষি বেদব্যাসের জীবন থেকে তো এর আভাস পাই। আদিকবি রামচন্দ্রকে পূর্ণব্রহ্মের অবতার বলে স্বীকার করেও তাঁর মনুষ্যজীবন বর্ণনায় মহাকালের অমোঘ নিয়ম থেকে অব্যাহতি দেন নি। বেদব্যাস শ্রীকৃষ্ণকে জরাব্যাধের শরাঘাতে দেহত্যাগ করিয়েছেন, যদুবংশকে কুরুক্ষেত্রের প্রতিফলে গৃহযুদ্ধে ধ্বংস হতে দিয়েছেন। এই অনুভূতি এই দৃষ্টিলাভের জন্য অবশ্যই একটা সাধনা তাঁরা করেছিলেন। একটি ইষ্টকে তাঁরা ধ্যান করেছিলেন। এবং তাঁদের জীবনে যে পরিশুদ্ধতা, যে প্রসন্নতা, যে শান্ত কাঠিন্য আমরা দেখতে পাই, তাঁদের যে মহর্ষিত্ব স্বীকারে কোনো সংশয় জাগে না, তার একটি সাধনপন্থা নিশ্চয়ই আছে। সে পথ ও সে তন্ত্র পরবর্তী কালে যেন হারিয়ে গেছে। কালিদাস মহাকবি, কিন্তু মহর্ষি আখ্যা পান নি। অথচ নূতন কালে রবীন্দ্রনাথ ঋষিত্ব অর্জন করলেন আমাদের চোখের সামনে।

মধ্যযুগে কবিরা ঋষিত্বের পরিবর্তে ভক্তত্ব অর্জন করেছেন। তাতে তাঁরা জীবনে যাই পেয়ে থাকুন, ঋষিত্বের এবং ভক্তত্বের মধ্যে পার্থক্য থাকুক বা না থাকুক, একটু হিসেব করে দেখলেই দেখা যাবে যে, খাঁটি সারস্বত-সাধনা বা সরস্বতী-তন্ত্রমতে সাধনা তাঁদের মূল সাধনা ছিল না। তাই ঋষিদৃষ্টি তাঁরা অর্জন করেন নি। কথাটা সম্পর্কে আমার বাল্যকালে আমি যে সেকালের ঘরোয়া আলোচনা শুনেছি, সেই কথা এখানে বললে কথাটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

মধ্যযুগে চণ্ডীদাস থেকে রামপ্রসাদ পর্যন্ত কবিরা সাধক! ও-দিকে কবীর তুলসীদাসও তাই, ভক্ত-সাধক। এঁদের কাব্য সার্থক কাব্য, তবুও একটি বিশেষ রসের অভিসিঞ্চনে এমন অভিষিক্ত যে বৈষ্ণব কাব্যের মাল্যখানি যদি বলি, অগুরুচন্দনে এমনি চর্চিত যে মালতী-মল্লিকা-যূথী প্রভৃতি বিভিন্ন পুষ্পের বর্ণ এবং গন্ধ সেখানে ঢাকা পড়ে বা চন্দনগন্ধের সঙ্গে মিশে অন্য এক রূপ ও গন্ধ ধারণ করেছে, তবে অন্যায় বলা হবে না। শাক্ত কাব্যেও তাই, সে রক্তচন্দনের শোভাই বড়। সেকালে আমাদের শাক্ত কর্তারা বলতেন, মা সরস্বতী হলেন শক্তি এবং শিবের ঘরের গিন্নী কন্যা। মা-বাপের হাল-হদিস রুচি এমন কি তাঁদের আসল তত্ত্ব পর্যন্ত সব জানেন। তাই সাধকেরা শক্তি বা শিব যাকেই জানতে হোক, ধরে গিয়ে দিদিঠাকরুনটিকে। বলে—ঠাকরুন, তুমি দয়া করলেই ঠিক সুনজরে পড়ব এবং বেশি সুনজরে পড়ব। এখন বন্দে

দাও দেখি, কি ভাবে কথা বললে, কি নামে ডাকলে ও'রা খুশী হন, তোমার মা-বাপের আসল তত্ত্বটাও বলে দাও তো!

বৈষ্ণবেরা বলেন, ঠাকরুন, তোমার ঠাকুরটিকে তুমি যে ভালোবাসায় পেয়েছ, সেই ভালোবাসার তত্ত্বটা আমাদের বলে দাও দেখি। কিসে খুশী হন, কেমন করে ডাকলে খুশী হন বলে দাও তো!

অর্থাৎ সরস্বতী এ যুগে স্বাধীন সত্তা হারিয়েছেন। ঋষিদৃষ্টিতে কাব্য-সাধনা বিলুপ্ত হয়েছে।

নূতন কালে, বাংলা দেশে নবজাগরণের সময় সরস্বতী অর্থাৎ জ্ঞানযোগ নূতন করে স্বাধীন আসন পেয়েছেন। সারস্বত-তন্ত্রের পুনরুত্থান হয়েছে। বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ ঋষিত্ব অর্জনের স্বীকৃতি পেয়েছেন।

অবশ্য সাধারণভাবে মা-সরস্বতীর দুঃখ আরও বেড়েছে। সেখানে বণিকের মানদণ্ডটি রাজদণ্ডে পরিণত হওয়ায় বণিকের একমাত্র দেবতা, যিনি নাকি বাংলা দেশের মতে একাধারে সরস্বতীর সহোদরা এবং সপত্নী তিনি, অর্থাৎ মা-লক্ষ্মী ওই দাঁড়িপাল্লার দণ্ডটির তাড়নায় সরস্বতীকে করেছেন নিজের অধীন। একালে একেবারে হালে বি. কম., আই. কম-র সংখ্যাবৃদ্ধি সে সত্যটিকে একেবারে প্রকট করে দিয়েছে। সে দিক দিয়ে সরস্বতী এখন লক্ষ্মীর রাজমহলের দাসদাসী সরবরাহের আড়কাটিতে পরিণত হয়েছেন। যাই হোক, স্বল্প কয়েকজন সাধকের জীবনে একালে সেই প্রাচীন সারস্বত-তন্ত্রের নবজাগরণে আমি প্রত্যাশা করেছিলাম, এই দীক্ষাই নেব। দীক্ষার উপর তখন আমার একটা আকর্ষণ হয়েছিল, সে আমি পূর্বেই বলেছি। আমি সাহিত্যসৃষ্টিই করতে চাই নি; আমি জানতে চেয়েছিলাম জন্ম-মৃত্যুর রহস্যকে—বায়োলজি এবং মেডিকেল সায়েন্সের পরও যা আছে তাই, তাকে অনুভব করতে চেয়েছিলাম। অন্তত মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও চিত্তের আনন্দ অনুভবের শক্তি অর্জন করতে চেয়েছিলাম। সংযম নয়, ভয় সংবরণ নয়, আনন্দ-অনুভব-শক্তি, যা আজ নেই। নূতন কালের ভাবের ভাবুক কারও নেই। তাকে অর্জন করা যায় বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এ দীক্ষা দিতে পারতেন রবীন্দ্রনাথ। জীবনে তাঁর সাকার না হলেও নিরাকার একটি দেবতা ছিলেন। তিনি তাঁকে ধ্যান করেছেন নিত্য নিয়মিত। রবীন্দ্রকাব্যের সর্বত্র তাঁর আভাস ও অস্তিত্ব রয়েছে। কিন্তু তাঁর কাছে যাওয়ার আমার সাহস ছিল না, পূর্বেই বলেছি! তাই মোহিতলালকে লিখলাম।

মোহিতলাল লিখলেন—দীক্ষা লইয়া কি করিবেন? দীক্ষায় আমার নিজের কোনও বিশ্বাস নাই। আমার দীক্ষা সাহিত্যের দীক্ষা, সে মন্ত্র

আপনি স্ফুরিত হয়। অন্তরে বীজ থাকিলে সাধনার উত্তাপে নিষ্ঠার অভিসিঞ্চনে সে বীজ আপনি উপ্ত হইবে, মন্ত্র-চৈতন্য আপনি ঘটিবে।

আমি মনে মনে বিষণ্ণ হলাম। এবং এ কথা আর কখনোও তাঁর কাছে লিখি নি। উত্তরকালে শাক্ততন্ত্র নিয়ে অনেক কথাই তিনি আমাকে লিখেছেন। শাক্ততন্ত্রের প্রতি তাঁর একটা বিপুল আকর্ষণ ছিল। কিন্তু এ মন্ত্রে দীক্ষা নিতে তাঁর যেন কোথাও বাধা ছিল। সম্ভবত নূতন কালের ইউরোপীয় সাহিত্যের মাধ্যমে নাস্তিক্য-মতবাদের প্রভাবই ছিল সেই বাধা।

বাংলা দেশের কয়েকজন কবি—যাঁরা মোহিতলালের সমসাময়িক বা কিছু পূর্ববর্তী—তাঁদের জীবন দেখে মনে হয় এবং আমার দৃঢ়বিশ্বাসও বটে যে, মোহিতলাল যদি জীবনে দীক্ষা নিয়েই হোক বা না নিয়েই হোক কোনো দেবতাকে অনুভব করতেন, নিত্য-নিয়মিত ধ্যান করতেন, তবে তাঁর কাব্যসৃষ্টির প্রতিভা প্রদীপ্ততর হয়ে উঠত। বর্তমানে বাংলা দেশের সর্বাগ্রজ কবি করুণানিধান, কবি কুমুদরঞ্জন, কবি কালিদাস রায়কে দেখেই এই কথা বলছি। কথা বললেই এঁদের প্রসাদতৃপ্ত অন্তরের পরিচয় মেলে। মাত্র জ্ঞানযোগে সিদ্ধি অত্যন্ত কঠিন। সেখানে মধ্যপথে শূন্যবাদের মত্ততায় আচ্ছন্ন হওয়ার আশঙ্কা প্রবল। শূন্যবাদের মত্ততা মোহিতলালকে কোন দিন আচ্ছন্ন করে নি, তিনি জগৎ ও জীবনের বৈজ্ঞানিক নিয়মের মধ্যেও একটি নীতিকে আবিষ্কার করেছিলেন। তাকে তিনি জানতেন। মনে মনে মানতেনও। কিন্তু মনে মানা এক কথা এবং নিঃসংশয় বিশ্বাসে তার অনুশীলন আর এক কথা। কবি কুমুদরঞ্জন সম্পর্কে তিনি লিখেছেন—ইহার প্রধান লক্ষণ রূপপিপাসা। অর্থাৎ কবি কুমুদরঞ্জনের বৈষ্ণবীয় দৃষ্টিভঙ্গিও সৃষ্টির ধারার লক্ষণ। ইহার ভগবান যিনি তিনি আর কিছুই নন, তিনি পরম সুন্দর; বিশ্বের বিরাট দেউলে সেই পরম সুন্দরই তৃণ হইতে তারকা পর্যন্ত সর্বত্র বিরাজ করিতেছেন। বেদান্ত যাহাকে ব্রহ্ম নাম দিয়াছে, যাহাকে সর্বব্যাপী ও সর্বময় বলিয়াছে।···এ সম্পর্কে আলোচনা করে শেষে তিনি নিজেই লিখেছেন—ওই দেউল, ওই বিগ্রহ, ওই আরতির আনুষ্ঠানিক যাহা-কিছু সকলই সেই রূপ-পিপাসার শুধুই প্রতীক নয়, শুধুই রূপক নয়, কোন্ অর্থে (অর্থাৎ কোন্ দিক দিয়া) একেবারে একটা সাক্ষাৎ রূপ হইয়া উঠিয়াছে।

মোহিতলাল শূন্যবাদী হলে কাব্যরসটুকু স্বীকার করেও বক্রহাস্য হাসতেন। তা তিনি হাসেন নি। তিনি জ্ঞানবাদী হতে চেয়েছিলেন এবং কঠোর সাধনায় জ্ঞানযোগের শূন্যবাদের ধাপ অতিক্রমও করেছেন।

কিন্তু বিশেষ ইষ্ট এবং সেই ইষ্টের সপ্রেম ধ্যান করেন নি। সেই কারণেই তাঁর জীবনের কঠোরতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে।

ইউরোপীয় ধারায় যাঁরা সাহিত্য সাধনা করেছেন, তাঁদের কথা আমি বলছি না। তাঁদের প্রকৃতির ধাতু আলাদা। তাঁদের একটি বড় দল এবং স্বতন্ত্র ধারা এদেশে একালে সৃষ্টি হয়েছে। যদি বলি এঁদের দলে এবং ধারায় ভারতীয় ধারার বৈদিক ও তান্ত্রিক বা যে কোন মতের কোন মন্ত্র-দীক্ষাকে এঁরা স্বীকার করেন নি তবে অন্যায় বলা হবে না।

আরও একটু স্পষ্ট করে বললে এই দাঁড়ায় যে জগৎ ও জীবনকে দেখার ভঙ্গিতে এঁরা বস্তুপুঞ্জ ও মৃত্যুর মধ্যেই সমস্ত কিছুকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে জৈব কোষের ক্ষয়শীলতার মধ্যেই জীবনের স্ফুরণ এবং মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গিয়ে তার মধ্যেই জীবনের শেষ এঁদের। জৈব কোষের চরম ক্ষয়ের পরও অনন্তকাল প্রবহমান বিশ্বশক্তির সঙ্গে একাত্মতা অনুভব এঁরা করতে চান না। যেটা স্ফুরিত হল সেটার অস্তিত্বই ওই শক্তির মধ্যে ছিল—ততদূরও যেতে চান না। তাই দীক্ষা তাঁদের অবান্তর। রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা এঁদের কাছে স্বীকৃতি পান না।

এঁদের কথা যাক। মোহিতলালের কথা এবং নিজের কথা বলি।

প্রথমে দীক্ষার কথাই বলি।

মোহিতলালের সঙ্গে এই পত্রালাপের পরও আমার গুরুসন্ধানে আমি ক্ষান্ত হই নি। অকস্মাৎ এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। তিনি তান্ত্রিক নন, বৈষ্ণব নন খাঁটি যোগী—এবং সাগ্নিক তপস্বী। সন্ন্যাস গ্রহণের দিনে যে হোমকুণ্ড প্রজ্বলিত করে দীক্ষা নিয়েছিলেন সেই অগ্নিকে তিনি একমাত্র স্নান, আহার ইত্যাদি জৈব-কৃত্যের সময় ছাড়া, অহরহই স্পর্শ করে থাকেন। এই লোকটিকে দেখে আমার দীক্ষাগ্রহণের আকাঙ্ক্ষা আবার প্রবল হয়ে উঠল। আত্মসংবরণ করতে পারলাম না। প্রথম দিন প্রথম দর্শনেই তাঁকে প্রার্থনা জানালাম, বাবা, আমার চিত্ত বড় অশান্ত, দীক্ষার জন্য আমি ব্যাকুলতা অনুভব করি। আপনি আমাকে দীক্ষা দেবেন?

সন্ন্যাসী তখন দীর্ঘপথশ্রমে ক্লান্ত, সদ্য আসন গ্রহণ করে তাঁর বহনকরা অগ্নি দিয়ে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করছেন। তিনি উত্তর দিলেন, বাবা, সুধা রাখতে গেলে হিরণ্ময় পাত্র অর্থাৎ স্বর্ণপাত্রের প্রয়োজন হয়, মৃৎপাত্রে হয় না।

মনে কঠিন আঘাত পেলাম। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে 'নমো নারায়ণায়' বলে প্রণাম জানিয়ে চলে এলাম। এই প্রণাম-পদ্ধতির তুল্য অপরূপ প্রণাম-পদ্ধতি আর নেই। মানুষকে প্রণাম কেউ করে না। মানুষের অন্তরস্থ নারায়ণ অর্থাৎ দেবত্ব বা মহত্ত্বকে প্রণাম জানায়।

এর পর এই সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমার এক অদৃশ্য দ্বন্দ্ব শুরু হল। বিচিত্র সে দ্বন্দ্ব। সেই দ্বন্দ্বের শেষে সেই অদ্ভুত সন্ন্যাসী নিজে আমাকে বুকে টেনে নিয়ে বিচিত্রভাবে আমাকে পরাজিত করলেন। সে পরাজয়ে যে আনন্দ, তার আস্বাদ আজও আমার অন্তরলোকে অমৃতের মতোই অক্ষয় হয়ে আছে। তাঁর প্রসঙ্গ আমার জীবনকে ধন্য করে দিয়েছে। সে অমৃতে সেদিন আমার সকল অশান্তির দাহ জুড়িয়ে গিয়েছিল।

তিনি আমাকে দীক্ষার কথায় বলেছিলেন, দীক্ষার জন্য অধীর হয়ো না। জীবনে যার সাধনা থাকে, তার গুরু আপনি আসেন। তোমার গুরু আসবেন। তোমার সাধনা তুমি করে যাও। শুনেছি, তুমি জ্ঞানের সাধনা কর। তার সঙ্গে এই রকম কর্মের সাধনা কর। নইলে পূর্ণ হবে না সাধনা। আমি তখনকার মতো গুরুর সন্ধানে বিরত হলাম। রত হলাম সাহিত্য-সাধনায়।

চোদ্দ

বলতে বলতে খানিকটা সময়ের ফের ঘটে গেছে। অনেকটা পরের কথায় চলে এসেছি। ফিরে যেতে হবে পিছনে। "বঙ্গশ্রী"র আমলে। তখন সবে "চৈতালী ঘূর্ণি", "পাষাণপুরী", "ছলনাময়ী" ও "রাইকমল" বের হয়েছে। থাকি কালীঘাট-বালিগঞ্জের ঠিক মাঝখানটিতে একটি বস্তির ধারাধারি, ঘরখানি টিনে ছাওয়া, পাকা মেঝে, পাকা দেওয়াল। আমাদের দেশের ষষ্ঠীচরণ দাস বালিগঞ্জে আমারই গ্রামবাসী বন্ধু কালীকিঙ্করদাদার বাড়ি খানসামার কাজ করে, সে এসে দিনান্তে একবার পথের কল থেকে জল তুলে দেয়, ঘরদোর পরিষ্কার করে দেয়, বসে ঘুমোয়, মধ্যে মধ্যে বলে—কি লেখেন বাবু, পড়ুন শুনি! সে বুঝতে পারে দেখে উৎসাহিত হই। খাই পাইস হোটেলে—তাও একটা নির্দিষ্ট হোটেলে নয়, কালীঘাট থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত পথের মধ্যে যেটা যেদিন ক্ষুধার সময় চোখে পড়ে সেটাতেই। খরচ, মাসে পঁচিশ-তিরিশ টাকার বেশি নয়। তাও সব মাসে কুলোয় না। যে মাসে টাকা ফুরোয়, সে মাসে তিনটে টাকা থাকতেই লাভপুরে রওনা হই। আবার কিছু লিখে, কোনক্রমে দশটা টাকা যোগাড় করে কলকাতা রওনা হই এবং কাগজের আপিসে আপিসে ঘুরে সেগুলি দাখিল করে আসি আর অনুরোধ জানাই যাতে সেই মাসেই প্রকাশিত হয়। তা হলেই টাকাটা পাব। লেখা বের না হলে তো টাকা পাওয়া যাবে না! পাওয়ার মতো

প্রতিষ্ঠাও হয় নি, আর আমি চাইতেও পারতাম না, মুখে বাধত। দুটো জায়গা ছিল যেখানে গল্প দাখিল করেই টাকাটা চাইলেই পাওয়া যেত। "বঙ্গশ্রী"তে সজনীকান্তের কাছে আর "দেশ" পত্রিকার আপিসে, পবিত্র গাঙ্গুলীর তদ্বিরে এবং সুপারিশে। পবিত্র তখন "দেশ" পত্রিকার সহকারীর কাজ করেন। সম্পাদক শ্রীযুক্ত বঙ্কিম সেন মশায় তখন বোধ হয় দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন, আসতেন না। সব কাজের কর্তা ছিলেন শ্রীযুক্ত মাখন সেন মশায়ের দক্ষিণহস্তস্বরূপ এক ব্যক্তি। সমগ্র "আনন্দবাজারে"ই তাঁর অপ্রতিহত প্রতাপ। তিনি কর্মী মানুষ, গুণীও বটেন। কিন্তু এসব স্বীকার করেও এইটুকু নালিশ করব, তিনি মেজাজী ও রূঢ় মানুষ, এবং সে রূঢ়তা সেকালে "আনন্দবাজারে"র আপিসে আধিপত্যের উত্তাপে অসহনীয় ও অশোভন হয়ে উঠত। এঁর সাহিত্য-বিচার নির্ভর করত মেজাজের উপর। "দেশ" পত্রিকায় আমার প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়েছিল একটি পূজা-সংখ্যায়, গল্পটির নাম— "নারী ও নাগিনী"। এই গল্পটি সম্পর্কে তিনি নাকি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলেছিলেন, ফরাসী গল্পের সমকক্ষ; এবং দক্ষিণা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন দশ টাকা। দশ টাকা সেকালে আমার পক্ষে অনেক। এর পর থেকে সাধারণ সংখ্যা "দেশে" আমার অনেক গল্প বেরিয়েছে। সাধারণ সংখ্যায় প্রকাশিত গল্পের দক্ষিণা ছিল—পাঁচ টাকা। সজনীকান্তের কাগজ মাসিক-কাগজ। মাসে একবারের বেশি সেখানে যাওয়া যায় না এবং প্রতিমাসেও যাওয়া যায় না। সে যাওয়ার উপায় থাকলে মাসের অর্ধেক সমস্যা মেটে—পনের টাকা পাওয়া যায়। "দেশ" মাসে চারখানা বের হয়। সেখানে বার-দুই যাওয়া যায় এবং দশটা টাকা মেলে। এই যাওয়া-আসার অভিজ্ঞতায় এই ভদ্রলোকের বিচিত্র বিচারপদ্ধতি আমার পক্ষে তিক্ততার কারণ হয়ে আছে। মেজাজ ভালো থাকলে লেখার প্রশংসা করে নিয়েছেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই ভাউচার সই করে দিয়েছেন। আবার মেজাজ খারাপ থাকলে শোরগোল তুলেই এমন ভাবে 'না' বলেছেন যে লজ্জায় মরে গিয়েছি ভিক্ষুকের মতো। "মুসাফেরখানা" গল্পটি ভালো গল্প, সে গল্পও খারাপ মেজাজে ফিরিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, এটা একটা ডাস্টবিন নয়। "মহামারী" বলে একটি গল্পের কথাও মনে পড়ছে। শীতের সময়, বোধ হয় মাঘ মাস, বাদলা নেমেছে, সে দিন আমার হাত রিক্ত হয়ে পড়েছে প্রায়; তিন টাকাও অবশিষ্ট নেই; লাভপুর পালাতে হলে বিনা টিকিটে যেতে হবে—এমনই অবস্থা! একটি লেখা—ওই "মুসাফেরখানা" ("রসকলি" নামক গল্প-সংগ্রহে প্রকাশিত) নিয়ে "দেশ" আপিসে গেলাম একটা-দেড়টার সময়। সেদিন কিছু একটা হয়েছিল আপিসে। নিচের তলায় শ্রীযুক্ত মাখন সেন মশায়ের ঘরে কর্তাব্যক্তিরা

ছুটোছুটি করছেন। পবিত্র বললেন, বসুন ভাই, আজ একটু অপেক্ষা করতে হবে। বসলাম, বিড়ি টানতে লাগলাম একটার-পর-একটা। মধ্যে মধ্যে চা। ওটা সেকাল থেকেই "আনন্দবাজারে" মহোৎসবের মতো অঢেল। চাইলে তো মেলেই, না চাইলেও মেলে; নূতন আগন্তুক এলেই তাঁকে সংবর্ধনার সময় উপস্থিত সকলকেও পরিবেশন করে যায় বেয়ারা। আপিসের কর্তার স্লিপ সই করিয়ে নিয়ে যায়। বেলা চারটে নাগাদ পবিত্র গল্পটা হাতে করে গেলেন কর্তাব্যক্তিটির কাছে। লেখাটা হাতেই ফিরে এসে বললেন, আজ নয়, কাল; কাল আসতে বললেন। আমি একটু সাহস করে একখানা স্লিপে লিখে দিলাম, আমার প্রয়োজন অত্যন্ত জরুরী। যদি অনুগ্রহ করে আজই দেখে ব্যবস্থা করেন তো অনুগৃহীত হই। পবিত্রকে বললাম, এটা নিয়ে আর-একবার যান ভাই; পবিত্র এবার লেখাটা তাঁর হাতে দিয়ে ফিরে এলেন, বললেন, বসুন। আধ ঘণ্টা পর তিনি চটির শব্দে ঘরখানিকে সচকিত করে তুলে এসে টেবিলের উপর লেখাটি ফেলে দিলেন এবং একটি 'না' শব্দ উচ্চারণ করে দিয়েই চলে গেলেন। সে দিনে শীতের সন্ধ্যায় টিপিটিপি বৃষ্টির মধ্যে বর্মণ স্ট্রীট থেকে মনোহরপুকুর সেকেণ্ড লেন পর্যন্ত হেঁটে বাড়ি ফিরেছিলাম। এর পর শ্রীযুক্ত মাখন সেন মহাশয়ের সঙ্গে পরিচয় হলে অনেকখানি এই উত্তাপ থেকে রেহাই পেয়েছিলাম। "আনন্দ-বাজারে" আমার "প্রতিমা" গল্প যেবার প্রকাশিত হয়, সেবার এই গল্পটিই "আনন্দবাজারে" সেরা গল্প হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল—সেই সূত্রেই আলাপ, সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন সজনীকান্ত, এবং সেই হিসেবে আমিই পেয়েছিলাম সর্বোচ্চ দক্ষিণা—পঁচিশ টাকা। সে অবশ্য পরের কথা।

কাগজের আপিসে এই অবস্থা হলেও তখন কিন্তু তরুণ মহলে খ্যাতি হয়েছে আমার। মধ্যে মধ্যে কলেজের ছেলেরা আসতেন। তিনটি ছেলে প্রায় নিয়মিতই আসতেন। এঁরা তিনজনেই ছিলেন কবিযশঃপ্রার্থী। এঁদের একজন আজ নেই, অনেক কাল আগেই নিতান্ত তরুণ বয়সেই মৃত্যু তাঁর জীবনে ছেদ টেনে দিয়েছে। তাঁর নাম ছিল ফাল্গুনী রায়, তাঁর মা দু-চারটি ভালো গল্প লিখেছিলেন। মায়ের প্রথম গল্প এবং আমার প্রথম গল্প 'কল্লোলে'র এক সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয়েছিল। নৃসিংহবালা দেবী তাঁর নাম। ফাল্গুনীরা আসতেন তিনজন—ফাল্গুনী, সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় এবং বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। এঁদের সঙ্গে একালের নাম-করা লেখক সুশীল জানাও বোধ হয় মধ্যে মধ্যে আসতেন। সুধীরঞ্জন এবং বিশ্বনাথ—এঁরাও আজ সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। সুধীরঞ্জন সেকালে বড় মুখচোরা ছিলেন। এসে চুপ করে বসে থাকতেন। গৌরবর্ণ, মিষ্ট চেহারার কিশোর। মধ্যে মধ্যে অনুরোধ

করতেন, তাঁদের বাড়ি যাবার জন্য। কাছেই তাঁদের বাড়ি ছিল। বলেছিলাম, যাব। কিন্তু পরিচয়ে একদিন জানলাম, সুধীরের বাবা জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট। শুনেই মন আমার বেঁকে গেল। পুলিস সাহেব সামসুদ্দোহার কুটিল ধর্মাধর্মহীন ব্যবহারে তখন আমার মন ইংরেজের চেয়েও ইংরেজের কর্মচারীদের উপর বেশি বিরূপ। অবশ্য বীরভূমে সামসুদ্দোহার আমলেই ছিলেন শ্রী. কে. কে. হাজরা জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁর দৃঢ় ন্যায়পরায়ণতায়, ভদ্র ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হয়েছি। শ্রীযুক্ত হাজরার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না; জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে পরিচয় করবার মতো যোগ্যতাও ছিল না, কোনোদিন কোন প্রয়োজনও হয় নি তাঁর কাছে যাবার। তবুও যা শুনেছিলাম, দূর থেকে অন্য লোকের সঙ্গে কথাবার্তায় শুনেছিলাম, তাতেই মুগ্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু শ্রী কে. কে. হাজরা একজন দুজন ছাড়া মেলে না। আজও না। সরকারী কর্মচারীদের কথার ঝাঁজ, চোখা-বাঁকা-ধারালো খোঁচা আজও অনুভব করি, সইতে হয়, এই তো সেদিন—। থাক, সে কথা, সে কথা যথাস্থানে লিখব।

সেবার পুজোর সময় যে কটি গল্প লিখেছিলাম, তার মধ্যে "রায়বাড়ি" গল্পটি অন্যতম। "রায়বাড়ি" গল্পটি আমার খুব প্রিয় গল্প। তার কারণ পরে বলব। গল্পটি লেখার ছোট্ট ইতিহাস বলব। পুজোর আগে দেশে গিয়েছি, আমার বন্ধু জগবন্ধু ডাক্তার এসে একখানা ছাপা কাগজ আমার হাতে দিলেন। বললেন, তাঁদের গ্রামের আমাদেরই বন্ধু শরৎচন্দ্র চন্দ মাস্টারের পুরনো ঘরের মেঝে বাঁধাবার জন্য জিনিসপত্র বের করা হয়েছে, তার মধ্যে এটা ছিল। দেখ, এটা কি বল দেখি! সত্যই কাগজখানা বিচিত্র! একটা ছাপানো জিনিসের ফর্দ। এবং সে ফর্দ দেখে একালে ইংরিজিজানা মহলের এক-আধজন বহুদর্শী ছাড়া বলতে পারবেন না, সেটা কিসের ফর্দ। একটা মস্ত বড়—অন্তত সাত-আট পৃষ্ঠা ফর্দের এক পৃষ্ঠার আধখানা। আজও যত দূর মনে পড়ছে, তাতে তিল কুশ থেকে আরম্ভ করে কোশাকুশি, পুষ্পপাত্র, কুশাসন, কম্বলের আসন, হাঁড়ি, মালসা, পিতলের গ্লাস, আতপচাল, ঘি, আলু, কচু, লবণ, হলুদ, হরতকী, মিষ্টান্ন, একদফা কাষ্ঠ, মায় খড়কে কাঠি পর্যন্ত রয়েছে। ফুল-বিল্বপত্র বাদ পড়ে নি। আরও আছে, জলের জন্য জালা, ঘটি, হস্তপ্রক্ষালনের জন্য মৃত্তিকা, দাঁতনকাঠি, এবং চাকর একজন—এও তার অন্তর্ভুক্ত।

দেখে আমি বললাম, এ কোন বিরাট ক্রিয়ার ফর্দ। এটুকুতে যা আছে, তা দেখে মনে হচ্ছে, সে ক্রিয়া অন্নপ্রাশন উপনয়ন বিবাহ নয়; হয় শ্রাদ্ধ, নয় দেবপ্রতিষ্ঠা, যাতে বহু পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এটুকুতে

পণ্ডিতদের সংবর্ধনা এবং পরিচর্যার ব্যবস্থার ফর্দ রয়েছে। কিন্তু এত বড় শ্রাদ্ধ বা ক্রিয়া কোথায় হয়েছে এখানে? বড় বড় রাজা মহারাজা ছাড়া কোথায় হবে এখানে? বড় জমিদার বলতে বরেন্দ্রভূমে। রাঢ়দেশে কজন রাজা আছেন—বর্ধমান, কাশিমবাজার, কাঁদী। আর দু-চার জন রাজা আমাদের অঞ্চলে আছেন, কিন্তু তাঁরা কীর্তির জন্য খ্যাত নন। সম্ভবত এঁদের বাড়িরই কোন ক্রিয়ার ফর্দ, শরৎ চন্দদের বাড়িতে এসেছে বিচিত্রভাবে। ওদের এককালে ছিল মসলাপাতির দোকান, কোন জিনিসের মোড়ক হয়ে চলে এসে থাকবে।

ফর্দটি আমি রেখে দিলাম। মনের মধ্যে দেবপ্রতিষ্ঠার কথাটা বড় হয়ে উঠল না, শ্রাদ্ধের কথাই ঘুরতে লাগল। মহাসমারোহের কোন শ্রাদ্ধ। দশ দিনের মধ্যে শ্রাদ্ধ, নকল করে চল্লিশ-পঞ্চাশ খানা ফর্দ তৈরিতে সময় লাগবে, তাই হয়তো ছাপানো হয়েছিল। এর সঙ্গে যোগ দিল "জলসাঘরে"র সুর। সেই বছরেই গত বৈশাখে "জলসাঘর" বের হয়েছিল এবং "জলসাঘর"ই আমাকে পরিচিত করে দিয়েছিল পাঠক-সমাজের মধ্যে। বহুজনের অভিনন্দন পেয়েছিলাম। কে বলেছিলেন মনে নেই, বলেছিলেন—"জলসাঘরে"র ভাঙনের কথা লিখলেন; গড়নের কথা লিখুন। তখন থেকেই কল্পনা ছিল—আরও দুটি গল্প লিখে "জলসাঘর" নাম দিয়েই একটি বই প্রকাশ করব। প্রথম জলসাঘর গড়ে ওঠা, দ্বিতীয় জলসাঘরের পরিপূর্ণ জৌলুস, তৃতীয় এবং শেষেরটি আগেই লেখা হয়ে আছে। সেই কল্পনা নিয়েই এই ফর্দটিকে উপলক্ষ করে "রায়বাড়ি" লিখলাম—লিখলাম—জলসাঘর গড়ে ওঠার গল্প। জলসাঘরের ভাঙনের কথা মনে রেখেই লিখলাম "রায়বাড়ি"। প্রজাদের অভিসম্পাত থাকল। "রায় বাড়ি"র বিশ্বম্ভর রায়ের চরিত্র চোখে দেখি নি, কিন্তু এমন চরিত্রের' কথা গল্পে আমি শুনেছিলাম। ছেলেবেলা থেকে শুনেছি এবং এমনি কঠিন চরিত্রের মানুষের ছায়া আমার পিতৃপুরুষদের মধ্যে, পিতৃপুরুষদের সমসাময়িকদের মধ্যে দেখেছি বলেই এ চরিত্র এত সজীব, এত বাস্তব আমার কাছে। ১০৯২ নং লাটটি আমাদেরই ছিল। ওই লাট শাসন করতে না পেরে আমারই পূর্বপুরুষ সেকালের নামকরা এক দুর্ধর্ষ জমিদারকে পত্তনি দিয়েছিলেন। সে জমিদারটির নাম আমাদের ও-অঞ্চলে আজও লোকের কাছে গল্পের কথা হয়ে আছে। তিনি ছিলেন মুর্শিদাবাদের নিমতিতার জমিদার গৌরসুন্দর চৌধুরী। এবং ১০৯২ নং লাটের প্রজাদের নিমতিতায় গৌরসুন্দরের সঙ্গে মিটমাট করতে যাওয়ার ছবিটুকু একেবারে বাস্তব সত্য। গল্পের শেষে আছে, দুকূলপ্লাবী গঙ্গার বুকে নৌকা ভাসিয়ে বিশ্বম্ভর নিরুদ্দেশ যাত্রায় চলে যাবেন। জলসাঘরের বাতি আধখানা জ্বলে সেদিন নিবে গিয়েছে। রায়বাড়ি অন্ধকার। সন্ন্যাসীর গেরুয়া

পরিধান করে রায় একখানি দণ্ড হাতে নিয়ে গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন গঙ্গার ঘাটে। চলে যাবেন। একবার ফিরে তাকালেন বহু মমতার রায়বাড়ির দিকে। দেখলেন, এ কি! আবার আলো জ্বলেছে, রায়বাড়ির সেই জলসাঘরে; সেই আধপোড়া বাতিগুলিই আবার জ্বলে উঠেছে! সেই আলোতে ঘরে তাঁর পূর্বপুরুষদের ছবিগুলো দুলছে, তাঁরা যেন তাঁকে ডাকছেন। ফিরে আসতে বলছেন! চোখে তাঁর জল এল। তিনি ফিরে এলেন। কালী বাগদী কালী-বাড়ির বিরাট সিংহদ্বারে গিয়ে সবলে করাঘাত হানলে—দুয়ার খোল।

"জলসাঘরে"র মাঝের গল্প আর লেখা হয়নি। লিখি নি। এর এক বৎসর পরেই "জলসাঘর" বই প্রকাশিত হল। সজনীকান্ত জলসাঘরের "জলসাঘর" প্রকাশ করবেনই। সেই কারণেই ওই দুটিকে এক করেই জলসাঘরের পালা শেষ করলাম।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নৃত্যনাট্যের দল নিয়ে কলকাতায় এলেন। আমি একদিন "জলসাঘর" হাতে নিয়ে বিচিত্রা-ভবনে উপস্থিত হলাম। তাঁকে প্রণাম করে বইখানি তাঁর হাতে দিয়ে চলে এলাম। এখানে এম্পায়ারে এবং ছায়ায় নৃত্য-নাট্যের পালা হল। সে বোধ হয় সবসুদ্ধ সাত-আট দিন। এরই মধ্যে তাঁর কাছে যাঁরা যাওয়া-আসা করলেন, তাঁদের কাছে "জলসাঘরে"র প্রশংসার কথা শুনলাম। কলকাতার নৃত্যনাট্যের পর্ব শেষ করে তিনি শান্তিনিকেতনে ফিরলেন। ফেরার পথে তাঁর হাতে নাকি "জলসাঘর" বইখানি ছিল। ট্রেনেই তিনি ইরিসিপ্লাসের আক্রমণে জ্ঞান হারান বা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। এরপর কয়েকদিন চেতনাহীন অবস্থা তাঁর। গোটা দেশ উৎকণ্ঠায় আহার নিদ্রা ত্যাগ করে তাকিয়ে রইল শান্তিনিকেতনের দিকে। সে কি উদ্বেগ! তারপর মেঘ কাটল, আবার আলোয় ভরে উঠল দেশ। কবির চেতনা ফিরেছে। আশঙ্কা কেটে গিয়েছে। এ সংবাদ যেদিন কাগজে বের হল, ঠিক তার তৃতীয় দিনে দুখানি পত্র পেলাম শান্তিনিকেতন থেকে। একখানি লিখেছেন সুধীর কর—কবির প্রাইভেট সেক্রেটারি, অন্যখানি শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সুধীর কর লিখেছেন—তারাশঙ্করবাবু পত্রপাঠ যদি একখানি "জলসাঘর" কবিকে যে-ভাবে লিখে দিয়েছিলেন তেমনি লিখে পাঠিয়ে দেন তবে অত্যন্ত উপকৃত হব। গুরুদেবকে যে বইখানি দিয়েছিলেন সেখানি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সম্ভবত তাঁর অসুখের সময় যে সব ভক্ত এখানে এসেছিলেন তাঁদেরই কোন সাহিত্যরসরসিক বা রসিকা নিজের পিপাসা মেটাবার জন্য নিয়ে গেছেন। এদিকে গুরুদেব বইখানির বার বার খোঁজ করছেন। না-পেলে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হবেন। পাঠালে অত্যন্ত উপকৃত হব। আমার নামে বা রথীন্দ্রবাবুর নামে পাঠাবেন।

শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রবাবুর পত্র সংক্ষিপ্ত। তিনি লিখেছেন—শ্রীসুধীর কর আপনাকে পত্র লিখছেন। একখানি বই পাঠালে অত্যন্ত খুশী হব।

বই পাঠিয়ে দিলাম সেই দিনই।

এর কয়েক দিন পর "প্রবাসী" আপিসে পুলিন সেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মৃদুহাস্যসহকারে বললেন, শুনেছেন নাকি?

বুঝলাম না কথা। উত্তরে প্রশ্নই করলাম, কি?

একটু বিস্মিত হয়েই পুলিনবাবু বললেন, সে কি? কেউ জানায় নি?

না তো। কি?

পুলিনবাবু আবার হেসে বললেন, না, তাহলে বলব না। থাক। শীর্ণকায় মানুষটি আপনি স্ফীতকায় হয়ে উঠবেন। হয়তো বা ফেটেই যাবেন।

আমি আর বার দুই অনুরোধ করেই ক্ষান্ত হলাম। এটুকু আমার স্বভাবের বাইরে। তবে সংবাদটা পেলাম। শ্রীযুক্ত সুধীর করই আমাকে জানিয়েছিলেন। চেতনা ফিরে পেয়ে কবি চেয়েছিলেন তাঁর বিজ্ঞানের বইয়ের প্রুফ আর চেয়েছিলেন "জলসাঘর" বইখানি। ওই "রায়বাড়ি" গল্পে, গেরুয়া পরে সর্বস্ব ত্যাগ করে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়ে, গঙ্গার ঘাটে নৌকায় উঠতে গিয়ে বিশ্বম্ভর রায় বারেক ফিরে তাকিয়ে যে দেখলেন, অন্ধকার রায়বাড়ির জলসাঘরে আবার জ্বলে উঠেছে আধ-নেবানো বাতিগুলি এবং সেই আকর্ষণে যে আবার তিনি ফিরে এলেন, এরই মধ্যে অচৈতন্যের অন্ধকার থেকে চৈতন্যের দীপ্তির মধ্যে তাঁর নিজের ফিরে আসার একটি মিল পেয়েছেন বলে তাঁর মনে হয়েছে।

শ্রীযুক্ত সুধীর কর লিখেছেন, গুরুদেব কোন খ্যাতনামা কবিকে আপনার সম্পর্কে একখানি মূল্যবান পত্র লিখেছেন। তাতে ইউরোপের গল্পলেখকদের সঙ্গে আপনার তুলনা করেছেন। পারেন তো চিঠিখানি সংগ্রহ করুন।

যাঁকে লিখেছেন তিনি খুব সম্ভব ৺সুরেন্দ্র মৈত্র মহাশয়। কারণ মধ্যে মধ্যে আমার সম্পর্কে কিছু বলতে হলেই বলতেন, রবীন্দ্রনাথ তারাশঙ্করকে চিনিয়েছিলেন আমাকে! যাই হোক, আমি কিন্তু কোন খোঁজ করি নি।

কি বলে যাব? কি বলব?

এই কারণেই "জলসাঘরে"র "রায়বাড়ি" আমার খুব প্রিয় গল্প। কিন্তু গল্পটি মাসিকপত্রের কর্তৃপক্ষের কাছে আদৌ সাদর অভ্যর্থনা পায় নি। এই পত্রিকাটির আপিসের নিয়ম ছিল গল্প যাবে মালিকের কাছে। তিনিই গল্প নির্বাচন করতেন। আগে সম্পাদকদের হাতে দিতাম, তিনি পাঠিয়ে দিতেন

কর্তার দপ্তরে। এ সময়ে কর্তার কাছে সরাসরি দিয়ে আসবার মতো সাহস এবং প্রতিষ্ঠা আমার হয়েছিল। আমি গল্পটি কর্তার হাতে দিতেই তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললেন, এই তো পর পর তিন-চারটে গল্প আপনার ছাপা হল। আবার এখন কেন? আমি বললাম, থাক আপনার কাছে, এক মাস পরেই ছাপবেন।

তিনি আর কোনও কথা বললেন না। লাল পেনসিল দিয়ে একটা ঢেঁড়াচিহ্ন দেগে রেখে দিলেন। ঢেঁড়া কাটা চিহ্নটাই এমনি যে, কাটা অর্থাৎ বাতিল ইঙ্গিতটা মুহূর্তে বুঝিয়ে দেয়। আমি সন্দিগ্ধ হযে সম্পাদকীয় দপ্তরে গিয়ে কথায় কথায় চিহ্নটার অর্থ জিজ্ঞাসা করলাম। উত্তর পেলাম, ওটার অর্থ রিজেক্‌টেড। যাবে না।

সম্পাদকীয় দপ্তরে কোন কথা না বলেই ফিবে এলাম। লেখাটাও ফিরিয়ে আনলাম না। মনে মনে স্থির করলাম, থাক, ওঁরাই ফিরিয়ে দিন।

গল্পটি কিন্তু পরের মাসেই ছাপা হল। তখন আমি দেশে। একটু বিস্মিত হলাম। তখন আমার শরীর খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে। পাইস হোটেলে খাওয়ার ফল ফলেছে। দুরন্ত পেটের রোগে ভুগছি।

পুজোর ঠিক পরেই কিছুদিনের জন্য পাটনায় মামাদের ওখানে যাব স্থির করলাম। যাব—হঠাৎ বাধা পড়ল "গণদেবতা"য় যে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার কথা আছে, সেই দাঙ্গা আমাদের দেশে বেধে ওঠবাব উপক্রম হল।

শুরু ওই একটা তালগাছ নিয়েই। মুসলমানটির নামও ওই রহম শেখ। এবং এই ঘটনাটি আমার জীবনে লাভপুরের সঙ্গে বন্ধন-সূত্রে আবার হানলে কঠিন আঘাত।

একটি তালগাছ কাটার ঘটনা উপলক্ষ করে আমাদের ও-অঞ্চলে যে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বাধবার উপক্রম হল তার এক পক্ষে রহম শেখ, অন্য পক্ষে আমাদের গ্রামের প্রধান ধনী ষষ্ঠীকিঙ্করবাবু। এ ঘটনাটি "পঞ্চগ্রামে"র মধ্যে জুড়ে দিয়েছি। তখন লীগ-আমলের প্রথম। লীগ-মন্ত্রিত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রথম বা দ্বিতীয় বৎসর। সামান্য ঘটনাটিকে উপলক্ষ করে অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই যে ভয়ঙ্কর একটা বিপর্যয় ঘটবার উপক্রম হল সে স্মরণ করলে আজও শিউরে উঠি। আমিও এর মধ্যে প্রায় স্বেচ্ছায় জড়িয়ে পড়েছিলাম; জড়িয়ে পড়েছিলাম হিন্দুদের পক্ষেই, পঞ্চগ্রামের দেবু ঘোষের মতোই। ফলে যখন সদর থেকে রিজার্ভ ফোর্স এসে হাজির হল এবং গ্রামেব ভিতর দিয়ে রাস্তায় রাস্তায় মার্চ করে বেড়ালে, তখন আমাব বাড়ির সামনেই তাদের হল্ট হুকুম দিয়ে সেখানেই প্রায় আধ ঘণ্টা লেফট-রাইট কুচকাওয়াজ করিয়ে বেশ হুমকি দেখিয়ে গেল। যতদূর মনে পড়ছে, সে দিনটি ছিল কোজাগরী

পূর্ণিমার পর তৃতীয়া কি চতুর্থী। এদিকে পুজোর পর ত্রয়োদশীতেই আমার পাটনা রওনা হওয়ার কথা ছিল কিন্তু এই কারণেই আটকে গিয়েছি। সে দিন রিজার্ভ ফোর্স এসে পড়তেই আমি নিশ্চিন্ত হয়ে সেই রাত্রেই বেরিয়ে পড়ব স্থির করলাম। সন্ধ্যাবেলা একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তলব পাঠালেন থানায় এবং আমাকে খুব শাসিয়ে দিলেন। অথচ যাঁদের নিয়ে বিবাদ, প্রকৃতপক্ষে যাঁরা দাঙ্গার এক অংশ তাঁদেরই ঘরে আতিথ্য গ্রহণ করে তাঁদেরও ধন্য করলেন, নিজেও ধন্য হলেন। ধন্য না হলেও আহারে পরিচর্যায় সুনিদ্রায় পরিতৃপ্ত হলেন।

আমি রাত্রেই রওনা হয়ে গেলাম।

ভাগলপুর পড়ে পথে। শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু "বনফুলে"র সঙ্গে তখন নিয়মিত পত্রালাপ চলত; তিনি বার বার নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন, ভরসা দিয়েছেন—এখানে এস, অসুখ ভালো হবে, শরীর সেরে যাবে! আমি দায়িত্ব নিচ্ছি।

বনফুলের লেখা গল্পগুলি কল্পনাপ্রসূত হতে পারে, অর্থাৎ গল্পগুলির ঘটনা সত্যি নাও হতে পারে, কিন্তু ডাক্তার বলাইচাঁদের দেওয়া ভরসা একেবারে খাঁটি বাস্তব। ভাগলপুরে থাকি বা না থাকি একবার ওখানে নেমে বলাইকে দেখিয়ে ওষুধপত্রের একটা ব্যবস্থা করে নেবার অভিপ্রায় ছিল. আর ছিল এই সবল এবং প্রাণখোলা মানুষটির সঙ্গে কয়েকটা দিন আনন্দের মধ্যে কাটিয়ে দেবার বাসনা। ভাগলপুর থেকে গৈবীনাথ-মুঙ্গের এ দুটি জায়গা যাবারও অভিপ্রায় ছিল। ভাগলপুরে নেমেছিলাম খানিকটা রাত্রি থাকতে। রাত্রিটুকু রি স্টেশনে কাটিয়ে দিয়ে আলো ফুটতেই একটা এক্কা করে বনফুলের —াম্প. দরজায় হাজির হলাম। মোটাসোটা মানুষটি কাছাকোঁচা গুঁজতে গুঁ। স্পিরিট খুলে আমাকে দেখেই হৈ-হৈ শুরু করে দিলেন। এ দুটিই এসে খাতা- বৈশিষ্ট্য। বলাই যখন সেজে-গুজে সমাজে সভায় ঘোরাফেরা বনকের দৃষ্টি, কোমরে বেল্ট আঁটেন; বাড়িতে বেল্ট খুলে বসলেই ...—গল্প. কবিতা, গুঁজতে হয় এবং ক্রমে ক্রমে গোড়ালির কাপড় হাঁটুবার আপনার রাজ্যে প্রবেশ মধ্যে অনর্গল গল্প—সে বৈঠকী এবং সাহিত্যিক লেখা। দেখি, কেমন হয়! থেকে ডাক পড়লে ওই অবস্থাতেই কষিতে ত

টানতে টানতে গিয়ে হাজির হন সহাস্যমুখে স লেখা শুরু করেন নি। হাস্যরস ও সহজ, ক্রোধও তত তীব্র সশব্দ। ক্রুদ্ধ হ

জানিয়ে দেবেন, তিনি রেগেছেন। অন্য দিবেয়ে উঠে পড়লেন। নির্দিষ্ট সময় মানুষ। অতি অল্প আসবাবে ঘরখানি সুন্দর সামালেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় পড়ছে, বনফুলের ফুলদানি কখনও খালি থাকেত্যের কথা। স্লাইড চড়ালেন গুচ্ছ সংগ্রহ করে সেগুলিকে পূর্ণ করে দেন, ন বসে পূরণ করে চললেন।

বাড়ির উঠানে জালের খাঁচায় ডজন খানেক বুনো হাঁস। পরে শুনেছি, বাড়িতে গাই এবং ভালো জাতের রামপক্ষী পুষেছেন। বলাইয়ের গৃহিণীও এদিক দিয়ে তার সুযোগ্য সহধর্মিণী। বনফুলের ক্রমবর্ধমান খ্যাতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এই ভদ্রমহিলা ঘর-সংসারের একচুল ত্রুটি না ঘটিয়েও প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে একে একে আই. এ. এবং বি. এ. পাস করেছেন, এম. এ. পাস করবার ইচ্ছেও রাখেন। ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাস করাই ছিল। এবং বনফুল নাকি একমাত্র এই পাসের যোগ্যতাটাই বিবাহের সময় বিবেচনা করেছিলেন। তাঁর নাকি পণ ছিল ম্যাট্রিক-পাস-করা মেয়ে ছাড়া তিনি বিয়ে করবেন না। এ ছাড়া অন্য কোনো কিছু তাঁর নিজের দাবি ছিল না। সেকালে ম্যাট্রিক পাস মেয়ে সাধারণ বাঙালীর ঘরে খুব সুলভ ছিল না এখনকার মতো। কাজেই বনফুলের পিতৃদেবকে কন্যাসন্ধানে একটু বেগ পেতে হয়েছিল। খোঁজ পেয়ে তিনি বনফুলকে জানিয়েছিলেন, 'ম্যাট্রিক পাস মেয়ে পাওয়া গিয়াছে। এখন তুমি নিজে দেখিয়া পছন্দ-অপছন্দের কথা জানাও।' বনফুল জানিয়েছিলেন, 'আমার দাবি ম্যাট্রিক পাস মেয়ে। সে যখন পাওয়া গিয়াছে, তখন পছন্দ-অপছন্দের প্রশ্নই উঠে না। ভদ্র ও সদ্‌বংশ—সুতরাং দেখিবার কোন প্রয়োজন নাই।' বিবাহ হয়ে গেল। তাতে বনফুলের জীবনে কোন ক্ষোভের কারণ হয় নি। পারিবারিক জীবনে তিনি সুখী; পত্নীটি সত্যকারের গুণবতী এবং প্রকৃতিগতভাবে তাঁদের ঐক্য অসাধারণ। বনফুলের মাছ-মাংসে একটু বেশী রুচি, পত্নীরও তাই; এমন কি কতটা ... দিয়ে রান্না হবে—এ নিয়েও কোনদিন মতভেদ হয় না। রন্ধনবিদ্যায় ... স্ত্রী উভয়েরই সমান পারদর্শিতা। কলকাতায় সজনীকান্তের বাড়িতে মুসলমানী রান্না করা মাংস খেয়ে অনেক সাহিত্যিকই তাঁর তারিফ আমাদের বনফুল-পত্নী অভ্যাস ও বেশী চর্চার ফলে উৎকৃষ্টতর রান্না জুড়ে দিয়েছি। বনফুলের সঙ্গে বন্ধুত্ব-বিচ্ছেদের ভয়েও গোপন করব প্রথম বা দ্বিতীয় বর্ষ থেকে অধিকতর সমাদরের প্রত্যাশাতেও বাড়িয়ে দিনের মধ্যেই যে ভয়ঙ্কর ওখানে অচিরে আতিথ্য গ্রহণের কোন কল্পনাই আজও শিউরে উঠি। আমি কবে যেতে পারি সেও গণনা করে জড়িয়ে পড়েছিলাম হিন্দুদের ছেলে-মেয়েতে তাঁদের তিনটি—কেয়া, অসীম, যখন সদর থেকে রিজার্ভ সুশোভিত পুষ্পোদ্যানের মতো সুন্দর ঠেকল। রাস্তায় রাস্তায় মার্চ করে হুকুম দিয়ে সেখানেই প্রাতঃরাশ চা-পর্ব। ডিম-মাখানো ভাজা পাঁউরুটির হুমকি দেখিয়ে গেল। কারণ ওই বস্তুটা বলাইয়ের ঘরেই প্রথম গাঁয়ের বাড়িতে এসব অজানা। ছোট্ট একটি

আধুনিক নাগরিক পরিবারের সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়। আধুনিকও বটে, নাগরিকও বটে, কিন্তু উগ্রতাবর্জিত। সইয়ে নিতে, খাপিয়ে নিতে বেগ পেতে হয় না, সময় লাগে না।

চায়ের কাপে চা ঢালতে ঢালতেই বনফুল পত্নীর দিকে তাকিয়ে বললেন, আজ গোটা চারেক হাঁস তৈরী করতে বল। আর মাছ—ভালো মাছ।

আমি শিউরে উঠে বললাম, দোহাই মশাই! মরে যাব আমি! আপনি জানেন না, আমি পেটের গোলমালে নিদারুণ কষ্ট পাচ্ছি।

তখন তাঁর সঙ্গে 'আপনি' 'আজ্ঞে' চলত।

বনফুল বাধা দিয়ে বললেন, ঠিক আছে। তাহলে তো মাংসই আপনার পথ্য। পথ্যই নয়, ওষুধও বটে। ভয় করছেন কেন? আমি তো ডাক্তার। দায়ী আমি। নিন আর-এক পেয়ালা চা। ওগো, আর-একখানা রুটি।

কথার মাঝখানেই বলাই-গৃহিণী ডিম-মাখানো পাঁউরুটি নিয়ে হাজির! আমি উপুড় হয়ে পড়লাম প্লেটের উপর।—দোহাই! অবিশ্বাস করছি না, কিন্তু ভয় যাচ্ছে না।

বনফুল নিজের প্লেটে সেটা নিয়ে হেসে বললেন, তবে থাক।

এর পর নিয়ে গেলেন ক্লিনিকে।

বনফুলের ক্লিনিক-প্র্যাকটিস। স্টেশন রোডের উপর ঘরখানিতে নানা যন্ত্রপাতি ভীত বিচিত্র গন্ধ সেখানে। রক্ত, মল, মূত্র, পুঁজ, থুথু পরীক্ষার বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা—টেস্ট টিউব, স্লাইড, মাইক্রসকোপ, স্পিরিট ল্যাম্প, রিপোর্ট-ফর্ম, খাতা। তারই মধ্যে তাঁর সাহিত্যচর্চার খাতা-কলম। স্পিরিট ল্যাম্পের উপর ওষুধপত্র মিলিয়ে পরীক্ষার সামগ্রী চাপিয়ে দিয়ে এসে খাতা-কলম টেনে নিয়ে লিখতে বসছেন। অক্লান্ত লেখনী, বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি, আকাশচারী বিহঙ্গের মতো কল্পনার পক্ষবিস্তার; লেখা চলে—গল্প, কবিতা, ব্যঙ্গরসাত্মক, হাস্যরসাত্মক। বনফুল বললেন, এবার আপনার রাজ্যে প্রবেশ করছি। সিরিয়াস লেখা শুরু করেছি। বড় লেখা। দেখি, কেমন হয়! একটা লিখেছি, শোনাব আপনাকে।

তখনও পর্যন্ত বড় লেখা এবং সিরিয়াস লেখা শুরু করেন নি। হাস্যরস ও ব্যঙ্গরস নিয়েই কারবার করতেন।

কথা বলতে বলতেই ঘড়ির দিকে তাকিয়ে উঠে পড়লেন। নির্দিষ্ট সময় পার হচ্ছে, নামাতে হবে পরীক্ষার বস্তু। নামালেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় রত হলেন। মনে হল, ভুলেই গেছেন সাহিত্যের কথা। স্লাইড চড়ালেন মাইক্রসকোপে। বিশ্লেষণ শেষ করে ফর্ম টেনে বসে পূরণ করে চললেন।

সই করলেন। খামে পুরলেন। নামঠিকানা লিখে রেখে আবার একটা পরীক্ষা শুরু করে দিয়ে এসে বসলেন লেখার টেবিলে। লিখে চললেন।

বিস্মিত হয়ে গেলাম শক্তি দেখে।

এরই মধ্যে লোক আসছে, ফিস দিয়ে রিপোর্ট নিয়ে যাচ্ছে। বেলা একটা পর্যন্ত একনাগাড়ে চলল এই দুই সাধনা—বিজ্ঞানের এবং সাহিত্যের।

এর পর বাড়ি। স্নান আহার। পরিচ্ছন্ন এবং অভিনবত্বে ভরা আহারের উপকরণ। মাংসে হাত দিয়ে ভাবিত হলাম। বনফুল বললেন, খান মশায়। আমি ডাক্তার, আমি বলছি—খান।

কথায় আদেশের সুর। ভয়ে ভয়েই খেলাম।

খাওয়ার পর লেখা নিয়ে বসলেন বনফুল। একটার-পর-একটা পড়ে যেতে লাগলেন। গতরাত্রি জেগে কেটেছে ট্রেনের থার্ড ক্লাসে। তার উপর দুপুরে ঘুম অভ্যেস। আমার চোখে ঘুম নামল। কিন্তু বনফুল পড়েই গেলেন, পড়েই গেলেন—একটার-পর-একটা, একটার-পর-একটা। আমার তন্দ্রাচ্ছন্নতা বোধ করি তাঁর চোখেই পড়ল না।

আজও মনে পড়ছে, সে দিন মনে মনেই বলেছিলাম, বনফুল সিংহ নন, ব্যাঘ্র। সিংহ শুনেছি মৃত বা অতিদুর্বল প্রাণী বধ করে না।

বেলা সাড়ে-চারটের সময় আবার চা-খাবার।

এইবার বনফুল থামলেন। বললেন, চা খান। ঘুম ছাড়বে। দিনে ঘুমোলেন না, ভালো হল, এতটুকু বদহজম হবে না। কি, অম্বল মনে হচ্ছে?

সন্ধ্যার সময় বনফুল আমাকে নিয়ে বের হলেন; বিখ্যাত Asude অর্থাৎ আশু দে, মাখন চৌধুরী—এঁদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। আরও কারও কারও সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তবে একটি কৌতুকের কথা মনে আছে। হঠাৎ পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়লেন, বললেন, দাঁড়ান।

একটি পাশের পথের দিকে আঙুল দেখিয়ে মৃদুস্বরে বললেন, এক ভদ্রলোক আসছেন, দেখছেন?

দেখলাম, একজন খাঁটি বাঙালী প্রৌঢ় অর্থাৎ আমারই মতো ডিসপেপসিয়াগ্রস্ত প্রৌঢ় বাঙালী আসছেন। গলায় যেন একটা কম্ফার্টার জড়ানো ছিল মনে হচ্ছে। বনফুল বললেন, উনি হলেন শরৎচন্দ্রের ''শ্রীকান্তে''র সেই মেজদা যিনি নাকি গঁদের আঠা দিয়ে নাক ঝাড়া, জল খাওয়া, বাইরে যাওয়ার সময়ের হিসেবের কাগজ খাতায় এঁটে রাখতে গিয়ে নিজের পড়বার সময় পেতেন না, বছর বছর ফেল করতেন, যিনি "ছিনাথ বউরূপী"র ব্যাঘ্রবেশ দেখে দাঁতকপাটি লাগিয়ে তক্তপোশে পড়ে গোঁ-গোঁ করেছিলেন।

উনিই তিনি ?

উনিই তিনি। দেখুন না, মজা দেখুন।

ভদ্রলোক বড় রাস্তায় পড়তেই বনফুল তাঁকে নমস্কার করে কুশলবার্তা প্রশ্ন করলেন এবং আমার পরিচয় দিয়ে বললেন—ভাগলপুর বেড়াতে এসেছেন। শরৎচন্দ্রের লেখায় ভাগলপুরের যে সব জায়গার কথা আছে, দেখছেন এবং দেখবেন। যে সব পাত্রপাত্রীর কথা আছে—

এর পর ভদ্রলোক আর দাঁড়ালেন না। হনহন করে চলে গেলেন।

বনফুল হেসে বললেন—শরৎবাবুর ওপর ভয়ানক চটা উনি।

সন্ধ্যের পর আবার কিছুক্ষণের জন্য ক্লিনিক। তার পর বাড়ি ফিরে আবার চা এবং সাহিত্য। সে দিন সন্ধ্যায় শোনালেন তাঁর প্রথম সিরিয়স রচনা, বড় গল্প—'টাইফয়েড'।

শুনে চমকে গেলাম।

এর পরই এলেন বনফুলের মেজভাই ভোলানাথ। তিনিও ডাক্তার। ভাগলপুর থেকে কিছু দূরে ডাক্তারি করেন। চমৎকার চেহারা। খাপখোলা তলোয়ারের মতো। ভোলানাথও লিখতে পারেন। কিছু কিছু লেখা প্রকাশিতও হয়েছে। কিন্তু পরে আর চর্চা রাখেন নি। চমৎকার মানুষ।

তিন দিন ছিলাম বনফুলের ওখানে। তিন দিনেই বুঝলাম, আমার রোগের উপশম হয়েছে। চতুর্থ দিনে রওনা হলাম। বনফুল ও তাঁর গৃহিণী অনেক অনুরোধ করলেন। কিন্তু আমার তাগিদ ছিল। এবং সঙ্কোচের সঙ্গে বলছিই যে, বনফুলের মতো স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির সঙ্গে আহারে সাহিত্যালাপে মজলিসে পাল্লা দিয়ে চলা আমার পক্ষে কঠিনও হয়ে উঠেছিল।

আমার জীবনে সাহিত্যিক সুহৃদের মধ্যে অন্তরঙ্গতমদের মধ্যে বলাই অন্যতম। সজনীকান্তের পরেই তিনি স্থান জুড়ে বসেছেন। দীর্ঘদিন ধরে অনেক প্রীতিনিবেদন নিয়মিতভাবে চলেছে পত্রালাপের মধ্যে। দু-চারবার মতান্তরও ঘটেছে। অনেকদিন নীরবও থাকি দুজনে। আবার একটা ডাক আসে, মনের দুয়ার খোলে।

একবার জামসেদপুরে চলন্তিকা-সাহিত্য-সম্মেলনের আসরে আমরা প্রকাশ্যে কোমর বেঁধে লড়াই করেছিলাম। সে লড়াই কবির লড়াইয়ের মতো উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে। লোকে ভেবেছিল, দুই বন্ধুর বুঝি বিচ্ছেদ ঘটে গেল জীবনে। কিন্তু সভার শেষে দুজনকে গলা ধরে বেড়াতে দেখে তাদের বিস্ময়ের সীমা ছিল না। ফেরাবার পথে ট্রেনে চার-পাঁচ ঘণ্টা ধরে বনফুল যে অলৌকিক কাহিনী শুনিয়েছিলেন, তার অনেকগুলি এখনও মনে আছে।

আর একবার ঘটেছিল, আমার "কবি" উপন্যাস নিয়ে।

"কবি" উপন্যাসখানি বনফুলের কাছে ভাল্‌গার বলে মনে হয়েছিল। অবশ্য আমি কোন বাদ-প্রতিবাদ করি নি।

আরও দু-চারবার ঘটেছে হয়তো। সে সব তুচ্ছ ঘটনা। মোটের উপর বনফুল আমার জীবনে অনেক প্রেরণা যুগিয়েছেন। তাঁর কাছে আমার অনেক ঋণ। অদ্ভুত মানুষটিকে দূর থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করি। কাছে যেতে সাহস করি না, ওই সবলদেহ মানুষটির সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারব না—কি আড্ডায়, কি ঘোরায়, কি সাহিত্যালাপে।

বনফুলের ওখান থেকে অর্থাৎ ভাগলপুর থেকে গেলাম পাটনা। পাটনাতে এসে দেখলাম একজন বড় মানুষকে। কিন্তু তার পূর্বে একজন অতি সাধারণ মানুষের কথা আছে। পাটনা যাবার পথে একটি নগণ্য মানুষ মনে ঠাঁই করে নিয়ে বসে রয়েছে। মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য পরিচয়। পরিচয়ই বা কি! কয়েকটা কথাবার্তা, সামান্য কিছু অর্থ ও কর্ম বিনিময়। এতেই সে সেদিন এমন আনন্দ দিয়েছিল যার স্বাদ অমৃতের মতো, না হলে সে স্বাদের স্মৃতি আজও ভুললাম না কেন?

কিউল জংশনের ধর্মশালার পরিচারক। ওই দেশের দেহাতি মানুষ; সবল সুস্থদেহ, শান্ত, মিতভাষী। রাত্রি একটার সময় শীতে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে এলাম ধর্মশালায়। নদীর ধারে ফাঁকা স্টেশনে আমাকে জামা-জোড়া পরেও কাঁপতে দেখে কুলি ওখানেই এনে তুলে দিলে। মধ্যে উঠোন, চারিদিকে খিলেনের বারান্দাওয়ালা সারি সারি ঘর; নদীর বাতাস নেই; উঠোনে ঢুকতেই আরাম পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে সেই রাত্রিকালে লোকটি এসে দাঁড়াল।

পরণাম বাবুজী!

জিজ্ঞাসা করলাম—কে তুমি? উত্তর পেলাম—আপনাদের সেবক আমি। এই ধরমশালার নোকর। হাত জোড় করে বললে।

এ সংসারে কত মানুষ দেখলাম, বড়-ছোট নিঃস্বার্থ-স্বার্থপর ভদ্র-ইতর; কিন্তু এমন একটি মানুষ দেখলাম না বলেই আজ মনে হচ্ছে। অন্তত এই ধরনের এমন মানুষ।

আপনার কর্তব্যগুলি নিখুঁতভাবে করে গেল, এক বিন্দু বিরক্তি দেখলাম না, যে কাজগুলি করলে এতটুকু ত্রুটি তার চোখে পড়ল না।

এরই মধ্যে সে কিছু বাণিজ্যও করলে আমার সঙ্গে।

বললে—আঁধিয়ারা বাবুজী, তোমার বাতি না হলে তো অসুবিধে হবে। অন্ধকারে আলো কেউ ধরে না, এইটেই চিরন্তন দুঃখ এবং সত্য। ধরতে চাইলে নেব না? বললাম—নিশ্চয় চাই। এনে দাও। মনে মনে ধর্মশালার

প্রতিষ্ঠাতাকে ধন্যবাদ দিলাম সুবিবেচনার জন্য। বললাম, তোমার সবার পথে তুমি দেওয়ালীর সমারোহ জ্বালবার ব্যবস্থা করেছ যে বিশ্বাসে, সে বিশ্বাস সত্য হোক।—সত্য হোক—সত্য হোক। লোকটি তিন ইঞ্চি লম্বা আঙুলের মতো সরু বাতির বান্ডিল এনে নামিয়ে দিয়ে বললে—নাও, কটা নেবে।

ভাবছিলাম স্বার্থপরের মতো বেশি নেওয়াটা কি উচিত হবে?

লোকটি সবিনয়ে বললে—দাম কিন্তু বাজার থেকে একটু চড়া। কত বলেছিল মনে নেই। আজকের দিনের অর্থাৎ যুদ্ধের আগুনে পুড়ে খাক হয়ে যাওয়া বাজারের মধ্যে বসে সে বাজারের দর-দাম মনে করা অসম্ভব।

চমকে উঠে বললাম—দাম লাগবে নাকি?

সবিনয়ে সে হাতজোড় করে বললে—গরিব আদমী আমি বাবুজী—ধরমশালার নোকর, আপনাদের সেবক, এখানকার অতিথি আগন্তুকদের অন্ধকারে কষ্ট হয় দেখে বাতি এনে রেখেছি! বাজারে দাম অবশ্য কম। এত দাম। এখানে আমি এনে রাখি, তোমাকে কষ্ট করে যেতে হয় না, তার জন্য কিছু বেশি নিই। এই মাত্র। তা তুমি একটাই নাও; নিবিয়ে রেখে দাও, দরকার হলে ম্যাচিস ধরিয়ে জ্বালিয়ে নেবে। ভয় নেই, অন্ধকারে থাকলে কোন জিনিস তোমার চুরি যাবে না। আমি পাহারা আছি।

সঙ্গে আমার লোটা বা কোনো জলাধার ছিল না; উঠানে একটি কুয়োতে শিকলে বাঁধা একটি বালতি আছে—সাধারণের জন্য। জল তুলে হাতে খেতে হয়। লোকটি লোটা ভাড়া দেয়, বালতি ভাড়া দেয়। মাটির ভাঁড় রাখে, বিক্রি করে। দাম বেশি সে কথা সে অকপটেই বলে; কিন্তু সব থেকে আশ্চর্যের কথা, লোকটিকে তবু কালোবাজারী বলে মনে হয় না। চড়াদামে কিনেও তাকে উপকারী বন্ধু বলে মনে হয়। এর মধ্যেও তার লোভ দেখতে পাই নি। তার সঙ্গে আলাপের মধ্যেই সে মুঠো-ভর্তি ভাঙা বাতি এনে দেখিয়ে বলেছিল—এরই জন্যে বাবুজী, এই লোকসান হয় বলেই দাম কিছু বেশি নিই। আর মাটির ভাঁড় কত ভাঙে, সে আর কি বলব? এই এত।

অবিশ্বাস করি নি। তাকে অবিশ্বাস কেউ করতে পারে কি না জানি না, যিনি করেন তিনি মহাপাষণ্ড তাতে সন্দেহ নেই। সকালবেলা সেই কুলি ডেকে দিলে, বিদায় নেবার সময় একটি আধুলি তার হাতে দিয়েছিলাম। সে পূর্বদিকে সদ্য-ওঠা সূর্যের দিকে তাকিয়ে হাত জোড় করে বলেছিল, হে সূর্যনারায়ণ, বাবুজীর মঙ্গল কর।

কুলি বললে—এই ওর আশীর্বাদের এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা।

কথায় কতটা তাকে প্রকাশ করতে পারলাম জানি না, এই বিবরণ পড়ে

তার সম্পর্কে কার কি ধারণা হবে বলতে পারি না, কিন্তু সে আমার অতীত কালের অন্ধকার চিত্তাকাশে দ্যুতিমান একটি নক্ষত্রের মতোই জেগে রয়েছে। ভাগলপুর থেকে পাটনা যাওয়ার পথে আর সবই অন্ধকারে হারিয়ে গেছে, কিন্তু কিউল স্টেশনের ধর্মশালা দেখতে পাচ্ছি তারই আলোতে।

পাটনায় এসে বনফুলকে লিখলাম এই কথা। বনফুল উত্তরে যা লিখলেন তার মর্মার্থ—ওর কথা সাহিত্যের মধ্যে ধরে রেখে দিন। স্বধর্ম পালন করুন। নিজের তন্ত্রে ওই নরদেবতাটির অর্চনা করুন।

আমি তার আগেই অর্থাৎ বনফুলকে পত্র লিখে তাঁর পত্র আসতে আসতে "ভ্রমণ-কাহিনী" নাম দিয়ে একটি গল্প লিখে পাঠিয়ে দিলাম "দেশ" পত্রিকায়। "যাদুকরী" নামে গল্পসংগ্রহে গল্পটি আছে।

পাটনায় এলাম দীর্ঘকাল পর। বোধ হয় বছর আষ্টেক পর। শেষ এসেছিলাম উনিশশো তিরিশ সালের মে মাসে কি জুন মাসের প্রথমে। জেলে যেতে হবে, আদালতে হাজির হয়ে আত্মসমর্পণের দিন পড়েছে, তার আগেই এখানে এসেছিলাম আমার মাকে নিয়ে যেতে। দেশের ম্যালেরিয়ায় মায়ের শরীর খারাপ হয়েছিল। মা এসেছিলেন শরীর সারাতে। তার পর এই। এই সময় আমার বড় ছেলে ওখানে থেকে কলেজে পড়ছিল। সেও ছিল পাটনায়।

পাটনায় এই প্রথম এলাম সাহিত্যিক পরিচয় নিয়ে। আমার বড় মামা ছিলেন ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ। পাটনার ওই পাড়ায় সকল কর্মের অগ্রণী, লাইব্রেরি, ক্লাব, থিয়েটার, সেবাধর্ম, সৎকার-সমিতি—সর্বত্র ছিল তাঁর স্থান। ওইটিই ছিল তাঁর কর্ম এবং ধর্ম। সরল মানুষ, প্রেমিক মানুষ, পড়াশুনাও প্রচুর, কিন্তু তার সঙ্গে দুরন্ত ছিল তাঁর ক্রোধ। প্রথম দিন সন্ধ্যাতেই তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন একটি আড্ডায়।

একটি মানুষ দেখলাম সেখানে।

কিউলে দেখে এসেছিলাম একটি মানুষ, আর এই এক মানুষ। ভাস্কর মহিমময় দিব্যকান্তি প্রসন্ন সহাস্য। ছ ফুটের উপর লম্বা, যাকে বলে—শালপ্রাংশু মহাভুজ। রক্তাভ গৌরবর্ণ, তীক্ষ্ণ সুগঠিত দীর্ঘনাসা, কৌতুকোজ্জ্বল ঝকঝকে চোখ, মজলিসের সকল মানুষের উপরে মাথা তুলে বসে আছেন—ইচ্ছে করে নয়, স্বাভাবিকভাবে।

লম্বা হাতখানা বাড়িয়ে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে বললেন—এস ভাগ্নে এস।

একটি শব্দ উচ্চারণ করে একটু থেমে আবার একটি শব্দ উচ্চারণ করে কথা বলেন। বর্ণনা শুনে চাল মনে হতে পারে—হয়তো এমন

ধরনে কথা বলা তাঁর প্রথম যৌবনের কোন ফ্যাশন অনুযায়ী অভ্যাসও বটে, কিন্তু অন্তরের প্রসন্নতার মাধুর্যে কণ্ঠস্বর ও বাগ্‌ভঙ্গি এমনি অভিষিক্ত যে পুষ্পিত একটি গোলাপের ডালের মতো কাঁটার কথা ভুলিয়ে দিয়ে ফুলের শোভায় চিত্তলোককে রঙের বাহারে রাঙিয়ে তোলে, রসাসক্ত করে দেয়, গন্ধে তৃপ্ত করে। গোলাপের ডালের উপমাটা আপনিই এসে গেল। কারণ, শচীমামার কথা বলতে গেলেই গোলাপবাগের কথাই মনে পড়বে তাঁর ছবির পটভূমি হিসেবে। গোলাপের শখ শচীমামার বোধ করি এ জীবনের সব থেকে বড় শখ।

শচীমামা—শচীন্দ্রনাথ বসু, ব্যারিস্টার। শচীমামাকে না দেখলে পাটনা দেখা সম্পূর্ণই হয় না বলেই আমি মনে করি। হাজার মানুষের মধ্যে প্রথম চোখে পড়বার মতো মানুষ। বাংলা দেশে এ কালে এমন সদৃশ রূপের একটি মানুষ মাত্র আমার চোখে পড়েছে। তিনিও অংশ্য যে-সে নন, ঠাকুর বংশের সন্তান শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দীপ্তিতে শচীমামার কান্তি, সৌম্যেনবাবু অপেক্ষা আরও উজ্জ্বল। যেমন বাইরের কান্তি, তেমনই কান্তি অন্তরের। শুধু কান্তিই নয়, অন্তরের ঐশ্বর্যও অফুরন্ত এবং সে ভাণ্ডার উদারতায় অকৃপণ, মাধুর্যে সুপ্রসন্ন প্রশান্ত। ভরাট কণ্ঠস্বর, তেমনি প্রাণ-খোলা হা-হা-হা হাসি।

পাণ্ডিত্যও অগাধ, বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি, কিন্তু তার স্পর্শ প্রখর কণ্টকতীক্ষ্ণ নয়। রস-রসিকতায় প্রদীপ্ত, কিন্তু উত্তাপ নেই। মানুষটির সমস্ত জীবনকে বেষ্টন করে বৈরাগ্যের একটি গৈরিক উত্তরীয় জড়ানো আছে। জীবনে এ মানুষের যা বা যতখানি পাওয়া উচিত ছিল তার কিছুই পান নি, কিন্তু তাঁর কামনা বাসনা যেন এক অপরূপ প্রসন্নতার স্পর্শে প্রশান্ত হয়ে নির্লিপ্ততায় পরিণতি লাভ করেছে। সুপ্রসন্ন বৈরাগ্যে তিনি মহিমান্বিত।

প্রথম যৌবনে হেডমাস্টার ছিলেন দেওঘর ইস্কুলে। তারপর উকিল হয়েছিলেন। ওকালতির কালে অসহযোগ আন্দোলনে বর্তমান ভারতের রাষ্ট্রপতি পণ্ডিত রাজেন্দ্রপ্রসাদের সহকর্মী ছিলেন; তারপর কিছুকাল উদাসীর মতো দেশে দেশে বেড়িয়েছেন। এখন ব্যারিস্টার, কিন্তু সে দিকে তাঁর আদৌ রুচি নেই, অনুরাগ নেই। প্রথম বয়সে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে স্বর্গীয় মতিলাল ঘোষ মশায়ের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রে "অমৃতবাজারে" লিখতেন।

সন্ধ্যায় তাঁর বাড়িতে একটি মনোরম আড্ডা বসত। সেখানে পাটনার বাঙালী সমাজের বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি আসতেন। শ্রীযুক্ত যোগীন ঘোষ—পাটনায় বাঙালী সমাজের মুখোজ্জ্বল-করা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, পাটনায় ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ বা সহকারী অধ্যক্ষ; সাহিত্যে যত অনুরাগ তত পড়াশোনা,

ঈষৎ বক্র তীক্ষ্ণ রসিকতার অনুরাগী হলেও সহৃদয় মানুষ; সত্যকারের বুদ্ধিবাদী ব্যক্তি। তার সঙ্গে তাঁর শখ বাগানের। যোগীনবাবু মিতব্যয়ী ব্যক্তি, জীবনে কোনখানে এক বিন্দু আতিশয্য অমিতাচার নেই কিন্তু ফুলের শখে যোগীনবাবু প্রচুর খরচ করেন—শুধু অর্থই নয়, তার সঙ্গে নিজের শ্রম এবং সময়। আর ছিল তাঁর ছেলেকে সত্যকারের মানুষ করে তোলার কামনা এবং তার জন্য অধ্যবসায়। যোগীনবাবুর ছেলে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র; হীরেমানিকের মতো উজ্জ্বল; তার সঙ্গে যোগীনবাবু মানুষের জীবন-গঠনে যা কিছু প্রয়োজন তা অর্জনে সাহায্য করেছেন, উৎসাহিত করেছেন। নিজে ছেলেকে নিয়ে গঙ্গাস্নানে যেতেন, ছেলেকে সাঁতার শেখাতেন। ছেলে গঙ্গা পারাপার করত, বাপ নৌকা নিয়ে পাশে পাশে চলতেন।

আর একজন আসতেন শ্রীশম্ভু চৌধুরী—পাটনা মেডিকেল কলেজের সান্যালদের আত্মীয়; বায়োলজির অধ্যাপক; লক্ষ্ণৌর লোক, লক্ষ্ণৌর বিখ্যাত দ্বিজু সান্যাল ও পাহাড়ী সান্যাল তাঁর আত্মীয়। পাটনাতেই বাড়ি কিনে পাকা বাসিন্দে হয়েছেন; লক্ষ্ণৌর ভদ্রতা-সভ্যতা সবই আছে এবং অন্য দিকে শ্রীযোগীনবাবুর সঙ্গে এক টোলের ছাত্রের মতোই সাহিত্য ও কুসুমবিলাসী। ফুলের বাগানে শম্ভুবাবুর খরচ অনেক।

এঁদের দুজনের বাড়িতে যে যেত এবং সম্ভবত এখনও যে যায়, তাকে কিছুক্ষণ মুগ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। বিশেষ করে শীতকালে, মরসুমী ফুলের সমারোহের সময়। দেশ-দেশান্তর থেকে বীজ আনিয়ে চারা তৈরি করে যে ফুল তাঁরা ফোটান, তার শোভা দেখে যে কোনো মানুষকে মুগ্ধ হতেই হবে—সে যত বড় রূঢ়প্রকৃতি বাস্তববাদী হোক না কেন? বাগানের এক প্রান্তে কোনো পাত্রে গোবর পচছে, কোনটায় পাতা পচছে, কোনটায় কিছু, এবং সে সবই তাঁরা নাড়েন ঘাঁটেন। শচীমামা এঁদের নাম দিয়েছিলেন, বাগানিয়া। এই বাগানিয়াদের বাগান থেকে মরসুমী ফুলের কিছু চারা আসত শচীমামার বাড়ি। শচীমামার শখ ছিল শুধু গোলাপে। যশিডির বিখ্যাত গোলাপবাগানের মালিক তাঁর ছাত্র। শচীমামা প্রথম দিন ফুলদানি থেকে একটি গোলাপ ফুল তুলে আমায় দিয়েছিলেন।

আর-একজন এই আসরের নিয়মিত সভ্য ছিলেন। তিনি আসতেন সকলের শেষে, তাই শেষেই তাঁর নাম করছি—নইলে তিনি বৈশিষ্ট্যে-খ্যাতিতে-সংস্কৃতিবানতায় কারও চেয়েই কম নন, বরং সাহিত্যক্ষেত্রে খ্যাতনামা একজন বড় অধিকারী। আমাদের রঙীনদা অর্থাৎ শ্রীরঙীন হালদার; বি এন. কলেজের বাংলার অধ্যাপক। পাটনায় বাংলাসাহিত্য সম্পর্কে সর্বশ্রেষ্ঠ কষ্টি-পাথর। আজীবন কুমার রঙীনদা সাজে-পোশাকে চালে-চলনে যেমন পরিচ্ছন্ন

তেমনই পরিপাটি। সে আমলে থাকতেন বি. এন কলেজের হোস্টেলের অধ্যক্ষ হিসেবে; সে ঘরে গিয়ে চোখ জুড়িয়ে যেত। রঙীনদা সন্ধ্যার পর হোস্টেলের দেখাশুনা ও তত্ত্বাবধান সেরে আয়নার মতো পালিশ-করা গ্লেজকিডের আলবার্ট পায়ে, খদ্দরের দামী ধুতি, চমৎকার ফ্ল্যানেলের পাঞ্জাবি ও সরুপাড় সাদা শালখানি গায়ে দিয়ে এসে হাজির হতেন—কোনদিন সাড়ে-আট, কোনদিন নয়, কোনদিন সাড়ে-নটায়। শচীমামার গেটের বাইরে রাস্তায় একখানি ফিটন এসে থামত। শচীমামা বসতেন হাঁটু ভেঙে, হাঁটুর ভাঁজের মধ্যে হাতের মুঠোটি রাখতেন, শব্দ শুনেই হাত তুলে বলতেন—ওঃই!

তারপর থেমে থেমে বলতেন, সে—এসেছে।

প্রথম দিন রঙীনদা আসতেই শচীমামা আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বলেছিলেন, ভাগে, এইবার তোমার যাচাই হবে। এইবার বোঝা যাবে, তোমার কত দর! কষ্টিপাথর এল! শঙ্কিত অবশ্যই হয়েছিলাম। এই পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যে এসে অবধিই নিজেকে অসহায় এবং সত্যই নগণ্য বলে বোধ করছিলাম। শুধু সস্নেহ পরিমণ্ডল অনুভব করে ভরসা পেয়ে পিপাসু চিত্তে তাঁদের মিলনতীর্থের গোমুখী থেকে ঝরা জলধারা পানের প্রত্যাশায় বসে ছিলাম।

পরীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুতও নই, যোগ্যতাও নেই। ভয় না পেয়ে উপায় কি? রঙীনদা কিন্তু আদৌ আমাকে যাচাই করেন নি। তিনি আমাকে স্নেহের বশেই খাঁটি বলে গ্রহণ করেছিলেন।

রঙীনদা এলেই উঠত তর্ক। সাহিত্যিক তর্ক। এক দিকে শম্ভুবাবু ও যোগীনবাবু, অন্য দিকে একা রঙীনদা। ভরাট মোটাগলা রঙীনদার কণ্ঠ উচ্চ থেকে উচ্চতর গ্রামে উঠত। শচীমামা বসে বসে হাসতেন, উপভোগ করতেন। সর্বশেষে মুখ খুলতেন তিনি। তাঁর মতামত মেনে নিতেন সবাই, না মেনেও উপায় থাকত না। তাঁর বিচার ছিল নির্ভুল, অনুভূতি ছিল সূক্ষ্মতম; তাই বিচারের উক্তিগুলি হত অলঙ্ঘনীয়—সে যেন প্রাণের তারে ঝঙ্কার তুলে দিত, সঙ্গে সঙ্গে মনে হত, তাই তো, এই তো ঠিক—এই তো সত্য।

পাটনায় আরও অনেক সুধী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক শ্রীবিমান-বিহারী মজুমদার অন্যতম। ঐতিহাসিক, বৈষ্ণব-সাহিত্যে সুপণ্ডিত এবং বোধ করি কোন প্রাচীন বৈষ্ণবাচার্য ঘরের সন্তান। তাঁর অন্তরে বংশগত বৈষ্ণব-সংস্কৃতির বীজ ছিল। কিন্তু তখনও তা উপ্ত হয়নি বলেই আমার মনে হয়েছিল সে সময়। এখনকার কথা জানি না। হওয়ারই কথা। একালের পাণ্ডিত্যের আধিক্যে, বৈষম্যের ফলে যদি সে বীজকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে থাকে, তবে বলতে পারি নে।

বিমানবাবু এলে রঙীনদা সেদিন জেঁকে বসতেন, ভাবটা—যুদ্ধং দেহি! তুমুল এবং প্রবল তর্ক শুরু হয়ে যেত। রাত্রি দশটা সাড়ে-দশটায় আসর ভাঙত।

বড় মামার সঙ্গে বাড়ি ফিরতাম স্তব্ধ হয়ে। মন পরিপূর্ণ হয়ে থাকত। কত শুনলাম, কত শিখলাম! শীতের রাত্রি দশটা সাড়ে-দশটাতেই পথ হয়ে যেত জনবিরল—অন্তত এই অঞ্চলটা। মধ্যে মধ্যে পিছনে অন্ধকারের মধ্যে বেজে উঠত ঘোড়ার ক্ষুরের এবং গলার ঘণ্টার ধ্বনি। মনে হত কোন যেন মধ্যযুগ।

এক্কাওয়ালা হেঁকে উঠত, হঠ যাইয়ে, বচ যাইয়ে—বচ যাইয়ে।

রাস্তার ধার ঘেঁষেই আমরা চলতাম, আমাদের জুতোর শব্দ উঠত। কিন্তু সেসব কিছুই আমার আচ্ছন্ন চৈতন্যের ধ্যান ভাঙতে পারত না। স্বপ্নাচ্ছন্নের মতোই চলতাম। কোনো কোনো দিন কোনো বাড়ির বাগানের গাছের ছায়ার অন্ধকারের মধ্য থেকে রসিক পাগলের কণ্ঠস্বর বেজে উঠত—গাছ থেকে ফল পড়ল, সেই দেখে তুমি আবিষ্কার করলে মাধ্যাকর্ষণ, বেশ কথা, বড় আবিষ্কার করেছ—এ গ্রেট্ ম্যান তুমি। কিন্তু বলতে পার—কোন্ আকর্ষণে, কার আকর্ষণে মানুষের জীবনটা চলে যায়, দেহটা পড়ে থাকে? বলতে পার?

একদিনের কথা মনে পড়ছে। ওই কথাই আপন মনে বকছিল পাগল রসিক। বাঙালীর ছেলে, শিক্ষিত ছেলে ছিলেন, শচীমামাদের থেকেও বয়সে বড়ো; পাগল হয়ে গিয়েছিলেন।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কি বলছেন? কার সঙ্গে কথা বলছেন রসিকবাবু?

দাড়িতে হাত বুলিয়ে চিন্তাকুল নেত্রে রসিকবাবু বলেছিলেন, কথা বলছি নিউটনের সঙ্গে।

নিউটনের সঙ্গে?

হ্যাঁ। এই যে ইটের থামটা দেখছ, এইটে—এইটেই কখনোও নিউটন হয়, কখনো শেক্স্পীয়র হয়, কখনোও গ্যালিলিও হয়, কখনোও মাইকেল হয়। মাইকেল মধুসূদন গো! তারা এসে থামের মধ্যে মিশে থাকে, কথা বলে। আবার চলে যায়।

কি জিজ্ঞাসা করছিলেন না?

হ্যাঁ।

যে প্রশ্ন করেছিলেন তারই পুনরাবৃত্তি করলেন—দেহটা পড়ে থাকে আর জীবন কার আকর্ষণে কোথায় যায়? বলতে পার? তা পারলে না! পারলে না! জানো না।

রসিক পাগল এই সময়টায় আমাকে খুব অভিভূত করেছিলেন। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিতে রসিকবাবু পাগল ছাড়া কিছুই নন। তাঁদের বংশেও নাকি এই ব্যাধি ছিল। তাঁর পূর্বপুরুষের কথা জানি না; তবে তাঁর ছোট ভাইকে দেখেছি, তাঁর মস্তিষ্কও সুস্থ নয়। রোগা লোক, খোনাটে সুরে কথা বলতেন। অত্যন্ত ভীতু, বিশেষ করে বড় ভাইকে প্রায় ভূতের মতোই ভয় করতেন। রসিকবাবুকে পথে আসতে দেখলে সঙ্গে সঙ্গে কারুর বাড়ি ঢুকতেন বা উলটো পথ কি পাশের গলি ধরে সরে পড়তেন। বলতেন, ওটা পাগল—বদ্ধ পাগল। বোধ করি এক ভগ্নীও পাগল ছিলেন। প্রথম দিকে রসিকবাবু ভয় করবার মতোই মানুষ ছিলেন। অনেক কাল আগে, বোধ করি ১৯১৫।১৬ সনে তাঁকে যখন প্রথম দেখি তখন আমিও ভয় পেয়েছিলাম। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, দাড়িগোঁফে আচ্ছন্ন মুখ, কৌপীনসার নগ্ন দেহ, সবল পেশী পরিপুষ্ট জোয়ান, কাঁধে কম্বল নিয়ে উন্মাদের মতো পথ হাঁটতেন, আর অনবরত বলতেন, ছুঃ! ছুঃ! ছুঃ! ছুঃ!

যেন ফুঁ দিয়ে কিছু উড়িয়ে দিচ্ছেন বা ঘৃণায় ফুৎকার দিচ্ছেন— ছুঃ! ছুঃ! মুখটা এদিকে ফিরত একবার, ওদিকে একবার। সব দিকেই যেন সেই বস্তুটা রয়েছে, যাকে উড়িয়ে দিতে চান বা যার উপর ঘৃণার নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করছেন।

লোকে বলত, কালী সাধনা করতে গিয়ে শবাসনে বসে পাগল হয়ে গেছেন।

হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। কারণ এ দেশে ও পদ্ধতিটা আছে, তখনোও ছিল, একেবারে ও-সাধনা বিলুপ্ত হয় নি এবং পাগলও বহুজন হয়েছে। এতে কেউ কোনো প্রতিবাদই করবেন না। সিদ্ধি পেয়েছেন, সাধনা পূর্ণ হয়েছে বললেই ঝগড়া হবে, কিন্তু রসিকবাবু তা থেকে রেহাই দিয়েছেন মানুষকে। তবে তাঁর কথাবার্তা আচার-আচরণ অত্যন্ত বিচিত্র। সেই কারণেই আমাকে আকৃষ্ট করেছিলেন রসিকবাবু। যখন তিনি উন্মাদ পাগল, তখনকার একটি কথা মনে পড়ছে। তখনই তাঁর প্রতি মন প্রথম আকৃষ্ট হয়। মামাদের বাড়ির সামনে রাস্তার উপরে একটা কুকুরছানাকে একটা এক্কা চাপা দিয়ে গেল। কুকুরছানাটা মরণ-যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল। ছুঃ! ছুঃ!— শব্দ করে রসিক পাগল যাচ্ছিলেন পাশ দিয়ে, মুহূর্তে সেই শব্দ শুনে নিজেই যেন একটা নিষ্ঠুর যন্ত্রণা অনুভব করে বেঁকেচুরে ঘুরে দাঁড়িয়ে, চিৎকার করে উঠলেন—আঃ! মরণ। মৃত্যু আগেয়া।

তারপর ছানাটা তাঁর চোখে পড়ল। পাগল ছুটে এসে পাশে হাঁটু গেড়ে বসে ঝুঁকে পড়ে দেখে, চিৎকার করে উঠলেন—জল! পানি! জলদি! ডাক্তার! ডাক্তার বোলাও! জলদি!

এর মধ্যেই কুকুরছানাটা শেষ হয়ে গেল।

যে মুহূর্তে পাগলের তা উপলব্ধি হল, সেই মুহূর্তে উঠে দাঁড়িয়ে সারা শূন্যলোকটা খুঁজে চিৎকার করে উঠলেন—কাঁহা গয়া? কাঁহা? কিধর?

এর পর দীর্ঘকাল পরে রসিকবাবুকে দেখলাম—শান্ত পাগল। গভীর কোনো ভাবনায় যেন মগ্ন হয়ে আছেন। মানুষের সঙ্গে কদাচ কথা বলেন। কথা বললেও স্বল্প কথায় মৃদুস্বরে উত্তর দেন। তখন দুপুর হলেই কারুর বাড়িতে গিয়ে বসেন। তারা খেতে বললে খান, না বললে কিছুক্ষণ পর উঠে চলে যান। আমার মামাদের বাড়িতে তাঁর খুব খাতির ছিল। আমার দিদিমা-মাসিমারা বিশ্বাস করতেন যে, শবাসন ছেড়ে পাগল হয়েও আবার সাধনা করে রসিক সিদ্ধ হয়েছেন।

সিদ্ধ হোন বা না হোন, বৃদ্ধ বয়সে শান্ত নীরব রসিকবাবুকে সেই এক ভাবনাতেই মগ্ন থাকতে দেখেছি। যে উন্মাদ, উচ্চ চিৎকারে ওই কুকুরছানাটার আত্মা বলুন, জীবন বলুন, প্রাণ বলুন সেটা কোন্‌দিকে গেল খুঁজেছিলেন, সেই পাগলকেই শান্তভাবে শীতের রাত্রে রাস্তার ধারে বসে একটা গ্যাস-পোস্টকে নিউটন ঠাউরে তাকে যখন প্রশ্ন করতে শুনলাম—গাছ থেকে ফল পড়া দেখে মাধ্যাকর্ষণ তো আবিষ্কার করলে তুমি; কিন্তু কই, বল তো মানুষের প্রাণটা কিসের আকর্ষণে, কেমন আকর্ষণে কোথায় যায়? কি হয়? তখন এ সন্দেহ আর থাকে না যে এই লোকটি—মৃত্যু কি, মৃত্যু কেন, মৃত্যু কোথায়—সেই আদিম মহাপ্রশ্ন নিয়েই পাগল হয়ে গেছেন ও আছেন।

রসিক-পাগলকে শান্তরূপে দেখি উনিশশো তিরিশ সনের মে বা জুন মাসে। তখনও তাঁর মুখে এই প্রশ্নই শুনেছিলাম। আমি জেলে যাব, কোর্টের সমন হয়েছে হাজির হতে। আমার মা তখন পাটনায় ছিলেন; কোর্টের সমন পেয়েই তাঁকে আনতে গিয়েছি। বেলা সাড়ে-দশটা এগারোটার সময় পাগল এসে বাড়ি ঢুকে বসলেন—কম্বল নামালেন, আপনমনেই বিড়বিড় করতে লাগলেন। জিজ্ঞাসা করে জানলাম, এই সেই উন্মাদ পাগল রসিকবাবু। দিদিমা-মাসিমারা তাঁর সিদ্ধিলাভের কথাও বললেন। আমার কৌতূহল বাড়ল। বেশ তীক্ষ্ণ মনঃসংযোগ সহকারেই তাঁকে দেখতে শুরু করলাম। খুব কাছে বসে কথা শোনবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কাছে গেলেই পাগল চুপ করে যেতেন। একদিন কিছু যেন আলোচনা করছিলাম আমরা, সে আলোচনার মধ্যে 'বিষ' কথাটা ছিল, এবং মৃত্যুও ছিল। একটার সঙ্গে অন্যটার সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

ঠিক এই সময়েই পাগলের জন্য ভাতের থালা কেউ নিয়ে এলেন, এবং

আসনের সামনে নামিয়ে দিলেন। আমরা আলোচনাই করছি, পাগলের দিকে দৃষ্টি কারোও ছিল না। হঠাৎ একসময়ে আমার বড় মামার দৃষ্টি পড়ল তিনি বললেন, কি হল রসিকদা, খাচ্ছেন না যে?

এবার আমিও দৃষ্টি ফেরালাম; দেখলাম, পাগল ভাতের থালা সামনে রেখে আসনে বসে আছেন, ভাতে হাত দেন নি; হাত নেড়ে যাচ্ছেন আর বিড়বিড় করে বকছেন।

মামার কথার উত্তরে পাগল মামার দিকে তাকিয়ে বললেন, বিষ? না? বিষ যেখানে, মৃত্যু সেখানেই। তা হলে মৃত্যু যেখানে, সেইখানেই বিষ। মৃত্যু তো সর্বত্র। বিষও সর্বত্র। ভাতেও তা হলে বিষ!

আমি এমনি, বোধ করি, তাঁর বিষভীতি ঘোচাবার জন্যেই বললাম, সর্বত্র কি শুধু মৃত্যুই আছে? জীবনও যে রয়েছে সর্বত্র। ভাতেও কি শুধু বিষই আছে? জীবন নেই? নইলে ওতেই জীবন বাঁচে কেন? জীবনই তো অমৃত।

মুখের দিকে তাকিয়ে তারিফ করে পাগল বললেন, ভালো বললে তো! হ্যাঁ। তাও তো বটে! তাই তো! তা হলে ভাতটা বিষ নয় বলছ? উহুঁ।

বললাম, বিষও বটে, অমৃতও বটে। বিষামৃত।

খুব খুশী হয়ে কথাটা বার বার যেন মুখস্থ করলেন কিছুক্ষণ, তারপর খেলেন। যে কয়দিন সেবার ছিলাম, তার মধ্যে কয়েকদিন তিনি মামাদের ওখানে এসেছেন, রোজই কথাটা জিজ্ঞাসা করেছেন পাগল—কি কথাটি হে? বিষামৃত, নয়?

হ্যাঁ। বিষামৃতেই সংসার সৃষ্টি হয়েছে।

হুঁ। ঘাড় নাড়তে শুরু করতেন পাগল।

শুধু তাঁর পাগলামির এই বিচিত্র একমুখীত্বই তাঁর সবটা নয়, আরও একটু ছিল। পাটনার অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁকে ভালো খাওয়াতে চাইতেন, ভালো পরাতে চাইতেন, ভালো স্থানে আরামে রাখতেও চাইতেন, কিন্তু পাগল তা চাইতেন না। জগৎবাবু উকিল শীতকালে পাগলকে গাড়ি করে দোকানে নিয়ে গেলেন, দোকানদারকে বললেন, খুব ভালো কম্বল দাও। দোকানদার বিলাতী রাগের গাঁটরি খুলে দিলে। পাগল একবার নেড়ে-চেড়ে বললে, উহুঁ।

আবার অন্য গাঁটরি খুললে। পাগল ঘাড় নাড়লেন এবং শেষে আঙুল বাড়িয়ে যে কম্বল দেখিয়ে দিলেন, তা সামনের থাকে রয়েছে—একেবারে অতি সাধারণ, যার দাম সেকালে ছিল দু টাকা কি তিন টাকা।

রসিক পাগলই। কোনো সিদ্ধিযোগের বিভূতি তাঁর ছিল না; থাকলেও তার জন্যে আমি তাঁর দিকে আকৃষ্ট হই নি, আকৃষ্ট হয়েছিলাম এই বিচিত্র প্রশ্ন নিয়ে পাগল হয়েছেন বলে। আকাশের দিকে তাকিয়ে যারা ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড বলে পাগল হয়, সে পাগলেরা পাগল হয়েও যে শ্রদ্ধা পায়, রসিককে আমিও সেই শ্রদ্ধার চোখে দেখেছি। এ সংসারে দুনিয়ার মঙ্গল করতে যারা বদ্ধপরিকর হয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে নির্যাতন করে, যুদ্ধ বাধায়, ধ্বংস করে দুনিয়া, তাদের চেয়ে এ পাগল অনেক শ্রদ্ধার মানুষ আমার কাছে।

আত্মসর্বস্বতামূলক পাগলামি আর রসিক পাগলের পাগলামি কত স্বতন্ত্র! প্রথমটা আমাকে বেদনা দেয়, দুঃখ পাই, মর্মাহত হয়ে ভাবি—অহংয়ের কি শোচনীয় পরিণতি! শেষেরটায় জাগে বিস্ময় এবং মুগ্ধও হতে হয় এই ভেবে যে, এই মহাতত্ত্বটা যে এমন দিশাহারা হয়ে ভাবলে, সে মানুষটার মধ্যে সম্ভাবনা তো কম ছিল না!

রসিক পাগল আমাকে এমনই প্রভাবান্বিত করেছিলেন যে, তাঁকে নিয়ে গল্প লিখেছি সে সময়। গল্পটির নাম "প্রতিধ্বনি"। পাগল মূর্খ ছিলেন না। কলেজে পড়েছেন, তবে কতদূর পড়েছেন আজ ঠিক মনে পড়ছে না। এবং প্রথম দিকে নাকি সে আমলের ইয়ংবেঙ্গলদের মতোই রীতিমতো ইংরেজি-নবিস ছিলেন। যাঁরা পশ্চিমপ্রবাসী বাঙালী-সমাজের সঙ্গে পরিচিত, তাঁরা জানেন এমনিতেই প্রবাসী বাঙালী-সমাজ কতখানি ইংরেজিভক্ত ছিলেন। সে আমলে ইংরেজের রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে ইংরেজিতে রাজকার্য সুগম করে দেবার জন্যই বাঙালী দেশ ছেড়ে ভারতের বড় বড় শহরে গিয়ে বাস করেছিলেন। ইংরেজিতে দখলটাই ছিল জীবনে জীবিকা উপার্জনের মূলধন। এর উপর মডার্ন বা ইয়ংবেঙ্গল হবার ঝোঁক চাপলে সে মানুষ কেমন ধারার ছিল তা অনুমান করতে কষ্ট হয় না। কষ্ট হয়, সে মানুষ এই ধারায় ঘুরল কি করে ভেবে।

*   *   *   *

পাটনায় আর-একজন বৃদ্ধকে দেখেছিলাম। বাংলা-সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী বঙ্গবাণীর প্রবীণ সেবক। সেকালের পশ্চিমী হাওয়ার মানুষ, ডাল রুটি ও ব্যায়ামে সবল দেহ—মথুরবাবু। আমি যখন তাঁকে দেখলাম, তখন তিনি অশীতিপর বৃদ্ধ। তবুও বঙ্গ-সাহিত্যকে উপলক্ষ করে যে কোন অনুষ্ঠান হোক, বৃদ্ধ এসে উপস্থিত হতেন। বঙ্গ-সাহিত্যের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা এবং অনুরাগ দেখে শ্রদ্ধানত চিত্তে ভাবতাম, প্রবাসী বাঙালী-

সমাজে জন্মে, মানুষ হয়ে, কি করে সে আমলে এত বড় অনুরাগ তিনি অর্জন করেছিলেন! সে আমলে প্রবাসী বাঙ্গালীর পক্ষে বাংলার চেয়ে ইংরেজিটাই ছিল বেশী রপ্ত। বাংলাতে একখানা সে আমলের ছোট আকারের পোস্টকার্ড লিখতে হলে তাঁরা বেশ একটু কষ্ট এবং মনে মনে তিক্ততা অনুভব করতেন।

এই ভাবটা খানিকটা কেটেছে জাতীয় আন্দোলনে, খানিকটা কেটেছে রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির গৌরবে।

অবশ্য সর্বস্থানেই সর্বকালে ব্যতিক্রম থাকে, পাটনার বাঙালী-সমাজে মথুরবাবুর কালেও ছিল। তিনি নিজেই ছিলেন এই ব্যতিক্রম। এবং ছিলেন আচার্য যদুনাথ সরকার।

আরও একজন ছিলেন। স্বর্গীয় যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার মহাশয়। এঁদের পর কিন্তু পাটনার বাঙালী-সমাজে দীর্ঘকাল এঁদের মতো নিষ্ঠাবান বাংলা-সাহিত্যের সেবকের আর আবির্ভাব হয় নি; এই দীর্ঘ ছেদের পর ঠিক এই সময়ে, অর্থাৎ আমি যখন গেলাম, তখন একদল বাঙালী তরুণ নতুন করে সাহিত্যসাধনার আসন পেতেছেন পাটনায়। এঁদের সকলেই কৃতবিদ্য। কেউ এম. এ. পাস করেছেন, কেউ এম. এ. পড়ছেন, কেউ বি. এ. পড়েন এবং সকলেই ছাত্র হিসাবে কৃতী। অবশ্য এর আগেই বর্তমান কালের বাঙালী সাহিত্যরথীদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট রথী শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় পাটনায় কয়েক বৎসরের জন্য এসেছিলেন। তিনি কোন আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন বলে শুনি নি। তবে তাঁর ছাত্রজীবনের অসামান্য সাফল্যের গল্পের মধ্যে বাংলাভাষায় দখলের কথা শুনেছিলাম। তারও একটি বৈশিষ্ট্য আছে। ম্যাট্রিকুলেশনে শ্রীযুক্ত রায়ের বাংলা ভাষা ছিল না। তিনি নাকি ওড়িয়া ভাষা নিয়ে পাস করেছিলেন। পাটনায় কলেজে পড়তে এসে তাঁকে বাংলাসাহিত্যে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিতে হয়। সেই পরীক্ষায় তিনি বাংলাভাষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। তারপর আই. সি. এস. পরীক্ষা দিয়ে শিক্ষার্থী হিসেবে বিলেত গিয়ে যখন 'পথে প্রবাসে' লিখতে শুরু করেন, তখন তাঁর অসামান্য সাফল্য পাটনার তরুণ-সমাজে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। একজন আই. সি. এস., পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বাঙালীর সাহিত্য-প্রীতি এবং আই. সি. এস. খ্যাতি অপেক্ষাও সাহিত্যিক খ্যাতির মূল্যের তারতম্য পাটনার ছেলেদের মনে নূতন প্রভাব বিস্তার করেছিল—এতে সন্দেহ নেই।

এই ছেলেদের দলের মধ্যমণি ছিলেন যিনি, তাঁর নামও ছিল মণি। বাংলাসাহিত্যের সেবায় অনুরাগে এবং অধিকারে জন্মগতসূত্রে তাঁর উত্তরাধিকার

ছিল। অবশ্য সাহিত্যক্ষেত্রে উত্তরাধিকার জন্মাধিকারে থাকে না; দুনিয়ার বিষয়গত জাতিগত আইন এখানে অচল। তবুও ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে এ উত্তরাধিকার সার্থক হয়! মণির ক্ষেত্রে তাই হয়েছিল। মণি—মণীন্দ্রনাথ সমাদ্দার স্বর্গীয় যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দারের ছোট ছেলে। মণির বড় ভাইয়েরা সরকারী চাকুরে। এক ভাই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, এ আমার মনে আছে। মণি এম. এ. পাস করে চাকরির চেষ্টা না করে সাহিত্যসাধনার বাসনা পোষণ করত। তাকেই কেন্দ্র করে নবেন্দু ঘোষ, শিশির ঘোষ, শিশিরের দাদা, যোগীনবাবুর ছেলে প্রভৃতি একদল বাঙালী তরুণ "প্রভাতী সঙ্ঘ" নাম দিয়ে একটি সঙ্ঘ স্থাপন করেছিল এবং হাতে লিখে "প্রভাতী" নামে একখানি হাতে-লেখা মাসিকপত্রে লেখার সাধনা শুরু করেছিল তখন।

এঁরাই এলেন একদিন আলাপ করতে, ওঁদের সঙ্গে যাবার জন্য নিমন্ত্রণ জানাতে। সকলেই প্রায় আমার বড় ছেলের সমবয়সী—দু বছর চার বছরের বড়। লাজুক ছেলের দল, চোখে মুখে স্বপ্নের ছাপ, এবং সঙ্কোচও আছে। সে সঙ্কোচ আমাকে নয়; সঙ্কোচ, প্রতি বাড়িরই অভিভাবকদের কাছে। তাঁরা তো এই সাধনাকে বেশ প্রীতির চক্ষে দেখেন না, কারণ সাহিত্যসাধনা যতই ভালো বস্তু হোক, ওই মানুষের ভবিষ্যৎ নষ্ট করবার পক্ষে স্বাস্থ্য নষ্টকারী ডিস্‌পেপসিয়ার মতোই দুরারোগ্য এবং কুটিল ব্যাধি। ধরলে বড় একটা ছাড়ে না এবং চোঁয়াঢেকুর ও অগ্নিমান্দ্যের মতো নিরীহ উপসর্গে শুরু হয়ে বৎসর কয়েকের মধ্যেই যখন পেড়ে ফেলে, তখন আর উপায় থাকে না। সাহিত্যসাধনাকে তাঁরা মানসিক ডিস্‌পেপসিয়া বলেই মনে করতেন।

"প্রভাতী সঙ্ঘ" পাটনার বাঙালীসমাজে সত্যকারের সাহিত্যরুচি সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হয় নি। মণীন্দ্র শক্তিশালী সম্পাদক ও সমালোচক হয়ে উঠেছিলেন। "প্রভাতী সঙ্ঘ"র নবেন্দু ঘোষ বাংলাসাহিত্যে শক্তিমান লেখক হিসেবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। শিশির ঘোষ আজ বিশ্বভারতীতে অধ্যাপক, বর্তমানে তিনি শুনেছি শ্রীঅরবিন্দের দর্শনের পথে সাধনা করেন, অন্যথায় তিনিও বাংলাসাহিত্যে সম্পদ যোজনা করতে পারতেন। মণীন্দ্র অকালে মারা গেছেন। মণীন্দ্রের হাতে লেখা "প্রভাতী" বৎসর কয়েকের জন্যে ছাপা হয়েও প্রকাশিত হয়েছিল। "প্রভাতী" স্বল্পকালের মধ্যেই বিশিষ্ট একটি ছাপ রেখে গেছে। "প্রভাতী"র দাবিতেই "বনফুলে"র বিখ্যাত উপন্যাস "রাত্রি" প্রকাশিত হয়েছে। আমার "কবি" উপন্যাসও "প্রভাতী"তে প্রকাশিত হয়েছে। কয়েকজন নবীন লেখকের কয়েকটি বিখ্যাত গল্পও "প্রভাতী"ই হাতে তুলে সাহিত্যের দরবারে হাজির করেছে।

চোখে হাই-পাওয়ার চশমা, মাথায় কোঁকড়া চুল, ভারী-গলা মণি সমাদ্দারের মুখে হাসি লেগেই থাকত। তাঁর বাড়িতেই ছিল "প্রভাতী সঙ্ঘর" স্থায়ী আসর। আর তাঁদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন আমাদের রঙীনদা। অকৃতদার রঙীনদা নিজের ঘরদোর গোছগাছ করতে এবং আশপাশ পরিচ্ছন্ন পবিত্র রাখতেই সারা জীবন এমনই ব্যস্ত থেকে গেলেন যে, নিজে আর সাহিত্যসাধনার সময় পেলেন না কিন্তু এই উদারচরিত্র সাহিত্যানুরাগী মানুষটি যেখানেই এবং যার মধ্যেই সাহিত্যসাধনার সন্ধান পেয়েছেন, সেইখানেই ও সেই জনকেই অকৃপণ স্নেহে সাহায্যে সমৃদ্ধ করবার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন।

উনি আমাকে বলেছিলেন, তুমি যেও হে তারাশঙ্কর, ওদের উৎসাহ দিও। বুঝলে হে, বড় ভালো ছেলে ওরা।

আমি একদিন গেলাম মণির বাড়ি।

গিয়েই মনে হল, এ কোথায় এলাম? এ যে সাধকের সাধনপীঠ! স্বর্গীয় যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার মশায়ের লাইব্রেরি-ঘর। রাশি রাশি বই চারদিকে, মাঝখানে এবং আলমারিগুলির ফাঁকে অসংখ্য প্রস্তরমূর্তি—সে এক বিচিত্র সংগ্রহশালা! এক জ্ঞানীর জ্ঞানভাণ্ডার!

বুঝলাম, মণির উত্তরাধিকার কিসের শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অল্পবয়সে পিতৃহীন ছেলেটি, এই ঘরের চারপাশে ঘুরেছে আর স্বপ্ন দেখেছে। পৈতৃক সাধনার মূল্য উপলব্ধি করেছে দেহের প্রতি লোমকূপে-কূপে, আবেগময় রোমাঞ্চের মধ্যে বুকের মধ্যে বাসনা পোষণ করেছে বাবার আসরে বসবে।

সেদিন মণি আমাকে তার বাবার লেখা বিখ্যাত গ্রন্থ "সমসাময়িক" ভারতে'র কয়েক খণ্ড উপহার দিয়েছিল। স্বর্গীয় সমাদ্দার মহাশয়কে প্রণাম জানিয়েই তা গ্রহণ করেছিলাম। তারপর আরও কয়েকদিন গেলাম ওদের আড্ডায়। সকলেই ওরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, রাশি রাশি ইংরেজি বই পড়েছে। আমি তার কিছুই পড়িনি। ওরা আলোচনা করত, আমি মুগ্ধ হয়ে শুনতাম! কিন্তু মধ্যে মধ্যে মনে হত, এই পড়ে ইউরোপের সাহিত্য এবং ওই দেশের বিচিত্র জীবনধর্ম সম্পর্কে যা ওরা জেনেছে তাই যদি এ দেশে মানুষের জীবনধর্ম সম্পর্কে সত্য বলে মনে করে, কি প্রয়োগ করে, তবে কিন্তু ভুল হবে।

যেমন মনে হয়েছে, এ কালের দু-একজনের তখনকার লেখা পড়ে। তাঁরা শক্তিমান লেখক। কিন্তু লেখা পড়ে তার মধ্যে এ দেশের জীবনের সন্ধান পাই নি। ভাষা পড়ে তারিফ করতে হয়—যেমন মাজা-ঘষা, তেমনি চোখা, চমৎকার বাংলা। কিন্তু তবু এ কথা অবশ্যই বলব যে, এ ভাষা তো বাঙালীর ভাষা নয়। পাত্র-পাত্রীগুলির দেশী কাপড়জামা বেশভূষা সত্ত্বেও

মনে হয় এরা কারা? বাঙালী? ইংরেজ? মানুষ? তাই যদি হয়, তবে জীবন কোথায়? তার স্পর্শ কই?

যাই হোক, ওরা আমাকে কিছু কিছু বই পড়ালে। তারপর একদিন বললে, ওরা একটি উৎসব-অনুষ্ঠান করবে। "প্রভাতী সঙ্ঘে"র প্রথম বার্ষিক অনুষ্ঠান। আমি আছি এখানে, আর ওরা নিমন্ত্রণ করেছে শ্রীসজনীকান্ত দাসকে, বনফুলকে এবং শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়কে। রঙীনদা উৎসাহিত করেছেন। শচীমামা বলেছেন, খুব ভালো, আন, আন। জমিয়ে তোল আসর। আমি সেদিন শচীমামার সান্ধ্যমজলিসে যাওয়ামাত্র বললেন, ওগো ভাগ্নেকে ভালো করে খেতে দাও। ওকে সারিয়ে তোল। এবার আসরে গাওনা গাইতে হবে। গায়ে জোর না হলে গাইবে কি করে?

প্রভাতী সঙ্ঘের এই অধিবেশনের কথার আগে এক বেহারী ভদ্রলোকের কথা বলব।

পাটনাতে শচীমামার ওখানেই ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, তিনিই বাঙালীর সম্পর্কে আমার কাছে কঠিন অভিযোগ করেছিলেন। ওই শচীমামার ওখানেই তিনি আসতেন। শচীমামার উদার প্রসন্ন সাহচর্য শুধু বাঙালীকেই মুগ্ধ করে নি ও-দেশের গুণীজনদেরও মুগ্ধ করেছিল।

ভদ্রলোকটির নাম ছিল খুব সম্ভব অম্বিকাপ্রসাদ। রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন, কিন্তু সাহিত্যানুরাগ ছিল প্রবল। ইংরিজি পড়েছিলেন নিশ্চয়, কিন্তু কতদূর তার পরিচয় দেওয়া আমার মতো স্বল্প-ইংরিজি-জানা লোকের পক্ষে বুঝে ওঠা কঠিন। বাংলা-সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান এবং পড়াশুনার ব্যাপকতা দেখে বিস্মিত না হয়ে পারি নি। অম্বিকাপ্রসাদ জীবিত নেই। দেশ স্বাধীন হবার অব্যবহিত পূর্বেই বা পরেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেছেন। দু-বছর আগে কলকাতায় প্রান্তীয় হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলন উপলক্ষে পাটনার খ্যাতনামা রাজনৈতিক কর্মী এবং প্রসিদ্ধ হিন্দী-সাহিত্যসেবী বেণীপুরীজী তাঁর সম্পর্কে আক্ষেপ প্রকাশ করে বলেছিলেন, অম্বিকাপ্রসাদের অভাবে তাঁদের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। তখন কিন্তু বাঙালীদের মধ্যে অনেকেই অম্বিকা-প্রসাদকে ভালো চক্ষে দেখতেন না। শচীমামার কথা ছাড়া অবশ্য। অম্বিকা-প্রসাদকে বাঙালী-বিদ্বেষী বলতেন অনেকে। অম্বিকাপ্রসাদ একদিন আমাকে আমার "জলসাঘর" গল্পসংগ্রহখানি এনে বললেন, এ শব্দটা কেন আপনি প্রয়োগ করেছেন তারাশঙ্করবাবু?

শব্দটি 'খোট্টা' শব্দ। "টহলদার" গল্পে এক জায়গায় ছিল, "বাবুদের খোট্টা চাপরাসীটা ভোরের আমেজে নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে।" অম্বিকা-প্রসাদ বললেন, কথাটার অর্থ কি বলুন তো?

চমৎকার বাংলা বলতেন। তেমনি বুঝতেন। তাঁর কথায় প্রশ্নটা প্রথম মনে জাগল, তাই তো, অর্থ কি? ঠিক অর্থ বুঝে তো লিখি নি। দেশপ্রচলিত শব্দ। আমাদের রাঢ়ের পল্লী অঞ্চলে হিন্দীভাষী লোকেদের 'খোট্টা' বলে থাকে। শব্দটার অর্থ কি, কি হিসেবে ব্যবহার করে, তা সত্যিই ভাবি নি। আমাদের দেশে এই রকম কয়েকটা কথাই আছে। একটা 'ভোজপুরে'। 'ভোজপুরে' শব্দটার অর্থ স্পষ্ট—ভোজপুরের অধিবাসী। কিন্তু ব্যবহার করি যখন, তখন মনে ভাসে একটা বলশালী দুর্দান্ত জোয়ান—যে হয় লাঠি না হয় কুস্তিগিরের কাজ করে। 'খোট্টা' শব্দটার অর্থ বা ব্যঞ্জনা আরও নীচুস্তরের। কাঠখোট্টা আমরা তাদেরই বলি, যারা কাঠের মতো নীরস কিন্তু নীরস তরুবর নয়, গড়া-পেটা মুগুরও নয়, সাদা কথায় খেঁটে। অর্থাৎ একেবারে অসংস্কৃত শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড যা দিয়ে আঘাতই করা যায়। সেই অর্থে খোট্টা শব্দের অর্থটা দাঁড়ায়—বর্বর, হৃদয়হীন বা নিষ্ঠুর।

কথাটা নিয়ে খানিকটা তর্ক উঠেছিল, কিন্তু আমিই সেদিন প্রকাশ্যেই তাঁর কাছে মার্জনা চেয়ে বলেছিলাম, প্রচলিত শব্দ বলে না বুঝেই ওটা আমি প্রয়োগ করেছি। পরে ওটা সংশোধন করে দেব।

অম্বিকাপ্রসাদ বলেছিলেন, তারাশঙ্করবাবু, বাঙালী সাহিত্যিকরা সকল দেশ থেকে এগিয়ে আছেন আজ। তাঁদের খুব সাবধান হতে হবে। এগিয়ে আছেন তাঁরা ইংরিজির জোরে! এই ইংরিজির জোরেই তাঁরা সব প্রভিন্সে গিয়ে মাতব্বরি করেছেন; সেখানে তাঁরা অনেক কিছু করেছেন—সে অবশ্যই বলব। কিন্ত তাঁরা সব প্রভিন্সের লোকদের এত ছোট নজরে দেখেছেন, এত অবজ্ঞা ঘৃণা করেছেন যে, সবার অন্তরেই দগদগে ক্ষত হয়ে রয়েছে। আমি ঠিক জানি না, তবে আমার মনে হয়, ইংরিজিনবিশ বাঙালী বাংলা দেশের দেহাতী বাঙালীকেও ঠিক এমনি আঘাতই দিয়েছে। ইংরেজ থাকবে না তারাশঙ্করবাবু। তাকে যেতে হবে। সে যেদিন যাবে, সেদিন এদের বিপদ ঘটবে। তার সঙ্গে ইংরিজি ভঙ্গির এবং ভাবনার সাহিত্যেরও বিপদ আসবে।

তখন বেশী কেউ ছিল না আড্ডায়। সময় দুপুরবেলা। সেদিন শচী-মামার ওখানেই নিমন্ত্রণ খেয়েছি। অম্বিকাপ্রসাদও নিমন্ত্রিত ছিলেন। শচী-মামার বাড়িতে এসেছেন শ্রদ্ধেয়া বাসন্তী দেবীর ছোট বোন—শ্রীযুক্তা মাধুরী দেবী. বিখ্যাত গায়িকা শ্রীমতী সতী দেবীর মা। এককালে শ্রীযুক্তা মাধুরী দেবীর স্বামী পাটনায় ওকালতি করতেন। পাটনার বাঙালী সমাজে এবং কিছু বাংলা-জানা বেহারী-সমাজে তাঁর একটি পরম প্রীতির স্থান ছিল। অম্বিকা-

প্রসাদ ছিলেন সেই প্রীতিমুগ্ধদের একজন। দুপুরে খাওয়ার পর বাইরের ঘরে অম্বিকাপ্রসাদ কথাগুলি বললেন। শচীমামা শুনছিলেন।

আমি বলেছিলাম, অম্বিকাবাবু, কথাগুলির মধ্যে সাবধান-বাণী যা উচ্চারণ করলেন তা আমার মনে থাকবে। কিন্তু ইংরিজিনবিশদের কথা এবং ইংরিজী সাহিত্যের প্রভাবে প্রভাবান্বিত সাহিত্যের কথা যা বললেন তার সঙ্গে একমত হতে পারছি নে। কারণ ইংরেজ গেলেও ইংরিজি যেতে পারে না। পৃথিবীর সঙ্গে এ দেশের লোককে সম্বন্ধ রাখতে হবে। তা ছাড়া ইংরিজি শিক্ষা ও সভ্যতার মারফত যে বিজ্ঞানবাদ ও বোধ এসেছে তাকে দূর করে কার সাধ্য?

অট্টহাসি হেসেছিলেন অম্বিকাপ্রসাদ।

এই দেশের কোটি কোটি লোক, যারা মাটির মানুষ, তারা এই ইংরিজি চাল আর চালিয়াতিকে ঝেঁটিয়ে তাড়াবে। তারা নিজের বুকের ভাষা আর ভাবকে গঙ্গার ধারার মতো ঢেলে দেবে। বস্তুবিজ্ঞান দিয়ে ভয় দেখাচ্ছেন, তার ভয়ই বা তারা কেন করবে? তাকে তারা নেবে। আপনার মতো করে নেবে। দেখে নেবেন। তারাশঙ্করবাবু, এ দেশে তুলসীদাসজীর "রামচরিত-মানস"ই এ দেশের লোককে বাঁচিয়ে রেখেছে। আপনার দেশে কৃত্তিবাস কাশীরামের রামায়ণ মহাভারত কত চলে খোঁজ নেবেন। আপনি বা আপনারা তার কাছে মক্ষি।

পরের দিন, বোধ করি কি দু-একদিন পর অম্বিকাপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথের একখানি বই হাতে করে এলেন। সে দিনও অপরাহ্নবেলা। শচীমামা বাগানে কিছু করছিলেন। আমি একা বসেছিলাম। আমার হাতে বইখানি দিয়ে তিনি বললেন, পড়ুন। এই শেষটা পড়ুন! দাগ দেওয়া আছে।

পড়লাম—"ভস্মাচ্ছন্ন মৌনী ভারত চতুষ্পথে মৃগচর্ম পাতিয়া বসিয়া আছে—আমরা যখন আমাদের সমস্ত চটুলতা সমাধা করিয়া পুত্রকন্যাগণকে কোট ফ্রক পরাইয়া দিয়া বিদায় হইব, তখনো সে শান্ত চিত্তে আমাদের পৌত্রদের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে। সে প্রতীক্ষা ব্যর্থ হইবে না, তাহারা সন্ন্যাসীর সম্মুখে করজোড়ে আসিয়া কহিবে, 'পিতামহ আমাদের মন্ত্র দাও'।"

পাটনার কথায় অম্বিকাপ্রসাদকেও মনে পড়ে গেল। তাঁর কথাগুলি মনের মধ্যে ছাপ রেখে গেছে।

পর পর কয়েক বৎসর গিয়েছি। তিন বৎসর তাঁকে দেখেছিলাম।

অম্বিকাপ্রসাদের কথা এইখানে থাক।

এর আগে মণি-মণ্ডলের "প্রভাতী সঙ্ঘে"র উদ্যোগে সাহিত্য-সভার আয়োজনের কথা বলেছি। যে বৎসর আমি সাহিত্যিক পরিচয় নিয়ে প্রথম গেলাম, সেই বৎসরই এর শুরু হল। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত সভাপতি হিসেবে

নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। আমি ওখানে ছিলাম। আর নিমন্ত্রিত হলেন ভাগলপুরের বনফুল, মুঙ্গেরের শ্রীযুক্ত শরদিন্দুবাবু। বাঙালীসমাজে বেশ সাড়া পড়ে গেল।

পাটনায় আরও একটি সাহিত্যিক-সঙ্ঘ ছিল। তাঁরা ছিলেন একটু অভিজাতশ্রেণীর। একমাত্র রবীন্দ্র-সাহিত্য নিয়েই তাঁরা আলোচনা করতেন। এবং সে আলোচনার আসরও ছিল অতি অল্প কিছু লোকের মধ্যে আবদ্ধ। তাঁদের দু-একজন আমার মামার বাড়ির সম্পর্কে আত্মীয় হলেও তাঁরা এগিয়ে আসেন নি। আলাপও হয় নি। পরে হলেও সেকালে হয় নি।

সজনীকান্ত, বনফুল এসে উঠলেন মণি সমাদ্দারের ওখানে। স্বর্গত যোগীন্দ্র সমাদ্দার মশায়ের প্রশস্ত লাইব্রেরি-ঘরে তাঁদের ঠাঁই হয়েছিল। মনে পড়ছে, বনফুল এরই মধ্যে অর্থাৎ আমি তাঁর ওখান থেকে পাটনা আসার পর সপ্তাহ তিনেকের মধ্যেই একখানি উপন্যাস—তাঁর প্রথম উপন্যাস "তৃণখণ্ড" লিখে শেষ করেছিলেন। সকালবেলায় গেলাম, বনফুল পড়া শুরু করলেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস, তার উপর সুস্থ সবলদেহ বলাইচাঁদ। সতেজকণ্ঠে আবেগের সঙ্গে পড়ে গেলেন।

'তৃণখণ্ড' কেমন বই, সে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে সেদিন লেগেছিল অপূর্ব। কাব্যে এবং গদ্যে রচনার টেকনিক তাঁর সেই প্রথম। পরে তিনি আরও লিখেছেন। এর সঙ্গে নাটকীয় টেকনিক মিশিয়ে "মৃগয়া" লিখেছেন। টেকনিকের দিক দিয়ে মধুদাদার অক্ষয় ভাণ্ডের অধিকারী তিনি। সেই দিন তার প্রথম পরিচয় পেয়ে আমরা যেন বুঁদ হয়ে গিয়েছিলাম। বনফুলের ভিতরের কবি-সাহিত্যিক সেই দিনেই যেন বলেছিল, ওই মানসীর হাতছানিতেই আমার জীবনতরী চলবে, ভাসবে, কেউ ঠেকাতে পারবে না। বাইরেটা নিতান্তই খোলস।

বই শেষ হতে বাজল দুটো।

বাড়ি এসে খাওয়া-দাওয়া করছি, এমন সময় খবর এল, যে বেহার ন্যাশনাল কলেজ হলে সম্মেলন হওয়ার কথা, সেখানকার কর্তৃপক্ষ খবর পাঠিয়েছেন—তারাশঙ্করবাবু রাজনৈতিক অপরাধে কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি, তাঁকে কলেজ-হলে বক্তৃতা করতে দিলে কলেজের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে; সুতরাং তাঁকে বাদ দেওয়া হোক অথবা আই বি পুলিসের কাছে যথারীতি অনুমতি নেওয়া হোক।

সজনীকান্ত, বনফুল, শরদিন্দু বললেন, তারাশঙ্করকে যোগ দিতে না দিলে আমরা যোগ দিতে পারি না।

মণি সমাদ্দারের দলটি ব্যাকুল হয়ে উঠল—কি হবে?

রঙীনদা একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তিনি বললেন, এ হতে পারে না। প্রিন্‌সিপ্যালের কাছে কেউ গিয়ে নানা ভুয়ো সংবাদ দিয়ে ভুল বুঝিয়ে এই কাণ্ড করেছে। এবং কে করেছে সে আমি জানি।

টেবিলটার ওপর তিনি প্রচণ্ড একটা মুষ্ট্যাঘাত করলেন।

বেশ গরম হয়ে উঠল বাঙালী-সমাজ। বিপদে পড়ল তরুণ ছেলে কয়টি। আমি নিজে হলাম বিব্রত। আমার বড়মামার রাগ সবচেয়ে বেশী। ওই শচীমামাই তখন হাসিমুখে এগিয়ে এসে বললেন, আরে, এ নিয়ে এত রাগারাগি কর কেন? হইচই কেন? চল, আমরা কজন যাই প্রিন্‌সিপ্যাল সাহেবের কাছে। দেখি কি বলেন তিনি!

আসল প্রিন্‌সিপ্যাল স্বর্গীয় ললিতবাবু তখন অসুখে শয্যাশায়ী। তাঁর জায়গায় কাজ চালাচ্ছেন ভাইস্‌-প্রিন্‌সিপ্যাল জনাব মৈনুদ্দিন সাহেব। ললিতবাবু, যতদূর মনে পড়ে, শচীমামাদেরও শিক্ষক ছিলেন। শচীমামা ও আর দু-তিন জন গেলেন এবং আধ ঘণ্টার মধ্যেই সব গণ্ডগোল মিটিয়ে ফিরে এলেন। সেই স্বকীয় ভঙ্গিতে থেমে থেমে ঝোঁক দিয়ে দিয়ে বললেন, নাও, এইবার কি বলে—আসর পাত। শুরু করে দাও গাওনা!

গাওনাই বটে। সে এক জমজমাট আসর। আজ যত দূর মনে হচ্ছে, তাতে হলখানা ছিল মস্ত বড় এবং ঘরখানার এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত লোকে ঠাসা। লোকগুলি প্রবাসী-সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং ছাত্র-সমাজের ভালো ছেলের দল। সত্যিকারের তৃষ্ণা নিয়ে এসেছে। আজকের দিনে বলাটা বাহুল্য হবে না যে, লোকের কাছে সেদিন সবচেয়ে বড় ঔৎসুক্য সজনীকান্ত সম্পর্কেই। "শনিবারের চিঠি"র তীব্র তীক্ষ্ণ সমালোচনায় তখন আধুনিক সাহিত্যক্ষেত্র প্রায় ছিন্নভিন্ন তিনি তখন সদ্যযুদ্ধজয়ী বীরের মতোই গৌরবান্বিত। তখন "কল্লোল" শুরু আধুনিক সাহিত্যের অভিযান প্রায় ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। "কল্লোল", "কালিকলম", "ধূপছায়া" উঠে গেছে; এমন কি শনিবারের বের-হওয়া চিঠির প্রসার রুখতে রবিবারে যে লাঠি বেরিয়েছিল সে লাঠিতে ঘুণ ধরে ভেঙে গেছে। ওই সময়ের লেখকদের মধ্যে শৈলজানন্দ প্রবোধ সান্যাল ছাড়া সকলেই যেন সাময়িকভাবে কলম থামিয়েছেন। সজনীকান্ত তখন সম্মুখ-বাহিনী ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে পিছনের রথীদের আক্রমণোদ্যোগের আভাস দিয়েছেন।

সত্যিকথা বলতে কি, লোকে দুঃখও অনুভব করে, আবার "শনিবারের চিঠি"র মারের চাতুর্য দেখে তারিফ করে না হেসেও থাকতে পারে না। সেই সজনীকান্ত কি বলবেন! এক দল তাঁকে বলে—কালাপাহাড়, সব ভেঙে-চুরে দিলে, বিগ্রহগুলোর নাক কেটে বিকৃত করে ফেললে। বলে অবশ্য গোপনে। তবে মারের তারিফ করে। হ্যাঁ, মার বটে!

আর একদল বলেন—হ্যাঁ, বলশালী সংস্কারক বটে।

যাই হোক, সে দিন সজনীকান্তের বক্তব্য শুনতে লোক ভিড় করে এসেছিল। প্রবীণ মথুরবাবু থেকে মণি-দলের পরের দল পর্যন্ত।

সজনীকান্ত আধুনিক-সাহিত্যকে গাল দিয়ে শরৎচন্দ্র সম্পর্কেও সুকঠোর মন্তব্য করে বসলেন। তাঁর সেই সময়ের লেখা "পথের দাবি" "শেষপ্রশ্ন" প্রভৃতি ওই ধরনের লেখাগুলি সম্পর্কে বলেছিলেন—পল্লীসমাজের দাদাঠাকুর মুদির দোকানে বসিয়া থেলো হুঁকায় তামাক খাইতে খাইতে পল্লীজীবনের গল্পে আসর মাত করিয়াছেন, কিন্তু যেই তিনি থেলো হুঁকা ছাড়িয়া ও মুদির দোকান ফেলিয়া বালিগঞ্জের ড্রয়িংরুমে সোফা-সেটিতে হেলান দিয়া পাইপ টানিতে টানিতে গল্প বলিতে গিয়াছেন অমনি হাস্যাস্পদ হইয়াছেন, নাজেহাল হইয়াছেন গল্প অল্প না হইয়াও মাঠে মারা গিয়াছে।

কথাগুলি ঠিক এই কথাই নয়, আমার স্মৃতি থেকে উদ্ধার করে দিলাম। স্মৃতির উপর বিশ্বাস আছে।

সজনীকান্তের এই উক্তির সঙ্গে সে কি হাততালি! ঘরখানা যেন ফেটে পড়েছিল। আশ্চর্যের কথা, কেউ তাঁকে এ নিয়ে প্রশ্ন করে নি। উল্লসিতই দেখেছিলাম সকলকে। আমি সে দিন একটি ছোট লেখা পড়েছিলাম। লেখাটির উল্লেখযোগ্যতা কিছুই ছিল না। তখন প্রবন্ধ বা অভিভাষণ জাতীয় কিছু লিখতে হলে বিব্রত হতাম। কেন না, সেকালে ইংরিজি কোটেশন কিছু না থাকলে এবং মতামত ইংরিজি-সমালোচনা-সাহিত্য-সম্মত না হলে সেটা গ্রাহ্যই হত না। লেখাটি বেরিয়েছিল 'দেশ' পত্রিকায়।

আমি কিন্তু একটু আঘাত পেয়েছিলাম সজনীকান্তের এই উক্তিতে। বিষণ্ণ হয়েছিলাম। পরের দিন আসর মাত করলেন বনফুল ও শরদিন্দু। বনফুল হাসির কবিতা পড়ে হাসির হুল্লোড় বইয়ে দিলেন, শরদিন্দু পড়লেন "তিমিঙ্গিল" নামক হাসির গল্প। আমি পড়েছিলাম "জলসাঘর" গল্প। লোকে জুতো ঘষতে লাগল। আমার বড়মামা রেগে আগুন। আমি কিন্তু নিজের কণ্ঠস্বরে ঢাকা পড়ে জুতো-ঘষার আওয়াজ পাই নি। শেষ পর্যন্ত পড়ে তবে ছেড়েছিলাম।

পাটনাতে এই বছরেই কিছুদিন পর এলেন বাংলা-সাহিত্যের রসিকচূড়ামণি "পরশুরাম"—শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মশায়। এবং ঠিক তাঁর সঙ্গেই এসেছিলেন "অমৃতবাজারে"র সম্পাদক শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ।

পরশুরামকে দেখবার পরম আগ্রহ ছিল। না জানি, এই লোকটি কি বিচিত্র ঢঙে কথা বলবেন! হয়তো বা কথায় কথায় হাসির তুফান উঠবে।

আমার তখন শরীরের যে অবস্থা তাতে হয়তো জিজ্ঞাসা করেই বসবেন, কৌন বা ? কারিয়া পিরেত ?

শরীর দেখে অসুখের কথা উঠলে হয়তো বলবেন, এই উপসর্গ হয় ?

হয়তো সে উপসর্গ নেই—সে কথা বললে বলে বসবেন, হয়, জানতি পার না।

হয়তো বা "কচিসংসদে"র উত্তরখণ্ডে কোনো ডিস্‌পেপসিয়াগ্রস্ত গাল্পিকের চরিত্রই দেখতে পাব। নানা শঙ্কায় শঙ্কিত আগ্রহ নিয়েই দেখতে গেলাম। রঙীনদা তাঁর সম্মানে বি. এন. কলেজের মাঠে একটা চায়ের মজলিসের অনুষ্ঠান করেছিলেন। সেখানে তিনি আমাকে একেবারে রাজশেখরবাবুর টেবিলে সামনের চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। দেখে অবাক হয়ে গেলাম।

ইনিই পরশুরাম ? "গড্ডালিকা"-"কজ্জলী"র স্রষ্টা রসসাগর ব্যক্তিটি!

শান্ত স্নিগ্ধ স্বল্প এবং মৃদুভাষী প্রসন্ন একটি মানুষ; স্থির ধীর এমন মানুষের কাছে গেলে মনটি জুড়িয়ে যায়; পবিত্র হয়; জীবনে গভীরতার সন্ধান পায়। বুঝলাম, হাস্যরসের সৃষ্টি এ'র খেলা। আসলে গভীর ভাবের ভাবুক। মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম নেওয়ার মতো খেলা করেন।

শ্রীযুক্ত রাজশেখরবাবু প্রথম জীবনে বা কৈশোরে পাটনার ওদিকে ছিলেন। পাটনা কলেজে কিছুদিন পড়েও ছিলেন। তাঁর মা বলতে গেলে দানাপুরের মেয়ে; তাঁর বাবা দানাপুরের সামরিক বিভাগে কাজ করতেন। শ্রীযুক্ত বসুর মায়ের বয়স যখন মাসখানেক কি মাস দুয়েক তখনই হয় মিউটিনি। দিদিমার কাছে মিউটিনির অনেক গল্প তাঁরা শুনেছেন। "যুগান্তরে" বর্তমানে তাঁর দাদা শ্রীযুক্ত শশিশেখর বসু তার অনেক কাহিনী লিখেছেন।

সেবার পাটনা কলেজে ছেলেরা তাঁকে একটি অভিনন্দন দিয়েছিল। স্বল্প কথায় একটি ছোট বক্তৃতা দিয়ে তিনি সবিনয়ে জানিয়েছিলেন লেখার কথা আলাদা, কিন্তু বক্তৃতা দিতে তিনি ঠিক পারেন না। সেই সভায় শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষও বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ঘোষ মশায় চতুর বক্তা। কি যেন একটি সরস গল্প বলে বক্তৃতা শেষ করে আসরটা খুব জমিয়ে দিলেন।

পাটনায় আর একজন বড়মানুষকে দেখেছিলাম, তাঁর কাছে আসবার সৌভাগ্যও হয়েছিল—শ্রীযুক্ত পি. আর. দাশ মশায়।

শ্রীযুক্ত পি. আর. দাশ মহাশয় সেকালে পাটনার সাধারণ বাঙালী-বেহারী সমাজে গল্পের মানুষ ছিলেন। আইনজ্ঞ হিসেবে তাঁর যোগ্যতা, তাঁর দানশীলতা, তাঁর বৈষ্ণবধর্মে অনুরাগ, তাঁর উপার্জন—সবই ছিল বিস্ময়কর। তাঁর যুক্তি-তর্কে সওয়ালে-জবাবে দিনকে রাত্রি করতে চাইলে তাই হয়, রাত্রিকে দিন বলে প্রমাণ করতে উঠলে কোন প্রতিপক্ষই রাত্রিকে রাত্রি বলে কায়েম

করতে পারেন না। তিনি উপার্জন করেন লক্ষ লক্ষ টাকা। কিন্তু তাঁর দান এমনি, খরচ এমনি যে, মধ্যে মধ্যে বা মাসের শেষে রিক্তহস্ত হয়ে পড়েন। সকালে সন্ধ্যায় তাঁর বাড়িতে খোল-করতালের বাজনা শোনা যায়, কীর্তনগান শোনা যায়—কীর্তনগান শুনতে শুনতে দাশ মহাশয় বিভোর হয়ে যান। আবার বিকেলবেলা বাড়ির সামনে যখন টেনিসের আসর পড়ে, তখন দাশ মশায় আর-এক মানুষ;—নিজে খেলেন না, কিন্তু বেতের চেয়ারে বসে খেলা দেখেন, প্রতিটি মারের সমালোচনা করেন। খেলে ভারতবিখ্যাত খেলোয়াড়েরা বিশ্ববিখ্যাত খেলোয়াড়েরা। খেলার মাঠের সঙ্গে সংস্রব আমি তখন অনেক দিন ছেড়েছি। প্রতিজ্ঞা করে ছেড়েছি। ও-পথ হাঁটি না। এবং পথ-হাঁটা ছাড়ার সঙ্গে ক্রমে ক্রমে ও-দিকের খবর রাখাও ছেড়েছি। সে সেই মোহনবাগান-কুমোরটুলির মধ্যে সেমিফাইনালে মোহনবাগানের এক গোলে হারের খেলার পর। সে যে কি দুর্ভোগ আর আমাদের নিজেদের দীনতার কি পরিচয় ফুটে উঠেছিল, তা আজও মনে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে হাসিও পায়। সে যে কি হাস্যকর ঘটনা, সে আর কি বলব! বর্ণনা করে বোধ হয় সে দৃশ্য পাঠক-মানসে পরিস্ফুট করা অসম্ভব। আমার সাহিত্য-জীবনের সঙ্গে তার সম্পর্ক অবশ্য অতি ক্ষীণ। তবে তারই ফলে আজও মাঠের সামনে খেলার সময় খেলাফেরত কর্দমাক্ত ছিন্নবস্ত্র উন্মত্তপ্রায় লোকগুলিকে যখন বাড়ি ফিরতে দেখি, তখন লজ্জা অনুভব করি, বেদনাও পাই। একবার মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের খেলার শেষে ট্রামে যে কদর্যতা দেখেছি, তার নমুনা আমার খাতায় লেখা আছে। এই নিয়ে একটি গল্পও লিখেছিলাম সেবার। সে কি মুখভঙ্গি করে পরস্পরকে ভ্যাংচানো, কি ইঙ্গিত, কি গালাগাল! সে সব সাহিত্যের আসরে ঠাঁই পায় না। তবে হ্যাঁ, মধ্যে মধ্যে এমন বোলচালও শোনা যায় যে, তারিফ না করে পারা যায় না। সব ভুলে হাসতেই হবে সেই মুহূর্তে। দুটো কথা আমার মনে গাঁথা হয়ে আছে। কোন্ দলের জানি না, খেলোয়াড়েরা বল প্রতিপক্ষের গোলের কাছে নিয়ে গিয়েও গোল করতে পারে নি, বলটা গোলের সামনে গিয়ে গড়িয়ে চলে গেছে সীমানার বাইরে, কেউ ছুটে এসে ধরে নি বলটা, গোল লক্ষ্য করে মারে নি, বিবরণটা এই। এই নিয়ে আলোচনা করতে করতে বক্তা বলে উঠল, আর বাবা, চেঁচিয়ে গলা ফাটিয়ে দিলাম, ওরে, যা যা যা। তা নড়ল না একপা! কপাল চাপড়ে তারপরই বললে, তখন কি জানি মাইরি, ও জা নয়, ননদ। রাধা নয়, কুটিলে।

কথা অসংলগ্ন তবুও প্যাঁচ আছে বইকি!

আর-একবার এক পক্ষ অন্য পক্ষকে বলছে, ক্যায়সা হয়েছে! একেবারে

দই বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর হল, ঘাঁটালের দই বাবা, ঘাঁটিয়ে ঘোল করো না। খাওয়া যাবে না, মাথা চে'চে মাথায় ঢালতে হবে!

অপ্রাসঙ্গিকভাবে খেলার কথা এসে পড়েছে। তবুও কিছু না বলে থামতে পারছি না। "কল্লোল-যুগে" বন্ধুবর অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত খেলার কথা উল্লেখ করেছেন, বলেছেন, মোহনবাগান তখনকার দিনে গোরা খেলোয়াড়দের হারিয়ে খেলার মাঠে বাঙালীর জাতীয় চেতনার আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছিল। মোহনবাগানের জিত হলে বাঙালী জাত ভাবত, এ তার জাতীয় জয়।

কথাটা অস্বীকার করার উপায় নেই। খেলার মাঠেই যেন জাতীয় চরিত্র, জাতীয় ভবিষ্যৎ একেবারে ভবিষ্যৎচিত্রের মতো ফুটে উঠেছিল। মহমেডান স্পোর্টিং-এর আবির্ভাব, তার কয়েক বছরের দুর্দান্ত খেলা, মুসলিম দর্শকদের সম্প্রদায়গত উল্লাস—ছেচল্লিশের দাঙ্গার এবং বঙ্গদেশ-খণ্ডনের পূর্বচিত্র। শুনেছি, সেকালে ওদের ধুরন্ধর খেলোয়াড়দের কোনো শটের বা কোনো পাশের প্রশংসা করে কোন কোন হিন্দু যদি বলত—ওয়াণ্ডারফুল খেলছে, তবে সঙ্গে সঙ্গে আশপাশ থেকে তার মাথায় চাঁটি পড়ে যেত এক সঙ্গে দু-তিনটে কি তারও বেশী। এবং ঘাড় ফেরালে সে দেখতে পেত, কয়েকটি দাড়িশোভিত মুখমণ্ডল দন্তবিকাশ করে তার দিকে চেয়ে আছে আর বলছে, আরে রসিদ খেলবে না তো তোর বাপ খেলবে! এখন বাংলা ভাগ হয়ে ওদের খেলাও পড়েছে, তার দম্ভও নেই, এমন কি জিতলেও নেই। কিন্তু এখন বাঙালী দলের মধ্যে, বিশেষ করে সমর্থকদের মধ্যে, যে কদর্য কলহদ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে, তাতেই এখন আমাদের রাজনৈতিক জীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটে বেরুচ্ছে। মোহনবাগান-ইস্ট-বেঙ্গলের খেলা নিয়ে ঝগড়া ক্রমবর্ধমান। ওটার মধ্যে কোন ইঙ্গিত আছে কিনা বিশেষজ্ঞরা বলবেন। থাক। এবার মোহনবাগান-কুমোরটুলির সেই স্মরণীয় খেলার কথা বলি।

তখন আমি শ্বশুরকুলের কলকাতার কয়লা-আপিসে কাজ শিখি। ও'রা পাকড়ে এনে কাজে লাগিয়েছেন—কাজের মানুষ তৈরী হচ্ছে! রীতিমতো কোট পেণ্টালুন টাই পরি, মাথায় হ্যাট পরি। দুর্ভাগ্যের কথা, সে অপরূপ বেশের ছবি নেই। বেড়ালবাচ্চার চোখ ফোটানো পদ্ধতিতে কয়েক মাসে কয়লা, হার্ড-ওয়ার—দুটো ডিপার্টমেণ্টের চাব-পাঁচটা ব্রাঞ্চ ঘুরিয়ে এক অভিনব ডিপার্টমেণ্টে দিয়েছেন। কোম্পানির নাম—এন. মিটার অ্যাণ্ড কোম্পানি। লিমিটেড অবশ্যই। এন. মিটার কলকাতার কোন প্রাচীন মিত্র-বংশের সন্তান, এখানে লেখাপড়ায় কি অসুবিধে হয়েছিল বলতে পারি না, ফার্স্টক্লাসে বা ফার্স্ট আর্টস অর্থাৎ আই. এ. পড়তে পড়তে বিলেত চলে যান। যেভাবে বাঙালীর ছেলেরা পালিয়ে বিলেত যায়, সেইভাবেই যান এবং বছর আট-দশ সেখানে

থেকে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে এক বেলজিয়ান পত্নীসহ কলকাতায় ফেরেন। এ দেশ তখন নিজের গণ্ডিতে নেটিভ স্টেট্‌সের প্রতাপ এবং প্রমোদস্পৃহা পুরোদমে বজায় আছে। মিত্রমশায় সন্ধান করে গোয়ালিয়রের মহারাজার এক প্রমোদ-তরণী—হাউসবোট তৈরির কন্‌ট্রাক্ট সংগ্রহ করে ফেললেন। বিশ হাজার টাকার কন্‌ট্রাক্ট। খরচ খুব জোর বারো হাজার। মাস কয়েকের মধ্যে আট হাজার মুনাফা। এই টোপ নিয়ে লালবাজার অঞ্চলে তিনি ঘুরছিলেন। সেই টোপ গিললেন আমার শ্বশুরকুল। সায়েব-মিত্তির বেলজিয়ান পত্নীসহ গেলেন গোয়ালিয়রে, সঙ্গে চীনে মিস্ত্রী কাঠ-বোল্ট-নাট প্রভৃতি। এখানে রইল হেড অফিস। এখানে তিনি তাঁর তরফে বসিয়ে গেলেন তাঁর এক ভাইকে, এবং আমাকে বসালেন আর-এক পক্ষ। মিত্তির সাহেবের ভাইয়ের নাম বোধ হয় ডি. এন. মিটার। একখানি খাঁটি কলকাতার ছেলে। কথাবার্তায়, চালেচলনে, ঠোঁটের কোণে সিগারেট ধরায় শরৎচন্দ্রের দাঁজপাড়ার দাদার মতো কলকাতার মহিমা ঘোষণা করেন। তবে এটা ঠিক যে, দাঁজপাড়ার দাদার মতো অবজ্ঞা ছিল না! কথাবার্তা শোনবার মতো। তুবড়ির মতো ফুলঝুরি ফোটাতে পারতেন ভদ্রলোক। দুনিয়ায় জীবনটাকে সাবানের মতো ঘষে ফেনায় পরিণত করে রঙিন ফানুষের মতো উড়িয়ে উড়িয়ে শেষ করে দেওয়ার আইডিয়া ছিল তাঁর। কথায় কথায় বলতেন—দি আইডিয়া! কলকাতার কত গল্প যে করতেন! কাজ আমাদের খুব কম ছিল। গোয়ালিয়রের দু-তিনখানা চিঠির জবাব আর বরাত থাকলে জিনিস কিনে পাঠানো। বাকি অধিকাংশ সময়টাই ওই বাক্‌চাতুর্য এবং গল্প চলত। আমার সাহিত্যপ্রীতির কথা জেনে লাফিয়ে উঠে বলেছিলেন, মাই গুড লাক্‌! বলেন কি? আমি নিজে অথর। ড্রামাটিস্ট। মিলবে ভালো! ট্রা লা ট্রা লা।

এই ধরনের মানুষ। তাঁর "মৎকরাক্কা" বলে একখানি প্রহসন আমাকে দিয়েছিলেন। তার বাক্‌ভঙ্গি ভালো লেগেছিল। সত্যিই ভালো ছিল।

তিনটে সাড়ে-তিনটে বাজতেই মিত্তির আমাকে টেনে নিয়ে চলতেন খেলার মাঠে।

মোহনবাগান সেবার ফার্স্ট বা সেকেন্ড রাউণ্ডে দুর্ধর্ষ ডি. সি. এল. আই.কে বেকুব বানিয়ে হারিয়ে দিলে। খেলার শেষে মিত্তির ফেল্ট-হ্যাটখানা শূন্যে ছুড়ে দিয়ে বিচিত্র ক্ষিপ্রতার সঙ্গে অভ্যাস-করা সুকৌশলে মাথার পরে নিয়ে বললেন, ইন দিস ওয়ে, ব্যানার্জি, জাস্ট ইন দিস ওয়ে, মোহনবাগান উইল উইন দ্য শিল্‌ড্‌ দিস ইয়ার।

'ইয়ার'টা অবশ্য 'ইয়া' বলেই শেষ করলেন।

এই এঁর সঙ্গে সেদিন একটার সময় গেলাম ক্যালকাটা মাঠে—মাঠের

ধারে চেয়ারের টিকিট কিনে বাক্স চারেক সিগারেট পকেটে নিয়ে বসলাম। তার তিন দিন আগে অাপিস থেকে মিত্তির সে আমলের অয়েলস্কিনের ওয়াটারপ্রুফ আদায় করেছেন, সেইটে তাঁর কাঁধে, আমার কাঁধেও একটা। সিগারেট ফুঁকি, মিত্তির গল্প করে যান, সময় চলে যায় হাওয়ায় উড়ে। তিনটে নাগাদ এল বৃষ্টি। সে কি বৃষ্টি! আমি বললাম, ওরে বাপ, এ যে মুষলধারে নামল!

মিত্তির বললেন, লাইক ব্যাট্স্ অ্যান্ড ডগ্স্, তা! পকেটে পুরুন।

ভিজে একেবারে চুপসে গেলাম। শুকনো খটখটে মাঠ জলে ভরে গেল। এরই মধ্যেও লোকের চাপ বাড়তে শুরু করল। সাড়ে-চারটে নাগাদ অবস্থা হল, দুই বাঁধের মাপের মধ্যে কানায় কানায় ভর্তি জলের আবর্তের মতো। সে জল মুহূর্তে মুহূর্তে বাড়ছে। ওদিকে গ্যালারির সামনে গ্রাউন্ড ঘেরা দড়ির সীমারেখা। অবস্থা দেখে বাঁধ রক্ষা করতে সারি সারি পুলিস এসে দাঁড়িয়েছে ব্যাটন হাতে। পিছনের গ্যালারির ওপর থেকে গ্রাউন্ডের ধার পর্যন্ত সবলে দাঁড়িয়ে উঠেছে। পিছন থেকে চাপ আসছে সামনের দিকে—সামনের উদ্যতব্যাটন পুলিসের ঠেকায় ধাক্কা খেয়ে সামনের মানুষ দিচ্ছে পেছনে ঠ্যালা। মানুষ পড়ে যাচ্ছে, পাশের মানুষের জামা আঁকড়ে ধরছে—সে ছিঁড়ুক আর থাক, যাই হোক, তাকে বাঁচাতে হবে। মাঠের মাটির ওপর গোড়ালি-ঢাকা জল পায়ে পায়ে তলতলে কাদায় পরিণত হয়েছে, ছিটে লেগে সর্বাঙ্গ চিত্রিত করেছে, মুখে কাদা লাগছে, চোখে কপালে লাগছে, পা পিছলোচ্ছে। শ্বাস প্রায় রুদ্ধ হয়ে আসছে। সমগ্র জনতা চাপবন্দী হয়ে একবার সামনে, একবার পিছনে অহরহ যেন টলমল করছে। আজও মনে করতে পারি যে, সেদিন মনে হয়েছিল, বোধ করি পড়ে গিয়ে মানুষের পায়ের চাপে থেঁতলে যাব অথবা দম বন্ধ হয়ে যাবে। মিত্তির আমার পাশে, তার টুপিটা কোথায় চলে গেছে, টাইটা বেচারা নিজেই শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্টে খুলে ফেলেছে। অয়েলস্কিনের ওয়াটার-প্রুফটা কাদায় ভরে গেছে, ছিঁড়ে ফর্দাফাই হয়ে গেছে, লম্বা ভিজে চুলগুলো চোখে নাকে এসে পড়ে আছে—সে হাঁপাচ্ছে। আমিও তাই। তবে আমি এতখানি অধীর হই নি। মিত্তির অধীর হয়ে গেছে—তারই বুকে একটা হাত রেখে সামনে পুলিস ঠেলছে। সে হঠাৎ বলে উঠল সেই পুলিস কন্স্টেবলটিকে, একেবারে খাঁটি মাতৃভাষায় সরল সহজ অকৃত্রিম ভঙ্গিতে, বাবা, দয়া করে এখান থেকে বার করে দাও বাবা।

সে লোকটা ভেঙিয়ে ভাঙা বাংলায় বলে উঠলো, হ্যাঁ, আভি বলছে বা-বা, দয়া কর্কে হিঁয়াসে বাহার করে দাও বাবা! ঘুষথা কাহে?

আঁ? হাম বোলা ঘুষনে লিয়ে? বাহার করকে দাও বাবা! হটো—হটো—পিছু হটো। চলো।

মিত্তিরের পিছনে কেউ পড়ে যাচ্ছিল, সে তার জামার কলার ধরলে চেপে। মিত্তির এবার পড়ল, তার সঙ্গে আমিও পড়লাম। পুলিস মারলে ব্যাটন।

তারপর খেলা শুরু হতে জনতা একটু স্থির হল। আমার পাশেই উত্তর দিকের গোলপোস্ট, পাঁচ হাত তফাত। সেকেন্ড হাফে মোহনবাগান ও-দিকে খেলছে। একটা বল এসে থপ করে পড়ে কাদায় বসে গেল এই ট্রিন ইয়ার্ডের লাইনের উপর। কুমোরটুলির খেলোয়াড়েরা অন্তত বিশ-পঁচিশ গজ দূরে। মোহনবাগানের গোষ্ঠ পাল ছুটলেন মারবার জন্যে। পা তুললেন, পড়লেন, পিছলে চলে গেলেন গজ দশেক, তারপর ছুটলেন পরামানিক। তিনিও পা তুলতে গিয়ে পড়ে ঠিক এমনি ভাবে চলে গেলেন গজ পনের। গোল-কিপার ছুটলেন, কিন্তু বলের কাছে পেঁছুবার আগেই মুখ থুবড়ে পড়লেন। গজ বিশেক দূরে ছিল হুইটলে—কুমোরটুলির সেন্টার ফরোয়ার্ড। সে এবার বেড়াতে বেড়াতে এল, টুপ করে মারলে, বলটাও এসে জালে পড়ল—কাতলা মাছের মতো। বাস, দেহের নির্যাতনের ওপরে মনের উৎসাহ-আশার মস্তকে একখানি ছিন্ন পাদুকার চাঁটি। আমাদের দেশের একটা প্রচলিত কথা মনে পড়েছে—মারকে মার তার উপর পাঁচ সিকে জরিমানা। খেলার মাঠ থেকে বেরিয়ে মিত্তির কান মলেছিলেন, সত্যি সত্যি, আর যদি খেলা দেখতে আসি তো—

আমি কান মলি নি, তবে মনে মনে সঙ্কল্প করেছিলাম, খেলা আর দেখব না। সে সঙ্কল্প রক্ষা করেই এসেছি। বোধ করি সমস্ত সাহিত্যিক-জীবনে দিন চার-পাঁচ পাল্লায় পড়ে গেছি। এর মধ্যে একদিনের কথা মনে আছে, শ্রীযুক্ত নৃপেন চট্টোপাধ্যায়ের কাছেই বোধ হয় শুনেছিলাম যে, শ্রীসৌম্যেন ঠাকুর দেশে ফিরেছেন, তিনি মাঠে আসবেন। সেদিন গিয়েছিলাম সৌম্যেনবাবুকে দূর থেকে দেখতে।

আর একদিন শৈলজানন্দের সঙ্গে গিয়েছিলাম।

আর একদিন, এই সেদিন ১৯৫০।৫১ সনে কমনওয়েলথ ক্রিকেট টীমের সঙ্গে ভারতীয় টীমের ক্রিকেট ম্যাচ দেখতে গিয়েছিলাম। ঘণ্টা দুয়েক ছিলাম। ক্রিকেট ম্যাচ দেখা সেই প্রথম, সেই শেষ।

নিজে এককালে উনিশ-কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত ফুটবল হকি খেলেছি। টেনিসও খেলতে চেষ্টা করেছি। ব্যাডমিন্টন ভালো খেলেছি। ফুটবল খেলার ঝোঁকের জন্যে ইস্কুল-জীবনে পাঁচ টাকা জরিমানা দিয়েছি। আমাদের

ওখানকার কীর্ণাহার ফুটবল টীমকে ম্যাচ খেলায় নেমন্তন্ন করে ভালো করে খাওয়াতে পারি নি বলে তারা না খেলে চলে গিয়ে আমার নামে আমাদের হেডমাস্টারের কাছে অভিযোগ করেছিল। হেডমাস্টারমশায় জরিমানা করেছিলেন, তাঁকে না জানিয়ে চ্যালেঞ্জ করার জন্যে। এই ঝোঁক আমার জীবন থেকে ওই একটি ঘটনায় মুছে গেছে।

তাই পাটনায় গিয়ে যখন মজলিসে পি. আর. দাশ মশায়ের বাড়িতে আগন্তুক বিখ্যাত খেলোয়াড়দের নাম শুনতাম, তখন তাদের ঠিক চিনতাম না। আজও সে সব নাম মনে করতে পারি না। তবে দুটো নাম মনে আছে, একজন ওয়াই সিং। আর একজন ফরাসী দেশের খেলোয়াড়—ক্রোচে কি ক্রোসে। দাশ মশায়ের দুই ভাইপো তখন বালক। একজন ফার্স্ট ক্লাসে উঠেছে, একজন টেস্ট দিয়েছে—খসু সেন ও নসু সেন।

এই নসু সেন ও খসু সেনকে বাংলা পড়াবার ভার আমাকে দিলেন দাশ মশায়। প্রথম দিন রাত্রে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হল। গৌরবর্ণ, শুক্লকেশ, সুস্থদেহ মানুষ, সরল সরস বাক্যালাপ। চোখ দুটি তাঁর প্রতিভার পরিচয় বহন করে। এক কথায় বললেন, একশো টাকা মাসে দেব আমি। ওদের বাংলার সঙ্গে পরিচয় করে দিন। এই টাকা থেকে আমার সাহিত্যিক-জীবনের প্রথম ফাউণ্টেন পেন কিনেছিলাম। সেটি আজও রয়েছে।

সেবার পাটনায় তিন মাস ছিলাম। মধ্যে মধ্যে দাশ মশায় এক-একদিন ডাকতেন। একটি ছোট ঘরে বসে আলাপ করতেন। আমার কখানি বই তাঁকে দিয়েছিলাম। "রাইকমল" তাঁর ভালো লেগেছিল। একদিন বলেছিলেন, আমার সময় থাকলে আমি ইংরাজিতে অনুবাদ করতাম আপনার এই বইখানি। এতে বাংলার অপরূপ প্রাণের পরিচয় আছে।

আর বলতেন, আমার এক সময় কিছু লেখবার ইচ্ছা ছিল। এখনো মধ্যে মধ্যে ইচ্ছে হয়। প্লটও তৈরি করি। কিন্তু সে আর লেখা হয়ে ওঠে না। আমার লেখার ইচ্ছে নাটক। আপনি নাটক লেখেন না কেন?

আমি 'মারাঠা তর্পণের' কথা বলেছিলাম। বলেছিলাম, নাটক এই জন্যেই আর লিখি না।

দাশ মশায় বলেছিলেন, তা হলে আর একবার লিখুন নাটক। আমার একটা প্লট আপনাকে দেব আমি।

প্লটটির কালের পটভূমি বৌদ্ধযুগ। বলতে শুরু করলেন তিনি। অল্প কিছুদূর বলার পরই সেদিন দু-তিনজন খ্যাতনামা ব্যক্তি এসে উপস্থিত হলেন। পাটনার বাঙালী। একজন তার মধ্যে পাটনা হাইকোর্টের জজ (তখন রিটায়ার করেছেন) অমর মুখোপাধ্যায়। তাঁরা এসে বেহারে বাঙালীদের

সমস্যা তুলে আলোচনা শুরু করলেন। সেই দিন সেই ঘরে আমার সামনেই বেহার-বেঙ্গলী-সেটলারস্ অ্যাসোসিয়েশনের পত্তন হল। স্থির হল, সভা আহ্বান করা হবে। এবং সমিতি তৈরী হবে। তার মুখপত্র থাকবে। কর্মী সন্ধানের কথা উঠল। আমি সেই সভায় মণি সমাদ্দারের নাম করেছিলাম। মুখোপাধ্যায় মশায় বলেছিলেন, দেখি সন্ধান করে কেমন ছেলে! অল্পস্বল্প জানি। তবু ভালো করে জানি, সকলকে জিজ্ঞেস করি। কিন্তু দাশ মশায় বলেছেন, দরকার নেই। এ'রা হলেন সাহিত্যিক, তরুণ-সমাজের খাঁটি পরিচয় ও'রাই জানেন নির্ভুলভাবে। বুঝলেন, এ'রা ছেলেদের খুব প্রিয়জন। মণিকেই নিন। মাথার ওপরে শচী বোস আছে।

পি. আর. দাশ মশায় পৃথিবীর নিন্দা-প্রশংসাকে গ্রাহ্য করেন না। উদার হৃদয়বান মানুষ। একটি বিশিষ্ট যুগের জীবন-দর্শনের প্রতীক। সব থেকে ভালো লেগেছিল মানুষটির সরলতা।

পাটনার প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন হল। তার অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হয়েছিলেন কলিকাতা হাইকোর্টের রিটায়ার্ড চিফ জাস্টিস মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মশায়। দাশ মশায় সহকারী সভাপতি। সানন্দে পদ গ্রহণ করলেন, পাঁচশো কি বেশি টাকা চাঁদাও দিলেন। অপর্ণা দেবী তাঁর কীর্তনের সম্প্রদায় নিয়ে আসবেন, নিজের বাড়িতে তাঁদের থাকবার ব্যবস্থা করলেন। এরই মধ্যে কেউ তাঁকে বুঝিয়ে দিলে, এতে আপনার মর্যাদার হানি হয়েছে। দাশ মশায় তাই বুঝে গেলেন এবং আয়োজন শুরু করলেন এই সময়টায় যাবেন রাজগীরে। তাঁবুর বরাত হল, আয়োজন হল। এখানকার বাঙালীরা রঙীনদার নেতৃত্বে গিয়ে বললেন—সে কি করে হয়? আপনি থাকবেন না, সম্মেলন হবে কি করে?

দাশ মশায় ঘাড় নেড়ে বললেন, উঁহু। সে হয় না। আমাকে যেতেই হবে।

একেবারে সরল ছেলেমানুষের মতো।

লোকে তাকে দাম্ভিক বলেছিল।

কিন্তু আমি মানুষটিকে যতটুকু জেনেছিলাম, তাতে ওই অভিমান বা দাম্ভিকতার মূলে দেখেছিলাম একটি সারল্য।

দাশ মশায়ের দরজায় এসে দাঁড়াল একটি ছেলে—গরিব, পড়বে, সাহায্য চাই।

বেরিয়ে এসে অসহিষ্ণুর মতোই প্রশ্ন করলেন, কি, কি চাই?

সাহায্য।

নেই। নেই। আমাকে কে সাহায্য করে ঠিক নেই।

ঢুকে গেলেন ভিতরে। আবার বেরিয়ে এলেন, কিসের জন্য সাহায্য?

পড়ব।

পড়বে? কী পড়বে? কোথায় বাড়ি? কত সাহায্য চাই?

উত্তর শুনলেন। বললেন, আচ্ছা মাসে মাসে এসে নিয়ে যাবে। যাও। এখন যাও। যাও।

ভিতরে চলে এলেন।

ঘটনাটি আমারই সামনে ঘটেছিল।

দাশ মশায়ের সঙ্গে পরিচয় পাটনায় যাওয়ার ফলে—যা পেয়েছি—যা লাভ করেছি তার মধ্যে অন্যতম।

পনেরো

পাটনার কথা এখানেই প্রায় শেষ। ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতে আছে। এ পর্যন্ত ওখানেই ছেদ পড়েছে।

পাটনায় প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের কথা একটু আছে। সেখানে সাহিত্য শাখার সভাপতি হিসেবে স্বর্গীয় শ্রদ্ধেয় মোহিতলাল যে অভিভাষণ পাঠ করেছিলেন, সে নিয়ে একটা বড় বাদ-প্রতিবাদের সৃষ্টি হয়েছিল। তার মধ্যে আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর বিরূপ মত প্রকাশ করতে গিয়ে কিছু অসৌজন্য-জ্ঞাপক মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন এ কথা সত্য, কিন্তু সেই অভিভাষণে তিনি যে মত প্রকাশ করেছিলেন এবং তাঁর দূরদৃষ্টিতে যে ভবিষ্যৎ দর্শন করেছিলেন, তা প্রায় অক্ষরে অক্ষরে মিলে গিয়েছে। এই নিয়ে তাঁর বিরোধী দলের মধ্য থেকে একজন তরুণও যে উদ্ধত ব্যবহার করেছিলেন বা করতে চেষ্টা করেছিলেন, তা স্মরণ করলে আজও লজ্জায় মাথা হেঁট করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। মোহিতলাল সভামণ্ডপ থেকে বেরিয়ে আসবামাত্র রাগে আত্মহারা হয়ে ছুটে এসেছিল, তাঁর হাতটা ধরবার চেষ্টা করলে, বারেকের জন্য ধরেওছিল। সেদিন বিক্রম এবং সাহস দেখেছিলাম সজনীকান্তের। সজনীকান্ত মোহিতলালের সঙ্গে গিয়েছিলেন এবং সে সময়ও পাশেই ছিলেন। সজনীকান্ত মুহূর্তে ছেলেটির সম্মুখীন হয়ে কঠিন প্রতিবাদে তাকে আত্মস্থ এবং নিরস্ত করেছিলেন।

মোহিতলালের সেদিনের অভিভাষণে একটি কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আজ। তা নিয়ে আজও দ্বন্দ্ব রয়েছে। আজ আবার সেকালের দুই শিবির

ভেঙে তিন শিবির হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শিবিরের কথা বলার প্রয়োজন নেই; তৃতীয় নূতন শিবির যেটি হয়েছে—তার সঙ্কল্প প্রগতি হলেও সে যুগের প্রগতি সাহিত্যের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই; এ প্রগতির অর্থ হল—মার্কসবাদ অনুযায়ী সাহিত্য। তাঁর কথা ছিল, বাংলা-সাহিত্যে বাঙালীর জীবন থাকবে, বাঙালীর বাংলা-ভাষা থাকবে, মানবজীবনের চিরন্তন সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্না থাকবে; পটভূমিতে বিশেষ কাল এবং বিশেষ ভৌগোলিক গণ্ডী থাকতেই হবে। এই রচনা রচনাগুণে রসোত্তীর্ণ হলে তবেই হবে সার্থক সাহিত্য; এবং তাই হবে সর্বকালীন ও বিশ্বজনীন। ইংরেজিতে মনে মনে বাক্য রচনা করে সেই ভঙ্গিতে বিন্যাসে সুমার্জিত বাংলা-শব্দ বসিয়ে রচনার পদ্ধতিকেও তিনি মারাত্মক ভ্রম এবং অনিষ্টকর মনে করতেন। ভাব ও ভাবনার কথা এ ক্ষেত্রে বলাটাই বাহুল্য হবে। এক বিশেষ ভৌগোলিক সংস্থানের মধ্যে প্রকৃতিবৈচিত্র্যের বিশেষ প্রভাব জীবিকানির্বাহের বিশেষ পদ্ধতির অনুসরণের ফলে মানুষ এক উপলব্ধিতে উপনীত হয়—এই ধারণাই ধ্যানযোগে পরিপুষ্ট হয়ে পরিণত হয়েছে মানসিকতা গঠনের ধাতুতে। তার মনোজগতের তাই উপাদান। ক্ষেত্রে এবং বাতাবরণের পার্থক্যে ফসলের পার্থক্যের মতো ভাবজগতের পার্থক্যও অবশ্যম্ভাবী। তাই এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইউরোপের দিকে তাকিয়ে তার সাধনায় সিদ্ধিফলের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন যখন খুঁজতে যাই, তখন সর্বাগ্রে দুটি আবির্ভাব চোখে পড়ে। একজন কার্ল মার্কস, অপর জন লেনিন। হিটলারও এই সাধনার ফল। ভারতবর্ষের দিকে তাকালে চোখে পড়বে রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, শ্রীঅরবিন্দ এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্র। সুতরাং ভাবগত পার্থক্য অস্বীকারের উপায় কোথায়?

ভারতবর্ষের রূপ যদি কেউ আকাশ-পথে ঘুরে এসে ছবি আঁকে তবে তাকে আঁকতে হবে, অসংখ্য দেউল মন্দির আকাশ-পথে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। আশ্চর্যের কথা, রঘুপতি-যদুপতির উত্তর কোশল মথুরায় প্রাসাদ নেই, বিক্রমাদিত্যের স্বর্ণপুরী নেই, কিন্তু মন্দির আছে। অসংখ্য মন্দির! তার আকাশমুখী চূড়ার সূক্ষ্মাগ্র যেন মনোলোকের ঊর্ধ্বমুখী বাসনার প্রতীক। বিচিত্র গঠন-কৌশলে মনে হয় সে যেন সত্যই আকাশ ছুঁয়েছে।

ইউরোপের বস্তুবাদতত্ত্ব যখন এসে এর উপর সংঘাত হানলে, বিজ্ঞানের আবিষ্কারতথ্য যখন ডিনামাইটের মতো তাকে ধূলিসাৎ করে দিতে চাইলে, বাইরের বহু উপকরণে তখনই রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব হল এবং ইউরোপীয় ভাববাদ ও তার ভাবনা-রস আকণ্ঠ পান করে গঠিত হল নবভারতের ভাব ও ভাবনা। যা ছিল বাইরে তাকে তিনি অন্তরে প্রতিষ্ঠা করলেন। বাইরের ভারত ভারত-জীবনের অন্তরলোকে দৃঢ়তররূপে প্রতিষ্ঠিত হল। সমগ্র

রবীন্দ্রকাব্যে সেই সনাতন ভারতের পরমোপলব্ধির অপরূপ নবীন প্রকাশ। মনোলোকে মন্দির গড়া হয়েছে, দেবতা সেখানে নবীন প্রকাশে মহিমান্বিত, সেখানে শঙ্খ বাজে, আরতি হয়, প্রদীপ জ্বলে, ফুল আছে, চন্দন আছে, বাইরের ভারতের সব কিছুই আছে সেখানে। ইউরোপীয় শাসনের রক্ষণাবেক্ষণে পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতের মঠ-মন্দিরের চারিদিকে বস্তুপুঞ্জ পাহাড়ের মতো জমে উঠল, তার ইয়ার্ডের বৈদ্যুতিক আলোর জ্যোতিতে মন্দিরের আলোক নিষ্প্রভ হল। কিন্তু তাতেও কোন ক্ষতি হল না। ভিতরের আয়োজন বাইরের সংঘাতকে প্রতিহত করে ব্যর্থ করে দিলে। সে আয়োজনের ফল যখন আবার বাইরে রূপ পরিগ্রহ করলে গান্ধীর সাধনায়, তখনকার ভারতের রূপের কথা, মহিমার কথা বলার প্রয়োজন আছে কি? নেই।

তাই আজ এ দেশের ইউরোপীয় ভাববাদীদের সর্বাপেক্ষা বড় প্রচেষ্টা হয়েছে, এই দুই ভারত-জীবনের প্রতীককে অস্বীকার করবার। ভারতের জীবন-ক্ষেত্রে এই দুই সিদ্ধমূর্তি যতক্ষণ স্থান জুড়ে আছেন ততক্ষণ ইউরোপের ওই দুই মূর্তিকে এনে অধিষ্ঠিত করা অসম্ভব। গান্ধীজীর নাম এবং তাঁর ছবি প্রগতি সাহিত্যের আসরে বর্জন করা হয়েছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করতে সাহস নেই। যদিও একখানি বামপন্থী পত্রিকায় দেখেছি যে, এঁরা ভিতরে রবীন্দ্রনাথকে কদর্য অভিধানে অভিহিত করে থাকেন। সম্প্রতি শান্তিনিকেতনের সাহিত্যমেলায় রবীন্দ্রনাথকে এ-যুগে অচল বলে আসার মধ্যেও এরই প্রকাশ আছে। রবীন্দ্রনাথ তার ঋষিদৃষ্টিতে এ ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়েছিলেন। এবার কিন্তু তিনি কৌতুক অনুভব করেন নি। তিনি শঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। তার সংস্কৃতির সঙ্কট ["সভ্যতার সঙ্কট"] নামক মহাবাণীর মতো প্রবন্ধে তিনি পশ্চিমী-সভ্যতার উপর নিঃশেষে হারানোর কথা ব্যক্ত করেছিলেন। দেখেছিলেন বাহিরের রিক্ত ভারতের চেয়েও অন্তরে রিক্ত ভারতের আগামী অন্ধকারকে। "কল্লোল" ও "কালিকলমে'র' যুগে একবার যখন তারুণ্যের বিদ্রোহ হয়েছিল তখন তিনি শঙ্কিত হন নি—কৌতুক অনুভব করেছিলেন।

"শেষের কবিতা"র অমিত রায়ের পকেট থেকে খেরো বাঁধানো খাতায় নিবারণ চক্রবর্তীকে আমদানি করে বৃদ্ধ পিতামহের মতো কিঞ্চিৎ পরিহাস করেছিলেন। তার বেশী কিছু না। সকলেই ছিল তাঁর স্নেহের পাত্র। তিনি জানতেন যে, তারুণ্য তো চিরস্থায়ী নয়; প্রবীণতায় পেঁছানো তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। তাতে একদিন পেঁছুতেই হবে। মধ্যে মধ্যে ক্ষুব্ধও হয়তো হতেন। শুনেছি এক আধুনিক কবির কবিতার দুর্বোধ্যতা লক্ষ্য করে

তিনি তাঁকে বলেছিলেন—তোমাকে লজ্জিত হতে হবে একদিন ; লজ্জিত হবে তুমি। কাকে যেন লিখেছিলেন—এই···কবির কবিতা যদি তুমি আমাকে বুঝিয়ে দিতে পার তবে তোমাকে শিরোপা দেব। এর বেশী কিছু না। কাগজে-কলমে শঙ্কা প্রকাশ করেন নি এসম্পর্কে। কিন্তু এই তৃতীয় শিবির সম্পর্কে হয়েছিলেন শঙ্কিত। তখনও এ শিবিরের প্রকাশ্য স্কন্দাবার স্থাপিত হয় নি, স্কন্দাবারশীর্ষে রক্তপতাকাও ওড়ে নি ; তখন শুধু দু-চারজন এ-পাশ ও-পাশ ঘুরে তাঁবু খাটাবার জায়গা-জমি খুঁজছেন। এদিক ওদিক চাইছেন। মধ্যে মধ্যে দু-চার কথা ফিস-ফাস করে বলছেন ; সে ফিস-ফাস কথা তাঁর কান এড়ায় নি। এবং ফিস-ফাস কথার সঙ্গে এঁদের নাসিকা ও ওষ্ঠের বক্রভঙ্গিমাও তাঁর চোখ এড়ায় নি। ১৩৪৬ সালে "সাহিত্যবিচার" প্রবন্ধে তিনি কাগজ-কলমে লিখে গেলেন—আশ্চর্য এই যে, সাহিত্যে··· মধ্যবিত্ততার অভিমান অত্যন্ত মেতে উঠেছে। (তখনও সর্বহারা কথাটা জোরালো হয়ে ওঠে নি, তত আওয়াজের জোর ছিল না এবং ইংরেজের শাসন তখনও কড়া) আমাদের দেশে কিছুকাল পূর্বে 'তরুণ' শব্দটা এই রকম ফণা তুলে ধরেছিল। আমাদের দেশে সাহিত্যে এই রকম জাতে ঠেলাঠেলি আরম্ভ হয়েছে হালে। আমি যখন মস্কো গিয়েছিলুম, চেকভের রচনা সম্বন্ধে আমার অনুকূল অভিরুচি ব্যক্ত করতে গিয়ে ঠোক্কর খেয়ে দেখলুম, চেকভের লেখায় সাহিত্যের মেলবন্ধনে জাতিচ্যুতি দোষ ঘটেছে, সুতরাং তাঁর নাটক স্টেজের মঞ্চে পঙ্‌ক্তি পেল না।···

আমার আশঙ্কা হয়, একসময়ে "গল্পগুচ্ছ" বুর্জোয়া লেখকের সংসর্গ দোষে অসাহিত্য বলে অস্পৃশ্য হবে। এখনি যখন আমার লেখার শ্রেণী নির্ণয় করা হয় তখন এই লেখাগুলির উল্লেখ মাত্র হয় না···।···ভয় এই, এই আগাছাকে উপড়ে ফেলা শক্ত হবে।

দুবার তিনি 'আশঙ্কা' এবং 'ভয়' শব্দ ব্যবহার করেছেন। এবং এই বিচারপদ্ধতি ও মনোভাবকে আগাছার সঙ্গে তুলনা করেছেন।

এখানে বর্তমানে এই তৃতীয় শিবিরের সাহিত্যবুদ্ধির বীজ উপ্ত হয়ে কেমন আকার ধারণ করেছে তার ফসল অবশ্য আজও জন্মায় নি তবে বন্ধ্যা ফুল অনেক ধরেছে, তার পাপড়ির বর্ণরেখায় কি কথা লেখা হচ্ছে তার একটু নিদর্শন দিলে সবটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। তৃতীয় শিবিরের এক লেখক রবীন্দ্রনাথকে বিচার করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির মাধুর্য উপলব্ধি ও স্বীকৃতি রয়েছে বলে, বলছেন··· প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ভারতীয় বুর্জোয়া চিন্তাধারার একটি প্রধান অংশে পরিণত। রবীন্দ্র-সাহিত্য অঙ্গে অঙ্গে তার প্রমাণ বহন করছে।

"অচলায়তন" নাটক সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন—"অচলায়তন নাটকখানি একখানি 'নতজানুবিদ্রোহ' নাটকে পরিণত হয়েছে।"

রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত ("অচলায়তনে"র) দাওয়াই কি পশ্চিমী সভ্যতার পক্ষে, কি কৃষক-শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে মোটেই কল্যাণকর নয়, একথা সব মার্কসবাদীই স্বীকার করবেন। অথচ এই পরামর্শ (অর্থাৎ ভারতীয় অহিংসা ও সংযমের ব্যক্তিমানস-সাধনা) দিয়েই অচলায়তন নাটকের উপসংহার—সংহার?—হয়েছে। তবে অচলায়তনকে বিপ্লবী চিন্তার বাহন বলে মেনে নেব কেমন করে?

এ আলোচনা থাক। এখন ঘটনার কথা বলি।

এই সময়ের মধ্যে অর্থাৎ পাটনার কালের মধ্যে জীবনের চার বছর সময় জুড়ে রয়েছে।

এই চার বছরে কলকাতায় আমার জীবনে অনেক ঘটনা ঘটে গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছে এই সময়ের মধ্যে, দ্বিতীয় সাক্ষাৎ হয়েছে—সেকথা পরে বলব। তার আগে কলকাতায় এই চার বছরে আমার জীবনের কয়েকটা কথা বলে নি। "বঙ্গশ্রী" থেকে সজনীকান্ত জবাব দিয়ে চলে এসেছেন। আমি দক্ষিণ কলকাতার সেই পাঁচ টাকা ভাড়ার ঘর ছেড়ে এসেছি বউবাজারে একটি মেসে। সেখান থেকে হ্যারিসন রোডে একটি বোর্ডিঙে।

বউবাজারের মেসটি ছিল একটি অতি বিচিত্র স্থান। এমন বিচিত্র সংস্থান কদাচিৎ ঘটে জীবনে। বাড়িটি কলেজ স্ট্রীট এবং সেণ্ট্রাল অ্যাভিন্যুর মধ্যে বউবাজার স্ট্রীটের উত্তর ফুটপাথের উপর। সামনেই একটি গির্জে আছে। এবং উত্তর দিকের ফুটপাথের বাড়িটার ঠিক একখানা বাড়ির পরেই আছে ফিরিঙ্গী-কালী। চীনেম্যান, দেশী ক্রীশ্চান, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, মুসলমান নিয়ে পাড়াটা। শুধু তাই নয়, বড় বড় বাইজীদের বাসা এখানে। যে বাড়িটায় আমাদের মেস ছিল, সেই বাড়িতে এককালে ছিল বিখ্যাত ইংরেজি দৈনিক "সারভেণ্ট" পত্রিকার আপিস। একদিন পবিত্র গাঙ্গুলী মেসে এসে সে কথা বলে গেলেন। প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়ি। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা। নিচের তলায় চামড়ার গুদাম; সামনেটায় ফার্নিচারের দোকান। একটা গলি-পথে ঢুকে পূর্বমুখী দরজার উপরতলার সিঁড়ি। এই সিঁড়িটাই বাড়িটাকে দু ভাগে বিভক্ত করেছে। সামনের ভাগে অর্থাৎ দক্ষিণে বউবাজারের রাস্তার দিকটায় দোতলা এবং তিনতলায় চারখানা বড় বড় ঘরে পশ্চিমদেশীয়া বাইজীরা থাকে। উত্তরে চারখানা চারখানা আটখানা ঘরে চারটে মেস। দুখানা করে ঘর এক-একটি মেস। এক-এক ঘরে দশ-বারোজন থাকে, যাত্রার দলের আসামীই বলুন

আর ধর্মশালার যাত্রীই বলুন—যা বলবেন উপমায় বেমানান বেখাপ্পা হবে না। চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ঢাকা, বরিশাল, বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম—লোক সব জায়গারই আছে। আমি যে মেসটায় গিয়েছিলাম, সে মেসটা ছিল লাভপুরের নির্মলশিববাবুদের ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের মেস। শান্তিনিকেতনের কয়েকজন কর্মী একটি বীমাপ্রতিষ্ঠান করেছিলেন, সেই প্রতিষ্ঠানটি হাত ফিরে তখন নির্মলশিববাবুর ছোট ছেলে নিত্যনারায়ণের হাতে এসেছে। তাঁরাই তার সর্বেসর্বা। শান্তিনিকেতনের কর্মীরা দূরে পড়েছেন। কিন্তু পূর্ববঙ্গীয় কর্মীরা সেই শান্তিনিকেতনের কর্তৃত্বের আমলের। চট্টগ্রামবাসীদের মধ্যে এক দিকে এক কথা হচ্ছে, এক দিকে ঢাকাই কর্মীরা চালাচ্ছেন তাঁদের জেলার কথাবার্তা, ওদিকে চলেছে বাঁকুড়া ও বীরভূঁইয়াদের ঝগড়া। এরই মধ্যে খাস কলকাতার একটি প্রিয়দর্শন তরুণ, সে লাভপুরের থিয়েটারে এবং কলকাতার অ্যামেচারে নারীভূমিকায় অভিনয় করে, সেই সূত্রেই তার এখানে চাকরি, সে মিঠে গলায় গান ধরে—

> "আমার জ্বলে নি আলো অন্ধকারে
> দাও না, দাও না দেখা কি তাই বারে বারে!"

এরই মধ্যে হঠাৎ দরজার বাইরে থেকে একখানি কচিমুখ উঁকি মারে—বাবুজী!

ছেলেটিকে শরৎবাবুর "শ্রীকান্তের" সেই রেঙ্গুন-প্রবাসী চতুর বাঙালীর ছেলেটির সঙ্গে তুলনা করব না, যে নাকি বর্মী মেয়েকে বিয়ে করে যথাসর্বস্ব নিয়ে পালিয়ে আসবার সময় কান্নার সুরে তাকে বঙ্গভাষায় ব্যঙ্গ করেছিল—হায় রে, আর তোর কিছু নেই যে নিয়ে যাই। ওঃ, এই যে হাতে একটা চুনীর আংটি রয়েছে, ওটাই দে রে! তবে এটা বলব যে সে হৃদয় নিয়ে কৌতুকবশে হৃদয়হীন খেলা খেলতে গিয়েছিল। আমাদের মেসের গায়ে সিঁড়ি; তার ও-ধারে দুটি ঘরে থাকত দুটি বাইজী—দুই বোন, লক্ষ্ণৌ কি এলাহাবাদ তাদের দেশ। এটি ছোট বোন। বয়স আঠারো কি উনিশ। সুন্দরী বলব না। তবে প্রিয়দর্শিনী তাতে সন্দেহ নেই। আমাদের মেসের আটাশ-তিরিশ জন এবং পাশের মেসের জন পঁচিশেক—সবসুদ্ধ পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন জনের একশো দশটি চক্ষু অহরহই উঁকিঝুঁকি মেরে ফিরত তার সন্ধানে। মেয়েটি কৌতুকে মধ্যে মধ্যে উঁকি মেরে কটাক্ষ হেনে বক্র হেসে আবার মুখ টেনে নিত। সন্ধ্যার সাজসজ্জা করে বারান্দায় বেড়াবার অছিলায় এক পাক ঘুরে পঞ্চান্নটি যুবকের হৃদয় জর্জরিত করে সামনের বারান্দায় গিয়ে বসত। তারপর আসত মলমলের পাগড়ি, আদ্দির পাঞ্জাবি, হীরের বোতাম, হীরের আংটি-পরা শেঠের দল। ও-দিকে ঘরে তবলা

বাঁধা হত, চাকর ঘন ঘন উঠত নামত, পান পানীয় ইত্যাদি আনয়ন করত, খুসবাইয়ের গন্ধ ছুটত। গান শুরু হত—শুনু যা শনু যা পিয়া—

ঘুঙরের ধ্বনি উঠত। ওরা এ ঘরে বিছানায় শুয়ে বুক বাজাত। কেউ তারিফ করত, কেউ করত—হায় হায়! এখানে বলা ভালো যে, পূর্ববঙ্গের ছেলেদের শতকরা নিরেনব্বুই জন ছিল কুমারের দল। রাজসাহীর দুই ভাই থাকত। তাদের একজন ছিল মুগুর-ডাম্বেল-ভাঁজা ছেলে। সে এই সময়েই মুগুর ঘোরাতে শুরু করত।

কলকাতার থিয়েটার-করা ছেলেটি মেসে থাকত না। তবে আসত যেত। এদের এই অবস্থা দেখে সে হাসত, কৌতুক করত। একদা এই নিয়ে তকরার হয়; এবং সে বাজি রাখে যে, সে যদি এখানে এক মাস থাকে তবে ঐ তরুণীটি—যার পায়ে নাকি পঞ্চান্নটি হৃদয় গড়াগড়ি খাচ্ছে, ওর ঘুঙুরের প্রতিটি দানার ঘায়ে আহত হচ্ছে, তাকেই সে জয় করে ওঠাতে পারে, বসাতে পারে হাসাতে পারে—কাঁদাতে পারে, এমন কি ওর যে ঘরে বসে গান শুনতে পঞ্চাশ বা একশো টাকা লাগে, সেই ঘরে তাদের বিনা দক্ষিণায় সমাদর করে ডেকে বসিয়ে ওর নাচ-গান শুনিয়ে দিতে পারে।

বাজি হয়েছিল। কি বা কত বাজি তা আমি জানি না। এ সব আমি ওখানে যাবার আগের ঘটনা। আমি যখন গেলাম, তখন ছেলেটি বাজি জিতে বসে আছে। এবং বোধ করি বাজি জিতেও নিজের অগোচরে নিজে দেউলে হয়েছে। সাধারণ কথায়—মরেছে।

ওদিকে মেয়েটির দিদি প্রাণপণ চেষ্টা করছে, তার এ মোহের কাজল মুছতে। ছেলেটির প্রাণপণ চেষ্টা বন্ধন কাটাত। কিন্তু তা কি হয়? সেও কাঁদে, ওদিকে মেয়েটিও কাঁদে। কেঁদেই সে ক্ষান্ত থাকে না, গানের সাড়া পেলেই বংশীরব-মুগ্ধা কুরঙ্গিণীর মতো দীর্ঘবেণী দুলিয়ে এসে উঁকি মেরে ডাকে—বাবুজী!

কখনোও কখনোও মধ্যরাত্রে পানীয়ের প্রভাবে দিগ্‌ভ্রান্ত নটবর শেঠমহারাজ-দের দু-একজন এসে ভুল করে বাঁয়ে না গিয়ে ডাইনে মোড় ফিরে আমাদের বারান্দায় ঢুকে পড়ে ডাকত—কাঁহা হো পিঁয়ারী?

পঞ্চান্নটি কণ্ঠস্বর গর্জন করে উঠত মুক্ত আগ্নেয়গিরির মতো—কৌন রে?

কেডা?

পাকড়ো হালার পোকে!

মধ্যে মধ্যে এক আধজন ভয়ে আছাড় খেত!

আরও একটা বিচিত্র সংস্থান ছিল। সরু মিহি গলায় চিৎকার উঠত ছাদে বা সিঁড়িতে—ঈ—ওল্‌ড্‌ হ্যাগ—

উত্তরে আরও একটা গলা চেঁচাত—হোয়থ ? ইউ বিচ্ ।

উপরের ছাদে এই ফ্ল্যাটেই বলুন আর ঘরেই বলুন এগুলির জন্যে কাঠের রান্নাঘর ছিল। বোধ হয় খান তিনেক রান্নাঘর খালি ছিল, সেখানে থাকত দুটি ক্রীশ্চান মেয়ে।—একটি যুবতী একটি বুড়ী। ওদের দুজনে ঝগড়া বাধত। বুড়ী ওই যুবতীটির রান্নাবান্না করত। তার সঙ্গেই খেত-দেত। যুবতীটি বিকেলে সাজসজ্জা করে বের হত, রাত্রে প্রায়ই মাতাল হয়ে ফিরত। তখনই বাধত ঝগড়া। মধ্যে মধ্যে সঙ্গে আসত ফিরিঙ্গী ছোকরা। খানিকটা দাপাদাপি করে শেষে গালাগাল করতে করতে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ছুটে পালাত। মাতাল যুবতীটা তাড়া করত ভাঙা বাজু বা মশারির ডাণ্ডা নিয়ে।

বুড়ীটা মধ্যে মধ্যে কাঁদত। হিন্দিতেই বলত, ছোকরী সেও এককালে ছিল।

বাবুরা অনেকে তাকে ডাকত 'ম্যাগী' বলে।

সে কিছু বলত না। কিন্তু একদিন আমাকে বলেছিল, দেখ, আমি ম্যাগীর মানে জানি।

বাড়ির সামনে পশ্চিম দিকে ছিল খানিকটা পতিত জায়গা, সেখানে ছিল রিক্‌শার আড্ডা। আর তার পাশেই ছিল চীনেম্যানদের বাসা। ছাদে দড়ি টাঙিয়ে তার উপর সারি সারি নীল কাপড়ের জামা পেণ্টালুন ক্লিপ এঁটে শুকুতে দিত আর একপাল ছেলে নিয়ে—সে যে কি বকাবকি সে আর কি বলব ?

রবিবার দিন সকলে ছাদে উঠে সতৃষ্ণনয়নে তাকিয়ে থাকত উত্তর-পশ্চিম দিকের একখানা বাড়ির ছাদের দিকে। কি ? কানে কানে চুপিচুপি একজন বললে,—এর বাড়ি। ওই যে ফুলের টবওয়ালা ছাদ।

নামটা একজন বিখ্যাত সিনেমা-অভিনেত্রীর।

রবিবার দিন তিনি নিজে হাতে গাছগুলিতে জল দেন এবং পরিচর্যা করেন। তাই রবিবার সকালে ছাদে সকলে ভিড় করে দাঁড়ায়।

আমাদের একজনের নাম ছিল রাজেনবাবু, চাটগাঁয়ের ছেলে। ছিমছাম অবিবাহিত যুবক। তাঁর বাই ছিল এই সিনেমা-স্টার দেখে বেড়ানোর। এবং মধ্যে মধ্যে এমন সব খবর নিয়ে আসতেন যে সকলে থ মেরে যেত।

একদিন বললেন,—দেবীকে দেখে এলাম, এই দু-হাত পাশ থেকে গাড়িটা ছুঁয়ে দেখেছি। লোকে বলে—কালো, আমি দেখলাম গোলাপী সাটিনের মতো চকচকে গায়ের রঙ আর তেমনি কি চামড়া !

এই আসরের মধ্যে আমার আসর পাতলাম।

সুবিধে ছিল দুপুরের সময়। খাঁ-খাঁ করত সব মেসগুলি। ওদিকে বাইজীরা নিদ্রামগ্ন। উপরে ফিরিঙ্গী মেয়ে দুটিও ঘুমোত। আমি লিখতাম।

ষোলো

এই বিচিত্র বাসাটির স্মৃতি বিচিত্র। কত বিচিত্র মানুষ বিশেষ করে এই মহানগরীর বিস্ময়কর বৈচিত্র্যের সমাবেশ এখানে দেখেছি তার হিসাব দিতে গেলে—সে হবে অন্য গ্রন্থ। তবে একটি বৈচিত্র্যের কথা বলব। সে ফিরিঙ্গী কালী ও কালীতলার কথা। এই কালীস্থানটি বহু পুরাতন। কলকাতার তথ্য ভারতবর্ষের সামাজিক পরিবর্তনে এই দেবতাটির ভূমিকা ঐতিহাসিক বললে অতিশয়োক্তি হবে না। সেকালে সমাজের অবহেলিত বর্ণের যারা ক্রীশ্চান হয়েছিল—ওই আমাদের মেসের ছাদের বাসিন্দে ম্যাগী-লুসির পূর্বপুরুষদের আরাধ্যা দেবী। ক্রীশ্চান হয়েও বিপদে আপদে শোকে তারা মেরী ও ক্রাইস্টকে ডেকে সান্ত্বনা পেত না। তাই ওই দেবীটিকে স্থাপনা করেছিল। এখানে তারা পুজো দিত সেকালে। প্রণাম করে কাজে বের হত। এইকালেও দেখতাম, ক্রীশ্চানরা এসে দাঁড়াত—মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে থাকত। যেই দেখত বিশেষ লোকজন নেই অমনি পয়সা দিয়ে টুপ করে একটি ছোট্ট প্রণাম নিবেদন করে চলে যেত। সন্ধ্যের পর থেকে এইটে ঘটত বেশী। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম। মধ্যে মধ্যে দেখতাম—ম্যাগী বুড়ী হাত জোড় করে বিড়বিড় করে কিছু বলছে।

রিক্‌শাওয়ালাদের ঝগড়া দেখেছি; চীনেম্যানদের কর্মতৎপরতা দেখেছি। আমাদের গলির মধ্যে অন্ধকারে সওদা হত।

এই বিচিত্র স্থানটিতে থাকতেই মহাকবির সঙ্গে আমার দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে কবিগুরুর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের বিবরণে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথা বাদ পড়ে গেছে। প্রথম সাক্ষাতের সময় কথাবার্তার মধ্যে তিনি আমাকে বলেছিলেন—তোমায় একটা কাজের কথা বলি, শোন। কলকাতা থেকে মধ্যে আমার কাছে এসেছিলেন শিশিরকুমার। শিশিরকুমার ভাদুড়ী। ভালো নাটক পাচ্ছেন না। আমি তাঁকে বললাম, আমার তো এখন রঙ্গমঞ্চকে দেবার মতো তৈরি কিছু নেই। কি দেব? তবে তুমি তারাশঙ্করের "রাইকমল" নাটক করে নিয়ে দেখতে পার। আমার

ভালো লেগেছে। বাংলার খাঁটি মাটির জিনিস। সাত্যকারের রস আছে।'
তাঁকে বইখানাও পড়িয়েছি এবং তোমাকে তাঁর কাছে পাঠাবার কথাও দিয়েছি। তুমি কলকাতা গিয়ে শিশিরকুমারের সঙ্গে দেখা কর। তিনি তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

আমি অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম।

শিশিরকুমার ভাদুড়ী। রঙ্গমঞ্চে যাঁর অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অন্তরের নারায়ণ নারদের বীণার ঝঙ্কারে গঙ্গার মতো বিগলিত হয়ে যায়। বাংলার তথা ভারতবর্ষের মনোহারিণী যাঁর প্রতিভা, তিনি আমার "রাইবমল" অভিনয় করবেন! মনে পড়ল "মারাঠা তর্পণে"র লাঞ্ছনার কথা। কবিগুরু অন্তর্যামীর মতো আমার অন্তরের অন্তরে লুকানো বেদনার সন্ধান জেনে সেই বেদনাই উপশম করার ব্যবস্থা করেছেন আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেই। শিশিরকুমার তাঁর কাছে এসেছিলেন তাঁর বইয়ের জন্যে, তিনি আমার বই অভিনয় করতে বলেছেন।

তখনকার আমার মতো একজন সামান্য লেখকের পক্ষে এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কি হতে পারে? শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয় বাংলার রঙ্গমঞ্চে নূতন ভগীরথ, নবসঞ্জীবনের ব্রহ্মার মতো স্রষ্টা আমার জন্য অপেক্ষা করছেন?

এতবড় সৌভাগ্য আমার!

কলকাতায় সে সময় থাকতাম মনোহর পুকুরে। সেই ষষ্ঠীচরণের সস্নেহ সেবার মধ্যে।

কবির কথায় আশাভরা বুক নিয়ে কলকাতায় এলাম। বন্ধুবান্ধব কাউকে বললাম না কথাটা। কি জানি শিশিরকুমার কি ভাবে নেবেন বা নিয়েছেন কথাটা! কোথায় দেখা করব তাঁর সঙ্গে? বাসার ঠিকানা জানি না। কাকেই বা জিজ্ঞাসা করব? অবশেষে একদিন স্টার থিয়েটারের দরজায় এসে হাজির হলাম। ওখানে তখন নাট্যাচার্যের অভিনয়ের আসর বসে।

একে কলকাতা, তায় থিয়েটারের কাণ্ডকারখানা। সকলেই অপরিচিত, সকলকে দেখেই ভয় করে। এঁরা বিচিত্র জগতের মানুষ বলে মনে হত। কথাবার্তার ঢঙে ভঙ্গিতে শঙ্কিত হতে হত, এবং সেই "মারাঠা-তর্পণে"র-স্মৃতি থেকে আমার মনে কেমন একটা অস্বস্তি ছিল। স্টার থিয়েটারের টিকিট-আপিসের সামনে এসে দাঁড়ালাম। কাকে জিজ্ঞাসা করি? কাকে বলি? অনেক সাহস করে টিকিটের ঘুলঘুলি দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললাম, নমস্কার।

হাতের পেনসিলটা কপালে ঠেকিয়ে খুব গম্ভীরভাবে স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলেন।

আমি বললাম, আমি একবার শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

কার সঙ্গে?—ভদ্রলোকের চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল।

শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয়ের সঙ্গে।

মিনিটখানেক আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, দেখা হবে না।

আমি—

হবে না মশায়। তিনি অভিনয় করছেন। এ সময় দেখা তিনি করেন না।

দয়া করে আমার নামটা—

না মশায়, না। যা নিয়ম নেই, তা পারব না।

কি করব? চলে এলাম। পথে আপসোস হল, ও'র বাসার ঠিকানাটা জেনে এলাম না কেন?

পরদিন আবার গেলাম।

ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলাম, উত্তর পেলাম—সে দেবার হুকুম নেই মশায়। তাঁর শরীর ভালো নয়।

পরের দিন এলাম। সেদিন অভিনয় নেই, সব খাঁ-খাঁ করছে, ফিরে গেলাম। এইভাবে দিন আষ্টেক ফেরার পর সেদিন স্টার থিয়েটার থেকে বেরিয়ে এসে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে মনে মনে সঙ্কল্প নিচ্ছিলাম, নাঃ থিয়েটার-জগতের দরজা আর মাড়াব না।

ঠিক এই সময়টিতেই সাড়া পেলাম—তারাশঙ্করবাবু!

এদিক ওদিক তাকাচ্ছি, আবার সাড়া এল—সামনের ফুটপাথে, আমি পবিত্র গাঙুলী।

তখন কলকাতা এমনতর ঘন জনারণ্য হয়ে ওঠে নি, সামনের ফুটপাথের দিকে তাকাতেই পবিত্র গাঙুলী মশায়কে দেখলাম। হাতের তালুতে তামাকের পাতা কচলাচ্ছেন চুন সহযোগে।

এ পারে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলেন, এখানে? থিয়েটার দেখতে না কি?

না ভাই, এসেছিলাম শিশিরবাবুর কাছে।

বলে সকল বিবরণ প্রকাশ করে বললাম, তা হল না। আর হয়েও কাজ নেই। এ দরজা আর মাড়াচ্ছি না।

দাঁড়ান দাঁড়ান। রবীন্দ্রনাথের হুকুমে এসেছেন, ফিরে যাবেন কি? আসুন, দেখি আমি।

তিনি উঠে গেলেন, দোতলায়। তারপর একজন সুদর্শন ব্যক্তিকে ধরে তাঁর সঙ্গে কথা বলে তাঁকে ভিতরে পাঠালেন। বোধ করি মিনিট তিন-চারের মধ্যেই ফিরে এসে বললেন, চলুন, ভিতরে চলুন।

শিশিরকুমার বোধ হয় আলমগীর সেজে বসে ছিলেন, "আলমগীর" অভিনয় হচ্ছিল। আর বসে ছিলেন একজন বয়স্ক ভদ্রলোক। তিনি শিশিরকুমারের মামা।

আমরা ঢুকতেই শিশিরকুমার আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, এস পবিত্র। আপনি তা হলে তারাশঙ্করবাবু।

আমি নমস্কার করলাম। প্রতিনমস্কার করতে করতেই তিনি বললেন, আরে, মশাই, আমি আপনার পথ চেয়ে বসে আছি।

পবিত্র হেসে বললে, কিন্তু বাইরে যে আপনার অনুচরেরা পথ বন্ধ করে বসে আছে! উনি দিন আষ্টেক ঘুরে প্রবেশ-পথ না পেয়ে 'আর আসব না' বলে ফিরে যাচ্ছিলেন। এমন মুহূর্তে আমার সঙ্গে দেখা তাই, আমার কথাই শোনে নাকি আপনার দ্বারপালেরা। অনেক বলে-কয়ে—তবে।

শিশিরবাবু হেসে হাত নেড়ে বললেন, ওদের দোষ নেই—ওদের দোষ নেই। দোষ আমার ভাগ্যের। থিয়েটারের দেনা হয়ে গেছে। কে পাওনাদার, কে পাওনাদার নয়—ওরা চেনে না; কাজেই একধার থেকেই ফিরিয়ে দেয়।

এমন সুন্দর কথা বলা শুনি নি।

তারপর বললেন—আমাকেই বললেন, নইলে পবিত্র জানে, কারও ভালো লেখা পড়লে, শিশির ভাদুড়ী তাকে খুঁজে বের করে আলাপ করে আসত। আমার থিয়েটারে নতুন লেখকদের দ্বার ছিল অবারিত। কত আনন্দ গেছে তখন! আজ আমাকে দেখছেন, আমি আমার কঙ্কাল। গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

তারপর বললেন, "রাইকমল" কিনে পড়ে নিয়েছি। ভালো জিনিস—বাংলার মাটির খাঁটি জিনিস ভালো হবে। হ্যাঁ। আমি ওই বগ বাবাজীর ভূমিকাটা নেব। একটু অদল-বদল করে নেব। বগের বদলে ব্যাঙ করলেই মানিয়ে যাবে। ছোট কমলের ভূমিকাটা প্রভার মেয়েকে দিয়ে চালিয়ে নেব। তারপর প্রভা। বইটা আমাকে শিগগির করে দিন। খুব শিগগির। আমি পড়ে পড়ে মার খাচ্ছি।

মাসখানেকের মধ্যে বই দেব বলে নমস্কার করে পরিপূর্ণ মন নিয়ে বিদায় নিলাম। ভারি ভালো লেগেছিল এই প্রাণ-খোলা প্রতিভাশালী মানুষটিকে। বার বার মনে পড়েছিল সেদিন রবীন্দ্রনাথের রচিত রামেন্দ্রসুন্দর-প্রশস্তি—তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর—

পরের দিনই বাড়ি চলে এলাম "রাইকমল"কে নাট্যরূপ দেবার জন্যে।

একখানা গানও রচনা করে ফেলেছিলাম, প্রথম দৃশ্যটাও লিখে ফেলেছিলাম। গানটি এবং আরম্ভ দুই-ই চমৎকার হয়েছিল। ওতে করেছিলাম রসিকদাস বাউল ঘুরতে ঘুরতে রাইকমলের গ্রামে এসে পড়ল এবং কমলরঞ্জন এদের রাধাকৃষ্ণ সাজিয়ে, গাঁয়ের লোকের চৈত্রসংক্রান্তির পর্ব দেখে ওইখানে দুদিন চারদিন থাকতে গিয়ে থেকেই গেল। গানটার গোড়াটা ছিল—

"হায় কোন্ মহাজন পারে বলিতে
আমি পথের মাঝে পথ হারালাম ব্রজে চলিতে।"

সে যাক। আমি তখন ভাবিও নি, শিশিরবাবু গান গাইবেন কি করে? কিন্তু সব ভাবনার হঠাৎ সমাপ্তি ঘটল একদিন কাগজ পড়ে। দেখলাম, শিশিরকুমার স্টার রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে দিয়েছেন, এবং হয়তো বা আর রঙ্গালয়ের সংস্রবেই আসবেন না।

দুঃখ খুবই হয়েছিল। তবে শিশিরকুমারের সেদিনের সহৃদয়তা, তাঁর পরিচয় আমার জীবনের সম্পদ হয়ে রইল।

এইবার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দ্বিতীয়বার সাক্ষাতের কথা বলব। তখন রবীন্দ্রনাথ বিচিত্রা-ভবনে এসেছেন। সেই ইরিসিপ্লাস হয়ে কবি যেবার জীবনমৃত্যুর সন্নিক্ষণে উপনীত হন—সেইবারের কথা। কবি তাঁর নৃত্যনাট্যের দল নিয়ে কলকাতায় এসেছেন—নিউ এম্পায়ারে অভিনয় হবে।

আমার দ্বিতীয় গল্পের বই "জলসাঘর" তখন কিছুদিন—কয়েকমাস হল বেরিয়েছে। কবিকে প্রণাম করে তাঁকে বই নিজে দিয়ে আসব এই বাসনা ছিল। কিন্তু যাই-যাই করে যাওয়া হয় নি। এবার কলকাতায় এসেছেন জেনে একদিন দুপুরবেলা "জলসাঘর" বইখানি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

গিয়ে দাঁড়ালাম নব্য বাংলার তীর্থভূমির মতো পবিত্র ঠাকুরবাড়ির সামনে। ও-বাড়ি ঠাকুরবাড়িই বটে বাংলা দেশের। সেই আমার প্রথম যাওয়া ঠাকুরবাড়ির এলাকায়। এর আগে চিৎপুরের ট্রামে যেতে বড় বড় থামওয়ালা—খুব উঁচু বড় সিঁড়িওয়ালা বাড়িটিকে দেখে ভাবতাম, এইটিই রবীন্দ্রনাথের বাড়ি। সেদিন ঠাকুরবাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে চারিদিকে দেখে—কোথায় যাব, কোন্ দিকে যাব ভাবছি, এমন সময় পুরনো বাড়ির বারান্দায় দেখলাম শান্তিদেব ঘোষ যাচ্ছেন—বিচিত্রাভবনের দিকে। আমি তাঁকে ডাকলাম।

শান্তিদেব আমাকে চিনতেন। আগেই বলেছি তাঁর পিতার স্নেহাস্পদ ছিলাম আমি। শান্তিদেব মানুষটিও বড় স্নিগ্ধ এবং মধুর। যা দেখে ভয় পাই, তা তাঁর মধ্যে ছিল না। আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে তাঁকে ডাকলাম। তিনি নেমে এলেন। অভিপ্রায় শুনেই বললেন, দাঁড়ান দেখি, কি করছেন।

দেখে ফিরে এসে বললেন, আসুন। একা রয়েছেন, আপনার ভাগ্য ভালো।

বিচিত্রাভবনের দক্ষিণ-পূর্ব কোণের ছোট ঘরখানিতে মহিমান্বিত কবি বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে বসেছিলেন। সে দিন সেই তাঁর আকাশ-দেখা দৃষ্টি দেখে আমার জন্ম ধন্য হয়েছে। আমি সেইদিন ঠিক বুঝতে পেরেছিলাম, মুহূর্তে আমার মন বলে দিয়েছিল, হ্যাঁ, হ্যাঁ এই তো, সেই কবি, যে কবির মনে আকাশের, মেঘের, গোধূলির আলোর স্পর্শ সুরঝঙ্কার তুলে দেয়, ধ্যানপুলকমগ্ন কবিকণ্ঠে আপনি স্ফুরিত হয়—

আজ নবীন মেঘের সুর লেগেছে আমার মনে,
আমার ভাবনা যত উতল হল অকারণে॥

সেদিনও আকাশে মেঘ ছিল। আমি দেখলাম, ক্ষণে ক্ষণে তাঁর উজ্জ্বল দুটি চোখে তার ছায়া পড়ছে। এই কবির মনেই আসতে পারে এবং আসে বহু যুগের ওপার থেকে আষাঢ়ের গান। আকাশে বকের পাঁতি উড়ে চলে যায়, নীলনভোপটে তাদের সারির শুভ্র লাবণ্য, তাদের পাখার শব্দ কবিচিত্তকেই আত্মহারা করে দেয়, গানের ঘরের দুয়ার আপনি খুলে যায় সোনার কাঠির স্পর্শে ঘুমন্ত রাজকন্যার চোখের পাতার মতো।

শান্তিদেব আমার হাত ধরে আকর্ষণ করলেন। অর্থাৎ অপেক্ষা করুন। বোধ করি মিনিট দুয়েক, কি তারও বেশি সময় পরে কবি দৃষ্টি ফেরালেন।

শান্তিদেব ঘরে ঢুকলেন, কবি নিজেই প্রশ্ন করলেন, কই তারাশঙ্কর?

শান্তিদেব বিনাবাক্যব্যয়ে সরে দাঁড়ালেন, আমি তাঁর সম্মুখীন হলাম। প্রণাম করলাম। হেসে বললেন, বস।

শান্তিদেব চলে গেলেন।

আমি বইখানি তাঁর পাশের ছোট টেবিলটার উপর রেখে দিলাম।

বললেন, বই? গল্পের? "জলসাঘর"! জলসা দেখেছ? গান বোঝ?

আমি চুপ করে রইলাম।

তিনি বললেন, পড়ব। সময় পেলেই পড়ব। তোমার লেখা আমার ভালো লাগে। কলকাতায় কি কাজে এসেছ? বৈষয়িক?

বললাম, বিষয় সামান্য আমাদের। আর বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখি না। এই লেখা-টেখার কাজ নিয়েই আসি যাই।

তা ভালো। যদি একেবারে আঁকড়ে ধরতে পার তো ভালো করবে। তবে তাতে দুঃখ পাবে। অনেক দুঃখ। সে দুঃখকে জয় করতে হবে।

আমি বললাম, সঙ্কল্প আমার তাই।

—দুঃখকে ভয় কোরো না, হার হবে না।

তারপর বললেন, আমাদের নৃত্যনাট্য দেখেছ তুমি?

—আজ্ঞে না।

—কেন? শান্তিনিকেতন বাড়ির কাছে, এসে দেখ না কেন? এস এস। আমি বলে দেব তোমাকে জানাতে। কালীমোহনকে বলে দেব।

তার পরই বললেন, তোমাদের ওখানে তো অভিনয়ের খুব সমারোহ! দীনু দেখেছেন, গান শিখিয়েছেন। কালীমোহন দেখেছেন, খুব প্রশংসা করেন। আমিও একবার বলেছিলাম, দেখব তোমাদের অভিনয়। কিন্তু তোমরা দেখালে না আমাকে।

কথাটা সত্য। আমাদের লাভপুরের অভিনয়ের মান খুব উঁচু ছিল, সত্যিই অভিনয় ভালো হত। কবির "চিরকুমার সভা"র অভিনয় দেখে অনেকে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের অভিনয় থেকে ভালো হয়েছিল বলেছিলেন। শান্তিনিকেতন থেকে দলবেঁধে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অভিনয় দেখতে গিয়েছিলেন। শ্রীনিকেতনের কি একটি উপলক্ষে অর্থ সংগ্রহের জন্য কলকাতার বর্তমান গ্রেস সিনেমায়—তখনকার অ্যালফ্রেড থিয়েটারে—লাভপুরের সম্প্রদায়কে অনুরোধ করে অভিনয় করিয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনের শিল্পীরাই আমাদের মঞ্চসজ্জা করে দিয়েছিলেন। সেই অভিনয়-নৈপুণ্যের কথা কবির কাছ পর্যন্ত পৌঁচেছিল। তিনি সত্যই বলেছিলেন, ওদের একবার শান্তিনিকেতনে ডাক। আমি দেখব ওদের অভিনয়।

কথা অনেকদূর এগিয়েছিল। কিন্তু কি যে হয়েছিল, কি বাধা যেন হয়েছিল। যত দূর মনে পড়ছে, কবিরই সময়ের অভাব ঘটেছিল। সেই কথা তুলে হেসে কৌতুক করে বললেন—তোমরা আমাকে দেখালে না। তার পর প্রশ্ন করলেন—তুমি? তুমি পার অভিনয় করতে?

—পারি একটু আধটু।

—পার? অনেক কিছু পার তুমি। স্বদেশী, অভিনয়, লেখা। তা হলে ভালোই পার। নইলে আমার কাছে স্বীকার করতে না। তুমি আমাদের এই নৃত্যনাট্য দেখ। কলকাতাতেই দেখ। শান্তিদেবকে আমি বলে দেব। তুমি এসে একখানা প্রবেশপত্র নিয়ে যেও।

আমি অভিভূত হলাম তাঁর স্নেহের স্পর্শে।

দোরের ও-পাশে সিঁড়ির মাথায় পায়ের শব্দ উঠল। অনেকগুলি একসঙ্গে। দেখলাম, গানের মহলার জন্যই বোধ হয়, যন্ত্র হাতে শিল্পীর দল উঠে এসে বড় হলে ঢুকছেন। শান্তিদেব এসে দাঁড়ালেন।

কবি বললেন—তোমার বই আমি পড়ব। বইখানি সরিয়ে তুলে রাখলেন।

আমি প্রণাম করে চলে এলাম। দু-তিন দিন পর শান্তিদেবের কাছে গেলাম, কিন্তু দেখা হল না। তিনি ছিলেন না।

আমি ছায়া 'মঞ্চে' নৃত্যনাট্য দেখে এলাম।

সে কি দৃশ্য!

মঞ্চের বেদীর উপর আসনে কবি বসেছেন, সে যেন দেবতার আবির্ভাব হয়েছে। তার পরেও দেখেছি শান্তিনিকেতনের নৃত্যনাট্য! কবির আসন অপূর্ণ থাকে, তাতেই যেন সব অপূর্ণ। কবিকে নিয়ে যারা সে নাট্য দেখেছে, তাদের চোখে সব ম্লান ঠেকবে।

কবির সেই আবৃত্তি—দে দোল—দোল, প্রিয়ারে আমার পেয়েছি আজিকে ভরেছে কোল।

তারই সঙ্গে শান্তিদেবের নাচ। আর সেই আমার প্রথম দেখা। আমার মনে অক্ষয় হয়ে রয়েছে।

কবি কদিন কলকাতায় ছিলেন, অভিনয় নিয়ে ব্যস্ত। লোকজনের সমাগমের তো কথাই নেই। তারই মধ্যে কিন্তু তিনি "জলসাঘর" পড়ে শেষ করেছিলেন এবং আগন্তুক অনেক জনের কাছে বলেছিলেন। তারই দু-চার টুকরো আমার কানে আসতে লাগল।

এর পর কবি ফিরে গেলেন শান্তিনিকেতন। সন্ধ্যার ট্রেনে গেলেন। তখন ইরিসিপ্লাসের আক্রমণ শুরু হয়েছে; বোলপুর পৌঁছতে পৌঁছুতেই তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। পরদিন সকালে কাগজে কাগজে তাঁর অসুখের কথা প্রচারিত হল।

মনে মনে ভগবানকে ডেকে বললাম, কবিকে তুমি বাঁচাও। রক্ষা কর। শতায়ু কর। কবি সেরে উঠলেন। তার পরই শান্তিনিকেতন থেকে একসঙ্গে শ্রীসুধীর কর ও শ্রীরথীন্দ্রবাবুর পত্র পেলাম—"জলসাঘর" বই পাঠাবার জন্য। কে যেন বইখানি নিয়ে গেছে। কবি বইখানি চান। রাগ করছেন না পেয়ে। এসব কথা আগেই লিখেছি। কবির সঙ্গে পরের দেখার কথাও লিখেছি।

এদিকে আমার জীবনের যে অস্থির গ্রহটি আমাকে স্থান থেকে স্থানান্তরে ক্রমাগত তাড়িত করে নিয়ে ফিরছিলেন, তিনি আবার সক্রিয় হয়ে উঠলেন।

এমনই একটি অপবাদ আমার ঘাড়ে এসে চাপল যে, আমার পক্ষে এই মেসে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠল। এই মেসটির সঙ্গে আমার মামাশ্বশুরদের সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। অপবাদটা তাঁদের সঙ্গে শত্রুতার অপবাদ—দিলেন যিনি, তিনি আমার শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। সত্যকে তিনি বিকৃত করলেন! আমাকে আঘাত দিলেন আমার মামাশ্বশুরেরা।

আমি ওই মেস ছাড়লাম। এবার এসে উঠলাম হ্যারিসন রোড মির্জাপুর স্ট্রীট জংশনে 'পূরবী' সিনেমার সামনে শান্তিভবন বোর্ডিঙে।

সুবল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমি দুজনে সামান্য জিনিসপত্র-কটা নিয়ে এসে বসে গেলাম শান্তিভবনে।

শান্তিভবন বোর্ডিঙে এসে পরম আরাম অনুভব করেছিলাম। জীবনে প্রমোশন পাওয়ার স্বাদ পেলাম। এ কাল পর্যন্ত সাহিত্য-জীবনের মধ্যে আহার বাসস্থানের সুখের দিক দিয়ে এর থেকে সুখে (অক্ককষা ফলের মতো সুখে) ছিলাম না এমন নয়; অর্থাৎ এর থেকে ভালো বাড়িতে আহার্যের ব্যবস্থায় ভালোতর ব্যবস্থা অবশ্যই পেয়েছি। যে সব আত্মীয়দের বাড়িতে এসে অতিথি হিসেবে থেকেছি তাঁরা আমাকে পরম যত্ন করেছেন, তাঁরা আমাদের বাঙালী সমাজে ধনী পর্যায়ের মানুষ; এবং তাঁদের আতিথেয়তা তাঁদের ব্যবহার যত্ন সবই তাঁদের শিক্ষা এবং শ্রীর উপযুক্ত। এবং আমার প্রতি স্নেহের মধ্যে কোন কৃত্রিমতাও ছিল না—এ সত্য অন্তর দিয়েই অনুভব করেছি। তাঁরা আমার হিতাকাঙ্ক্ষী। আমার সুখদুঃখের সমান অংশ চিরকাল গ্রহণ করে আসছেন। আজও সেই সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রয়েছে। মনে পড়ছে তাঁদের স্নেহ সমাদর। স্বর্গত রায়বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দুই কন্যা এই দুই আত্মীয় বাড়ির গৃহিণী। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বড় মেয়ে আমার সাহিত্যের প্রতি মতিগতি দেখে এই পথে আমার সুবিধা করে দিতে তাঁর বাবাকে একটি চাকরি দেবার অনুরোধ করেছিলেন। রায়বাহাদুরের হাতে ছিল "বঙ্গলক্ষ্মী" পত্রিকা। তিনিই ছিলেন সরোজনলিনী স্মৃতি সমিতির সম্পাদক। কাগজের সম্পাদিকা ছিলেন বড়মা অর্থাৎ শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী। তাঁর অধীনে আমাকে একটি কাজ দেবার কথা বলেছিলেন। রায়বাহাদুর আমাকে ভালো করে জানতেন; স্বর্গীয় গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে রায়বেঁশে নিয়ে যে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছিল তাও তাঁর অজানা ছিল না। তিনি তাঁর মেয়েকে বলেছিলেন, তা হলে তো ভালোই হয়। কিন্তু "বঙ্গলক্ষ্মী"তে কাজ কি সে করবে?

তিনি ভুল ধারণা করেন নি। আমি সবিনয়েই বলেছিলাম—না বউদি, ওখানে চাকরি আমার সইবে না।

রায়বাহাদুরের মেজ মেয়ে—তাঁর বাড়িতে মায়ের মতো সহোদরার মতো যত্ন করেছেন সে কথা আগে বলেছি। মনে পড়ছে "বঙ্গশ্রী" গল্পের জন্য প্রতীক্ষা করে রয়েছে, মাসের তিরিশ তারিখ—আমি "জলসাঘর" লিখছি; বলেছি রাত্রে খাব না। রাত্রির মধ্যেই গল্প শেষ করব সঙ্কল্প নিয়ে বসেছি। তিনি নিজে অল্প কিছু খাদ্য নিয়ে এসে বলেছেন—আমি দাঁড়িয়ে আছি, তুমি না

খেলে নড়ব না। না খেয়ে লিখলে শরীর থাকবে কেন? লিখতেই বা পারবে কেন?

খেতে হয়েছে। তারপরও খাবার রেখে গেছেন, হিটার দিয়ে গেছেন, ফ্ল্যাস্কে চা রেখে গেছেন; বলে গেছেন খিদে পেলে যেন খাই।

সুতরাং সুখ ও যত্নের দিক দিয়ে পরম আরামের কথা বলি না। মনের দিক দিয়ে এসব সুখ যত্ন সত্ত্বেও যে সঙ্কোচ কাঁটার মতো খচ-খচ করত, নিজেকে অক্ষম এবং অন্যের উপর নির্ভরশীল মনে করে যে অশান্তি অনুভব করতাম তাই থেকে নিষ্কৃতি, চলাফেরার স্বাধীনতা এবং বেশ ভালো সুখ-সুবিধে দুটো একসঙ্গে পেয়ে আরাম অনুভব করলাম। অনেক আগেই—প্রায় বৎসর তিনেক—আত্মীয়বাড়িতে থাকা ছেড়েছি কিন্তু সুখসুবিধে পাই নি।

শান্তিভবনে এসেছিলাম হোলির কাছাকাছি—সালটা ১৩৪৫ সাল, ইংরিজি ১৯৩৮। জায়গাটি এত ভালো লেগেছিল যে এখানে এসে লেখা গল্পের প্রথম গল্পটিতে শান্তিভবনের উল্লেখ এবং ছাপ না পড়ে পারে নি। গল্পটির নাম "হোলি"। ১৩৪৪ সালের "শনিবারের চিঠি"র ফাল্গুনেই প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম প্যারাগ্রাফেই লিখেছিলাম—

"রাস্তা হইতেই বাড়িটা বেশ পছন্দ হইল, মির্জাপুর স্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডের জংসনের উপরেই তিনতলা বাড়ি। সামনে দক্ষিণে পার্ক; দক্ষিণের বাতাস খানিকটা পাওয়া যাইবে। বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, বাড়িখানি বেশ ঝরঝরে, এমন কি নিচের তলাতেও ধরিত্রীগর্ভের ভোগবতীর করুণা বেগবতী নয়। দোতলায় উঠিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া দক্ষিণের বারান্দায় আসিয়া আর বিন্দুমাত্র দ্বিধা রহিল না, বারান্দাটাই মন হরণ করিয়া লইল;—শুধু আরামপ্রদই নয়, বেশ একটা আভিজাত্যও আছে। বসন্তকাল—সন্ধ্যায় একখানি ঈজিচেয়ার পাতিয়া বসিলেই স্বর্গসুখ না হউক—ত্রিশঙ্কুলোকের সুখটাও অন্তত পাওয়া যাইবে।"

সেদিন সুবল যা বলেছিল—তাও আছে কয়েক লাইন পরে। সুবল বলেছিল—নামটা কিন্তু শান্তিভবন না হয়ে শান্তি-কুঞ্জ হলেই ভালো ছিল।

এখানকার সব থেকে আরামের ছিল প্রত্যেকের জন্য এক-একখানি কুঠুরির ব্যবস্থা। লম্বায় ১২।১৪ ফুট, চওড়ায় বড় জোর ৮ ফুট। তার বেশী না। কিন্তু তাতে অসুবিধা ছিল না। একটা মানুষের থাকতে কতটা জায়গা লাগে? ঋষিকল্প লেখক মহাত্মা টলস্টয়ের গল্প মনে পড়ে এ কথায়।

এরপর লিখেছিলাম—বেশ জায়গা; একেবারে খাঁটি শহুরে আবহাওয়া! কাহারও উপর কাহারও আগ্রহ নাই, কিন্তু প্রত্যেকের উপর প্রত্যেকের সন্দেহ

আছে। এক মিনিটের জন্য বাহিরে যাইতে হইলেও দরজায় তালা পড়ে। পরিচয়ও বড় কাহারও সহিত কাহারও নাই, যে যাহার আপন আপন ঘরের মধ্যেই থাকে। দেখাশুনা এক হয় সিঁড়িতে, কিন্তু সিঁড়িটা অন্ধকার বলিয়া এক জায়গায় থাকিয়াও কথা না বলার জন্য চক্ষুলজ্জাও ঘটিতে পায় না। আর দেখাশুনা হয় খাবার ঘরে, কিন্তু সেখানেও হাত এবং মুখ দুই ব্যস্ত থাকে, কাজেই কথা বলাও চলে না—করমর্দন করাও হয় না। কয়টি প্রাণী মাত্র সর্বজনপরিচিত।—কালী, নরেন, ভজ এবং লোচন, সকলে ইহাদের বিশ্বাসও করে; সে অবশ্য বাধ্য হইয়া, কারণ উহাদের দুইজন চাকর, অপর দুইজন ঠাকুর। আর একটি প্রাণী—একটি লাল রঙের বিড়াল—সে সব ঘরেই যায়, আপন ভাষায় দুই-একটা কথাও বলে, কখনো কখনো কাপ-ডিশও ভাঙে, কোনো কোনো দিন পাশে শুইয়া গলা ঘড়ঘড় করিয়া আদরও জানায়। আমি উহার নাম দিয়াছি—'রাঙা-সখি'।

শান্তিভবনের কথা এত করে বলছি এই কারণে যে আমার সাহিত্য জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ কেটেছে এইখানে। জীবনের পটপরিবর্তনের ভূমিকা রচিত হয়েছিল এই শান্তিভবনে থাকতেই। এখানে প্রায় দেড়বছর ছিলাম। এখানে থাকতেই "ধাত্রীদেবতা" রচনা আরম্ভ এবং শেষ; "কালিন্দী" এখানেই আরম্ভ করি। প্রথম ছ-মাসের লেখা এখানেই লিখেছি। এখানে থাকতেই ক্রমশ প্রকাশিত লেখাগুলি কিস্তিতে কিস্তিতে লেখার অভ্যাস আয়ত্ত করেছি। এ একটা অভ্যাস অবশ্য। কিন্তু সে অভ্যাস সাধনা-সাপেক্ষ। "ধাত্রীদেবতা"র শেষ ছ-মাস এবং "কালিন্দী"র প্রথম ছ-মাস একসঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে। এক সঙ্গেই দুখানি উপন্যাস কিস্তিতে কিস্তিতে লিখেছি তখন। লেখার তখন নেশা চেপেছে। "ধাত্রীদেবতা" কিছুদিন প্রকাশিত হতেই সকলে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বড় উপন্যাস লেখার কৌশল যেন আয়ত্ত হয়ে এসেছে আপনার অজ্ঞাতসারেই। সেই নেশাতে দেহের প্রতি চরম অবহেলা করে শুধু লিখেই গিয়েছি। সব দিন ভাত খাই নি। স্নানেরও সময় নির্দিষ্ট থাকে নি। সমস্ত দিন শুধু লিখেছি এবং চা খেয়েছি; মধ্যে মধ্যে তার সঙ্গে দু-এক টুকরো পাঁউরুটি, কখনও বা একটা ডিম। দিনে ৩০।৩৫ কাপ খেয়ে ক্ষিদে অনুভব করতেই পারতুম না। পরবর্তীকালে চায়ের বিজ্ঞাপনে আমার নাম ও ছবি বের করেছিল। সেটা আমি সাহিত্যিক দাবিতে দিই নি, ওই 'চাতাল' দাবিতে দিয়েছি। আমাদের ও অঞ্চলে মাতালের সঙ্গে মিল রেখে 'চাতাল' শব্দটা প্রচলিত আছে।

এই সময় আমার স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন মশায়ের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য হয়েছিল। এই মানুষটির স্নেহে এবং অন্তরের উদার পরিচয়ে

আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। এমন মাটির বাংলার খাঁটি মানুষ আর আমি দেখি নি। বাংলার সমাজ বাংলার সভ্যতা এবং সংস্কৃতির সঙ্গে সুগভীর পরিচয় তাঁর বাক্যে ব্যবহারে ও সৌজন্যে মূর্তি ধরে দেখা দিয়ে সেকেলে মিষ্টি হাসি হেসে সম্ভাষণ জানাত। এই মানুষ বলেই তিনি লিখতে পেরেছিলেন—বাংলা সাহিত্যের ও সংস্কৃতির প্রথম সার্থক ইতিহাস। তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়া ঘটনাটিও আমার জীবনের একটি বিশিষ্ট ঘটনা। এই ঘটনায় হাঁ ও না-এর উপর পরবর্তী কালের জীবন নির্ভর করেছে। ঘটনাটির কথাই বলি।

একদিন ভৃত্য কালী এসে ডাকলে, আপনার ফোন এসেছে।

শান্তিভবনে ফোন ছিল। ফোন ধরলাম, দেখলাম "শনিবারের চিঠি"র আপিস থেকে সুবল ফোন করছে। বললে—ওহে, তোমাকে ডাঃ দীনেশ সেন মশায় একবার ডেকেছেন।

বিস্মিত হলাম—ডাঃ দীনেশ সেন মশায় ?

—হ্যাঁ। "আনন্দবাজার" আপিস থেকে ফোন করে খবরটা তোমাকে দিতে বললে। তোমার ঠিকানাও জিজ্ঞেস করলে।

ফোন ছেড়ে দিলে সুবল। আমি ভেবেই পেলাম না কি জন্যে তিনি ডাকবেন আমায়। ঘণ্টাদুয়েক পর আবার ফোন এল, এবার এল "আনন্দবাজার" থেকে।—আপনাকে ডাঃ দীনেশ সেন মশায় খুঁজছেন। আপনি একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করুন। আমরা ওবেলা "শনিবারের চিঠি"তে জানিয়েছিলাম। উনি এসেছিলেন আমাদের এখানে। আবার এখন ফোন করেছেন—আপনার কোনো জবাব পেয়েছি কি না। আপনি ওঁকে ফোন করে জানান কখন যাবেন। গাইডেই পাবেন ওঁর নাম্বার। উনি খুব ব্যস্ত হয়েছেন।

সত্য বলতে কি আমি বেশ একটু চঞ্চল হয়ে পড়লাম। ডাঃ সেন এমন ভাবে খুঁজছেন কেন ? কোনো লেখা ভালো লাগলে অবশ্য রসিক সাহিত্যসাধক ব্যক্তি খোঁজ করে থাকেন। কিন্তু এমন ব্যস্ত হবার কথা তো নয়।

যাই হোক ফোন করলাম। তিনি আমার নাম শুনেই বললেন, আরে বাবা আপনাকে খুঁজে হয়রান, বৃদ্ধবয়সে "আনন্দবাজার" পর্যন্ত ছুটে গিয়েছি। তা ওরা বলতে পারলে না ঠিকানা। "শনিবারের চিঠি"তে ফোন করলে, তারা বললে কোন বোর্ডিং-এ আপনি থাকেন। বললে, খবর দেবে। আমি আর ঘুরতে পারলাম না। আমার ঘোড়াটাও দুর্বল। বেহালা পর্যন্ত ফিরতে দম থাকবে না বলে আর এগুতে সাহস করলাম না। আপনাকে আমার বিশেষ দরকার। কখন আসছেন বলুন।

বললাম—কাল যাব।

—নিশ্চয় কাল। যেন ভুল না হয়।

পরের দিন—"শনিবারের চিঠি"তে গিয়ে—সেখানে রাস্তার হালহদিস জেনে, ফড়েপুকুরের মোড়ে ট্রামে চড়লাম, সঙ্গে সজনীকান্তও ছিলেন, তিনিও এসপ্লানেডে নেমে কোথাও যাবেন। ট্রামে একটু গিয়েই পেলাম শৈলজানন্দকে। তিনি উঠলেন শ্যামপুকুরের মোড়ে। যাচ্ছেন নিউ থিয়েটার্স স্টুডিয়ো। ওখানে তিনি তখন চাকরি নিয়েছেন গল্প ও সংলাপ লেখক হিসেবে। ট্রামে ভিড় ছিল না; সময়টা এগারটার পর। গল্প জমে উঠল। শৈলজানন্দই তাঁর স্টুডিয়ো জীবনের গল্প করলেন। সে গল্প দুঃখজনক। অনেক অবজ্ঞা সহ্য করতে হয়।

এসপ্লানেডে এসে তিনজনের ছাড়াছাড়ি হল। আমি বেহালার ট্রামে চড়লাম।

সেন মশায়ের বাড়িতে গিয়ে দাঁড়ালাম। শীর্ণকায় বৃদ্ধ প্রসন্ন হাসিমুখে আমাকে গ্রহণ করলেন—আসুন আসুন, বাবা আসুন।

এই সম্বোধনেই আমি অভিভূত হলাম। মনে হল যেন দেশকাল পালটে গিয়ে মহানগরীর থেকে, ১৯৩৮ সাল থেকে—বাংলার পল্লীতে ১৩৪৪ সাল এসে পেঁৗছে গেছে। এ ভাষা হারিয়ে গেল বাংলা দেশ থেকে—এ হৃদয় হারিয়ে গেল। সকল বাংলা থেকে গেল কি না জানি না—মহানগরী থেকে এবং বাংলা-সাহিত্য থেকে গেল।

বাংলা-সাহিত্য কথোপকথনের ভাষা আশ্চর্য রকমের মার্জিত হয়েছে। ধারালো হয়েছে—ঝকঝকে হয়েছে কিন্তু মধু হারিয়েছে—প্রেম হারিয়েছে—নিরাভরণ লাবণ্যের মাধুর্য হারিয়েছে এ কথা বলতে আজ দ্বিধা করব না। আজকের কথোপকথনে, প্যাঁচ মেরে কথা কাটাকাটির পালা জমাবার পথ প্রশস্ত হয়েছে কিন্তু আত্মীয়তা স্থাপনের সোজা সরল রাস্তাটা হারিয়ে গেছে। সম্বোধনের মধ্যেই তার পরিচয় রয়েছে। এ কালে—'বাবা আসুন, এ কথা শিক্ষিত মানুষের রসনা কিছুতেই উচ্চারণ করতে পারবে না। কিন্তু কী নিবিড় স্নেহ এর মধ্যে। অথচ এর মধ্যে কী যে আপত্তিজনক তা কেউ বোঝাতে পারবেন না। ইংরিজি আমি ভালো জানি না। কিন্তু বয়স্ক ব্যক্তির অল্পবয়সীকে my son বলে সম্বোধন ইংরিজিতে অচল বলে মনে হয় না। এখন মশায় ছাড়া সম্বোধন নাই।

ঘরের মধ্যে সে দিন খ্যাতিমান সাহিত্যিক আমাদের অগ্রজতুল্য শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায় বসেছিলেন। বোধ করি এম-এ পরীক্ষার বাংলা খাতা দিতে গিয়েছিলেন। আমি তাঁকে চিনলেও তিনি আমাকে চিনতেন না। চিনিয়ে দিলেন ডাঃ সেন। এবং মুখোপাধ্যায়কে বসতে অনুরোধ করে

বললেন—এঁর সঙ্গে আমার একটু কথা আছে, সে কথাটা সেরে নি। আপনি (কি তুমি আমার ঠিক মনে হচ্ছে না) একটু বসুন।

বলে আমায় সঙ্গে নিয়ে পিছন দিকে ছোট্ট একটি ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। ঘরখানির চারিপাশে স্তূপীকৃত পুঁথি এবং পুরোনো বই, মেঝেতে টেবিলে চেয়ারে পুরু ধুলোর আস্তরণ পড়েছে। আমাকে বললেন—ঘরে ধুলো আছে বাবা। মা সরস্বতীর প্রত্যক্ষ পদরজ। এ সব পুঁথির ধুলো। কার যে কত বয়ঃক্রম তা বলতে পারব না। তবে পাঁচশো বছর বয়স দু-একখানার আছে গো। এ ঘরে আমি কাউকে হাত দিতে দিই নে। নিজে হাতে মাঝে মাঝে ঝাঁটপাট দি। বসুন, এখানেই বসুন কোনো রকমে।

তারপর বললেন—বম্বের বম্বে টকীজের হিমাংশু রায়কে জানেন? সে আমার শ্যালকপুত্র। আর ডাঃ সুরেন্দ্র দাশগুপ্তের সম্বন্ধী। সে আমাকে চিঠি লিখেছে। আপনাকে বম্বে যেতে হবে বাবা।

আমি অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

তিনি বললেন—সেখানে তারা একজন বাঙালী গল্পলেখক নেবে। আপনার লেখা পড়ে ভালো লেগেছে। আপনাকে চায় সে।

—আমাকে চান তিনি?

—হ্যাঁ। লিখেছে, আবার কাল সুরেনকে তারও করেছে। আপনি চলে যান সেখানে। তিন বছরের কন্ট্রাক্ট হবে আপনার সঙ্গে—প্রথম বছর ৩৫০ দ্বিতীয় ৪৫০ তৃতীয় বছরে ৫৫০ পাবেন।

আমি হতবাক হয়ে গেলাম। আমি এখানে মাসে চল্লিশ টাকা নিয়মিত উপার্জন করতে পারি না। পথে আজ শৈলজানন্দের মুখে শুনে এসেছি—নিউ থিয়েটার্স তাঁকে দেড়শো কি দুশো দেয়। সেন মশায়ের কথা যেন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।

সেন মশায় বলে গেলেন—তিন বছরের পর আবার কন্ট্রাক্ট হতে পারবে। হবেও। তবে সে তো আর লেখাপড়া কথা নয়! আপনি চলে যান, যেতে টাকাকড়ি দরকার হলে আমি দেব আপনাকে।

কি ভেবেছিলাম, কোন তর্ক, কোন হিসেব মনের মধ্যে সেদিন উঠেছিল মনে নেই, তবে এইটুকু ভুলি নি এবং কোন দিন ভুলব না যে—আমার মন সায় দেয় নি, মনে আমি কোন উৎসাহ অনুভব করি নি, বরং বেদনাই অনুভব করেছিলাম। মনে হয়েছিল—এ যাওয়া আমার সাহিত্য-সাধনার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে যাওয়া হবে।

সেন মশায় সস্নেহে বলেছিলেন—তা হলে কবে যেতে পারবেন বাবা? আমি তার করব।

আমি অভিভূতভাবেই বলেছিলাম—আজ আমি এ কথার উত্তর দিতে পারব না। আমাকে সময় দিন।

সেন মশাই হেসে বলেছিলেন—মা ঠাকরুনের মত নেবেন?

অর্থাৎ আমার স্ত্রীর।

আমি সলজ্জভাবেই উত্তর দিয়েছিলাম—আমার মা আছেন, তাঁর অনুমতি চাই—

—বাবার মা বেঁচে আছেন? ভাগ্যবান গো আপনি। নিশ্চয় তাঁকে লিখুন—বউমাকে লিখুন। নিশ্চয় তাঁদেরও মত চাই বই কি। যারা চায় না তাদের কথা আলাদা। কিন্তু আপনার নিজের মত আছে তো?

—সেও আজ বলতে পারব না। ভেবে দেখতে সময় দিন।

—ক দিন?

—এক সপ্তাহ।

—না। সে সময় হিমাংশু দেবে না। তিন দিন। তিন দিন পর রবিবার। সকালে আপনি আসবেন এখানে।

আমি প্রণাম করতে গেলাম, তিনি হাঁ-হাঁ করে উঠলেন—না।

অদ্ভুত একটা মনের অবস্থা তখন। ঠিক বুঝানো যায় না। যেন একটা মর্মান্তিক বিয়োগান্ত কিছু ঘটবার উপক্রম হয়েছে—আমার চারিপাশে আমাকে ঘিরে ফেলেছে এমন অবস্থা। ফেরবার পথে মাঠে বসে থাকলাম রাত্রি পর্যন্ত। তারপর হঠাৎ ফিরে পেলাম মনের জোর। স্থির করে ফেললাম না যাব না। এই পথের সাধনা ছেড়ে আমি যাব না। তাতে আমার যা ঘটে ঘটুক।

পরদিন বাড়িতে চিঠি দিলাম মত জানাতে। সঙ্গীদের বললাম। সজনীকান্ত প্রথমেই বলে উঠলেন—চলে যাও। কি করবে এ করে?

আমি বললাম—না। আমি যাব না ঠিক করেছি।

সজনীকান্ত আমার মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর বললেন—তোমার জয় হোক।

বাড়ি থেকে চিঠিও পেলাম—পিসিমা, মা, স্ত্রী সকলেই আমাকে সমর্থন করেছেন। মনে কোনো কিন্তু রইল না, প্রসন্নতায় তৃপ্তি অনুভব করলাম। দেবতাকে প্রণাম জানিয়ে বললাম—আশীর্বাদ অভিশাপ যা তোমার ইচ্ছা তাই দিয়ো আমাকে—তোমার পূজা করার অধিকার থেকে শুধু আমাকে বঞ্চিত করো না?

তিন দিন পর তাঁর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম। তিনি বললেন—মন ঠিক হয়েছে বাবা?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি যেতে পারব না।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। তারপর বললেন—মায়েদের মত হল না?

আমি মায়ের চিঠিখানি তাঁর হাতে দিলাম। আমার মায়ের হাতের লেখা সেকালে ছিল অতি সুন্দর। সোজা সারিতে নিটোল মুক্তার মতো হরফগুলি নিপুণ গ্রন্থনে তারেগাঁথা মালার মতো সাজানো মনে হত; দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যেত। তিনি বললেন, আপনার মায়ের লেখা?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

ততক্ষণে তিনি পড়েছেন মায়ের চিঠির প্রথম পঙ্‌ক্তি। মা লিখেছিলেন—তুমি এমন প্রলোভন জয় করিয়াছ জানিয়া আমি পরম তৃপ্ত পাইয়াছি। সুখী হইয়াছি। আমি তোমাকে আশীর্বাদ করিতেছি।

এরপর আরও ছিল।

তিনি চিঠি থেকে মুখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি তা হলে যাওয়ার পক্ষে মত চান নি, যাবেন না এরই পক্ষে মত চেয়েছিলেন?

—আমি আমার মত লিখেছিলাম।

—কেন বাবা? আপনার অমত কিসে? চরিত্র চরিত্রবানের উপর নির্ভর করে। ভয় করলেই ভয়, সাহস করলেই ভয় জয় করা যায়।

আমি আমার মনটাকে তাঁকে বুঝাবার চেষ্টা করলাম। বললাম, এ ছেড়ে যেতে আমার মন চাইছে না, আমার মনে ইচ্ছে সব হারিয়ে যাবে আমার।

—সব হারিয়ে যাবে?

—হ্যাঁ, তাই মনে হচ্ছে আমার।

—আপনি তো কোথাও চাকরি করেন না?

—না।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন বৃদ্ধ। তারপর অকস্মাৎ তাঁর হাতখানি বাড়িয়ে আমাকে আকর্ষণ করে বললেন, কাছে আসুন আমার।

আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর ছেলে—তৃতীয় ছেলেকে ডাকলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তাঁর স্ত্রীকে ডাকলেন। ডেকে বললেন, শোন এঁর কথা।

তারপর বললেন, গাড়ি আনতে বল।

তাঁর ব্রুহাম গাড়িখানির কথা সাহিত্যক্ষেত্রে অপরিচিত নয়। সেই গাড়িতে আমায় নিয়ে বললেন, আসুন আমার সঙ্গে।

নিয়ে প্রথমেই গেলেন তাঁর বড়ছেলের বাড়ি। পৌত্র কবি সমর সেনকে ডেকে আমার পরিচয় দিয়ে সেই কথা বললেন। সমর সেন সেকালে খ্যাতিমান

আধ্‌নিক কবি ; কাব্যে তাঁর আধ্‌নিকতার উগ্রতা তাঁর সম্পর্কে কোন কল্পনা করতে গেলেই সে কল্পনাকে ঝাঁঝালো করে তুলত। কিন্তু তাঁকে দেখে ভারি ভালো লেগেছিল। সন্দর মিষ্টি চেহারা, কথাগুলি মিষ্টি। তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, বয়সে তখন তরুণ, তখন তাঁর পাণ্ডিত্য কাঁটাভরা ডালের মাথার বর্ণাঢ্য গোলাপ ফুলের মতোই হওয়া ছিল স্বাভাবিক। সেই ভয়ও ছিল আমার। কিন্তু কিছুক্ষণের আলাপেই দেখেছিলাম না—তা নয়। শুভ্র স্নিগ্ধ সৌরভময় যুঁই ফুলেরই সন্ধান মিলেছিল। প্রসঙ্গ যখন উঠল তখন বলি শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে, শ্রীযুক্ত কামাক্ষী চট্টোপাধ্যায় এঁদের মধ্যেও এই মাধুর্য দেখেছি।

ওখান থেকে আরও দু-তিন জায়গায় তিনি আমাকে সেদিন দেখিয়ে আমার কথা শুনিয়ে বেড়িয়েছিলেন। তার মধ্যে কবি কালিদাস রায় দাদার বাড়িও ছিল। কালিদার সঙ্গে তখন পরিচয় স্বল্প।

সে যে তাঁর কী আনন্দ সে প্রকাশ করতে পারব না।

তিনি শেষে আমাকে আশীর্বাদ করে কালীঘাটের মোড়ে ট্রাম ধরিয়ে দিয়ে বিদায় নিয়েছিলেন। আমি তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে শান্তিভবনে ফিরেছিলাম।

সেদিন আমার দেবতাই আমাকে যেতে দেন নি—তাঁরই আকর্ষণে আমি থাকতে পেরেছিলাম।

এরপর আরও একবার লোক এসেছিল। এবার লোক পাঠিয়েছিলেন ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মশায়।

এসেছিলেন সাহিত্যিক শ্রীগজেন্দ্র মিত্র। এবার বেতনের হার ১০০ টাকা বাড়িয়ে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। ৪৫০ টাকা থেকে ৬৫০ টাকা। কিন্তু তাতেও না বলতে আর আমার দ্বিধাই ছিল না।

এরই ঠিক দিন তিনেক পরে শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমহার্স্ট স্ট্রীটের মোড়ে দেখা হল। তিনি বললেন—আপনি নিলেন না—আমি নিলাম ও কাজ। বম্বে যাচ্ছি আমি।

আমার জীবনের গতি স্থির হয়ে গেল সেই দিন।

দুঃখে আমার মৃত্যু হয় হোক আমি এ সাধনা ছাড়ব না। এখানে থাকতেই "ধাত্রীদেবতা" পুস্তকাকারে বের হল। সজনীকান্ত মনোরম প্রচ্ছদপট করে "ধাত্রীদেবতা" প্রকাশ করলেন। শান্তিভবন আমার সাহিত্য-জীবনের একটি বিশেষ ক্ষেত্র। ওইখানটি ছাড়বার ইচ্ছা আমার ছিল না। কিন্তু চায়ের নেশা ছাড়বার জন্যেই আমাকে শান্তিভবন ছাড়তে হল। জেলখানা থেকে পেটের গণ্ডগোল অজীর্ণ ব্যাধি নিয়ে ফিরেছিলাম। সেটা পাটনায় গিয়ে এসে সেরেছিল। শান্তিভবনে চায়ের অত্যাচারে আবার চাড়া দিয়ে উঠল। তাতেও

সাবধান হই নি। কিন্তু একমাসে চায়ের দাম দিলাম ছাপ্পান্ন টাকা। অবশ্য সবই আমি খাই নি। তখন আমার বড় ছেলে এসে আমার কাছেই রয়েছে, এম-এ ক্লাসে ভর্তি হবে। বন্ধুবান্ধবও আসেন। কিন্তু তবু ছাপ্পান্ন টাকা চায়ের দাম? তখন দু-পয়সা চার-পয়সা চায়ের কাপ।

ছাড়লাম শান্তিভবন।

কোথায় যাব? সজনীকান্ত আহ্বান জানালেন—আমার এখানে এস উপস্থিত। একখানা ঘর এখানে আছে। উপস্থিত খাও আমার বাড়িতে। তারপর যা হয় ব্যবস্থা হবে। ছাপ্পান্ন টাকার চায়ের অর্ধেক খেলেও সে তো কম নয়। মরে যাবে তুমি।

এলাম মোহনবাগান রোয়ে।

স্বর্গত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় যে বাড়িতে থাকতেন, তার নিচের তলায় সজনীকান্তের একখানি ঘর নেওয়া ছিল; সেই ঘরে এসে আড্ডা পাতলাম।

সজনীকান্তের স্ত্রী শ্রীসুধা দেবী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। এমন মিষ্টভাষিণী মধুর চরিত্র সচরাচর দেখা যায় না। এখানে এসে তাঁর হাতের সযত্ন রান্নায় এবং নিয়ন্ত্রিত পরিমাণ চায়ের ব্যবস্থায় কিছুদিনের মধ্যে সুস্থ হলাম। কোন্ মাসে এসেছিলাম ঠিক মনে নেই—তবে পুজোর আগে।

সেবার পুজোয় "পিতাপুত্র", "বেদেনী" এ-গল্পদুটি এখানেই লিখেছিলাম। "প্রবাসী"তে "কালিন্দী" চলছে। মধ্যে মধ্যে অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু আসেন বাইশিক্ল চেপে; বলেন, ভালো হচ্ছে মশাই। খুব ভালো। "কালিন্দী"; চালান চালান।

এখানে থাকতেই নূতনকালের শক্তিশালী লেখক শ্রীমান নারায়ণ গাঙ্গুলীকে প্রথম দেখলাম। "শনিবারের চিঠি"তে তাঁর গল্প তখন চকিত করেছে সকলকে। মনে মনে শুনতে পাই নূতন জনের পদধ্বনি।

একদিন "শনিবারের চিঠি"র আপিসের বাড়িতেই স্নান করে ঘরে যাচ্ছি, শুনলাম শ্রীমান নারায়ণ এসেছেন। ভিজে কাপড় রেখে মাথায় চিরুনি দিয়েই খালিগায়েই বোধ করি ব্যগ্রতাভরে দেখতে এসেছিলাম। শুনেছিলাম বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র। সেবার বোধ হয় পরীক্ষা দিয়েছেন কি দেবেন। অথচ বাংলাদেশের সঙ্গে নাড়ীর যোগ। এই তো—একেই তো চাইছে দেশ।

এসে দেখলাম আমারই মতো ক্ষীণতনু অথচ ধারালো চেহারা সুকুমার একটি তরুণ। মুখে চোখে প্রসন্নতা। অন্তরে জ্যেষ্ঠদের জন্য অকৃত্রিম শ্রদ্ধা। কোমল মন, তাতে বিনয় যেন পুষ্পশোভার মতো বিকশিত। তার রূপে গন্ধে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম প্রথম দিনই।

এদের মতো লোকই তো দরকার। আমার নিজের কথা আমি তো জানি—অভিজ্ঞতার সম্বল আমার যাই থাক—যতই থাক, দেশকে আমি যেমনই জানি, আমার মধ্যে যে পাণ্ডিত্যের অভাব রয়েছে। নারাণের সে সম্পদ আছে। এরপর "ভারতবর্ষে" যেদিন নারাণের উপন্যাস—"উপনিবেশে"র শুরু পড়লাম সেদিন আর সন্দেহ রইল না। নারায়ণ তখন কোথায় থাকতেন জানি না, ভারতবর্ষের ঠিকানাতেই অভিনন্দন জানিয়ে তাঁকে চিঠি লিখেছিলাম। মনের কথা সব লেখা যায় না। সব লিখতে পারি নি। মনে মনে বলেছিলাম—ষোল কলায় পরিপূর্ণ হও তুমি।

এখানে এসে সব থেকে বড় লাভ হয়েছিল—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংস্পর্শ। তাঁকে ভালো করে জানার সৌভাগ্য। এর আগেই তাঁর সংস্পর্শে অনেকবার এসেছি কিন্তু একবাড়িতে থেকে তাঁর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের মধ্য দিয়ে যা দেখলাম যা জানলাম তা আগেকার পরিচয় থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

* * *

অনেক কাল আগে তখন আমার প্রথম যৌবন, সেই সময় বিজ্ঞাপন দেখে তাঁর 'মোগল-বিদুষী" এবং "বেগম সমরু" ভি-পি-তে কলকাতা থেকে আনিয়ে পড়েছিলাম। মধ্যে মাঝে মাসিকপত্রে "সংবাদপত্রে সেকালের কথা"র দু-একটি প্রবন্ধও পড়েছিলাম। ভারি ভালো লেগেছিল একটি প্রবন্ধের কাহিনী। তাতে সেকালের এক চৌকিদারের মৃত্যুর পর তার সহায়হীন বিধবা স্ত্রী দুটি ছেলে নিয়ে বিব্রত হয়ে অবশেষে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে দরখাস্ত করেছিল—স্বামীর পদের অর্থাৎ চৌকিদারির জন্য। জানিয়েছিল, যোগ্যতার সঙ্গেই সে এ দায়িত্ব বহন করতে সক্ষম। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট তার দরখাস্ত মেয়েছেলের দরখাস্ত বলে ফেলে দেন নি, কৌতূহলী হয়ে তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তার যোগ্যতার কথা। মেয়েটি জানিয়েছিল যে, সে লাঠিয়ালের কন্যা, লাঠিয়ালের স্ত্রী, নিজেও লাঠি ধরতে পারে, চোর হোক ডাকাত হোক, তাদের বাধা দিতে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ। সাহেব তাকে প্রশ্ন করলেন যে, সে পরীক্ষা দিতে সম্মত আছে কি না? আবক্ষ ঘোমটা টেনেই মেয়েটি কথা বলছিল। ঘোমটাসুদ্ধ মাথা নেড়েই সে সম্মতি জানালে। লোকে হাসলে। সাহেব কিন্তু হাসলেন না। তিনি হুকুম দিলেন, নির্দিষ্ট দিনে পরীক্ষা হবে এবং পুলিস সাহেবকে বললেন, তিনি যেন কনস্টেবলদের মধ্য থেকে ভালো দু-তিনজন লাঠিখেলোয়াড় বাছাই করে রাখেন। নির্দিষ্ট দিনে কালেক্টরী বাড়ির সামনে লোকে লোকারণ্য হয়ে

গেল। সেই লোকারণ্যের মধ্যে অবগুণ্ঠনবতী বিধবা এসে তার স্বামীর বাঁশের লাঠি সামনে রেখে সাহেবকে এবং জনতাকে প্রণাম করে উঠে গাছকোমর বেঁধে কাছা এঁটে লাঠি হাতে নিয়ে দাঁড়াল। দেখা গেল লজ্জাশীলা বাংলার বাগদীবধূটির চেহারা পালটে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে সে হয়ে গেল আর এক মেয়ে, বলা চলে ভীমা ভয়ঙ্করী। লাঠিখেলা আরম্ভ হল। সে খেলা—খেলা নয়, মারাত্মক যুদ্ধই। এক দিকে পশ্চিমদেশী সিপাহীদের মর্যাদার ইজ্জৎ, অন্য দিকে এই মেয়েটির অন্নসংস্থানের দায়। জিতেছিল সেই মেয়েটিই এবং শুধু চাকরিই পায় নি, পুরস্কারও পেয়েছিল।

এই কাহিনীকে যিনি উদ্ধার করেছিলেন পুরাতন কাগজ ঘেঁটে, তাঁকে সেদিন দূর থেকেই নমস্কার জানিয়েছিলাম; অবশ্য তাঁর কাজের সম্পূর্ণ মূল্য তখন বুঝতে পারি নি, বুঝবার যোগ্যতা হয় নি। সত্য কথা বলতে কি, তাঁর কর্মের পূর্ণ মূল্য বুঝতে অনেক দেরি লেগেছে। বুঝতে যেন চাই নি ইচ্ছে করে। তার একটু কারণও ছিল। মনে হত আধুনিক কালের কবি এবং কথাসাহিত্যিকদের তিনি যেন খানিকটা অবজ্ঞার চোখেই দেখতেন। কথাটা অসতও নয়; এই মনোভাবের মূলে "অটোবায়োগ্রাফি অব অ্যান আননোন ইণ্ডিয়ানে"র লেখক শ্রীযুক্ত নীরদ চৌধুরীর প্রভাব ছিল। আরও কিছু ছিল। সে হল আমাদের নিজেদেরই ব্যক্তিগত আচার-আচরণ। কবি এবং গল্পলেখকদের মনোভাব তাঁর প্রতি সেকালে প্রসন্ন দেখি নি। তাঁর নিজের আচার-আচরণ এমনই সুশৃংখল, পরিচ্ছন্ন এবং মর্যাদাপূর্ণ ছিল যে, তাঁর পক্ষে আচার বা মর্যাদভ্রষ্টতা সহ্য করা প্রায় অসম্ভব ছিল।

তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয় আমার পত্রযোগে। আমার প্রথম গল্প "রসকলি" সর্বাগ্রে আমি "প্রবাসী"তেই পাঠিয়েছিলাম, আট মাস পড়ে ছিল "প্রবাসী"র দপ্তরে; এর মধ্যে অন্তত আট জোড়া রিপ্লাই-কার্ড অবশ্যই আমি লিখেছিলাম এবং প্রত্যুত্তরে একই বাঁধা-গৎ 'গল্পটি সম্পাদকের বিবেচনাধীন আছে' জবাব পেয়েছি। নিচে সই থাকত তাঁরই—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, একটু বাঁকা লাইন, অক্ষরগুলির গোড়ার দিকটা মোটা, তার পর ক্রমশ সরু এবং জড়ানো হয়ে যেত। তারপর একদা কলকাতায় এসে "প্রবাসী" আপিসে গেলাম। দেখলাম, ছোট-করে-চুল-ছাঁটা, সবলদেহ, নির্ভীকদৃষ্টি একটি মানুষ দরজার দিকে মুখ করে বসে আছেন। বাকি সকলে দক্ষিণমুখী, একজন তাঁর দিকে মুখ করে বসে আছেন। গিয়ে বললাম, আমার লেখা ফেরত নিতে এসেছি।

গম্ভীরস্বরে প্রশ্ন করলেন—লেখার নাম? আপনার নাম?

উত্তর দিতেই বিনাবাক্যব্যয়ে ফাইল বের করে কয়েক মিনিটের মধ্যেই লেখাটি দিয়ে দিলেন। তার পর আবার নিজের কাজে মন দিলেন।

তার পর "বঙ্গশ্রী"র আপিসে তাঁকে দেখলাম। সজনীকান্তের আহ্বানে তিনি এলেন। সেই দিন তাঁর প্রতি "বঙ্গশ্রী"র লেখকগোষ্ঠীর যে সম্ভ্রম দেখলাম, তাতে একটু সচকিত হলাম। বন্ধু কিরণ রায় সেদিন প্রথম আমাকে বুঝিয়ে দিলেন ব্রজেন্দ্রনাথের সাধনার মহত্ত্ব এবং গুরুত্ব। এবং সেই দিনই শুনলাম, আচার্য যদুনাথ সরকারের তিনি একনিষ্ঠ এবং অতিপ্রিয় শিষ্য।

আচার্য যদুনাথ আমার কাছে আমার প্রায় শৈশব থেকেই আদর্শ পুরুষ এবং ঋষিতুল্য পণ্ডিত। আমার মা প্রায়ই তাঁর নাম আমার কাছে বলতেন সেই ছেলেবেলা থেকে। আচার্য যদুনাথ পাটনায় ছিলেন দীর্ঘকাল—আমার মাও পাটনার মেয়ে; বাঙালী সমাজে যদুনাথের ছাত্র-জীবনের খ্যাতি, তাঁর "রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ"-বৃত্তিপ্রাপ্তি বিপুল গৌরবের কথা ছিল। তার উপর ছিল তাঁর আদর্শ দৃঢ় চরিত্রের খ্যাতি। সেই কথা মা আমাকে প্রায়ই বলতেন। বলতেন, সে আমলে নন্দলাল বলে একজন যদুনাথের সহপাঠী এবং প্রতিযোগী ছিলেন—বুদ্ধিতে তিনি কম ছিলেন না, কিন্তু বুদ্ধি প্রতিভা ও চরিত্রের অভাবে তৈলহীন প্রদীপের মতো। যদুনাথের সাধনা, তাঁর চরিত্রবল তাঁকে নিয়ে চলেছে সিদ্ধির পথে, চরিত্রবলহীন নন্দলাল বুদ্বুদের মতো কোথায় মিলিয়ে গেছে। যদুনাথ নাকি অশুচি অশুদ্ধ কিছুকে সহ্য করেন না।

ঠিক এই কারণেই সেদিন কিরণের কথা অগ্রাহ্য করি নি।

তারপর সেবার পুজোর সময় সজনীকান্ত বললেন, একটি গল্প "প্রবাসী"তে দিয়ে আসুন।

আমি ইতস্তত করে "রসকলি"র অভিজ্ঞতার কথা বললাম। তিনি বললেন, এখন আর তা হবে না। আগের ব্যাপারে চিঠিতে সই করে ব্রজেনদা সব দায়টা ঘাড়ে করলেও দায়ী তিনি নন। কারণ গল্পনির্বাচন করেন অন্য লোকে। এখন সে ধারার খানিকটা বদল হয়েছে।

"ঘাসের ফুল" গল্পটি হাতে নিয়ে গেলাম "প্রবাসী" আপিসে।

ব্রজেনদা গল্পটি খুলে আমার নাম দেখে বললেন—বসুন। তারাশঙ্কর বাড়ুজ্জে? পরশু, চা দাও।

তারপর কাজে মন দিলেন। চা খেয়ে সভয়ে বললাম, কবে খবর নেব?

—খবর? একটু হাসি তাঁর মুখে যেন খেলে গেল।

—মানে, পুজো-সংখ্যার জন্যে দিচ্ছি তো—

নেবেন। আবারও একটু হাসলেন, সঙ্গে সঙ্গে একটু দুললেন; এটি ছিল তাঁর স্বাভাবিক ভঙ্গি। লেখাটি সেই সংখ্যাতেই বেরিয়েছিল।

তারপর "প্রবাসী"তে অনেক লেখা বের হল। কত বার গেলাম—প্রুফ দেখতে, দক্ষিণা আনতে। ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা বসে থাকতে হয়েছে, ব্রজেনদা চা খাইয়েছেন, মধ্যে মধ্যে গল্প করেছেন। পরিচয় গাঢ় হয়েছে। এর মধ্যে তাঁর লেখা গ্রন্থগুলি পড়েছি। শ্রদ্ধাও বেড়েছে।

হঠাৎ ঘটনাচক্রে এর পর এসে পড়লাম মানুষটির একেবারে অত্যন্ত সন্নিকটে। একেবারে এক বাড়িতে। উপরতলায় তিনি, নিচের তলায় আমি।

১৯৩৯ সালে "ভাগ্যকুল ম্যান্‌সন" থেকে তিনি এলেন মোহনবাগান রো-র একখানি বাড়িতে। আমি তার নিচের তলায় এলাম।

ঘরখানি ছিল সজনীকান্তের। তিনি বই রাখবেন বলে ঘরখানা ব্রজেনদার কাছে ভাড়া নিয়েছিলেন একথা আগেই বলেছি। প্রসন্ন হাস্যের সঙ্গে গম্ভীর ব্রজেনদা এসে বললেন, ভালো হল ভায়া। খুব ভালো হল। মধ্যে মধ্যে গল্পগুজব করা যাবে। তোমারও ভালো হল, "প্রবাসী"র লেখা দিতে যেতে হবে না তোমাকে। আমি নিয়ে যাব।

বাড়িতে ব্রজেনদা হাঁটু পর্যন্ত খাটো ধুতি পরেন, খালি গা, গলায় পৈতে—খাঁটি এ দেশের মানুষ। হাতে কাগজের তাড়া নিয়ে চলে গেলেন "শনিবারের চিঠি"র আপিসে। দশটা বাজতেই বেরিয়ে গেলেন আপিসে।

এই সময়ে দেখলাম ব্রজেনদার তপস্বী রূপ।

এমন তন্ময় তপস্যা, এমন বিরামহীন তপস্যা এ যুগে দেখি নি! ধূলিধূসর জরাজীর্ণ কাগজ—পুরাতন সংবাদপত্রের ফাইল নিয়ে বসে কাজ করে চলেছেন। কাগজ কাটছেন, আঁটছেন, তারপর লিখছেন মন্তব্য, আবার পাতা উলটাচ্ছেন, হঠাৎ উঠে চটি পায়ে দিয়ে চলেছেন—সজনীবাবু! সজনীবাবু! সমস্যা উপস্থিত হয়েছে, পরামর্শ চাই। দিনের-পর-দিন। রাত্রির-পর-রাত্রি। কোথায় আছে পুরনো সংস্করণের বই, কোথায় আছে কাগজ, খোঁজ করে কোন একজনকে সঙ্গে নিয়ে চলেছেন সেখানে। ঠিক তেমনি ভাবে—অ্যাডভেঞ্চারের বইয়ে স্বর্ণ-সন্ধানীরা যে ভাবে বনের মধ্যে পথ হেঁটে চলে, মাটি খোঁড়ে, সেই ভাবে। যাওয়া-আসার কাজে তিনি একটু অপটু ছিলেন, কোন একজনকে সঙ্গে না নিয়ে যেতে পারতেন না। তাঁর ধ্যানজ্ঞান এমন কি নিদ্রার মধ্যে স্বপ্নও ছিল এই গবেষণা। আমি অবাক হয়ে দেখেছি আর ভেবেছি, এতটা মানুষ পারে? আমার নিজের জীবনেও আমি নিত্য নিয়মিত শ্রম করি; নিত্য লিখি; এ শৃঙ্খলাকে কোনোদিন ভাঙি না; সে নিয়ে অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করেন। আমিও বিস্মিত হলাম। শিখলাম তাঁর

কাছে। শুধু এইটুকুই নয়, আরও দেখলাম মানুষটির জীবনের আর একটি দিক, এই গম্ভীর বাহ্যত-কঠোর মানুষটির স্নেহতৃষ্ণা।

সন্তানসন্ততিহীন জীবন ও সংসার। স্বামী এবং স্ত্রী পরস্পরকে নিবিড় ভালোবাসায় জড়িয়ে ধরেছেন, পরস্পরের জন্য কি ব্যাকুলতা, কি চিন্তা! তারই মধ্যে মাঝে মাঝে সজনীকান্তের শিশুকন্যা রমাকে নিয়ে কতো সমাদর!

জীবনে ব্যয়বাহুল্য নেই—কার্পণ্যও নেই, কেউ একটি পয়সা তাঁর কাছে পেলে কাগজে মুড়ে সেটি পকেটে নিয়ে ফেরেন। ডাকে বিলেত থেকে আসে দুর্লভ বইয়ের পৃষ্ঠার ফোটোগ্রাফ। এই সময়ে ব্রজেনদা মধ্যে মধ্যে বসে কবি দেবেন সেনের কবিতা আবৃত্তি করতেন। বধূর পায়ের মল ঝমর ঝম বাজতো তাঁর মুখে। বলতেন—ভায়া নেহাত 'শুষ্কং কাষ্ঠং' মনে করো না। রসতৃষ্ণা আছে।

পুজোর সময় মাসখানেক নিয়মিত তিনি চেঞ্জে যেতেন বউদিদিকে নিয়ে। বলতেন—আমার তো কাজ আছে, গবেষণার অনুসন্ধানের কাজ আছে। ও'র কি আছে?

এমন নিবিড় দাম্পত্য জীবন আমি দেখি নি।

ভোরবেলা আমি উঠি। ব্রজেনদাও ভোরবেলা উঠতেন। মধ্যে মধ্যে প্রায়ই শুনতাম, বাইরে উঠে এসে তিনি বলছেন—হ্যাঁ গা, গাড়ুতে আজ জল রাখ নি?

মুহূর্তে সচকিতকণ্ঠে বউদির কথা শুনতাম—ঐঃ যাঃ! ভুলে গিয়েছি।

ব্রজেনদার সহাস্য কথা শুনতাম—ঠিক আছে। আমি নিচ্ছি।

আকুল হয়ে উঠতেন স্ত্রী—না না, আমি যাই।

স্বামী উৎকণ্ঠিত হতেন এবার—না। উঠো না, সকালে উঠলে তোমার শরীর খারাপ হবে।

—না—না—না। আমি যাই। খবরদার তুমি জল নেবে না।

—আঃ! না, উঠো না তুমি। বারণ করছি আমি। আমি নিচ্ছি জল।

—না। আমার দিব্যি রইল। মাথা খাবে আমার।

অবাক হয়ে বসে শুনতাম। কখনোও হাসি আসতো এই প্রৌঢ় দম্পতির ছেলেমানুষি দেখে, কখনোও চোখে জল আসত। বুঝতে পারতাম—মনে হত একটা শূন্য ঘরে অনন্ত শূন্যের বাতাস ভেসে এসে ঢুকছে দীর্ঘনিশ্বাসের মতো।

এখান থেকে চলে গেলাম আমি বাগবাজার আনন্দ চ্যাটার্জী লেনে।

সেখানে থেকে নিত্য দশটা সাড়ে-দশটায় আসতাম "শনিবারের চিঠি"র আপিসে। একদিন হঠাৎ ব্রজেনদার সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেল। তিনি তখন "সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা" সম্পাদনা আরম্ভ করেছেন। এরই মধ্যে মহিলা

সম্পাদিত মাসিকপত্র নিয়ে গবেষণামূলক একটি প্রবন্ধ রচনা শুরু করেছিলেন। সেই নিয়েই কথা চলছিল। তিনি বলছিলেন—নসীপুর থেকে "ভুবনমোহিনী দেবী" একখানি মাসিক পত্র বের করেছিলেন বহুকাল পূর্বে, তারই কথা। এবং পত্রিকার প্রকাশক এবং ম্যানেজার ডাঃ নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

শুনে আমি বললাম, দাদা, তা হলে হয়েছে। ভুবনমোহিনী দেবী নামে মহিলা হলেও আসলে মহিলা নন। ওটি নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ডাক্তারের ছদ্মনাম।

ভ্রূকুঞ্চিত করে তিনি বললেন—তার অর্থ?

আমি "ভুবনমোহিনী প্রতিভা" কাব্যগ্রন্থের কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম। যে কাব্যগ্রন্থের কবি মহিলা ভেবে সমালোচকেরা প্রশংসা করেছিলেন—বোধ হয় বঙ্কিমচন্দ্রও করেছিলেন—এবং পরে কবির সঠিক পরিচয় পেয়ে এই প্রতারণার জন্য তাঁরা তিরস্কার করেছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন—তা হলেও সম্পাদনার বেলা ও-কথা খাটবে না। ভুবনমোহিনীকে সামনে রেখে কাজ যেই করুক, সম্পাদনা ভুবনমোহিনীর বলেই গ্রহণ করব আমরা।

বললাম, আসলে যে ভুবনমোহিনী বলে কারও অস্তিত্বই ছিল না। আমি খুব ভালো করেই জানি—কারণ "ভুবনমোহিনী প্রতিভা"র কবি ডাঃ নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পরে গিয়ে লাভপুরের ছ মাইল দূরে কীর্ণাহারে বাস করেছেন। তাঁর দুই স্ত্রী। তাঁর সন্তানসন্ততিরা এখনোও রয়েছেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ কিছুতেই মানলেন না, এবং আমাকে কটু কথাই বললেন—বললেন, এ বানিয়ে গল্প লেখা নয়। ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমিও কটু উত্তর দিয়ে উঠে এলাম। বললাম—আপনিই বা কি ঐতিহাসিক? একটি তথ্যের সংবাদ আমি দিচ্ছি, আপনি সন্ধান না করেই তাকে উড়িয়ে দিচ্ছেন?

উঠে চলে এলাম।

ঠিক দিন চারেক পরেই একখানি পত্র পেলাম। ব্রজেনদা লিখছেন—'ভায়া, তোমার কথাই ঠিক বলিয়া প্রমাণিত হইল। পরে কাগজ ঘাঁটিয়া বাহির করিলাম—ভুবনমোহিনী নবীনচন্দ্র নিজেই। কিছু মনে করিও না। ইতি ব্রজেন্দ্রনাথ।'

শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে পড়ল। পরের দিন প্রণাম করে এলাম।

এর পর তাঁর "সাহিত্য-সাধক চরিতমালা" একে একে পড়ে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে এলাম একদিন। "সাহিত্য-সাধক চবিতমালা" তহবিলে কিছু সাহায্যও দিয়েছিলাম। তাঁর সে কি আনন্দ! আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন—ভায়া, দুটি গুণ তোমার আছে। সে দুটিতে যেন খাদ না মেশে।

বুঝেছ? অন্যের কীর্তিকে কর্মকে স্বীকার করা, আর নিজের কর্মে ফাঁকি না দেওয়া। বাস্, ওতেই জীবনযুদ্ধে জয় হয়ে যাবে।

অল্প একটু হেসে ডান হাতখানি বুকের উপর রেখে একটু দুললেন।

তার পর বললেন—আমার "বেগম সমরু" আবার ছাপা হচ্ছে। তোমাকে দিয়ে একটা কাজ করিয়ে নেব। আমাকে ভূমিকা লিখতে হবে কথাটা শুনে আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। এ কি মানুষ!

কীর্তির চেয়ে কীর্তিমান আমার কাছে বড়।

'তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ'—এ তত্ত্ব যার জীবনে সত্য না-হয়ে ওঠে তার তিরোধানে সংসারের ক্ষতি তো বড় নয়; কারণ কীর্তিমানের চেয়ে কীর্তি বড় হলে এবং সেই কীর্তি সংসারে থেকে গেলে হিসেবের অঙ্কেই ওই কথা বলবে।

ব্রজেন্দ্রনাথের তপস্যার নিষ্ঠা এবং মানুষ হিসেবে খাঁটিত্বই তাঁকে মহত্তর করেছিল। এবং তাঁর সাহচর্যে এসে এর শিক্ষা তাঁর কাছে আমি নিয়েছি।

মোহনবাগান রোয়ের জীবন এই সঞ্চয়ে ধন্য। কয়েক মাসের পক্ষে এ অনেক। সজনীকান্ত, তাঁর পত্নীর যত্ন, ব্রজেন্দ্রনাথকে এইভাবে জানা—নারায়ণের সঙ্গে পরিচয় এবং স্নেহের সম্পর্ক গড়ে ওঠা—এতো কম নয়।

এখান থেকে মাস কয়েক পরেই উঠলাম—

এখান থেকেই পরে এলাম আনন্দ চ্যাটার্জী লেনে।

নির্মল বসু মহাশয় আমাকে নিয়ে এলেন। তিনি থাকতেন নিচে। আমি নিলাম দোতালার একখানা ঘর ভাড়া। দোতলাটা গোটাটাই তখন খালি পড়ে রয়েছে। এখানে আসার মাসখানেকের মধ্যেই খবর পেলাম আমার স্ত্রীর ঘুষঘুষে জ্বর কিছুতেই ছাড়ছে না। তাঁকে কলকাতায় দেখানো দরকার। দোতলার বাকী ঘর তিনখানাও ভাড়া করলাম। সব সমেত ভাড়া ২৫ টাকা।

বাড়িখানার সামনেই শিল্পী যামিনী রায়ের বাড়ি। এ বাড়ি ও বাড়ির মাঝখানে উঠানে একটা পাঁচিল শুধু। প্রথম দিনেই তিনি আমার দাদা হলেন। ভাই সম্বোধন করে যামিনীদা বললেন—ভাই, এইবার—এইবার আপনার সাধনা পাকা হবে। হয় মরবেন নয় সত্য করে বাঁচবেন। এ কাজ ঠিক করলেন।

হেসে বললেন—এতদিন তো ভূমিকা করেছেন। এবার জীবননাট্য শুরু হল। নির্মল সূত্রধারের কাজ করলে।

সত্যই, শুরু হল নতুন জীবন। এইখানেই ছেদ টানলাম বর্তমানে।

সমাপ্ত

পরিশিষ্ট ঃ ১

তারাশঙ্কর

তারাশঙ্করের পিতা হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি সুবৃহৎ ডায়রি আছে। বীরভূম জেলার লাভপুরে নিতান্ত গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে অবস্থান করিয়াও তিনি তাঁহার দেশ ও কালকে ধরিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি তুলিয়াছিলেন ফোটোগ্রাফ।

পুত্র তারাশঙ্কর দেশ ও কালকে ধরিয়া রাখিবার জন্য ছবি আঁকিয়াছেন। পিতার তোলা ফোটোগ্রাফগুলি তিনি এখনও মাঝে মাঝে দেখেন এবং পরিপ্রেক্ষিত ঠিক করিয়া লন। এইখানেই পিতা-পুত্রের যোগ।

মাতা প্রভাবতী প্রবাসী বাঙালীর সন্তান, পাটনার শহুরে মেয়ে, স্বভাবতই উদারদৃষ্টিসম্পন্ন। তারাশঙ্করের রচনায় গ্রাম-শহরের দ্বন্দ্ব আছে। ক্ষুদ্র গণ্ডি ও বৃহত্তর পরিধির দ্বন্দ্ব।

তারাশঙ্করের ক্রমবর্ধমান গল্প ও উপন্যাস-সাহিত্যে তাঁহার জীবনের অন্তরঙ্গ ইতিহাসও ওতপ্রোত হইয়া আছে, সেই ইতিহাস চলমান, তিনি এখনও ফুরাইয়া যান নাই। দেশের কবি-সমালোচক সম্প্রদায় এই অন্তরঙ্গ জীবনী-রচনায় তৎপর হইতেছেন। এই জীবনী রচিত হইলে দেখা যাইবে যে, এই শিল্পী মানুষটির জীবন বিচিত্র। পুরাতন ও নূতন, অতীত ও ভবিষ্যৎ, বনেদী জমিদার ও সাম্যবাদী বিপ্লবী, গ্রাম ও নগর, সংস্কার ও সংস্কার-মুক্তির সমবায়ে তারাশঙ্কর একটি অতিশয় জটিল গ্রন্থি। এই গ্রন্থি উন্মোচন করিতে তিনিই পারিবেন, যিনি কারাগারের "পাষাণপুরী" হইতে নিষ্ঠার সঙ্গে "হাঁসুলী বাঁক" পর্যন্ত তাঁহার অনুসরণ করিবেন, এবং বক বাবাজীর আখড়ায়, রায়বাড়ির জলসাঘরে, কলিকাতার চা-খানায় অথবা সীতারামের পাঠশালায় তিনি আটক পড়িবেন না। তারাশঙ্কর শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে লইয়া কোথায় পৌঁছাইয়া দিবেন বলিতে পারি না। তাঁহার নিত্যনব-উন্মেষশালিনী প্রতিভা বাঁধপথে চলিতেছে না, এইটুকুই আমরা বিস্ময়ের সহিত লক্ষ্য করিতেছি।

তাঁহার বহিরঙ্গ জীবনের স্থায়ী কাহিনী খুব দীর্ঘ নয়। সাহস করিয়া সেটুকু আমরা এখনই লিপিবদ্ধ করিতে পারি। ভবিষ্যৎ জীবনীকারের তাহা সহায় হইবে।

১৩০৫ বঙ্গাব্দের ৮ শ্রাবণ (ইংরেজি ১৮৯৮; ২৩ জুলাই) লাভপুরে তাঁহার জন্ম হয়। শৈশবেই (১৩১৩ আশ্বিন মাসে নবমী পূজার দিন) তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। দুই বিধবা নারী—মা ও পিসিমার স্নেহের দ্বন্দ্বের মধ্যে তিনি মানুষ হন। "ধাত্রীদেবতা"র শিবনাথের কাহিনীতে এই দ্বন্দ্বের ইতিহাস আছে। এই দুই বৃদ্ধা এখনও জীবিত।

লাভপুরের উচ্চ-ইংরেজি বিদ্যালয়ে তাঁহার শিক্ষার পত্তন হয়। ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে এই বিদ্যালয় হইতেই প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করিয়া তিনি কলিকাতার সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে আই. এ. শ্রেণীতে ভর্তি হন। কিন্তু কলেজের শিক্ষা বেশিদূর

অগ্রসর হইতে-না-হইতেই রাজনীতি ও সমাজনীতি বিষয়ে স্বাধীন মতামতের জন্ত সে যুগের অত্যুৎসাহী পুলিসের দৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হয় এবং তিনি গৃহেই নজরবন্দী হইয়া থাকেন। ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে যখন এই বন্ধন শিথিল হয়, তখন তিনি পীড়িত দেহ লইয়া আর একবার বিশ্ববিদ্যালয়ের পথে চলিবার চেষ্টা করেন। তিনি কলিকাতা সাউথ সুবার্বান কলেজে (বর্তমানে আশুতোষ কলেজ) ভর্তি হইয়া কয়েক মাসের মধ্যেই শারীরিক কারণে তাঁহার গতানুগতিক শিক্ষা রুদ্ধ হইয়া যায় এবং ১৯১৯ সালে কয়লা-ব্যবসায়ী আত্মীয়কুলের আওতায় কয়লার ব্যবসায় শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন।

সে শিক্ষাতেও তিনি বিশেষ পারদর্শিতা অর্জনের সুযোগ পান নাই! মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ সেখানেও তাঁহাকে স্থানচ্যুত করে এবং তিনি ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে কংগ্রেসে যোগদান করিয়া আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়েন। কিন্তু কবি-শিল্পীর মনে কর্মীর উৎসাহ স্বভাবতই দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না, ১৯২৪-২৫ খ্রীস্টাব্দে আমরা তাঁহাকে ওলাওঠা-মহামারী-আক্রান্ত বীরভূমের উৎসাহী জনসেবক হিসাবে দেখিতে পাই "পথের ডাক" নাটকে এই সময়ের কিছু ছবি আছে।

যে সৃষ্টিপ্রতিভা তাঁহার মধ্যে নীহারিকা অবস্থায় ছিল, এই সময়ে তাহা নির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিতে আরম্ভ করে। সমাজসেবার অবকাশকাল তিনি সকল সাহিত্যিকের প্রথম-উপজীব্য কবিতা-রচনার দ্বারা বিনোদন করিতে থাকেন। তাঁহার এই যুগের কৌতুককর কাব্যসাধনা "ত্রিপত্র" নামক অধুনা সম্পূর্ণ দুষ্প্রাপ্য একটি কাব্যপুস্তিকায় বিধৃত হইয়া আছে, তাহার মধ্যেই বিলুপ্ত হইয়াছে বলিলে আরও ঠিক বলা হইবে।

ওলাওঠা-মহামারীর মতো তারাশঙ্করের জাতের মানুষের সমাজ সেবার উৎসাহও স্তিমিত হইয়া আসে, মন বিষয়ান্তরে ধাবিত হইতে চায়। বয়স বাড়িয়া গিয়াছে। পড়াশুনার ধারা ধরিয়া চলা আর সম্ভব নয়। সুতরাং চাকুরি খুঁজিতে হয়। করিবার মধ্যে নাড়াচাড়া করিয়াছেন কয়লা লইয়া। জমিদারিও বেশ বোঝেন। কিন্তু জমিদারি করিতে হইলে গ্রামের গাণ্ডর মধ্যেই বদ্ধ থাকিতে হয়। সে অসহ্য। সুতরাং স্বল্পপরিচিত কয়লাকে ভেলা করিয়াই তারাশঙ্কর এবার ভাসিলেন, উপাস্থত হইলেন কানপুরে। মাত্র ছয়মাস কাল চাকুরি করিলেন বটে, কিন্তু জীবনে নূতন সুর লাগিল, উচ্ছৃঙ্খলতার সুর, বাঁধন-ছেঁড়ার, শিকল-ভাঙার সুর বলিলে কাব্য করিয়া বলা হয়। ফলে তাঁহার জীবনে বহু-স্নেহলালিত জীবনে দুঃখ আসিল, মাটির পুতুল তারাশঙ্কর পোড় খাইয়া পাথর হইতে লাগিলেন। বিবাহিত জীবন আরম্ভ হইয়াছিল অনেক পূর্বে—১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে মাত্র সতেরো বৎসর বয়সে স্বগ্রামে শ্রীমতী উমা দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। এইবারে সত্যকার সাংসারিক জীবন আরম্ভ হইল। তারাশঙ্কর—পরাজিত নিষ্ফল তারাশঙ্কর কানপুর হইতে লাভপুর ফিরিয়া আসিলেন।

পল্লীগ্রামের উত্তমবিত্ত ও মধ্যমবিত্ত বেকার সমাজে সেদিনও পর্যন্ত নাটকাভিনয়ই একমাত্র সাংস্কৃতিক অবলম্বন ছিল। গ্রামের স্তিমিত জীবনধারা দৈনন্দিন মহড়া ও পর্বকালীন অভিনয়ে সাময়িকভাবে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিত; আবর্তের সৃষ্টি করিত। বেকার তারাশঙ্কর সেই আবর্তে পড়িলেন। কাব্যলক্ষ্মীর পূর্বতন পরিহাসে নাট্যলক্ষ্মী দমিলেন না। ঘূর্ণমান সৃজনী-নীহারিকা এবার নাটকে রূপ পরিগ্রহ করিল।

তারাশঙ্কর "মারহাটা-তর্পণ" নাটক রচনা করিলেন। আদর্শ ছিল ঘরেই। লাভপুরের নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়, কুড়মিঠার হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। নির্মলশিববাবু তখন "রাঙকানা"র খ্যাতিতে ভাস্বর; কলিকাতায় অপরেশ মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত তাঁহার রশ্মি ধাবিত হইয়াছে। তিনিই হইলেন পৃষ্ঠপোষক। "মারহাট্টা-তর্পণ" গ্রামে মহাসমারোহে অভিনীত হইল। তাহার পর বৃহত্তর খ্যাতির অন্বেষণে নাটকের পাণ্ডুলিপি নির্মলশিব-মারফৎ অপরেশ-সমুদ্র পর্যন্ত প্রধাবিত হইয়া গেল। সে নাটকের এইখানেই যবনিকা।

উপন্যাসের সূত্রপাত এই সময়ে। "দীনার দান" নামক ছোট উপন্যাসখানি রচিত হইয়া নির্মলশিববাবুরই সহায়তায় "সাপ্তাহিক শিশির" পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। কিন্তু "দীনার দান" তখন পর্যন্ত দীন-তারাশঙ্করের দান বলিয়া যথাযোগ্য মর্যাদায় গৃহীত হইল না। কালের কুটিল প্রবাহে তাহাও হারাইয়া যায়।

গ্রামের সমাজ-জীবনে তারাশঙ্কর তখন প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতেছেন। বেকার জমিদার যেভাবে গ্রামোন্নয়নে ব্রতী হয় ঠিক সেভাবে নয়। একটু ঘনিষ্ঠভাবে—হাতে-কলমে তিনি কাজ আরম্ভ করিয়াছেন, মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ সম্মুখে, মনেও সৃষ্টির আগুন। ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দ হইতে ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত—তিন বৎসর কাল তিনি গ্রামের কাজে জড়াইয়া পড়িয়াছেন, ম্যালেরিয়া-নিবারণী-বাহিনীর কর্তৃত্ব করিতেছেন। গ্রাম-পঞ্চায়েতের (ইউনিয়ন বোর্ড) মোড়লিও (প্রেসিডেণ্ট) দুই বৎসর করিয়াছেন।

কিন্তু এই আধা-সরকারী জোয়ালে যুক্ত থাকা স্বভাববিদ্রোহী তারাশঙ্করের পক্ষে বেশিদিন সম্ভব নয়। অসহযোগ-আন্দোলনের তৃতীয় ঢেউ আসিতেছে ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে তারাশঙ্কর জোয়াল ছিঁড়িলেন। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টের এই অনাচার স্থানীয় পুলিস-বিভাগের সহ্য হইল না। তারাশঙ্কর ধৃত ও কারারুদ্ধ হইলেন। একেবারে সিউড়ির জেলখানায়। সেখানে মাত্র চার মাসের বসতি তাঁহার জীবনের ধারা সম্পূর্ণ পালটাইয়া দিল। কবি ও শিল্পী তারাশঙ্কর উদ্দেশ্যহীনভাবে লক্ষ্যহীন পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে সহসা যেন পথের সন্ধান পাইলেন। এখনকার পূর্বের সমস্ত অতীত জীবন তাঁহার ভিত্তিনিম্নে আমূল প্রোথিত হইয়া গেল। শুরু হইল নূতন প্রাসাদ গঠন। বাংলা সাহিত্য জয়যুক্ত হইল।

কারা প্রাচীরের অন্তরালে যাঁহারা তাঁহার সহবাসী ছিলেন, তাঁহাদের আদর্শ ও কর্মপদ্ধতি তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই, ক্ষুব্ধ করিয়াছিল। কারা হইতে নিষ্কৃতি লাভের দিন ইঁহারা তারাশঙ্করকে সম্বর্ধিত করিয়া কামনা করিয়াছিলেন, তিনি যেন শীঘ্র প্রত্যাবর্তন করেন। তারাশঙ্কর এই সহৃদয় আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিয়াছিলেন, 'না আপনাদিগকে প্রণাম নিবেদন করিয়া আমি বিদায় লইতেছি। বুঝিয়াছি, নিছক রাজনীতি আমার ক্ষেত্র নহে। যে বঙ্গ ভারতীকে আমি উপেক্ষা করিয়াছি, এবার তাহারই সাধনায় আত্মনিয়োগ করিব মনস্থ করিয়াছি।'

সাহিত্যযশাভিলাষী তারাশঙ্কর সুতরাং এবারে প্রস্তুত হইয়াই ভারতীর প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন। দীনেশরঞ্জন দাশ সম্পাদিত "কল্লোলে" তখন শৈলজানন্দ ও প্রেমেন্দ্র বাংলা কথা-সাহিত্যে নূতন ভঙ্গীর আমদানি করিতেছেন। এই নূতনত্ব

তারাশঙ্করকে আকৃষ্ট করিল। নূতনভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি "রসকলি" গল্পটি রচনা করিলেন। নিজের ভালো লাগিল। তিনি তাহা প্রকাশার্থ পাঠাইয়া দিলেন একটি গতানুগতিক প্রসিদ্ধ মাসিক-পত্রিকায়। সেখানে তারাশঙ্করের নূতন পরীক্ষা সম্বর্ধিত হইল না। সুতরাং তারাশঙ্কর "কল্লোলে"র শরণ লইলেন। "রসকলি" দ্রুত গৃহীত হইল। আরও লেখার প্রার্থনাও দীনেশ দাশ জানাইলেন। কিন্তু বহু আশা লইয়া স্বয়ং তারাশঙ্কর যখন "কল্লোল"-গৃহে দর্শন দিলেন, অতি আধুনিকতায় প্রমত্ত কল্লোলীদল তাঁহাকে সহৃদয়তার সঙ্গে গ্রহণ করিলেন না। ডিম্বকে যথাযোগ্য খাতির করিয়া তাঁহারা হংসকে অনাদর করিলেন। অভিমানক্ষুব্ধ তারাশঙ্কর প্রতিহত হইয়া সম্পূর্ণ বিপরীতস্থানে সাবিত্রী-প্রসন্নের "উপাসনা"য় সাময়িকভাবে আত্মসমর্পণ করিলেন। ইহা ১৯৩১—৩২ সালের কথা। "চৈতালী ঘূর্ণি" ও 'পাষাণপুরী" এই দুইখানি উপন্যাস এই কালের মধ্যে লিখিত ও প্রকাশিত হয়। তিনি তখন মাকুর মতোন কলিকাতা-লাভপুর করিতেছেন। পত্রিকা-সম্পাদক ও পুস্তক-প্রকাশকদের দরজায় দরজায় তাঁহার মাথাটিও কিঞ্চিত ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে।

"চৈতালি ঘূর্ণি" ও "পাষাণপুরী" প্রকাশকালে আশানুরূপ সমাদর লাভ করে নাই। তারাশঙ্কর না যশে না বাসে কলিকাতায় তখনও প্রতিষ্ঠিত হন নাই। প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন "বঙ্গশ্রী" পত্রিকায় ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিয়া। "বঙ্গশ্রী" পত্রিকা ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। ইহার অব্যবহিত পূর্বে সম্পাদক সজনীকান্তের সহিত তারাশঙ্করের পরিচয় হয়। সজনীকান্ত তখন "বঙ্গশ্রী"র লেখা সংগ্রহে তৎপর ছিলেন, কিন্তু তিনি তারাশঙ্করকে উপেক্ষা করিলেন। পোড়-খাওয়া তারাশঙ্করের তখন প্রচুর আত্মপ্রত্যয় জন্মিয়াছে। তিনি স্বয়ং অগ্রসর হইয়া আসিলেন, "শ্মশান-ঘাট" গল্পটি লইয়া। এই গল্পটি স্নেহ-স্মৃতির দিক দিয়া তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনে অক্ষয় হইয়া থাকিবে। তিনি সদ্য শ্মশান-ঘাটের চিতাবহ্নির উত্তাপদগ্ধ—প্রিয়তমা কন্যা বুলুকে চিতায় তুলিয়া দিয়া আসিয়াছেন। খ্যাতির দিক দিয়াও এই গল্পটি স্মরণীয়। "শ্মশান-ঘাট" পরবর্তীকালে—"সন্ধ্যামণি", ইহাকেই তারাশঙ্করের সাহিত্য-সাধনার দ্বিতীয় বা সফল পর্বের "অবতরণিকা" বলা চলে। এখান হইতেই নিরুদ্বেগ-নির্ভয়পথে তারাশঙ্করের জয়রথ ধাবিত হইয়াছে নব নব যশের অন্বেষণে, নব নব খ্যাতির প্রতিষ্ঠায়। অন্য দিকে তাঁহার মাকু-জীবনও সমাপ্ত হইয়া আসিল। তিনি আত্মীয়-গৃহে, পরে কলিকাতার দক্ষিণ প্রান্তে এক টিনের ঘরে বাসা বাঁধেন, তাহার পর বউবাজারের মেস, হ্যারিসন রোডের বোর্ডিং এবং মোহনবাগান রো হইয়া ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার বাগবাজারস্থিত বর্তমান বাসাবাড়িতে শ্রীযুক্ত নির্মলকুমার বসুর সহায়তায় আশ্রয় লাভ করেন। পরবর্তী বৎসরে বরাহনগরে নিজস্ব গৃহ প্রতিষ্ঠা। কিন্তু সে ইতিহাস বর্তমান বর্ষে অতীত ইতিহাস মাত্র। টালার বিস্তৃত ভূমি সংগ্রহ করা সত্ত্বেও তিনি এখনও বাগবাজারের মায়া বা ঘোর কাটাইতে পারেন নাই।

তিনি এই পর্বে রাজনীতির সংস্রব পরিত্যাগ করিলেও আইন এবং শৃঙ্খলার মালিকেরা পূর্বতন খ্যাতিমাহাত্ম্যে অনেকদিন পর্যন্ত তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া-ছিলেন। ইঁহাদের নিবিড় প্রেমপাশ এড়াইবার জন্য তারাশঙ্করকে কলিকাতা বাসের

একটা যুক্তিপূর্ণ কারণ দর্শাইতে হইয়াছিল, তিনি কিছুকালের জন্য "শনিবারের চিঠি"র সহ-সম্পাদকের ভোল গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সজনীকান্তের সম্পাদকত্বে প্রকাশিত "বঙ্গশ্রী"র প্রথম দুই বৎসরের ইতিহাসের সহিত তারাশঙ্করের বঙ্গদেশের চিত্তজয়ের গৌরবময় ইতিহাস অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হইয়া আছে। এই কালের শেষের দিকে "জমিদারের মেয়ে" ধারাবাহিকভাবে "বঙ্গশ্রী"তে বাহির হইতে আরম্ভ হয়। সজনীকান্ত "বঙ্গশ্রী"র সম্পাদকত্বে ইস্তফা দিয়া আসিলে (১৯৩৫, ১৫ জানুয়ারি) তিনিও "বঙ্গশ্রী"র সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করেন এবং "জমিদারের মেয়ে" "ধাত্রীদেবতা"-রূপে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত আকারে 'শনিবারের চিঠি"তে আবার গোড়া হইতেই প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। তারাশঙ্কর তখন লব্ধপ্রতিষ্ঠ।

আজ সাহিত্য ও জীবনের বহু বিভাগে তারাশঙ্কর যশস্বী হইয়াছেন। নাট্যমঞ্চে, ছায়াছবির পরদা গ্রামোফোন-রেকর্ডে সর্বত্রই আজ তিনি বিজয়ী। তাঁহার ছোট গল্প উপন্যাস ও নাটকে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ। এইগুলির প্রত্যেকটির রচনার ইতিহাস আছে এবং এগুলির প্রত্যেকটির মধ্যে তিনি ওতপ্রোত হইয়া আছেন। ভবিষ্যৎ জীবনীকারকে তারাশঙ্করের অন্তরঙ্গ জীবনের ছবি আঁকিবার জন্য এগুলির সাহায্য লইতে হইবে। আমরা সে গভীর গহনে প্রবেশ করিব না।

তারাশঙ্কর মানুষটি সম্পর্কেও আমরা আপাতত নীরব থাকিব। আগেই বলিয়াছি, মানুষটি অতিশয় জটিল। কিন্তু বয়ঃধর্মে জীবনের সার্থকতায় এবং নিত্য নব নব প্রাপ্তির প্রসন্নতায় জটিল মানুষটিও-প্রেমে ও রসে সরল হইয়া আসিতেছেন। মানুষের প্রতি তাঁহার সুগভীর প্রেমের পরিচয় আমরা ক্রমশ পাইতেছি। আশা করিতেছি, তাঁহার সাহিত্যবুদ্ধি প্রেমে স্নিগ্ধ হইয়া তাঁহার জীবনকে মহামহিমায় মণ্ডিত করিবে, প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের (কানপুর, ১৯৪৪) সাহিত্য-শাখার সভাপতি অথবা কলিকাতায় (১৯৪৭) মূলের উদ্বোধক তারাশঙ্করকে আমরা তখন খুঁজিব না। আমরা খুঁজিব রসিক তারাশঙ্করকে, কবি তারাশঙ্করকে।

তারাশঙ্কর কি ভালোবাসেন অর্থাৎ তাঁহার Hobby কি, ইংরেজি মতে এ খবরটা অত্যাবশ্যক। তিনি সর্বপেক্ষা ভালোবাসেন—মানুষ পাইলে গুছাইয়া কথা বলিতে; তাহার পর, আগে ভালোবাসিতেন চাষ-আবাদ গার্ডেনিং (বাংলা খুঁজিয়া পাইলাম না। বাগান শব্দটা প্রয়োগে নৈতিক আপত্তি হইতে পারে); বর্তমানে ভালোবাসিতেছেন নাতিনী-নাতিদের। মাঝে মাঝে তাহাদের অত্যাচার বাংলা সাহিত্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছে, এমনও দেখিতে পাই। গৃহিণী, দুই পুত্র দুই কন্যা ও এক জামাতা লইয়া তারাশঙ্করের দুই পুরুষের সংসার, তৃতীয় পুরুষ তাঁহার উপন্যাস সংখ্যার মতো ক্রমবর্ধমান।

১৩৫৪ বঙ্গাব্দের ৮ শ্রাবণ তারিখে তারাশঙ্কর উনপঞ্চাশের বিপদ উত্তীর্ণ হইয়াছেন। সেই উপলক্ষে তাঁহার সাহিত্যিক, শিল্পী ও সাহিত্যরসিক বন্ধুরা ১০ শ্রাবণ রবিবার নিউ শ্যামবাজার স্ট্রীটের [বর্তমান ভূপেন্দ্র বসু অ্যাভিনিউ] কে. বি. ক্লাব-প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়া তাঁহাকে লইয়া একটি ছোটখাটো ঘরোয়া উৎসব করেন। বাংলা দেশের অনেক খ্যাতিমান কবি ও কথাশিল্পী স্বয়ং অথবা

প্রশস্তিপত্র মারফৎ এই উৎসবকে সার্থক করিয়া তুলেন। প্রশস্তিপত্রগুলি এই প্রসঙ্গে শেষে মুদ্রিত হইল। শ্রীযুক্ত প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কমলাকান্ত পাঠক, নরেন্দ্রনাথ মিত্র ও বাসন্তী রায় নিজেরা উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব প্রশস্তি পাঠ করেন। বক্তৃতা করেন অমল হোম, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল, মনোজ বসু, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, যোগেশ ভট্টাচার্য ও গজেন মিত্র। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় স্বতন্ত্র নির্বন্ধাকারে তাঁহাদের বক্তব্য লিখিয়া পাঠাইয়াছেন তাহাতে এই সঙ্গে (তারাশঙ্কর-প্রশস্তির পূর্বে) মুদ্রিত হইল। প্রথমে শ্রীযুক্ত সুকৃতি সেন এই উৎসবের জন্য রচিত নিম্নলিখিত কথাগুলিতে সুর যোজনা করিয়া গান করেন—

ভালোবাসা দিয়ে বরি বন্ধুরে, প্রেমের গর্বে লই যে নাম,
প্রতিভাদীপ্ত মধ্য-আকাশে ঘাসের ফুলের লও প্রণাম।
প্রসন্ন হাসি ভাসুক এবার
মন্দির ঘর সৌরভভার
মোদের বাসনা কামনা, নিদাঘ দিনের হোক রমণীয় এ পরিণাম।

বন্ধু-কামনা। এই আনন্দ সারা দেশ জুড়ে সবার হোক,
তব কালিন্দী ধাত্রীদেবতা কল্যাণে হোক বিগতশোক
হে কবি, তোমারে করি হে বরণ
গণদেবতার আনো জাগরণ,
মন্বন্তর পার করে দিয়ে নির্ভয় কর পঞ্চ গ্রাম॥

বাংলা দেশের সাহিত্যিক ও শিল্পীগণের পক্ষে সজনীকান্ত দাস পরে এই কবিতাটি পাঠ করেন।

তারাশঙ্কর,

অর্ধেক শতাব্দী ধরি জীবধাত্রী ধরিত্রীর স্নেহ
তোমারে করেছে রক্ষা। মাটিরে করনি অস্বীকার—
এড়াতে পেরেছ তাই সর্বনাশা যুগের সন্দেহ,
ভালোবাসা জয়ী হল। প্রেম হল বন্দী প্রতিভার।
আমাদের দুঃখদৈন্য আমাদের বিক্ষোভ-শঙ্কার
তুমি বার্তাবহ বন্ধু। দিতেছ সার্থক বাণীদেহ—
সর্বহারা, গৃহহারা স্বার্থের সংঘাতে বারম্বার
রচিছে কল্পনা তব, আমাদের ভবিষ্যৎ গেহ।
আমরা কৃতার্থ আজি বন্ধু-তারাশঙ্কর-সোহাগে
একদিন এই নামে ধন্য হবে নিখিল সংসার।
সেদিন সুদূর নহে ঊর্ধ্বে হেরি যশসূর্য জাগে
দিকে দিকে খুলিতেছে বন্ধ যত হৃদয়ের দ্বার
গর্বভরে আজ মোরা দাঁড়াই সবার পুরোভাগে
জীবনের মাঝখানে জানাই তোমারে নমস্কার॥

প্রশস্তিপত্রগুলি পাঠ করেন শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। সর্বশেষে তারাশঙ্কর নিম্নলিখিত ভাষণ দেন—

"আমার পঞ্চাশৎ বৎসর প্রবেশের মুখে আমার সাহিত্য জীবনের গুরুজন বন্ধুজন স্নেহভাজনেরা মিলে আজ সাদরে আহ্বান করে দিলেন যে স্নেহাশীর্বাদ, যে অজস্র-ধারায় প্রীতি, অকপট অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা, তাতে আমার দুই হাতের অঞ্জলি পরিপূর্ণ হয়ে অন্তরের সকল আধারকে ছাপিয়ে আমার চারিপাশে অপরিমেয় সৌভাগ্যের মতো ছড়িয়ে পড়ে গেল। আমার এমন আধার আর নাই, যার মধ্যে সঞ্চয় করে রাখি। আমার অঞ্জলিতে, আমার অন্তরে যেটুকু ধরেছে, তাই আমার অবশিষ্ট জীবনের জন্য পর্যাপ্ত হয়ে রইল, বাকি জীবনপথে চলার কালে পাথেয়ের আমার অভাব হবে না। গুরুজনদের প্রণাম জানাচ্ছি। বন্ধুগণকে অন্তর উজাড় করে প্রীতি নিবেদন করছি স্নেহভাজনদের স্নেহ-আশীর্বাদ জানাচ্ছি ; আপনাদের জয়ে বাংলা সাহিত্য জয়যুক্ত হোক।

অসঙ্কোচে অকপটেই আজ স্বীকার করছি যে, সাহিত্যসাধনার আসরে এসে প্রথম প্রহরে কিছু কিছু গ্লানি এবং বেদনা অনুভব করেছিলাম, ক্রমে ক্রমে তার অনেক অংশ দূরীভূত হলেও কিছুটা যেন যায় নি, সুপ্ত ক্ষোভের মতো অন্তরে লুকিয়ে ছিল। আজ সে সমস্তই ধুয়ে মুছে গেল, আমাকে লজ্জিত করে দিয়ে গেল। মনে মনে বুঝতে পেরেছি যে, সে ক্ষোভ ছিল অহেতুক, আমারই অন্তরের ক্ষুদ্রতা থেকেই তার উৎপত্তি হয়েছিল। আজ আপনাদের ভালোবাসার উদার প্রকাশে আমি ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্তি পেলাম। জীবনের সংশয়কণ্টক এবং ক্ষোভের বন্ধুরতায় বন্ধুর প্রান্তরে আপনারা প্রেমে স্নেহে শ্রদ্ধায় শুভ্র মর্মরে দেবালয় গড়ে দিলেন।

আপনারা বিশ্বাস করবেন, জীবনে সাহিত্য সাধনায় অগ্রসর হয়েছিলাম এসব পাবার স্বপ্ন নিয়ে নয়, আমি এই সাধনায় অগ্রসর হয়েছিলাম অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে। জীবনের প্রথম যৌবন থেকেই দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনের অগ্নি-সাধনার শিখার স্পর্শ পেয়েছিলাম। এ আগুন মনের গহনে লাগলে আর নেবে না। তার সঙ্গে অবশ্য সাহিত্যপ্রীতি ছিল, সাহিত্যকে প্রাণের বস্তর মতোই ভালোবাসতাম ; বিবাহে প্রীতিউপহার লিখতাম, শারদীয় পূজায় আগমনী লিখতাম, আমাদের গ্রাম লাভপুরে স্বর্গীয় নাট্যকার নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়, বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপণ্ডিত হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের সহযোগিতায় মাসে মাসে সাহিত্যসভার আয়োজন করতেন, সেখানে কবিতা পড়তাম। তাঁরা দুজনে সংশোধন করে দিতেন। ওখানে শখের অভিনয়ের আসর ছিল সমৃদ্ধ, অভিনয়ও ছিল বহুপ্রশংসিত, সেখানে অভিনয়ের জন্য নাটকও লিখেছিলাম। সে নাটকখানিকে স্বর্গীয় নির্মলশিববাবু কলকাতায় কোন রঙ্গমঞ্চের অধ্যক্ষের হাতে দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি সেখানি না পড়েই ফেরত দিয়েছিলেন, তার জন্য নাটকখানিকে নিজেই আগুনে সমর্পণ করেছিলাম। কারণ তখন সাহিত্যিক হবার, সাহিত্যসেবা করবার কল্পনাটাই বড় ছিল না। এই কল্পনাকে প্রথম আকৃষ্ট করে বাংলার বিখ্যাত কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ ও শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রের দুটি গল্প। এমনই গল্প লিখবার বাসনায় "রসকলি" গল্পটি

লিখি। বাংলার কোন বিখ্যাত মাসিকপত্রে পাঠাই। কিন্তু বৎসরখানেক ধরে গল্পটি সম্পাদকমণ্ডলীর বিবেচনাধীন থাকায় নাটক-রচনার মতো গল্প-রচনার বাসনারও পরিসমাপ্তি ঘটাবার ইচ্ছায় গল্পটি ফেরত নিই। কিন্তু কি মনে হয়, শেষ চেষ্টা করবার জন্য পাঠাই "কল্লোলে"। স্বর্গীয় দীনেশ দাশকে নমস্কার জানাই, তিনি সঙ্গে সঙ্গে গল্পটি মনোনীত করে নূতন গল্প পাঠাতে অনুরোধ করেন। সেদিন যদি তিনি আমাকে আহ্বান না জানাতেন, তবে এ পথে আমি আসতাম না।

তারপরই এলো উনিশশো তিরিশ সাল। আমার জীবনে তখনও রাজনীতিই ছিল প্রধান। জেলে গেলাম। সেই জেলখানাতেই আমার রাজনৈতিক-জীবন এবং সাহিত্যিক-জীবন এক হয়ে গেল। কারাপ্রাচীরের অন্তরালে হাজার হাজার বাংলার তরুণ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার তপস্যা করে—বন্ধনের মধ্যে মুক্তির তপস্যা। রাত্রে অন্ধকারের দিকে চেয়ে তারই পথ খোঁজে : ঘুমের মধ্যে তারই স্বপ্ন দেখে। প্রিয়জনের মুখ, স্নেহসিঞ্চিত গৃহকোণ তারা যেন ভুলে গেছে। শাসনকে তুচ্ছ করে, অস্ত্রকে ভয় করে না, মৃত্যুর মধ্যে মানস-বধূকে পাওয়ার পরমানন্দকে আস্বাদন করে, এই ত্রাসের কথা—এই হাজার হাজার তরুণের বুকের আগুনের শিখার বিচিত্র রূপকে সাহিত্যের মধ্যে স্থান দেবার কল্পনায় আমার দ্বিধাবিভক্ত জীবন পূর্ণতা লাভ করলে। আমাকে আমি খুঁজে পেলাম। জেলখানার বিদায়-আসরে সেই কথা নিবেদন করে প্রত্যক্ষ রাজনীতির ক্ষেত্রে বিদায় নিয়ে সাহিত্য-ক্ষেত্রে এসে প্রবেশ করলাম। এই সময় আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম সন্তান একটি কন্যার মৃত্যু আমাকে দিয়ে গেল গভীরতম বেদনার অমৃতস্বাদ। মানুষের বেদনাকে আমি যেন বুঝতে পারলাম।

সেই বেদনার মধ্যে আকস্মিকভাবে পেলাম সজনীকান্তকে। কবি শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্নকে নমস্কার জানাই, তাঁকেও স্মরণ করি। তিনিও এর পূর্বে গাঢ় প্রীতির স্বাদ অনুভবের সুযোগ দিয়েছিলেন। "কল্লোলে"র বন্ধুরা আমাকে আসরে ঠাঁই দিয়েছিলেন, কিন্তু অন্তরঙ্গভাবে গ্রহণ করেন নি। তাঁরা হয়তো আমার সঙ্গে কোথাও যেন অমিল অনুভব করেছিলেন, তাঁরা প্রশংসা করেছিলেন, কিন্তু প্রীতি দেন নি। সজনীকান্ত তখন "বঙ্গশ্রী"র সম্পাদক, সহকারী ছিলেন কিরণকুমার রায়। কিরণকুমারের মধ্যস্থতায় সজনীকান্তের সঙ্গে গাঢ় প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হল। অকপটে স্বীকার করব, সজনীকান্ত উৎসাহিত করেছেন, লেখা সংশোধন করে দিয়েছেন, অনেক—অনেক করেছেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলব, রাজনীতি নিয়ে সারাজীবনের এবং সাহিত্যক্ষেত্রের চিরন্তন গণ্ডি সংসারের স্নেহনীড় উপেক্ষা করেছে, প্রেম কামনা বাসনাকে যারা ভুলেছে, তাদের নিয়ে সাহিত্য রচনায় এবং রাজনৈতিক মতবাদের মধ্যে মানুষের জীবনাদর্শের যে বিপ্লব সাধিত হচ্ছে, নূতন জীবনাদর্শের মতবাদকে নিয়ে সাহিত্যরচনায় অন্য সকলের সঙ্গে সজনীকান্তও আমার সম্পর্কে শঙ্কিত হয়েছিলেন। বন্ধুবর প্রবোধকুমারও এ সম্পর্কে আমাকে একটি পোস্টকার্ড লিখেছিলেন। আমি একথার মধ্যে আত্মপ্রচার করছি না। আমার রচনা সম্পর্কে মোহ নেই, এমন কথা আমি বলছি না। তবে সে দাবি নিয়ে আজ আপনাদের সম্মুখে দাঁড়াইনি। সাহিত্যের বিচার হবে কালের

দরবারে। আমি অসঙ্কোচে আপনাদের সম্মুখে দাঁড়িয়েছি ভালোবাসা পাবার আকাঙ্ক্ষায়; আমি আমাদের সমসাময়িকগণের মধ্যে বয়সে জ্যেষ্ঠ সেই দাবিতে। শ্রেষ্ঠত্বের দাবি আমার নয়। এই যুগ অনেক জনের কীর্তিতে সমৃদ্ধ, একক কারও যুগ এ নয়। সাহিত্যিক শিল্পীজনের সম্মান আমাদের জাতীয় জীবনের সচেতনতার কথাটাই ঘোষণা করছে। ভারতবর্ষ স্বাধীনতার প্রথম তোরণ অতিক্রম করছে। ভবিষ্যতে বন্ধুজনের সকলেই সম্মানিত হবেন দেশের কাছে। সমসাময়িকগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ হিসাবে আমিই হব অগ্রণী সেসব আয়োজনের ক্ষেত্রে! আজ মনে হচ্ছে, এই দেশে জন্মলাভ করেছি পরম সৌভাগ্যের ফলে। আমার জীবনসাধনার মূল্য এমন স্নেহ-শ্রদ্ধায়-ভালোবাসায় পেয়ে জন্মকে সার্থক বলে মনে করছি। সম্মান নয়, যশ নয়, ভালোবাসাই মানুষের জীবনের পরম কামনার ধন। যাঁরা আমাকে সেই পরম সম্পদ এমন অজস্রধারে দিলেন, তাঁরা হয়ে রইলেন আমার কাছে জীবনদেবতার দূত। যাঁরা দেন, তাঁরাই তো দাতা, আমি তো গ্রহীতা। আপনাদের দানে আমি ধন্য, আমি কৃতজ্ঞ, আমার জীবনের সকল দীনতাকে আপনারা মোচন করে দিলেন। আপনাদের আমি প্রণাম জানাই, দান গ্রহণকারী পরিপূর্ণ চিত্ততার যে অধিকারে আশীর্বাদ জানায়, সেই অধিকারে আশীর্বাদও জানাই, আপনারা জয়যুক্ত হউন, পরম সম্পদে ভরে উঠুক আপনাদের জীবন, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে জয়যুক্ত হোক সাহিত্য শিল্প দেশ ও জাতি। বন্দে মাতরম।"

সবশেষে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার উদ্বোধন-সঙ্গীতের একটি প্যারডি করিয়া সুরসহযোগে গান করিলে আনন্দ ও জয়ধ্বনির মধ্যে সভা সমাপ্ত হয়। নলিনীকান্তের মারাত্মক হাসির গানটা এখানে নথিভুক্ত হইল।

গর্ব তোমার কোথায় বন্ধু, খর্ব হতেছে তোমার নাম।
মাথা কাটা গেছে, ঠ্যাং কাটা গেল—কোথায় আশিস্ কোথা প্রণাম?
আপনার হাতে ধার তরবার,
শ্রীসম্পদ তব করেছ সাবাড়।
সম্প্রতি কাটা বাঁড়ুজ্জেটাও—বড় শোচনীয় এ পরিণাম!
যেটুকু রয়েছে সেইটুকুই নিয়ে পাব্লিশারেরা চকিত চোখ,
তব "কালিন্দী" "ধাত্রী দেবতা"—কল্যাণে তারা বিগত শোক।
সকলে মিলিয়া করিছে দোহন
সজনী গজেন, মনোজমোহন,
তুমি কামধেনু ভরাইছ কেঁড়ে পাথার করিয়া মাথার ঘাম।

আজ তারাশঙ্করের জন্মোৎসবে যোগ দিতে পেরে আমি গৌরব অনুভব করছি। তারাশঙ্করকে আমি অনেকদিন থেকেই জানি, দশ-পনেরো বছর আগে বন্ধুবর রমেশ সেনের আড্ডায় তার প্রথম পরিচয় ঘটে। তারপর মাঝে মাঝে তার সঙ্গে দেখা হত। তখন আমিও কলকাতার অধিবাসী। কিন্তু ভালো করে তখন তাকে জানতাম না, কলকাতায় বহু পরিচিত ও অর্ধপরিচিতদের ভিড়ের মধ্যে সেও একজন।

সে সময়ের একটি কথা আমার বেশ মনে আছে। তখন তারাশঙ্করের "রাইকমল"

বেরিয়েছে এবং অনেকের মুখে মুখে বইখানার সুখ্যাতিও ছড়িয়েছে। এক বর্ষার দিনে একখণ্ড "রাইকমল" যোগাড় করে দেশের বাড়িতে দুদিনের কিসের একটা ছুটিতে বেড়াতে গেলাম। একা বসে নির্জন ঘরে "রাইকমল" পড়তে আরম্ভ করলাম সন্ধ্যার পরে। অনেক রাত্রে বইখানা শেষ হল। তখন জানলা দিয়ে বাইরের জোনাকি-জ্বলা বাঁশ বাগানের দিকে চেয়ে আমার মনে হল, সাহিত্যে একটি নতুন সুরের সন্ধান পাওয়া গেল এই বইয়ের মধ্যে। এক অজানা জগতের সঙ্গে নতুন পরিচয়ের আনন্দ। বীরভূমের মাটির গন্ধ পেলাম বইয়ের ছত্রে ছত্রে। আমার মনে আছে, দেশের লাইব্রেরিতে বইখানা আমি দিয়ে সকলকে বলেছিলাম, বইখানা পড়ে দেখ, নতুন জিনিস পাবে।

কিন্তু তারাশঙ্করকে ভালো করে জানলাম আজ বছর চারেক আগে, কানপুর প্রবাস-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনে একই ট্রেনের কামরায় আমরা যাই এবং আসি, কানপুরে একই ঘরে আমরা তিনদিন বাস করি। তারাশঙ্করের মধ্যে যে সহজ, সরল ভদ্র, অমায়িক ও সুরসিক লোকটি বাস করে, তাকে আবিষ্কার করলাম ওই কয়দিনে। অনেক লোকের সঙ্গে এর চেয়েও বেশি দিন একত্র বাস করেছি, কিন্তু এমন নিবিড় আত্মীয়তা কারও সঙ্গে হয়নি। এমন আনন্দজনক বন্ধুত্ব কারও সঙ্গে গড়ে ওঠেনি। একথাও বলব, মনকে স্পর্শ করবার এই যে ক্ষমতা, তারাশঙ্করের মধ্যে এর যে প্রকাশ ওই কদিনে আমি মনেপ্রাণে অনুভব করেছিলাম। অনেক হাজারের মধ্যে তা এক-আধজনেরই থাকে। তারাশঙ্করের বন্ধুত্বলাভ আমার জীবনের একটি দুর্লভ ঘটনা।

যশোর জেলার অধিবাসীদের পক্ষ থেকে আমি তারাশঙ্করকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি তার শুভ জন্মদিনে। বহুদিন ধরে এই দিনটি বার বার ফিরে আসুক। সে শত শরৎ পরমায়ু নিয়ে বঙ্গবাণীর দেউলকে দিন দিন নবতর অর্ঘ্যে মণ্ডিত করুক, দেশ ও জাতিকে নতুন পথের নির্দেশ দিয়ে চলুক তার জয়শ্রীমণ্ডিত লেখনী।

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ যে শুধু তারাশঙ্করের সাহিত্যিক ও শিল্পী বন্ধুরা তাঁকে অভিনন্দন জানালেন বা অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র বাংলা তথা ভারতের মনীষীরা অভিনন্দন জানাবেন, সেইটাই তো বড় কথা নয়, আজ রসিক অরসিক নির্বিশেষে বাংলা দেশের সমস্ত পাঠক সাধারণের কণ্ঠ থেকেই স্বতঃ-উৎসারিতভাবে তাঁর উদ্দেশ্যে অভিনন্দন উচ্চারিত হচ্ছে, আমাদের চেনা ও জানায় বাইরে লক্ষ হৃদয়ের প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিরন্তর প্রার্থনা করছে, তারাশঙ্কর শতায়ু হোন, শতাধিকায়ু হোন। এ যেমন আমাদের ভরসা, তেমনই আশা ও গর্বেরও কারণ বটে।

আশা এই জন্য যে, অনাগত দিনের যে সব সহায় সম্বল-হীন নিঃসঙ্গ তরুণরা এই পথে আসবেন, তাঁদের পক্ষে মস্তবড় সান্ত্বনা হয়ে রইল তারাশঙ্করের সাফল্যের এই ইতিহাস।

তারাশঙ্কর আজ সকলের উর্ধ্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন নিজের শক্তি এবং নিষ্ঠার জোরে। চুম্বক যেমন লোহাকে টানে বৈদ্যুতিক শক্তির জোরে, সূর্য যেমন সমস্ত জলাশয় থেকে বাষ্প আহরণ করেন নিজের অমিত তেজে, তেমনই করেই

তারাশঙ্কর আজ সমস্ত দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা নিজের দিকে টেনে আনতে পেরেছেন শুধু মাত্র নিজের ক্ষমতায়, সাহিত্যিক প্রতিভা ও চিন্তাশীলতার জোরে।

—শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

১৯৩৮ সাল। মফস্বলের মুখচোরা ছেলে নতুন কলকাতায় এসে পোস্ট গ্রাজুয়েটে ভর্তি হয়েছি। এই সময় একদিন নার্ভাসভাবে "শনিবারের চিঠি"র আখড়ায় বসেছিলাম। হঠাৎ চমকে উঠলাম সজনীদার কণ্ঠস্বরে, নারাণ; এঁকে চেনো? ইনি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

মফস্বলের ছেলের সর্বাঙ্গ শির শির করে শিউরে উঠল। লক্ষ্যই করিনি, ঘরে কখন একটি নতুন লোক এসে ঢুকেছেন। খালি গা, গলায় মালার মতো করে সাদা ধবধবে পৈতা জড়ানো, পৈতের সঙ্গে গোটা দুই মোটা মোটা আংটি দুলছে। পুরু চশমার আড়ালে দুটি চোখে উজ্জ্বল দৃষ্টি।

আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। তখন "শনিবারের চিঠি"তে তাঁর "ধাত্রী দেবতা"র জন্যে মাসের-পর-মাস প্রতীক্ষা করে থাকি। "চৈতালী ঘূর্ণি", "নীলকণ্ঠ", "পাষাণপুরী" এবং অন্যান্য ছোট গল্প পড়ে এই লোকটি সম্পর্কে আমার শ্রদ্ধা আর কৌতূহলের অন্ত নেই। এ-হেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় খালি গায়ে পৈতের সঙ্গে আঙটি জড়িয়ে আমার সামনে আবির্ভূত। এ কি বিশ্বাস করা সম্ভব?

বাংলা সাহিত্যে তারাশঙ্করের আবির্ভাবের মধ্যেও যেন এই বিস্ময়ের চমক আছে।

"কল্লোল"-"কলিকলমে"র পাতায় যে বিদ্রোহ একদিন বাংলা সাহিত্যকে সব দিক দিয়ে ভাঙনের প্রেরণা দিয়েছিল, সে বিদ্রোহ ধোপে টিঁকল না। বুদ্ধি-জীবীর সাহস এবং ইন্টেলেক্ট্-বিলাশের আশ্রয়ে যে বিপ্লবের স্বপ্ন "কল্লোলে"র লেখকেরা দেখেছিলেন। সে বিপ্লববোধ হয়ে রইল নিছক ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং সঙ্কীর্ণ। শেভিয়ান নায়িকাকে এঁরা কল্পনা করলেন বাঙালীর ঘরে। বস্তির মজুরদের দিকে তাকিয়ে তাদের যৌন-বিকৃতিকেই এঁরা সবচেয়ে বড় সমস্যা বলে ধরে নিলেন এবং বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদেই এঁরা শুনলেন "ভুখা ভগবানে"র আর্তনাদ। উপযুক্ত সমাজ চেতনার অভাবে এঁদের বিদ্রোহ-বুদ্ধি অবদমনের দেওয়ালে মাথা ঠুকে মরল, দেশকে সত্যিকারের কিছু দিতে পারল না।

অথচ, এঁদের চাইতে দেশকে অনেক বড় করে দেখেছিলেন শরৎচন্দ্র। পল্লী-সমাজের জন্যে তাঁর চোখ দিয়ে যে জল পড়েছে, তার সঙ্গে মিশে রয়েছে তাঁর বুকের রক্ত। তাঁর অসার্থক নায়িকা কমল "কল্লোল"-পন্থীদের চাইতে আরও এক ধাপ এগিয়ে সমাজের সমস্ত কিছুকে নাড়াচাড়া দিতে চেয়েছে নিষ্ঠুর হাতে। তাঁর সব্যসাচী দেখেছে সমস্ত দেশ জুড়ে এক অগ্নিস্রাবী মহাবিপ্লবের জ্বলজ্জ্যোতিরূপ—সেই অগ্নিতাণ্ডবে পরাধীনতার নাগপাশ পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

কিন্তু "পল্লীসমাজ" কমল আর সব্যসাচীর মধ্যগত যে একটি ঐক্যসূত্র রয়েছে, এঁরা আসলে যে একটি বস্তুরই সব বিচ্ছিন্ন রূপ, শরৎচন্দ্র তা ধরতে পারেন নি; উপযুক্ত সমাজ-চৈতন্য তাঁর সহায়ক ছিল না। তাই সব্যসাচীর মতো বিপ্লবীর কল্পনা সত্ত্বেও শরৎচন্দ্র শুধু প্রশ্নই জানিয়ে গেলেন, উত্তর দিতে পারলেন না।

বাংলা সাহিত্যে বিচ্ছিন্নভাবে তখন প্রচুর উপকরণ ছড়িয়ে পড়ে ছিল।

এগুলির সমন্বয় এবং সামঞ্জস্য বিধান করতে পারলে শুধু "কল্লোল"-পন্থীদের বিদ্রোহই পথ খুঁজে পাবে না, সেই সঙ্গে বর্মার বিপ্লবী নেতা সব্যসাচী এগিয়ে এসে বাংলার পল্লী-সমাজের গ্লানিগ্রস্থ ঘুণধরা জীবনকেও উদ্বুদ্ধ করে তুলবে নব-জীবনের দিকে, এটা কারও কাছেই তখন স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। অথচ সেই সময় এমন একজন শক্তিমানের আবির্ভাব প্রয়োজন ছিল, যিনি এই বিক্ষিপ্ত উপকরণগুলোকে বিচার করে এবং সংহত করে পরিপূর্ণ যুগ-সাহিত্য গড়ে তুলতে পারবেন। এই যুগের দাবি মেটালেন তারাশঙ্কর। তাই বাংলা সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাব চমকপ্রদ হলেও তিনি অনিবার্য।

তারাশঙ্কর রচনায় বহন করে আনলেন শরৎচন্দ্রের ঐতিহ্য; শৈলজানন্দের ধারায় কয়লা কুঠির অন্ধকারে কিংবা ময়ূরাক্ষী আর কোপাইয়ের ম্লান ছায়ায় পেলেন এক বিস্তীর্ণতর জীবন-জিজ্ঞাসা; এই জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে সব্যসাচীর বিপ্লবী সঙ্কল্প। এই ত্রিবেণী-সঙ্গমেই গড়ে উঠল তারাশঙ্করের সাহিত্য। বিশ্বব্যাপী যুগ সন্ধির আঘাতে-সংঘাতে তাঁর প্রতিভার ক্রম-বিকাশ। জরিষ্ণু সামন্ততন্ত্রের বেষ্টনী-প্রযুক্ত হয়ে তাই তিনি চলিষ্ণু সমাজতন্ত্রের সহযাত্রী।

তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠতার মর্মতত্ত্বও এইখানে। তিনি চিন্তা বিলাসী আকস্মিক বিপ্লবী নন। স্তরে স্তরে, চিন্তিত প্রত্যয়ের দৃঢ়পদপাদে তিনি অগ্রসর। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যেই তাঁকে বুঝতে এবং বিচার করতে হবে। তাঁর যে প্রশ্ন-কাতর মন পাষাণপুরীর লোহার গরাদে অসহায়ভাবে মাথা ঠুকেছে কিংবা নীলকণ্ঠের বিষজ্বালায় জর্জরিত হয়ে গেছে, সেই মনই এসে "ধাত্রী দেবতা"র "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রে আশ্বাস খুঁজে পেয়েছে। সে মন আরও অগ্রসর হয়েছে "কালিন্দী"তে—যন্ত্রবাদের সঙ্গে সামন্তবাদের সংঘাত উপলব্ধি করে তিনি "গণদেবতা"র দেবায়তনে এসে পৌঁচেছেন। দেবু পণ্ডিত। পণ্ডিত সীতারামের ভেতর দিয়ে একটির-পরে-একটি আলো জ্বলে উঠেছে তাঁর দৃষ্টির সামনে আর সেই আলোর দীপালীতে ঝলমল করে উঠেছে তাঁর আধুনিকতম সৃষ্টি এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি "হাঁসুলী বাঁক"। এই "হাঁসুলী বাঁকের উপকথা" বলতে গিয়ে তারাশঙ্কর শুধু "বাঁশবাদি"র কাহারদেরই ফুটিয়ে তোলেন নি—ব্রাত্য, মন্ত্রহীন ভারতবর্ষে যুগান্তরের দোলা যেন রূপকচ্ছলে এতে আত্মপ্রকাশ করেছে।

শুধু বিস্তীর্ণ পটভূমিকা, শুধু গ্রামীণ সংস্কৃতির সঙ্গে অকুণ্ঠ অন্তরঙ্গতা, শুধু রাজনৈতিক চেতনা—এগুলিই তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় নয়। বিপ্লবের বিভিন্ন প্রবাহগুলি তাঁর রচনায় সমাবিষ্ট হয়ে একটা পরিপূর্ণ যুগ-সাহিত্যের মূর্তি গ্রহণ করেছে। এইটেই তাঁর সব চাইতে বড় সাফল্য। যুগস্রষ্টা হয়তো তিনি নন, কিন্তু চলমান যুগের তিনি সার্থক কাহিনীকার এবং গণ-সাহিত্যের নির্ভীক অগ্রদূত। —শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

তারাশঙ্কর-প্রশস্তি

আগামী ২৫শে জুলাই আমার কল্যাণীয় ও প্রিয় তারাশঙ্কর ভায়ার পঞ্চাশৎ জন্মদিন। সেই উপলক্ষে ২৭শে জুলাই আনন্দোৎসবের অনুষ্ঠানে উপস্থিতির অনুরোধ জানিয়েছ। এর কি আর বলবার অপেক্ষা ছিল, এর সবটাই যে আমার

প্রাণের প্রতিধ্বনি. না গিয়ে থাকতে পারতুম না। কিন্তু আমার এখন এটা যে সত্যিকার বাঁচা নয়, দুঃখ ভোগের জন্যে কেবল দেহটা আছে। শক্তর-ভায়াকে পত্র লেখা পর্যন্ত বন্ধ করেছি। কারণ দু-কথায় পত্র লেখায় আমি কোনদিন অভ্যস্ত নই; প্রাণের কথা উজোড় করে না লিখে স্বস্তি পাই না। দু-কথায় 'কেমন আছ' জানবার শক আমার নেই, তার চেয়ে না লেখাই ভালো। চিরদিন বাজে কথা নিয়েই আমার কাজ বা আনন্দ ছিল। কাজের কথা কোনদিন আসে নি, আসেও না। এখন প্রিয়দের বিরক্ত করা আপনিই থেমেছে।

পরম শ্রদ্ধাভাজন শ্রীমধুসূদন ও ভূদেবচন্দ্রকে নমস্কার করে সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে আমার তিন যুগই দেখা হল। বাংলা ভাষাই বলতুম। বঙ্কিমচন্দ্র একটা অভিনব সুর কানে ও প্রাণে পৌছে দিতে লাগলেন, সাহিত্যের সূত্রপাত হল, সাহিত্য কথাটি শুনলুম। তার সূক্ষ্ম রস রসিকেরা অনুভব করতে লাগলেন, বাঃ কি প্রাণস্পর্শী ভাষাবিন্যাসের কারিগরি, প্রকাশের কি মধুর ভাব! তখনও ঠিক বুঝি নি, কিন্তু আনন্দ পাই। রসমাধুর্য পাঠের মোহ বাড়ায়, "বঙ্গদর্শন" কবে আসবে তার প্রতীক্ষায় থাকি। অক্ষয় সরকার, দীনবন্ধুকে খুঁজি। "আর্য-দর্শনে" যোগীন বিদ্যাভূষণ আমাদের অবস্থা ও দেশের কথা ওজস্বিনী ভাষায় শোনান। বয়সের নেশায় তাও ভালো লাগে। লেখক প্রধানেরা প্রায়ই ডেপুটি। সেটাকে ডেপুটির যুগও বলা যেতে পারে।

মাইকেল চলে গেলেন, হেম বাঁড়ুজ্জে কবি প্রধান—জাতীয় কবি। পরে ডেপুটি নবীন সেনের "পলাশীর যুদ্ধ" আমাদের মাতিয়ে দেয়। সাহিত্য রসের সঙ্গে বীররস পেলুম। বঙ্কিমের "আনন্দমঠে" পট-পরিবর্তন।

অনেক পরে শরৎবাবুর আকস্মিক প্রকাশ। "যমুনা"য় তাঁর "রামের সুমতি" "বিন্দুর ছেলে" সকলকে চমকে দিলে। যুগ বদলে গেল। সাহিত্য রস এসে গেছে, দেশের কথা সাড়া দিয়েছে। এবার পল্লীসমাজের অবগুণ্ঠন মোচন চলল। শরতের অপূর্ব লেখনী সমাজের আবর্জনা দেখাতে আরম্ভ করেছে, কেউ চটছেন, কিন্তু সাহিত্যের জয় রোকে না। সাহিত্য বেড়ে চলল। তার দায়িত্ব সম্বন্ধে শরৎ ছিলেন অটল। প্রায় একই সময় প্রমথ চৌধুরীর অভিনব ব্যঞ্জনারীতি সাহিত্যকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করেছে।

এখন বর্তমানের কথা। ইতিপূর্বে আমরা সাহিত্যোদ্যানে বাগান আলো-করা পদ্ম গ্রাণ্ডিফ্লোরা পেয়েছি যা শোভায় সৌন্দর্যে ও সুগন্ধে তুলনাহীন। কিন্তু বর্তমান আমাদের সাহিত্যোদ্যানকে বিবিধ বা নানা উল্লেখযোগ্য ফুলে সাজিয়ে দিয়েছে, যা এক যুগে প্রায়ই দেখা যায় না, যা যে-কোন সভ্য দেশের গর্বের বস্তু। এখন আমার কোন কথা মনে থাকে না, আত্মীয়-স্বজনের নামও ভুলে যাই, সুতরাং নাম করতে পারব না, সে সাহস রাখতে আমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ! তবে বলতে পারি, আমার শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার হতে আরম্ভ করে ১০।১৫ জন সুসাহিত্যিকের নাম করতেই হয়, যাঁদের কবিতা, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, নাটক প্রভৃতি পাবার জন্যে পাঠক মাত্রেই উদ্‌গ্রীব থাকেন। তাঁরা সকলেই বাংলার কৃতী সন্তান। এতগুলি শক্তিমান সাহিত্যিক এক যুগে পাওয়া বহু ভাগ্যের কথা। তাঁদের কাজে কাছে আমার দুঃস্থ দেশ অনেক আশা রাখে। তাঁরাও নিশ্চিন্ত নন।

স্থান-কালের গণ্ডির মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে আনা যায় না বলেই তাঁর কথা উল্লেখ করি নি। সাহিত্যের প্রথম যুগেই তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের বরমাল্য লাভ করেছিলেন। দ্বিতীয়ে ও তৃতীয়ে তিনি সে মাল্যের মর্যাদা মণি-মুক্তায় মণ্ডিত করে গেছেন। তাঁর জ্যোতিতে সাহিত্য জগৎ জ্যোতির্ময়। বাংলা ও বাঙালী আজ ধন্য।

আজ যাঁর জন্মবাসরে এই আনন্দ-আসরের অনুষ্ঠান, তিনি আমার বিশেষ পরিচিত। আমি একবার তাঁদের গ্রাম—লাভপুরে ৺নির্মলশিববাবুর অতিথি-রূপে যাই। অনেকেই দেখা করতে আসেন, তারাশঙ্কর ভায়াকেও পাই। তাঁর আনন্দ উৎফুল্ল উৎসাহপূর্ণ বদন আমাকে আকৃষ্ট করে। কে এ যুবকটি? গ্রামের একজন আমার পাশেই ছিলেন, তিনি নিম্নকণ্ঠে একটা বিরুদ্ধ মন্তব্য করেন, তারাশঙ্কর সম্প্রতি জেল থেকে বেরিয়েছেন। সেটাকে যেন তুচ্ছ করবার বাহাদুরি। কথাটা আমার ভালো লাগে নি, বলে ফেলেছিলুম, লাল পাগড়ি দেখলে আমরা কাল মনে করে কাঁপি, সে মিছে ভয়টা যদি ওরা ভেঙে দেয়, মন্দ কি? আমি তো দেখছি, লেখাপড়া-জানা ছেলেরাই জেল থেকে বেরুচ্ছে। থাক্, সে অবান্তর কথা বাড়াব না। তারাশঙ্করের কাছে আমরা যা পেয়েছি ও পরে পাবার আশা রাখি, তা আমাদের সাহিত্যকে যথেষ্টই দিয়েছে ও দেবে। তারাশঙ্করের লেখায় তাঁর রাষ্ট্রীয়-চেতনা ও পল্লীগ্রাম ও পল্লী-জীবনের প্রতি আন্তরিক টান বিশেষভাবে নজরে পড়ে। পল্লীগ্রামের কত অজানা কথা। কত নীরব সত্য। কি সুন্দর সুপাঠ্যভাবে তার লেখনী-সাহায্যে প্রকাশ পেয়েছে। তারা কেবল উপন্যাস পাঠের আনন্দই দেয় না। পল্লী-ইতিহাসের ভাবী লেখকদের সাহায্যও করবে। আমার মতো পল্লীগ্রামের ছায়া শীতল কোলে জন্মগ্রহণ করে ভাগ্যক্রমে যাঁরা তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন তাঁদের কাছে এ লেখার বিশেষ মূল্য আছে। বাংলার ভাগ্য বিপর্যয়ের ভীষণ সময়ে শঙ্কর ভায়ার মতো যাঁরা সাহিত্যের ভিতর দিয়ে দেশ-সেবার কঠিন ব্রত গ্রহণ করেছেন, দেশের ভাবধারাকে সকল সঙ্কীর্ণতার উর্দ্ধে সর্বসাধারণের কল্যাণের পথে পরিচালিত করে, তাঁরা সে ব্রতের উদযাপন করুন—এই প্রার্থনা করি।

প্রিয় ও কল্যাণীয় তারাশঙ্কর সুস্বাস্থে দীর্ঘজীবী হয়ে সাহিত্যসেবায় মগ্ন থাকুন, যশস্বী হোন—এই শুভকামনা জানাই।

—শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীমান তারাশঙ্করের প্রতিভার সমাদর করিবার জন্য তোমরা যে আনন্দ উৎসবের অনুষ্ঠানে ব্রতী হইয়াছ, তাহাতে আমি অপর কাহারও অপেক্ষা কম পুলকিত নহি। শ্রীমান তারাশঙ্কর আমার একান্ত প্রাণের। তাহার চরিত্র-মাধুর্যে ও উপন্যাস লিখন ভঙ্গীতে আমরা সকলেই মুগ্ধ। দেশ যে যোগ্যজনের আদর করিতে শিখিয়াছে, ইহা অতি আশার লক্ষণ। ইহা ভবিষ্যৎ লেখকদিগকে অনুপ্রেরণা দান করিবে। আমি উপস্থিত হইয়া শ্রীমান তারাশঙ্করকে সম্বর্ধনা করিবার সুযোগ পাইলে সুখী হইতাম। কিন্তু বার্ধক্য ও ব্যাধি একযোগে আমাকে বঞ্চিত করিল। ইতি—

—শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

তোমার কল্পনালোক
অপরূপ আমি তাহা চিনি,
বসতি করেন সেথা
শিব সাথে শিবসিমন্তিনী।
কোথাও ডম্বরু বাজে,
কোথা শুনি মহোক্ষের স্বর।
অহি নাচে শিখী সনে,
সিংহ নাড়ে কনক কেশর।
শঙ্খ ও শিঙার সাথে
কি অপূর্ব বেণু বীণারব।
তৃতীয় আঁখির দৃষ্টি
সুন্দরের বসায় উৎসব।
সুলভে দুর্লভ ক'রে
লৌকিককে করে অলৌকিক।
ভস্মেতে বিভূতি আনে
আনন্দেতে ভাসে দশ দিক
তুমি যে সার্থকনামা
অগর্বিত হে তারাশঙ্কর।
শত জীবী হও তুমি
রাজরাজেশ্বরী দিন বর।

—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

একদা সরস ছিল যে রাঢ়ের মাটি
সারা দেশ তার পেয়েছিল রস খাঁটি।
শুকায়ে উষর সে মাটি হইল ক্রমে,
এবে জীবন্ত কঙ্কাল তায় ভ্রমে।
সে মাটিতে পুন রস সন্ধান
পাইয়াছ তুমি হে গুণি ভাগ্যবান্।
সেই রসধারা বিলালে গৌড়জনে,
তোমার বাণীতে ফিরে পাই হারাধনে।
ও মাটির খাঁটি মালিক যাদের জানি,
শুনি ও-কণ্ঠে তাদেরি প্রাণের বাণী।
শুনি ও-কণ্ঠে অজয়ের জয়গান,
কিরাতদুহিতা কালিন্দী-কলতান।
ময়ূরাক্ষীর স্বচ্ছ চাহনিখানি
তব জয়পথে হইয়াছে হাতছানি।
রসসাধকেরে আদি কবিদের দেশে
তোমার মাঝারে পাইলাম নববেশে।

জানি জানি সখা কোথা পেলে রসকূপ,
সে রসেরে দিতে পারি নাই বাণীরূপ।
তোমা পানে তাই অবাক হইয়া চাই
আমার আকৃতি তোমার ভাষণে পাই।
তুমিই সহিলে স্রষ্টার ব্যথা সবি
পূরা আনন্দ উপভোগে আমি লভি।
অর্ধশতে এ তোমার অর্ধোদয়,
শতদলে যেন জীবন পূর্ণ হয়।
অর্ধজীবন সংগ্রামে কাটিয়াছে,
বাকি অর্ধেক স্বাধীন বঙ্গ যাচে।
রাখিয়াছ মোর রাঢ় বঙ্গের মান,
করি তোমা তাই স্নেহালিঙ্গন দান।

—শ্রীকালিদাস রায়

(১)

আপন মানস-সৃষ্ট পাত্র-পাত্রী-মুখে
শতাব্দীর ইতিহাস যাঁদের রচনা,
যাঁদের ঘেরিয়া মহাকাল স-কৌতুকে
শতাব্দীর ইতিহাস করেন যোজনা,
তুমি তাঁহাদেরি একজনা।

(২)

আজি অর্ধ শতাব্দীর পথে
তোমারে দেখিয়া গেনু,
আশিস করিনু দান—
শতাব্দী সার্থক কর বাণী সেবা-ব্রতে।

—শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

আমি কাহারও (যাহাদিগকে স্নেহ করি ; যাহাদের দীর্ঘায়ু কামনা করি) পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়ঃক্রম হইয়াছে শুনিলে কেমন একটা বিষাদ ও আশঙ্কা বোধ করি। ওটা অতিশয় অযুক্তিযুক্ত তাহা মানি, কিন্তু ওই পঞ্চাশ বৎসরটাকে আমি ভয় করি। যতদিন তোমরা চারের কোঠায় আছ, ততদিন নিশ্চিন্ত থাকি, অনেক আশা ও ভরসা করি ; কিন্তু পঞ্চাশের পরেই আয়ুসূর্য চলিয়া যায়, তার পরে যত বৎসর বাঁচি না কেন, সে যেন দাবি নয়, একটা অনুগ্রহ। তাই যদিও আমি তোমার 'শত-শরৎ' আয়ু কামনা করি, তোমার প্রতিভা আরও দৃঢ়সার ও পূর্ণপরিণত হোক এই প্রার্থনা করি, তথাপি এই পঞ্চাশৎ-বর্ষটিকে দৃষ্টির আড়ালে রাখিতে চাই। তোমার শক্তি এখনও অক্ষুণ্ণ আছে, তাহার প্রমাণ আমি পাইতেছি, এবং বর্তমান কালের কথাশিল্পীগণের মধ্যে তুমিই যে অগ্রগণ্য, ইহা আমার নিজস্ব বিশ্বাস। আমি আশা করি, তুমি তোমার ওই শক্তির দ্বারা বাংলা ও বাঙালীর

আত্মাটিকে আরও গভীর এবং আরও সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত কর। তোমার পঞ্চাশতম জন্মদিনে ইহাই আমার প্রাণের কামনা ও আশীর্বাদ।

—শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

তারাশঙ্করের বয়েস হল পঞ্চাশ বৎসর। যৌবনাগমের মতোন এই বয়সটিও মানুষের পক্ষে সাংঘাতিক। যিনি এই বয়সে পৌঁছলেন এবং যাঁরা যাঁরা তাঁর চারপাশে রইলেন, উভয়ের পক্ষেই সময়টি সাংঘাতিক বিবেচিত হওয়ায় শাস্ত্রকারেরা এক পক্ষকে সংসার থেকে দূরে থাকতেই ইঙ্গিত করেছেন। কিন্তু এখনকার দিনে লোককে কষ্ট করে আর বনে যেতে হয় না, এ বয়সে পৌঁছলে অধিকাংশ লোকই ত্রিভুবন অরণ্যময় দেখতে থাকেন—চারপাশে যারা থাকেন, নেহাৎ মোটা রকমের কিন্তু সম্ভাবনা না থাকলে, সকলেই এই বাহুল্যটিকে বর্জন করতে চান—কেউ বা মনে, কেউ বা প্রকাশ্যেই।

কিন্তু এ হল সাধারণ ব্যক্তিদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা। যাঁরা অসাধারণ, তাঁদের জন্য নিজের গৃহকোণে প্রতিদিন 'শুদ্ধি'র ব্যবস্থা থাকলেও, সমাজের ব্যবস্থা অন্যরকম। এঁরা কেউ এ বয়সে পৌঁছলে কুলোর পরিবর্তে মালার ব্যবস্থা করার রীতি প্রচলিত আছে। তাঁর দানের প্রতিদানস্বরূপ সমাজ সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে এই বয়সে তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানায়, বিশেষরূপে অভিনন্দিত করে তাঁকে প্রতিষ্ঠা দেয়। উভয়ের পক্ষেই এই দিনটি একটি বিশেষ দিনরূপে গণ্য হয়।

আমাদের বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও তারাশঙ্কর অসাধারণ ব্যক্তি। তাই তাঁর পঞ্চাশ বছর বয়সে তাঁকে অভিনন্দিত করবার জন্য আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। বন্ধুসমাজে বসে সাক্ষাতে এবং অসাক্ষাতে তাঁর কাব্যের গুণাবলীর যে আলোচনা এতদিন ধরে আমরা করে এসেছি, আজকের এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে তার অনেক প্রভেদ আছে। এই অনুষ্ঠানের যে একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে, তা উপস্থিত বন্ধু মাত্রেই স্বীকার করবেন।—তা যদি না থাকত, তা হলে এই অনুষ্ঠানের আয়োজনই হত না।

এ কথা নিশ্চিত। তারাশঙ্কর বঙ্গভারতীর বীণায় যে নূতন স্বর্ণ-তার যোজন করেছেন, তার সঙ্গীত কেবল শব্দের ঝঙ্কার মাত্র নয়। তাঁর কাব্যের মধ্যে গভীর মর্মস্পর্শী সহানুভূতির যে সুর অসংখ্য হৃদয়কে স্পর্শ করেছে, আমিও তাদের মধ্যে একজন। দুঃখ সুখের বিপুল ও বিচিত্র অনুভূতির আলোড়ন তুলেছে আমার মানস-সরোবরে যে শক্তি, তাঁর সেই শক্তিকে আমি এখানে প্রকাশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। তারাশঙ্কর দীর্ঘদিন জীবিত থাকুন। আমি তাঁর অগ্রজ। আমি আশীর্বাদ করছি এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি, তাঁর শক্তির ভাণ্ডার অক্ষয় হোক।

—শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী

তোমার পঞ্চাশৎ জন্মবাসরে তোমার পূর্ণ পুরুষায়ুঃ কামনা করি। তোমার লেখনী অক্ষয় হোক। তোমার যশ অম্লান হোক।

আজকাল বিজ্ঞানের যুগে life begins at fifty। পঞ্চাশোর্ধ্বে বনং ব্রজেৎ—এ যুগে অচল। সুতরাং তুমি জীবনের যে নতুন অধ্যায় আরম্ভ করলে, তা হবে নব-যৌবনের সৃষ্টিশক্তিতে গরীয়ান। অথচ বহুদর্শিতার প্রবীনতায় দৃঢ়—এক কথায়

বৃদ্ধত্বং জরসা বিনা। এই জরাহীন বৃদ্ধত্ব আজীবন ভোগ কর এবং বঙ্গবাসীর চিত্তকে তোমার মনের মাধুরী দিয়ে মধুরতর করে তোল।

—শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

বন্ধু, তোমার মহিমা, তোমার আসন
তোমার জন্মদিনের-ভাষণ
    রচনা করেছ তুমিই নিজে ;
চলেছ স্বপ্ন-সরণি বাহিয়া
আপনার মনে কি গান গাহিয়া
    ভাবিয়া পাই না বলিব কি যে।

আজিকে তোমার জনম-লগনে
শ্রাবণের ঘোর ঘন বরষণে
    জানি না কি ভাব জাগায়ে তোলে,
বজ্রে কি তাহা পড়িবে ভাঙিয়া
জবায় কি তাহা উঠিবে রাঙিয়া
    জানি না কি ভাষা আভাসে দোলে।

মহাকাশ ভরা কার অন্তরে
কোন্ সঙ্গীত ভাসে মন্থরে
    আগামী দিনের ছন্দভারে
তারই প্রত্যাশা, তারি আগ্রহ
বিদ্যুতে আজি জাগে অহরহ
    শিহরে শ্রাবণ অন্ধকারে।

দাঁড়ায়েছে আজি তোমারে ঘিরিয়া
প্রত্যাশা-ভরা অসংখ্য হিয়া
    এসেছে অকবি এসেছে কবি
এসেছে জনতা এসেছে পথিক
এসেছে রসিক এসেছে বণিক
    শ্রাবণ গগনে জেগেছে ছবি।

টগর যূথীর ছন্দ লইয়া
ভক্তি-শুভ্র অর্ঘ্য বহিয়া
    এসেছে অসীম চিরন্তন
কেয়া-করবীরা প্রণাম জানায়
বনফুল-লীলা বাদলের বায়
    গন্ধ ছড়ায় আকুল মন।

—"বনফুল"

বন্ধুবর তারাশঙ্করের পঞ্চাশৎ জন্মদিন উপলক্ষে সবার সঙ্গে আমার শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি তাকে। তিনি শতায়ু হোন—ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা, অর্থাৎ আজকের দিনটিকে যেন তাঁর জীবনের মধ্যাহ্ন, তাঁর সাহিত্য-জীবনের যৌবন বলে মনে করতে পারি আমরা।

মানুষের নিজের পরমায়ু সম্বন্ধে যে একটা স্বাভাবিক দুর্বলতা আছে, তার বশেই সশরীরে উপস্থিত হতে পারলাম না—আপনাদের উৎসবে। ভেবে দেখলাম, উপস্থিত হলেই থাকতাম অনুপস্থিত—মনটা নিজেকে আগলে থাকতেই হত হয়রান। এখন নিশ্চিন্ত মুক্তিতে সে আপনাদের উৎসবে লিপ্ত হয়ে রইল।

তারাশঙ্কর দেশের হৃদয়টি কি ভাবে জয় করেছেন এই থেকেই বোঝা যায় যে, এই দারুণ দুর্দিনের মধ্যে সে তার জীবনের এই অতি বিশেষ দিনটিকে অনভিনন্দিত যেতে দিলে না। এই প্রীতিটুকু হোক শাশ্বত।

— শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

তোমার পঞ্চাশৎ জন্মতিথি পালনের ব্যবস্থা করিয়া সজনীবাবু অত্যন্ত সময়োচিত কার্য করিয়াছেন এবং সাহিত্যানুরাগী মাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র হইবেন। তাঁহাকে ধন্যবাদ।

তোমার পঞ্চাশৎ জন্মতিথিতে শিক্ষিত বাঙালী সমাজের আনন্দিত হইবার কথা। আর আমরা যাহারা তোমার সাহিত্য-সতীর্থ, তাহাদের যুগপৎ আনন্দিত ও গৌরবান্বিত হইবার বিষয়। তুমি অচিরকালের মধ্যে প্রতিভার বলে পাঠক সমাজের চিত্তে যে শ্রদ্ধা ও প্রীতির আসন গ্রহণ করিয়াছ, আমরাও তাহার অংশভাক্‌। আমাদের সকলের সাহিত্য-সাধনা তোমার মাধ্যমে আশাতীত পূর্ণতা লাভ করিয়াছে, আমাদের যাহা সাধ ছিল তোমার ক্ষেত্রে তাহা সাধ্য হইয়াছে। তোমার মুক্তিতে আমরা নিজেদের পরিপূর্ণ সাফল্য দেখিয়া যে গৌরব অনুভব করিতেছি, সাধারণ পাঠক তাহার কতটুকু বুঝিতে পারিবে জানি না। প্রদীপের শিখাটুকুই জলে, কিন্তু সেই শিখাকে সমস্ত প্রদীপটি লালন করিতেছে। বাঙালী সাহিত্যিক-সমাজের তুমি সেই প্রতিভাভাস্বর শিখা। তুমি আমাদেরই পূর্ণ স্বরূপ। এই জন্মতিথি উপলক্ষে যে শ্রদ্ধা তুমি সাধারণের নিকট হইতে পাইবে, তাহার সঙ্গে আমার এই পরম প্রীতির ক্ষীণ ধারাটি যোগ করিয়া দিয়া ধন্য হইলাম।

তোমার জীবনের অতিক্রান্ত পঞ্চাশ বৎসর আরও পঞ্চাশকে লাভ করুক। তুমিই শত-শরৎ দেখিবার সৌভাগ্য লাভ কর। তোমার লেখনী অমৃতশ্রী হোক।

—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

অন্তরে জোরালো তাগিদ, আজ গিয়ে আপনার সঙ্গে বসে একটু আনন্দ করি, পারিবারিক দুর্যোগ ঠেকিয়ে রাখছে। তাই দূর থেকেই আপনার কাছে অনুরোধ জানাই, কবি সাহিত্যিকের বয়সের যে দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ রেখে গেছেন, তা অতিক্রম করা চাই। এ শুধু অনুরোধ নয়, দাবি, শুধু আমার নয়, সকলের।

—শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

গুরু গরবের ধন আমাদের—ওগো তারাশঙ্কর,
জন্মবর্ষ—স্মরণোৎসবে তব—
স্নেহ-শ্রদ্ধার চন্দনদ্রবে মাখানো আমার প্রণতি তোমারে নিবেদি যুগ্মকর।
আমি আসিয়াছি—গোকুলের দূত
শতধা-শীর্ণ বৃন্দারণ্য হতে—
আসিয়াছি আমি—তব কৈশোর-লীলানিকেতন বনের বার্তা বয়ে;
মনের কথাটি তার—
অঞ্চলে নিধি—পঞ্চাশোর্ধ্বে ফিরিয়া পাইতে,—বাসনা চমৎকার!
জানে,—রাজা আসি রাখালিয়া-খেলা খেলিতে পারে না বনে,
কিন্তু বাধা কি বাসনা জাগিতে মনে।

আজি রাজসমারোহে—
পুত্র গরবে স্ফীতবক্ষের বিগলিত ক্ষীরধারে
বিরহের মধুবেদনার কালি মাখিয়া যতনে জননী যশোদা তব
কাজর করিয়া পাঠায়ে দিয়েছে হেথা;
বাসনার সাথে পূত স্নেহাশ্রু মিশায়ে দিয়েছে দই হলুদের ফোঁটা
বাৎসল্যের দুগ্ধবারিধি-মন্থনজাত নবনী দিয়েছে ধড়ার আঁচলে বাঁধি।
কহিয়া দিয়াছে মোরে—
ওরে, বলে দিস চুপি-চুপি কানে কানে—

সভাকোলাহল থেমে যাবে যবে—নিভে যাবে দীপমালা—
বসিবে যখন একাকী আপন ঘরে—
এমনি যেন সে আহীরিণী—মার ফল্গু এ উপায়ন
নিভৃতে গ্রহণ করে।
আমি আসিয়াছি—গ্রাম্য আভীর,—
যত রাখালের সখ্য করিয়া জমা—
বক্ষে এনেছি বয়ে,—
কানুর গরবে গরবিতদের মরমের প্রীতি শরমের পুটে লয়ে
আসিয়াছি দিতে আজি এ রাজোৎসবে।
দিতে সঙ্কোচ—নিতেও লজ্জা—এমনি এ উপায়ন,
তবু আনিয়াছি—কোনমতে মানা মানে নি আহীরি-মন।

হে কীর্তিমান-বক্ষ যে আজ দুলিছে গরবভারে—
'গৌরীকান্ত'-চরণাঙ্কিত পন্থাটি ঘিরে ঘিরে
দেশের চিত্ত তীর্থ করিয়া ঘুরিছে বিভোর হিয়া,
গোকুলই তীর্থ—মধুপুরী শুধু মথুরানাথের রাজকাহিনীর স্নেহহীন ইতিহাস।
ওগো বরেণ্য, ওগো প্রণম্যতম,
অন্তরঙ্গ—ওগো সৌন্দর্যাপম,

অমরের পরমায়ুতে বরণ করিবারে তোমা পাঠালো 'তারা-মা' মোরে,
আশীর্বচন পাঠায়ে দিয়েছে সাথে—
বলেছে আমারে মা তার আশিস্, করিতে উচ্চারণ—
'শশ্বজ্জীব—কীর্ত্তৌ—শান্তৌ জীব—ওম।' —শ্রীকমলাকান্ত পাঠক

শুধু গান শুধু ফুল নয়
সমগ্র জীবন ভরে
যে বিরোধ যে বিস্ময়
স্বেদ আর শোণিতের
ক্ষয় ক্ষতি জয় পরাজয়
সংগ্রামের সাধনার যত
অরণ্য গভীর ঘন বিশাল বিপুল
কাব্য হোক
সর্বগ্রাহী জীবনের মতো
এই তো প্রয়াস, এই তো প্রত্যাশা।

পাতায় পাতায় কাটাকুটি
দুঃখ ক্ষোভ, অসন্তোষ
কত যে ভ্রূকুটি
তার পরে ভাব আর ভাবনার রূপ
থরে থরে মিতাক্ষরা শ্লোক
এই কি ব্যঞ্জনা তার
অন্তর্গূঢ় বাণী
সুন্দর ফুলের মতো হোক,
শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যানী
জীবন কাব্যের পাক ছন্দোময় ভাষা।

—শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র

আঁধারের ঘন-কালো গুণ্ঠনে গুণ্ঠিত দুঃখের দীপ হাতে রাত্রি—
ঘিরিয়াছে চারিধারে, মুদ্রিত দু নয়ন স্পন্দিত হিয়া মোরা যাত্রী॥
স্বার্থের হানাহানি, আর্তের অসহায় সকরুণ ক্রন্দন ছন্দ
চিত্তের মাঝে নিতি জাগরূক করি দেয় হিংসা ও করুণার দ্বন্দ্ব॥
উজ্জ্বল তব আঁখি পঙ্কিল পন্থায় ব্যথিত পরাণে স্থির দৃষ্টি
ধীরে ধীরে তারি ছবি আঁকিছে লেখনীপাতে তোমারে আপনি কর সৃষ্টি।
ধরণীর শঙ্কিত সন্তান মোরা, শুনি দুরু-দুরু-কম্পিত বক্ষে
নূতন আশার বাণী আনি দাও অন্তরে আলো এনে দাও ম্লান চক্ষে॥
আজি তব জীবনের মণি-দীপ-কক্ষটি পঞ্চাশ দীপে হল পূর্ণ।
উজ্জ্বল প্রভা ঝলে দশ দিক উজলিয়া আঁধারের ভীতি করে চূর্ণ॥
আনন্দে নির্বাক সমুখের দিনগুলি সুন্দর নির্মল কান্ত
অজানার বন্ধন টুটে নিতি দেখা দিক দুখানি চরণ ফেলি শান্ত॥
চলিবার পথ তব, আপনার সারাদেহে নিজ হাতে শত দীপ জ্বাললো।
আমি আসি এনে দিনু আমার প্রণতি-গাঁথা প্রীতিফুলে ছন্দের মাল্য॥

—শ্রীবাসন্তী রায়

পরিশিষ্ট ঃ ২

॥ সাবিত্রীপ্রসন্ন ॥

গত ২৩শে [মার্চ ১৯৬৫] তারিখ কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের জীবনের খেলা শেষ হয়ে গেল।

সাবিত্রীপ্রসন্নের সঙ্গে আমার সাহিত্যিক জীবন একরকম শুরু থেকে জড়িয়ে আছে।

সাবিত্রীপ্রসন্ন তখন "উপাসনা"র সম্পাদক। খ্যাতনামা কবি এবং দেশপ্রেমিক ও সেবক বলেও সম্মানিত। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের নেতাদের সঙ্গে সুপরিচিত; দেশবন্ধু, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, কিরণশঙ্কর রায়, বিধানচন্দ্র থেকে তখনকার বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল।

সাহিত্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ থেকে ১৯২৯ সনে নবাগত আমার সঙ্গে পর্যন্ত তাঁর পরিচয়। আমার দুটি গল্প তিন মাসে পর পর কল্লোলে বের হতেই তিনি আমাকে পত্রযোগে আহ্বান করেছিলেন। কলকাতায় এলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

সেদিন আমি আশ্রয় পেয়েছিলাম সাবিত্রীপ্রসন্নের মধ্যে, দেখেছিলাম গ্রামের মানুষ তাঁর মধ্যে বেঁচে আছে; এবং একজন দেশসেবক ও দেশপ্রেমিক উজ্জ্বল মূর্তিতে অধিষ্ঠিত। আমার সঙ্গে চরিত্রগত মিল পেয়েছিলাম। তিনি আমারই সমবয়সী। তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় আমার সুবিদিত। কলেজ-জীবনে তিনি আমার থেকে এক বছরের অগ্রগামী। কলেজ জীবনেই সেণ্ট পলস কলেজে সরস্বতী পূজা নিয়ে মিশনারী কর্তৃপক্ষের ছাত্রদের যে সংঘর্ষ হয় সে সংঘর্ষে সাবিত্রীপ্রসন্নই ছিলেন অবিসংবাদী ছাত্রনেতা। চোখে না দেখলেও বিবরণ থেকে তাঁর সেইকালের তরুণ প্রদীপ্ত মূর্তি আমি কল্পনা করতে পারি। তাঁর চোখের দীপ্তি সঞ্চারিত হচ্ছে ছাত্রদের চোখে; তাঁর কণ্ঠস্বরের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে ছাত্রমিছিলের কণ্ঠে। যে ধ্বনি ও দীপ্তির আকর্ষণে তখনকার দিনের তারুণ্যের নবোদিত ভাস্কর-সুভাষচন্দ্র এসে তাঁদের মধ্যে দাঁড়িয়েছিলেন।

সাবিত্রীপ্রসন্ন জীবনমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে বাংলার গ্রামের একটি তরুণের চিত্তেও তাঁর স্পর্শ পাঠাতে পেরেছিলেন। তখন তাঁর পল্লী-কবিতা আমার ভালো লাগে, পরাধীনতার বেদনার কবিতা হৃদয় স্পর্শ করে, স্বাধীনতা কামনার দীপ্ত আবেগ মনকে চঞ্চল করে, তাই তাঁর নাম আমার পরিচিত ছিল। অবশ্য প্রথম প্রথম আমি তাঁর সমকক্ষতায় পৌঁছতে পারি নি, সমকক্ষ ছিলামও না। খানিকটা শ্রদ্ধার ব্যবধান রেখেই চলতাম। কিন্তু "উপাসনা"ই হয়ে উঠেছিল আমার সাহিত্য-সেবার আশ্রয়। সেটা ১৯২৯ সন। ১৯৩০ সনের আন্দোলনে জেলে চলে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যক্ষেত্রে যোগাযোগে ছেদ পড়ল। কিন্তু সাবিত্রীপ্রসন্ন ছেদ টানলেন

না, তিনি তার মধ্যেও যোগসূত্রটি বজায় রাখলেন। তার আগে "উপাসনা"য় আমার "চৈতালী ঘূর্ণি" প্রথম উপন্যাস বের হয়েছে দু-তিনটি সংখ্যায়। ১৯৩০ সনের প্রথমেই সাবিত্রীপ্রসন্ন একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করেছিলেন—কি নাম ছিল মনে নেই। তবে কাগজখানির সঙ্গে প্রাদেশিক কংগ্রেসের যোগ ছিল; সম্ভবতঃ তিরিশের আন্দোলনকে সাহায্য করতেই কাগজখানির সৃষ্টি হয়েছিল।

আমি জেলে গেছি সংবাদ শুনে সাবিত্রীপ্রসন্ন আমার ছবি সংগ্রহ করে তাঁর এই কাগজে আমার সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ প্রকাশ করেছিলেন।

জেল থেকে বেরিয়ে এসেই কাগজখানি দেখেছিলাম। দেখে যেমন উৎসাহ অনুভব করেছিলাম (কারণ সংবাদপত্রে বা সাময়িক পত্রে এই আমার প্রথম ছবি প্রকাশিত হল) সঙ্গে সঙ্গে সাবিত্রপ্রসন্নের প্রীতি অনুভব করে কৃতজ্ঞ হয়েছিলাম। এ দিকে কল্লোল তখন উঠে গেছে। "উপাসনা"ই আমার একমাত্র অবলম্বন হয়ে রইল।

এবার কলকাতায় এসে সাবিত্রীপ্রসন্নের বাড়িতেই উঠেছিলাম। বেশ কিছু-দিন—বোধহয় পনেরো-কুড়িদিন ছিলাম। একসঙ্গে বাস, এক সঙ্গে আহার এবং রাত্রিতে দীর্ঘক্ষণ গল্পগুজব আলাপ-আলোচনার মধ্যে কাটিয়েছি; অন্তরঙ্গতা ধীরে ধীরে ঘনীভূত হয়েছিল। সে অন্তরঙ্গতা আরও ঘন হল আরও একটি ঘটনায়। সাবিত্রীপ্রসন্ন একদিন 'চলুন, এক জায়গায় বেড়িয়ে আসি' বলে আমাকে এনে সরাসরি তুলেছিলেন শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়ের উডবার্ন পার্কের বাড়িতে।

এখানে তিনি আমাকে এনে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সামনে উপস্থিত করলেন। সেদিন নেতাজী সুভাষচন্দ্রের যে পরিচয় আমি পেয়েছিলাম তাতে আমি নিজেকে ধন্য মনে করেছিলাম এবং আজও পর্যন্ত জীবনের যেকটি দিনকে আমি শ্রেষ্ঠ দিন বলে গণনা করি তার মধ্যে সেই দিনটি অন্যতম একটি দিন, তাতে সন্দেহ নেই এবং এমন দিন বোধকরি জীবনে আর আসবে না।

এরপর প্রায়ই আমরা মিলিত হয়েছি স্বর্গত বিমলচন্দ্র সিংহের ল্যান্সডাউন রোডের বাড়িতে। সাহিত্য শিল্প আর দেশের কথাতেই সীমাবদ্ধ থাকত না, সুখদুঃখ নানান কথার মধ্যে সেই পুরাতন অন্তরঙ্গতা আবার বর্ণে স্বাদে উজ্জ্বল এবং মধুর থেকে মধুরতর হয়ে উঠেছিল।

নিত্য নূতন করে পরস্পরকে আবিষ্কার করেছি। তার মধ্যে যেমন পেয়েছি সরল উদার দেশপ্রেমিককে, তেমনি দেখেছি একটি অভিমানী মানুষকে। একটি অভিমান তাঁর ছিল। অবহেলার অভিমান। তিনি অনুভব করতেন যে প্রাপ্য বলে তিনি কিছু পান বা না পান, যে অবহেলা তাঁর প্রাপ্য নিশ্চয় ছিল না, সেই অবহেলাই তাঁর জীবনের পাত্র তিক্ত করে তুলে উপচে পড়েছে। চরিত্রের যে জটিলতায় মানুষ কুটিল চক্রান্ত করে কাম্যবস্তু প্রাপ্য বলে আদায় করে তাঁর চরিত্রে সে জটিলতা ছিল না। কুটিল পথে নামা-হাঁটা তাঁর সাধ্যের অতীত ছিল। ঘৃণা হলে, নিজেকে অশুচি মনে করতেন।

আবার যে উগ্রতা থাকলে, উচ্চ কণ্ঠে দাবি জানিয়ে বা জোর করে মানুষ আদায় করে নেয় নিজের প্রাপ্য, তাও তাঁর ছিল না। তিনি ছিলেন শান্ত

মানুষ। মানুষের কাছে মানুষ আপনি সসম্মানে তুলে দেবে নিজ নিজ প্রাপ্য, এতেই ছিল তাঁর বিশ্বাস। এবং এতেই ছিল তাঁর রুচি।

আমি নিজে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখেছি। মনে হয়েছে, কার্যকারণে এইটে যে তাঁর জীবনে দুর্ভাগ্যের মতো এসেছিল, তার জন্য দেশের নেতা এবং সমাজপতিরা দায়ী হলেও সাধারণ মানুষেরা বোধহয় দায়ী নয়।

কিছুকাল আগে চীন আক্রমণের সময় সাবিত্রীপ্রসন্ন আর একবার প্রজ্বলিত হবার চেষ্টা করেছেন। কয়েকটি কবিতায় তার পরিচয় আছে; এবং দেশপ্রেমিক কবি সাবিত্রীপ্রসন্নের মূল্য সেদিন নূতন করে অনুভব করলো দেশ।

স্বাধীনতার পর গান্ধীজীর সাধনাপীঠে সাধনাভ্রষ্ট মানুষের আবির্ভাব দেখে নিরন্তর বেদনা অনুভব করেছেন। সাবিত্রীপ্রসন্ন শক্তি কাড়াকাড়ির নির্লজ্জ চক্রান্ত দেখে সভয়ে চোখ বুজেছেন কিন্তু তবু তিনি সরে আসেন নি। নিত্য প্রত্যাশা করেছেন, কোথা থেকে কোনদিন নূতন সাধকদলের আবির্ভাব হবে। আবার কেরোসিনের অভিসিঞ্চন বন্ধ হবে এবং নূতন করে পড়বে ঘৃতের আহুতি। ত্যাগ ও বৈরাগ্যের নির্মলতায় ও আলোকে সকল কলুষ ও গ্লানির মেঘাচ্ছন্নতা ও কুয়াশা দূরীভূত হবে। জীবন সঞ্জীবিত সুস্থ হয়ে উঠতে পারবে।

সেই সাবিত্রীপ্রসন্ন চলে গেলেন। দেশ ও বঙ্গসাহিত্য একজন নির্মলচিত্ত সেবককে হারালো। নিজেকে আজ বড় নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে।

পরিশিষ্ট ঃ ৩

॥ সজনীকান্ত ॥

মৃত্যু মানুষের অনিবার্য পরিণতি। এ সত্যের চেয়ে বড় সত্য আর নেই। কিন্তু সে পরিণামে উপনীত হওয়ার একটি ক্রম আছে। ক্রম ভঙ্গ করে এই পরিণাম যখন আসে তখন যারা থাকে তারা বিহ্বল হয়ে পড়ে—এই অনিবার্য সত্যকে মেনে নিতে পারে না। মানতে হয় অনেক হাহাকার করে। সজনীকান্তের মৃত্যু মেনে নিতে আমার অন্তর এই হাহাকার করে উঠেছে। আমি তার অন্তরঙ্গ বন্ধু আমার মতো অন্তরঙ্গ বন্ধু যাঁরা তাঁদের বাদ দিয়েও সমগ্র দেশে সাহিত্যানুরাগী ও পাঠক সমাজও এই মৃত্যুকে স্বীকার করে নিতে হায় হায় করেছেন ও করছেন। সজনীকান্ত নামটি সাধারণ নয়। বর্তমান বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে বিচিত্রগুণের ও শক্তির সমন্বয়ে এ নামটি বিশিষ্ট এবং বিচিত্র, কয়েকটি গুণ ও শক্তির ক্ষেত্রে অনন্য। এই নামটি উচ্চারণে বা স্মরণে মনে শঙ্কামিশ্রিত শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ই জাগে সর্বাগ্রে। মনে ছবি জেগে ওঠে এক যোদ্ধার মূর্তি। ভুল তাদের হয় না। সত্যই সজনীকান্ত ছিলেন নির্ভীক অমিত বিক্রম যোদ্ধা। সাহিত্যে সমাজে জাতীয় জীবনে অনাচার কদাচার ও যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে তাঁর যুদ্ধ ক্লান্তিহীন ক্ষমাহীন। মৃত্যুদিনের দুদিন আগে পর্যন্ত

তিনি এই যুদ্ধ করেছেন। যেদিন রাত্রে তাঁর এই মৃত্যুরোগের আক্রমণ হয় সেদিনও তিনি সংবাদ সাহিত্য রচনা করেছেন। এবং কবিতাও রচনা করেছেন। সজনীকান্তের পরিচয় পূর্বেই বলেছি—বিচিত্র—তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে ক্ষমাহীন যোদ্ধাই শুধু নয়—তবে এই পরিচয়টাই সবচেয়ে বড় এবং প্রথম হয়ে উঠেছে। নইলে সজনীকান্তের কবি হিসাবে পরিচয় প্রথম হয়ে উঠেছে। নইলে সজনীকান্তের কবি হিসাবে পরিচয়—গবেষক প্রবন্ধ লেখক হিসাবে তাঁর দানের মূল্য তো কম নয়—ছোট নয়; আমি বলব সেই পরিচয় সজনীকান্তের যোদ্ধা পরিচয়ের চেয়ে অনেক বড় অনেক সত্য পরিচয়। মানুষের কাছে আজও তার আরণ্যজীবনের প্রসুপ্ত স্মৃতি তাকে বাঁশীর সুরের চেয়েও যুদ্ধক্ষেত্রের অস্ত্র ঝনৎকারের প্রতি আকর্ষণ করে বেশী, তাই যোদ্ধা সজনীকান্তের পরিচয় তাঁর বংশীবাদক বীণা-বাদক পরিচয়ের চেয়ে সাধারণের কাছে বড় হয়ে উঠেছে। রাজহংস, মানস-সরোবরের কবি—বাংলা সাহিত্যের গদ্যের প্রথম যুগ ও রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্যের পণ্ডিত গবেষক—শনিবারের চিঠির সম্পাদক পরিচয়ের আড়ালে পড়ে গেছে। এর অন্তরালে আছে তাঁর শ্রেষ্ঠ সত্য, বিপুল ব্যক্তিত্ব, উদার হৃদয় ও কোমল প্রাণের পরিচয়। সংসারে বিশেষ গুণপণায় যাঁরা প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তাঁদের ভাগ্যে এমনই ঘটে থাকে, সমগ্র পরিচয় হয়তো বা আসল পরিচয়টিই চিরকালের জন্য অজ্ঞাত থেকে যায়।

আমার সঙ্গেও সজনীকান্তের প্রথম সাক্ষাৎ তাঁর এই যোদ্ধা সাহিত্যিক খ্যাতির আকর্ষণেই। "আমার সাহিত্য-জীবনে" লিখেছি—(সজনীকান্তও তাঁর আত্মস্মৃতিতে" তা উদ্ধৃত করেছেন। "সেই সময় (১৩৩১ সাল) শনিবারের চিঠির দুরন্ত প্রতাপ। সাহিত্যিক মজলিস বললেই শনিবারের চিঠির কথা ওঠে। গালাগালির অন্ত থাকে না।·· একদা ইচ্ছা হল শনিবারের চিঠির দুর্দান্ত সজনীকান্তকে দেখে আসি, কেমন সে লোকটা।"·· রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটে "জবরদস্ত কাঠামো, মোটা নাক, 'বড় উগ্র দৃষ্টি চোখ, ফরসা রং সজনীকান্ত চেয়ারে বসেছিলেন? তাঁকে দেখেই ফিরে এলাম, কয়েকটা কথা বলেছিলাম মাত্র, আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন নি—আমিও দিই নি।" পড়লেই যে কোন পাঠক অনুভব করবেন—লেখকের মনোভাবের মধ্যে বিস্ময় ছিল, শঙ্কা মিশ্রিত শ্রদ্ধাও ছিল—কিন্তু প্রীতি ছিল না। দেখা হল, পরিচয় হল না—এই কারণেই।

পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় হল বঙ্গশ্রীর আসরে। সেও সংক্ষিপ্ত। দূরে থেকে গেলাম পরস্পর থেকে। বঙ্গশ্রীতে লিখবার জন্য একবার বললেন না পর্যন্ত। পনেরো দিনের মধ্যে সজনীকান্তের সম্মুখ থেকে একপ্রস্থ আবরণ সরে গেল। একটি গল্প লিখেছিলাম, সে গল্পটি কিরণ রায় আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে চলে গেলেন এবং আমার অসাক্ষাতেই সজনীকান্তকে শোনালেন। সাহিত্য-প্রেমিক যোদ্ধা সজনীকান্ত সেই মুহূর্তে টেলিফোন তুলে আমাকে ডাকলেন; আমি তখন বালিগঞ্জে আমার আত্মীয় বাড়িতে রয়েছি। বললেন, আপনি দয়া করে এখানে আসুন। প্রথম সংখ্যাতেই (বঙ্গশ্রী) ছাপতে চাই আপনার গল্প। গুণগ্রাহী সম্পাদক সজনীকান্তকে পৃষ্ঠপোষক হিসাবেই পেলাম সেদিন। সে সজনীকান্ত তাঁর বোধ ও উপলব্ধি অনুযায়ী বহু সাহিত্যিকের উগ্র আধুনিকতাকে অভারতীয় এবং অকল্যাণকর বলে নিষ্ঠুর আঘাত

করে বিরোধিতা করেছেন—সেই সজনীকান্ত শুধু আমি নই আমার সমসাময়িক ও আমার পরবর্তী নবীন অনেক কয়জন সাহিত্যিককেই সপ্রেম গুণগ্রাহিতার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন এবং সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভে যে সাহায্য করেছেন—সে আমি চোখে দেখেছি এবং বিস্মিত হয়েছে। সাহিত্যক্ষেত্রে সম্পাদক সমালোচক ও যোদ্ধা সজনীকান্ত তাঁর প্রখর শরাঘাতে শুধু ভাঙার কাজই করেন নি। তিনি গড়েছেন, তাঁর সে সংগঠন অনেক সম্ভাবনা এনেছে বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে; সার্থক সুন্দর রচনা পড়ে বা শুনে—তাঁর বড় উগ্র-দৃষ্টি চোখে সে যে কি আনন্দোজ্জ্বল, কোমল ক্ষেত্রবিশেষে সজল দৃষ্টি ফুটে উঠত—সে তো আমি ভুলতে পারব না।

কয়েক মাস যেতে—আর এক পরিচয় পেলাম। এই কয়েক মাসের মধ্যে সজনীকান্তের আর এক রূপ দেখেছি। বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছি। অভিভূত হয়েছি তাঁর প্রাণ-প্রাচুর্যের উল্লাসময় অভিব্যক্তিতে। দিনের-পর-দিন—ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা—বিখ্যাত সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় থেকে সাহিত্যযশোপ্রার্থীদের নিয়ে-সে কি প্রাণোচ্ছল আলোচনা আসর—আনন্দ-বাসর। যত পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা তত কি কৌতুক-রস রসিকতার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পাণ্ডিত্যের কাছে সজনীকান্ত অবশ্যই তুলনায় নিষ্প্রভ ছিলেন, কিন্তু কৌতুক রস-রসিকতায় সজনীকান্ত ছিলেন মধ্যমণি, ক্ষণে ক্ষণে বৈদগ্ধের রশ্মিপাতের প্রতিফলনে রসিকতার প্রদীপ্তছটা ফুলঝুরির মতো ঝরে পড়ত। মজলিস হাসিতে মুখর হয়ে উঠত। জীবনের শেষ দিন—রবিবার দিন—বেলা একটা তখন। তাঁর নাকে অক্সিজেনের টিউব, তাঁর তৃতীয়া কন্যা মীরা পর পর তিনটি পিল খাওয়াচ্ছিল। শেষ পিলটি তাঁর সামনে ধরে মীরা বলল, বাবা, এই পিলটাও খেয়ে নাও সজনী তার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বলেছিলেন, আবারও পিল? এ যে পিল পিল করে পিল খাওয়াতে শুরু করলি। লিখতে বসে মনে হচ্ছে জীবনকে কেউ নেয় হাসির সঙ্গে—কেউ নেয় বেদনার অশ্রুর সঙ্গে। সজনীকান্ত জীবনে সুখ দুঃখ সব কিছুকে হাসির মধ্য দিয়ে গ্রহণ করতে চেয়েছেন—ব্যক্ত করতেও চেয়েছেন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তেও তিনি পূর্ণ জ্ঞানে ছিলেন। কিন্তু দৈহিক যন্ত্রণায় একটা বায়ুশূন্য আবরণপাত্র দিয়ে মৃত্যু তাঁর হাস্যোজ্জ্বল জীবন-দীপশিখাকে ঢাকা দিয়েছিল বলে আমরা তা দেখতে পাই নি।

যাক, যে কথা বলছিলাম। বঙ্গশ্রীতে আলাপের মাস তিনেক পর একদিন আমার নিজের ব্যয়ে প্রকাশিত প্রথম বই "চৈতালি ঘূর্ণি"র দপ্তরী "বঙ্গশ্রী" আপিসে এসে আমাকে ধরলে। সে বইগুলি সবই জুস বাইণ্ডিং করে রেখেছে—তার দরুন সে ৬০ টাকা পাবে। তার সেই টাকা চাই। না পেলে—বই বাতিল কাগজের দরে বিক্রি করে দেবে। কয়েকটা অপমানজনক কথাও বলেছিল। আমার কাছে টাকাও ছিল না। উত্তরও খুঁজে পাচ্ছিলাম না। সজনীকান্ত অন্তরাল থেকে কথাটা শুনে ফেলেছিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসে দপ্তরীর টাকা মিটিয়ে দিয়ে আমাকে বলেছিলেন? আপনি সঙ্কুচিত হবেন না তারাশঙ্করবাবু-আজ থেকে আপানার পাবলিশার হলাম। বইয়ের ভার আমার রইল।

সেদিন তিনি পৃষ্ঠপোষক থেকে আত্মীয় হয়েছিলেন আমার। বয়সে বড়

ছিলাম আমি—মুখ ফুটে অনেকের মতো সজনী দাদা বলতে পারি নি। কিন্তু সম্ভ্রমে আচারে তাঁকে জ্যেষ্ঠের সম্মান দিয়েছিলাম। তিনিও সহজভাবে নিয়েছিলেন। এমন ঘটনা শুধু আমার সম্পর্কেই ঘটে থাকলে এটা সজনীকান্তের চরিত্রগুণ বলতাম না; এটা সর্বজনীন পরিচয়ের অঙ্গ হতে পারত না। কিন্তু কিছু কাগজ দৈবক্রমে আমার চোখে পড়েছে যাতে দেখেছি অনেক সাহিত্যিক তাঁর কাছে এইভাবেই ঋণী। এর মধ্যে দু-একজন—তাঁদেরই মধ্যের দু-একজন যাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন।

সজনীকান্তের পরিচয়ের সম্মুখের আর একটা আবরণ উঠে গেল।

এর পর ক্রমে ক্রমে নিকটে এসে বন্ধু হয়েছি। তাঁর সঙ্গে চরিত্রগত অমিল আমাদের বন্ধুত্বের পথে অন্তরায় ছিল। তিনি হাসির মানুষ—আমি তার উলটো। বেদনার কান্নার সঙ্গেই জীবনকে গ্রহণ করেছি, কখন তা বলতে পারি না। হয়তো বা জন্মলগ্নে। তিনি বাক্যে রসিক ছিলেন, ভোজনে রসিক ছিলেন, উল্লাসের প্রকাশে রসিক ছিলেন; আমি তা ছিলাম না—আমি তা নই। কিন্তু তবুও বন্ধু হয়েছিলাম, সম্ভবত অতিক্রম করেছিলাম, বাইরের সব কিছুকেই।

হঠাৎ একদিন আমাকে ডাকলেন, বড়বাবু বলে।

প্রশ্ন করলাম। কেন? এ নাম কেন? রসিকতা?

না। তুমি বড় হয়ে গেছ বলে।

আমি হেসে বলেছিলাম, তা হলে তুমি ছোটবাবু।

খুব ভাল!

বাংলাদেশের অনেকেই এ নাম জানেন। এই স্বীকৃতি—এ কি আমি পারি? বা আর কজনে পারে? যাক সজনীকান্তের এত কাছে এলাম যে, তাঁর ভালোমন্দ সবকিছু আমি দেখতে পেলাম। দোষ তাঁর ছিল। নির্দোষ মানুষ সংসারে কজন? কিন্তু গুণ, আমি দেখেছি। যাচাই করেছি। সে অনেক এবং তা সুদুর্লভ। এত গুণের মানুষ বর্তমানকালে বেশী নেই। তবে সাহিত্য-বিচারক, সাহিত্য-প্রেমিক হিসাবে তাঁর দোসর কেউ আছেন কিনা সন্দেহ। শনিবারের চিঠির দায়িত্বে—সেকালে এবং একালেও চিঠিতে প্রকাশিত বহু কটু প্রবন্ধের দায় তাঁর উপর বর্তেছে। বেনামী অনেক প্রবন্ধের লেখক বলেও তিনি গণ্য হয়েছেন এবং পুরাতন নূতন অনেক সাহিত্যিকের কাছে অপ্রীতিভাজনও হয়েছেন কিন্তু তিনি কখনও এ লেখা আমার নয় বলে বেনামীর নাম প্রকাশ করে দেন নি; তাঁর কাগজে প্রকাশিত প্রবন্ধের উপরে বা নিচে লিখে দেন নি, মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন। এ সবই তাঁর দায়িত্বজ্ঞানের লক্ষণ। কিন্তু অনেক সাহিত্যিকের, যাঁরা তাঁর উপর বিরূপ, তাঁদের সম্পর্কেও তাঁর কাছে অনেক প্রশংসা শুনেছি।

তাঁরা কাছে এলে একজন সত্যকারের সাহিত্য-রসিক ও মানুষ হিসাবে একজন উদার মানুষকেই পেতেন বলে আমি বিশ্বাস করি। তাঁর মৃত্যুর দিন বন্ধুবর প্রেমেন্দ্র মিত্র একটি ঘটনার কথা বললেন। তারই মধ্যে সজনীকান্তের বিচিত্র সত্য চরিত্র দিনের আলোর মতো প্রকাশ পাবে। প্রেমেন্দ্রের বিরুদ্ধে তিনি লিখেছেন অনেক। কিন্তু বঙ্গশ্রীর সম্পাদনার ভার নিয়ে—তিনি নিজে গিয়েছিলেন প্রেমেন্দ্রের কাছে, শৈলজানন্দের কাছে। বঙ্গশ্রীর প্রেমেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর

প্রীতি গাঢ় হয়। এ কালেও টালার বাড়িতে প্রেমেন্দ্রকে নিয়ে তাদের আসর পেতেছেন। পরস্পরে সম্বোধন করেছেন 'তুই' বলে। সম্প্রতি মাস দুই আগে বেথুন স্কুল "মাসিক পত্রে"র রবীন্দ্র-সংখ্যায় প্রেমেন্দ্র একটি লেখা দিয়েছিলেন। সেই লেখা নিয়ে সজনীকান্ত সংবাদ-সাহিত্যে প্রেমেন্দ্রকে শরাঘাত করলেন। প্রেমেন্দ্র আমাকে বললেন, ভাবছিলাম একদিন গিয়ে খুব বলে আসব। হঠাৎ রেডিও থেকে একটি প্রোগ্রামের অনুরোধপত্র পেলাম। বিষয়টা কবির লড়াই। প্রতিপক্ষ সজনীকান্ত। তিনি টেলিফোন করলেন রেডিও অফিসে। এতে তাঁকে কেন টানা হয়েছে? কর্তৃপক্ষ বললেন, সজনীকান্ত বলেছেন প্রেমেন্দ্র ভিন্ন অন্যের সঙ্গে তিনি লড়বেন না। সজনীকান্তকে টেলিফোন করলেন প্রেমেন্দ্র। সজনী বললেন, গাল খেতে হয় তোর গালাগাল খাব; অন্যের সঙ্গে লড়ব না। প্রেমেন্দ্র এর পর প্রশ্ন করলেন আমায়, চিঠিতে এসব কি বলেছিস? সজনী বললেন, তুই এসব লিখেছিস কেন? কয়েকটি বাদানুবাদের পর টেলিফোনের দুই প্রান্তে দুটি কণ্ঠের হাস্যরোল উঠল। তারপর প্রেমেন্দ্র বললেন, তাহলে বিষয় স্থির রইল আধুনিক কবিতা। তুই স্বপক্ষে আমি বিপক্ষে। বিচিত্র সজনীকান্তের এই বিচিত্র পরিচয়। কবি সজনীকান্তের পরিচয় দেবার যোগ্য স্থানও এ নয়, সে পরিচয় দেবার যোগ্যপাত্রও আমি নই। তবে "রাজহংস" "মানস সরোবর" আমার প্রিয় কাব্যগ্রন্থ।

আমাকেও সজনীকান্ত এবং তাঁর কাগজে অন্যের কটূক্তি করেছেন। এবং হঠাৎ দু-একদিন পরই এসে ডেকেছেন। বড়বাবু? আমি উত্তর দিয়েছি—এস ছোটবাবু।

এরপর বড়বাবু থেকে একদিন তিনি আমাকে ডাকলেন বড়ভাই বলে। সে তাঁর পরিবারে একটি সঙ্কটের দিন। আমি গিয়ে পড়েছিলাম। এবং সে সঙ্কট উত্তীর্ণ হতে সাহায্য করেছিলাম। যে মুহূর্তে সঙ্কট উত্তীর্ণ হল সেই মুহূর্তে আমাকে তিনি বড়ভাই বলে প্রণত হতে দ্বিধা করলেন না। এইভাবে যে বৃহৎ—সম্মানোন্নত মস্তককে ঋণ স্বীকার করে নত করতে পারে তারমতো বালষ্ঠ বৃহৎ তো শুধু বৃহৎই নয়—সে মহৎ।

মৃত্যুব্যাধি যে দিন রাত্রে তাঁকে আক্রমণ করলে, শুক্রবার সরস্বতী পুজার রাত্রে। তখন রাত্রি বারোটা। আকস্মিক যাঁরা বলবেন তাঁরা তাই বলুন, আমি বলব কারও-বা কোন কিছুর প্রচ্ছন্ন নির্দেশ বা চক্র, যাতে করে আমাকে টেনে নিয়ে গেল তাঁর শয্যাপার্শ্বে। তাঁর গৃহ চিকিৎসক অসুখে শয্যাশায়ী ছিলেন সেদিন, তাঁকে না পেয়ে তাঁর ছেলে আমাকে টেলিফোন করলেন আমার ছোট জামাই ডাঃ বিশ্বনাথ রায়ের খোঁজ করে। বললেন, বাবার অসুখ। বিশ্বনাথবাবু বাড়ি আছেন, 'তাঁকে কি—। আমি ছুটে গেলাম মেয়ের বাড়ি এবং জামাইকে নিয়ে গেলাম। সজনীকান্ত ডাক্তারকে চেয়েছিল, তার সঙ্গে আমাকে দেখে উল্লাসে আশ্বাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। আমাকে বললেন, আমাকে আশীর্বাদ কর। মাথায় হাত বুলিয়ে দাও। সেদিন রাত্রি দুটোর সময় তাঁকে কিছুটা সুস্থ দেখে ফিরে এলাম। সকালে উঠে গেলাম। বিকেলে গেলাম। শেষ মুহূর্ত কেন—শ্মশান পর্যন্ত তাকে অনন্তের পথে এগিয়ে দিয়ে এলাম? বারবার শুনলাম সে আমার অনুপস্থিত অবসরে বলেছে—বড়বাবু আমাকে সত্য সত্য ভালোবাসে। বড়

ভালোবাসে। আমার ভালোবাসায় নিঃসংশয় হয়ে যে তার উল্লাস তার মধ্যে তার একটি অনুক্ত কথা রয়ে গেছে আমিও বড়বাবুকে বড় ভালোবাসি।

এইটেই আমার পরম সান্ত্বনা।

হয়তো এই শেষটুকু ব্যক্তিগত ঘটনা ও কথা। সজনীকান্তের ব্যক্তিত্ব, প্রতিভা ও কীর্তির যে পরিচয় ও মূল্য লেখার মাধ্যমে দেশের কাছে নিবেদন করা কর্তব্য ও উদ্দেশ্য—তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ না থাকলেও এই ব্যক্তিটির হৃদয় এইখানে পরম সত্যে উদ্ঘাটিত বলেই আমার বিশ্বাস।

প্রতিষ্ঠার ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যশালী সজনীকান্ত, দুর্লভ নির্ভীকতার অধিকারী বলিষ্ঠ যোদ্ধা সজনীকান্ত, কবি সজনীকান্ত, পণ্ডিত সজনীকান্ত, অপরূপ হৃদয়ের অধিকারী সজনীকান্তের তুলনা করেছি আমি শুক্রগ্রহের সঙ্গে। বঙ্গ-সাহিত্য-গগনের প্রদীপ্ত জ্যোতিষ্ক—যিনি দেবলোকের অন্যায়কেও সহ্য করতে পারেন না, শিষ্য এবং অনুগতের অন্যায়কেও ক্ষমা করেন না—সেই দীপ্ত জ্যোতিষ্ক আজ দিগন্তে অস্তমিত হয়ে অনন্তের পথে যাত্রা করলেন।

তিনি আজ আমার জ্যেষ্ঠ—তাঁকে প্রণাম করি। তাঁকে সত্যিই বড় ভালোবাসতাম।

পরিশিষ্ট ঃ ৪

॥ সজনীকান্ত ও 'শনিবারের চিঠি' ॥

সজনীকান্ত আর নাই। তাঁর বাষট্টি বৎসরের জীবন বহু সংঘাত ও সংঘর্ষের জীবন। বহু কীর্তির জীবন। কীর্তিমান সজনীকান্তের কীর্তিতে ছেদ পড়ে নি, জীবনের প্রায় মধ্যগগনেই দীপ্ত জ্যোতিষ্কের মতো কক্ষচ্যুত হয়ে মৃত্যুর আকর্ষণে অকস্মাৎ বিলীন হয়ে গেলেন। তাঁর মৃত্যুতে আমাদের মতো বন্ধুজনের জীবনে অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। আমরা বন্ধু হারিয়েছি, তাঁর পত্নী পরমজনকে হারিয়েছেন, পুত্র-কন্যারা পিতৃহীন হয়েছে, বাংলা সাহিত্য প্রতিভাশালী সেবক হারিয়েছে—"শনিবারের চিঠি" হারিয়েছে কর্ণধারকে; যদি সজনীকান্তের পুত্রকন্যার মতোই সেও পিতৃহীন হয়েছে বলি, তবে ভুল করা হবে না। "শনিবারের চিঠি" সজনীকান্তের মানসকন্যা। তার সূতিকাগৃহ থেকেই তিনি তার পরিচর্যা করেছেন।

"শনিবারের চিঠি"র প্রতিষ্ঠা করেছেন শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযোগানন্দ দাস ও শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়। তার জন্মক্ষণে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী পরোক্ষভাবে এবং মোহিতলাল মজুমদার, যোগেশ বিদ্যানিধি থেকে ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ সুশীলকুমার দে, ডাঃ কালিদাস নাগ প্রমুখ প্রত্যক্ষভাবে সমাদর এবং সেবা করেছেন। সজনীকান্ত সাধারণ কর্ম নিয়ে তার সূতিকাগৃহে প্রবেশ

করেছিলেন। কিন্তু তিনি ওই কর্মের জন্য সংসারে আসেন নি, তাঁর শক্তি ছিল, প্রতিভা ছিল, সর্বোপরি এই কন্যাটিকে দেখে তাঁর অন্তরলোক—সীতার প্রতি জনকের স্নেহের মতো স্নেহ-উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল। তিনি কামস্কটীয় ছন্দে কবিতা লিখে "শনিবারের চিঠি"র শ্রীবৃদ্ধি করেছিলেন। "শনিবারের চিঠি" তখন সাপ্তাহিক। শনিবারের চিঠির বাঁধানো পুরনো সংখ্যাগুলি পড়েছি, পড়েই একথা বলছি এবং সজনীকান্তের "আত্মস্মৃতি"র কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করতে গিয়ে বলছি, তাঁর এই কথাগুলি অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

"যে কামস্কটীয় ছন্দের জন্য 'শনিবারের চিঠি'র ভোল পালটাইতে চলিয়াছে তাহার রচনাকে বাজে কাজের পর্যায়ভুক্ত করিতে পারিলাম না।"

এই সব বাজে রচনাকর্ম ছাড়তে উপদেশ দিয়ে কথাটা বলেছিলেন একজন প্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তি। তা বলুন। সজনীকান্ত তাঁর কথা মানলে নিজে ভুল করতেন এবং বাংলা-সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি হত। সমালোচনা-সাহিত্য এবং ব্যঙ্গরচনার ধারা আজ যে পরিমাণে পরিসর এবং পুষ্ট তা হত না এতে কোন সংশয় নেই।

সে কথা এখন থাক। "শনিবারের চিঠি" এবং সজনীকান্ত এই প্রসঙ্গেই ফিরে আসি। শনিবারের চিঠির ভোল পালটেছিল তাঁর কবিতার সুরে ও ছন্দে। অনেকজনে অনেক সুরে অনেক ছন্দে তাকে সমৃদ্ধ করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু "শনিবারের চিঠি" রূপিণী কন্যাটির কণ্ঠস্বরে সজনীকান্তের দেওয়া সুরই বেজে উঠেছিল স্বভাবসঙ্গীতের মতো এবং তাঁর পাঠকবৃন্দই তার গতিপথে সঞ্চারিত করেছিল স্বকীয়তার বেগ। এই সংগঠনের মধ্যেই তিনি দেখতে পেয়েছিলেন তাঁর নিজের এবং "শনিবারের চিঠি"র ভবিষ্যৎ। এ দেশের সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর ধ্যান ও ধারণা তাঁর ইংরাজি শিক্ষা ধারার প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে যায় নি। যদি বলি যে, তখনকার আধুনিক সাহিত্যিক যাঁরা, তাঁদের তাই হয়েছিল, তাঁরা আমাদের সমাজের আচার-বিচারের যেটুকু জীর্ণতা ও বিকৃতি তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে গিয়ে সমস্ত সমাজকেই ভাঙতে চেয়েছিলেন, অসুস্থ হৃদপিণ্ডে অস্ত্রোপচারের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী তথা ভারতীয় হৃদয়কে ছিন্ন করে ফেলে দিতে চেয়েছিলেন—তবে বাড়িয়ে বলা হবে না। তৎকালীন ইংরেজিভাবে অতি মাত্রায়-প্রভাবিত সাহিত্যিক ও রসিক সম্প্রদায় যতই সে সাহিত্যের বাহবা দিয়ে থাকুন সাধারণ বাঙালী সমাজ—তাঁদের মধ্যে ইংরিজি পড়া ও ইংরিজি না-পড়া মোটা বাঙালী সমাজ এই সাহিত্যকে আনন্দের সঙ্গে আপনার বলে গ্রহণ করেন নি। প্রতিবাদ উঠেছিল বাঙালী-হৃদয় থেকে। তাঁর হৃদয়ের প্রতিবাদ "শনিবারের চিঠি"র কণ্ঠস্বরের সহায়তায় সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। এবং বাংলাদেশের খাঁটি বাঙালী সমাজ তাকে গ্রহণ করেছিল। এ সত্য—একটা কালের সাহিত্য ও সমাজের ঘাত-প্রতিঘাত ও সংঘটনের যে ইতিহাস সেই ঐতিহাসিক সত্যের দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত।

আরও ঘটনাপরম্পরা আছে, যার ফলে "শনিবারের চিঠি"র সঙ্গে সজনীকান্ত জড়িয়ে পড়েছেন—সত্য সত্যই কন্যা-পিতার মতো। সে সব ঘটনা অনুবিস্তর

সুবিদিত "শনিবারের চিঠি"—শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযোগানন্দ দাসের পরিচালনায় সাপ্তাহিক হিসেবে কিছুদিন প্রকাশিত হয়ে বন্ধ হল। কিছুকাল পর আবার প্রকাশিত হল মাসিকপত্রাকারে। এ পর্যায়ে প্রকাশও আবার বন্ধ হল। এর পর সজনীকান্ত গভীর আকর্ষণে ও অন্তরের প্রেরণায় উপার্জনকরী অন্য কর্ম ত্যাগ করে অনন্যকর্মা হয়ে নিজের যথাসর্বস্ব এমন কি পত্নীর আভরণ পর্যন্ত দায়যুক্ত করে "শনিবারের চিঠি"কে লালনের ভার গ্রহণ করলেন। পুরনো "শনিবারের চিঠি"গুলি দেখে আমার কতবার মনে হয়েছে, তার লালন-পালনে তিনি তাকে অন্নবস্ত্র-উপার্জনক্ষমা করে তোলার মতো শিক্ষায় গঠন না করে, তাঁর আদর্শে ব্রতপালনক্ষমা করে তোলার মতো শিক্ষাকেই বড় করে তুলেছিলেন; "শনিবারের চিঠি"র সাহিত্য-জাতীয়তাবাদ সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলি বাংলা দেশের সাহিত্যক্ষেত্রেও জাতীয় জীবনের সম্পদ। এই নূতন পর্যায়ে পুরাতন নূতন শক্তিশালী বন্ধু ও সমব্রতধারীর অভাব হয় নি। মোহিতলাল মজুমদার তাঁদের মধ্যে অগ্রণী ও অধিনায়ক। রবীন্দ্র মৈত্র, ডাঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ সুশীলকুমার দে, ডাঃ বনবিহারী মুখোপাধ্যায় আবার এসে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। সঙ্গে ছিলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আরও ছিলেন শ্রীগোপাল হালদার—তখন তিনি জাতীয়তাবাদী। এবং আরও অনেকে। এ কালেরও সব কথা আমার শোনা, চোখে দেখা নয়। যাত্রাপথ সুগম ছিল না, দুর্গমই ছিল। এবং ভুলও হয় নি এমন নয়। আমার বিচারমতো আমি বলছি এ কথা। এ কালের শনিবারের চিঠি পড়ে এবং পরবর্তীকালে যখন শনিবারের চিঠির আসরে স্থান নিয়েছি তখনকার কালেও অনেক লেখা সম্পর্কে আমি আপত্তি জানিয়েছি; বলেছি, ভুল হয়েছে। এবং এই সব ভুলের জন্য সজনীকান্ত ও শনিবারের চিঠি আইন-আদালতের উদ্যত দণ্ড থেকে সাধারণের অপ্রীতির দণ্ডের সম্মুখীন হয়েছেন। এবং সে দণ্ড অম্লানমুখে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ভুলকে যখনই বুঝেছেন তখনই তা স্বীকার করার মতো ঔদার্য এবং মানসিকতার কখনই অভাব হয়নি সজনীকান্তের। একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করব। ১৯২৮ সনের কলকাতা কংগ্রেসে G. O. C.-র ভূমিকায় নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে আক্রমণ তাঁর ভুল হয়েছিল। কবিগুরুকে নিয়েও এ ভুল হয়েছে। কিন্তু কবিগুরুর শেষ জীবনে সজনীকান্ত এবং শনিবারের চিঠি এ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করে কবিগুরুর ক্ষমাই শুধু পায় নি, তাঁর আশীর্বাদস্বরূপ তাঁর রচনাও প্রকাশের অধিকার পেয়েছে। সজনীকান্ত ব্যক্তিগতভাবে কবিগুরুর আহ্বান পেয়েছেন, তাঁর চরণে প্রণতি জানিয়ে আশীর্বাদও পেয়েছেন। নেতাজী যদি ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করতেন, তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁর কাছেও এ আশীর্বাদ পেত শনিবারের চিঠি এবং সজনীকান্ত তাঁর স্নেহে ধন্য হতেন। নেতাজীর প্রত্যক্ষ আশীর্বাদ না পান—নেতাজী সম্পর্কে সেদিনের ভুল—সজনীকান্ত এবং শনিবারের চিঠি এ কালে বারংবার স্বীকার করে তাঁকে উচ্চকণ্ঠে প্রণতি জানিয়েছে ও তাঁর মহিমা-কীর্তনে মুখর হয়েছে। হয়তো কোন কোন ক্ষেত্রে সংশোধন হয় নি। সম্ভবতঃ আমি যাকে ভুল বলেছি তাকে সজনীকান্ত নিজের বিচারে ভুল বলে মানতে পারেন নি।

বঙ্গসাহিত্যের সেবক হিসাবে সজনীকান্ত এবং তাঁর মন্ত্রশিষ্যা—ব্রতপালিনী কন্যার মতো শনিবারের চিঠি এই কর্তব্য ব্রতধর্মের মতোই পালন করে এসেছে ; তাতে ভুল হয়েছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে, কিন্তু ভুল—ভুল বলে বুঝলে সংশোধনে কখনও কুণ্ঠা বোধ করেন নি সজনীকান্ত—সঙ্গে সঙ্গে শনিবারের চিঠি।

এইখানেই সজনীকান্ত এবং তার সঙ্গে শনিবারের চিঠির সাধনার শেষ বা সব নয়। এ মাত্র একটা দিক। এ তো শুধু ভাঙার সাধনা, হোক যা মন্দ যা বিকৃত তাই ভাঙার সাধনা। এতে শক্তির পরিচয় নিশ্চয় আছে—মন্দের উপর হলেও ক্রোধ—ক্রোধই, ধ্বংসাত্মক। কিন্তু কোন সাধনা বা সাধক পূর্ণ হতে পারে না, যতক্ষণ না শক্তির সঙ্গে সৃষ্টিলীলার সমন্বয় ঘটে ততক্ষণ। মহাপ্রকৃতির অমোঘ নির্দেশে, প্রকৃতিতে তাই ঘটে—তাই নিয়ম! নদী এক কূল ভাঙে, এক কূল গড়ে। ভূমিকম্পের মতো ধ্বংসাত্মক বিপর্যয়েও হিমালয়ের মতো নগাধিরাজের অভ্যুদয় হয়। কিন্তু মানুষের সভ্যতায় ও ইতিহাসে এ নিয়ম অমোঘ নয় ; শুধু ধ্বংস অনেক করেছে মানুষ। ব্যক্তি করেছে ; দল করেছে, জাতিও করেছে। সজনীকান্ত ও শনিবারের চিঠি যদি শুধু আঘাতে আঘাতে ভেঙেচুরে বিকৃতিরোধ করেই সাধনা শেষ করতেন তবে সে সাধনার মধ্যে বীর্য ও সংগ্রামজয়ের যত গৌরবই থাক, সে হত নিষ্ফলা সাধনা। কিন্তু তা নয়, সজনীকান্ত কবি, সজনীকান্ত স্রষ্টা, তার সঙ্গে শনিবারের চিঠির পৃষ্ঠা বাংলা সাহিত্যে সার্থক সৃষ্টিস্বাক্ষরে ধন্য ও উজ্জ্বল। শনিবারের চিঠির আসরের কথা বাংলা দেশে শুধু গল্পের আসর নয়, গৌরবের আসর। মোহিতলাল মজুমদার, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, মহাস্থবির, বনফুল, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সম্বুদ্ধ ও তাঁদের সঙ্গে লেখকও সজনীকান্তের আকর্ষণে এসেছেন, পরস্পরের লেখা পড়েছেন, আলোচনা হয়েছে, সৃষ্টির প্রেরণা লাভ করেছেন, সজনীকান্তের উদ্যোগে শনিবারের চিঠির পরিচর্যায় আনন্দ অনুভব করেছেন। সাধক গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে, শনিবারের চিঠি সৃষ্টিফলের উপচারে নৈবেদ্য সাজিয়ে বঙ্গবাণীর মন্দিরে ভক্তিবিনম্র-মস্তকে নিবেদন করেছে।

কালের নিয়মে পুরাতনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন সাহিত্যিকের আবির্ভাব হয়েছে। তাঁরাও পুরাতনের সঙ্গে সমান সমাদরে স্থান পেয়েছেন শনিবারের চিঠির আসরে। মনে পড়ছে যখন "বঙ্গশ্রী"র আসরে প্রথম তাঁর সঙ্গে পরিচয় হল তখন "বঙ্গশ্রী"তে প্রকাশিত হোক বা না-হোক যে কোন রচনা শেষ হলেই ছুটেছি সজনীকান্তের কাছে, আমি পড়েছি, তিনি শুনেছেন, মতামত দিয়েছেন। "বঙ্গশ্রী"তে তিনি ছিলেন দু-বৎসর। দু-বৎসর পর বঙ্গশ্রী ছেড়ে চলে এলেন। তিনি যখন "বঙ্গশ্রী"র সম্পাদক, তখন তাঁর জায়গায় পরিমল গোস্বামী ["শনিবারের চিঠি"র] সম্পাদক হয়েছিলেন। সজনীকান্ত "বঙ্গশ্রী" ছাড়বার পরও পরিমলবাবু বেশ কয়েক মাসই চিঠির সম্পাদক ছিলেন। এখানেও সেই লেখা শোনানো চলেছে। শুধু কি আমার। আরও কতজন এসেছে, শুনিয়ে গেছে। অসীম ধৈর্যের সঙ্গে ঘন্টার-পর ঘণ্টা লেখা শুনে গেছেন। এই সময়েই শনিবারের চিঠির পৃষ্ঠায় আমার রচনা প্রকাশিত হতে শুরু করে। থাকতাম বালিগঞ্জে মহানির্বাণ রোডের কাছে একখানা পাঁচটাকা ভাড়ার ঘরে,

খেতাম পাইস হোটেলে, দুপুরে এসে বসতাম শনিবারের চিঠির আপিসে। লেখা শোনাতাম, ওখানেই বিশ্রাম করতাম। তারপর একসময় আমার শরীর যখন ভেঙেছে—১৯৩৯ সন, পাইস হোটেলে খাওয়া সহ্য হয় না, সজনীকান্ত আমাকে আমন্ত্রণ করলেন শনিবারের চিঠির আলয়ে, দু-মাসেরও অধিককাল শনিবারের চিঠির পরিচর্যায় পরম তৃপ্তি অনুভব করেছি। জীবনে "অন্নঋণে"র মতো নিষ্ঠুর ঋণ আর হয় না, এ যেন সারা জীবনে পরিপাক পায় না, মৃত্যু পর্যন্ত মানুষকে পীড়িত করে রাখে, জীবনে, এই সাহিত্যসাধনার সময়, আমার দ্বারা উপকৃত কোন আত্মীয় বন্ধু (উপকার সামাজিক এবং রাজনৈতিক) আমাকে তাঁর ওখানে উঠতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। তাঁর সে অন্নমূল্য আমার উপকারকে তুচ্ছ করে আজও বহুমূল্য বা ক্রমেই গুরুপাক হয়ে উঠেছে, আজ তার দরুণ পীড়া অনুভব করি। কিন্তু শনিবারের চিঠির এই পরিচর্যা, এই অন্ন কখন যে পরিপাক পেয়ে গেছে তা বলতে পারব না। কোনদিন কোন পীড়া অনুভব করি নি। শনিবারের চিঠি এবং সজনীকান্ত বরং এই সত্যই ঘোষণা করেছেন যে, তাঁরা ধন্য হয়েছেন একজন সাহিত্যসাধকের সেবা করে।

আচার্য মোহিতলালের সেবায় ধন্য হয়েছে শনিবারের চিঠি ও সজনীকান্ত। সাহিত্যরথী বনফুলের সেবায় কৃতার্থ হয়েছে শনিবারের চিঠি ও সজনীকান্ত। এক্ষেত্রে যে প্রেম দেখেছি তা সচরাচর দেখা যায় না। দুর্লভ।

সজনীকান্ত দোষলেশহীন ত্রুটিহীন চরিত্র মহাপুরুষ এ অবশ্যই বলি নে আমি, "শনিবারের চিঠি" অতুলনীয় সাহিত্যের আকর তাও বলি নে। গৃহী মানুষ, কর্মী মানুষ, দোষে-গুণের সমন্বয়ে গড়া, জীবন কর্ম ব্যর্থতায় সার্থকতায়, ভ্রান্তিতে সংশোধনে দৃঢ়তায় 'পতন অভ্যুদয় পন্থার মতো' বন্ধুর, কিন্তু এই মানুষ এবং তাঁর কর্ম কখনও হীনমন্যতায় দুষ্ট এবং পতিত নয়। বলিষ্ঠ মানুষ, আদর্শবাদী মানুষ, প্রেমিক মানুষ; তাঁর মানসকন্যা শনিবারের চিঠিও তাই। সজনীকান্তের বিয়োগে শনিবারের চিঠি আজ পিতৃহীনা হল।

তাঁর মৃত্যুর ক্ষণে আমি তাঁর পাশে বসে; ডাক্তারেরা চলে গেলেন; পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—আমাদের পাটুদা পাশের ঘরে চলে গেছেন।—কাঁদছেন; আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি, চোখের সামনে সজনীকান্ত চলে গেলেন। ধরাশায়ী বীরের মতো তিনি বিছানায় এলিয়ে পড়ে গেছেন। স্ত্রী, পুত্র, পুত্র-বধূ, কন্যারা উৎকণ্ঠা-কাতর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তাঁর নিমীলিতদৃষ্টি মুখের দিকে। ভাবছেন চোখ মেলবেন এখনি। বুঝতে পারছেন না কি হয়েছে। আমাকে তাঁর চতুর্থ কন্যা সোমা হাত ধরে ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করল, জ্যাঠামশাই, কি হয়েছে? বলুন না, ডাক্তারেরা চলে গেলেন কেন? পরপর সব মেয়েরা প্রশ্ন করল। তাঁর স্ত্রী কাতরভাবে প্রশ্ন করলেন, বলুন তারাশঙ্করবাবু? আমাকেই এ নির্মম সত্য প্রকাশ করে বলতে হল। সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে মীরা প্রথম, তার সঙ্গে সকলে চিৎকার করে প্রতিবাদ করল, না-না-না।

আমি নিচে নেমে আসবার সময় সজনীকান্তের গ্রন্থাগারের দরজায় যেন আরও কার কণ্ঠের এই প্রতিবাদ শুনেছিলাম। সে কণ্ঠ তাঁর মানসকন্যা শনিবারের চিঠির।

সজনীকান্তের তিরোধানে পিতৃহীনা হল "শনিবারের চিঠি।" পিতৃগৌরব এবং গুরুবল হারিয়ে আজ সে একা। শুব্ধ বিষণ্ণমুখে সে ভাবছে তার পিতৃদত্ত মন্ত্রসাধনার গুরুভার এবং গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবে তো?

সজনীকান্তের সহকর্মী বন্ধু যাঁরা তাঁদের সঙ্গেই আমি বলব, পারতে হবে। এতকালের যে শিক্ষা, তন্ত্রধারক সজনীকান্তের চালনায় যে হোমাগ্নি জ্বলেছে, তাকে অনির্বাণ রাখতে হবে। তিনি তো তোমাকে একাকিনী রেখে যান নি, তোমার চারিপাশে সমবেত করে দিয়ে গেছেন নবীন তপস্বীর দল। হোমকর্মের এক পর্যায় শেষ হল, জীবন ঢেলে দিয়ে সজনীকান্ত পূর্ণাহুতি দিয়েছেন, আবার নূতন তন্ত্রধারকের পরিচালনায় নূতন অগ্নি স্থাপন কর।

তার পূর্বে পিতৃবন্দনাকৃত্য শেষ কর, হাত জোড় করে বল, পিতা গুরু, দিব্যরথে তোমার ঊর্ধ্ব থেকে ঊর্ধ্বতরলোকে গতি অব্যাহত হোক, আমরা দিব্য-রথের জ্যোতির্লেখা যতক্ষণ দূরতম ঊর্ধ্বলোকে চক্ষুর অগোচর না হয়, ততক্ষণ নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছি।

তারপর নবমন্ত্রে আবাহন করে অগ্নি স্থাপন কর।